মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১৫শ বর্ষ—২য় খণ্ড

(ভাদ্র—মাঘ, ১৩৩০)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৪এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩৩০

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(ভাদ্র—মাঘ ৩৩০)

বিষয়-সূচী

লেখক-সূচী

চিত্র সূচী (পূর্ণপৃষ্ঠা)

মোকদ্দমায় পরাজিত শাইলক।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ
২য় খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩০

২য় খণ্ড
১ম সংখ্যা

রামায়ণে বানর ও রাক্ষস

যাঁহারা রাম রাবণের যুদ্ধ কাল্পনিক মনে না করেন, তাঁহাদের অনেকের মতে রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যবাসী অসভ্য জাতির সহায়তায় দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কাপতিকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন—ফলমূলভোজী বানর ও আমমাংসভোজী রাক্ষস তাঁহাদের মতে সেকালের অনার্য্য, অসভ্য মানব মাত্র।

অসভ্য বানর ও অসভ্য রাক্ষস কিন্তু এক শ্রেণীর জীব নহে; অমর কবির তুলিকায় উভয়ের পার্থক্য বেশ পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত হইয়াছে। উভয়ের জীবনোপায় ভিন্ন, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ভিন্ন, আদর্শ ভিন্ন। বানর বীর-প্রকৃতির হইলেও অপেক্ষাকৃত শান্ত জীব, সে আর্য্যজাতির অনুগত; তাহার ধর্ম্মজীবনের আদর্শ আর্য্যমানব। রাক্ষস পার্থিব সুখ সম্পদ ও কার্য্য কুশলতায় বানর অপেক্ষা অনেক উন্নত, আর্য্য অপেক্ষাও বোধ হয় অবনত নহে; কিন্তু ধর্ম্মজীবনে সে অনেক নিম্ন স্তরে।

রামায়ণের বানর লাঙ্গুলযুক্ত হইলেও কেবল বৃক্ষ-বিচরণকারী জীব নহে, রাক্ষসও কেবল আমমাংসভোজী নহে। রামায়ণকার উভয় শ্রেণীর জীবকেই সংস্কৃত নাম দিয়াছেন; জন্মবিবরণ দিতে গিয়া অলৌকিকতার ভিতর দিয়া উভয়েরই শরীরে যথেষ্ট সভ্যরক্ত মিশাইয়া দিয়াছেন। রামায়ণের বানরগণের পিতৃত্ব স্বর্গের দেব-গণে আরোপিত হইয়াছে, রাক্ষস নিধনের জন্ত দেবগণ মর্ত্ত্যে আগমন করতঃ এই আবশ্যক ভারটি গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। আর রাক্ষসদের দলও নানা জাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে উৎপন্ন—ব্রাহ্মণ, দানব, গন্ধর্ব্ব, খাঁটি রাক্ষস, এই সকলের সংমিশ্রণের মধ্যে উদ্বাহ ক্রিয়ার যে উদারতা দেখিতে পাই তাহা বর্ত্তমানযুগের উৎকট সমাজ-সংস্কারকের পক্ষেও লোভনীয়।

রামায়ণের বানরগণের রাজা সুগ্রীব হইলেও তাহা-দের প্রধান আদর্শ চরিত্র হনুমান। তাঁহাকে প্রথমতঃ সুগ্রীবের প্রধান মন্ত্রী, পরে রামচন্দ্রের প্রধান চররূপে দেখিতে পাই; হনুমান ইচ্ছানুরূপ বেশ ধারণে ও গমনে সমর্থ, বাগ্মী ও সুপণ্ডিত, তাঁহার ভাষা ব্যাকরণ-সম্মত ও বিশুদ্ধ—

"নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩–২৯

তিনি কাষ্ঠঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে জানেন। এই রকম অগ্নির সম্মুখেই রামচন্দ্রের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা সম্পাদিত হইয়াছিল।

রামায়ণের বানরগণ ঠিক বনচারী জীব নহে। তাহাদের রাজ্য, রাজধানী, ধ্বজা, ছত্র, চামর, মুকুট, অমাত্য, জ্যেষ্ঠত্ব ক্রমে রাজ্য প্রাপ্তি—সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের মুকুট আছে তাহারা যে বিবস্ত্র নহে ইহাও সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। তাহারা একবস্ত্রও নহে, সুগ্রীব একস্থানে রামের নিকট কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী তাঁহাকে দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে না দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছেন—

"এবমুক্ত্বা তু মাং তত্র বস্ত্রেণৈকেন বানরঃ।
তদা নির্ব্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ ॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ১০।২৬

যুদ্ধের সময় বালী ও সুগ্রীব উভয়েরই দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করার উল্লেখ আছে। নির্ব্বাসিত অবস্থায়ও সুগ্রীবের কণ্ঠাভরণ দেখিতে পাই।

কিন্তু অগ্নি প্রজ্বালন সত্ত্বেও অগ্নিপক্ক খাদ্যের পরিচয় পাই না, সভ্যতার অনেক উপকরণ সত্ত্বেও ধনুর্ব্বিদ্যার অভাব দেখিতে পাই। বাস্তবিক যুদ্ধবিদ্যায় রামায়ণের বানরগণ নিতান্তই সেকেলে, বৃক্ষ ও পাথর তাহাদের একমাত্র অবলম্বন।

রমণী লইয়া বানররাজ বালীর সহিত অসুরের শত্রুতার উল্লেখ আছে,—রমণীটি লাঙ্গুলধারিণী ছিলেন কি না বোঝা যায় না; না থাকারই সম্ভাবনা। সেই সভ্যতার প্রভাতকালে বানরবংশের যৌন সম্বন্ধ বানর দলেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বানর হইলেও কিষ্কিন্ধ্যা রাজবংশ আর্য্যোচিত ক্রিয়াকলাপ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নহে। বানর রাজমহিষী তারা স্বয়ং স্বস্ত্যয়ন মন্ত্রজ্ঞা—সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধগমন কালে বালীর জন্য মাঙ্গলিক কার্য্য তিনি স্বয়ং সম্পাদন করিতেছেন দেখিতে পাই। বালীর মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ বিচিত্র শিবিকায় নদীকূলে দাহস্থলে নীত হওয়ার উল্লেখ আছে। আর্য্য শাস্ত্রানুযায়ী মৃতদেহে অগ্নি প্রদান ও চিতা প্রদক্ষিণ, উদক ক্রিয়া প্রভৃতি করিলেন দেখিতে পাই। ইহা যে রামলক্ষ্মণের অবস্থিতিবশতঃ নূতন রকমের একটা সংস্কার এরূপ নহে। সুগ্রীবের অভিষেক ক্রিয়াটা রীতিমত শাস্ত্রসম্মত নিয়মে সম্পন্ন হইবার উল্লেখ আছে; ব্রাহ্মণদিগের সন্তোষ বিধানটিও বাদ পড়ে নাই।

বলা বাহুল্য বানরগণের কিষ্কিন্ধ্যা নগরও ঠিক বানরের নগর নহে। এখানে সুসমৃদ্ধ গুহা প্রাসাদ ও স্বর্ণ-সিংহাসন, প্রাকার ও পরিখা, গুহামধ্যে হর্ম্ম্য ও বিবিধ বিলাসদ্রব্য, প্রধান বানরগণের অত্যুৎকৃষ্ট গৃহের সমাবেশ দেখিতে পাই। সুগ্রীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লক্ষ্মণকে আসন সমন্বিত সপ্তকক্ষ্যা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, সেখানে রমণীগণের নূপুর ও কাঞ্চীরব লক্ষ্মণকে লজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। রামচন্দ্র বনবাস ব্রতাবলম্বী সুতরাং কিষ্কিন্ধ্যার ন্যায় নগরে প্রবেশ করিতে আপনাকে অনধিকারী মনে করিয়াছিলেন। বালী, সুগ্রীব, তারা প্রভৃতির মদিরাপানের উল্লেখ আছে। সুগ্রীবকে সুবর্ণ শিবিকায় আরোহণ করতঃ রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিতে দেখা যায়। সুগ্রীবের প্রজা পৃথিবীর নানাস্থানে ব্যাপ্ত; তাঁহার রাজ্যশাসন সামন্তগণের সহায়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অন্তঃপুর প্রাচ্য নরপতির অন্তঃপুরের ন্যায় গুপ্ত ও জমকালো। যেখানে এত বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্য, সেখানে লাঙ্গুল কেন, এবং অস্ত্রবিদ্যার অভাব কেন বুঝিয়া উঠা কঠিন। বালি-বধের কৈফিয়ৎ-স্বরূপ রামচন্দ্র যে এই হত্যাকাণ্ডকে মৃগয়ার সহিত উপমিত করিয়াছেন, তাহাও কেমন একটু সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হয়।

যদি রাম রাবণের যুদ্ধ ইতিহাসমূলক হয়, তবে এই অসামঞ্জস্যের একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, রামায়ণ রচনার সময়টা রামায়ণোক্ত ঘটনার এত পরে যে, তখনই অলৌকিকতার আবরণ প্রকৃত ইতিহাসকে প্রচ্ছন্ন করিয়া

ফেলিয়াছিল। প্রাচ্যজগতের কল্পনা ও ভারতীয় আর্য্য-জগতের ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত কাব্য এখানে নিবিড়ভাবে জড়িত, ইহাতে ডারউইনের যে কোন হস্তচিহ্ন নাই তাহা নিশ্চিত।

রামচন্দ্রের অনুচরবর্গ ঐশ্বর্য্যশালী দেবকুমার হইলেও মরজগতে বানরমাত্র, তাই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের এই অলৌকিক আলিঙ্গন। বানর প্রভৃতির যে অলৌকিক ক্ষমতা তাহাও তাহাদের এই মিশ্র উৎপত্তি ও মিশ্র প্রকৃতরই আনুসঙ্গিক ব্যাপার।

রামায়ণের রাক্ষসেরাও স্বভাবতঃ অসভ্য জাতি নহে। আন্দামান দ্বীপের আমমাংসভোজী বনচারী দ্বিপদ জীবের সহিত তাহাদের জ্ঞাতিত্বের কোন পরিচয় নাই। রাক্ষসরাজ রাবণের ও তাঁহার লঙ্কাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্য। দেবতা, যক্ষ, মানুষ, নাগ, কাহারও অপেক্ষা রাবণ শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যে কম নহে—অযোধ্যা রাজ্যের ঐশ্বর্য্য তাঁহার অপেক্ষা কম বই বেশী নহে। লঙ্কার রাজপথ কুসুমে বিকীর্ণ, প্রাসাদ নানা রত্নে সজ্জিত, বিলাসিতার তাৎকালীন কোন উপকরণেরই সেখানে অভাব নাই। রাবণের অন্তঃপুর শ্বেতপদ্ম শোভিত পরিখার পরিবেষ্টিত, দেব দানব ও ঋষিকন্তার পরিপূরিত—তাঁহার প্রধানা মহিষী মন্দোদরী ময়দানবের কন্তা, সুতরাং পিতৃকুলে পুলোমকন্তা ইন্দ্রাণীর সহিত সমান পর্য্যায়ভুক্তা। কবি বিভীষণের মুখে রাবণকে অহিতাগ্নি ও বেদান্তগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও রাবণ রাক্ষস। তাঁহার দশটা মাথা। লঙ্কাপুরে যেমন সুন্দরী রমণীর অভাব নাই, তেমনি কুরূপ ও বিকটাকার রাক্ষস রাক্ষসীরও অভাব নাই—কাহারও এক চক্ষু, কাহারও এক কর্ণ, কাহারও বিশাল কর্ণ, কাহারও মস্তকের উপর নাসিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। অলৌকিকতা আবার স্বাভাবিকতাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এইরূপ রাক্ষসীরাই অন্তঃপুর রক্ষার নিযুক্ত। ইহারাই সীতাদেবীর উপর পাহারার ভারপ্রাপ্ত। উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ প্রধান প্রধান রাক্ষসের থাকিলেও, অনেকের পরিধানে গোচর্ম্ম।

রাবণের প্রধান মহিষীগণ অবশ্যই রূপবতী ও যুবতী এবং দুনিয়ার নানাস্থান ও নানাবংশ হইতে সংগৃহীত। তাঁহার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ভয়ে ভয়ে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইব, এখানে প্রাচ্য নৃপতির বিলাস সম্পদের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার আহার পানাদির উপকরণ গলাগলিভাবে জড়িত। এখানে বীণাধ্বনি আছে কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য আছে গন্ধ তৈল পূর্ণ রত্ন-প্রদীপ আছে, স্বর্ণালঙ্কৃত শিবিকা আছে, কৃত্রিম পর্ব্বত আছে, কাঞ্চন ও বৈদূর্য্যমণিযুক্ত গবাক্ষ আছে। অক্ষ-ক্রীড়া আছে, নৃত্য আছে, রমণীকণ্ঠের রাগ রাগিণী আছে। আবার সুপক্ক ও অপক্ক বহুবিধ মাংস স্তূপীকৃত। পানপাত্র বিবিধ মদিরায় পূর্ণ। কুক্কুট ও ময়ূর, শশক ও বরাহ নিহত হইয়া সান্ধ্য ভোজনের উপকরণ রূপে সেখানে সজ্জিত। রাক্ষসেরা মদিরাপানে বিলক্ষণ অভ্যস্ত। বীর রাক্ষসেরা শোণিত পানেও পরাঙ্মুখ নহে; নর বানরের শোণিত কুম্ভকর্ণের লালসার জিনিষ।

হস্তী অশ্ব ও রথের বর্ণনায় রাক্ষসদিগকে একটি পরাক্রান্ত জাতি রূপে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাক্ষসরাজ রাবণের দিগ্বিজয়, অলৌকিকতার ভিতরেও, বিপুল পরাক্রমের পরিচায়ক। রামায়ণের প্রথমাংশে তাড়কা, সুবাহু, বিরাধ প্রভৃতি রাক্ষস রাক্ষসীগণের সহিত যখন আমাদের পরিচয় জন্মে, তখন তাহাদিগকে শান্তিপূর্ণ জনপদে অত্যাচারকারী, মুনিঋষিগণের যজ্ঞ বিঘ্নকারী, আমমাংস ভোজী, দস্যুপ্রকৃতি ভীষণ জীব স্বরূপই দেখি। ক্রমে কামচারিণী শূর্পণখার সহিত পরিচয়ে তাহাদিগের নৈতিক জীবনের আর একটি অপকৃষ্ট দিক আমাদের গোচরীভূত হয়। তাহার পর সীতাহরণ ব্যাপারে প্রবল প্রতিহিংসা বৃত্তি ও দুর্দ্দমনীয় রিপুর দাসত্ব আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে। তাহার পর যখন সমগ্র জাতিটার সহিত আমাদের পরিচয় হয়, তখনই দেখি, ইহার মধ্যে কেবল নীচতা নাই, তেজস্বিতাও আছে, কেবল ধ্বংসকারিতা নয়, সৃষ্টিকারিতাও আছে। লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের পর আমাদের স্বাধ্যায়-

নিরত রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বেদাধ্যায়ী, (হয়ত রাক্ষসী বেদ) পূজানিরত রাবণের জটাতাংযুক্ত গুপ্তচর দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই—কেবল নররক্ত পিপাসু দস্যুপ্রবৃত্তি রাক্ষসে লঙ্কাপুরী পূর্ণ নহে। সেখানে বুদ্ধিমান্, আস্তিক, "রুচিরাভিধান" রাক্ষসেরও অস্তিত্ব আছে—বিভীষণই লঙ্কার একমাত্র ধার্ম্মিক পুরুষ নহেন। ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞে আর্য্যোচিত ক্রিয়াকলাপ দেখিতে পাই। রাবণের সৎকার ব্যাপারে আর্য্য ও অনার্য্য ব্যবহারের অপূর্ব্ব সমাবেশ। ইহাতে বেদোক্ত চিতার সহিত দারুপাত্র ও পশুচর্ম্মের ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে। রাক্ষসগণ বশিষ্ঠ বা রামচন্দ্রের সমধর্ম্মী না হইলেও তাহাদের স্বতন্ত্র উপাস্য দেবতা ছিল, এমন কিছু উল্লেখ নাই। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ তাহাদের প্রতিযোগী ও শত্রু। কিন্তু ব্রহ্মার স্তব ও তাঁহার নিকট বরলাভই প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের দুর্জ্জয়তার কারণ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রাবণকে কোন সময়ে মহাদেবেরও অনুগ্রহভাজন দেখিতে পাই। অবশ্য রামায়ণের উত্তর কাণ্ডেই এই সকল তপস্যা, বর ও দেবগণের সহিত ঘনিষ্ঠতার ছড়াছড়ি। উত্তর কাণ্ড পরবর্ত্তী যোজনা হইতে পারে এবং রাক্ষসদিগকে আর্য্যধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনাও অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে সুস্পষ্ট ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রচলিত রামায়ণের কবি বা কবিগণ কি ভাবে রাক্ষস চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাই আলোচ্য। একটি আর্য্যেতর ভীষণ জাতি কতকটা আর্য্য ভাবাপন্ন ও অনেকটা অনার্য্য ভাবাপন্ন-শস্ত্রবিদ্যায় ও পার্থিব ভোগবিলাসে অত্যন্ত উন্নত; কিন্তু দুর্নীতি ও কদাচারে ভীতিব্যঞ্জক—এইরূপ ভাবেই সাধারণ রাক্ষসগণ চিত্রিত। কল্পনা এই চিত্রকে কালপ্রবাহে হয় ত রূপান্তরিত করিয়াছে। অথবা চিত্রটাই এমন সময়ে অঙ্কিত যখন ইতিহাস অলৌকিকতায় পরিণত।

রাক্ষস ও বানরের যুদ্ধই প্রধানতঃ রামায়ণের বিশেষত্ব। মানুষে মানুষে যুদ্ধ ত' অনেক কাব্যেই আছে। রামায়ণ পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কবি যে সময়ের কথা লিখিয়াছেন তখন ভারতবর্ষের অনেক স্থান জঙ্গলাবৃত। জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে মুনি ঋষিগণের আশ্রম, সমুদ্র বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থল খণ্ডের মত দেখা গিয়াছে মাত্র। আর্য্য রাজদিগের কয়েকটী রাজ্য স্থূলতঃ উত্তরাপথেই সীমাবদ্ধ। অরণ্য মধ্যে অপর যাহারা বিচরণ করে তাহারা হয় বানর, নয় মারীচ বিরাধাদির ন্যায় রাক্ষস। বানর ও রাক্ষসেরাও কথা কহে, আর্য্যোচিত কিছু কিছু আচরণ করে, কিন্তু তাহাদের নিজেদের রীতি নীতি আর্য্য রীতি নীতি হইতে স্বতন্ত্র। বানরেরা নিরামিষাশী এবং অহিংস্র—তাহাদিগের সম্বন্ধ মুনি ঋষিদের ভয় নাই। কিন্তু রাক্ষসেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিপৎকালে যতই বড় বড় দেবতার শরণাপন্ন হউক্ না, সাধারণ দেবতাদিগের সহিত তাহাদের অহিনকুল সম্বন্ধ; ঋষিগণ তাহাদিগের হিংসাবৃত্তির প্রধান পাত্র। যজ্ঞের দ্রব্য হরণ ও শোণিত বর্ষণ দ্বারা যজ্ঞনাশ তাহাদের নিত্যকর্ম্ম। ঋষিকন্যা হরণ তাহাদের নিকট অপকর্ম্ম নহে; আবশ্যক হইলে ঋষি মাংসে উদর পূর্ত্তি করিতেও তাহারা প্রস্তুত। আর্য্যের আনুগত্য বানরগণের, আর্য্যের বৈরিতা রাক্ষসগণের প্রকৃতিসিদ্ধ। শারীরিক বলে কেহ কাহা অপেক্ষা হয়ত ন্যূন নহে। বালীর নিকট রাবণ অধিক বলশালী নহে। হনুমান ও অঙ্গদের ভয়ে বড় বড় রাক্ষস বীর সন্ত্রস্ত।—তবে রাক্ষস শস্ত্র-বিদ্যায় কুশল। বানর সে বিদ্যার অর্জ্জনে সময়ক্ষেপ করে নাই। আমরা এখনও সার্কাসের বানরকে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান দেখিতে পাই, কিন্তু রামায়ণের বানরকে যুদ্ধ স্থলে কোনরূপ বাহন অবলম্বন করিতে দেখি না। ঈশ্বরদত্ত পদেই তাহারা দ্রুতগামী—লম্ফনে তাহারা সুপটু। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও বানর রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে, সাহস ও বীরত্বে কম নহে। তাহাদের প্রভুভক্তি অটল, আদর্শ আর্য্যবীরের ন্যায়-সঙ্গত কার্য্যে তাহারা নির্ভীক। মাংসাশী, উগ্র-প্রকৃতি রাক্ষসের শস্ত্রবিদ্যা ও রণকৌশল নরবানরের

সময়ে বিফল হইলে আর্য্যোচিত গুণযুক্ত বিভীষণ তাহাদের রাজা হইলেন। রাক্ষসগণ অবশ্য তাঁহার শাসনাধীনে অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিল। রামের রাজ্যাভিষেক কালে যে সকল রাক্ষসকে অযোধ্যায় দেখিতে পাই, তাহাদের দ্বারা কোনরূপ উপদ্রবের উল্লেখ নাই; নম্র ভাবেই রাক্ষসত্ব লুকাইয়া রাখিয়াই তাহারা স্বকার্য্য সাধন করতঃ দেশে ফিরিয়াছিল। বাস্তবিক বিভীষণের আশ্রিত রাক্ষসদিগকে রামের পরিবারভুক্ত জীবও বলা যায়। রামচন্দ্রের তিরোধানের সময় কেবল অনেক বানরই নহে, অনেক রাক্ষসকেও সরযূসলিলে প্রবেশ করিতে দেখি। এই রাক্ষসগণের রাক্ষসত্ব নিশ্চয়ই লোপ পাইয়াছিল। রামচন্দ্রের বিজয়-লাভ, বিভীষণের শাসন, ও আর্য্যগণের সংস্রবে আসিয়া রাক্ষসগণ উত্তরোত্তর আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছিল। বাহুবল ও নৈতিক বল উভয়েরই এখানে ক্রিয়া। রামায়ণের রাক্ষসগণ কাল্পনিক জীবই হোক আর ভিন্ন সমাজের মানবই হউক, তাহাদের বিবরণে কবি ভারতে অনার্য্য-জাতির অবস্থান্তর প্রাপ্তি বেশ সুন্দর রূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন। বানরের বেলাও ওই কথা। কিন্তু এখানে বাহুবলের ব্যবহার ততটা স্পষ্ট নহে।

প্রথমে বালীবধ ব্যাপারে অবশ্য কিঞ্চিৎ বাহুবলের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সেটা সূচনা মাত্র। বানর-রূপী অনার্য্য জাতির আর্য্যভাবগ্রহণ আর্য্যের নৈতিক বলের—উচ্চতর সভ্যতারই ফল। উচ্চশ্রেণীর মানবের নিকট নিম্ন শ্রেণীর মানব যে জন্য মস্তক অবনত করে, রামায়ণের 'বানর' সেই জন্যই আর্য্যমানবের নিকট মস্তক অবনত করতঃ আর্য্যসভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বানর অহিংস্র, তাই এখানে বাহুবলের প্রয়োগ নাই; রাক্ষস হিংস্র, তাই এখানে প্রথমে বাহুবল, পরে নৈতিক বল। ভারতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের এই প্রক্রিয়া। কেবল স্বতন্ত্র ভাবে, অনার্য্যের সাহায্য না লইয়া মুষ্টিমেয় আর্য্যসন্তান এই বিশাল ভূখণ্ড আর্য্য উপনিবেশে পরিণত করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এখানে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড সকল নীতির প্রয়োগেরই আবশ্যকতা ছিল, কিন্তু সর্ব্বোপরি প্রয়োজন ছিল বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করা। 'বানর' শ্রেণীর অনার্য্যকে এইরূপ আনয়ন করা সহজ ছিল। সহজ ছিল বলিয়াই এইরূপ অনার্য্যের সহায়তায় রাক্ষসশ্রেণীর অনার্য্যকে আর্য্যধর্ম্মের, আর্য্য-সভ্যতার গণ্ডীর ভিতরে আনা সম্ভব হইয়াছিল। বাহু-বল ও মানসিক বল, শস্ত্রবল ও নৈতিক বল উভয়েরই এখানে যুগপৎ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, শুধু বাহুবলে কখনও এই জনপদ "ভারতবর্ষে" পরিণত হইত না। বানর ও রাক্ষস উভয়ের উপরই যদি কেবল বাহুবল প্রয়োগে প্রাধান্য বা সখ্য স্থাপন আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্ত যাহাই হউক, দাক্ষিণাত্য হয়ত চিরকালই "বানর" ও "রাক্ষসের দেশই থাকিয়া যাইত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আমার ঠাঁই

যারা নেহাৎ ঘুমায় জেগে,
মুখে সদাই বাদল লেগে,
হাওয়া খেতে, হাস্য যাদের
হাওয়ায় নাহি বহে,

পুলক যেথা এসেই ছুটে
দেখেই তাদের আঁতকে উঠে
কুটিলতায় করকটে আর
দরকটে সব প্রাণ—
হে ভগবান হয় না যেন তাদের মাঝে স্থান।

ঘুরছে মাথা যাদের কাছে
মৃত্যুস্পর্শ লেগেই আছে,
চিন্তা যেথা বসত করে
পেচক গাহে গান।
পঞ্জিকাতে যাদের রে ভাই
পার্ব্বণেরি উল্লেখও নাই,
ঘেঁটু এবং ঘণ্টাকর্ণ
কচিৎ পূজা পান—
হে ভগবান হয় না যেন তাদের মাঝে স্থান।

যাদের বুকে আলেয়া জলে,
ফুল ফোটে না, ফল না ফলে,
শিয়ালকাঁটায় ভরা যাদের
মরা মরুস্থান,
বাস্ত যেথায় কেবল শিঙে
পক্ষী যেথায় কেবল ফিঙে,
ভোক্‌রাতে আর ঠোক্‌রাতে হায়
জীবন অবসান—
হে ভগবান হয় না যেন তাদের মাঝে স্থান।

ফন্দী যেথায় আঁটছে সবে,
ঘুরছে সদাই কি মৎলবে
তেজের বহর হয় যেখানে
তেজের পরিমাণ,
নিরেট যত বোকার বাথান
নিন্দা রটান, দেশটা মাতান,
নাইক গোটা, লোটা লোটা
যাদের দুটো কাণ—
হে ভগবান হয় না যেন তাদের মাঝে স্থান।

নাকের সোজা যাদের সড়ক,
এক দিনেতে পৌছে নরক,
অবিশ্বাসীর নিশ্বাসে পাই
কুম্ভীপাকের টান,
অহঙ্কার আর ইতরতায়
বসে যাদের জীবনটা যায়,
দেহের মাঝে গুমরে কাঁদে
আত্মা ম্রিয়মাণ—
হে ভগবান হয়না যেন তাদের মাঝে স্থান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অপূর্ণ
(উপন্যাস)

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লি ঘুরিয়া অতুলকৃষ্ণ সনাতনকে লইয়া পুনরায় কাশী ফিরিতেছেন। কাশী আসিয়া আত্মীয়গণকে বাসা করিয়া রাখিয়া, তিনি সনাতনকে লইয়া অন্যান্য স্থানে বাহির হইয়াছিলেন।

অশোকের সন্ধান কোথাও মিলে নাই। কাশীতে আরও দিন পনেরো থাকিয়া, আত্মীয়বর্গকে সঙ্গে লইয়া বরাবর কলিকাতায় আসিবেন। সেখানে অন্ততঃ ৪৫ মাস থাকিয়া অশোকের সন্ধান করিবেন। কে জানে হয়ত সে কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছে।

একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামিলে সনাতন অতুলকৃষ্ণকে একেবারে নির্ব্বন্ধ করিয়া ধরিল—"বাবু এখানে একটু নামুন। এর পরে হলে আর হবে না।"

আহারাদি করিয়া সকাল ৮টার সময় ট্রেণে উঠা হইয়াছিল, এখন রাত্রি ১০টা। সনাতন সেই সন্ধ্যা

হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে কি করিয়া বাবুকে কিঞ্চিৎ আহার করাইবে। ট্রেণে বসিয়া বাবু কিছু খান্ না তাই এখনও কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই। সে অন্যান্য আরোহী বাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছে যে. এই ষ্টেশনে ট্রেণ ১৫ মিনিট থামিবে, তাই স্থির করিয়াছে বাবুকে এখানে গাড়ী হইতে নামাইয়া যেমন করিয়া হউক কিছু আহার করাইয়া লইবে এবং বাবুকে সেই অভিপ্রায়ে অনেক পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাযেই অতুলকৃষ্ণ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। সনাতন বাবুক সঙ্গে করিয়া একেবারে দীর্ঘ প্লাটফরমের শেষ-ভাগে একটু নিভৃত স্থান দেখিয়া, সেখানে কম্বল পাতিয়া বাবুকে বসাইল ও ফলমূল যাহা সঙ্গে ছিল কাটিয়া রেকাবী বাহির করিয়া তাহাতে সাজাইয়া দিল ও তাড়াতাড়ি জল আনিয়া দিল।

অতুলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "সনাতন তোমার এ সব খেতে গেলে গাড়ী ছেড়ে দেবে এ জেনে রাখ। তখন উপায় ?"

সনাতন বলিল, "আপনি কিছু ভাববেন্ না বাবু, —নিশ্চিন্দি হয়ে খান। বেহারী বসে রইল, আপনার খাওয়া হইলে এগুলো নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবেখন। আমি ততক্ষণ এগিয়ে গিয়ে থাকি, তেমন তেমন দেখ্‌লেই ছুটে এসে খবর দেব।" বলিয়া, অপর যে চাকরটি সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাকে বাবুর কাছে বসাইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

গাড়ী সেদিন ঐ ষ্টেশনে ৫মিনিট বিলম্বে পৌঁছিয়াছিল। সনাতন কিন্তু সে খবর রাখে নাই। সে বাবুকে নিশ্চিত ভাবে ভরসা দিয়া গিয়াছিল যে দরকার বুঝিলে সংবাদ দিবে। কিন্তু এ ধারে লোকের ব্যস্ততা, ষ্টেশন মাষ্টারের আবির্ভাব ইত্যাদি দেখিয়া সে নিজেই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর খানিকটা পরে ষ্টেশন মাষ্টারের ইঙ্গিতে হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফরমের লোকগুলি ছুটিতে ছুটিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত প্লাটফরমে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

সনাতন এবার বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেল। বাবু আসিয়া তাহাকে কি বলিবেন? ছুটিয়া সে ষ্টেসন-মাষ্টারের নিকট যাইয়া হাতযোড় করিয়া বলিল—"হুজুর, আমার বাবু গাড়ীতে জলবিন্দু মুখে দেন্ না। অনেক করে বলে তাঁরে ঐ মহাড়ায় বসিয়ে একটু জল খেতে দিয়েছি। আপনি গাড়ীটা একটু থামিয়ে দিন।"

ষ্টেশনমাষ্টার সাহেব তাহার একবর্ণ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "নেহি হোগা, টিকেট লেনে হোগা।"

—বলিয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

এদিকে গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিবা মাত্র গাড়ী ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিল। সনাতন দেখিল শেষপ্রান্ত হইতে বাবু ছুটিয়া আসিতেছেন। গার্ড সাহেব তাহার নিকট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া—নিজের গাড়ী আসিলেই উঠিয়া পড়িবে সেই অপেক্ষায় আছেন। সনাতনের মাথা ঘুরিয়া গেল। মুহূর্ত্তে একটা মৎলব তাহার মাথায় আসিল। আর কালবিলম্ব না করিয়া সে ছুটিয়া গিয়া, যেমন গার্ড হাত দিয়া হ্যাণ্ডেল ধরিবেন, অমনি সনাতন দুই হাত দিয়া গার্ড সাহেবকে জড়াইয়া ধরিল।

ষ্টেশনময় একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। গার্ড সাহেব তো অবাক্! তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। গাড়ী আর একটু গিয়াই থামিয়া পড়িল। ষ্টেশনের পুলিশ ছুটিয়া আসিয়া সনাতনকে ধরিয়া ফেলিল। গার্ড সাহেব তখন ব্যাপার একটু বুঝিয়া, একটা ঘুঁসি উঠাইলেন।

এমন সময় অতুলকৃষ্ণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন। ব্যাপারটা গার্ড সাহেবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধ ভৃত্য তিনি গাড়ী পাইবেন না এই আশঙ্কায় গাড়ী থামাইবার এই শেষ বিপজ্জনক উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কাযটা অত্যন্ত গর্হিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। সেজন্য তিনি ও ভৃত্য দুজনেই মার্জ্জনা চাহিতেছেন। কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টারেরও ইহাতে কিঞ্চিৎ দোষ আছে, যেহেতু দুই মিনিট আগে গাড়ী ছাড়া হইয়াছিল।" বলিয়া অতুলকৃষ্ণ নিজের মূল্যবান্ ঘড়ি খুলিয়া দেখাইলেন যে এতক্ষণে ঠিক সময় হইয়াছে।

গার্ড সাহেবের তখনি মনে হইয়াছিল যেন একটু আগে ছাড়া হইতেছে; কিন্তু তাঁহার ছাড়িলেই ভাল বলিয়া ও বিষয়ে মাথা ঘামান নাই। যিনি দায়ী—ষ্টেশন মাষ্টার তিনি কাযের ঝোঁকে অত খেয়াল করেন নাই। টেলিগ্রাফ অফিসের ঘড়ি ঠিক ছিল, কিন্তু বাহিরে যে ঘড়ি ছিল তাহা দেখিয়া তিনি গাড়ী ছাড়িবার আদেশ দিয়াছিলেন।

গার্ড সাহেব লোকটি ছিলেন সহৃদয়। ব্যাপার বুঝিয়া খুব উচ্চ হাসিয়া প্লাটফর্ম্ম প্রতিধ্বনিত করিয়া সনাতনের পিঠ চাপ দিয়া - Faithful servant, faithful servant বলিয়া ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিলেন। ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিলেন, পরের ষ্টেশনে ঠিক সময়ে পৌছাইয়া দিব।

বলিয়া নিজের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। সনাতন ও সভৃত্য অতুলকৃষ্ণও নিজ স্থানে পৌছিয়াছিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া অতুলকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ সনাতন, রাস্তাঘাটে খাওয়া খাওয়া করে অত ব্যস্ত হওয়া ঠিক নয়। আর একটু হলেই এখানে আটক পড়েছিলাম আর কি? তবে গাড়ী থামাবার অব্যর্থ উপায় দেখিয়ে দিলে বটে!"

সনাতন অপ্রস্তুত হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণ পাঁচটায় ভুবন সরকারের লেনে কতকগুলা খোলার বাড়ীর মধ্যে একটি বাড়ীর দুয়ারের নিকট যাইয়া অশোক ডাকিল, "কুমুদ!"

ভিতর হইতে বাবা বাবা বলিয়া অশোকের শিশুপুত্র কুমুদ আসিয়া তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলিয়া দিয়া পিতার হস্ত ধরিয়া আহ্বান করিয়া লইল; দুয়ার বন্ধ করিয়া অশোক ভিতরে গেল।

অনুপ্রভা অতিকষ্টে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, স্বামীর মলিন মুখ দেখিয়াই অনুপ্রভা বুঝিল আজও তিনি বিফল হইয়া আসিয়াছেন।

ত্রিপুরার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়াও অশোক নিস্তার পায় নাই। অসুখের সময় বিনা মাহিনায় তাহার ৩ মাস ছুটি মঞ্জুর হইয়াছিল। ঐ ৩ মাস সময়ের জন্ত ঐ গ্রামেরই সন্ত আই-এ পাশকরা একটি যুবক উক্ত কার্যের জন্ত আগে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল। তারপর ঘটনাচক্রে ঐ লোকেরই ঐ কার্য্যটি স্থায়ীভাবে মিলিয়া গেল এবং অশোক পদচ্যুত হইল। ঘটনাচক্র আর কিছুই নহে—কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিলেন যে স্থানীয় লোক বিদেশী লোক অপেক্ষা ভাল, সেজন্ত একটি কারণ দেখাইয়া বলিলেন যে, অশোক বাবু রোগে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, বৎসর কয়েক তাঁহার রীতিমত বিশ্রামের দরকার। সুতরাং তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অতি কষ্টে সংসার চালাইয়া, এবং বাড়ীতে ছাত্র পড়াইয়া যে টাকা পাওয়া যাইত তাহার একটিও খরচ না করিয়া, অনুপ্রভা যে অর্থ সঞ্চিত করিয়াছিল, সে সমস্ত অশোকের রোগে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। এ অবস্থায় চাকরি যাওয়ায় অশোক ও অনুপ্রভা অত্যন্ত অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে পড়িয়া গেল। তাহার উপর একটী কন্তা প্রসব করিয়া অনুপ্রভা পীড়িত হইয়া পড়িয়া অশোককে আরও অসহায় করিয়া ফেলিয়াছিল। শেষটা অনুপ্রভার অবস্থা ক্রমেই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল, এদিকে বেকার অবস্থা এমনই সাংঘাতিক হইয়া উঠিল যে অশোক ২১ জন শুভানুধ্যায়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসাই স্থির করিয়া ফেলিল। অগত্যা অশোক সেখান হইতে এক ভদ্রলোকের নিকট আংটি বন্ধক দিয়া মাত্র ২৫টি টাকা সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসিয়া এই খোলার বাড়ীতে উঠিয়াছিল।

আজ দুই সপ্তাহ হইল অশোক সপরিবারে কলিকাতা আসিয়াছে। অনুপ্রভার একখানি মাত্র যে অলঙ্কার ছিল তাহা বেচিয়া পথ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কোনমতে করিয়াছিল। কিন্তু রোগ একটু কমিতে না কমিতে হাত শূন্ত হইয়া গিয়াছিল এবং ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া

অশোক কোথাও একটা ১০ টাকা মাহিনার টিউশনিও যোগাড় করিতে পারে নাই।

অশোক শ্রান্তভাবে স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আর এক দাগও ওষুধ নেই, নয়?"

প্রশ্নের সহিত অশোকের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল।

সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রভার বুকও যেন অনেকখানি বসিয়া গেল। তবু সে মুখখানি কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কাল তো রাত বেশী হয়ে গেলে আর খাই নি। আজ সকালে সে দাগটা খেয়েছি। আজ আর ওষুধের দরকার হবে না। শরীরটা একটু ভালও বোধ হচ্চে।"

"কোথা ভাল বোধ হচ্চে! ও সব বলে আমার পাপের বোঝা আর বাড়িওনা অনু।"

কথা কয়টা অশোক নিতান্ত হতাশ হইয়াই বলিল।

শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বে ছোট্ট মেয়েটি মাইপোষ মুখে দিয়া পড়িয়া ছিল। মুখ হইতে সেটা ছাড়িয়া যাইতেই সে কাঁদিয়া উঠিল।

ক্রন্দনের স্বরে চমকিত হইয়া অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "খুকীর গলার আওয়াজটা অমন হ'ল কেন?"

অনুপ্রভাও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া খুকীকে কোলে তুলিয়া স্তন্য দিতে গেল। দুগ্ধহীন মাতৃস্তন দুই একটিবার টানিয়াই সে আবার কাঁদিয়া উঠিল।

অনুপ্রভা অতি ধীরে ধীরে স্বামীর অবসন্ন হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল, তুমি "অমন মুষ্‌ড়ে পোড়ো না। তুমি দেখো, ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেনই।"

অশোক নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল, "তার আগে বুঝি বা তোমাকেই হারাই, অনু! এ রকম দুর্ব্বল রুগ্ন শরীরে না অষুধ, না পথ্য, আর কদিন বাঁচবে?"

দুঃখের মধ্যেও আনন্দে অনুপ্রভার চোখের কোণায় কোণায় জল ভরিয়া আসিল। একটু থামিয়া থাকিয়া কহিল, "দেখো গো আমি এখনি মরছিনে। তোমাকে নিশ্চিন্ত সুখী না দেখে আমি কি করে মরি বল?"

এ সান্ত্বনা অশোককে শান্ত করিতে পারিল না।

অশোক সবিষাদে কহিল, "কিছুতে সুবিধে করতে পারছিনে অনু। কত জায়গায় চাকরির চেষ্টায় গেলাম, সব মিছে হ'ল। আফিসে আফিসে ঘুরলাম—বল্লে, খালি নেই। কত লোকের দোকানে গেলাম, যদি যা তা একটা কায পাই—তারা বল্লে, ব্যবসা অত সোজা নয় যে আস্‌বে আর কায কর্‌বে, এও শিখ্‌তে হয়। এদিকে কাল থেকে হাতে তো একটা পয়সাও নেই! কি যে করি!"

স্বামীর এই অবসন্ন ও নিরাশ ভাব অনুপ্রভার হৃদয়ে শেল বিঁধিয়া দিতে লাগিল। মাত্র আধ পোয়া-টেক চাউল ছিল, সেই চাউলে যে ভাত হইয়াছিল তাহা খোকা খাইবার পর মাত্র ৩।৪ গ্রাস অবশিষ্ট ছিল। তাই —উদরস্থ ঠিক বলা যায় না—প্রায় 'কণ্ঠস্থ', করিয়া বেলা ১১টার সময় স্বামী বাহির হইয়াছিলেন, আর এই অপরাহ্নে সমস্ত কলিকাতা প্রদক্ষিণ করিয়া কোথাও কিছু যোগাড় করিতে না পারিয়া অবসন্ন শরীর মন লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

অনুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিতে করিতে কহিল, "একটা কথা বল্‌ব, রাগ করবে না?"

অশোক। কি, বল! এত সুখে রেখেছি, এর উপরে আবার রাগ করব? তা হলে আমার বাহাদুরি আছে বটে।

অনুপ্রভা। তোমার ঐ এক কথা। আচ্ছা দেখ, তুমি যে ৩।৪ মাস আগে মায়ের নামে চিঠি লিখেছিলে, হয়ত সে পৌছে নি, কি আর কোন গোলমাল হয়েছে। একদিন তুমি নিজে যাওনা কেন? কখনও কষ্ট সহ্য করনি; কষ্টের আর অবধি নেই তোমার।

অশোক। ও কথাটি মুখে এনো না। বেঁচে থাকতে আর বাড়ীর দ্বারস্থ হব না। যদি অদৃষ্টে লেখা থাকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করব সেও স্বীকার, তবু বাড়ী আর যেচে যাব না। এখানে এসেও তো চিঠি দিয়েছিলাম বাবার নামে—কোন উত্তর আসে নি।

অনুপ্রভা। কি কুক্ষণে তুমি আমায় গ্রহণ করেছিলে!

তাইতে তোমার আজ এই দুঃখ। নইলে তোমার অন্ন খায় কে?

বড় দুঃখে অনুপ্রভা এই কথাটা বলিল।

অশোক দেখিল পার্শ্বে ছোট একটি পৃথক শয্যায় অনুপ্রভার ছোট্ট মেয়েটি এতক্ষণ ঘুমাইতেছে। হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল।

ক্রন্দনের সুরে চমকিত হইয়া আবার অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "খুকীর গলার আওয়াজটা অমন হল কেন?"

অনুপ্রভা তৎক্ষণাৎ খুকীকে কোলে তুলিয়া বলিল, "কি রকম ঠাণ্ডা লেগেছে। ভিতরে ভিতরে বড্ড সর্দ্দি হয়েছে।" বলিয়া সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে খুকীর পানে চাহিয়া তাহাকে স্তন্য পান করাইতে গেল।

অশোক নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মাটির মেঝে, একটা চৌকিরও ব্যবস্থা করতে পারলাম না, তা আর ঠাণ্ডা লাগবে না!"

খুকী কোলে উঠিয়া, চুপ করিয়াছিল, কিন্তু দুই এক বার দুগ্ধহীন মাতৃস্তন টানিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

অশোক মুহূর্ত্ত তাহার বিস্ফারিত চোখ দুটা অন্য দিকে ফিরাইয়া কহিল, "কোত্থেকে মায়ের মাইয়ে দুগ্ধ আসবে! একে অসুখ, তার উপর অনাহারে অচিকিৎসা, দুধের আর অপরাধ কি?

খুকী আর একবার মাতৃস্তন্য টানিবার চেষ্টা করিয়া খুব জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

অশোক অনুপ্রভার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "ফিডিং বোতলটা কোথায় গেল? সেইটেই দিয়ে দি।"

অনুপ্রভা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

অশোক উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে বোতলটা আনিয়া কহিল, "দুধ কৈ? এতে ত দুধ নেই!"

অনুপ্রভার মুখ শুকাইয়া গেল। কুমুদ পিতাকে দুধের খোঁজ করিতে দেখিয়া কহিল, "দুধ আজ আনেনি ত বাবা। খুকি কি খাবে?"

কথাটা বজ্রের মত অশোকের বুকে গিয়া বাজিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মোটেই বুঝি দুধ দেয় নি? দাম পায়নি বলে বুঝি সে বন্ধ করেছে? আজ সমস্ত দিন কি খেলে?"

অনুপ্রভা বলিল, "বোস গিন্নি খানিকটা দুধ দিয়েছিলেন। তাতেই চলে গেছে।"

অশোক হতাশ হইয়া শয্যায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, "পরের কাছে ভিক্ষে করেও এক সের দুধ সংস্থান করতে পারা গেল না। শেষে এও অদৃষ্টে ছিল। উঃ!"

অনুপ্রভা ভয়ে ভয়ে কহিল, "তুমি অমন কোরো না; এখনও আধসেরটাক দুধ আছে। ঐ তাকের উপর আছে পেড়ে দাও না।"

"তা হলে তুমি কি খাবে?"

"আমি ত সাবু খেয়েছি। তাতেই আমার পেট যথেষ্ট ভরে গেছে।"

অশোক আর সহ্য করিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আপনার উচ্ছ্বসিত রোদন বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। তবু মুখ দিয়া একটি আর্ত্ত স্বর বাহির হইল।

অনুপ্রভা তাড়াতাড়ি খুকিকে বিছানায় রাখিয়া নিজে মাথাটা স্বামীর পায়ের উপর রাখিয়া মৃদু সিক্ত কণ্ঠে কহিল, "চুপ কর। তুমি অমন করলে আমি কি করব?"

খোকা বাপ মায়ের অবস্থা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা দিন বা একটা রাত্রি কিংবা অন্ততঃ খানিকটা সময় এমন ভাবে কাটে যে, সে তাহা চিরজীবনের মধ্যে কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না। পুত্র কন্যা ও স্ত্রীর ক্ষুধাতুর অবস্থা দেখিয়া অশোকের অদ্যকার রাত্রি সেইরূপ একটা রাত্রি কাটিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোরের দিকে অতি অল্পক্ষণের জন্য অশোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভোরে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল সদানন্দ পুত্রও আজ ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোট মেয়েটি সাবুর জল খাইয়া শ্লেষ্মার অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে। স্ত্রী শুষ্ক মুখে ম্লান নেত্রে কোলের মেয়েটীর পানে মাঝে মাঝে চাহিতেছে, আর কুমুদকে বুঝাইতেছে, "চুপ কর। তুমি

লক্ষ্মী ছেলে বাবা। এখনি ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অশোক আধ ময়লা চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া, জুতা যোড়াটা কোন মতে পায়ে ঢুকাইয়া বাহির হইতে গেল।

অনুপ্রভা ব্যস্ত হইয়া দেওয়াল ধরিয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় যাচ্চ? অন্ততঃ হাত মুখটা ধুয়ে বেরিও।"

অশোক ততক্ষণ দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেখান হইতে কহিল, "আজ একবার শেষ চেষ্টা করব।"

অনুপ্রভা শয্যার উপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পরে একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কুমুদ, দুয়োরটা বন্ধ করে এস বাবা!"

পিতার হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে কুমুদ অতিশয় বিস্মিত হইয়া কান্না বন্ধ করিয়াছিল। মাতার কথা শুনিয়া আস্তে আস্তে দুয়োর বন্ধ করিয়া আসিয়া মায়ের কাছটিতে শুব্ধ হইয়া বসিল।

অশোক বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, ইহার মধ্যে রীতিমত লোক চলাচল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নিজের যে একটা নিশ্চিত কায আছে ইহা সকলেরই মুখভাবে সুস্পষ্ট।

বড় রাস্তায় পড়িয়া অশোক ভাবিল যে এখন কোথায় যাইবে? কোথায় গেলে অর্থ আসিবে? অর্থ এখন তাহার দেবতার মত আরাধ্য। অর্থ আসিলে ঔষধ আসিবে, খাদ্য আসিবে, শিশু পুত্র কন্যা খাইয়া বাঁচিবে।

অশোক পাঠ্যাবস্থায় শুনিয়াছিল যে বড়বাজারের মাড়োয়ারীরা অনেক সময় অনেক টাকা দিয়া প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করে। এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সে কোন সন্ধানই এযাবৎ কখনও করে নাই। আজ সে স্থির করিল ঐ মাড়োয়ারি অঞ্চলে ঘুরিয়া দেখিবে যদি একটা মাষ্টারি যোগাড় করিতে পারে।

কিন্তু এত সকালে কাহার কাছে গিয়া সে বলিবে আমাকে মাষ্টারি দাও। তখন সে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে কলেজ ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্ হইতে বৌবাজার ষ্ট্রীট্ এই রকম করিয়া ঘণ্টা দুয়েক কাটাইয়া দিল। তার পর আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া হ্যারিসন রোডে পড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিল। কত মাড়োয়ারির বাড়ী সে পার হইয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে খুকীর গলায় কি রকম একটা ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল এবং দুধ অভাবে গলা-ভিজাইবার জন্য ঈষৎ গরম যেটুকু জলসাবু তাহার মুখে দেওয়া হইতেছিল, তাহা দু'গাল বাহিয়া পড়িয়া গেল।

খুকীর অবস্থা দেখিয়া অনুপ্রভা বড়ই ভীতকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁগা খুকী এমন কচ্ছে কেন দেখ।" অশোক সমস্ত দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘরের দাওয়ায় তাহার ময়লা উড়ানিখানি বিছাইয়া একটু শুইয়া পড়িয়াছিল, একটু ঘুমও বোধহয় আসিয়াছিল।

স্ত্রীর আর্ত্তস্বরে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া অশোক এক লাফে ঘরের ভিতরে আসিল।

স্বামীকে দেখিয়াই অনুপ্রভা কাঁদিয়া কহিল, "ওগো দেখ খুকী কি রকম করছে। হ্যাঁগা কি হবে?"

অশোক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল অতটুকু মেয়ের পেট কমিয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। দুধ না পাইয়া যেন অজ্ঞান হইয়া যাওয়ার মত হইয়াছে। শিশুপুত্র কুমুদ একটা শুষ্ক নারিকেলের মালা করিয়া আধমুঠা ছোলাভাজা লইয়া এক একটি করিয়া খাইতেছিল, কিন্তু মাকে হঠাৎ কাঁদিতে দেখিয়া ঐ মহার্ঘ খাদ্যগুলি হাতে করিয়া শুব্ধ হইয়া দাড়াইয়া ছিল।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক করে বল খুকীকে আজ কতটুকু দুধ খেতে দিয়েছিলে।"

অনুপ্রভা সত্য গোপন করিতে আর সাহস করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আজ অন্য দুধ পাইনি। মাইতে যা একটু ছিল তাই খেয়েছে।"

অশোক ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "অ্যাঁ," বল কি! তাহলে এতক্ষণ কি দিয়ে শান্ত করে রেখেছিলে?"

অনুপ্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সাবুর জলের সঙ্গে ভাতের মাড় মিশিয়ে বারকতক দিয়েছি। মাড়ও যে বেশী ছিল না।"

কথাটি অশোকের কাণে যেন বজ্রাঘাতের মত বাজিল। সে ভয়ে টলিতে টলিতে দাওয়ার কাছ হইতে ময়লা উড়ানি খানা কাঁধে তুলিয়া লইল।

এমন সময় খুকী কি রকম একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া মুখব্যাদান করিল।

"ওগো তুমি একবার কাউকে ডাক। খুকী বুঝি বাঁচেনা।" বলিয়া অনুপ্রভা অত্যন্ত সভয়ে ও কাতর ভাবে স্বামীর পানে চাহিল।

অশোক আর বাক্যব্যয় না করিয়া ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার মনে তখন সঙ্কল্প জাগিয়াছিল যেমন করিয়া হোক এখনই অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিতেই হইবে, আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে ঔষধ পথ্য ডাক্তার সব যোগাড় করিতেই হইবে। ভিক্ষা, চুরী—সব উপায়ের জন্যই সে আজ প্রস্তুত।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর আসিয়া অশোক ভাবিতে লাগিল, কোন পথ সে এখন অবলম্বন করিবে। প্রথমে ভাবিয়াছিল ভিক্ষা করিবে। কিন্তু তাহার গা ঘেঁসিয়া কত ধনী যুবক চলিয়া গেল, কাহারও কাছে তো হাত পাতিতে পারিল না। অশোক কেমন করিয়া ভুলিবে যে সে একদিন এইসব ধনিসন্তানদের মধ্যে কাহারও চেয়ে কম ছিল না। এত অভাবের মধ্যে পড়িয়াও আজও যে সে কথা অশোক ভুলিতে পারিল না। সম্মুখ দিয়া লোকের পর লোক চলিয়া যাইতেছে, কত বার অশোকের মনে হইল যে একবার কাহাকেও বলে——আমি আজ বড় বিপন্ন, দয়া করিয়া কিছু ভিক্ষা দিন্। কিন্তু কথাটা মন হইতে কণ্ঠের কাছে আসিয়া আটকাইয়া গেল।

আর একটু অগ্রসর হইতে অশোক দেখিল, এক বাবুর সঙ্গে এক মুটে একটি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দ্রব্যাদি নামাইল। বাবুটি তাহার হাতে একটি দুয়ানি দিতে গেলে সে বলিল, "বাবু সেই ইষ্টেশন থেকে আস্‌ছি —মোটে আট পয়সা?"

এই কথাটি শুনিয়া অশোকের সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হইল। সে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে শেয়ালদহ ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিল। সে আজ মোট বহিয়াই পুত্র কন্যা কে বাঁচাইবে। অন্য কোনও পথ যখন সে পাইল না, তখন এই করিয়াই সে দেখিবে।

ষ্টেশনে যখন অশোক পৌঁছিল তখন ঠিক সন্ধ্যা। একখানা গাড়ী সবে মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দলে দলে লোক বাহির হইতেছে। অনেকের সঙ্গে ষ্টেশনের কুলি।

বাহিরের একটি জায়গায় ঝাঁকা লইয়া ও শুধুহস্তে অনেক কুলি দাঁড়াইয়া। তাহারা বাহিরের।

অশোক দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সম্মুখ দিয়া অধিকাংশ কুলি মাল লইয়া দর ঠিক করিয়া চলিয়া গেল। সে শুষ্ক কণ্ঠে দুর্ভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ এক বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া একটা ক্যাম্বিসের বড় ব্যাগ প্রায় অশোকের দেহের উপর ফেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "চল্ তো রে, ঐ ট্রাম পর্য্যন্ত—দু'পয়সা পাবি,"বেশী নয়। শীঘ্র চল্—ট্রাম এখনই ছেড়ে দেবে।"

বলিয়া, বৃদ্ধ হাঁপাইতে হাঁপাইতে অগ্রগামী হইল। অগত্যা অশোক ব্যাগ দুইহাতে বুকের কাছটি পর্য্যন্ত উঠাইয়া পিছে পিছে চলিল। কাঁধে তুলিতে তাহার কি রকম একটা লজ্জা করিতে লাগিল।

ট্রামে উঠিয়া বৃদ্ধ কোমরে বাঁধা একটা গেঁজে খুলিয়া দুটি পয়সা বাহির করিল ও একবার পয়সা দুটি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এই নে রে!"

অশোকের মাথা যেন কিসের ভারে নত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মনে হইল, সকলেই যেন তাহার পানে তাকাইয়া আছে, দেখিবে কেমন করিয়া জমিদার

অতুলকৃষ্ণ রায়ের একমাত্র পুত্র 'অশোক' মোট বহিয়া দুটি পয়সা হাতে করিয়া লয়।

অশোক আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। পয়সা না লইয়াই, সে একটু হাসিয়া এক দৌড়ে ট্রাম হইতে দূরে একটা আলোক স্তম্ভের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রামের কয়েকজন লোক বলিল, "লোকটা পাগল।"

সে ট্রামখানা ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর মিনিট কয়েক অশোক আলোকস্তম্ভের নীচে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় আর একটা গাড়ীর আরোহী দল নিকটে পৌছিল।

একজন অশোকের মুখের পানে তীক্ষ্ণভাবে কয়েক বার চাহিয়া কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

অশোকের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এ ব্যক্তিকে বুঝি সে কোথাও দেখিয়াছে। তাহার গ্রামেই না? অশোক আর প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে চাহিতে সাহস করিল না। একটু সরিয়া জনসঙ্ঘের মধ্যে মিশিয়া পড়িল। তার পর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একেবারে হেরিসন রোডের সহিত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট যেখানে মিশিয়াছে সেই খানটায় আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর কি ভাবিয়া, উত্তর দিকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

মিনিট পাঁচেক ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিতে চলিতে একটা বাড়ীর সম্মুখে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন মনে মনে পড়িল, তাহার বাসায় মরণাপন্ন একটি শিশুকন্যা ও ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের ভার এক অসহায়া রুগ্না নারীর উপর দিয়া আসিয়াছে। ডাক্তার ডাকাইবার অর্থ তো দূরের কথা, এক পোয়া দুধের দামও সে যোগাড় করিতে পারে নাই।

যাহা করিতে হয় এখনি করিতে হইবে। সম্মুখের ত্রিতল অট্টালিকা যেন কোনও ধনীর বলিয়াই মনে হইতেছিল। দ্বারে কোনও দ্বারবান্ বসিয়া ছিল না। মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। উপরে পায়ের শব্দ হইতেছিল। পার্শ্বে একটু দূরে লোকজনের কথাবার্ত্তাও শুনা যাইতেছিল। কিন্তু সে সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না যাহার নিকট নিজের অভাব বা মনোভাব প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা চাহে।

আর একটু অগ্রসর হইলে কাহাকে না কাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, এখন সে মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা করিবেই করিবে—এই ভাবিয়া অশোক বারান্দায় উপর উঠিয়া আসিল।

বারান্দায় উঠিয়া অশোক দেখিল, সেখানেও কেহ নাই। শুধু সম্মুখে চেয়ার টেবিল দেওয়া সজ্জিত একটা ঘরে সুদৃপ্ত আলো জ্বলিতেছিল। হয়ত এই ঘরে কেহ আছে, এই ভাবিয়া অশোক ধীরে ধীরে ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, ইহা ভাবিতেই অশোকের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু ঘরের ভিতর ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল ঘরের মধ্যে তখনও কেহ আসে নাই।

কেহ না কেহ এখনি আসিবে এই মনে করিয়া অশোক সেখানে অপেক্ষা করিতে যাইবে, এমন সময় তাহার লক্ষ্য পড়িল টেবিলের উপরকার একটা রিষ্ট-ওয়াচের উপর। আর মনে পড়িল বাড়ীর সেই সাজ্ঘাতিক অবস্থা—সেখানে হয়ত এতক্ষণ মৃত্যুর হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

সামান্য অশুচিতার ভিতর দিয়া যেমন নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ এই দারুণ অভাবের মধ্য দিয়া লোভ ও মোহ আসিয়া অশোকের চিত্ত বিদ্যুদ্বেগে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার মনে হইল, কখন কে আসিবে, আসিয়া কিছু সাহায্য করিবে কি তাড়াইয়া দিবে তাহার ঠিক নাই। তাহার চেয়ে ঐ ঘড়িটা লইলে তো এখন বাঁচিয়া যায়। ঘড়িটা বেচিলে অন্ততঃ ১০ টাকাও তো পাওয়া যাইবে।

তখনি আবার মনে হইল এ যে চুরী—নিতান্তই হীন কায! শেষটা বংশ, জীবন সব কি এক মুহূর্ত্তে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে?

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল মরণাপন্ন শিশু-কন্যার ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি, ক্ষুধাতুর পুত্রের ক্রন্দন, রুগ্ণা পত্নীর ম্লান বেদনাতুর দৃষ্টি!

বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। শেষে প্রলোভনেরই জয় হইল। অশোক ঘরের মধ্যে একটু অগ্রসর হইয়া কম্পিতপদে স্পন্দিতবক্ষে রক্তহীন হস্ত দিয়া টেবিলের উপর হইতে ঘড়িটা তুলিয়া, চারিদিকে একবার চাহিয়া, একটু দ্রুতপদে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

গেটের কাছে পৌছিতেই কে যেন অন্তরের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—চোর!

হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া অশোক ভাবিল, তাই তো, শেষটা চুরী করিতে হইল? সমস্ত জীবনটা কি একটা দিনের এক মুহূর্ত্তের ঘটনায় এমনি করিয়া কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে? পিতামাতা তো তাকে ত্যাগ করিয়াছেন; শেষটা ভগবানের দ্বারাও কি সে পরিত্যক্ত হইবে?

আবার মনে পড়িল সেই কাতর-ক্লিষ্ট পুত্র কন্যার মুখ।

হউক্, যা হইবার তাহাই হউক্, সে এমন করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিবে না। আর এই কলঙ্কের পসরা পুত্র কন্যার শিরে চাপাইয়া যাইবে না।

অশোক স্থির করিল যে ঘড়ি ফিরাইয়া রাখিবে; তারপর ভিক্ষা চাহিবে। মিলে ভাল। না মিলে অন্যত্র চেষ্টা করিবে। আর এই যে বিলম্ব—এই সময়, তুমি তাদের দেখিও ভগবান্।

সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে মনে বল আসিল। অশোক দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিল এবং তারপর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর ঘড়িটী রাখিল। সঙ্গে সঙ্গে কে একজন ছুটিয়া আসিয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"তবে রে শালা! আর চুরির জায়গা পাও নি?"

থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অশোক ঘরের সেইখানে বসিয়া পড়িল। যে লোকটি ধরিয়াছিল সে 'চোর' চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। উপবিষ্ট অশোককে টানিয়া হিঁচড়াইয়া বারান্দায় আনিয়া ফেলিল।

একটু পূর্ব্বে একটাও লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এখন সে বাড়ীর বাবু ও ভৃত্যবর্গের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল এবং সকলে মিলিয়া, ভয়ে কম্পমান ও লজ্জায় ম্রিয়মান অশোককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। অশোক আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া সমস্ত প্রহার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

যে যুবকটি প্রথমেই অশোককে ধরিয়াছিল, সে তখন বলিল, "এই জয়া, যাতো, শালাকে এখনি থানায় নিয়ে যা। যা, এখনি যা।" এতক্ষণ এত নির্ম্মম প্রহার যে নিস্তব্ধ হইয়া সহ্য করিয়াছিল, থানায় যাইবার কথা শুনিবামাত্র সে করযোড়ে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই আপনাদের বাবু, আমায় আরও মারুন, মেরে ফেলে দিন। আমায় থানায় দেবেন না।"

"থানায় দেবনা তোমায়? গোপাল আমার! হয়েছে কি তোমার এখন, ঘানি টানবে যখন তখন এর মর্ম্ম বুঝবে।" বলিয়া সে লোকটি এক বলিষ্ঠ উড়িয়া ভৃত্যের হাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

"আপনাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন। আমার বাসায় আমার স্ত্রী মেয়ে মরমর, ছেলে খিদেয় ছটফট করছে, আমার স্ত্রী মরণাপন্ন, তাদের মুখ তাকিয়ে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। সত্যি বল্‌ছি আমি ভদ্র লোকের ছেলে, ভিক্ষা করতে এসেছিলাম। চোর নই।"

উপরের কোণের একটি সুসজ্জিত ঘরের বারান্দায় এক ভদ্রলোক সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া পাইচারী করিতেছিলেন, এমন সময় নীচেকার কোলাহল ও অশোকের সেই আর্ত্তস্বরে উচ্চারিত কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এ কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। এতদিন পরে—এ তাহারই কণ্ঠস্বরের মত নয়?

মন তাঁহার এত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল যে, সেখানে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। "আহা কে কাকে

এমন করে কষ্ট দিচ্ছে রে। এস তো সনাতন আমার সঙ্গে।"

বলিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত তিনি বরাবর নীচে নামিয়া আসিলেন। ভৃত্য নীরবে প্রভুর অনুসরণ করিল।

ইনিই অতুলকৃষ্ণ। তীর্থাদি শেষ করিয়া দুই মাস হইতে পুত্রের আগমন আশায় কলিকাতা আসিয়া বাস করিতেছেন।

ঘরের ভিতরকার আলোতে, চৌর্য্যাপরাধে ধৃত যুবকটিকে দেখিবামাত্র অতুলকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিলেন। আশা ও আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"সনাতন, একটা আলো আন ত, কে দেখি।"

সনাতনেরও সন্দেহ হইয়াছিল। সে ছুটিয়া পাশের ঘর হইতে একটা লণ্ঠন আনিয়া সম্মুখে ধরিল।

বিস্মিত স্তম্ভিত ও রক্তাক্ত হৃদয়ে অতুলকৃষ্ণ দেখিলেন, যাহার জন্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া চক্ষু আজ অন্ধ হইতে চলিয়াছে, যাহার বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহিণী লোকান্তরে চলিয়া গেলেন, যাহার সন্ধানে জলের মত দুই হাতে অর্থব্যয় করিয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই তাঁহার একমাত্র বংশধর, তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী অশোক তাঁহারই বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে,—আর তাঁহার নাম মাত্র আত্মীয় অপদার্থ গলগ্রহ লোকগুলা, তাঁহারই বাড়ীতে তাহাকে ধরিয়া এমন নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিতেছে—আর সে কাঁদিয়া বলিতেছে—"আমার পুত্র, কন্তা স্ত্রী মরমর, আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি চোর নই।"

উঃ অদৃষ্টের একি ভয়ঙ্কর পরিহাস! খানিকক্ষণ অতুলকৃষ্ণের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তার পরই যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া ছুটিয়া আসিয়া অশোককে বুকের উপর টানিয়া লইলেন। অশোক ধীরে ধীরে পিতার বক্ষ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, পিতার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অতুলকৃষ্ণ তখন পাগলের মত সেই বারান্দায় ছুটাছুটী করিতে করিতে ও এক একবার অশোকের গায়ে হাত বুলাইয়া যেন তাহার প্রহারের বেদনা উপশম করিয়া দিতে দিতে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"সনাতন, ও সনাতন, বাড়ীর ভিতর থেকে কাউকে সঙ্গে করে, শীগ্‌গির বৌমাদের নিয়ে এস।—ও অশোক, বাবা, কোন্ ঠিকানায় যাবে শীগ্‌গির বলে দে।—হ্যাঁ সনাতন, শুন্‌লে তো? যাও শীগ্‌গির ঐ ঠিকানায় গিয়ে, তারা যে অবস্থায় আছে তাদের নিয়ে এস। উপেন শীগ্‌গির যাও, ডাক্তার বাবুকে শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এস। কি জানি যদি দরকার হয়।"

উঃ! তাঁহার দেবচরিত্র পুত্র তাঁহারই বাড়ীতে তাঁহারই চোখের সম্মুখে চোরের মত মার খাইল! আর মারিল কে? না যারা অন্নাভাবে তাঁহার গৃহে আত্মীয়ের মত আসন পাতিয়াছে। আর তাঁহার কত সাধের পুত্রবধূ ও পৌত্র পৌত্রী আজ অনশনে বিনা চিকিৎসায় তাঁহারি দুয়ারের গোড়ায় মরিতে বসিয়াছে! আর তিনি তাহাদেরই সন্ধানের জন্ত সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়া, এত কাছে থাকিয়াও তাহা জানিতে পারেন নাই।

তখনি মনে পড়িল সরস্বতীর কথা। সে যে অশোক অশোক করিয়া অশোকের সন্ধানে নিরাশ হইয়া অকালে প্রাণ বাহির করিয়াছে, তাহাকে এখন কোথায় ফিরিয়া পাওয়া যাইবে?

অতুলকৃষ্ণ পুত্রের হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন—"অশোক তোকে তো শুধু আমি পথের ভিখারী করিনি, তোকে যে মাতৃহীনও করেছি। তোর সব চেয়ে বড় জিনিষ যে কেড়ে নিয়েছি। তিনি যে তোর নাম করতে করতে তোকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে গেলেন। ওরে, দুটোমাস আগেও যদি আস্‌তিস্, তাহলেও তিনি তোকে দেখে যেতে পেতেন।"

"মা নাই" শুনিয়া অশোক ছিন্ন তরুর মত পিতার পদতলে লুটাইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত কষ্ট এত দুঃখ পাইয়াও শেষে বাড়ী ফিরিয়া মাকে দেখিতে পাইল না, আর কখনও দেখিতেও পাইবে না।

অশোক শুধু 'মা, ও মা, মাগো!' বলিয়া সেই ভূমিতলে লুটাইয়া লুটাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল, আর অতুলকৃষ্ণ সজল নেত্রে বসিয়া পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

তার পর খানিক ক্ষণের জন্য পিতাপুত্রের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন। কোথা দিয়া যে কতখানি সময় কাটিয়া গেল তাহার কোনও হিসাব রহিল না।

এমন সময় অনুপ্রভা ও ছেলে মেয়েকে লইয়া একখানি গাড়ী, এবং ডাক্তারকে লইয়া আর এক খানি গাড়ী গেট দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

অতুলকৃষ্ণ পুত্রের হস্ত ধরিয়া উচ্ছসিত কণ্ঠে সরস্বতীকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "সবই হল, সবই ফিরে পেলুম, কিন্তু তোমার অভাবে, এত আনন্দ যে আমার অপূর্ণ রয়ে গেল। এ দুঃখ যে আমার কিছুতে যাবে না। ওগো, একটী বারের জন্যেও কি আজ ফিরে আস্‌তে পার না?"

সমাপ্ত

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

সভ্যতা

নানা দিক হইতে সভ্যতার বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহার লক্ষণও বহু। সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নহে। আমি কতিপয় লক্ষণ মাত্র আলোচনা করিব, এবং সে আলোচনাও যথাসম্ভব সংক্ষেপেই করিব। সভ্যতার কতিপয় সর্ব্ববাদী-সম্মত লক্ষণই অদ্য আমার আলোচ্য বিষয় হইবে; যথা খাদ্য, পরিচ্ছদ, বিবাহ-বিধি, সন্তান-পালন, দ্বন্দ্ব, দণ্ড, ভাষা এবং ধর্ম্ম। সভ্যতার পরিচায়ক এই কয়েকটী বিষয়ও যথাযোগ্য ভাবে আলোচনা করিবার শক্তি ও সময় আমার নাই। তাহা হইলেও আপনাদিগের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারি নাই। এ নিমিত্তই এই ক্ষুদ্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নানা দিক

কিন্তু প্রথমেই আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, মানব শুধু দেহ নহে, দেহাশ্রিত আত্মা। সুতরাং এই দুই দিক হইতেই মানবীয় সভ্যতার আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন কোনও মানব সম্প্রদায় দেহের সৌষ্ঠবকে এবং কোন কোনও মানব-সমাজ আত্মার উৎকর্ষকেই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বিবেচনা করেন। আমি আত্মার দিক হইতেই সভ্যতার উচ্চাবচ শ্রেণী নির্ণয় করিব। দেহের দিক হইতে সভ্যতা পরিমাপ করিতে আমি কেবল বর্ণের কথাই উত্থাপন করিব। মানব-দেহের স্থায়ী বর্ণের সহিত চরিত্রের সুতরাং সভ্যতার যোগ থাকা আমি বিশ্বাস করি। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি এই বিষয় "নব্যভারত" পত্রে আলোচনা করিয়াছি। এ স্থলে এই মাত্র বলিলেই হইতে পারে যে, দেহের বর্ণ pigment পদার্থের উপর নির্ভর করে। ইহা মিশ্র পদার্থ, ইহার আমি বর্ণোপকরণ নাম দিয়াছি। কৃষ্ণ বর্ণোপকরণ হইতে কোন কোনও বস্তু বাহির হইয়া গেলে অথবা অত্যন্ত কম হইলে সাদা বর্ণ হয়। যুগ যুগান্তর হইতে মানব-সভ্যতার ইতিহাস যেরূপ জানা যাইতেছে তাহাতে শ্বেতবর্ণ মানব-সম্প্রদায়ের ব্যবহার যে পরিমাণ নৃশংস জানা যায়, কৃষ্ণ কটা অথবা পীতবর্ণ মানবগণ সম্বন্ধে তাহার শতাংশের একাংশও জানা যায় না। যে বর্ণের মানব মতভেদের নিমিত্ত মানুষকে খুঁটায় বাঁধিয়া পোড়াইয়া মারিয়াছে, এখনও সেই বর্ণের

দেহ ও আত্মা

বর্ণ

মানব দলের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সহৃদয় কৃষ্ণবর্ণ মানব-সমাজ স্তম্ভিত হইতেছে। জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ ওয়ালেস্ একস্থানে * বলিয়াছেন, আদিম অবস্থার পর এ পর্য্যন্ত মানবের নৈতিক উন্নতি বেশি কিছু হয় নাই। এই উক্তি তাঁহার সুপরিচিত মানব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে সত্য বলিয়া আপনারা গ্রহণ করিতে পারেন। আত্মবিস্মৃত হইলেও বর্ত্তমান যুগের প্রাচ্যগণ এ উক্তি স্বীকার করিবেন না, এ কথা বাহুল্য মাত্র। এই মীমাংসা স্মরণ রাখিয়া সভ্যতার অতর্কিত চিহ্ন ও লক্ষণ সকল বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বলিয়াছি, মানব দেহাশ্রিত আত্মা, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত, জীবাত্মার অনুচর। এ সকল হইতেই মানবের আহার পরিচ্ছদ অবধি আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম বিশ্বাস পর্য্যন্ত সকলই উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে এই সকলের উল্লেখ করিব।

আবিষ্কার

কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখি যে আবিষ্কারের দ্বারা সভ্যতার পরিমাপ করা উচিত নহে। যে সকল আবিষ্কার মানবকে বর্ত্তমান উচ্চ সভ্যতার অধিকারী করিয়াছে সে সকলই অসভ্য অথবা বর্ব্বর যুগের আবিষ্কার। অগ্নি আবিষ্কার এবং ভাষা আবিষ্কার এই দুইটাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার; এবং এতদুভয়ই অসভ্য অথবা বর্ব্বর যুগের আবিষ্কার। অস্ত্র-ব্যবহার উচ্চ শ্রেণীর ইতর জীবগণই প্রথমে আরম্ভ করে। তৎপরে ওরাংওটাং শিম্পাঞ্জি হইতে প্রস্তর যুগের Pithacanthropus erectus এবং পরবর্ত্তী Protoman প্রভৃতি বনমানুষ অথবা সত্ত্ব বিবর্জ্জিত মানুষ ইহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। অবশেষে বর্ত্তমান লৌহ যুগের মানবেরাও অস্ত্রাদির আরও উন্নতি করিয়াছে। আমি এ সকলকে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলি না। শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সভ্য সময়ের নহে, এ কথা স্মরণ রাখিলেই আবিষ্কারকে সভ্যতার গুরুতর লক্ষণ বলিতে প্রবৃত্তি হইবে না। বর্ত্তমান যুগের প্রায় সকল আবিষ্কারই প্রকৃতপক্ষে পুনরাবিষ্কার; মানব-সমাজের প্রথম আবিষ্কার নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আহার পরিচ্ছদাদি সভ্যতার স্বীকৃত লক্ষণ সকল বিবেচনা করা যাউক।

আহার

জীবের আহার দেহের অভাব পূরণ মাত্র; ইতর জীবগণ এবং অনুন্নত মানবগণ ইহার অধিক বুঝে না। ক্রমে যখন মানব সভ্যতায় অধিক উন্নত হয় তখন বুঝিতে পারে যে শুধু দেহের অভাব পূরণ নহে, আহারের সহিত স্বাস্থ্যের এবং চরিত্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আহারের সহিত আত্মার উন্নতি অবনতির যোগ থাকা এতদ্দেশে বহুকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আধুনিক মানব-সমাজেও দুই একজন বিজ্ঞানবিৎ এ কথা এখন স্বীকার করিতেছেন। সর্ব্বভুক্ হইলে উন্নত মানবের উন্নতি স্থায়ী হয় না। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত এবং শরীর ও মনে উন্নতির সহিত যোগ রাখিয়া আহার বর্জ্জন গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর, সুসভ্য সমাজে প্রধান খাদ্য পদার্থ রন্ধন করিয়া সুসিদ্ধ অবস্থায় খাইবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। অসভ্য অবস্থায় মানব রন্ধন করিতে জানে না। ক্রমে অগ্নি উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হইলে মানব যখন কিঞ্চিৎ উন্নত হয় তখন হইতে অধিকাংশ খাদ্য পদার্থ অগ্নি ও জল সংযোগে সুপক্ব করিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে সুসভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানব নানাবিধ স্বাদু উপকরণ যোগে বিবিধ পদার্থ একত্রে উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া আহার করে। এ কথা নিশ্চিত বলা যায় যে, ভোজ্য পদার্থ যে মানব সম্প্রদায় যে ভাবে ভোজন করে তাহাই তাহার সভ্যতার মানদণ্ড। আমমাংস ভোজী অসভ্য; অর্দ্ধপক্ব মাংসভোজী, যাহার স্বাদু উপকরণ সমূহের জ্ঞান নাই অথবা সে জ্ঞান অল্প মাত্র, সে অর্দ্ধ সভ্য; আর যে সকল মানব-সম্প্রদায় সুসিদ্ধ নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত স্বাদু উপকরণে প্রস্তুত সুপক্ব খাদ্য আহার করে, যাহারা বহুবিধ স্বাদু খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং উপভোগ করিতে জানে, তাহারা

* সম্ভবতঃ Wonders of Life গ্রন্থে।

সুসভ্য। এ সকল অসভ্য অবস্থায় কিংবা অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় হয় না। আমার উত্তম মনে পড়ে, আমার কিশোর বয়সে দুইটী শ্বেতবর্ণ ব্যক্তিকে আমরা রসগোল্লা ও ক্ষীরের পুলি খাওয়াই এমনই বাধ্য করিয়াছিলাম যে তাহারা অনেক দিন ঐরূপ খাদ্য পুনরায় খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল এবং আমরাও দিয়াছিলাম। যাহা হউক, আহার্য্য বস্তু যে অবস্থায় আহার করা হয় তদ্দৃষ্টে সভ্যতার পরিমাপ করা যায়। অর্দ্ধপক্ক মাংস যাহা কর্ত্তন করাই কঠিন এবং কাটিলেও রক্ত বাহির হয়, তদ্ভোজন সুসভ্যাবস্থার পরিচায়ক নহে। বিশেষতঃ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু যেরূপ গোটা পশু বধ করিয়া সম্মুখে রাখিয়া একটু একটু করিয়া ভোজন করে, সেইরূপ কোন কোন মানবসম্প্রদায়ও গোটা পশুটী অর্দ্ধপক অবস্থায় সম্মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন করে। এ বীভৎস কাণ্ড অদ্যাপি কতিপয় মানব সমাজ হইতে তিরোহিত হয় নাই। বহুব্যক্তি একত্রে বসিয়া দীর্ঘকাল গল্প এবং আলাপ প্রলাপ করিতে করিতে ভোজন করাও উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক নহে। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ রে ল্যাংকেষ্টার তাঁহার সমাজে এইরূপ প্রণালীতে আহার করিবার নিয়ম দেখিয়া ঐ নিয়মকে বর্ব্বরোচিত বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। * সভ্যতার অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় মানব মৌন হইয়া, একাকী বসিয়া অল্প পরিমিত সুপাচ্য স্বাদু আয়ুষ্কর বলবর্দ্ধক এবং সত্বগুণজনক পদার্থ যথাযোগ্য তিথি ঋতু ও কাল বিবেচনা করিয়া আহার করিয়া থাকে। এ সকল প্রথম অবস্থায় মানব বুঝিতে পারে না।

অসভ্য অবস্থায় মানব উলঙ্গ অথবা প্রায় উলঙ্গ থাকে। কিন্তু যখন প্রথম দেহে কিছু আবরণ দিয়াছিল,—লতা হউক পাতা হউক ত্বক্ হউক, যাহা হউক,—কোন পদার্থ দেহে ব্যবহার করা আরম্ভ করিলেই, বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে সেই সেই পদার্থটী মস্তকে ধারণ করিয়াছিল। এই সকল সময়ে লজ্জার কোন ধারণাই থাকে না। যখন বৃক্ষপত্র, বৃক্ষত্বক, পশুচর্ম্ম অথবা অস্থি প্রভৃতি পদার্থ মানব কটিদেশে ঝুলাইয়া দেয় তখনও লজ্জাস্থান আবরণ করিবার উদ্দেশ্য প্রথমতঃ থাকে না। সে যুগে ঐ সকল পদার্থ অলঙ্কার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্রমে মানব যতই সভ্যতায় অগ্রসর হয়, ততই লজ্জাস্থান আবৃত করাই পরিচ্ছদ-ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু সুসভ্য অবস্থাতেও অলঙ্কার স্বরূপে বস্ত্র ব্যবহার করার ইচ্ছা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না। নানাবিধ ফ্যাসান্ করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করা সুন্দর দেখাইবার নিমিত্তই অদ্যাপি সুসভ্য সমাজেও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। শীতাতপ নিবৃত্তি আদিম অবস্থায় অঙ্গাবরণ ধারণের উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাহউক, একথা অস্বীকার করা যায় না যে সুসভ্য অবস্থায় বস্ত্রব্যবহারের অন্য উদ্দেশ্য থাকিলেও, লজ্জাস্থান আবৃত করাই প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হয়। লজ্জাস্থান লোকলোচনের দৃষ্টিগোচর না হয় ইহাই সভ্য মানবের উদ্দেশ্য। কিন্তু অপর জীবগণের ন্যায়, স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ উচ্ছৃঙ্খল কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যৌন সংস্রব সংঘটন করিবার প্রথা কোন কোন মানব সমাজে অদ্যাপি প্রচলিত থাকায়, যেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই, পুরুষগণ এরূপ ভাবে লজ্জাস্থান আবৃত করে, যাহাতে আবরণ সত্বেও দর্শকের মনে তৎসম্বন্ধে একটা ধারণা হইতে পারে। স্ত্রী জাতীর দর্শকই সম্ভবতঃ প্রধান লক্ষ্য। যাহাদিগের কোটের বোতাম বন্ধ করিলে লজ্জাস্থান সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইত,

---

* Romanes Lecture 1905. ইহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের নাম The Kingdom of Man. অধ্যাপক ল্যাংকেষ্টার ঐ Lecture-এর শেষ ভাগে নোট মধ্যে ৫১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন: "We shall never establish a rational and healthy mode of feeding ourselves until we give up the barbarous but to some persons pleasant custom of converting the meal into a social function." দ্বিতীয় রেজিন্যাও তাঁহার একস্থানে বলিতেছেন—"Should people resolve to eat in solitnde there could be no doubt that the result would be an increase in their health and their happiness."

তাহারা বাধাযোগ্য স্থানে ঐ বোতামটি খুলিয়া রাখিয়া প্যাণ্টের সম্মুখ ভাগে দেখিবার সুবিধা করিয়া দেয়। ঐ সকল সমাজে নারীগণও সুগোল বাহু, স্ফীত বক্ষ এবং গুরু নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গ নরগণের দর্শনযোগ্য অথবা ইঙ্গিতে অনুমেয় হইতে পারে এরূপ ভাবে বস্ত্র পরিধান করে। এ সকল সমাজে কাম এবং ভোগই প্রধান সাধনা, সুতরাং তাহার যথোচিত ইন্ধন যোগাইতে ত্রুটী হয় না। ইহারা জানে না যে লজ্জাস্থান অর্থাৎ বংশ রক্ষা সম্বন্ধীয় মুখ্য ও গৌণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুসভ্য মানব লোকলোচনের অন্তরালে রাখে; স্পষ্টতঃ অথবা ভাবতঃ ঐ শ্রেণীর অঙ্গ অদৃশ্য রাখাই উচ্চ সভ্যতার লক্ষণ। যখন স্বাধীন উচ্ছৃঙ্খল যৌন সম্বন্ধের উপর বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিলে অল্পকাল মধ্যেই তাহা বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায়, তখন মানব বুঝিতে পারে যে নিজের উদ্দাম কাম প্রবৃত্তি পরম হিতৈষী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের মতের দ্বারা সংযত করা উচিত। এ শিক্ষা সভ্যতার প্রথম অবস্থায় হয় না। এই অবস্থায় বস্ত্র ব্যবহার দ্বারা লজ্জাস্থান আবৃত করিবার স্থলে প্রায় অনাবৃত রাখিবার আবশ্যকতা থাকে না। সুতরাং ঐ সকল স্থান আবৃত রাখাই বস্ত্র ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এই মান দণ্ড দ্বারা মাপিয়া লইলেও বর্ত্তমান যুগের কতিপয় মানব সম্প্রদায়ের সভ্যতা কোন্ শ্রেণীর তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ইহাদিগের সামাজিক নৃত্যাদি অনুষ্ঠানে এবং রঙ্গালয়ে অনেক সময় বস্ত্র ব্যবহার উলঙ্গ অবস্থার নামান্তর মাত্র হইয়া থাকে।

সভ্যতার দুইটি অবস্থা। প্রথম অবস্থায় মানব মৃগয়াজীবী; দ্বিতীয় অবস্থায় মানব কৃষিজীবী। মৃগয়া জীবী অবস্থায় তাহার প্রধান সহচর কুকুর। ঐ অবস্থায় পশুচর্ম্ম দ্বারা মানব দেহের কোন কোন স্থান আবৃত করে, এবং কোন কোন স্থানে পশুচর্ম্ম অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহার করে। নারীগণ সাধারণতঃ অলঙ্কারপ্রিয়। সুতরাং অদ্যাপি কোন কোন কৃষি বাণিজ্যজীবী মানব-সমাজেও নারীগণকে পশুচর্ম্ম অঙ্গে ধারণ করিতে দেখা যায়। ইহা তাহারা প্রধানতঃ অলঙ্কার স্বরূপেই ব্যবহার করে। কখনও বা পক্ষীদিগের পালক দ্বারা মস্তক শোভিত করে। এই সকল ব্যবহার সভ্যতার প্রথম অবস্থার পরিচায়ক। সর্ব্বদা কুকুর সহ গমনাগমন করাও মৃগয়াযুগের চিহ্নস্বরূপ কতিপয় মানব সম্প্রদায়ে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

বিবাহ প্রথাও সভ্যতার পরিমাপক একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। অসভ্য সমাজে প্রথমতঃ এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ও হইতে পারে না, হয়ও না। সমাজের সকল নরনারীই পরস্পরের ভোগ্য থাকে। ইতরজীবগণের যেমন ব্যক্তি বিচার নাই, অসভ্য সমাজের প্রথম অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। জাতি মাত্রেই গ্রহণীয়। এই অবস্থায় বোধ হয় সৌন্দর্য্য বোধের অভাবই ভোগের একমাত্র প্রতিষেধক থাকে।

বিবাহ ও বংশরক্ষা

ইতর জীবগণ মধ্যে যৌন সম্বন্ধ কখনও বা ক্ষণস্থায়ী কখনও সংস্থ কাম কাল ব্যাপী, কখন বা দীর্ঘকাল ব্যাপী হইতে দেখা যায়। কদাচিৎ কখনও ঐ সম্বন্ধ জীবিত কাল ব্যাপীও হইয়া থাকে। মানব সভ্যতার প্রথম অবস্থাতেও প্রায় এইরূপ দেখা যায়। কোন কোন মানব সম্প্রদায়ে আজীবন ব্যাপী বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও কারণ বশতঃ উহা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। প্রাচীন হিন্দুসমাজে এ বিষয়ে এতদূর গিয়াছিল যে পতি প্রব্রজিত হইলে, ক্লীব হইলে, পতিত হইলে নারীগণের সে পতি বিদ্যমানেও অন্য পতি গ্রহণ করিবার বিধি স্মৃতি গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই সম্বন্ধে ঐরূপ বিধি প্রচলিত নাই। কিন্তু অদ্যাপি অনেক মানব সম্প্রদায়ে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা ভাল কি মন্দ সে বিচার আমি করিতেছি না। আমি কেবল এইমাত্র দেখাইতে ইচ্ছা করি যে, জীবরাজ্যে বিচ্ছেদযোগ্য যৌন সম্বন্ধই সাধারণ নিয়ম; উহাই প্রাথমিক অবস্থা। জীবিতকাল ব্যাপী যৌন সম্বন্ধ অপর জীবেও যেমন পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান, মানবেও তেমনই। ইহা প্রাথমিক সমাজে কদাচিৎ দেখা যাইত, অভিজ্ঞ মানব সমাজে ইহাই সাধারণ নিয়ম। মানব আরও উন্নত হইলে বিবাহ বিষয়েও তাহার দৃষ্টি

ইহকালেই সীমাবদ্ধ থাকে না, পরকালেও বিবেচ্য বিষয় হয়। তখন সে বিবাহ বন্ধনকেও শুধু ইহকালের ব্যাপার মনে করে না, পরকালের ব্যাপারও মনে করে। বিবাহ অনুষ্ঠান মূলতঃ কাম সম্পর্কযুক্ত হইলেও, প্রাচীন অভিজ্ঞ সমাজে ইহা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বলিয়াও বিবেচিত হয় না, ইহকালের অনুষ্ঠান বলিয়াও বিবেচিত হয় না। এ অনুষ্ঠান এক দিকে দম্পতীর আত্মার উৎকর্ষ সাধক বলিয়া, অপরদিকে সমাজের কল্যাণকর বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু আত্মা ত কেবল ইহকালের পদার্থ নহে, আত্মা ইহকাল পরকাল ব্যাপী পদার্থ। আত্মার উৎকর্ষ ইহকালে এবং পরকালেও হইয়া থাকে। সুতরাং যে বিবাহ অনুষ্ঠান আত্মার উৎকর্ষ সাধক, তাহা ইহকাল ও পরকাল ব্যাপী অনুষ্ঠান। এই নিমিত্তই স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ। ইহার ছেদ হইতে পারে না।

বিশেষতঃ নর অথবা নারী একক অসম্পূর্ণ। উভয়ের মিলনেই পূর্ণতা। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি।" যিনি উভলিঙ্গ তিনি খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া এক খণ্ড নর অপর খণ্ড নারী হইয়াছেন; কখনও বা একাধারেই দ্বিলিঙ্গ মূর্ত্তিতে আমাদিগের সমক্ষেই বিচরণ করিতেছেন। অনেক জীব স্পষ্টতঃই দ্বিলিঙ্গ, এবং অলিঙ্গ জীবেরও অভাব নাই। বোধ করি বা আমরা সকলেই দ্বিলিঙ্গ। এসকল লিঙ্গ বিভাগের কথা এস্থলে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে দেহে ও মনে নর এবং নারী প্রত্যেকে অসম্পূর্ণ। উভয় একত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়। উভয়ের জীবিতকাল ইহ-পর-কালব্যাপী, সুতরাং উভয়ের দাম্পত্য সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এরূপ চিন্তার ও মীমাংসার যাথার্থ্য আমার বিচার্য্য নহে; কিন্তু ঈদৃশ চিন্তা ও মীমাংসা আদিম অবস্থার অত্যন্ত পরবর্ত্তী কালের, এই মাত্র আমার বক্তব্য। ইহা মানব সমাজের প্রাথমিক সংস্কার হইতে পারে না; ইহা বহু পরবর্ত্তী কালের সংস্কার। সুতরাং বিবাহ বিধান আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, কতিপয় মানব সমাজ এখনও প্রাথমিক অবস্থাতেই বিদ্যমান আছে। কোন কোন ইউরোপীয় মানব সম্প্রদায় মধ্যে দেখা যায় যে, যে সকল নারী বিবাহের পূর্ব্বে দ্বিচারিণী অথবা বহুচারিণী হয়, তাহারাই আবার অনেক গৃহস্থের গৃহে গৃহিণী মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অধিক বয়সে বিবাহ দিবার প্রথাও নিরাপদ নহে। ইহাতে নরনারীগণের চরিত্র দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সভ্য সমাজ মাত্রেই নরগণ অপেক্ষা নারীগণের সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। ইহার উপর যদি নরগণের ও নারীগণের বিবাহ অধিক বয়সে হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তবে সমাজের পবিত্রতা কখনই রক্ষিত হইতে পারে না। বিগতযৌবনা অথবা বৃদ্ধা কুমারীর সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে। কোন কোন অদূরদর্শী মানব সমাজে ঈদৃশ অবস্থার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়।

এক্ষণে সন্তান পালনের কথা। ইহাও সভ্যতার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। অণ্ড-প্রসবিনী জননী সন্তান পালন করে না, অথবা অত্যল্পকাল মাত্র করে। ইতর জীব সম্প্রদায়ে সন্তান প্রসবিনী জননীও ক্ষণকাল মাত্র অথবা অল্পকাল মাত্র সন্তান পালন করে। উচ্চ শ্রেণীস্থ বানর, অসভ্য মানব, বর্ব্বর মানব এবং সভ্য মানব ও সুসভ্য মানব উত্তরোত্তর অধিক কাল সন্তান পালন করে। সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে এই মানদণ্ড অবলম্বন করিয়া মানব সভ্যতার পরিমাপ করিতে পারি। সন্তান পালন করিতে যেরূপ স্বার্থত্যাগ, পরার্থ সেবা, ভবিষ্যদ্দর্শন, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণ হৃদয়কে উন্নত করে, তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই করে না। দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি, বিনয়, একাগ্রতা, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সংযত পরিবারের ন্যায় বিদ্যালয় আর নাই। সুতরাং সন্তানকে পালন করা, শিক্ষা দান করা, বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইলে তাহার সন্তান সন্ততি দিগকে পালন করা ও গৃহ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করা—এ সকল অতি দীর্ঘকালে অথবা যাবজ্জীবনকাল হৃষ্ট চিত্তে সম্পাদন করা অতিশয় উচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক। ইহাতে নানাবিধ সদ্গুণে

চিত্তবৃত্তি অলক্ষ্ত হয়। অনুন্নত সমাজে ঈদৃশ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা কম। এ দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও কতিপয় মানব সম্প্রদায়ের তথাকথিত উচ্চ সভ্যতা কথামাত্রেই পরিণত হইয়া যায়। সে সকল সম্প্রদায়ে বয়স হইলে পুত্র কন্যা পিতা মাতাকে অনেক সময় গ্রাহ্যও করে না; পিতা মাতাও তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। অনেক সময়ে জীবিত কি মৃত তাহাও পরস্পরের অজ্ঞাত থাকে। জীবগণ মধ্যে ঈদৃশ অবস্থা প্রাথমিক অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত মাত্র।

ভাষা অসভ্য মানবেই আবিষ্কার করিয়াছিল। কোন কোন জীবতত্ত্ববিৎ বিবেচনা করিতেন যে প্রাথমিক মানুষ

ভাষা

ভাষা ব্যবহার করে নাই; কতিপয় অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া ও সীস্ দিয়া এবং অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিত! ডারুইন্ প্রমুখ মনীষিগণ বিশ্বাস করেন যে মানব কখনই মূক ছিল না, কিন্তু অপর দুইটী মীমাংসা অ-স্বীকার করেন না। আমার মতে ভাষার উৎপত্তির প্রধান কারণ আদিরস। ইহা আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত (সার আশুতোষ) জুবিলী গ্রন্থ নিচয়ের প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা এ মত অঙ্গীকার করেন না তাঁহারাও বোধহয় স্বীকার করিবেন যে সুস্পষ্ট তীব্র এবং বহুদূর শ্রাব্য সীস্ দেওয়া প্রাথমিক মানবের একটা প্রধান প্রয়োজন ছিল। ক্রমে যতই মানব সম্প্রদায় সভ্যতায় উন্নত হইতে লাগিল, ততই সে প্রয়োজন কমিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে অত্যুন্নত মানব সমাজে উহা প্রায় নাই বলিলেই হয়। কতিপয় মানব সম্প্রদায়ে বহুব্যক্তি এখনও উত্তম সীস দিতে পারে; অন্যে তেমন পারে না। ইহা হইতেও এতদুভয়ের সভ্যতার প্রাচীনত্ব অথবা অর্বাচীনতা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু সীস্ কোনও ভাষা নহে। তাহা না হইলেও কতিপয় মানবীয় ভাষায় সীস্ অথবা স-কার ধ্বনি (hissing sound) অত্যন্ত অধিক ব্যবহৃত হয়। এ শ্রেণীর ভাষায় প্রাথমিক লক্ষণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। সকল মানব সম্প্রদায়ই ভাষা ব্যবহার করে। ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ দেখিলেও বিভিন্ন মানব সভ্যতার উন্নত অবনত অবস্থা বুঝা যায়। সকল ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব কেহই অস্বীকার করেন না। এদিক হইতে দেখিলেও বিভিন্ন মানব সভ্যতার পরিমাণ করা যায়।

দ্বন্দ্ব কলহ এবং তাহার দণ্ড বিধান প্রথা যে ভাবে যে সমাজে প্রচলিত থাকে তাহা হইতেও ঐ সমাজের

দ্বন্দ্ব

সভ্যতা অনুমিত হইতে পারে। ঈষৎ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতেই জীবগণ পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব কলহ করিতেছে। এস্থলে আমি প্রথমেই বলিয়া রাখি যে দ্বন্দ্ব কলহ ডারুইনের সময় এবং তৎপরেও কিছুকাল জীব বিবর্তনের যেরূপ প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত, এক্ষণে তদ্রূপ হয় না। এক্ষণে একতা এবং মিলনকেই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়। যাহা হউক, অতি সামান্য কারণে দ্বন্দ্ব করা এবং সামান্য কারণে গুরুতর দণ্ড বিধান করা, এতদুভয়ই অসভ্য এবং বর্বর অবস্থার পরিচায়ক। এই অবস্থায় ন্যায়ান্যায় জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না; সহিষ্ণুতা, ধীরতা এবং বিচার বুদ্ধির উচ্চতম বিকাশ হইতে পারে না। সুতরাং সামান্য কারণেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আর, ন্যায়ান্যায় বোধের অভাব হেতু স্বার্থই প্রবলবৃত্তি হইয়া উঠে। তাহা হইতেই গুরুতর দণ্ড ব্যবস্থিত হয়। মানব সম্প্রদায় সভ্যতায় অধিক উন্নত হইলে পরার্থ বোধ, তিতিক্ষা এবং ন্যায্যান্যায্য জ্ঞান অধিকমাত্রায় সঞ্জাত হইয়া থাকে। তখন নানা প্রকার বিবেচনা করিয়া দণ্ড দিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। সুতরাং লঘু কারণে গুরু দণ্ড দেওয়া প্রায় উঠিয়া যায়। এস্থলে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞা করিব। আপনারা যদ্যপি আমাকে এ স্থানে আসিতে নিষেধ করেন, তথাপি যদ্যপি আমি এই সভাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হই, তাহা হইলে আপনারা কি আমাকে বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতে পারেন? আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলে আমার চোখে মুখে একটু জল দিয়া চৈতন্য লাভ করাইয়া পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাতে অজ্ঞান

করিতে পারেন? আমি আপনাদিগের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ না দিলে কিংবা আপনাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে আমার গ্রামে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিলে আপনারা আমার সমস্ত গ্রামটী দগ্ধ করিয়া দিতে কিংবা আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া সমস্ত গ্রামে পালে পালে নর-নারী ও শিশু হত্যা করিতে পারেন? কখনই পারিবেন না। আপনাদিগের উন্নত ন্যায্যান্যায্য বোধ এবং অনাবিল কার্য্য-কারণ জ্ঞান, আপনাদিগের দয়া গুণ ও সহিষ্ণুতা, আপনাদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞান ঈদৃশ কার্য্য আপনাদিগকে কখনই করিতে দিবে না। ১৮৮৫ সালে আমি অসুস্থ হইয়া বৈদ্যনাথ ধামে গিয়াছিলাম এবং দুই চারিদিন পাণ্ডা পাড়াতে ছিলাম। একটি বানর আসিয়া আমার রন্ধন-শালায় অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক হাঁড়ি হইতে ভাত খাইতেছিল। আমার পাচক ব্রাহ্মণ তাহার গায়ে একখণ্ড কাষ্ঠ ফেলিয়া দিয়া ঈষৎ প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ক্ষণকাল পরেই বহু বানর একত্র হইয়া আমার বাড়ী আক্রমণ করে। তখন আমরা সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিই। ক্রমে বানরগণ এরূপ ভাবে কপাটে আঘাত করিতে লাগিল যে আমরা ভীত হইয়া প্রতিবেশী দিগকে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া বানর দিগকে কিছু আহার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন এবং আমাদিগকেও রক্ষা করিলেন। এইরূপ ঘটনা কাকাদি ইতর জীবেও আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ঈদৃশ ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিতেছেন যে স্বজাতীয় ব্যক্তি অন্যায় কার্য্য করিলেও অনুন্নত জীব সমাজে তাহার দোষ উপেক্ষিত হয়; এবং বি-জাতীয় ব্যক্তি তাহাকে সঙ্গত-রূপে সামান্য তাড়না করিলেও সে-ই দণ্ডার্হ বিবেচিত হয়। তাহার স্বজাতীয়গণ বিজাতীয়েরই অপরাধ গ্রহণ করে ও দণ্ড দেয়। অনুন্নত মানব-সমাজেও ইহার অপেক্ষা অধিক ন্যায্যান্যায্য বোধ পরিস্ফুট হয় না। তাহা দিগের বিচার-বুদ্ধি উন্নত নহে। এই হেতু তাহারা ঐরূপ ব্যবহার করে। এইরূপ ভাবকে Herd sense অর্থাৎ "দলের টান্" বলা হয়। আপনাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না যে বর্ত্তমান সময়ে কতিপয় খ্যাতনামা মানব-সম্প্রদায় ঈদৃশ "দলের টান্" দ্বারাই প্রধানতঃ পরিচালিত হইতেছে। এই সংঘবৃত্তির বশে তাহারা স্বজাতীয় ব্যক্তির দোষ উপেক্ষা করে এবং অপর জাতীয় ব্যক্তিগণকে অকারণে অথবা অল্প কারণে গুরুতর দণ্ড দিয়া গৌরব বোধ করে। ন্যায়ান্যায় জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ ইত্যাদি উন্নতবৃত্তি তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে জাগরিত হয় নাই; তন্নিমিত্তই তাহারা নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। তাহারা যখন সভ্যতায় আরও উন্নতি লাভ করিবে, তখন আপনা-দিগের ন্যায় তাহারাও ঐরূপ ব্যবহার আর করিতে পারিবে না। তখন তাহারাও স্বজাতীয় দোষীকে বলিতে পারিবে, "তোমারই ত দোষ। তথাপি, যে তোমাকে প্রহার করিয়াছে তাহারও ঐরূপ করা সঙ্গত হয় নাই। অবস্থা দেখি, তাহাকে বলি; সে কি বলে তাহা শুনিয়া আমরাই এ কলহের মীমাংসা করিয়া দিব।" উন্নত সভ্যতার অধিকারীগণ দণ্ডদানে অনুন্নত জীবগণের ন্যায় ব্যবহার কখনই করিতে পারে না। এদিক হইতে বিচার করিলেও বর্ত্তমান যুগের অনেক মানব সম্প্রদায়কে সভ্যতায় হীন বলিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতবর টম্সন্ তাঁহার Heredity নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বিশদরূপে দেখাইয়াছেন যে গুরুতর দণ্ড বিধান করা অসভ্য এবং বর্ব্বরদিগেরই প্রথা। নিতান্ত স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে অকারণে অথবা অল্প কারণে কিংবা লঘু দোষে গুরুদণ্ড কখনই দিতে সমর্থ হয় না। এ স্থলে আপনারা আর একটী কথা স্মরণ করিবেন। সভ্য-সমাজে মতভেদের নিমিত্ত কোন দণ্ড বিধান করিবার প্রথা নাই। মতভেদে দণ্ডদান বর্ব্বরতার লক্ষণ। কর্ম্মের দণ্ড পুরস্কার হইতে পারে, মতের নহে। এ সূত্র অবলম্বন করিয়াও মানবীয় সভ্যতার পরিমাপ করা যায়।

ন্যায়ান্যায় বোধের কথা বলিয়া এক্ষণে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ন্যায়ান্যায় বোধ সমাজ-ধর্ম্মের এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্ম

সমাজ-ধর্ম্মের পূর্ণ পরিণতি গৃহ-ধর্ম্মে যে

সকল মানব-সম্প্রদায়ে পারিবারিক বন্ধন অতি শিথিল; স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্বন্ধ, মাতা-পুত্রে সম্বন্ধও ক্ষণস্থায়ী এবং প্রায় নামমাত্রে পরিণত, তাহাদিগের সমাজ-ধর্ম্ম অতি শিথিল হইবেই। তাহাদিগের সমাজ-ধর্ম্ম স্বার্থের নিকট টিকিতে পারে না। উহা কেবল একটী মাত্র কথায় নিহিত থাকে; সেই কথাটী Herd sense। ইহা এবং একতা এক কথা নহে। প্রকৃত একতা পরার্থ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Herd sense স্বার্থমূলক এবং বহু স্থলে স্বার্থের নিকট পরাজিতও হয়। গত জর্ম্মান-যুদ্ধে জার্ম্মাণগণের শক্র-পক্ষীয় ব্যক্তিগণ মধ্যেও কতিপয় ব্যক্তি তাহাদিগকে অস্ত্রাদি অথবা অস্ত্রের উপাদান—এবং উপকরণাদি যোগাইয়াছিল। এস্থলে Herd sense স্বার্থের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইলে পরার্থ বোধও শিথিল হয়। স্বার্থই প্রবল হইয়া উঠে। ঈদৃশ সমাজের একমাত্র সম্বল Herd sense অর্থাৎ সংবযৃত্তি; তাহাও অর্থের নিকট পরাজিত হয়। যে সকল সমাজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসহীন, কেবল স্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত, তাহাদিগের মধ্যে সত্য সরলতা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে না। উহারা স্বদেশে বিদেশে সামাজিক অথবা রাষ্ট্রনীতিক কার্য্যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না; বরং গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। ঈদৃশ ক্ষেত্রে সমাজ ধর্ম্মই হউক অথবা ব্যক্তিগত কিংবা জাতিগত ধর্ম্ম-বিশ্বাসই হউক, কিছুই উন্নত হওয়া সম্ভবপর নহে; এ কথা না বলিলেও বুঝা যায়।

চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে ধর্ম্ম-সাধন হইতেই পারে না। অথচ কতিপয় মানব-সম্প্রদায় মধ্যে দেখা যায় যে তাহারা দেব-মন্দিরকেও যুবক-যুবতীর আঁখি-ঠার দিবার আড্ডা করিয়া তুলিয়াছে। বিবাহের ঘটকালী অনেক সময়ে ভজনালয়েই হইয়া থাকে। কখন কখন এমনও জানা যায় যে পিতৃ-বিয়োগের পর পিতাকে গোর দিতে লইয়া গিয়া, গোরস্থানেই আঁখি ঠারাঠারি প্রভৃতি প্রণয়াভিনয় হইয়া যায়; যৌন সম্বন্ধও কখন কখন স্থাপিত হয়; পরিশেষে বিবাহ-ই হইয়া থাকে। ইহা হইতেই পিতৃভক্তি, শোক, দুঃখ সকলই পরিমাপ করা যায়। এ সকল মানব-সম্প্রদায় শুধু শিশ্নোদর পরায়ণ বলিলেই হয়। ইহাদিগের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর জন-সাধারণ এত দরিদ্র যে অনেকে স্থানাভাবে একটী কামরাতেই পিতা মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনীসহ একত্রে বাস করিতে বাধ্য হয়। একে ত ঈদৃশ অবস্থায় সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ বীভৎস নির্লজ্জ চরিত্রহীনতা উৎপন্ন হওয়া অত্যন্ত সম্ভব, তাহার উপর যখন স্মরণ করা যায় যে ইহারা অনেকেই মাতাল এবং নেশাখোর, তখন ঐ সকল হতভাগ্য সমাজের কি ঘৃণিত চিত্রই নেত্রপথে উদিত হয়! সে দৃশ্য হৃদয়-বিদারক। এ অবস্থায় ধর্ম্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথা তোলাই প্রলাপ মাত্র।

তারপর ইহাদিগের সভ্যতা যন্ত্র-বহুল। হাতের কায কলেই অনেক হয়। যন্ত্র-বহুল সভ্যতার শেষ কথাই এই যে ইহাতে দুই চারিজন কোটিপতি হয়, কিন্তু জনসাধারণ হত-দরিদ্র হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানবলে নানাবিধ কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াও, সসাগরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাণিজ্য বিস্তৃত করিয়াও, দীর্ঘ দুই শত বৎসর ইংলণ্ডের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র দেশের চারি কোটি মাত্র ব্যক্তির অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর করিতে পারিল না। দুই দশ জন কোটীশ্বর হইয়াছে সত্য; কিন্তু জন-সাধারণ ক্ষুধার তাড়নায় শীতের যন্ত্রণায় "যে তিমিরে সে তিমিরেই" পড়িয়া আছে। ইহাদিগের পেটে অন্ন নাই, দেহে বল নাই; ইহাদিগের নিত্য অভাব। ইহার ফল কি হইবে? অভাবে স্বভাব নষ্ট; এই চিরপ্রচলিত কথা বুঝিলেই ইহার ফলও বুঝা গেল। মনের এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের কাহিনী কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না। দেশে বিদেশে "হা-অন্ন, হা-অন্ন; হা-অর্থ, হা-অর্থ" বলিয়া ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে হইলে সুনীতি, সচ্চরিত্র সুতরাং চিত্তশুদ্ধি রাখা সম্ভবপর নহে। ফলেও এ সকল মানবসম্প্রদায়ে তাহাই হইয়াছে। একটী গল্প আছে যে জনৈক ধর্ম্মযাজক ইহাদিগের একজনকে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যীশুকে জান?" সে উত্তর করিল

"কোন্ নম্বর বাড়ীতে থাকে।" ইহা কিছুই বিচিত্র নহে, ইহা হইবারই কথা। কিন্তু সুসভ্য সমাজে মূর্খ নিরক্ষর ব্যক্তিরাও বেদ বেদান্তের স্থূল কথাগুলি জানে। এই কথাই অন্য প্রকারে বলিলে বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্মজ্ঞানই সভ্যতার প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক।

যাহা হউক, অভাব না কমাইলে ধনাকাঙ্ক্ষা কমে না, ধনাকাঙ্ক্ষা না কমাইলেও চিত্ত শুদ্ধি সুতরাং ধর্ম্ম-সাধন হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক সভ্যতার কোন্ অবস্থায় ধর্ম্ম-বিশ্বাস কিরূপ থাকে।

প্রথমতঃ, অতি অসভ্য সমাজে মানব নিজেকেই সর্ব্বশক্তিমান মনে করে। পরে ক্রমে যতই সভ্যতায় উন্নত হয়, ততই নিজ-শক্তির নিষ্ফলতা প্রতীয়মান হইতে থাকে, ততই অন্য শক্তিতে আস্থা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে। তখন মানব বহু শক্তির কল্পনা করে। সমাজ আরও উন্নত হইলে ঐ সকল শক্তির একীকরণ দ্বারা মানব একশক্তির উপর নির্ভর করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। একজন মানবতত্ত্ববিৎ অতি সুন্দর ভাষায় এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানব প্রথমে বলে "My will be done" এবং শেষে বলে "Thy will be done।" অর্থাৎ প্রথমে মানব নিজকেই সকল বিষয়ের প্রভু মনে করে; তখন সে অন্য কিছু জানে না। তখন তাহার ধারণা এই হয় যে হাড়িঝীর আজ্ঞা ভূত প্রেতাদি সকলেই মানিতে বাধ্য; শিরোলের* আদেশ মেঘ ঝড় ইত্যাদিও মান্য করিতে বাধ্য। ইহারই সনাতন প্রতিমূর্ত্তি "মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।" পরে যখন এ ধারণা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় তখন হতাশ মানব স্বীকার করে "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" সভ্যাবস্থাতে মানব প্রথমে মনে করে, ব্রহ্ম এক, ব্রহ্মাণ্ড আর; দুই পৃথক পদার্থ, শেষে আরও উন্নত অবস্থায় দুই এক হইয়া যায়। প্রথমে ব্রহ্ম প্রভু আমি দাস, ইহাই হতাশ মানবের পরনির্ভরতা। অবশেষে সভ্যতার চরম সীমায় ব্রহ্ম ও আমি এক হইয়া যাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তিনি; তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। সমস্তই ব্রহ্মময়, সুতরাং সমস্তই চৈতন্যময়। জড় কিছুই নাই। এই তত্ত্ব এতদ্দেশে বহুকাল পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে বিবিধ বিজ্ঞানবিদ্গণ, বিশেষতঃ জীবতত্ত্ববিদ্গণ এবং রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্গণ অঙ্গীকার করিতেছেন।* বিজ্ঞানের দিক হইতে এ তত্ত্ব পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করিলেও, উন্নত সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজের জন-সাধারণ ইহা বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। এতদ্দেশে মূর্খ নীচ-জাতীয় ব্যক্তিগণও এ তত্ত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। সভ্যতার এই সর্ব্বোচ্চ লক্ষণ দ্বারা পরিমাপ করিলেও অনেক সুপরিচিত মানব সম্প্রদায়কে সভ্যতায় হীন বলিতে হয়।

প্রথমেই বলিয়াছি, সভ্যতা দেহের সহিতও সংস্রব রাখে। দেহের শুদ্ধি এবং দেহ নিরাময় রাখিবার চেষ্টাও সভ্যতার অন্যতম লক্ষণ। যাহারা অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বেও ক্ষৌরকার্য্য জানিত না, এক্ষণেও শ্মশ্রু, গুম্ফ, মস্তকের কেশ এবং নখ প্রভৃতি কিরূপে কর্ত্তন করিতে হইবে তাহার ঠিক মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই; যাহারা অদ্যাপি মল-মূত্র ত্যাগের পর শৌচকার্য্যে অভ্যস্থ হয় নাই অথবা অতি অল্পই হইয়াছে; যাহারা আহারান্তে ভাল করিয়া মুখ ধুইতেও জানে না, তাহাদিগের সভ্যতার

* আমাদিগের বাল্যকালে উত্তর বঙ্গে একদল লোক মেঘ উড়াইয়া দিবার অথবা বৃষ্টিপাত করাইবার ব্যবসা করিত। কৃষকরা তাহাদিগকে কিছু ধান দিয়া প্রয়োজন মত বৃষ্টি আনাইত অথবা বৃষ্টি হওয়া বন্ধ করিত। তাহাদিগকে 'শিরোল' বলিত। এই ব্যবসা তখনই প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে নাই।

* The enlarged and deepened views of the universe attained through the discoveries of recent Physical Scinces have rendered incredible the idea of a God remote from the world. The rapid growth of biology and the spread of the doctrine of evolution have not only tended in the same direction but given a new and nobler conception of the tileology of the universe and consequently of God as the supreme intelligence.—Ency Brit. 9th Edn. Vol 23, 245.

পরিমাপ করা কঠিন নহে। সভ্যতা দেহের সহিত অসংসৃষ্ট নহে, কিন্তু মন বুদ্ধি ও চিত্তের সহিত-ই প্রধানতঃ সংসৃষ্ট। সভ্যতা, মন বুদ্ধি ও চিত্তের উৎকর্ষাপকর্ষের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। ইহা আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং তাহারই বাহ্য বিকাশ। সুতরাং যাহাতে মন, বুদ্ধি এবং চিত্ত অবনত করে, তাহাই সভ্যতার প্রধান অন্তরায়।

অন্তরায়

উহাদিগের উন্নতি রুদ্ধ হইলে সভ্যতার উন্নতিও রুদ্ধ হয়; উহারা অবসন্ন হইলে সভ্যতাও অবসন্ন হইয়া যায়।

মন, বুদ্ধি এবং চিত্তের নানা অবসাদক মধ্যে অ-হেতুক অনুকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক লোয়েব দেখাইয়াছেন যে, অনুকরণবৃত্তি একটী মৌলিকবৃত্তি। এ কথা অনায়াসেই বুঝা যায় যে, এই বৃত্তি মানবের অশেষ কল্যাণকর। কিন্তু ইহার অপব্যবহার অত্যন্ত সাংঘাতিক।

অনুকরণ।

যখন আমি অপরের ভাব ও ভাষা, আহার ও পরিচ্ছদ, ক্রীড়া ও সঙ্গীত, আচার ও অনুষ্ঠান—সকলই গ্রহণ করি, তখন আমি তাহার ছায়ামাত্রে পরিণত হই; আমার নিজের ব্যক্তিত্ব কিছুই থাকে না। ঈদৃশ অবস্থাকে আত্মহত্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই শ্রেণীর সাংঘাতিক অনুকরণ মানবকে ক্রমশঃ জড়ে পরিণত করে। তখন মানব অধঃপতিত হইয়া যায়। ইহা উচ্চতম সভ্যতাকেও অত্যন্ত অবনত করিয়া দেয়; এবং ব্যক্তিকে অবসন্ন করিতে করিতে ক্রমশঃ সমাজকেও অবসন্ন করিয়া ফেলে। ঈদৃশ সমাজ কালজয়ী হইতে ত পারেই না, ইহার অত্যন্তাভাব ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে; একথা বিশেষরূপে প্রণিধান করা আবশ্যক।

আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে আমার কথাগুলি শ্রবণ করাতে আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনাদিগকে সাধুবাদ দিতেছি। কোনও সমাজবিশেষের নিন্দাপ্রশংসা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল সভ্যতাবিকাশের সহিত যে সকল লক্ষণের ক্রমবিকাশ হয়, তন্মধ্যে আলোচ্য লক্ষণগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে বিভিন্ন মানব-সমাজের ব্যবহার নির্ণয় করিয়াছি মাত্র। তাহাতে সভ্যতার যে স্তরের যে লক্ষণ, তাহা অবশ্যই নিরপেক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিতে হইয়াছে। ঐ ব্যবহার অথবা লক্ষণ-সকলের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করা আমার প্রয়োজন হয় নাই। আপনারা কেহই আমার কথার কদর্থ গ্রহণ না করেন, ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অলমতি বিস্তরেণ ইতি।

শ্রীশশধর রায়।

বর্ষা প্রভাত

কে দিল রে আনি
স্নিগ্ধ অরুণ কিরণোজ্জ্বল মধুর প্রভাত খানি?
বর্ষা-সজল পাতার 'পরে, ঢাল্‌লো সোণা থরে থরে,
সবুজে আজ সোণার আগুন কে লাগালো নাহি জানি!

আকাশ পারের কোন্ বারতা পাঠাল আজ এই ভুবনে,
স্বর্গদূত সে বার্ত্তা নিয়ে লুটিয়ে প'ল সবুজ বনে।
তাই ধরণীর শ্যামল বুকে, অসীম পুলক খেলছে সুখে,
হরষ তারি মধুর রূপে ছড়ায় রে আজ সকল মনে

শ্রীপ্রমীলা সেন।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোন্ শিকার কোথায় পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্রাদি পশুর স্বভাব মহিষাদি অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। অনেক সময়েই, ইহারা, মহিষ প্রভৃতির মত, ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না। অপেক্ষাকৃত পাতলা জঙ্গলে ও শুষ্ক স্থানে, জলের নিকটে ইহারা থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু অত্যন্ত গরমের সময়, ইহারা লতা-গুল্মাদি-বেষ্টিত গাছড়া জঙ্গল পছন্দ করে। যে সব জঙ্গলে জল নাই, নিতান্ত নিরুপায় না হইলে, সেই সব স্থানে ইহারা প্রায়ই থাকে না।

বাঘকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। (১) Cattle-lifter (যাহারা গবাদি পশু শিকার করিয়া খায়—গো-বাঘা) (২), Game-killer (যাহারা বন্য জন্তুর উপর নির্ভর করিয়া জীবন-ধারণ করে), (৩) Man-eater (নরভুক্)। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে Cattle-lifterই সচরাচর দেখা যায়। ইহারা পাহাড় হইতে নামিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে চলিয়া যায়। গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে, গো-মহিষাদি পায় বলিয়াই, ইহারা সেই সব স্থান পছন্দ করে। হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীরা যেমন লোটা কম্বল সম্বল করিয়া, তাহাদের কষ্টোপার্জ্জনের দেশ হইতে, অস্থি-কঙ্কাল-সার অবস্থায়, আমাদের সোনার বাঙ্গলায় আসিয়া, কিছু দিনেই বেশ 'নাদুস নুদুস' হইয়া, মোহরের মালা গলায় পরে; ইহারাও তেমনই পার্ব্বত্য ভূমি ত্যাগ করিয়া লোকালয়ের নিকট-বর্ত্তী সুলভ জীবিকার স্থানে আসিয়া, কিছু দিনেই নধর-দেহ ও চাক্-চিক্যশালী হয়। লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে থাকিয়া অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে বলিয়া, ইহারা অন্য দুই শ্রেণীর বাঘ অপেক্ষা আয়তনে ও উচ্চতায় কিছু বড় হয়। কিন্তু Game-killerএর মত অত তৎপরতা (agility) দেখাইতে পারে না। Cattle-lifterগণ দিবারাত্রি সমভাবেই শিকার করে। বাঘ অপেক্ষা বাঘিনী অধিকতর শিকারপটু হয়। অধিকাংশ সময়ই বাঘিনী শিকার করে, পরে বাঘ আসিয়া তাহাতে ভাগ বসায়। এই কারণে বাঘ অপেক্ষা বাঘিনী অধিকতর কার্য্যতৎপর ও ধূর্ত্ত হয়।

ইহারা কোন সময়েই, মহিষকে পালের ভিতর ধরিতে সাহস করে না। যখন কোন মহিষ বা তাহার 'বাচ্চা' (Calf) দল-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তখনই ইহারা তাহাকে শিকার করে। খুব বড় মহিষ হইলে, প্রথমে বাঘিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পরে বাঘের হাতে উহার ভব-লীলা শেষ হয়।

রাত্রিতে গবাদি পশু, গোয়ালে বাঁধা থাকে বলিয়া, ইহারা গোয়াল হইতে বা কোন কোন সময় লোকের বাড়ীর উঠান হইতেও গরু বাছুর ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু বাঘ প্রায়ই ছোট বাছুর ধরে না, বোধ হয় বলাভিমানই ইহার কারণ। জঙ্গলা জায়গায় এক এক গৃহস্থের অনেক গরু থাকে। অনেক সময় দুই একটী গরু চরিয়া বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব করে বা কদাচিৎ একেবারেই রাত্রিকালে ফিরিয়া আসে না। সেই সময় ইহারা জঙ্গলেই নিধনপ্রাপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে গো-জাতির একটী বিশেষত্ব ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের কথা বলিব। আমাদের এতদ্দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলকে হাওর বলে। এই সকল বিলের কোন কোনটী ১০।১৫ মাইল বিস্তৃতও হয়। বর্ষাকালে পরিপূর্ণ অবস্থায়, সাধারণ বাতাসেও বড় বড় ঢেউ সৃষ্টি করিয়া, পদ্মা নদী অপেক্ষাও ভীষণ হইয়া থাকে। তখন নৌকা চলাচল এক দুরূহ ব্যাপার। ধরিতে গেলে ইহারা এক একটি ছোট lake বিশেষ। এই হাওর অঞ্চলে এক এক গৃহস্থের ২০।৩০টী বা তদধিক গরু থাকে। কোন

কোন বড় গৃহস্থের শতাধিকও দেখা যায়। অনেক সময় গৃহস্থেরা ২।৪ জনে মিলিয়া জঙ্গলের নিকট গোয়াল বাঁধিয়া গরু রাখে। আবশ্যকমত ১০।১৫টী বাড়ী লইয়া যায়। প্রাতে কয়েক জন রাখাল মিলিত হইয়া, এই সব গরু নিকটবর্ত্তী মাঠে বা বিলে চরায়। আবার সন্ধ্যা হইলেই ইহাদিগকে তাড়াইয়া, গোয়ালে লইয়া আসে। গোয়ালে স্থানাভাব প্রযুক্ত, অনেক সময় কতক গরু বাহিরেও বাঁধা থাকে। Reed jungle (নল-খাগড়ার জঙ্গল) ইহারা ভালবাসে বলিয়া, সেই সব জঙ্গলে চরাই করিবার সময়, ক্রমাগত চক্ষুতে নলের খোঁচা খাইয়া জল পড়িতে পড়িতে কাহারও এক চক্ষুতে কাহারও বা দুই চক্ষুতে ছানি পড়িয়া যায়। এই কারণে হাওরের অধিকাংশ গরুকে কানা দেখা যায়।

হাওরের এই সব ছুটা গরু প্রায় সবই লাল, কালো বা পাকড়া হয়। শতকরা ৫।৭ টার অধিক প্রায়ই সাদা গরু দেখা যায় না। গ্রামে বা সহরে যে সব স্থানে গরুকে বাঁধিয়া 'চাড়ি' দেয়, সেই সব স্থানে ঠিক ইহার বিপরীত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, ইহাই মনে হয় যে, গরু যতই গৃহপালিত হয়, ততই ইহাদের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া সাদা হইতে থাকে। এই সব স্থানের গরু, সহরের গরুর মত পোষমানা নয়। কিছু কিছু বন্য ভাব উহাতে থাকে।

Cattle-lifter বাঘেরা ২।৩টী কি অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদিসহ ৫।৬টী এক পরিবারে বাস করে। শিকার করিয়া গুরু ভোজনের পর, ঘন ঘন জল খাইতে হয় বলিয়া, ইহারা জলের নিকটবর্ত্তী জঙ্গল এত পছন্দ করে।

বহু স্থানেই দেখা যায়, ৪।৫টা গরু, আবশ্যকের অধিক সত্ত্বেও, হত্যা করে। পরে, ক্রমে ধীরে ধীরে পচাইয়া বেশ আয়েস করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত খায়। আবার অনেক সময় ইহাও দেখা যায়, বিনা কারণেও ৫।৭ টা শিকার করিয়া, স্পর্শ মাত্র না করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা সাধারণতঃ চলতি মুখে করে। গন্তব্য স্থানে যাইবার পথে যাহা পায় মারিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময়, বাঘিনীর শিক্ষানবীশ 'বাচ্চা' সঙ্গে থাকিলে তাহাদের দীক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রীরূপে পাঠ দেয়।

কোন স্থানে বাঘ আসিয়াছে 'সাড়া' পাওয়া গেলে, গৃহস্থেরা তাহাদের পালিত পশু সম্বন্ধে খুব সাবধান হয়। সেই সময় একাদিক্রমে এই বাঘেদের একাদশী চলিতে থাকে। ভগবান্ ইহাদের সে শক্তিও যথেষ্ট দিয়াছেন। যদি কখনও উপবাসের পালা খুবই বাড়িয়া যায়, ইহারা তখন অগত্যা জঙ্গলে শূকর বা হরিণ শিকার করে। ইহারা বনে সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া নিঃশব্দে গা ছিপাইয়া এত সহজে যাইতে পারে যে, সেরূপ দক্ষতা আর কোনও জানোয়ার দেখাইতে পারে না। আরও বিশেষত্ব এই যে, ভগবান্ ইহাদিগকে কতকগুলি গোঁফ্ দিয়াছেন, সেগুলির অন্য কার্য্য থাকিলেও প্রধানতঃ পথপ্রদর্শক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। যে-কোন সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া চলিবার সময়, ইহাদের গোঁফ্ পথের উভয় পার্শ্ব স্পর্শ করিলে, সেই সকল স্থান দিয়া ইহারা স্বাভাবিক অবস্থায় চলে না; কারণ ইহারা মনে করে, ঐ পথে ইহাদের শরীর আটকিয়া যাইবে। বাস্তবিক, মাপ করিয়া দেখিলেও ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। বিড়ালেরও এইরূপ স্বভাব দেখা যায়। ইচ্ছা করিলে, কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

বাঘেরা শিকার করিবার সময়, সাধারণতঃ পিছন দিক হইতে কোনও জানোয়ারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া কামড়াইয়া ধরে। ঘাড়ে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের গুরু ভারে শিকারের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়। খানিকক্ষণ মাটিতে পড়িয়া 'ঝটাপটি' করিতে করিতেই সব শেষ হইয়া যায়। Leopard, Panther প্রভৃতির চরিত্র ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা পিছন হইতে লাফাইয়া মুখ নীচু করিয়া একেবারে টুঁটি চাপিয়া ধরে ও ঝুলিয়া পড়ে। ইহারা সকলেই শিকার, একেবারে মরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, কামড়াইয়া ধরিয়া গোঁগরাইতে থাকে। ইহাতেই লোকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ইহারা শিকার করিয়া প্রথমেই রক্ত চুষিয়া খায়। বাস্তবিক, তাহা ভুল। ইহারা চাটিয়া খাওয়া ছাড়া চুষিয়া খাইতে পারে না।

কেবল শিশু শাবকেরাই চুষিয়া মাতৃস্তন্য পান করে।

অধিকাংশ স্থলেই বাঘেরা যোড়ায় যোড়ায় বাস করে। কিন্তু পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইটি জঙ্গল থাকিলে, যোড়ার দুইটিকে দুই জঙ্গলে থাকিতেও দেখা যায়। ইচ্ছানুসারে একত্র মিলিত হয়।

যোড়ার একটী নিহত হইলে, দশ-পনেরো দিন কি মাসখানেকের মধ্যে আর একটী আসিয়া মিলিয়া যায়। সাধারণতঃ বাঘ মারা পড়িলে বাঘিনী কিছুদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া, ক্রমাগত ডাকিতে থাকে; তাহাতেই আর একটী বাঘ আসিয়া মিলিত হয়। এইরূপে অনায়াসেই বিধবা-বিবাহ সংঘটিত হয়। কিন্তু বাঘিনী হত হইলে অত শীঘ্র সেরূপ ঘটে না। তবে পরবর্ত্তী বৎসরে বাঘ 'দোজবর' হইয়া নব যুবতী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে।

বাঘিনীরা প্রসবের কিছু পূর্ব্বেই, বাঘের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। প্রসবান্তে শাবক কিছু বড় হইলে, স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হয়। বিড়াল যেমন দুগ্ধপোষ্য শাবককে খাইয়া ফেলে, ইহাদেরও সেইরূপ প্রকৃতি বলিয়া, শিশু শাবককে রক্ষা করিবার জন্য, বাঘিনী প্রসবের পূর্ব্ব হইতেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। পশ্বাদি মাত্রেরই স্ত্রীগণ স্বাভাবিক নিয়মে ঋতুমতী হইলে পুরুষের সম্ভোগের সময় উপস্থিত হয়। ব্যাঘ্রাদিরা নিজ শাবককে নষ্ট করিয়া ফেলিলেই, পুনরায় সম্ভোগ করিতে পারিবে বলিয়া, শাবককে নষ্ট করে। এই জন্যই শাবক কিছু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত বাঘিনী, বাঘ হইতে পৃথক্ থাকে। Cattle-lifter বাঘের সম্বন্ধে আর যাহা কিছু বাকী রহিল, 'হাওদা' শিকার প্রবন্ধে তাহা বলা যাইবে।

Game-killer বাঘ লোকালয়ের নিকটে বড় আইসে না। ইহারা প্রায়ই পাহাড়ে বা তন্নিম্নস্থ জন-বিরল জঙ্গলে বাস করে। বন্য পশু শিকারই ইহাদের জীবিকা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একই জঙ্গলে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ সত্বেও বাঘ ও হরিণ প্রভৃতি অন্যান্য জানোয়ার বাস করে। বিশ্বস্রষ্টা বাঘকে যেমন শিকার করিবার উপযোগী করিয়া গড়িয়াছেন, হরিণাদি জন্তুকে তেমনই প্রখর ঘ্রাণ ও শ্রুতি শক্তি দিয়া একত্র বসবাসের উপ-যোগী করিয়া দিয়াছেন। তাই ইহারা একত্র বস-বাস করিতে অভ্যস্ত ও আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে সমর্থ। এই কারণেই Game-killer বাঘদের বহু কষ্ট ও পরি-শ্রম করিয়া শিকার সংগ্রহ করিতে হয়। সেই জন্য প্রতি-দিন ইহাদের অদৃষ্টে আহার 'জোটে' না। অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বদাই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া, cattle-lifter বাঘ অপেক্ষা game-killer খর্ব্ব ও কৃশ হয়। অন্য বাঘ অপেক্ষা ইহাদের স্ফূর্ত্তিও অধিক। এই শ্রেণীর বাঘ মানুষ দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পায়। কিন্তু গোবাঘা (cattle-lifter) শ্রেণী সর্ব্বদা লোক দেখে বলিয়া, তত ভয় পায় না। Game-killer শ্রেণীর বাঘই পরে গোবাঘায় পরিণত হয়। Game-killer বাঘেরা অধিক সময় একক বা যোড়া থাকে। শাবকগণ আত্ম-নির্ভর-ক্ষম হইলেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। ইহারা পাশ্চাত্য জাতির মত, পরিজনাদির দায়িত্বের গুরু ভার লইতে নারাজ। শাবকগণ প্রথম প্রথম ভাল করিয়া শিকার করিতে পারে না বলিয়া, গিরগিটি, গো-সাপ, বেজী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু ধরিয়া খায়।

Man-eater Tiger বলিয়া কোন বিশেষ শ্রেণীর বাঘ নাই। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর বাঘের বার্দ্ধক্যে কষ্ট-সাধ্য শিকার ধরিবার শক্তি কমিলে, যদি হঠাৎ কেহ কোন সময় ২।১ জন মানুষ হত্যা করিয়া খাইতে পারে, তবেই Man-eater হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় বাঘিনী Man-eater হইলে, তাহার শিশু-সন্তানগণও ক্রমে মাতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া Man-eater হইয়া পড়ে। একবার Man-eater হইলে, পরে আর এমন শ্রেষ্ঠ, সুখাদ্য, নরম মাংস ত্যাগ করিয়া, অন্য মাংস খাইতে চায় না। মানুষ মারিতে যেমন ইহাদের পরিশ্রম করিতে হয় না, অন্যদিকে তেমনই ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত না হইলে, মানুষ মারিতেও পারে না। মানুষের বুদ্ধির

উপর ইহাদের কৌশল খাটাইতে পারিলে,* তবে মানুষ শিকার করিতে পারে। দৈবাৎ আক্রান্ত হইয়া, কোন সময় কোন বাঘ মানুষকে জখম করিলে, সে Man-eater হয় না। সাধারণতঃ ১০।১৫ জন লোক হত্যা করিবার পরই ইহারা নিহত হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে একবার এক Man-eater ৭০০ শত লোক হত্যা করিয়া সে অঞ্চলে ত্রাস (panic) উৎপাদন করিয়াছিল।

বাঘ Man eater হওয়ার সংবাদ পাইবামাত্রই, ইহাদিগকে শিকার করিবার জন্য, সরকার হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। অনেক সময় অর্থলোভে 'বেচারা' শিকারীরা নিজের প্রাণ বলি দিয়াও অর্থাকাঙ্খা নিবৃত্তি করে। খুব সুচতুর ও সতর্ক শিকারী না হইলে ইহাদিগকে শিকার করিতে পারে না। ইহাদিগের চলা-ফেরা করিবার সময় কোন শব্দ হয় না। এমন কি বন নড়াও প্রায় অনুভূত হয় না। কাঠুরিয়াগণের দলবদ্ধ হইয়া কাঠ কাটিবার বা কর্ত্তিত বৃক্ষ আনিবার জন্য যাতায়াত সময়ে, বহু গাড়ী ও লোক থাকিলেও, ইহারা অতি সন্তর্পণে আসিয়া পিছনের গাড়োয়ান বা লোকটীকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই কার্য্যটী এত তৎপরতার সহিত ও সুকৌশলে সম্পন্ন করে যে, অগ্রবর্ত্তী লোকেরা অনেকসময় মোটে 'টের' পায় না। ইহারা সুবিধামত স্থানে, মানুষ ধরার মতলবে, বহুদূর হইতে এই সব লোকের পাছু লইয়া থাকে। সম্মুখের লোক ধরিলে, বিপদের আশঙ্কা আছে মনে করিয়া, পাছের লোককে ধরে। অনেক সময় এমনও দেখা গিয়াছে, এক স্থানে একটী লোক হত্যা করিয়া, তাহার ২।১ দিন পরেই ৫।৭ কি দশ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া আর একটীকে হত্যা করিয়াছে। এইরূপ ক্রমাগতই দূরে দূরে শিকার করিয়া, মানুষের চক্ষে ধূলি দিয়া ধূর্ত্ততার প্রকৃত পরিচয় দেয়। পাছে লোকে ইহাদের নির্দ্দিষ্টস্থান 'টের' পায়, এই জন্যই এত সতর্ক হয়। এক কথায়, ইহাদের মত ধূর্ত্ত ও চালাক বাঘ অন্য কোন শ্রেণীতে হয় না। Man eater Tigerএর সংখ্যা অতি অল্প।

Man-eater Tiger কিরূপ ধূর্ত্ত হয়, তাহা নিম্নের গল্প দুইটীর বিবরণ হইতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

বিখ্যাত শিকারী স্যার স্যামুয়েল বেকারের এদেশে শিকার করার সময়, আসামের কোন স্থানে Man-eater এর উপদ্রবে ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল। আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই ব্যাঘ্র শিকারের জন্য, প্রচুর পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম কিছুদিন স্যর স্যামুয়েল বেকার, বাঘটীকে মারিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যেখান হইতেই তিনি মানুষ মারার খবর পাইতেন, সেখানেই যাইয়া, তিনি নিহত লোকটীকে দেখিয়া তন্নিকটস্থ কোন গাছে বা অন্যস্থানে লুকাইয়া থাকিতেন। কিন্তু তিনি ঐ নিহত লোকটীকে দেখিলে পর, ব্যাঘ্র আর উহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিত না। বাঘ বেচারার শিকার করামাত্র সার হইত—উহা আর তাহার ভোগে আসিত না। কারণ সে বুঝিত যে, মানুষ তাহার পাছু নিয়াছে। ইহার কয়েকদিন পরেই, আর এক দিন একটী নরহত্যার সংবাদ পাইয়া শিকারী বেকার ১০।১১ জন লোক সঙ্গে লইয়া, যে ঝোপের মধ্যে অর্দ্ধভুক্তাবস্থায় মৃতদেহটী পড়িয়াছিল, সেখানে ঢুকিয়া, একটু পরেই নিজে মাত্র তথায় থাকিয়া অপর লোকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য—বাঘটীকে বুঝিতে দেওয়া যে, কতকগুলি লোক মৃতদেহটী খুঁজিতে গিয়াছিল এবং তাহারাই ফিরিয়া গেল; একজন যে ভিতরে রহিয়া গেল, ইহা বাঘটী বুঝিতে না পারে। বাস্তবিক, তাহাই ঘটিয়াছিল। খানিক পরেই, বাঘটীর ঐ ঝোপের দিকে, অতি সন্তর্পণে গা ঢাকিয়া আসিবার সময়, দূর হইতেই, তিনি উহাকে শিকার করেন। ব্যাঘ্র মহাশয়ের অঙ্কশাস্ত্রে কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিলে, ইহার উপর মানুষের এই চালাকি আর খাটিত না।

এইরূপ ছোটনাগপুরের কোন স্থানে, আর একটী বাঘ নর-ভুক্ (Man eater) হইয়া ডাকবিভাগের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। যে বনের মধ্য দিয়া ডাকের 'রাণার'গণ চলাচল করিত, বাঘটী প্রায়ই সেখানে 'ওৎ পাতিয়া' থাকিয়া—কেবল রাণারকেই ধরিয়া

নিত। ডাকের রাণারকে তাহার ঝুনুঝুনি শব্দ শুনিয়াই ধরিত, কিন্তু অন্ত লোক চলাচল করিবার সময় কিছুই বলিত না। ইহার জন্তও প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। ঐ রাস্তা দিয়া ডাক চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। স্যর স্যামওয়েল বেকার বাঘটীকে মারিবার জন্ত কয়েকদিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া, অকৃতকার্য্য হইবার পর, কোমরে 'ঘুঙ্গুর' বাঁধিয়া রাণার সাজিয়', বহুচেষ্টায় বাঘটীকে মারিতে সমর্থ হন।

Leopard, Pantherএর মধ্যেও সময় সময় Man-eater দেখা যায়। ইহারা Tiger অপেক্ষা আরও ধূর্ত্ত হইয়া উঠে। কারণ লোকের বাড়ীর 'আনাচে কাণাচে' অনেক সময় ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া, ইহাদের মানুষ ধরিবার সুযোগ বেশী। শিশুসন্তান ও অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েরা সন্ধ্যার পর হাতমুখ ধুইতে বাহিরে আসে বা মলমূত্রাদি ত্যাগের জন্ত বাড়ীর পিছে জঙ্গলে যায়; সেই সুযোগে ইহারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকে। কোন কোন সময় ছোট শিশুসন্তানকে ঘরের বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিয়া জননী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলে, ইহারা সুযোগ বুঝিয়া লইয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি এইরূপ একটী শিকার করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসি। ছেলেটীকে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহার আর কোন সন্ধানই করিতে পারিলাম না। কেবল একস্থানে একটু ন্যাকড়া ও রক্তের চিহ্ন পাইয়াছিলাম মাত্র। বাঘ না পাইয়া থাকিলেও, আমার যাওয়াতে এই উপকার হইয়াছিল যে, ঐ গ্রামে ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে পরে আর বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা যায় নাই।

অন্ত স্থানে একটী Man-eater leopard মারিয়াছিলাম; এই প্রসঙ্গে গল্পটী বলিতেছি।

১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে মুক্তাগাছার ৫।৬ মাইল পশ্চিমে বড়গ্রাম নামক একস্থানে, একটী leopard, man-eater হইয়া অনেকগুলি শিশু ও বালক হত্যা করে। যথা সময় খবর পাইলেও, হাতী আনাইয়া যাইতে আমাদের কয়েকদিন বিলম্ব হইয়া পড়িল। ইহার ফলে হত্যার মাত্রাও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাস্তবিক, এই জন্ত আমরা নিজেরাও অনুতপ্ত। কিন্তু কি করিব—যাওয়ার কোনই উপায় ছিল না। তখনও আমি হাঁটিয়া শিকার আরম্ভ করি নাই, কাযেই উহাতে অভ্যস্ত ছিলাম না। কিন্তু আমরা হাঁটিয়া শিকার করার অভিজ্ঞতা লাভের পরে, এরূপ ঘটিলে তিলার্দ্ধও দেরী করিতাম না।

যাহা হউক, পিলখানা হইতে হাতী আসিয়া পৌছামাত্রই, আমি ও শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় দুই হাওদায়, আরও কয়েকটী Beater elephants (জঙ্গলভাঙ্গা হাতী) সহ শিকার করিতে যাই। গ্রামে পৌছিয়াই শুনিলাম, সেই দিনও প্রাতে ঐ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী একটী খাল দিয়া, এক বৈরাগী-বালক তাহার জননীকে লইয়া, নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল, খালের পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপ হইতে বাঘটী নৌকার উপর লাফাইয়া পড়িয়া, ছেলেটীকে ধরিয়া নিয়া গিয়াছে। এত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত এই কার্য্য করিয়াছিল যে, বালকটী 'টুঁ' শব্দও করিতে পারে নাই। ছেলেটীকে ধরিয়া ঝপ্ করিয়া জলে পড়ার শব্দে, তাহার মা টের পায়। এখনও তাহার মাতার তখনকার সেই মর্ম্মস্পর্শী করুণ আর্ত্তনাদের কথা স্মরণ হইলে, অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। আমরা বহু চেষ্টায় হাতী দিয়া বাঘটীকে বাহির করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া, গ্রামস্থ লোকদিগকে বহু উত্তেজনায় জঙ্গলে ঢুকাইয়া, তবে শিকার করিতে পারি। যদি ঐ সমস্ত লোক সংগ্রহ করিতে না পারিতাম, তবে আর বাঘটীকে শিকার করিতে পারিতাম না। কারণ উহা একটী বটগাছের শিকড়ের নিম্নস্থ গর্ত্তে লুকাইয়াছিল। আমরা হাতী লইয়া, ঐ স্থান দিয়া বারম্বার যাতায়াতেও সাড়া দেয় নাই।

পূর্ব্বে man-eater tiger প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, উহারা পিছনের লোক ধরিয়া নেয়; বৈরাগী-বালককেও পিছন হইতে নেওয়াতে তাহাই উপলব্ধি হয়। কাযেই সকল শ্রেণীর বাঘই, man-eater হইলে, তাহাদের প্রকৃতিও প্রায় অভিন্ন হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

পৃথ্বীরাজ রাসোর ঐতিহাসিক মূল্য

গত ফাল্গুনের মানসীতে লিখিয়াছি যে, রাণা সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক ছিলেন না ; কিন্তু আমার নিজের পুস্তকাভাবে প্রমাণ দিতে পারি নাই। সমরসিংহের সময়ের আলোচনা, আশা করি, কোনও সহৃদয় পাঠক করিবেন। সমর সিংহকে বাদ দিয়া রাসোতে বর্ণিত অন্যান্য ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম ও ঘটনা সম্বন্ধে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। এই প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমি পূর্ব্বে রাসোতে যে এক বা দুই আনা সত্য কথা আশা করিয়াছিলাম, তাহাও নাই। সংযুক্তাহরণ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। যুক্তপ্রদেশে, অযোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ডে আল্হার গীত প্রচলিত। তাহাতে পৃথ্বী ও মহোবার রাজা পরমাল চন্দেলের যুদ্ধের ও মহোবা পতনের কথা গীত হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে সংযুক্তা (সংযোগিন্) হরণের কথাও গীত হয়। মহোবাকে সাহায্য করিতে জয়চন্দ আপনার ভাইপো লাখন্ রাণাকে পাঠাইয়াছিলেন। গীতে নানাস্থানে লাখন বলিতেছেন, "পৃথ্বী আমাদের বাটীর এক দাসী-কন্যাকে লইয়া গিয়াছে ; আমি প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি···ইত্যাদি।" সাধারণ দন্তকথা মতেও প্রথমে সংযুক্তা-হরণ, তাহার বহুকাল পরে মহোবা-পতন। মহোবা-পতনের প্রমাণ স্বরূপ মদনপুরে এক লেখ পাওয়া গিয়াছে। সম্বৎ ১২৩৯ মহোবার পতন হইয়াছে, তাহার ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে সংযুক্তা-হরণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু রাসোতে সংযুক্তা হরণের সময়ে পৃথ্বীর বয়স ৩৬ বৎসর ৬ মাস লেখা। পৃথ্বীর জন্ম ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ কৃষ্ণদ্বিতীয়া। সংযুক্তাকে গোপনে বিবাহ চৈত্র কৃষ্ণ অষ্টমীর রাত্রিতে। অংচ বয়স ৩৬ বৎসর ছয় মাস। খুব সম্ভব সংযুক্তা-হরণ হইয়াছিল ; কিন্তু রাসোতে যে সবিস্তার বর্ণনা আছে, সেটা রূপকথা মাত্র। পৃথ্বীর সমসাময়িকদের মধ্যে রাসোতে বর্ণিত কনোজে জয়চন্দ, গজনীতে ঘোরী, গুজরাটে ভীম ও মহোবাতে পরমাল এই কয়টি ঐতিহাসিক, আর সকলগুলি কাল্পনিক।
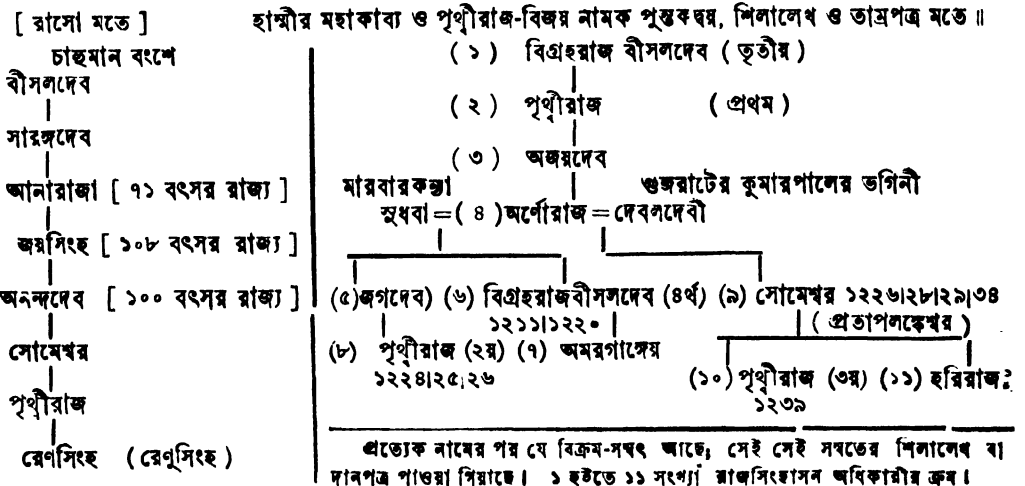
বিজওড়ার লেখ হতে (৪) অর্ণোরাজাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (৫) জগদেব হত্যা করিয়া (১২০৮ বিঃ সং) রাজ্যগ্রহণ করেন, কিন্তু ভোগ করিতে পারেন নাই। বোধহয় ৫।৭ দিবস মধ্যেই (৬) বিগ্রহরাজ বীসলদেব রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। চোহান বংশে চারিজন "বিগ্রহরাজ বীসলদেব" ছিলেন, সকলেই কীর্ত্তিমান্ ও প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের গল্পগুলি দন্তকথাতে অনেক ওলট পালট হইয়া গিয়াছে।

রাসোর অধ্যায়কে "সময়" বলা হইয়াছে। রাসোতে পরিশিষ্ট সহিত ৬৯ সময়।

রাসোতে আছে—

১। যখন সোমেশ্বর শাকম্ভরী (Sambhar) আজমীরে রাজা, তখন অনঙ্গপাল তোমর দিল্লীর রাজা। কনোজপতি কমধ্বজ বিজয়পাল দিল্লী আক্রমণ করিলে অনঙ্গ সোমেশ্বরের কাছে সাহায্য চাহিলেন। সোমেশ্বরের সাহায্যে জয়ী হইয়া তিনি আপন কনিষ্ঠা কন্যা কমলা সোমেশ্বরকে দান করিলেন। পরে জ্যেষ্ঠা সুরসুন্দরী বিজয়পালকে দিলেন। ১১৪৮ খৃঃ কমলার গর্ভে পৃথ্বীর জন্ম। বিজয়পালের পুত্র জয়চন্দ্র; কিন্তু সুরসুন্দরীর গর্ভে কি না, সেকথা নাই। কেবল একস্থানে (৪৮ সময়) জয়চন্দ পৃথ্বীকে বলিতেছেন "মাতুল হম তুম ইক।" অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি পৃথ্বীকে রাজ্যের রক্ষাভার দিয়া বদরিকাশ্রমে তীর্থ করিতে গেলেন। সেখানে দিল্লীবাসীরা গিয়া অভিযোগ করিল যে, পৃথ্বী আপনার চোহান সহচরদের প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমাদের পীড়ন করিতেছেন। অনঙ্গ দিল্লী আসিলেন, পৃথ্বীকে রাজ্যত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু পৃথ্বী তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন না; পরে তীর্থবাসের জন্ম বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন।

বিজয়পাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কটক আক্রমণ করিলেন। কটকের সোমবংশী মুকুন্দদেব যুদ্ধ না করিয়াই আপনার কন্যা জুনহিয়া (জ্যোৎস্না) ভেট দিলেন। বিজয়পাল এই কন্যার সহিত জয়চন্দ্রের বিবাহ দিলেন। তাহার গর্ভে সংযুক্তার জন্ম হইল।

২। গুজরাটের রাজা ভোলারায় ভীমদেব। আবুর রাজা সলখ (সলষ) প্রমার। উভয়ে স্বাধীন প্রতিবেশী। সলখপ্রমারের দুই কন্যা মন্দোদরী ও ইচ্ছিনী ও এক পুত্র জেতপ্রমার। মন্দোদরীর বিবাহ ভীমদেবের সহিত হইয়াছিল, ইচ্ছিনীর বাগ্‌দান পৃথ্বীর সহিত। মন্দোদরীর সেবিকাদের মুখে ইচ্ছিনীর রূপের কথা শুনিয়া ভীম মোহিত। সলখকে লিখিলেন, আমাকে ইচ্ছিনী দান কর, নতুবা আবু ছারখার করিব। সলখ অস্বীকার করিলেন ও পৃথ্বীকে শীঘ্র বিবাহ করিতে ডাকিলেন। ভীম ১১৭১খৃঃ চৈত্রমাসে আবু আক্রমণ করিলেন। [অন্য স্থানে (৬৫ সময়) আছে, তখন পৃথ্বীর বয়স ১২ বৎসর অর্থাৎ ১১৬০]। ঘোর যুদ্ধ হইল। সলখের মৃত্যু। কিন্তু জেত বা রাজপরিবারের সন্ধান পাইলেন না। আবুতে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া গুজরাট প্রত্যাগমন। পথে পৃথ্বীর সহিত যুদ্ধ। ভীমের পরাজয়, প্রাণ লইয়া পলায়ন। বিজয়ী পৃথ্বীর আবু প্রবেশ। ইচ্ছিনীর সহিত বিবাহ। জেতপ্রমার আপনার পৈতৃক রাজ্যে সুবাদার বা সামন্ত রাজা নিযুক্ত। পরে জেত পৃথ্বীর দরবারে থাকিতেন, কিছুকাল পরে পৃথ্বীর প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ঘোরীর সহিত যুদ্ধে পৃথ্বীর সহিত মৃত্যু।

পরাজিত ভীমের প্রতিশোধ লইবার জন্ম সোমেশ্বরকে আক্রমণ। ঘোর যুদ্ধে চোহানরা পরাজিত। যুদ্ধে সোম বধ। পৃথ্বী শোধ লইবার জন্ম ভীমকে আক্রমণ করিলেন (৪৪ সময়)। সনের উল্লেখ নাই; কিন্তু যুদ্ধে ভীমকে বধ করিলেন। ভীমের ৮৪টি বন্দর কাড়িয়া লইলেন ও ভীমের পুত্রকে পট্টনের রাজ্য দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

৩। (২০ সময়) ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বদেশে সমুদ্র শিখরগড়ে যাদব-বংশীয় রাজা বিজয়পালের সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য, দশহাজার বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী, অনেক হাতী, তিন লক্ষ পদাতিক, দশ পুত্র ও দশ কন্যা ছিল। কন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ কমাউর রাজা কুমোদমণির সহিত স্থির হইয়াছিল। পদ্মাবতী গোপনে পৃথ্বীকে পত্রদ্বারা আহ্বান করিলেন। পৃথ্বী পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলেন।

৪। (২৫।২৬) দেবগিরির প্রবল যাদব রাজা ভানুর কন্যা শশিবৃতার সহিত জয়চন্দ্রের ভাইপোর বিবাহ স্থির হইয়াছিল। পৃথ্বী যুদ্ধে উভয়কে পরাজিত করিয়া শশিবৃতাকে বিবাহ করিলেন। পরে জয়চন্দের সহিত ভানুর যুদ্ধ বাধিলে পৃথ্বী যাদবদের সাহায্য করিলেন। বিবাহের সন নাই; কিন্তু পদ্মাবতীর বিবাহের পর, মাঘ মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন।

৫। (৩৩ সময়) ইন্দ্রাবতীর বিবাহ। মালব-রাজ ভীমদেব পৃথ্বীকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়া পুরোহিত পাঠাইলেন। বিবাহ স্থির হইল; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল—ঘোরী চিতোর আক্রমণ করিয়াছে। পৃথ্বী চিতোরে চলিয়া গেলেন। বিবাহের জন্ত আপনার প্রতিনিধি খড়্গ রাখিয়া গেলেন। ভীম প্রথমে কুপিত হইলেন, পরে খড়্গের সহিত বিবাহ হইল। ইহারও তারিখ নাই। ২৮ সময়ে মালবের রাজার নাম যাদব রায়। সোমেশ্বরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন।

৬। (৩৬ সময়) রণথম্বের যাদব-বংশীয় রাজা ভানুর কন্তা হংসাবতীকে চন্দেরীর শিশুপাল-বংশীয় রাজা পঞ্চাইন বিবাহ করিতে চাহিলেন। ভানু অস্বীকার করিলেন ও পৃথ্বীর সাহায্য লইয়া পঞ্চাইনকে পরাজিত করিলেন। পরে পৃথ্বীকে কন্তাদান করিলেন।

৭। লাহোর সোমেশ্বরের, পরে পৃথ্বীর অধিকারে ছিল। একজন সামন্ত রাজা বা থানাদার থাকিতেন।

৮। সমর সিংহ ঘোরীর সহিত শেষ যুদ্ধ করিতে আসিবার পূর্ব্বে আপনার দ্বিতীয় পুত্র রত্নসিংহ [পৃথ্বীর ভগিনী পৃথার গর্ভজাত]-কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। কেননা জ্যেষ্ঠ কুম্ভ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া দক্ষিণে বিদর নগরে মুসলমান রাজার সহচর হইয়া বাস করিত।

৯। মহম্মদ ঘোরীকে পৃথ্বী ১৬ বার বন্দী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

১০। আনা রজা, জয়সিংহ ও অনন্দদেব তিন-পুরুষ, অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পৌত্র। অথচ তাঁহারা ৭১, ১০৮, ও ১০০ বৎসর রাজ্য করিলেন।

১১। রাসোর নানা স্থানে, কখন বা প্রকাশ্যে কখন বা ইঙ্গিতে লেখা হইয়াছে যে, হিন্দু রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ কনোজের জয়চন্দ। জয়চন্দ ঘোরীকে হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। যখন ঘোরী পৃথ্বীকে আক্রমণ করিলেন, তখন জয়চন্দ মুসলমান আক্রমণ-কারীদের সাহায্য করিয়াছিলেন। ঘোরী প্রথমে পৃথ্বীকে মারিয়া পরে জয়চন্দকে মারিলেন।

১। দিল্লীতে ফিরোজ শাহের লাট নামক যে অশোকস্তম্ভ আছে, তাহাতে অশোকের শাসনের নীচে ১২২০ সম্বৎ (১১৬৩ খৃঃ) বৈশাখী পূর্ণিমায় লেখা একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। সে শ্লোক সোমেশ্বরের অগ্রজ চতুর্থ বিগ্রহরাজ বীসলদেবের লেখা। তাহাতে আছে "বিগ্রহরাজ বিন্ধ্যাচল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সকল দেশ জয় করিয়া স্থানীয় রাজাদের কাছে কর সংগ্রহ করিলেন। তিনি ভারতকে পুনরায় আর্য্যভূমি করিলেন ইত্যাদি।" এই সময়ে দিল্লী জয় হইয়াছিল। দিল্লীতে অজমীরের কোনও সামন্তরাজা থাকিতেন। অজমীরের যুবরাজের একজন অধীনস্থ সামন্ত-রাজার পোষ্যপুত্র হওয়া অশ্রদ্ধেয়।

সোমেশ্বরের পিতা অর্ণোরাজা একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন রাণী। প্রথমা মারবার-কন্তা সুধবা। তাঁহার গর্ভে জগদেব ও বীসলদেব বিগ্রহরাজ (চতুর্থ) জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া গুজরাটের সোলঙ্কী সিদ্ধরাজ জয়সিংহের কন্তা কাঞ্চনদেবী। তৃতীয়া গুজরাটের সোলঙ্কী কুমার পালের ভগ্নী দেবলদেবী। এই কুমারপাল সিদ্ধরাজের খুড়তুতো ভাই ত্রিভুবন-পালের পুত্র। দেবলদেবীর গর্ভে সোমেশ্বরের জন্ম। সোমেশ্বর বেশীর ভাগ মাতুলালয়ে থাকিতেন। কুমার-পালের কাছে তাঁহার শিক্ষা। একবার কুমারপাল কোঙ্কন দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সোমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন। সোমেশ্বর স্বহস্তে কোঙ্কন-রাজকে মারিয়াছিলেন।

সোমেশ্বরের বিবাহ চেদির [জব্বলপুরের চারিদিকের দেশ] রাজা নরসিংহ দেবের কন্তা কর্পূরাদেবীর সহিত হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র পৃথ্বীরাজ ও হরিরাজ। সোমেশ্বরের মৃত্যু ১১৭৯ খৃঃ। সোমেশ্বরের চারিটি শিলা-লেখ পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক মিবার রাজ্যে বিজওলা নামক গ্রামের নিকট এক পর্ব্বতের গাত্রে ১১৬৯ খৃঃ লেখা এক বিস্তৃত লেখ আছে। তাহাতে তাঁহার বংশের অনেক কথা আছে। তাহাতে সোমেশ্বরের উপাধি "প্রতাপলঙ্কেশ্বর"। হম্মীর মহাকাব্যে সোমেশ্বরের স্ত্রীর নাম কর্পূরা দেবী; কিন্তু রাণীর পিতৃকুলের পরিচয় নাই।

শাকম্ভরীর (sambhar) রাজা রূপে পৃথ্বীরাজের সবিস্তার বর্ণনা আছে; কিন্তু দিল্লীর রাজবংশ অথবা তোমর-বংশের সহিত কোনও সম্বন্ধ আছে বা ছিল, এমন কথা নাই। তাহাতে আছে যে, মুসলমানেরা দিল্লী অধিকার করিলে পৃথ্বী সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ করিলেন। অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে তিনি দিল্লীতে ছিলেন না। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা পৃথ্বীকে অজমীরের রাজাই বলিয়াছেন। দিল্লীর সহিত কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। তবকাত-ই-নসিরী বলেন, দিল্লীর রাজা গোবিন্দ রায় বা গোবিন্দ রাজ। ফরেস্তা বলেন, পিথোরার ভাই দিল্লীশ্বর চামুণ্ড রায়। তাজ-উল-মআসীর বলেন "শিহাব উদ্দীন গজনী হইতে ৫৮৭ হিঃ লাহোরে আসিলেন ও সরদার হমজাকে দূতরূপে অজমীরের রাজার কাছে পাঠাইলেন।...অজমীরের রাজাকে শাস্তি দিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, রাজা মুসলমানদের ঘৃণা করে ও ষড়যন্ত্র করিতেছে, তখন রাজার শিরচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। অজমীরের রাজ্য রায় পিথোরার পুত্রকে দিয়া স্বয়ং দিল্লী চলিয়া গেলেন। দিল্লীর রাজা অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুলতান আপনার কতক সেনা ইন্দ্রপথে রাখিয়া স্বয়ং গজনী চলিয়া গেলেন।" অতএব দিল্লী ও অজমেরের রাজা দুই জন ভিন্ন ব্যক্তি।

পৃথ্বীর তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; তাহার একদিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি ও "শ্রীপৃথ্বীরাজ দেব" লেখা ও অন্য দিকে একটি বলদ মূর্ত্তি ও "আসাবরী শ্রীসামন্ত দেব" লেখা। অল্প কয়েকটি এমন মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে, যাহার একদিকে পৃথ্বীরাজের নাম ও অন্য দিকে "সুলতান মুহম্মদ সাম" লেখা। অজমীরের পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা অনুমান করেন, পৃথ্বী স্বাধীনতা হারাইয়া কিছুকাল ঘোরীর সামন্তরূপে ছিলেন। এ মুদ্রা সেই সময়ের।

অতএব দিল্লীর রাজ্যপ্রাপ্তি, তোমরের দৌহিত্র ইত্যাদি সকল কথাই কাল্পনিক।

২। আবুর রাজারা গুজরাটের সামন্ত ছিলেন। আবুর প্রমার বংশে ধরণীবরাহ নামক এক রাজা ছিলেন। গুজরাটের রাজা মূলরাজ সোলঙ্কী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও পলাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাষ্ট্রকূট ধবল তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ধবলের ৯৯৬ খৃষ্টাব্দের এক লেখে এই বর্ণনা আছে। মূল রাজ ৯৬১ হইতে ৯৯৫ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। আবুর রাজারা এই সময় হইতে গুজরাটের সামন্ত, ও ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

জিনমণ্ডন-রচিত "কুমার পাল প্রবন্ধ" নামক পুস্তকে আছে যে, একদিন শাকম্ভরী-পতি অর্ণোরাজা স্ত্রীর সহিত পাশা খেলিবার সময়ে কোনরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। রাণী কুপিত হইয়া, "দাদা কুমারপালকে বলিয়া দিব, তিনি তোমাকে শাস্তি দিবেন" এইরূপ ভয় দেখাইয়াছিলেন। রাজা রাণীকে পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিলেন। রাণী কুমারপালের কাছে চলিয়া গেলেন ও ভাইকে অপমানের প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিলেন। কুমার পাল ১১৩২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি তেজস্বী ও স্বাধীন-প্রকৃতির লোক ছিলেন। অমাত্যদের মতামত গ্রাহ্য না করিয়া আপন ইচ্ছামত সকল কার্য্য করিতেন। সেই জন্য অনেকে তাঁহার শত্রু ছিল। প্রধান অমাত্য বাগভট্টের ছোট ভাই আরভট্টকে পূর্ব্বরাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আরভট্ট কুমারপালকে ত্যাগ করিয়া অর্ণোরাজের কাছে চলিয়া গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে গুজরাট আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে রাণীর উক্ত ঘটনা হইল। কুমারপাল ভগিনীর কথা শুনিয়াই অজমীর আক্রমণ করিলেন। আরভট্ট অর্থ দ্বারা কুমারপালের অধিকাংশ সামন্তদের বশ করিয়াছিলেন। তাহারা যুদ্ধের সময়ে ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। আবুর রাজা বিক্রমসিংহ প্রমার কুমারপালকে ত্যাগ করিয়া অর্ণোর দলে প্রবেশ করিলেন। কুমারপাল সৈন্যের অবস্থা দেখিয়া প্রথমে চিন্তিত হইলেন; পরে আপনার হস্তীচালককে অর্ণোর হস্তীর কাছে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। দুই

রাজার হাতাহাতি আরম্ভ হইল। 'এই সময়ে আরভট্ট আপনার হাতী' হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কুমারপালের হাতীতে আসিবার চেষ্টা করিলে, মাহুতের ইঙ্গিতে হাতী সরিয়া গেল, আরভট্ট নীচে পড়িয়া গেলেন ও আবার উঠিবার পূর্ব্বেই শিক্ষিত হস্তীর পদতলে মর্দ্দিত হইলেন। কুমারপাল অর্ণোকে আহত করিয়া বন্দী করিলেন। অতএব যুদ্ধে কুমারপালের জয় হইল। অর্ণো আপনার ভগিনী জহ্লনা কুমারপালকে দান করিয়া মুক্তি পাইলেন। চোহানদের ইতিহাসে এ পরাজয়ের কথা নাই; কিন্তু গুজরাটের নানা পুস্তকে আছে। ইহা ছাড়া চিতোরের কেল্লার মধ্যে সমিদ্ধেশ্বরের মন্দিরগাত্রে একটি লেখ আছে, তাহাতে লেখা আছে, "গুজরাটের সোলঙ্কী কুমারপাল শাকম্ভরীর (sambhar) রাজাকে জয় ও সপাদলক্ষ দেশ (১) [চোহান দেশ] মর্দ্দন করিয়া প্রত্যাগমনের সময়ে শালীপুর গ্রামে আপনার সেনা ত্যাগ করিয়া একাকী চিত্রকূটের [চিতোর] শোভা দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছামত ১২০৭ সম্বতে এই লেখ লেখা হইল।" কুমারপাল বিক্রমসিংহকে বন্দী করিয়া বিক্রমের বড় ভাই রামদেবের পুত্র যশোধবলকে রাজ্যে অভিষিক্ত (২) করিলেন। আবুর কাছে অজারী গ্রামে ১২০২ সম্বতের (১১৪৫ খৃঃ) একটি লেখ আছে, তাহাতে প্রমার-বংশোদ্ভব মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীযশোধবল রাজ্যে শব্দ আছে। অতএব বিক্রমের সিংহাসনচ্যুতি ও যশোধবলের রাজ্যপ্রাপ্তি ১১৪৫ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

সিরোহী রাজ্যের সীমান্তে কায়দ্রা গ্রামের উপকণ্ঠে কাশী-বিশ্বেশ্বরের মন্দিরগাত্রে ১২২০ সম্বৎ (১১৬৩ খৃঃ) লিখিত এক শিলালেখ আছে, তাহাতে "যশোধবলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধারাবর্ষ" শব্দ আছে। ইনি ধারপমার নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাজ-উল-মআসীর বলেন, হিজরী ৫৯৩ (১১৯৭ খৃঃ) খুসরো অনহলবরার রাজাকে আক্রমণ করিলেন। তখন আবুর কাছে রায়কর্ণ ও ধারাবর্ষ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে ধারাবর্ষ জীবিত ছিলেন।

ফরিস্তা বলেন, ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মুলতানের পথে অনহলবারা আক্রমণ করিলেন। তখন সেখানকার রাজা ভীমদেব বালক মাত্র, তাঁহার সেনাপতিদের কাছে পরাজিত হইয়া সুলতানকে ফিরিতে হইয়াছিল। অতএব ১১৭১ বা ১১৬০ খৃষ্টাব্দে ভীম শিশু ছিলেন বা তাঁহার জন্ম হয় নাই। অর্থাৎ ১১৪৫ যশোধবল রাজা ছিলেন। ১১৬৩ যশোধবলের পুত্র ধারাবর্ষ রাজা ছিলেন ও ১১৯৭ পর্য্যন্ত ধারা জীবিত ছিলেন।

সোমেশ্বরের সহিত ভীমের যুদ্ধ, সোমেশ্বরের পরাজয় ও মৃত্যু, পরে পৃথ্বীর আক্রমণ, ভীমের মৃত্যু, এ সকল কেবল রাসোতেই আছে। গুজরাটের ঐতিহাসিকেরা ভীমের এত বড় জয়ের কথা (সোমেশ্বর বধ) মোটেই লেখেন নাই। পৃথ্বীর আক্রমণে ভীমের মৃত্যু অসম্ভব; কেন না, ইতিহাসে ভীম ১১৭৮ হইতে ১২৪১ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছেন।

অতএব সলম, জেত, মন্দোদরী, ইচ্ছিনী ইত্যাদি রাসোর সকল নায়ক-নায়িকাগুলিই কল্পিত। ভীমদেব ছাড়া অন্য নামগুলিও ঐতিহাসিক নহে।

৩। সমুদ্র শিখরগড় বঙ্গদেশ ছাড়া আর কোথায়ও হইতে পারে না; অথচ ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন, বঙ্গদেশে যাদব বংশীয় বিজয়পাল রাজা ১১৭২ বা তাহার পূর্ব্বে বা পরে ছিলেন না।

৪। দাক্ষিণাত্যে কল্যাণীতে ৩) সোলঙ্কীদের রাজা ছিল। তাহাদের পতনের পর ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে দেব

১। চোহানদের বিস্তৃত রাজ্যে সওয়ালক্ষ গ্রাম ছিল বলিয়া তাহাকে "সওয়ালখদেশ" বলিত। ক্রমে সংস্কৃত ভাবাপন্ন হইয়া "সপাদলক্ষ দেশ" হইয়াছে।

২। আবু পাহাড়ে অচলেশ্বর মন্দিরগাত্রের লেখ ও বস্তুপালের জৈনমন্দিরের ১২৮৭ সম্বৎ প্রশস্তি।

৩। এ কল্যাণী বঙ্গের কাছে কল্যাণী জংসন নহে। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সীমামধ্যে কল্যাণী এখনও একটী বড় নগর। একজন সামন্ত বা জায়গীরদার সেখানে থাকেন। কল্যাণীর দুর্গ প্রসিদ্ধ।

গিরিতে(৪) যাদবদের অধিকার হইল। ত্রয়োদশ শতকে যাদবেরা দেবগিরিতে পূর্ণ গৌরবে রাজ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ঘটনা ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার; তখন দেবগিরিতে রাজা ছিল না, যাদব ভানু বা শশিবৃতা জন্মায় নাই।

৫। মালবদেশে প্রমারদের বহু প্রাচীন রাজ্য। এককালে বিক্রমাদিত্য ও ভোজ এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া তাঁহারা গুজরাটের সোলঙ্কীদের সামন্ত হইয়া পড়িলেন। মালবের যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র জয়বর্ম্মা ও অজয়বর্ম্মা দুই শাখা হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের দুই বংশের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। পৃথ্বীর (১১৯২খৃঃ) নিধনের পর চোহানদেশের মণ্ডনকর (আধুনিক মেবার রাজ্যে মাঁডলগড়)-বাসী আশাধর নামক কবি মালবে পলাইয়া আসেন ও সে কালের সান্ধিবিগ্রহিক (Foreign minister) কবি বিল্হনের বন্ধুত্ব লাভ করেন। তিনি সবিস্তার বর্ণনা লিখিয়াছেন। প্রথম শাখায় জয়বর্ম্মার পুত্র লক্ষ্মীবর্ম্মার দানপত্র (১১৪৩খৃঃ) পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহার পিতা যশোবর্ম্মার ১১৩৪ খৃষ্টাব্দের দান স্বীকৃত হইয়াছে। লক্ষ্মী বর্ম্মার পুত্র হরিশচন্দ্রের ১১৭৯ খৃষ্টাব্দের দানপত্র ও হরিশচন্দ্রের পুত্র উদয়বর্ম্মার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। অন্য শাখার অজয়বর্ম্মার পুত্র বিন্ধ্যবর্ম্মার সময়ে আশাধর আসিয়াছিলেন। বিন্ধ্যর পুত্র সুভটবর্ম্মা ১২১০ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। অতএব রাসোর ভীমদেব, যাদব রায় ও ইন্দ্রাবতী আকাশকুসুম মাত্র।

৬। পৃথ্বীর সময়ে রণথম্ব ভিন্ন রাজ্য ছিল না। অজমীর অধিকারে সামান্য দুর্গ মাত্র ছিল। পৃথ্বীর মৃত্যুর পর (হাম্মীর মহাকাব্য মতে) পৃথ্বীর পুত্র গোবিন্দরাজ রণথম্বে বাস করিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল রাজাদের তিনটি প্রধান নগর ছিল। পূর্ব্বে কালিঞ্জর, মধ্যে মহোবা, পশ্চিমে চন্দেরী। এই তিনটিই পরমাল চন্দেলের ছিল। ১২৩৯ সম্বৎ (১১৮২ খৃঃ) [মদনপুরের লেখ মতে] পৃথ্বী মহোবা পর্য্যন্ত পশ্চিম অংশ জয় করিয়াছিলেন। অতএব এই সময়েই চন্দেরীতে পৃথ্বীর থানা বসিল, তাহার পূর্ব্বে পরমালের থানাদার বা কেল্লাদার থাকিত। সেখানে রাজা ছিল না, অতএব রাজকন্যাও ছিল না। হংসাবতী কাল্পনিক নাম মাত্র।

৭। মুসলমান ঐতিহাসিক মতে লাহোর মহমুদ গজনবীর বংশের ছিল। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে ঘোরী মামুদের শেষ বংশধর খুসরো মল্লিককে তাড়াইয়া আপনার অধিকার স্থাপন করেন; অর্থাৎ মহমুদ গজনবীর সময় হইতে পৃথ্বীর মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও হিন্দুদের অধিকার হয় নাই।

৮। রাসো মতে কুন্তা ১১৯০ বা তৎপূর্ব্বে বিদরের মুসলমান রাজার সহচর হইয়াছিলেন। কিন্তু ১২৯৪ অব্দের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান মোটে যায় নাই। ১৩১০ দেবগিরি হয়। ১৩৪৭ দক্ষিণের মুসলমান সামন্তরা কুলবর্গাতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৪২৫এর কাছাকাছি নূতন নগর বিদর স্থাপিত হইয়া সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৪২২ এর পূর্ব্বে বিদর নামও ছিল না।

৯। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা কোন কোন পরাজয়ের কথা লুকাইয়াছেন বটে, কিন্তু ঘোরীর মত প্রবল শত্রুকে ১৭ বার বন্দী করিয়া কেহ ছাড়িয়া দিতে পারে, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না। ১১৯১ সালের ঘোরীর পরাজয়ের কথা তবকাত-ই-নাসিরীতে আছে, কিন্তু রাসোতে নাই।

১০। রাসোর এ বর্ণনা সত্য হইতে পারে না। রাসোর সকল প্রধান ঘটনাগুলিই কল্পিত প্রমাণিত হইল। রাসোতে অনেকগুলি জন্ম সময়ের ঠিকুজি আছে। সেগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, লেখক সামান্য জ্যোতিষও জানেন না। রাসোর সনগুলি কল্পিত, যাহা-হউক একটা লেখা হইয়াছে মাত্র।

৪। আওরঙ্গাবাদের কাছে আধুনিক দৌলতাবাদ। যাদবদের কেল্লা এখনও দেখিবার মত জিনিষ।

১১। পৃথ্বীরাজ বিজয়, হাম্মীর মহাকাব্য ও রাজপুতানায় অন্যান্য দেশের গ্রন্থে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ পাওয়া যায় না। কোনও হিন্দু রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে মুসলমানদের ডাকে নাই। অবশ্য হিন্দু রাজাদের মধ্যে এতটা একতা ও দেশপ্রীতি ছিল না যে, সকলে মিলিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিত। সেরূপ করিলে হয় ত ভারতের ইতিহাস অন্য প্রকার হইত। রাসোতে যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন সামন্তদের মন্ত্রণা-সভাতে তর্ক হইয়াছে, সে তর্ক পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ের ক্ষত্রিয়ের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল—যুদ্ধে দেহ পাত করিতে পারিলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ হইবে। ইহা অপেক্ষা আর কি শুভ হইতে পারে? পরে দেশের কি দশা হইবে, সে কথা কেহ চিন্তা করিত না।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

মিলন-পথে

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দদাসের স্ত্রী রাসমণি দাওয়ায় বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল, কাছে বসিয়া মেয়ে মাধবী মায়ের সাহায্য করিতে করিতে তাহাদের আঙ্গিনা ঘেঁসিয়া যে গ্রাম্য পথটি চলিয়া গিয়াছে, উৎসুক নেত্রে তাহারই পানে তাকাইতেছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে! অশোক দা, কোথা যাচ্ছ ভাই? দাঁড়াও, শোন, শোন।"

সম্বোধিতের উত্তর আসা পর্য্যন্ত মাধবী অপেক্ষা করিতে পারিল না, সোৎসাহে, সোল্লাসে ত্রস্ত পদে নামিয়া উঠানের ধারের পথটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধবী যাহাকে সম্বোধন করিয়াছিল, সে এক তরুণ যুবা; সুন্দর, দীর্ঘ বলিষ্ঠ গঠন। খালি গায়, খালি পায় গ্রামলগ্ন মহকুমা মোহনগঞ্জে যাইতেছিল। মাধবীর আহ্বান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবি, বল।"

মাধবী সূচে সূতা পরাইতে পরাইতে বলিল, "কোথা যাচ্ছ? মোহনগঞ্জে?"

"হাঁ, কেনরে?"

"কিছু ফরমাস আছে গো।"

"কি ফরমাস? বর? মাসী তো তোর বিয়ের জন্যে ভারি ব্যস্ত।"

মাধবী মুখখানি নীচু করিল। তাহার পুরন্ত কপোল-দু'টি একটুখানি লাল হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পর সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "ভদ্দর লোকের মেয়েদের বরই বাজারের জিনিসের মত দর-কষাকষি ক'রে কিনে আনতে হয়, আমাদের মত ছোট জাতের নয়। ও-বলে ঠাট্টা করতে লজ্জা করে না তোমার?"

"তুই কি ঝগড়া করবার জন্যে আমাকে ডেকেছিস্? তা' হ'লে সেটা এখন মুলতুবী থাক্, পরে হবে।"

"কেন, সময় নেই নাকি? মস্ত বড় কর্ম্মী পুরুষ!"

"তা নয়তো কি? সত্যি, মাধু, কাযে যাচ্ছি।"

"সত্যি, আমার ফরমাস আছে। শুনবে না?"

"তবে দাঁড়িয়ে আছি কি জন্যে? কি আনতে হবেরে?"

"আমার জন্যে নয়।"

"সে আমি জানি গো। মানুষের নামের জন্যে আমি ব্যস্ত হই না, জিনিসের নামটা জানতে পারলে বেঁচে যাই।"

"একটু দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই! না, আমি বলবো না; তুমি যাও।"

"না মাধবি, তুই দিন দিন বড় ছেলে মানুষ হচ্ছিস। কথায় কথায় রাগ! শীগ্‌গির বল্ মাধু, সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে ফির্‌তে হবে।"

"বিপিন খুড়োর ছোট ছেলেটার জন্যে একটা জামা আন্‌তে হবে। তার জ্বর, গায় দেবার কিছু নেই। আন্‌তে ভুলে যেও না, ভারি গরিব ওরা।"

"না, ভুলব না" বলিয়াই অশোক সহরের দিকে চলিয়া গেল। মাধবী হৃষ্ট মনে দাওয়ায় ফিরিয়া আসিল। রাসমণি ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে মেয়ের পানে চাহিয়া বলিল, "তোর কি আক্কেল মাধি?"

বিস্মিত ও শঙ্কিত কণ্ঠে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, কি করেছি আমি?"

তেমনি ভ্রূকুটি করিয়া রাসমণি বলিল, "কি করেছি আমি! কোন্ আক্কেলে তুই এখনো অশোককে 'তুমি' বলিস্? সে ভদ্দর লোক, বড় লোক। তুই এখনো কচি খুকীটি আছিস্?"

মাধবী মুখ নত করিয়া লজ্জা-জড়িত মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কি জানি মা, ওঁকে 'আপনি' বল্‌তে মুখে বেধে যায়।"

রাসমণি তীব্র তিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি রাজরাণী কি না, যাচ্ছে-তাই বল্‌বে? বেহায়া কোথাকার!"

দাওয়ার একধারে বসিয়া গোবিন্দ দা লইয়া তামাক কুচাইতেছিল। সে মেয়ের সজল চক্ষু'টি দেখিয়া বলিল, "আহা, কেন ওকে গাল দিচ্ছ তুমি? ছেলে বেলার অভ্যেস ফেরান কষ্ট। আর অশোক ওকে ছোট বোনের মতই ভালবাসে। 'তুমি' বলায় সে ককখনো রাগ করে না তো।"

রাসমণি গলা এবার আরও চড়াইয়া ঝঙ্কার দিয়া, বলিয়া উঠিল, "হয়েছে, থাম এখন। ঐ রকম দরদ দেখিয়েই তো মেয়ের মাথাটি চিবিয়ে চিবিয়ে খেলে।" গোবিন্দ সভয়ে চুপ করিয়া গেল।

অশোককে 'তুমি' ছাড়িয়া এখন 'আপনি' বলা যে কতখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা মাধবীর মত আর কেহই জানে না। সামাজিক সম্মানের হিসাবে অমৃতলাল রায়ের ছেলে অশোক যে বৈষ্ণব গোবিন্দ দাসের চেয়ে অনেক উচ্চে অবস্থিত, তাহা সকলে বিনাতর্কে স্বীকার করিয়া লইবে। কিন্তু সেই সম্মানের হিসাবটাকে মাধবী এখনও মনের মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই না-পারাটা কত বড় অন্যায়, তাহা সে মায়ের মুখে অহরহ শুনিয়া আসিতেছে।

অমৃতলাল যখন জমিদারের ঘরের দুলাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তখন চঞ্চলা কমলা তাঁহার কমলাসন পাতিয়া অচলা হইয়াই সেখানে বসিয়াছিলেন। তখন জমিদারের অতিথি-শালায় কত অতিথি যে সাদরে গৃহীত হইয়া আহার ও আশ্রয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইত, তাহা গণনা করা যায় না। প্রত্যহ সমারোহ ও ভক্তির সহিত প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা হইত। দুর্গোৎসবের সময়ে গ্রামস্থ সকল দরিদ্র জমিদার-দত্ত নূতন কাপড় পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিত এবং শত শত কৃতজ্ঞ কণ্ঠে দাতার জন্য কল্যাণ-কামনা করিত। জমিদার বাড়ীর কোন পুত্রকন্যার বিবাহের কথা হইয়া গেলে, দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে গ্রামের ইতর ভদ্রলোক ভুরিভোজন এবং যাত্রাশ্রবণের আশায় উল্লসিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিত। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আশাতীত 'বিদায়' পাইয়া জমিদারকে 'মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম' আখ্যায় অভিহিত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করা অনাবশ্যক মনে করিতেন। সেদিন এখন আর নাই। অমৃতলালের জীবদ্দশাতেই অচলা কমলা সচলা হইয়া উঠিলেন। বৃহৎ জমিদার পরিবার পৃথক্ হইয়া গেল। জ্ঞাতিবিরোধ প্রাচীন জমিদার-বংশকে অনেকখানি অবনত করিয়া দিল। পৃথক্ হইয়া অমৃতলাল দেখিলেন, লক্ষ্মীর প্রসাদকণা তাঁহার ভাগ্যে যাহা মিলিয়াছে, তাহা পূর্ব্বের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য হইলেও পল্লীবাসী ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে একান্ত তুচ্ছ নহে। বুদ্ধিমানের মত চলিতে পারিলে, পরের দাসত্ব না করিলেও চলিবে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের কথা মনে পড়ায় তাঁহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল। তাঁহার

কোন কোন জ্ঞাতি বাহিরে আপনাকে খাটো করিতে না পারিয়া ঋণ-জালের মধ্যে এতটুকু হইয়া গেল। পূর্ব্বের অভ্যাস ছাড়িতে যাইয়া অমৃতলাল আহত ব্যথিত হইয়াও বুদ্ধিমানের মতই চলিতে লাগিলেন। এই জন্য অন্যের কাছে হোক না হোক, জ্ঞাতিদের কাছে তিনি নিন্দিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সে নিন্দা অগ্রাহ্য করার মত মানসিক তেজ তাঁহার মধ্যে ছিল।

গোবিন্দ দাস কোন এক সময়ে অমৃতলালের বড় একটা উপকার করিয়াছিল। সেই ছোট লোকের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। বালিকা মাধবীকে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী সন্তানের মত আদর ও স্নেহ করিতেন। তাঁহার পুত্র অশোক ও কন্যা উমা রাসমণিকে বলিত, 'মাসী'; কিন্তু মাধবী অশোকের মাকে বলিত, 'মা'। তিনি বলিতেন যে, মাধবীর সুন্দর মুখের 'মা' ডাক তাঁহার খুব মিষ্ট লাগে। 'মা' না বলিলে তিনি রাগ করিতেন। উমা মাধবীকে ক্রীড়াসঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিল। এই দুইটি বালিকা দিনের মধ্যে হাজার বার ঝগড়া করিত এবং হাজারবার ভাব করিত। তুমুল ঝগড়ার পরে তাহারা অনেক সময়েই অশোককে মধ্যস্থ মানিত। অশোক গম্ভীর ভাবে যুগপৎ দুইজনের অভিযোগ শুনিয়া বিচার করিতে বসিয়া যাইত এবং অধিকাংশ সময়েই ভাল মীমাংসা করিতে না পারিয়া বাদী প্রতিবাদী দুই জনের পিঠে দুম্ করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। মার খাইয়া দুইজনে খানিকটা কাঁদিয়া অমৃতলালের কাছে নালিস করিবে বলিয়া অবিলম্বে সন্ধি করিয়া ফেলিত।

যথাসময়ে পাঠশালায় উমাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। অমৃতলালের বহির্ব্বাটীর একটা ঘরেই পাঠশালা বসিত। মাধবীও বায়না ধরিল, "মা, আমিও উমাদি'র সঙ্গে পড়্‌ব।"

রাসমণি ধমকাইয়া উঠিল, "হাঁ, মেয়ে আমার পণ্ডিত হবে! তোর লেখাপড়ায় কায কিরে? আর বাবুর বাড়ী যেয়ে ধিঙ্গিপানা কর্‌তে হবে না, এখন ঘরের কায শেখ্।" সাতবছরের মেয়ে জননীর উপদেশের মূল্য বুঝিতে পারিল না। পাঠশালায় উমার কাছে থাকিতে পাইবে না বলিয়া গোঁ ধরিয়া বসিয়া রহিল। পাঠশালার ছুটির পরে উমা ছুটিয়া আসিয়া মাধবীর হাত ধরিয়া বলিল, "তুই আজ আমাদের বাড়ী যাস্‌নি কেন?"

মাধবী হাতের উল্‌টা পিঠে পতনোন্মুখ অশ্রু চাপিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কোনমতে বলিল, "মা বারণ ক'রেছে।"

"ইস্, বারণ ক'রেছে" বলিয়াই উমা হিড় হিড় করিয়া মাধবীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তখন অশোক বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পেয়ারা সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। উমা ও মাধবী সেখানে উপস্থিত হইলে সে মাধবীকে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই মাধবী "মা আমাকে উমাদের সঙ্গে পড়্‌তে দেবে না" বলিয়াই ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অশোক নিজে মারধর করিয়া অনেক সময়ে মাধবীকে কাঁদাইত বটে, কিন্তু অন্য কারণে সে তাহার কান্না সহ্য করিতে পারিত না। ভিতরে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াও বাহিরে বিজ্ঞতার ভান করিয়া বারোবছরের অশোক বয়স্ক-বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া একটুখানি হাসিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিল, "এই কথা! তার জন্যে কান্না কেন?"

তার পর একটু ভাবিয়া বলিল, "তুই যে আমার নামে বাবার কাছে নালিস করিস্, নইলে আমার জল-খাবারের পয়সা দিয়ে তোকে বর্ণপরিচয় কিনে দিতাম।"

মাধবী সকাতরে জানাইল, আর সে তেমন কায করিবে না। পরে অশোকের মা উমার কাছে সব শুনিয়া পরদিনই মাধবীকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মাধবী সকাল বৈকাল পাঠশালায় এবং বাকি সময় অশোক ও উমার সঙ্গে খেলিয়া কাটাইতে লাগিল। বৈষ্ণবের মেয়ের এইরূপ অবস্থায় এবং ব্যবস্থায় রাসমণি রীতিমত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। রায়গৃহিণীর কথার উপর মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও, মাধবীর অবস্থান্তর ঘটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

রাসমণির বাঞ্ছিত অবস্থান্তর ঘটিতে খুব বেশী বিলম্ব হইল না। আটবছর বয়সে মাধবী চব্বিশ বছর বয়সের

বরের সঙ্গে একদিন উচ্চরবে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। সেদিন উমাও কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল এবং অশোকের অকারণ উৎপাত ও অদ্ভুত বায়নায় চাকর ঝি হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ত্রী পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। দুইতিন দিন পরে মাধবী ফিরিয়া আসিয়া উমার সঙ্গে খেলিতে গেল। উমা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বর কেমন রে?"

মাধবী অম্লান মুখে জবাব দিল, "একটুও ভাল নয়। অশোকদা' যদি আমার বর হ'ত, তো কি মজাই হ'ত! তিনজনে মিলে সব সময়ে খেলা করতাম।" উমার বয়স দশ বছর, সামাজিক রীতিনীতির একটা অস্পষ্ট ধারণা তাহার ছিল। সে হাসিয়া বলিল, "দূর! তাকি হ'তে পারে?"

কেন যে হইতে পারে না, মাধবী তাহা বুঝিল না; কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "উমাদি', তোকেও কি বরের বাড়ী যেতে হবে ভাই?"

উমা গম্ভীর মুখে চুপি চুপি বলিল, "একদিন যেতে হবেই তো; তবে আজ কাল নয়।"

মাধবী বলিল, "তুমি যাও যাবে, আমি তো আর যাচ্ছিনে বরের বাড়ী।"

সত্যই তাহাকে আর বরের বাড়ী যাইতে হইল না। এক অদৃশ্য হস্তের পরোয়ানা—তাহাকে খেলিবার অখণ্ড অবকাশ দিয়া—তাহার বরকে এক অজানা দেশে লইয়া গেল; বর আর ফিরিয়া আসিল না। রাসমণি কান্নাকাটি করিত, তাই মাধবী এখন আরও অধিক সময় অশোক ও উমার সঙ্গে কাটাইতে লাগিল। এমনই করিয়া বছর-তিনেক গেলে, অশোক কলেজে পড়িতে কলিকাতায় গেল এবং উমার বিবাহ হইল। অমৃতলালের পত্নীর কাছে এখন অনেক সময়েই মাধবীকে থাকিতে হইত। জমীদারের বাড়ীর প্রত্যেক স্থান প্রত্যেক কক্ষে চিরকালই তাহার গতি অবাধ এবং যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল, এখন তাহা আরও বাড়িয়া গেল।

সঙ্গীত-বিশারদ অমৃতলাল স্বয়ং উমা ও মাধবীকে গান বাদ্য শিখাইতেন। মাধবীর শিক্ষায় উৎসাহ, সাফল্য শিক্ষককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া দিল। অমৃতলাল উমা ও মাধবীকে একই ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাতে গোবিন্দদাস আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় একেবারে আর্দ্র হইয়া গেল, কিন্তু রাসমণি মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল। মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তবে তাহার একটুখানি সান্ত্বনা ছিল যে, মাধবীর প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার অমৃতলালই বহন করিতেন। তাহার পর হঠাৎ একদিন সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। যেন বিশেষ পরামর্শ করিয়াই অমৃতলাল সস্ত্রীক লোকান্তরে যাত্রা করিলেন।

অমৃতলালের মৃত্যুর পর পূর্ণ দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার গৃহে মাধবীর অবস্থানের সময় এবং যাতায়াতও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু মাধবী যে আশৈশব একই স্নেহাদরে একই ভাবে অশোক ও উমার সঙ্গে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা সে ভুলিতে পারে নাই; কখনও পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। এতদিনের সঙ্গ, শিক্ষা, অভ্যাস, রাসমণির ধমকে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়া ঠিক বিশালী নদীর উপরে। আজ শ্রাবণের শুক্লা একাদশী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হিন্দোল বা ঝুলনযাত্রা আরম্ভ। আখড়া, উৎসবের উল্লাস-চাঞ্চল্যে ভরপুর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুন্দর সুসজ্জিত আলোকিত মন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে দোলনায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত। দোলনাখানি বহুমূল্য বস্ত্রে মণ্ডিত এবং অপূর্ব্ব পুষ্পাভরণ ভূষিত। বিগ্রহের অঙ্গেও আজ উৎসব-সজ্জা। ভক্তেরা নিজেদের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া পুষ্পে, স্বর্ণালঙ্কারে সযত্নে সাগ্রহে বিগ্রহের প্রিয় অঙ্গ সাজাইয়া রাখিয়াছে। মন্দিরের কাচাবরণের মধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোক বিগ্রহের সুন্দর প্রসন্ন মুখের উপর ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। আজ যেন সেই দুইজোড়া বাঁকা চোখে নিখিলের নরনারীর একাগ্র,

আকুল, সর্ব্বগ্রাসী প্রেম মূর্ত্ত হইয়া ভক্তের কাছে ধরা দিয়াছে।

দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ঠাকুরের ঝুলন দর্শন করিতে আসিতেছে, যাইতেছে। পুরুষেরা নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া মুক্ত দ্বারপথে ঠাকুর দর্শন করিতেছে, মহিলারা মন্দিরের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালক-বালিকারা সকলেই বিগ্রহের দোলনা দোলাইবার জন্য সমান আগ্রহ-যুক্ত হওয়ায় একটা কোলাহল ও হুটাপুটি লাগিয়া গিয়াছে। এক সঙ্গে পাঁচ সাতটি মিলিত হইয়া দোলনার রজ্জু ধরিয়া টানিতেছে। টানের সঙ্গে সঙ্গে রজ্জুগ্রথিত পিতলের ঘুমুরগুলি ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। ঘুমুরের সেই মিষ্ট কোমল বাজনার সঙ্গে কাঁসরের ধ্বনি ঠিক খাপ না খাইলেও, তাহাতে ভক্তদের ভক্তির বা শিশুদের আনন্দের কিছুমাত্র হ্রাস হইতেছে না। স্ত্রী-পুরুষের প্রণাম এবং প্রণামী সমানভাবেই বিগ্রহের আসনতলে পড়িতেছে এবং প্রণামীটা পূজারী অতি সাবধানে কুড়াইয়া লইতেছেন, আর শিশুরাও তেমনই আগ্রহে ঠেলাঠেলি করিয়া দোলনার দড়ি ধরিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছে।

সেই অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আখড়ার অন্যান্য বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সঙ্গে মাধবীও মন্দির-সজ্জা লইয়া ব্যাপৃত ছিল। দর্শকের ভিড় জমিতে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িয়া নদীর ঘাটে আসিয়া বসিল। গোবিন্দদাস ও রাসমণিও ঝুলন দেখিতে আসিয়াছিল এবং শীঘ্র তাহাদের বাড়ী ফিরিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়াই মাধবী নদীর ঘাটে আসিয়া বসিল। নদীর বিস্তারে 'বিশালী' নামের বিশেষ কোন সার্থকতা না থাকিলেও বর্ষায় নদী কূলে কূলে পূর্ণ এবং উচ্ছ্বসিত। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভারি এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ প্রায় পরিষ্কার হইয়া গেলেও একেবারে মেঘলেশ-শূন্য নহে। কতকগুলা ছিন্নমেঘ আকাশে এদিক ওদিক আনাগোনা করিতেছিল। মাঝে মাঝে মেঘের টুকরাগুলি শিশুর মত লঘু গতিতে চাঁদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, আবার তেমন করিয়াই সরিয়া যাইতেছিল। মেঘের অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের শুভ্র উজ্জ্বল আলোকে নদীর ঢেউ এবং নদীতীরের গাছপালার সবুজ পাতায় জলকণাগুলি ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে ঢেউ আসিয়া মাধবীর পদতল স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল। ঘাটের কাছেই একটা হাস্নাহেনার ঝাড়ে ফুল ফুটিয়াছিল। সেই শোভাহীন ফুলের মধুর গন্ধ গায়ে মাখিয়া বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল। সুরভি বাতাস, নদীতরঙ্গের স্নিগ্ধ স্পর্শ এবং আলো আঁধারের অপরূপ লীলা মাধবীকে অনেকক্ষণ মুগ্ধ ও স্তব্ধ করিয়া রাখিল।

"ভাল মেয়ে যা হোক! আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান্, আর তুই এখানে এসে চুপটি ক'রে ব'সে আছিস্?"

হঠাৎ চমকিয়া মাধবী ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, হরিপ্রিয়ার রুষ্ট মূর্ত্তি। ইনি আখড়ার মোহান্ত বা অধিকারীর সেবাদাসী। কাযেই আখড়ায় এবং মোহান্তের শিষ্য মধ্যে ইঁহার মর্য্যাদা এবং প্রতাপের অন্ত নাই। স্বয়ং হরিপ্রিয়াকে আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ের স্বরে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন খুঁজছেন আমায়?"

রুক্ষ কণ্ঠে জবাব আসিল, "আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কেন! শীগ্‌গির চ'লে আয়।"

মাধবী নিঃশব্দে দ্রুতপদে হরিপ্রিয়ার অনুসরণ করিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মন্দিরে আর ভিড় নাই। মন্দিরের মধ্যে শুধু এক বর্ষীয়সী মহিলা পশমের আসনের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে মূল্যবান গরদ, হাতে হরিনামের ঝুলি, কণ্ঠে তুলসীর মালা, নাকে তিলক। নাটমন্দিরের মধ্যে পরিষ্কৃত ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া আর একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। পরণে জরিপাড় সূক্ষ্ম ঢাকাই ধুতি গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, তদুপরি সিল্কের চাদর। বুকে বহুমূল্য চেইন, হাতে দু'তিনটা আংটি। আংটির পাথরগুলি আলোকে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। তাঁহার নাকে তিলক বা হাতে হরিনামের ঝুলি নাই বটে, কিন্তু গলার তুলসীর সূক্ষ্মমালা-গাছি তাঁহার বৈষ্ণবত্বের প্রমাণ দিতেছিল। বাবুটির কাছে মোহান্ত

বিনীত ভাবে বসিয়া ছিলেন। হরিপ্রিয়া অন্দরের পথে চলিয়া গিয়াছিল। না জানিয়া আসিয়া লজ্জিতা মাধবীও চলিয়া যাইতেছিল। তাড়াতাড়ি মোহান্ত উঠিয়া আসিয়া মাধবীকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—বৃন্দাবন বাবু মস্ত ধনী। মোহনগঞ্জে ইঁহার কারবার আছে। কিছু দিনের জন্য তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে মা আছেন। তাঁহার মা অর্থাৎ মন্দিরে আসীনা বিধবাটি কাহার কাছে নাকি শুনিয়াছেন, মাধবী সুন্দর 'পদ' গাহিতে পারে। বৃন্দাবন বাবু ও তাঁহার মা মাধবীর গান শুনিবার জন্যই ভিড় কমা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আছেন। এই অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে গাহিতে হইবে! সর্ব্বনাশ! মাধবী ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া চাপা গলায় বলিল, "আমি তা পারব না।"

মোহান্ত মাধবীর স্বভাব জানিতেন। তিনি নিরুপায়ের মত ঠাকুর্দ্দার পানে চাহিলেন। ঠাকুর্দ্দা আখড়াবাসী জনৈক বৈষ্ণব। ইনি পল্লীর বালক বালিকা ও যুবক যুবতীর কাছে ঠাকুর্দ্দা নামেই পরিচিত। ইঁহার পিতৃমাতৃদত্ত নাম অনেকেই জানিত না। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া অত্যন্ত নরমসুরে সস্নেহে বলিলেন, "ছি, দিদি, বাবুর কাছে মোহান্ত বাবাজীকে অপ্রতিভ ক'রো না। একখানা গাও লক্ষীটি।"

উত্তরে মাধবী ফিস্ ফিস্ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে গাহিতে হইল। সে গাহিল,—

"বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান।
নটন বিলাস উলাস পুলক তনু,
একই শকতি দুঁহু একই পরাণ॥
একে নব কুঞ্জ, কুসুম অতি মনোহর,
ভ্রমর ভ্রমরীগণে গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ, নীপ পর হিমকর,
মদন দেব মোহন নটরাজ॥
বাজত বলয়, নূপুর মণি কিঙ্কিনী,
শ্যাম বামে রহু গোরী কিশোরী।
ভুজ দুঁহু দুঁহুক কান্ধ পরে শোভই,
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী॥
মৃদু মধুরস্মিত মিলিত দৃগঞ্চল,
আনন্দে হেরি দুঁহু দুঁহুক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ সাগরে শুতল
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান॥"

এই সুশ্রী তরুণীর সুকণ্ঠ এবং বাজনার উপর অঙ্গুলির অবাধ গতির ললিত ছন্দ বৃন্দাবন বাবুকে বোধহয় খুব খুসীই করিল। তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে প্রশংসা করিয়া মোহান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে?"

মোহান্ত নম্র কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "এদের বাড়ী এই পাড়াতেই। এটি বোষ্টমের মেয়ে। এই যে এর বাপ গোবিন্দদাস।"

মেয়ের প্রশংসাই, বোধহয়, বাপকে নাটমন্দিরের এক কোণ হইতে ঈষৎ গর্ব্বের সহিত টানিয়া আনিয়া বৃন্দাবন বাবুর সম্মুখে হাজির করিয়া দিয়াছিল। বৃন্দাবন বাবু গোবিন্দদাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পকেটে হাত দিলেন। তার পর একটুখানি ভাবিয়া অঙ্গুলি হইতে একটি আংটি খুলিয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া মাধবীকে বলিলেন, "এটি নাও। মাঝে মাঝে ঠাকুর দর্শন করতে এসে তোমার গান শুনতে পাব ভেবে ভারি আহ্লাদ হচ্ছে।"

মাধবী তাহার আরক্ত মুখ নত করিয়াই রহিল। হাত বাড়াইবার কোন লক্ষণই দেখাইল না। সে হাত পাতিবে না জানিয়া মোহান্ত সসম্ভ্রমে আংটিটি লইয়া, মাধবীকে পরাইয়া দিলেন। বাবুটি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া মাকে লইয়া যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিয়া গেলে মোহান্ত বলিলেন, "মাধবী, তোর আক্কেল কি? আংটিটা হাত পেতে নিতে হয়, বাবুকে গড় কর্‌তে হয়।"

মাধবী কোন কথা কহিল না। কিন্তু হরিপ্রিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঢঙ্ দেখে আর বাঁচিনে! গাইতে পারেন ব'লে, মেয়ে কাউকে গ্রাহ্যিই করেন না। ওগো, আমরাও কখনো একটু আধটু গাইতে পার্‌তাম।"

তাহার অহেতুক উত্তাপ দেখিয়া মাধবী হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঘুম হইতে জাগিয়া মাধবী দেখিল, বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। উঠানের বকুল-গাছটার ঘন পল্লবে এবং তুলসী-মঞ্চের উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্যালোক হাসিতেছে। অনেকদিন পরে আজ পরিষ্কার নির্মেঘ প্রভাত। রাসমণি চিরদিনের অভ্যাস-মত এখনও বিছানায় পড়িয়া আছে। গোবিন্দদাস উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া দাওয়ায় বসিয়া টীকায় অগ্নিসংযোগ করিতে করিতে গুন্ গুন্ করিয়া কি গাহিতেছিল। মাধবী উঠিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইতেই গোবিন্দদাস স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এত বেলায় উঠিল যে মাধু? অসুখ করে নি তো মা?"

মাধবী লজ্জিত হাসিমুখে বলিল, "না বাবা, অসুখ করতে যাবে কেন? কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছিলাম কিনা। তুমি আমায় জাগাওনি কেন? দাও আমি তামাক সেজে দিচ্ছি।"

টীকাটি মেয়ের হাতে দিয়া গোবিন্দ বলিল, "আমি ভেবেছিলাম, অসুখ করেছে, তাই আর ডাকিনি।"

তামাক সাজিয়া হুঁকাটি পিতার হাতে দিয়া মাধবী সাজি লইয়া ফুল তুলিতে গেল। উঠানের একপাশে চাঁপা টগর ও একটা করবীর ফুলের গাছ। তাহারই পাশে কি একটা গাছ জড়াইয়া একটি পুষ্পিত মাধবী-লতা উঠিয়াছে। সে ফুল তুলিয়া, ফুলভরা সাজিটি দাওয়ায় রাখিয়া দিয়া ঘর নিকাইয়া বাসনগুলি মাজিয়া ধুইয়া আনিল। তা'র পর গাইগরু-দু'টি বাহির করিয়া গোহাল পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। রান্নাঘরের কাছে বাঁশ ও কঞ্চির দু'টি মাচার উপরে ঝিঙ্গা ও বরবটির গাছ। মাধবী সেই মাচা হইতে কিছু তরকারী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে রাখিয়া দিল। তৎক্ষণে রাসমণি উঠিয়া বার-কয়েক হাই তুলিয়া মুখের কাছে তুড়ি দিয়া, চোখ মুখ ধুইয়া পা ছড়াইয়া, বসিয়া, মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাঁরে মাধু, ফুল কিছু পেয়েছিস্, না রাখি সব নিয়ে গেছে? কতখানি বেলায় উঠেছিস বাপু।"

শুনিয়া গোবিন্দ হাসিয়া বলিল, "তুমি যে আজ এত সকালেই উঠে পড়্লে?"

রাসমণি ক্লান্ত স্বরে বলিল, "তোমার শরীল আগে আমার মত হোক্, তখন বুঝ্বে গো, বুঝ্বে।"

স্ত্রীর স্বাভাবিক ক্ষীণদেহের পানে চাহিয়া গোবিন্দ কৌতুক-স্মিতমুখে বলিল, "সকাল বেলা উঠেই গাল দিচ্ছ কেন? কবরেজ মশায় তো বল্লেন যে, তোমার রোগটা তিনি ধর্‌তে পাচ্ছেন না। কি যে অসাধ্যি বেয়াধি হলো তোমার!"

রাসমণির স্থির বিশ্বাস, সে চিররুগ্না। কিন্তু সে বিশ্বাসে গৃহের শৃঙ্খলা ও আরামের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে মাধবী। সে যেমন কর্ম্মপটু, তেমনি অনলস। রাসমণি স্বামীর পরিহাসকে নিঃশব্দে অগ্রাহ্য করিয়া তেলের বাটী ও মেয়ে চুল লইয়া বসিল। রাশীকৃত চুল, কাল বাঁধা হয় নাই; বাবেই খানকটা জোট পাকাইয়া গিয়াছিল। রাসমণি সেই জোটগুলি ছাড়াইয়া চুলে তৈল মাখাইয়া দিতে লাগিল।

মাধবীদের বাড়ীর কাছেই আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর, সুপারি, নারিকেলের বাগানে ঘেরা অশোকের দোতালা বাড়ী। এই বাড়ীর পুকুরের জল গ্রামের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাড়ার সকলেই সেই পুকুর হইতে জল লইত। মাধবী শুধু জল লইত না, সেখানে স্নানও করিত। আজও সে কলসী লইয়া সেই পুকুরে স্নান করিতে গেল। স্নান সারিয়া জল লইয়া উপরে উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, বাড়ীর মালিক কোথাও নাই। সে কলসী নামাইয়া রাখিয়া বারান্দায় গিয়া উঠিল। সেখানে চাকর বঙ্কু কি একটা কায করিতেছিল। মাধবী জিজ্ঞাসা করিল' "বঙ্কু, বাবু কোথায়?"

"তিনি তো এখনো ঘুমথেকে ওঠেন নি," বলিয়া বঙ্কু নিজের কাযে মন দিল।

"সে কি ! কেন ?" বলিতে বলিতে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মাধবী ত্রস্তপদে উপরে উঠিয়া গেল। সে অশোকের শয়নকক্ষের রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখনো শুয়ে কেন? ওঠনা। বেলা যে এক পহর হয়ে গেল।"

ঘর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সাড়া না পাইয়া মাধবী বুঝিল, আর হাজার বার ডাকিলেও সাড়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। অশোকের শয়নকক্ষের দরজায় প্রায় খিল দেওয়া হইত না। দরজায় ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল। মাধবী ঘরে ঢুকিয়া মশারির একধার তুলিয়া অশোকের পা ধরিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া কাতর স্বরে বলিল, "উঠে দেখ, আমার কি হয়েছে।"

শুনিয়া অশোক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হলো আবার?"

"সম্প্রতি তোমার শ্রীমুখ দর্শন" বলিয়া মাধবী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে সে কক্ষের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া মশারিটা তুলিয়া রাখিল। খোলা জানালা দিয়া সকাল বেলার স্নিগ্ধ আলো ও বাতাস ঘরে ঢুকিয়া মাধবীর হাসিমুখ খানির সঙ্গে মিলিয়া এমন এক গোলমাল বাধাইল যে, অশোক মাধবীকে যাহা বলিবে বলিয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার সব ওলোট পালট হইয়া গেল। সে একটা বেতের আসনে বসিয়া দুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে লাগিল। মাধবী এবার রাগিয়া বলিল, "আবার বস্‌লে যে বড়? মুখটুক ধুতে হবে না?"

অশোক বলিল, "না, হবে না। সকালবেলা মিছে কথা বলে দিনটাই মাটি করলে।"

অশোকের ইচ্ছা থাকিলেও তাহার কণ্ঠে ক্রোধ তেমন জমিল না। মাধবী হাসি চাপিয়া বলিল, "আমি কি করলাম, না তুমি করলে? সকালবেলা অমন হাঁড়িপানা মুখ করলে কক্‌খনো দিন ভাল যায় না। আজ আমায় কতবার বকুনি খেতে হয়, কতবার হোঁচট খেতে হয়, তার ঠিক নেই।"

"এলি কেন হাঁড়িমুখ দেখ্‌তে? আমি কি তোকে ডেকেছি?"

"তুমি কেন ডাক্‌তে যাবে আমায়? তুমি হ'লে বড় লোক, ভদ্দর লোক; আর আমরা হলেম গরিব, বোষ্টম। আমি কি তোমার ডাকার যুগ্যি? জলের জন্যে গরজ আমাকেই আস্‌তে হয়।"

বলিতে বলিতে মাধুরীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে মুখখানি ফিরাইয়া লইল। ফিরাইয়া লইলেও, তাহা যে ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে অশোকের তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। সে শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "মাধবী, কেন তুই এসব কথা ব'লে আমাকে জ্বালাতে এলি? আমি কি কখনো এসব কিছু বলেছি তোকে?"

মাধবী বলিল, "তুমি মুখে না বল্লেও তুমি যে ও-সব ভেবে থাক, সে আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি।"

অশোক হাসিয়া বলিল, "তা বৈ কি! কত বুদ্ধি তোর।"

"না, আমি বোকা কিনা! তুমি কেন রাগ করেছ, তাও আমি বল্‌তে পারি।"

"আমি রাগ করেছি কে বলেছে?"

"আমি। কাল বিকেলে আমি আস্‌তে পারিনি, তাই।"

"তুই না এলে আমার বয়েই যায় কি না।"

"বয়ে যায় কি না জানিনে; কিন্তু সাতটার মধ্যেও ওঠা হয় না, দরজা খোলা হয় না, মুখ ধোওয়া হয় না, সে আমি জানি।"

"আচ্ছা মাধু, কাল আসিস্‌নি কেন?"

"কাল যে ঝুলন আরম্ভ হয়েছে। আখড়ার কত কাষ করতে হলো।"

"আখড়াটা না থাক্‌লে হয়না মাধু?"

"কি ক'রে হবে বল? আমরা বোষ্টম।"

"তাইতো" বলিয়া অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আসনের পিঠে মাথাটা হেলাইয়া দিয়া চক্ষু বুজিবার উপক্রম করিতেই মাধবী বলিয়া উঠিল, "ওকি, আবার

চোক বুজলে কেন? নতুন হতাশার আবার কি হলো? আমরা যে বোষ্টম, তাতো জন্মাবধিই জানতে।"

মাধবীর পরিহাস-তরল কণ্ঠ অনেক সময়েই অশোককে বিদ্ধ করিত। কথা কাটাকাটি করিলে বেদনা বাড়িবে বৈ কমিবে না, জানিয়াই সে প্রাতঃ-কৃত্যাদি করিতে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাধবী একখানা রেকাবীতে কিছু ফল ছাড়াইয়া তাহার জন্য রাখিয়া, আঁচল দিয়া তাহার লেখাপড়ার টেবিলটা ঝাড়িয়া বই, কাগজ, কলম প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বন্ধুকে বলিতেছে, "কি যে অগোছাল তোমার বাবু। দেখ, ইংরেজি বইগুলো বাঙ্গালা বইয়ের আলমারীর মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে, বাঙ্গলা বইগুলো এ-দিক সে-দিক পড়ে আছে। কাচের ওপর কত যে ময়লা জমেছে। তুমিও তো ঝেড়ে ঝুড়ে আলমারীগুলো পরিস্কার রাখ্‌তে পার। পারিতো ও-বেলা এসে বইগুলো ঠিক ক'রে রেখে যাব।"

বন্ধু অপরাধীর মত নম্র স্বরে বলিল, "আজই আমি সব পরিষ্কার ক'রে রাখ্‌বো দিদি। তোমার শুধু বই-গুলো ঠিক ক'রে রাখ্‌লেই হবে। আমিতো বুঝে সুঝে তা' পারব না দিদি।"

কায করিতে করিতে হঠাৎ অশোকের প্রতি চোখ পড়িতেই মাধবী বলিয়া উঠিল, "এখনো দাঁড়িয়ে কেন? খাওনা। দেরী হলো কত, মা বক্‌বে না আমায়?"

পল্লীগ্রামে চা, বিস্কুট, টোষ্ট, ডিম প্রভৃতির বালাই বড় নাই। অশোক ফলের রেকাবীখানা টানিয়া লইয়া প্রাতর্ভোজন শেষ করিলে মাধবী তাহার জলভরা কলসীটি কক্ষে লইয়া চলিয়া গেল।

অশোক জানালায় যাইয়া মাধবীর গতির প্রতি অপলক দৃষ্টি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে আঁকা বাঁকা পথে বৃক্ষের অন্তরালে মাধবীর বিলীয়-মান দেহ আর দেখা গেল না। তবু অশোক তেমন করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত, সেই নিমেষহারা দৃষ্টির কোন অর্থ নাই। মানুষের চিত্ত যখন কোন চিন্তায় বা কল্পনায় একেবারে তলাইয়া যায়, তখনই তাহার দৃষ্টি এমন হয়। খানিক পরে সে শিশুর কলহাস্যে চকিত হইয়া দেখিল, মাধবীর পরিত্যক্ত পথখানির উপর দিয়া কোন তরুণী জননী তাহার শিশুকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে যাইতেছে। সে ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের প্রায় নির্জ্জন নিঃশব্দ গৃহের পানে চাহিল। এই নারীশূন্য, শিশুশূন্য গৃহ যেমনই শ্রীহীন, তেমনই আকর্ষণ-হীন। না আছে ইহার শৃঙ্খলা, না আছে ইহার সুখ দুঃখ; শান্তি,—শুধু অনাহত অবিরত শান্তি। কৈ, এখানে ত জীবনের চঞ্চল স্পন্দন অনুভূত হয় না। ঐ যে বৈষ্ণবের মেয়েটা মাধবী, সেও যতক্ষণ এই গৃহে ছিল, ততক্ষণ যেন তাহার হাস্যে, চপলতায়, অভিমানে, গাম্ভীর্য্যে গৃহ মুখর ও সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। নারীত্ব বুঝি প্রাণময়। নারীর স্পর্শ গৃহকে প্রাণের লীলায় স্পন্দিত করিয়া তোলে।

সে আশৈশব কত সসন্তান জননী দেখিয়া আসিতেছে এবং মাধবীকে এমনই ভাবে চিরকাল দেখিতেছে। তাহার অন্তরের তাহারই অজ্ঞাত এমন একটা রুদ্ধদ্বার এমন করিয়া ত কেহ কখনও স্পর্শ করে নাই। সে কল্পনার তুলি বুলাইয়া কত বিচিত্র রঙ্গিন ছবিই আঁকিয়া যাইতে লাগিল।

"দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা. বিনত ভুবন-বিজয়ী-নয়না" একটি তরুণী আসিয়া তাহার গৃহের অচল শান্তি সচল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার সঙ্গে আসিয়াছে প্রাণের লীলায়িত ধারা এবং অটুট কল্যাণশ্রী। অশোকের অবাধ স্বাধীনতা আর নাই। তাহার চলাফেরা, খাওয়া-শোওয়া, আচার ব্যবহার সব যেন সেই ক্ষুদ্র কর্ত্রীটির শাসনে নিয়মাধীন হইয়া গিয়াছে। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত পড়া বা তাস খেলা আর চলে না। সন্ধ্যার পরে বাহিরে থাকিলেই তাহার বিস্তৃত কৈফিয়ৎ দিতে হয়। দিনের বেলায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বারোটার সময়ে খাইতে আসিবার আর কোন উপায়ই নাই। মলিন পরিত্যক্ত জামা-কাপড়-গুলা আর স্তূপীকৃত

হইয়া আননায় পড়িয়া থাকিতে পার না। এই কর্ত্রীর শাসন এ টুখানি অমান্ত করিলেই, হয় মিষ্ট গলার মিষ্টতর গর্জ্জন, নয় দুইটি সজল ডাগর কালো চোখ তাহাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বস্তুও যেন তাহার বাবু অপেক্ষা তাহার ছোট্ট কর্ত্রীটিকেই বেশী ভয় করে। বধূ আসিয়াই রাঁধুনী বিধুঠাকুরাণীকে ছাড়াইয়া দিয়া স্বয়ং অন্নপূর্ণা হইয়া বসিয়াছে। অশোক কখন কখন রান্নাঘরে উঁকি দিয়া দেখে, রন্ধন-নিরতা বধূর সুগঠিত গৌর ললাটে চূর্ণ কুন্তলগুলি স্বেদ-বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। সে সাদরে তাহা সরাইয়া দিতে গেলেই বধূ তাড়াতাড়ি মাথাটি সরাইয়া হাসি মুখে বলে "তুমি আমাকে ছোঁও কেন? এখনো চান করনি তো।" একটু অপ্রতিভ হাসির সহিত সে ক্ষান্ত হয়।

খাইতে খাইতে তাহার আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবু খাওয়াইবার জন্ত অনুরোধ অনুযোগের অন্ত নাই। বধূ তাহার পড়ার ঘর সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছে-সে অপঠিত পুস্তক কোলের উপর খোলা রাখিয়া তৃপ্তি-হারা নিমেষহারা চোখে সেই কর্ম্মনিরতাকেই দেখিতেছে। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, এখনও বধূ ঘরে আসে নাই। অশোক প্রতীক্ষা করিতে করিতে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া বধূ যখন ঘরে আসিল, রাগ করিয়া সে কথা কহিল না। বধূ তাহার কাছে বসিয়া তাহার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মিনতির সুরে বলিল, "রাগ ক'রোনা লক্ষ্মীটি। সব কায শেষ না করে তো আসতে পারিনে।" তবু সে রাগিয়াই জবাব দিল, "ঝি চাকর রয়েছে, তবু কেবল কায, কায, কায! রাঁধুনীকে কেন ছাড়িয়ে দিলে? বেশ ত, যাও, কায করগে।" বধূ হাসিমুখেই বলিল "রাঁধুনীর রান্না খেয়ে ত এই দশা হয়েছে। ওদের খাওয়া দাওয়া না হ'লে আসি কি ক'রে বল? শ্বশুড়ী ননদ ত নেই, আমাকেই ত সব দেখতে শুনতে হবে।" ইহাতেও তাহার মন গলিল না। তখন বধূ নত হইয়া মুখখানি তাহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিল। সেই সরস আরক্ত অধর এবং পুষ্ট গোলাপী কপোল আর অনাদৃত থাকিতে পাইল না। অজস্র চুম্বন-বৃষ্টিতে পলকে মেঘ কাটিয়া গেল।

ক্রমে একটি নূতন আগন্তুকের আবির্ভাব তাহাদের মিলিত হৃদয়ের সুদৃঢ় বন্ধনকে একান্ত অচ্ছেদ্য করিয়া দিল। পিতামাতার অন্তরের অফুরন্ত স্নেহ সহস্র ধারায় উথলিয়া উঠিয়া সেই নবীন অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নিজের প্রতি মায়ের আর লক্ষ্য নাই, ছেলের পারিপাট্য সাধনই এখন তাহার ব্রত। সে বলিল, "একি! তোমার হ'লো কি? নিজের ওপর আর একটুও যত্ন নেই।" সহাস্যে বধূ বলিল, "কেনই বা থাকবে? তুমি তো আর আদর করনা; এখন খোকাই তোমার সব দেখছি।" সে প্রগাঢ় স্নেহে সপুত্র পত্নীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিল, "কায নেই তুচ্ছ সাজ সজ্জায়। মাতৃত্বই তোমার শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার। খোকা আমার আদরের বটে; কিন্তু তোমার আদরের ব'লে আমার আরো বেশী আদরের। তা কি তুমি বোঝ না?"

হরি! হরি! সে এতক্ষণ বসিয়া যে তাহার কল্পিতা দয়িতার আদর, যত্ন, সোহাগ, মিনতি, স্নেহ, অভিমান, চাঞ্চল্য, কর্ম্মপটুতা, হাসি কৌতুক, শাসনের এমন কি আকৃতিটির ছবি আঁকিয়াছে, সে যে বাস্তবতায় হুবহু একজনের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে! তাহার কল্পনা-প্রবণ মন তাহাতে মাতৃত্বের আরোপ করিয়াছে মাত্র—আর ত কিছুই কল্পনার কারুকার্য্য নয়। এই সত্য সে যে আবাল্য উপলব্ধি ও উপভোগ করিয়া আসিতেছে। কর্ম্মহীন সময়ের মনটাকে ভূতগ্রস্ত ভাবিয়া অশোক উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ভূতে পাওয়া মনটাকে সজোরে চাবুক মারিয়া, দেরাজ খুলিয়া গত বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

বিদ্যাপতির কাব্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রীতি মনুষ্যহৃদয়ের একটী শ্রেষ্ঠবৃত্তি। অবস্থা ও পাত্রানুসারে ইহারই আমরা ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়া থাকি। কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, যিনি মনুষ্যে প্রীতিহীন, তিনি ঈশ্বরে ভক্তিহীন। ইহা একটী অতিশয় বৃহৎ তত্ত্ব এবং বহু দার্শনিক বিচারণায় পরিপূর্ণ। এ তত্ত্বের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা বলিতেই হইবে যে, ভক্তিদ্বারা ভক্ত মুক্তিলাভ করে, অর্থাৎ ভক্তি নিজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা। আজ আমরা একজন লোক-শিক্ষকের গুণানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহাতে যদি ভক্তি না থাকে, তবে সে পূজা পণ্ড হইবেই হইবে,—কোন মঙ্গল লইয়া গৃহে ফিরিতে পারিব না।

জগৎ রক্ষা এবং ধর্ম্মাচরণ এতদুভয়ের জন্যই দম্পতি-প্রীতির প্রয়োজনীয়তা। দম্পতিপ্রীতি সংসর্গ হইতে জন্মে বটে, কিন্তু ইহার সহিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্মরজ অনুরাগ সম্বন্ধ বদ্ধ হয়। তাহা হয় বলিয়াই দম্পতিপ্রীতি হেয় হইতে পারে না। স্মরজ অনুরাগই যদি প্রবলতম হয়, তাহা হইলে দম্পতিপ্রীতিও পাশবিকতার নামান্তর মাত্র হইয়া পড়ে। এই মানদণ্ডে তুলিত করিলে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কুকাব্য—উহা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টসাধন করিতে পারে না। দম্পতিপ্রীতির ন্যায় পরম রমণীয় ও অতিশয় বেগবতী বৃত্তি নরচিত্তে কদাচিৎ দেখা যায়। সেই জন্যই পৃথিবীর সাহিত্যে ইহার এত অধিক প্রতিষ্ঠা, এত বেশী আদর। দম্পতিপ্রীতি ও অপত্যস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতির মত বৃহৎ পারিবারিক প্রীতির একটী অংশ। শুধু অংশমাত্র নহে—অতি প্রধান অংশ। সেই পারিবারিক প্রীতিকে সোপান করিয়াই বিশ্ব-প্রেমের মন্দিরদ্বারে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়,—আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিশ্বপ্রেমের অমৃত সমুদ্রে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইতে না পারিলে, কণিকা-মাত্রও ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহা যে শুধু হিন্দুধর্ম্মের কথা, তাহা নহে, ইহা সকল ধর্ম্মের মর্ম্মকথা। ইহা বিস্মৃত হইয়া বিদ্যাপতির কাব্য পাঠ করিলে, কবির প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শন করা হয় বলিয়া মনে করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কবিরা সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সৌন্দর্য্য ভিতরে এবং বাহিরে। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। যাহা চক্ষুতে দেখি, তাহা সুন্দর হইলে সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র, চন্দ্রকরধৌত বীচিবিক্ষোভ-সঙ্কুলা নদীহৃদয়, নদীহৃদয়ে মধুর বীণাঝঙ্কার কাহার না হৃদয়ে আনন্দ বিধান করে? মেঘলিপ্ত কটি তুষার-সমাবৃত অভ্রংলিহ গিরিশিখর যখন বালতপনে স্বর্ণের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করে, তখন কাহার শির বিস্ময়ে আনত হয় না? নীলিমার তটে বসিয়া লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী হীরক-খণ্ড গণনা করিতে, করিতে কাহার হৃদয় না সেই অনন্তের পরপারে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়? বহিঃপ্রকৃতিতে যে সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান, সে সকলই তাঁহার পূজার জন্য। সেই সুন্দরের পূজায় যে ভক্ত সার্থকতা লাভ করে, সেই কেবল অন্তরে নিহিত সুন্দরের যথাবিধি পূজা করিবার যোগ্য হয়। সে তখন অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পরমপ্রেমিক হইয়া সেই মহান্ বিরাট অনাদি সুন্দরের জয়গান গাহিতে পারে। সেই তখন বলার মত করিয়া বলিতে সমর্থ হয়—"অব তারণ ভার তোহারা" —হে সুন্দর, হে পরম প্রিয়, হে আমার জীবনের সাধনা মরণের কামনা—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে—

তুমি আমার—আমি তোমার। তুমি সুন্দর বলিয়াই ত তোমার বিশ্ব এত সুন্দর—"সরদক চান্দ সরিস তোর

মুখ রে”—সেই জন্যই ত চন্দ্র এত সুন্দর, তোমার নিঃশ্বাস বলিয়াই ত মলয় এত মধুর, তোমারই স্বর বলিয়া কোকিলকণ্ঠ এত মধুবর্ষণ করিতেছে, আজই ত সত্য সত্যই “গাবথু পঞ্চম কোকিল আবি।” বিদ্যাপতি সেই সুন্দরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, বিশ্বমানবের জন্য মন্ত্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই মন্ত্রে সেই সুন্দরের পূজা করিবার জন্য আজ আমরা মিলিত হইয়াছি।

শ্রীভগবান্ দুই মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা আমাদিগকে দেখা দিতেছেন,—একমূর্ত্তি প্রকৃতি বা Nature, আর এক মূর্ত্তি ললিত কলা বা Art. নগাধিরাজের বিরাট দেহ হইতে ক্ষুদ্র ধূলিকণায় পর্য্যন্ত একটীর বিকাশ, আর নরচিত্তে আর একটীর স্থান। দেশ, কাল, জাতি. প্রভৃতির ব্যবধান ললিত-কলার চরম আদর্শকে নানা মূর্ত্তি দেয় বটে, কিন্তু উহার ধ্যান শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,—তাহা সকল বিভেদকে মিলাইয়া এক করে। বিশ্বমানব সত্যের সেই শিখরদেশে আরোহণ করিবার জন্য যুগের পর যুগ ছুটিতেছে। জগতের কাব্য, নাটক, চিত্র প্রভৃতি মানবের সেই সাধনার ফল। ভাগ্যবান্ যিনি, ভক্ত যিনি, তিনিই কেবল সেই পরম সত্যের চরমে উপস্থিত হইয়া নিজেও ধন্য হন, পৃথিবীকেও ধন্য করেন। শ্রীভগবানের সহিত সেই মিলন ক্ষেত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার ভিতর দিয়াই বিশ্বদেবতা তখন আপনাকে বিশ্বের মধ্যে বিকশিত করিয়া থাকেন। এক কেন্দ্রে সংহত বিশ্বই ভগবান্—প্রকৃতি এবং কলায় বিকশিত ভগবানই বিশ্ব। কবি ও কাব্যের পূজা তাই ভগবানের পূজা। সেই পূজায় প্রেমের সহস্রধারায় সুন্দরের মহাস্নান সম্পন্ন করিতে পারিলেই, কবি বিদ্যাপতির মত একান্ত নির্ভরের সহিত বলিতে পারা যায়—

মাধব বহুত মিনতি কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল,
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি,
জগ বাহির নহ মোঞে ছার ॥

বলিতে পারা যায়—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়,
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি,
অব তারণ ভার তোহারা ॥

হে সুন্দর, হে প্রিয়, হে আমার পরম দেবতা! তুমি যদি আদিরও নাথ, অনাদিরও নাথ, তবে আমাকে তারণ করিবার ভার তোমাকেই লইতে হইবে—তুমি আমার, তুমি আমার—তুমি যে নিতান্তই আমার। আমার জীবনাধিক প্রেমের অঞ্জলি যে আমি তোমারই শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার প্রেমের পরিণতি এইখানে। তাই সে মহামিলনের দিনে মাধবের চরণলগ্ন হইয়া তিনি বলিয়াছেন—

নন্দনন্দন তুয় শরণ ন ত্যাগব
বরু জনু অহা চুরজনিয়া ॥

হে নন্দ নন্দন! যদি আমি এত কাঁদিয়া তোমায় পাইয়াছি, আর ত তোমায় ছাড়িব না! আমার কলঙ্ক হয় হউক, লোকে আমাকে কুলত্যাগিনী বলে বলুক—কিন্তু প্রেমময়! দেখিও, তোমার প্রেমে যেন কলঙ্কস্পর্শ না করে। আমাকে ছাড়িও না—ছাড়িও না—“দয়া জনু ছোড়বি মোয়”। যেরূপে প্রেমের সাধনা করিলে এই নির্ভরশীলতা লাভ করিতে পারা যায়, শ্রীরাধিকাকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যাপতি আমাদিগকে সেই সাধন-পথ দেখাইয়াছেন; সে পথ অনুরাগে উজ্জ্বল, নয়নজলে সিক্ত, ত্যাগে পবিত্র, আত্মবিসর্জ্জনে মহৎ। সেই সরল, বিরাট, সত্য নিত্যপরিচিত, শ্রেষ্ঠ পথকে চিনিবার জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রদীপ করিয়া হস্তে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন দেখি না।

যাহা বলিতেছিলাম—অভিরাম নবযৌবন শ্রীরাধিকার দেহে ফুটিয়া উঠিয়া মনকে স্পর্শ করিল। কিন্তু "তৈঅওন শৈশব সীমা ছাড়"— তখনও শৈশব সে হেমলতাকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাই লজ্জা ফুটি ফুটি করিতেছে মাত্র, পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই তখনও "বেকত অঙ্গ ন ঝপাবয় লাজে";—কিন্তু মনে তখন ভাবান্তর আসিয়াছে, শৈশবের সে সরলতা আর তেমন নাই, এখন "খন ভরি নহি রহ গুরুজন-মাঝে" কারণ তাঁহাদিগের সাক্ষাতে সসম্ভ্রমে থাকিতে হয়, চিত্তচাঞ্চল্যকে দমন করিতে হয়। এখন—

হৃদয় মুকুল হেরি হেরি থোর
খনে আচর দই খনে হোয় ভোর॥

সে যেন—

বালা শৈশব তারুণ ভেট
লখই ন পারিঅ জেট কনেঠ॥

তখন—

শুনইতে রসকথা থাপয় চিত।
যৈছে কুরঙ্গিনী শুনএ সঙ্গীত॥

কিন্তু লজ্জা আসিয়া ধীরে ধীরে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল,—এই বুঝি সখীগণ মন দেখিতে পাইল, এই বুঝি বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাধিকা বিলাস কৌতুক শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিতা। সুতরাং ছলনার প্রয়োজন হইল। সখীদিগের কথার দিকে কাণ রাখিয়া তিনি অন্যদিকে নয়ন স্থাপন করিলেন, যেন অন্য কিছুতে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইয়াছে,—যেন সখীদিগের কথোপকথন তিনি শুনিতেছেন না—

কেলিক রভস যব শুনে আনে
অনতএ হেরি ততহি দএ কানে॥

কিন্তু এ "চতুরপণা" অধিকক্ষণ টিকিল না—কোন কোন সখী ছলনা বুঝিতে পারিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। ছল ধরা পড়িলেই ক্রোধ উপস্থিত হয়। শ্রীরাধিকারও হইল। কিন্তু সে ক্রোধ অনলের জ্বালা নহে—তাহা সখীস্নেহে সিক্ত অভিমান মাত্র,—তাহাতে সুখ আছে, আনন্দ আছে, মৃদু তিরস্কার আছে। সে কেমন? না—হাসি মুখে কাঁদন-মাখা গালি—

কাঁদন মাখী হাসি দএ গারী।

সুন্দর—অতি সুন্দর। এ চিত্র শুধু বিদ্যাপতির তুলিকারই যোগ্য।

শৈশবে বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি ছিল না; তখন নয়ন স্থির রহিত, আলুলায়িত কেশ পৃষ্ঠে, বদনে, অংসে পতিত হইয়া চরণভঙ্গের সহিত দুলিত, শ্লথবিস্রস্ত বসন ধূলিতে গড়াইত। এখন "দিনে দিনে অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ", "অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল"—এখন—

"বচনক চাতুরি লহু লহু হাস
ধরণিয়ে চাঁদ করল পরগাস।"

সদ্যঃসমাগত-যৌবনা শ্রীরাধা এখন বয়সের গুণে বেশবিন্যাসে মন দিলেন, "মুকুর লই অব করত শিঙ্গার।" অনঙ্গের রাগ যেমন সকল অঙ্গে বিকশিত হইল, তেমনই মনে অনুরাগ দেখা দিল। সমস্ত দেহ ও মন সেই অনুরাগে ফুল্লনলিনীর ন্যায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তখন একদিন বিশ্ব নির্নিমেষে চাহিয়া দেখিল, এক শুভ মুহূর্ত্তে নয়নে নয়নে মিলন হইয়াছে। বিমুগ্ধ মাধব দেখিলেন, যমুনাতরঙ্গে চন্দ্রমণ্ডল শোভিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া নয়ন ত ভরে না; এ যে যুগ যুগান্তের কত শত জন্মের সঞ্চিত পিপাসা, দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া ত সে তৃষা মেটে না। আহা এ কি মনোহর দেবীমূর্ত্তি! "কনকলতা জন সঞ্চর রে, মহি নর অবলম্ব"—এ যে মেঘমালার গায়ে তড়িল্লতা—

নবজলধর তায় সঞ্চর রে
জনি বীজুরি রেহ।"

তৃষিত মাধবের ব্যথিতহৃদয় কাতরে কহিল—

"সজনি ভাল কএ পেখল ন ভেল"। যমুনা-শীকর-সম্পৃক্ত সমীরণে পদ্মগন্ধ বিতরণ করিয়া "কলাবতি রামা" ধীরপদে চলিয়া গেলেন। মাধব ভাবিতে লাগিলেন—আহা কি দেখিলাম "সে নহি দেখল জে দিয় উপামা"

সজনি অপরূপ পেখল রামা
কনকলতা অবলম্বন উয়ল
হরিণহীন হিম ধামা।

সজনি, আমি এক অপরূপ রূপ রামা দেখিলাম। মনে হইল যেন দেহযষ্টিরূপ কনকলতা অবলম্বন করিয়া হরিণ-চিহ্ন বিরহিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র উদিত হইয়াছে।

নয়ন নলিনি দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভৌহ বিভঙ্গ বিলাসা।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাসা॥

তাহার নয়ন-নলিনীদ্বয় অঞ্জনে রঞ্জিত, কিবা সুন্দর ভ্রূভঙ্গবিলাস। মনে হইল যেন চঞ্চল চকোর দুইটীকে বিধি বুঝি কেবল কাজলের পাশে বাঁধিয়াছেন।

আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
কামিনি পেখল সনানক বেলা॥
চিকুরে গলয় জলধারা।
মেহ বরিস জনি মোতিমহারা॥
বদন পোছল পরচুরে।
মাজি ধরল জনি কনকমুকুরে॥

আজ আমার শুভদিন সখি, আজ আমার বড় শুভদিন। যমুনাতটে সভস্নাতা রাইকে আজ দেখিয়াছি। তাহার ঘনকৃষ্ণ সিক্ত চিকুর হইতে জলধারা ঝরিতেছে, মনে হইতেছে যেন মেঘমালা মোতি বর্ষণ করিতেছে। সে যখন তাহার বদন মাজিল, জ্ঞান হইল, একখানি স্বর্ণমুকুর মাজিয়া ঘষিয়া কে যেন রাখিয়া দিল।

কি দেখিলাম—আজ এ কি দেখিলাম। আমার নয়ন ত আর ফিরিল না। সেই বরনারী যে দিকে গেলেন, আমার এই "ভুখল নয়ন" সেই দিকেই ধাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ত আর ফিরিয়া চাহিলেন না—তিনি কি এমনই কৃপণ যে আর একটীবার ফিরিয়া চাহিতে পারিলেন না? কিন্তু আমার নয়ন ত একবার সে মুখচন্দ্র দর্শনের ভিখারী। সে তাই আশায় আশায় লুব্ধ হইয়া তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কৃপণ ধনীর পশ্চাতে যেমন দীনদরিদ্র কাঙ্গাল বড় আশা করিয়া যায়, আমার নয়নও যে তেমনি করিয়া চলিল।

ততহি ধাওল দুহু লোচন রে
জতহি গেলি বরনারী।
আসা লুবুধল ন তেজএ যে
কৃপণক পাছু ভিখারী॥

এদিকে শ্রীরাধিকাও সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন—সখি, একি অপরূপ মূর্ত্তি দেখিলাম। তোরা শুনিলে মনে করিবি সত্য নহে স্বপ্ন। সখি, দেখিলাম তাঁহার চরণ-যুগলের উপর নখপংক্তি যেন কমলযুগলের উপর চন্দ্রের হার। তাহার উপর যেন তরুণ শ্যামল তমালরূপ উরু উঠিয়াছে। সে উরুদ্বয় বেড়িয়া পীতধড়া যেন শ্যামল তমাল বেড়িয়া বিদ্যুল্লতা বলিয়া মনে হইল। দেখিলাম এই অপরূপ মূর্ত্তি "কালিন্দিতীর ধীর চলি যাতা।" সখি সখি! সে কোথায় থাকে, বল—

কহহি মো সখি কহহি মো—
কতএ তাহেরি বাসা।

যতই কেন দূর না হউক, আর একটীবার দেখিবার জন্য তথায় আমি যাইব—

দুরহু দুগুণ এড়ি মঞে আবও
পুনু দরসন আশা।

হে ইন্দ্র, আমাকে তোমার সহস্রলোচন দাও, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখি,—হে গরুড়, তোমার সবল পক্ষদুইটী একবার আমায় দাও—সে যেখানে আছে আমি সেইখানে যাই। দিবে না কি? যদি নিতান্তই না দাও তবে আর কি উপায় করিব—মনোরথে মন রাখিয়া আমি সেই নন্দের নন্দনকে দেখি—

"সুরপতি পাএ লোচন মোগঞো
গরুড় মাগঞো পাখী।
নন্দেরি নন্দন মঞে দেখি আবঞো
মন মনোরথ রাখী॥"

সে যখন আসে তখন "হম রমণি সমাজ" ছিলাম বলিয়া দারুণ লজ্জায় "দিঠি ভরি ন পেখল"—

অবনত আনন কএ হাম রহিলহু"

লোচন চোরকে নিবারণ করিলাম—চক্ষু তুলিয়া চাহিলাম না। তবুও সে চোর বারণ মানিল না। চকোর যেমন

চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয়, সেও তেমনি পিয়ার মুখরুচির আশায় ধাইল—

পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর।

সখি তাকে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি—কিন্তু

কি কহব হে সখি ইহ দুখ ওর
বাঁশি নিশাস গরলে তনু ভোর।

সে বাঁশরীর নিশ্বাস যে সই গরলের মত, সে বিষে আমার তনু বিহ্বল হইয়াছে। সখি, শুধু বাঁশী শুনেছি—আর "মন প্রাণ যা। ছিল দিয়ে ফেলেছি।" আমি ভাবি শুনিব না, কিন্তু কালার বাঁশী বলপূর্ব্বক আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে—তখন আমার দেহ গলিয়া মন হইতে লজ্জা দূর হইয়া যায়—আমি বিপুল পুলকে চক্ষু মুদিয়া থাকি, চাহিনা—পাছে আমার প্রাণের আনন্দ নয়নের কোণে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সে বাঁশীর নিশ্বাস—

হঠ সঞে পৈসয় শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয় দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয় জনু কেহ॥"

সখি, এ আমার কি হইল? যতদিন দেখি নাই ততদিন ত ভালই ছিলাম। কালার দর্শনে যে প্রাণের অবশিষ্ট-টুকুও দূর হইল—

কা লাগি সুন্দরি দরসন ভেল
জেও ছল জীবন সেও দুর গেল।

হায় হায়! এ কি করিলাম—কেন তারে দেখিলাম—কেন তারে দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন সব খোয়াইলাম। তারে যে না দেখাই ভাল ছিল সখি, না দেখাই ভাল ছিল। এখন—

সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধস ধস করয় পরাণ॥
কাঁ লাগি সজনি দরসন ভেল।
রভসে অপন জিউ পর হাথে দেল॥

নয়ন হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। হৃদয়ের ভাষা নয়ন যেমন বুঝে অমন আর কেহ নহে। শ্রীরাধিকা তাই কাতরা হইয়া কহিতেছেন, নয়নের সহিত নয়ন মিলাইয়া হৃদয়ের কথা বুঝাইতে পারিলাম না এই দুঃখ।

নঅন হু নঅন জুঝাএ রে।
হৃদএ ন ভেল বুঝাএ রে॥

একস্থানে বিদ্যাপতির রাধা নয়নে হেরিয়া স্পর্শসুখ পর্য্যন্ত অনুভব করিতেছেন। তিনি সখীকে কহিতেছেন—

"লখল ললিত তনু গাতে রে
মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে।"

তাহার ললিত দেহ দর্শন করিলাম, মনে হইল যেন পদ্মপত্র স্পর্শ করিতেছি। অনুরাগের কি পরম রমণীয় উদাহরণ! নয়নের যেমন ভাষা আছে, দেহেরও কি নাই? শোক, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্তই দেহের ভাষায় প্রকাশিত হয়। রস বা স্থায়িভাব সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। আবার বলি, ভাব হইতে রস উদ্ভূত হয়। "ভাব" দুইভাগে বিভক্ত—স্থায়ী এবং ব্যভিচারী, স্থায়িভাব অর্থাৎ Permanent conditions of the mind or body which are followed by a corresponding expression in those who feel them—ইহাই সুপণ্ডিত হোরেস হিমেন উইলসনের ব্যাখ্যা। সেইরূপে ব্যভিচারী ভাবকে ক্ষণস্থায়ী ভাব বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন স্থায়িভাব বা রস আটটী যথা—রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শান্ত। এইস্থলে আর দুইটী আলঙ্কারিক পরিভাষা ব্যবহার করিতে হইবে যথা—বিভাব এবং অনুভাব। যে যে কারণে হৃদয়ে কোন বিশেষ ভাবের উৎপত্তি হয় সেই কারণ গুলিকে বিভাব কহে। পণ্ডিত উইল্সন্ বলেন বিভাব গুলি are the preliminary and accompanying conditions which lead to any particular state of mind or body-অনুভাব অর্থে সেই হৃদ্গত ভাব প্রকাশের বহির্লক্ষণ জানিতে হইবে, অর্থাৎ "the external signs which indicate its existence।" নানা বিভাব বা কারণে হৃদয়ে একটী স্থায়িভাব উপস্থিত হয় এবং হৃদয়ে যে সত্যই

সেই স্থায়িভাব বা রস উপস্থিত হইয়াছে তাহার পরিচয় স্বরূপ নানা লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়। এই লক্ষণগুলি অনুভাব।

বাঁশী শুনিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণদর্শনে আকুলতা হইয়াছে—সে বাঁশী পিয়ার মুখের মধুর রাগিণী—উহা তাঁহার মন প্রাণ মত্ত করিয়াছে, দেহমন গলাইয়া লাজকে পর্য্যন্ত দূর করিয়াছে। আনন্দে চিত্ত আর স্থির থাকিতেছে না। এই সকলই স্থায়িভাব রতির কথা।

জয়দেব গাহিয়াছেন—"নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং" সেই সুরে সুর বাঁধিয়া বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তর
ধিরে ধিরে মুরলি বলাব।
সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পঠাব॥

সে বাঁশী শুনিয়া প্রাণ আর প্রাণে থাকে না— বাঁশীর সুরের সঙ্গে ভাসিয়া যায়, বৃন্দা বিপিনে প্রিয়তমের সন্ধানে ফিরে। গুরুজনের নিকট অবস্থান করিতে করিতে রাধিকা সেই বাঁশী শুনিলেন, অমনি "বিপুল পুলকে পরিপূরয় দেহ," পাছে সেই পুলক কেহ দেখে সেইজন্য তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ভাবতরঙ্গ কি বালির বাঁধে রুদ্ধ হয়? উহা গুরুজনের বাধা মানিল না, দেহে প্রকাশ পাইল। পাছে গুরুজন দেখিয়া ফেলেন এই জন্য "যতন হি বসন ঝাঁপি সব অঙ্গ।" তাহাতেও হইল না। আনন্দে যে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, দেহ ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া উঠে, কখনো বা চক্ষে ধারা বহে, কণ্ঠ গদ্‌গদ হয়, আবেগে চঞ্চলতা আনে। বসনে অঙ্গ ঢাকিলে কি হইবে? হর্ষ ও আবেগের সকল বহির্লক্ষণ কি লুকাইতে পারা যায়? দেহ যে অবশ হইয়া আসিল, অবসন্ন দেহ হইতে যে নীবিবন্ধ খসিয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীরাধা তখন স্থান ত্যাগ পূর্ব্বক কক্ষান্তরে গমন করিবার জন্য উঠিলেন। এ কি, চর যে অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল! চঞ্চলতা আবেগের লক্ষণ বা অনুভাব। তিনি তখন বহু আয়াসে অতিশয় ধীর পদে কক্ষান্তরে গমন করিলেন

লহু লহু চরণে চলিয় গৃহ মাঝ।

ভাগ্যে "বিহি আজু রাখল লাজ" নতুবা এখনই ত সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল!

এইরূপে রসোদ্ভাবন করিয়া সৌন্দর্য্য সৃজনের ক্ষমতা অসাধারণ। সে শক্তি মনস্তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারণার উপর নির্ভর করে। যে কবি মানবহৃদয়-সাগরের গূঢ়তম তলে স্থিত ভাব সকলকে নিপুণহস্তে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন তিনিই এইরূপ সৌন্দর্য্য সৃজনে কৌশলী—অন্যের সাধ্য নাই যে এরূপ করে। ইহাকেই আমি বিদ্যাপতির লিপিকুশলতা বা Art বলিতে চাই। Suggestiveness সে লিপিকুশলতার অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তিনি সকল কথা খুলিয়া বলেন না। অনেকস্থলেই শুধু ইঙ্গিতমাত্র করেন।

আবেগে যেমন চঞ্চলতা আনে, তেমনি সময়ে সময়ে জড়তাও আনে। আবেগ নামক ব্যভিচারী ভাবের, জড়তা একটী অনুভাব বা লক্ষণ। যাহা প্রত্যাশা করি নাই এমন কিছু ঘটিলে আবেগ উপস্থিত হয়। ইহাকে আবেগের অন্যতম বিভাব বা কারণ বলা যায়। সখী সখীকে কহিতেছে, আজ যে কানাই কোন্ সময়ে এ পথে আসিবেন রাধার তাহা জানা ছিল না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সময়ে চারিচক্ষে মিলন হইয়া গেল

বিধি ঘটনে ভেল অকামিক
লোচনে লোচনে মেলা।

তখন শ্রীরাধার—

নব কলেবর নিজ পরাভব
থম্ভ ভেল বিনু কাজে।

তাঁহার নবীন দেহ পরাভূত হইয়া গেল এবং বিনা কাজেই "থম্ভ ভেল"—স্তম্ভিত হইল। সত্যই কি বিনা কারণে স্তম্ভিত হইয়াছিল? তাহা নহে। অকস্মাৎ মিলনের আবেগে দেহ স্তম্ভিত হইয়া ছিল। প্রথমে দেহ স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সেই আবেগ

তাঁহার দেহে চঞ্চলতা আনিয়া দিল—কানু যে চলিয়া যায়—গেলে ত আর দেখা হইবে না! শ্রীরাধিকার সেই "দরসন-রস-রভস" লীলার লোভ তখন তাঁহার লজ্জাকেও গ্রাস করিয়া ফেলিল, তখন "সুন্দরী মন্দির বাহর ভেলী।" কিন্তু সে ত একটী উন্মাদন মাত্র—বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির অতিতীব্র ক্ষণিক আক্ষেপের ন্যায়। সুন্দরী মন্দিরের বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু জলধরে বিজলী রেখার ন্যায় তখনই আবার লুকাইলেন—লজ্জাই শেষে প্রবল হইল।

"বিজুরি রেহ জলধর নাঞী
পুনু কৈসে লুকি গেলি॥"

আবেগের আর একটী অনুভাব পদস্খলন বা পতন। কবি কি কৌশলে স্থানান্তরে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন সে পরিচয় দিতেছি। শ্রীরাধিকা দুগ্ধ বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তখন

মুরলি ধুনি সুনি মন মোহল
বিকেহু ভেল সন্দেহা॥
তীর তরঙ্গিনি কদম্ব কানন
নিকট জমুনা ঘাটে।
উলটি হেরইত উলটি পরল
চরণ চীরল কাঁটে॥

হর্ষের অনুভাব প্রস্বেদ ও রোমাঞ্চাদি। তাহার বর্ণনা দেখুন! মাধব যখন মধুর বাণী বলিলেন, তখন তনুর প্রস্বেদে প্রসাধন ভাসিয়া গেল, দেহ এত অধিক পুলকাঞ্চিত হইল যে চুন্ চুন্ শব্দ করিয়া কাঁচুলি ফাটিল, বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া গেল।

তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি
তইসন পুলক জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ কাটলি—
বাহু-বলআ ভাগু॥

সার্থকজন্মা কবিগণ এইরূপেই রসোদ্ভাবন করিয়া যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন তাহা স্বভাবানুকারী এবং স্বভাবাতিরিক্ত বা Transcendental হয়। উহাই কবির কৌশল—উহাই তাঁহার কৃতিত্ব। বিদ্যাপতির গীতি কাব্য এই অনুপম গুণে পরম রমণীয়। সে কাব্য এতই মধুর যে পাঠকালে তন্ময় হইতে হয়, কবির সৃষ্টি চাতুর্য্য দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। যখন হৃদয় কোন বিশেষ রসে পূর্ণ হয়, তখন তাহার কতক অংশ কার্য্যে বা কথায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কতক অব্যক্ত থাকে। সেই কার্য্য ও বাক্য লইয়া নাটক—যাহা অব্যক্ত থাকে তাহাই গীতিকাব্যের প্রাণ। গীতি কাব্যের কবি সেই অব্যক্ত রসকে নানা কৌশলে পরিস্ফুট করেন। যে কবি সেই প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত সমুদয় রসটুকুই কৌশলে প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই পাঠকের চিত্ত হরণ করিয়া মহাকবি নামে পরিচিত হন। সুন্দরের উপাসক যাঁহারা, তাঁহাদের সশ্রদ্ধ কুসুম চন্দন যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহারই চরণে অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এইখানে সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের একটী কথা উদ্ধৃত করিতে চাই। তিনি বলিয়াছেন—"কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্য হৃদয়। যাহা মনুষ্য হৃদয়ের অংশ অথবা যাহা তাহাদের সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে।...(মহাকবিরা) দেবচরিত্রকে মনুষ্য চরিত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগ দ্বেষাদির বশীভূত, মনুষ্য যে সকল সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয়; মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্ধ, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত—এই মনুষ্য-প্রকৃত দেবতারাও তাই।"

যদিও বিদ্যাপতির কাব্য শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রণয়-কাহিনী—দেব কাহিনী—কিন্তু তাহা হইলেও উহা মানব মানবীর প্রেমকাহিনী। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন অতি-মানবের অতি মানবত্বের কাহিনী নহে—উহা দেব চরিত্রের বর্ণনা নহে। আমি আজ এই ভাবেই কবি বিদ্যাপতিকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি—ভক্তের ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর আলেখ্য রচয়িতা ভক্ত কবি রূপে নহে। আমি তাঁহাকে দেখাইতে চাহিতেছি নিসর্গ সুন্দরের সাধক রূপে—দেবচরিতের কথকরূপে নহে। সেই জন্যই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জটিল পথ

পরিহার করিয়া সাংসারিক সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা, বিরহ-মিলন, প্রেম-অনুরাগ, ভোগ-আশঙ্কা প্রভৃতির নিত্য পরিচিত পথকে আশ্রয় করিয়াছি। তাহাতে যদি ভক্ত জনের নিকট অপরাধী হইয়া থাকি তবে তজ্জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

চাঁদবদনী ধনি চকোর নয়নী।
দিবসে দিবসে ভেলি চউগুণ মলিনী॥

কারণ অনুরাগের প্রবল অনল হৃদয়কে দহন করিতে লাগিল, অথচ মিলন ঘটিল না—"একক হৃদয় অওকে ন পাওল।" কিন্তু দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে, মনের বিকারও তেমনি বদনে ব্যক্ত হইয়া পড়িল—

দপ্পন মুখে প্রতিবিম্ব নাঞো
বেকত ভেল বিকারে।

সখীরা বুঝিল। বুঝিয়াও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল সখি তোর একি হইল, বল্ কাহার আশায় তুই এমন করিয়া শিবের আরাধনা করিতে করিতে দিন দিন ক্ষিণ্ণ হইতেছিস্?

কহ কমল বদনী।
কমনে পুরুসে হর আরাধিয়
জনু কারণে তোঞে খিনী॥

শ্রীরাধিকা তখন প্রিয়তমের মুখচ্ছবি ধ্যান করিতে করিতে আত্মহারা। জগৎ সংসার বিস্মৃত হইয়াছেন। সখীদিগের কথা তাঁর কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাঁহার কিশলয় তুল্য করের উপর তখন মুখচন্দ্র অবস্থিত, নয়ন আকাশে বদ্ধ। লোকে জানে যে অরুণ সমাগমে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়,—কিন্তু এ যেন তাহার বিপরীত ঘটিল। অরুণপ্রতিম রক্ত রাগ রঞ্জিত করতলে মুখ-পদ্ম ঢলিয়া পড়িল। উজ্জল নয়ন দুইটী নবঘনের অবিরাম বারি বর্ষণ করিতে লাগিল, যেন চন্দ্রকরে কবলিত চকোর, ইতঃপূর্ব্বেই যে অমিয় পান করিয়াছিল, তাহা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। চিন্তামগ্না, ক্লিষ্টা বিষাদময়ী রাধিকার কি সুন্দর আলেখ্য।

কর কিশলয় সয়ন রচিত
গগন মণ্ডল পেখী
জনি সরোরুহ অরুণ সুতল
বিণু বিরোধে উপেখী॥
নবঘন জঞো নির বরীসএ
নয়ন উজ্জল তোরা।
জনি সুধাকর করেঁ কবলিত
অমিয় বম চকোরা॥

শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া দিনের পর দিন শ্রীরাধিকার নিকট কৃষ্ণের অনুরাগ প্রচার করিতে লাগিল। অভিসারে গমন করিবার জন্য দিনের পর দিন তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। কহিল, চৈত্র মাসের এই মধু নিশীথ অধিক ক্ষণ থাকিবেনা। এই শুভক্ষণে মণিময় ভূষণে অনুপম তনু ভূষিত করিয়া অভিসারে গমন কর। হে মল্লিকে, "পসরও পেম পসার" প্রেমের দোকান সাজাও, যৌবন নগরে রূপের হাট কর। দূতীর বাক্যে লোভে লুব্ধ আশা মিলনের আকাঙ্ক্ষা বন্যার তরঙ্গের ন্যায় ছুটিল বটে, কিন্তু পথে যে দারুণ বাধা, নানা শঙ্কা, কণ্টকিত চিন্তায় বিষ, অভিসারে যাইতে চরণ ত উঠে না,

ধকে ধাওল নহি পাওল
আসা লুবুধল লোভ।

শ্রীরাধা মনের কথা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন না, সে যে নবরাগরঞ্জিত অন্তর নলিনী, ফুটি ফুটি ফুটি কিন্তু ফোটেনা, সে যে মেঘান্তরালে স্থিত শারদ শশী, ফুটি ফুটি ফুটি কিন্তু ফোটেনা। হৃদয় ত কাহারও শাসন মানে না। সে বাঞ্ছিতের দিকেই ধাইল :

জকর হৃদয় জতহি রতল
সো ধসি ততহি যাএ।

সে যে নিম্নগামী নীর, যত কেন তাহাকে না বাঁধ, সে নীচের দিকেই যাইবে।

জইঅও যতনে বাঁধি নিরোলিঅ নিমন নীর থিরাএ।

দূতীও ছাড়িবার পাত্রী নহে। কহিতে লাগিল,

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি যব সুপুরুখ জানি॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নহি কোইল বাণি॥
সকল সময় নহ ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহ গুণবন্ত॥

মাধবের দূতী চতুরা, সংঘটন বিরহ নিবেদনে যথেষ্ট পারদর্শিনী, মিষ্টভাষিণী, রসিকা। অভিসারে গমন করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীরাধিকার নিকট সে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিল। শেষে এমনও কহিল, সখি, যৌবন গেলে আর ফিরিয়া আসিবেনা, এখন যদি মিলনের জন্য অগ্রসর না হও, তবে শুধু পশ্চাত্তাপই ভোগ করিতে হইবে। ঘোষিণী ঘরের বাসি ঘোলের দামে শেষে তোমাকে বিকাইতে হইবে।

গেল জউবন পুন পালটি ন আবএ
কেবল রহ পচতাবে॥
সুন্দরি বচনে করহ সম ধানে।
দিনে দিনে অগে সখি ঐসনি হোয়বহ
ঘোসিনী ঘোরক মূলে॥

এদিকে আবার শ্রীরাধার দূতীও শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া নানা ছন্দোবন্ধে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল,

এ হরি এ হরি কর অবধান।
দরশ দান দয় রাখ পরাণ॥

বিদ্যাপতি নানা কৌশলে দূতীর মুখে বেদন বিধুরা শ্রীরাধিকার যে নানা মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেন এক এক খানি আলোক চিত্র, সে আলোক চিত্রে প্রাণ আছে, প্রাণের স্পন্দন প্রতি কথায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দূতী জানাইল,

নয়নক নীর চরণতলে গেল।
থলহুক কমল অম্ভোরুহ ভেল॥
অধর অরুণ নিমিখি নহি হোএ।
কিসলয় সিসিরে ছাড়ি হলু ধোএ॥

সখা শুন, রাধার নয়নের জল যেন প্লাবনের ধারা। গড়াইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া সে ধারা নয়ন হইতে চরণতল পর্য্যন্ত সিক্ত করিতেছে। যে চরণ যুগল স্থলপদ্মবৎ ছিল, নয়ননীরে ভাসিয়া ভাসিয়া এখন তাহা অম্ভোরুহ বা জলপদ্ম হইয়াছে। আর সে অধরে আনন্দের অরুণ রাগ নিমেষের তরে ফুটে না। বিম্বাধর এখন মলিন পাংশুবর্ণ, নবকিশলয় যেন দারুণ তুষারপাতে পরিম্লান হইয়াছে।

কি কহব সজনি তাহেরি কাহিনী।
কহই ন পারিঅ দেখলি জহনী॥

যেমন দেখিলাম, তাহা ত বুঝাইয়া বলিতে পারি না সখা! মলয় পবন এখন অনল বর্ষণ করিতেছে, চন্দন এখন বিষ, যাহা কিছু শীতল ছিল সবই এখন তীব্র হইয়াছে। তপ্ত কনকতুল্য বর্ণ এখন কাজলের কালি।

এ হরি এ হরি কর অবধান।
দরশ দান দয় রাখ পরাণ॥

—শ্রীকৃষ্ণ রাধা দর্শনে চলিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

মথুরা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গ্রীকবীর মিলিন্দ কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণের কথাটা গার্গী সংহিতায় এই রূপ পাওয়া যায় :—

"ততঃ সাকেতমাক্রম্য পাঞ্চালান্ মথুরাং তথা।
যবনাঃ দুষ্টবিক্রান্তাঃ প্রাপ্স্যন্তি কুসুমধ্বজম্॥"

পাটলীপুত্রপতি পুষ্যমিত্রও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইতি পূর্ব্বেই তিনি দিগ্বিজয়োদ্দেশে প্রভূত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন; এখন সমযোগ্য শত্রু গ্রীকদিগকে সম্মুখে পাইয়া, স্বল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগকে ভারত হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, এবং মহা সমারোহে অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। সেই যজ্ঞে পানিনি ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি যাজক কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিজগ্রন্থ মধ্যে "ইহ পুষ্যমিত্রং যজামহে" বলিয়া আভাস দিয়া গিয়াছেন। পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং এই ধর্ম্মের ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি নিজে ব্রাহ্মণ বংশ জাত। অশোক ও তৎপরবর্ত্তী মৌর্য্য রাজারা বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ঐ সকল সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বহুল পরিমাণ ভূমি, গ্রাম ও অপরাপর ধন সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনেরা ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত প্রাণিহিংসাকল্প যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী এবং বৌদ্ধ ও জৈনেরা জাতিভেদ মানিতেন না বলিয়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রাধান্য হারাইয়াছিলেন ও মনে মনে অতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রকে আপনাদের পৃষ্ঠপোষক পাইয়া তাহাদের প্রধূমিত ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ইঁহারা অধুনা অবসর পাইয়া জৈন ও বৌদ্ধ গণের বিপক্ষে নব সম্রাটকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পুষ্যমিত্রও তাঁহাদের উপদেশমত বৌদ্ধ ও জৈন গণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মগধ হইতে জলন্ধর পর্য্যন্ত মথুরা এই উভয় নগরের মধ্যপথে যেখানে যে সকল বৌদ্ধ বা জৈন সঙ্ঘারাম বা মঠ প্রভৃতি ছিল, সে সকল ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন এবং তৎতৎ ধর্ম্মাবলম্বী জনগণকেও হুতাশন বা অসিমুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেকে ভয়েও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। যাঁহারা স্বস্বধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন ও স্বস্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যাধিগ্রস্ত কুরঙ্গের ন্যায় অন্যরাজ্যে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

এই সময়ে মথুরায় দুইটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক দিকে গ্রীকবীর মিলিন্দ আসিয়া মথুরা নগরীর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া গেলেন, অন্যদিকে পুষ্যমিত্রের উৎপীড়নে এখানকার জৈন ও বৌদ্ধ প্রজারা হত, আহত বা নির্ব্বাসিত হইয়া পড়িল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের গ্রন্থে এ সকল বিবরণ পাওয়া যায়।

শক বা কুশান যুগের মথুরা।

আধুনিক পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন যে কেবল আর্য্যরাই ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। গ্রীক্ যবন শক কুশান ও শ্বেত-হূন প্রভৃতি আর্য্যেতর অপর কয়েকটী জাতির লোকেরা এশিয়ার মধ্যভাগ হইতে ভারতে আসিয়া এ দেশের ধর্ম্ম, পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের দলে মিশিয়া গিয়াছেন। অশোকের পরবর্ত্তী এ দেশের কোন রাজাই ভারতের বাহিরে রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগে তিব্বত প্রভৃতি দেশ হইতে একদল বলিষ্ঠদেহ ও রণপটু লোক আসিয়া বাহ্লিক (ব্যাকট্রিয়া) কপিশা (কাবুল) প্রভৃতি স্থান হইতে, গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারত পর্য্যন্ত আসিয়া রাজ্য স্থাপন করে। চীন্ ভাষায় ইহাদের নাম "ইউচি"; ভারতের লোকেরা তাহাদিগকে "শক" বলিত। মানসিক শক্তি ও বিদ্যাবলে শকেরা আর্য্যদের সমকক্ষ না হইলেও, দেহ গঠনে ও সামরিক ব্যাপারে তাহাদের কতকটা অনুরূপ ছিল। এই শক দিগের একটী শাখার নাম 'কুশান'। কুশান বংশীয় শকরাজা কাদফিস দ্বিতীয় (Kadphises) সুরাষ্ট্র, গান্ধার প্রভৃতি জয় করিয়া মথুরা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজার নাম কণিষ্ক। আমাদের দেশে খৃষ্টীয় ৭৮ শকাব্দা নামে যে শাক প্রচলিত আছে কেহ কেহ বলেন ইহা কদফিস্ ২য় প্রবর্ত্তন করেন। অপরেরা বলেন, কণিষ্কের সিংহাসনারোহণ হইতে শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে।

কণিষ্ক প্রথম জীবনে অতিশয় রণদুর্ম্মদ ও দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি চীন দেশের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া তথায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীন সম্রাট এ বিবাহে অসম্মত ছিলেন বলিয়া কণিষ্ক তথায় ৭০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্গম পার্ব্বত্য পথে ইঁহার সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া যায়।

কথিত আছে যে সম্রাট কণিষ্কও সম্রাট্ অশোকের ন্যায় রণ-ভূমিতে অজস্র শোণিতপাত দেখিয়া অনুতপ্ত চিত্তে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন এবং ইঁহার রাজ্যের নানা স্থানে স্তূপ, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

আফগান্ পর্ব্বতমালা হইতে ভারতের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ পথে পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) ইঁহার রাজধানীতে ইনি একটি ৪০০ শত ফুট উচ্চ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ১৩ তলা বা মঞ্চ বিশিষ্ট সুন্দর স্তূপ (Relic tower) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার

কুশান যুগের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ নারীমূর্ত্তি

লোকেরা সেটীকে পৃথিবীর অপূর্ব্ব বস্তু (Wonder of the world) বলিয়া মনে করিত। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে মামুদ-গজনী অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন ধর্ম্মান্ধ পাঠান বীর সেটীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

ইঁহার অধীনে অনেকগুলি সত্রপ [ক্ষত্রিয়?]* সামন্তরাজ ছিলেন। তাহাদের মধ্যে নহপান ও চস্তন নামক দুইজন সত্রপবীরের সাহায্যে ইনি বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাবুল, পেশওয়ার, তক্ষশিলা ও মথুরা প্রভৃতি নানা স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি যখন যেখানে ইচ্ছা গিয়া বাস করিতেন। ইনি পাটলিপুত্র হইতে 'অশ্বঘোষ' নামক বৌদ্ধগ্রন্থ রচয়িতা মহাস্থবিরকে লইয়া

---

* অনেকে বলেন পারসিক সত্রপ (Satrap) শব্দ হইতে সংস্কৃত ক্ষত্রিয় শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করুন। তবে মথুরায় সোদাস, রঞ্জুবুল, মণিগুল প্রভৃতি কয়েকজন সত্রপের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

আসিয়া নিজ সভাসদ্ করেন। গান্ধার হইতে মগধ পর্য্যন্ত নানাস্থানে ইঁহার মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে গ্রীক, পারসিক, বা ভারতীয় কোন কোন দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মুদ্রাগুলির মধ্যে যে গুলিতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, সেগুলি পর্য্যন্ত তৎকাল প্রচলিত রাজভাষা [Court language] গ্রীক্ অক্ষরে লিখিত।

টাকার থলি হস্তে কুবের মূর্ত্তি (কুশান যুগ)

সম্রাট্ কণিষ্কের সময় হইতেই বৌদ্ধগণের মহাযান সম্প্রদায় অধিকতর ভাবে প্রতিপত্তি লাভ করে। সম্রাট্ রাজ-কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই বৌদ্ধমঠে যাইয়া মহাস্থবিরগণের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের আলোচনা করিতেন। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে কোথাও কোথাও পরস্পর বিরোধী মত দেখিয়া, সংশয় ভঞ্জন জন্য একটী মহা সঙ্গীতি আহ্বান করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে কুণ্ডল ভবন নামক মঠে, ভারতের নানা স্থান হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্রবিৎ ৫০০ শত মহাস্থবিরকে তথায় আনয়ন করেন। বৌদ্ধ মহাস্থবির বসুমিত্র এই সভার অধ্যক্ষপদে বৃত হইয়াছিলেন। অশ্বঘোষ তাঁহার সহকারীর কর্ম্ম করেন। সেই মহা সভায় 'মহাবিভাষ' নামে একখানি সুবৃহৎ বৌদ্ধ কোষ রচিত হয়। প্রবাদ এই যে সেই গ্রন্থখানি তাম্র ফলকে খোদিত করিয়া শ্রীনগর সমীপবর্ত্তী কোন স্তূপতলে আজিও প্রোথিত আছে। এই বৌদ্ধ মহা-সঙ্গীতির স্মৃতিরক্ষা জন্য সম্রাট্ সমগ্র কাশ্মীরের রমণীয় উপত্যকা প্রদেশটাই বৌদ্ধ-সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন।

ইনি কাশ্মীরে কণিষ্কপুর নামে যে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এবং কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, হুস্ক, জুস্ক ও কণিষ্ক নামে তিনজন পুণ্যবান তুরস্ক বংশীয় রাজার সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অতিশয় প্রবল হইয়াছিল।

ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যান পাওয়া যায়। ইনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কি হইবে? ইঁহার হৃদয় হইতে রাজ্য বিস্তারের প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষা শেষ জীবনেও তিরোহিত হয় নাই। একজন মথুরাবাসী অমাত্যের পরামর্শে ইনি চতুরঙ্গিনী-বাহিনী লইয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। তিনদিক জয় করিয়া যখন উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইঁহার রণশ্রান্ত সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা একদিন সুযোগ বুঝিয়া চক্রান্ত করিয়া সম্রাট্ যখন লেপ মুড়িদিয়া রোগ শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, তখন একজন আততায়ী আসিয়া তাঁহার বক্ষের উপর বসিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণ সংহার করিল। ইনি অনুমান ৪৫ বৎসর কাল ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পেশওয়ার ও মথুরা প্রভৃতি যে যে স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল, সেই সকল স্থানে ইহাঁর মুদ্রা ও ইঁহার নামাঙ্কিত বহু সংখ্যক শিলাফলকের ধ্বংসাবশেষ সকল পাওয়া যাইতেছে। সম্রাট্ কণিষ্ক বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা ইঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক-গ্রন্থরচয়িতা চরক ইঁহার রাজত্বকালে, ও সম্ভবতঃ ইঁহার আনুকূল্যে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং

বুঝা যাইতেছে যে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে নহে, চিকিৎসা বিস্তার দিকেও ইঁহার দৃষ্টি ছিল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তক্ষশিলা, পেশওয়ার প্রভৃতি স্থানে লতা-পুষ্পাদি বিজড়িত স্বভাবের অনুকারী যে সুচারু গান্ধার শিল্প নামক কারুকার্য্য-পূর্ণ গঠন সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ইঁহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইলেও, এই কণিষ্কের সময়ে তাহা সমধিক উৎকর্ষতা লাভ করে।
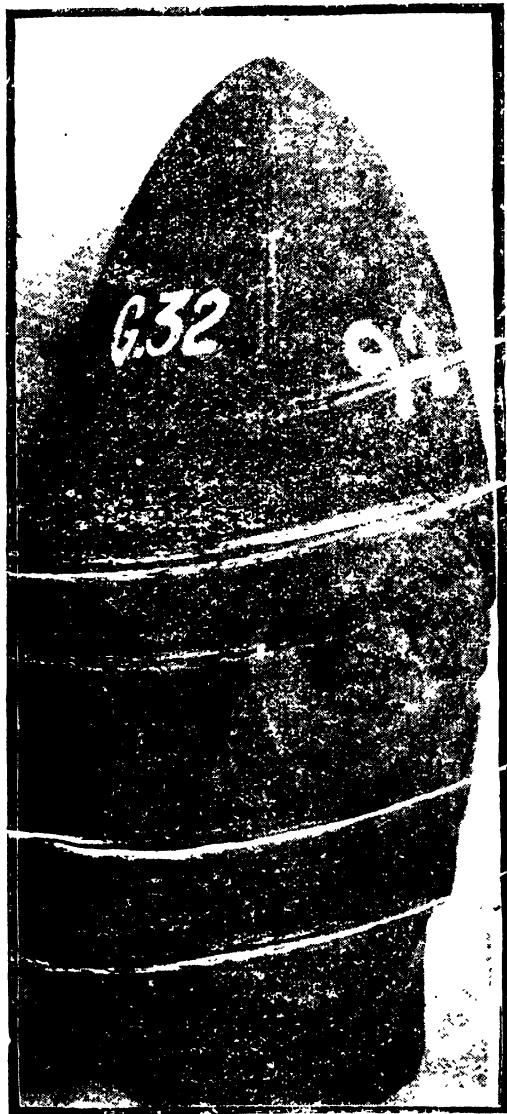
মস্তকে তুর্কী টুপী পরা কুশান বীর বা সত্রপের মুণ্ড

এই গান্ধার শিল্পে, গ্রীক্ ও রোমকদিগের কতকটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শিল্প খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। শুধু গান্ধারে নহে, মথুরার সমীপবর্ত্তী অনেক স্থানে বৌদ্ধ তীর্থ সমূহে ইহার নিদর্শন সকল পাওয়া যাইতেছে। স্যার আলেক্‌জন্দর ক্যানিংহাম সাহেব বলেন যে, সম্রাট্ কণিষ্ক গান্ধার হইতে আনীত কারিগরদিগের সাহায্যে, আগরার সন্নিহিত ফতেপুর শিক্‌রী হইতে লাল বর্ণের বালুকা প্রস্তর সকল আনাইয়া, মথুরা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি ও অপরাপর ভাস্কর কার্য্য সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মথুরার সমীপবর্ত্তী নানা স্থানে ইঁহার সময়ের ও ইঁহার নামাঙ্কিত অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

মথুরা হইতে ৯ মাইল উত্তরে, বৃন্দাবনের অপর দিকে, যমুনার পূর্ব্ব তীরে বেল বনের কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে 'মাঠ' গ্রাম নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। মথুরার প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত রায় রাধাকিষণ বাহাদুর সেই গ্রামের একটী ভগ্ন মাঠের ধ্বংসাবশেষ হইতে ধূসর পাষাণ রচিত কণিষ্কের মুণ্ডহীন একটি মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। সে টিলাটী দৈর্ঘ্যে ২২০ ফুট ও প্রস্থে ১৩০ ফুট। প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তিনি পুরাতন প্রাচীরের অবশেষ দেখিতে পান। সে টিলাটীর নাম "চৌক্র" টিলা। ইহার মধ্যে যে দেবকুল ছিল সেটী মাপে ১০০×৫৯ ফুট। ইহার নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে। তাহার ভিতর হইতে যে সকল ইষ্টক খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি এই দেবকুলের ইটের মত এবং পুষ্করিণীর মধ্য হইতে অনেকগুলি ভগ্নমূর্ত্তি মিলিয়াছে। তন্মধ্যে একটী নাগরাজ মূর্ত্তিও আছে। কণিষ্কের ভগ্ন মূর্ত্তিটী উচ্চে পাদপীঠ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। মস্তক ও উভয় বাহু নাই। ইহার দক্ষিণ করে রাজদণ্ড, বাম করে পক্ষীমুখাকৃতি তরবারি-মুষ্টি ধরিয়াছেন।

জানুর অধঃ পর্য্যন্ত লম্বিত জুব্বা (over coat] পরিহিত। কটিতে কোমর বন্ধ, পদে যে বুট জুতা আছে সেরূপ জুতা আজিও তুর্কীস্থানের লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। তরবারির অগ্রভাগ ভগ্ন, ইহার কোষখানা কোমর বন্ধের সহিত আবদ্ধ, দক্ষিণ করের রাজদণ্ডটা ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে অনেকটা মল্লগণের ভাঁজিবার গদা মুদ্গরের মত। এটী কোন অস্ত্র বা রাজচিহ্ন [Sceptre] কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। পরিচ্ছদটা বীরজনোচিত, পরিচ্ছদের উপর জানুর নিকট ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত আছে :—

"মহারাজাতিরাজ দেব পুত্র কণিষ্ক" অক্ষরগুলা মাপে ১ হইতে ১॥০ ইঞ্চি। (Archæological Survey of India 1911—12 page 120 দ্রষ্টব্য) মথুরা প্রদেশে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিটা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এ দেশের সহিত কণিষ্কের সংস্রব বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবেই ছিল। *

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মানসী ও মর্ম্মবাণীর ৩৩৪ পৃষ্ঠায় যে পরম রমণীয় নারীমূর্ত্তিটির চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সে মূর্ত্তিটিকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা, কোনও কুশান রাজমহিষীর মূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। খুব সম্ভব এটি কণিষ্কের প্রধানা মহিষীর মূর্ত্তি হইতে পারে। ইনি পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মানা, করদ্বয় মধ্যে যে পেটকটী রহিয়াছে তাহার ভিতর বুদ্ধদেবের স্বুবর্ণ বা মণিময় মূর্ত্তি ছিল, এখন তাহা অপহৃত। গান্ধার শিল্পের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ঐ চিত্রখানি দেওয়া হইয়াছে। এ মূর্ত্তিটি গান্ধারে পাওয়া গিয়াছে। ৩৩৫ পৃষ্ঠার চিত্র খানি কোন বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারের কপালি (lintel) চারিটি বুদ্ধ মূর্ত্তির পার্শ্বে একজন ভক্ত করযোড়ে উপবিষ্ট।

কেবল সম্রাট রাজা বা সম্ভ্রান্ত ধনীলোকেরাই যে স্তূপ বিহারাদি নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা নহে। কোথাও কোথাও সাধারণ প্রজারা চাঁদা তুলিয়া ঐ সকল পুণ্য কীর্ত্তি স্থাপন করিতেন। স্তম্ভ বা রেলিংএর গাত্রে চাঁদ-দাতা স্ত্রী ও পুরুষের নাম খোদিত থাকিত। আবার কেহ কেহ আপনাদের নিজস্ব কুলদেবতাও স্থাপন করিতেন।

বষিষ্ক ও হুবিষ্ক

মথুরায় প্রাপ্ত কয়েকখানা ভগ্ন শিলালেখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই নগরে কণিষ্কের পর বষিষ্ক ও হুবিষ্ক রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা উভয়েই কণিষ্কের পুত্র হইবেন। ইঁহাদের পিতা যখন সুদূর উত্তর পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করিতে যাইতেন, তখন ইঁহারা প্রতিনিধি রূপে মথুরায় থাকিয়া দেশ শাসন করিতেন। বষিষ্কের কোনও মুদ্রা পাওয়া যায় না। হয়ত পিতার পূর্ব্বেই ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। হুবিষ্কই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইঁহার অপর সংক্ষিপ্ত নাম

দেবপুত্র সম্রাট্ হুবিষ্কের নামে পরিচিত মূর্ত্তি

জুষ্ক। কাবুল, কাশ্মীর ও মথুরায় হবিষ্কের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এ দেশগুলি যে তাঁহার অধিকারে ভুক্ত ছিল সে বিষয়ে সংশয় নাই। মথুরা সহরেই হবিষ্কের নামে একটী বিশাল ও সুসমৃদ্ধ বিহার ছিল। তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। মথুরার দক্ষিণদিকে 'জামালপুর' নামক স্থানে একটী ভগ্নস্তূপে বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; তাহার পাদপীঠে লিখিত আছে যে জীবক উদয়ন নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুক সেটীকে 'দেবপুত্র হবিষ্কের' বিহারে দান করিয়াছিলেন। হবিষ্কও যে বৌদ্ধদিগের প্রতি পিতার ন্যায় অতিশয় সদয় ও অনুরক্ত ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ইঁহার মুদ্রাগুলির গাত্রে কোন কোন গ্রীকদেবতারও মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত কোন মুদ্রা অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। ইনি কাশ্মীরে বরামুলা পথের পার্শ্বে হবিষ্কপুর নামে একটী নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। উহার বর্ত্তমান নাম 'উষ্কাপুর'। কেহ কেহ কেহ ইহাকে কাশ্মীরের পশ্চিম ফটক নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। সহরটী বহুকাল পর্য্যন্ত খ্যাতাপন্ন ছিল। ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন হীয়ুয়ুসাঙ্ হবিষ্কপুরে গিয়াছিলেন, তখন তিনি এখানে ৫০০০ হাজার বৌদ্ধ যতি দখিতে পান, এবং তাহাদের বিহারে ইনি সমাদৃত অতিথি রূপে কয়েক দিন বাস করেন। ইনিও বোধহয় দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার জীবনে রাজনৈতিক কোন ঘটনার বিষয় জানিতে পারা যায় না। তবে ইনি যে পিতার ন্যায় ভাস্কর ও শিল্প কার্য্যে উৎসাহ দাতা ছিলেন, সে কথা ইঁহার সময়ের নানা ধ্বংসাবশেষ হইতে জানিতে পারা যায়। যে মাঠগ্রামে কণিষ্কের মুর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সেই গ্রাম হইতে দুই খণ্ডে বিভক্ত, মুণ্ডহীন, সিংহাসনে উপবিষ্ট, অপর একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সেইটী উচ্চে ৬ফুঃ ১০ ইঃ, পাদ পীঠ ৩ফুঃ ৩ইঃ×৩ফুঃ ৩ইঃ। মূর্ত্তির কটিদেশের নিকট কেহ যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে সযত্নে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল।

দেবপুত্র সম্রাট্ কণিষ্কের মূর্ত্তি

সিংহাসনের দুইদিকে দুইটা সিংহের মুখ দেখা যায়, গাত্রের উপরে পরিচ্ছদ আবৃত। তিনি যেন পদদ্বয় ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। ইহার দক্ষিণ হস্তে যে তরবারি ছিল, তাহার মুষ্টিমাত্র এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে, অপর অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাম হস্তটাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার কোষখানা যে এই হস্তে সংলগ্ন ছিল তাহার চিহ্ন এখনও জানুদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপরিচ্ছদ জানুদেশে পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তাহার প্রান্ত ভাগে যেন কোনরূপ জরির কায করা পাড় বসান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে বাজুবন্ধ রহিয়াছে। পায়ে তুর্কী দেশীয় বুট জুতা।

কুশানযুগের বৌদ্ধ শয়তান মার।
পৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা যক্ষিণী মূর্ত্তি।
(হিন্দুশাস্ত্রমতেও যক্ষেরা নরবাহন)

পাদপীঠে ব্রাহ্মী অক্ষরে চারিছাত্রে লিখিত আছে ;—
"মহারাজ রাজাতিরাজ দেবপুত্র।
কুশান পুত্র সহিবমতক্ষ মস্ত।
বকন পতিনা হুমা...... দেবকুল কারিতা।
আরামো পুষ্করিণী উদপান চ সদকো থাকো॥"

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে এই রাজার নামের প্রথম ভাগে 'হুমা' ছিল; তাহার পর নামটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি দেবকুল মন্দির আরাম উদ্যান পুষ্করিণী ও উদপান (কূ) প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যে ভগ্ন মন্দিরে এ মূর্ত্তিটী পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভিত্তিমাত্র এখনও অবশিষ্ট আছে। পুষ্করিণীটী মজিয়া গিয়াছে [এই গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে আরও ২।৪ টা ভগ্নমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের গাত্রেও কুশান রাজগণের মত কোমর বন্ধ আঁটা বীর পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু তাহাদিগের মস্তক হস্ত পদাদি নাই এবং যে সকল লিপি খোদিত ছিল তাহা কালবশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।] উপরউক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তিটীকে কেহ কেহ হুবিষ্কের মূর্ত্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এমূর্ত্তিটী তাঁহার কিনা ঠিক বলা যায় না। এই 'হুমা' নাম হইতে এটিকে অনেকে ওয়েমা বা বিম কজুদফিসের মূর্ত্তি মনে করেন। তবে যে এটী কোন কুশান রাজের মূর্ত্তি তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। কণিষ্কেরও মূর্ত্তিটি এখন মথুরার যাদুঘরে রহিয়াছে।

হুবিষ্কের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বাসুদেব ১ম। ইঁহার হিন্দুনাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে তৎকালে কুশান বংশীয় রাজারা ভিন্ন দেশীয় লোক হইলেও এ দেশীয় নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ দেশীয় জন সাধারণের দলে মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং ইঁহার মুদ্রাগুলিতেও শিবমূর্ত্তি, ত্রিশূল ও বৃষ প্রভৃতি অঙ্কিত আছে। মথুরা প্রদেশেই ইঁহার সময়ের অধিকাংশ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাইতেছে। ইঁহার বিষয়ে অপর কোন কথাই অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই; তবে খৃঃ পূঃ ২২০তে ইঁহার রাজত্ব শেষ হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। এই বাসুদেবের পর হইতে উত্তর ভারতে কুশান বংশীয় রাজগণের প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছিল। ইহার পর এ বংশীয় আর কোন প্রবল-প্রতাপান্বিত নরপতি মথুরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানিতে পারা যায় না। হয়ত এ প্রদেশ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত

হইয়া পড়িয়াছিল। ২৩০ হইতে শতাধিক বৎসর যাবৎ ভারতের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। সম্রাট্ অশোক আপনাকে 'দেবানাং প্রিয়' বলিয়া স্তম্ভগাত্রে লিপি খোদিত করিয়াছেন। কণিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি কুশান সম্রাটেরা 'দেবপুত্র' নামে পরিচয় শিলালিপিতে দিয়াছেন।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

বিধিলিপি

(গল্প)

তাসের আড্ডার জমাট আসরের রসভঙ্গ করিয়া গোকুল ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র মহেশ আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "জ্যেঠামশাই, ও জ্যেঠামশাই! ভারী মজা!"

মহেশ দশ বৎসরের বালক। দিনের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই সে 'মজার' আস্বাদন পাইয়া থাকে, কাযেই জ্যেষ্ঠতাত গোকুলচন্দ্র তাহার কথায় কিছুমাত্র মনোনিবেশ করা আবশ্যক মনে না করিয়া, হাতের তাসগুলি লইয়া চিন্তিত ভাবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মহেশ নাছোড়বান্দা। সে পুনরায় বলিল, "ও কি ছাই তাস দেখছো, আমি যা বলছি তা যদি দেখো তো মুখে আর বাক্যি থাকবে না।"

গোকুল এবার ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে মহ্‌শা, কি? চেঁচাচ্ছিস কেন গাঁ গাঁ করে?"

মহেশ বলিল, "চেঁচাচ্ছি কেন জিজ্ঞেস কর গিয়ে তৈলোক্যকে। সেও নিজের চক্ষে দেখেছে।"

"কি দেখেছে, কি?"

মহেশ তখন বলিল, "পুকুর পাড়ের পশ্চিম দিকটার সে বড় কলাগাছটার কি হয়েছে জান?"

"কি আবার হবে?"

মহেশ হি হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল, "কলাগাছের মাথার কাছ থেকে তো কাঁদি বেরোয়, তা জান তো? কিন্তু এ গাছটার কাঁদি বেরিয়েছে কোথা থেকে তা জান?"

"কোথা থেকে রে?"

"একেবারে মাঝখান থেকে।"

গোকুলচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধমক দিয়া বলিলেন, "দূর হতভাগা। যত সব গাঁজাখুরি গল্প নিয়ে এল। কলা-গাছের মাঝখান থেকে কখনও কলার কাঁদি বেরোয়, পাগল কোথাকার!"

মহেশ বলিল, "মা কালীর দিব্বি জেঠামশাই। জিজ্ঞাসা কর বরং এই তৈলোক্যকে।"

ত্রৈলোক্য বাড়ীর কৃষাণ। সেও বলিল যে প্রকৃতই উক্ত কদলী বৃক্ষটীর মধ্যস্থল ভেদ করিয়া এক কাঁদি কলা বাহির হইয়াছে।

তাসের খেলোয়াড়গণের তখন চমক ভাঙ্গিল। তাস যোড়াটা তুলিয়া রাখিয়া তখন প্রায় সকলেই পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে যাইয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, মহেশ এবং ত্রৈলোক্যর কথা অপ্রকৃত নয়। গাছের মাঝখানে এক কাঁদি কলা ফলিয়াছে।

গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য তো। যখন মোচা পড়ে ছিল, তখনও তো আমরা কেউ লক্ষ্য করি নি।"

নব্য দলের যোগেশচন্দ্র বলিলেন, "আহা হাঃ, একটা ক্যামেরা থাকলে গাছটার একখানা ফোটোগ্রাফ নেওয়া যেত হে।"

নবীন নামা আর একটী ছোকরা বলিল, "গাছটাকে উপড়ে একটা গামলায় পুঁতে প্যারিস একজিবিসনে পাঠিয়ে দিলেও হয়।"

এইরূপ নানা মন্তব্য করিতে করিতে দর্শকবৃন্দ পুনরায় গোকুল ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিলেন, কেবল ভৈরব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ফিরিলেন না, বলিলেন যে কি একটা কার্য্য সারিয়া তিনি এখনই আসিতেছেন।

২

সন্ধ্যার সময় সকলেই নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া রহিলেন গোকুলচন্দ্র, ভৈরব মুখোপাধ্যায় ও তিনকড়ি সরকার নামীয় গোকুলচন্দ্রের অনুগৃহীত এক ব্যক্তি।

ভৈরবচন্দ্র হুঁকায় একটা টান দিয়া গোকুলচন্দ্রকে বলিলেন, "ভায়া হে, ঐ যে কলাগাছ দেখে তোমরা এই চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এলে, আর আমি বাড়ীর দিকে একবার গেলাম, মনে আছে তো?"

গোকুলচন্দ্র জানাইলেন যে সে কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই।

ভৈরবচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "মনে একটা খটকা ঠেকলো তাই বাড়ী গিয়ে একখানা বই খুলে দেখলাম। দেখি যে, যা মনে ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মন নারায়ণ কি না।" বলিয়া হুঁকার আর একটা টান দিলেন।

গোকুলচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভৈরবচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। ভূমিকাটা শুনিয়া প্রকৃত কথাটী যে কি তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

ভৈরব বলিলেন, "কুষ্ঠী আছে তোমার?"

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, "না।"

"থাকলে একবার দেখতাম। কিসের দশাটা তোমার যাচ্ছে তা হলে ঠিক জানা যেত।"

গোকুলচন্দ্রের বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল। তিনি বলিলেন, "কেন বলুন দিকিনি?"

ভৈরব যেন একটু চিন্তাযুক্ত ভাবেই বলিতে লাগিলেন, "কথা আছে এর মধ্যে রে ভাই। ঐযে কলাগাছের মাঝখান দিয়ে কাঁদি বেরিয়েছে, ওটা বড় ভয়ানক দুর্লক্ষণ ভায়া।"

গোকুলচন্দ্রের বুকের ভিতরটা যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "কি রকম?"

ভৈরব আবার হুঁকা হাতে করিয়া বলিলেন, "সেই জন্যে তো বইখানা দেখতে গিয়েছিলাম।"

"কি দেখলেন?"

"যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই দেখলাম।"

গোকুলচন্দ্র আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভেবেছিলেন বা কি, আর দেখলেনই বা কি?"

ভৈরব বলিলেন, "কথাটা তোমাকে বলবো কি না তাই ভাবছিলাম। কিন্তু না বল্লে তো আর তুমি ছাড়বে না হে ভায়া, কাযেই বলতে হল। অপ্রিয় সত্য গোপন করাটাই শাস্ত্রের আদেশ কি না।"

অপ্রিয় সত্য! গোকুলচন্দ্রের মুখখানা যেন এক মুহূর্ত্তে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ভৈরব দা, তোমার পায়ে পড়ি কি কথাটা খুলে বল। আমাকে আর ধোঁকার মধ্যে রেখো না।"

"তাই তো বলছি। ঐ যে কলাগাছ—ও বড় সর্ব্বনেশে কলাগাছ গোকুল। ও তো কলাগাছ নয়—সাক্ষাৎ শমন তোমার বাড়ীতে এসেছেন। যে বাড়ীতে কলাগাছের মাথা থেকে না বেরিয়া মাঝখান ফুঁড়ে কলার কাঁদী বেরোয়, সে বাড়ীর গিন্নী—তাঁর কি হয় জানো?"

"না।"

"পরলোক প্রাপ্তি।"

এঁ্যা! গোকুল চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি ভৈরবদা? সত্যি বলছেন, না রহস্য করছেন?"

ভৈরব বলিলেন, "একটা লণ্ঠন নিয়ে চল বরং আমার বাড়ী, বইখানা পড়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবে চলো। সেই জন্যেই তো তখন এখানে না এসে বইখানা দেখতে বাড়ীতে গেলাম।"

গোকুলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার নিশ্বাস দ্রুত পড়িতে লাগিল। তারপর তিনি বলিলেন, "আচ্ছা গাছটাকে যদি কেটে ফেলি ?"

ভৈরব হাসিয়া বলিলেন, "গায়ে কাদা মাখলে কি আর যমে ছাড়ে রে ভাই!" বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

৩

বাড়ীর মধ্যে আসিয়া গোকুলচন্দ্র আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। তাঁহার মনের ভিতরটা তখনও গুরু গুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া গোকুলচন্দ্রের মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। প্রায় পনের বৎসর হইল তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে স্ত্রী সামান্য কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়ীতে যাওয়া ছাড়া আর কাছছাড়া হয় নাই। এই স্ত্রীর মৃত্যুর ওয়ারেণ্ট কি না তাঁহারই বাগানের পুষ্করিণীর পশ্চিমপাড়ে কলাগাছ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে! কি সর্ব্বনাশ! কথাটা ভাবিলেও যে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে।

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমার সে অম্লশূলের ব্যথাটা কেমন ?"

স্ত্রী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ হঠাৎ সে কথা মনে পড়লো যে ? সে তো সেই মাদুলী নিয়ে আজ বলতে নেই দুবছর টের পাই নি।"

গোকুল বলিলেন, "হুঁ।" পরমুহূর্ত্তেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই পালা জ্বরটাও বোধ করি আর হয় নি ?"

স্ত্রী বলিলেন, "না। সেই যে উপের মা শেকড় বেঁধে দিয়েছিল, তাতেই সেরেছে।" বলিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এ সব পুরোণো কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন গা ?"

গোকুল বলিলেন, "না, অমনিই।" বলিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলেন স্ত্রীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর একটু তৈল-সিক্ত বস্ত্রখণ্ড বাঁধা রহিয়াছে। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে ও কি ? ন্যাকড়া জড়ানো কেন ?"

স্ত্রী বলিলেন, "মাছ কুটতে গিয়ে হাতে মাছের কাঁটা ফুটে গিয়েছে।"

গোকুল চোখ দুটী কপালে তুলিয়া বলিলেন, "কি দিয়েছ ?"

"ন্যাকড়ায় সরষের তেল ভিজিয়ে।"

"সরষের তেল ভিজিয়ে ? কি সর্ব্বনাশ!" গোকুল ভাবিলেন, ব্যস! আর দেখিতে হইবে না। একে তো মাছ কুটিয়াছে, সুতরাং বিষাক্ত হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা, তার উপর কিনা সর্ষপ তৈল! গোকুল দিব্যচক্ষে দেখিল ঐ ক্ষুদ্র ক্ষত ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া সেপ্টিক হইবে, তারপর গ্যাংগ্রীণ হইয়া পচিবে, তার সঙ্গে জ্বর, এবং তার পরিণাম যাহা হইবার তাহা তো পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়েই কলাগাছ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে। হায় রে অদৃষ্ট!

গোকুলের চক্ষু দিয়া এক ফোঁটা জল অলক্ষিতে গড়াইয়া পড়িল। সে অক্ষুধার দোহাই দিয়া উঠিল, আর আহার করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

৪

তিনকড়ি লোকটী নিষ্কর্ম্মার একশেষ, বৎসরের মধ্যে সাড়ে এগার মাস সে গোকুলচন্দ্রের অন্নধ্বংস করিয়া তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে বসবাস করিত এবং বাগান ও চাষ-বাসের তত্ত্বাবধান করিবার ছলে মাঝে মাঝে কিছু রোজগারও করিত। তাহাতেই তাহার নেশার খরচটা একরূপে চলিয়া যাইত। গোকুলচন্দ্রের সহিত তাহার কি রকম একটা বহুদূরের সম্পর্ক ছিল, সে তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত।

পরদিন প্রাতে গোকুলচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে আসিলে তিনকড়ি বলিল, "দাদা মুখখানি যেন শুকনো শুকনো দেখছি। কাল ঘুমোও নি নাকি সারা রাত ?" বলিয়া হুঁকাটা তাঁহার হাতে দিল।

গোকুলচন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। একমনে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বদিনে ভৈরব মুখোপাধ্যায়ের সহিত গোকুলের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তিনকড়ি সবই শুনিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার এই বিমর্ষতার কারণ অনুমান করিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

দুই একটা একথা সেকথার পর তিনকড়ি বলিল, "কাল সন্ধ্যেবেলা ভৈরব মুখুয্য মশায়ের কথাটা শুনে পর্য্যন্ত আমারও মনের ভেতরটা যেন হাঁচোড় পাঁচোড় কচ্ছে। আচ্ছা দাদা, এক সত্য কথা বলে কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

গোকুল শুষ্কমুখে বলিলেন, "বিশ্বাস না হবার তো তো কোন কারণ দেখিনে। আরও আশ্চর্য্য দেখ তিনকড়ি, কালকেই আবার বড় বৌয়ের হাতে মাছের কাঁটা ফুটে এক ভয়ানক ইয়ে হয়ে গিয়েছে। রোজই তো তিনি মাছ কোটেন, এতদিন কিছু হল না, আর হঠাৎ কালকেই বা মাছের কাঁটা ফুটলো কেন বল? যা ঘটবে তা তো প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।" বলিয়া গোকুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

তিনকড়ি বলিল, "আমার কিন্তু মাথায় একটা ফন্দী এসেছে দাদা। তুমি যদি অভয় দাও তো বলি।"

গোকুল বলিলেন, "কি ফন্দী বল দিকিনি।"

তিনকড়ি বলিল, "ভৈরব মুখুয্যে মশাই তো বলেন যে বাড়ীর যিনি গিন্নি তাঁরই দুর্ঘটনা ঘটবে, আমাদের বড় বৌয়েরই যে—দুর্গা তাঁর শরীর ভাল রাখুন—যে কিছু অমন্দ—বুঝেছেন তো—তা তো আর স্পষ্ট করে করে বলেন নি। কাযেই এক্ষেত্রে এক কায করলেই সব গোল মিটে যায়।"

গোকুল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কায?"

"পুঁত্তঘাটায় আমার এক পিসী-ঠাকরুণ আছেন। সংসারে তাঁর আর আপনার বলতে কেউ নেই। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বুড়ীর তো হাড় মাস কালি হয়ে গেল—বয়সও প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। আমি বলছিলাম কি, তাঁকে কেন নিয়ে আসুন না—থাকুন তিনি এখানে এসে বাড়ীর গিন্নী হয়ে। ভগবান করেন যদি একটা খারাপ ঘটনা সতি সত্যিই ঘটে, তা হলে তাঁর ওপর দিয়েই যাবে, বড় বৌয়ের গায়ে আঁচড়টী লাগবে না। আর তিনিও সত্তর বছরের বুড়ী, মুদ্দোফরাস তো তাঁর মাথার কাছে খোন্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—"

গোকুলচন্দ্র একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভাগ্যের সঙ্গে কি আর ফন্দীবাজী চলে হে তিনকড়ি? তা চলে না।" মুখে কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতর তিনকড়ির প্রস্তাবটা কার্য্য করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল যে তিনকড়ির পিসী যদি আসেন তাহা হইলে আসুন না কেন, তাহাতে যদি সত্য সত্যই বড়বৌ বাঁচিয়া যায় তো মন্দ কি, আর যদি ভৈরবের কথাটা মিথ্যাই হয়, তাহা হইলেই বা মন্দ কি; সংসারে লোকাভাব, এই বৃদ্ধার দ্বারা তবু যৎসামান্য সাহায্য ও সাংসারিক কার্য্যে বড় বধূর শ্রমের লাঘব হইতে পারিবে।

অবশেষে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, ভাল কথা তিনকড়ি। আনাও তোমার পিসীমাকে। আজই বরং টিকিট কেটে রওনা হয়ে যাও। কাল না হয় পরশু সকালেই যাতে এখানে পৌছুতে পার তার বিশেষ চেষ্টা কোরো।"

তিনকড়ি অপরাহ্ণেই পুঁত্তিঘাটা রওনা হইল।

৫

পিসীমা আসিয়া যখন পৌছিলেন, তখন দেখা গেল যে যে তাঁহার বয়স সত্তর তো নহেই, সম্ভবতঃ পঞ্চাশের সামান্য কিছু বেশী হইতে পারে। দেহখানির স্থূলতা দেখিলে ম্যালেরিয়া দ্বারা যে তাঁহার 'হাড় মাস কালি' হইয়াছে একথা বিশ্বাস করিবার কোন উপায় থাকে না। গরুর গাড়ী হইতে সকলে নামিলে দেখা গেল যে পশ্চাতে আরও একটী স্ত্রীলোক রহিয়াছে,

ঘোমটা ও সিঁদুরের অভাবে তাহাকে যেন অবিবাহিতা কুমারী বলিয়াই মনে হয়। হঠাৎ দেখিলে মেয়েটাকে পনের ষোল বৎসরের যুবতী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তিনকড়ির পিসীমাতা পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মেয়েটী তাঁহার পরলোকগত ভাসুরের একমাত্র কন্যা, শৈশবেই মাতৃহীন হইয়া কাকীমার নিকট প্রতিপালিত এবং সে সবে মাত্র আট বৎসর অতিক্রম করিয়া নবমবর্ষে নিজ পদদ্বয় স্থাপন করিয়াছে। মেয়েটাকে রাখিয়া আসিবার স্থান নাই কাযেই সঙ্গে আনিতে হইয়াছে।

কিন্তু এত আয়োজন যাহার মঙ্গলের জন্য করা হইল, সেই বড় বধূ সেদিন রাত্রে স্বামীকে বলিলেন, "এসব আবার কি কাণ্ড? ওঁরা সব কি কত্তে এলেন?"

গোকুলচন্দ্র আসল কথাটাকে গোপন করিয়া বলিলেন, "তোমার শরীর ভাল নয়, যত্ন আত্তি করবার লোকও ত বাড়ীতে আর কেউ নেই, সেই জন্যই তিনকড়িকে বলে ওঁদের আনালাম।"

বড় বধূ শ্লেষের সহিত বলিলেন, "হঠাৎ একেবারে দরদ যে উছলে উঠলো?"

গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "এর আর উছলে ওঠা কি? তোমার কষ্ট হচ্ছে, কাযেই—"

বড় বধূ ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "নাও নাও আর ন্যাকাপনায় কায নেই।"

৬

কয়েকদিন গত হইল। সেদিন আহারান্তে পাণ চিবাইতে চিবাইতে গোকুলচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া তিনকড়িকে বলিলেন, "তোমার পিসীমার ঐ যে ভাসুরঝিটী—কি নামটা ভাল মেয়েটীর—"

তিনকড়ি বলিল, "চারুবালা।"

"মেয়েটী কাযে কর্ম্মে বেশ মজবুত আছে দেখতে পাচ্ছি। আর রাঁধেও মন্দ নয়। আজ শুনলাম যে হেঁসেলের সমস্ত কাযই নাকি ওই করে।"

তিনকড়ি বলিল, "সেই জন্যেই তো ওকে নিয়ে আসতে পিসীমাকে পই পই করে বলেছিলাম। রান্নায় ওর যোড়া পাবেন না। কাল যে এঁচোড়ের ডালনা খেলেন, তা কে রেঁধেছিল জানেন?"

গোকুল বলিলেন, "না। কে চারু রেঁধেছিল নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"বল কি তিনকড়ি? তুমি যে অবাক কল্লে দেখতে পাই। সে রকম এঁচোড়ের ডালনা তো আমি কখনও খাই নি।"

তিনকড়ি বলিল, "কালকে আবার আমায় বলছিল যে যদি কেয়াফুল পায়, তা হলে এমনি চমৎকার কেয়া খয়ের তৈরী কত্তে পারে যে, পাণ খেয়ে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।"

গোকুল উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "সত্যি নাকি তিনকড়ি? এ কথা তো তুমি এতক্ষণ বলনি। এখানে কেয়াফুল পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কলকাতায় তো অঢেল কেয়াফুল পাওয়া যায়। তুমি কালকে বরং কলকাতা থেকে আরও কি কি আনতে হবে তার একটা ফর্দ্দ নিয়ে চলে যাও কলকাতায়। ভোরের ট্রেণে গেলে আবার আড়াইটের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে।"

দুই আনার কেয়াফুল আনিতে তিনটাকা খরচ করিয়া পরদিন প্রত্যূষে তিনকড়ি কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং কেয়াফুল আনিয়া চারুবালার হাতে দিয়া বলিল, "এই নে তোর কেয়াফুল। কেয়া খয়ের করে তারই পাণ সেজে নিজে হাতে করে ঘোষ মশাইকে দিয়ে আসবি, তবেই তোকে বলবো যে হাঁ বাহাদুর মেয়ে বটে।"

পাণের ডিবা হাতে করিয়া চারুবালা যখন গোকুলচন্দ্রকে পান দিতে আসিল, তখন তিনি আহারাদি অন্তে শয্যায় শয়ন করিয়া দুই হাতে একখানি বই ধরিয়া পড়িতেছিলেন। চারুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই কি সেই কেয়া খয়ের দেওয়া পাণ নাকি?"

চারু গোকুলচন্দ্রের সহিত কথা কহিত না, সুতরাং ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে হাঁ তাই বটে।

গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "কি করে পাণ নেব বল?

দু হাত যোড়া রয়েছে যে। দু হাতে বই ধরে রইছি। তার চেয়ে বরং ইয়ে কর না কেন—"

চারুবালা চুপ করিয়া সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "ইয়ে কর বয়স্ক। আমি হাঁ করি, আর তুমি একটা পাণ টুপ করে আমার মুখের মধ্যে ফেলে দাও। দুখানা হাতই যোড়া থেকেই মুস্কিল হয়েছে কি না।"

চারুবালা গোকুলের কথা শুনিয়া পাণের ডিবা রাখিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

৭

প্রায় তিনমাস গত হইয়াছে। একদিন গোকুলচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক টানিতেছিলেন, এমন সময় তিনকড়ি বলিল, "দাদার মুখখানি যেন শুকনো দেখছি।"

গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "কৈ না।"

তিনকড়ি মহা চিন্তান্বিতের ন্যায় বলিল, "হাঁ, শুকিয়ে গিয়েছে বই কি, আজ যেন চেহারার কোন চটক নেই, চোখের কোণ দুটোয় যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে। শরীর ভাল আছে তো দাদা?"

গোকুল বলিলেন, "আছে।"

তিনকড়ি কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিল, "পিসীমা তো আর থাকতে চান না।"

গোকুল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

তিনকড়ি বলিল, "ঐ চারুকে নিয়েই মুস্কিল হয়েছে কি না। ওর একটা বিয়ে থাওয়া না দিলে তো আর ভাল দেখায় না। পুস্তিবাটাতেই একটী পাত্তরের সন্ধান পিসীমা করেছিলেন—আমার তাতে মত ছিল না বলেই হয় নি, পাত্তরটীর বয়স খুবই ভারি হয়েছে। পুরোপুরি ষাট বছর না হোক, পঞ্চাশ অনেকদিন পেরিয়েছে, এখন তাকে কি করে মেয়ে দেওয়া যায় বলুন। পিসীমা কাল তাই বলছিলেন যে কোথায়ই বা আর খোঁজ করি, আর কেই বা খোঁজ করে, ভাগ্য ছাড়া যখন আর পথ নেই, তখন না হয় সেইখানেই কাযটা করা যাক, ওর বরাতে থাকে, কিছুকাল মাছভাত খাবে। ওর বিয়েটা দিয়েই আবার পিসীমা আসবেন বলেছেন।"

গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "সে কি কথা তিনকড়ি। বিয়ের এত তাড়াতাড়ি কি? আচ্ছা আমিই তোমার পিসীমাকে বুঝিয়ে বলছি।"

গোকুলচন্দ্র যে ঠিক কি উপায়ে পিসীমাকে বুঝাইলেন তাহা অজ্ঞাত, কিন্তু পিসীমার চলিয়া যাইবার আর কোন আগ্রহ দেখা গেল না। দুই চারিদিন পরে গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "দেখ তিনকড়ি, এ সব বিষয় সম্পত্তি আর কেন? কার জন্যে? কে ভোগ করবে? একটা ছেলেও হল না যে পরে এক গণ্ডূষ জল পাবো। তার চেয়ে বরং সব বেচে কিনে কাশী কিম্বা বৃন্দাবন কোথাও গিয়ে জীবনের বাকী কটা দিন কাটাই। কি বল?"

তিনকড়ি বলিল, "সে কি কথা দাদা! ও কথা শুনলে যে আমার গায়ে জ্বর আসবার মত হয়। কি দুঃখে আপনি বিবাগী হতে যাবেন? ছেলেপিলে হল না সেই দুঃখে? তা বেশ তো, কিসের বয়স আপনার? আপনার মত বয়সে অনেকের বিয়েই হয় না। যদি অভয় দিতেন তা হলে একটা কথা নিবেদন কত্তাম।"

কথাটা যে কি তাহা গোকুলচন্দ্র পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিলেন, "কি বল দিকিনি? এর আর ভয় অভয় কি?"

তিনকড়ি বলিল, "ঐতো চারু মেয়েটী বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। ঘরও আপনাদের পাল্টী। পাত্তরের মধ্যে সন্ধানে আছে তো দেখছি সেই শ্মশানের বুড়ো। তাই বলছিলাম কি যে—না হয়—আপনি যদি—এমন অনেকেই তো করে থাকে—পিসীমাকে বরং—"

গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "সেটা কি ভাল দেখাবে তিনকড়ি? বড়বৌয়ের প্রতি তা হলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না কি?"

তিনকড়ি বলিল, "কিসের বিশ্বাসঘাতকতা? ছেলেপিলে হল না তাই আপনি এ কায করছেন বই তো

নয়? বংশটা তো বজায় রাখতে হবে। বংশলোপ করাটা কতবড় পাপের কায বলুন দিকিনি?"

গোকুলচন্দ্র বলিলেন, এ বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করিবেন।

ভাল করিয়া চিন্তা করিতে বেশী সময় গেল না। পরদিন প্রাতেই গোকুলচন্দ্র জানাইলেন যে তাঁহার অমত নাই, তবে কার্য্য এখন খুব গোপনে সারিতে হইবে এবং বড়বধূ যাহাতে ঘুণাক্ষরে এ সম্বন্ধে কোন কথা টের না পান তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিবাহকার্য্য হইয়া যাইবার পর তিনি টের পাইলে না হয় একটু রাগ করিবেন, কিন্তু সে রাগ মিলাইয়া যাইতে বড় বেশী সময় লাগিবে না।

তিনকড়ি জানাইল যে বিবাহকার্য্য নানাকারণে কলিকাতা হইতে হওয়াই সুবিধাজনক। কয়েকদিন পরেই গৃহে ফিরিয়া যাইবার অছিলায় তিনকড়ি তাহার পিসীমাতা ও চারুকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইল। বিবাহের যে দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহার একদিন পূর্ব্বে গোকুলচন্দ্রও একটা কাযের অছিলায় কলিকাতায় রওনা হইলেন।

* * * *

মানুষের জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন অদৃষ্ট না মানিয়া আর গত্যন্তর থাকে না। ভৈরব মুখোপাধ্যায়ের এক ভাগিনেয় দেশে যাইবার পথে অনেক দিন পরে হঠাৎ মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভৈরব বলিলেন, "কার্ত্তিক যে অনেক দিন পরে দেখছি। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

ভাগিনেয় কার্ত্তিক বলিল, "আজকাল কলকাতাতেই থাকি কি না, সেইখান থেকেই আসছি। প্রায় পাঁচ ছ' বচ্ছর দেশে যাই নি, তাই একবার বাড়ী যাব বলেই বেরিয়েছি। সন্ধ্যে হয়ে গেল, নদীপার হয়ে এই রাত্রি কালে ওপারে গরুর গাড়ী পাব কি না তার ঠিক নেই, সেই জন্তেই মনে কল্লাম যে যাই মামার পায়ের ধুলোটা একবার নিয়ে আসি।"

ভৈরব বলিলেন, "তা বেশ করেছ।"

কার্ত্তিক বলিল, "আচ্ছা মামা, আপনাদের এই গাঁয়ে গোকুলচন্দ্র ঘোষ বলে কেউ থাকে?"

ভৈরব বলিলেন, "হ্যাঁ থাকে বৈ কি। সে যে সেদিন কলকাতায় গেল। হাইকোর্টে বুঝি কি একটা মোকর্দ্দমা ছিল। কেন, চেন না কি?"

কার্ত্তিক বলিল, "চিনতাম না, পরশু দিন তাঁর বিবাহ হল কি না, আমাকেই সব কার্য্য করতে হল।"

ভৈরব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কার বিয়ে হল হে? আমাদের গাঁয়ের গোকুল ঘোষ?"

"হ্যাঁ।"

"বল কি হে? না না! আরে তার যে স্ত্রী বর্ত্তমান! আচ্ছা কি রকম চেহারাটা বল দিকিনি তার?"

কার্ত্তিক যে রূপবর্ণনা করিল, তাহাতে গোকুলচন্দ্রের সহিত ঠিক মিলিয়া গেল। কার্ত্তিক বলিল, "তিনকড়ি বাবু বলে আর একজন ছিলেন, তিনিই যেন এ বিয়েতে কতকটা মুরুব্বির মত বলে বোধ হল।"

ভৈরবের আর কোন সংশয় রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া গোকুলচন্দ্রের বাড়ী আসিয়া ডাকিলেন, "মহেশ আছিস না কি রে?"

মহেশ বাহিরে আসিলে ভৈরব বলিলেন, "তোর জেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তোর জেঠামশাই কি করতে কলকাতায় গিয়েছে।"

এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে এই প্রশ্ন শুনিয়া বড়বধূর বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। মহেশ বলিল, "মোকর্দ্দমা করতে।"

ভৈরব বলিলেন, "তার মাথা করতে। সে বিয়ে করতে গিয়েছে। এই আমার ভাগ্নে এইমাত্র কলকাতা থেকে এল, সে এই বিয়ের পুরুত ছিল কি না। কি হে, কার্ত্তিক, কোথাকার মেয়ে তা মনে আছে?"

কার্ত্তিক মাতুলের পশ্চাতে আসিয়াছিল, সে বলিল, "মেয়ের বাপের বাড়ীর নামটা ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু মেয়েটীর নাম মনে আছে।"

"কি বল দিকিনি?"

"চারুবালা।"

ভৈরব বলিলেন, "তোর জেঠাইমাকে ভাল করে শুনতে বল। হ্যাঁরে মহেশ, গোকুল ফিরবে কবে তা বলেছে ?"

মহেশ বলিল, "পরশু। নয় জেঠাইমা ?"

ভৈরব হঠাৎ বড় বধুর দিকে চাহিয়া মহেশকে বলিলেন, "ওকি রে, তোর জেঠাইমার হল কি রে। হাত টাত যে মুঠো মেরে গিয়েছে। মূর্চ্ছো টুর্চ্ছো নয় তো ? জল দে, জল দে, আমি ততক্ষণ নিতাই ডাক্তারকে ডাকি গে। কি গেরোর ফের দেখ একবার।" বলিতে বলিতে ভৈরব লাঠি গাছটী ঠক্‌ ঠক্‌ করিতে করিতে বাহিরে গেলেন। কার্ত্তিক তাঁহার অনুগমন করিল।

৯

গোকুলচন্দ্র গোরুর গাড়ী হইতে চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে নামিয়াই বড় বিস্মিত হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া তামাক খাইতেছে, ভৈরব ও আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। ভৈরব বলিলেন, "গোকুল এলে নাকি ?"

"হ্যাঁ এলাম, এঁদের তো চিনতে পাচ্ছি নে।"

ভৈরব বলিলেন, "ইনি হচ্ছেন দারোগা বাবু, আর উনি হলেন গিয়ে রাইটার বাবু।"

বিস্মিত হইয়া গোকুল বলিলেন, "দারোগা বাবু ?"

ভৈরব বলিলেন, "বড় দুঃসংবাদ, গোকুল। বস, তারপর বলছি। জানই তো খবর কাকের মুখে পৌঁছোয়। তোমার বিবাহের খবর কি রকম করে যে এঁরা টের পেলেন তা তো বুঝতে পাচ্ছিনে। সেই খবর শুনেই নাকি বড় বৌঠাকরুণ দমাস করে আছাড় খেয়ে পড়েন, তারপর রাত্তির নিশুতি হলে এক ভয়ানক কাণ্ড করে ফেলেছেন।"

গোকুলের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "কি কাণ্ড ?"

"কাপড়ে কেরাসিন ঢেলে পুড়ে মরেছেন। আজকাল কি যে ফ্যাসান হয়েছে তা তো বুঝতে পারিনে বাপু। আমাদের সময়ে তো এসব কেরাসিন ফেরাসিন কিছুই ছিল না। আর শাস্ত্রবাক্যি তো তোমরা মান'ব না, কলাগাছের সেই রকম ঘটনাটা দেখেই সেই দিনই আমি বলেছিলাম যে য গোক একটা দুর্ঘটনা ঘটবেই। এ তো যেমন তেমন শাস্তর নয়, এ যে একেবারে আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র।"

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অভিযানের পথে

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আ-মারা পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহর অতিক্রম করিয়া নিম্ন ইরাকের স্বাভাবিক দৃশ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। লোকের বসবাস যতই বিরল হইতে লাগিল, মেসোপটেমিয়ার একমাত্র দ্রষ্টব্য খেজুর গাছ গুলিও ততই সংখ্যায় কমিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পর নদীর দুই পার্শ্বে রৌদ্রস্নাত নগ্ন ভূ-পৃষ্ঠ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

ষ্টীমারে আমরা ৩৬ জন ব্যতীত কয়েকজন ইংরাজ

কর্ম্মচারী ও ক্যাভালরি ব্রিগেডের নেতা কর্ণেল রবার্টস্ যাইতেছিলেন, তিনি ষ্টীমার ছাড়িবার কিছু পরই আমাদের নিকটে আসিয়া চম্পটীকে বলিলেন যে তোমাদের কোন অসুবিধা হইলে আমাকে জানাইও।

সমস্তদিন ষ্টীমার চলিয়া রাত্রে মাঝ নদীতে নঙ্গর করিল। তাহার পরদিন দুপুর বেলায় আমরা আমাদের অ্যাড্ভ্যান্সড্ বেস্ বা অগ্রগামী ঘাঁটি আলি-আল-গরবীতে পৌঁছিলাম। শুনিলাম যে সম্মুখে দুদিন হইল যুদ্ধ চলিতেছে এবং আমাদের ডিভিসন অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সম্মুখস্থ নদী কাহার অধিকারে আছে তাহা ঠিক জানা নাই বলিয়া আমাদের সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ অগ্রসর হইলে শত্রুহস্তে বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা।

আমরা নদীর দক্ষিণ তীরে নামিয়া গেলাম এবং ট্রেঞ্চ দ্বারা বেষ্টিত শিবিরে প্রবেশ করিলাম। শত্রু পক্ষের গতিবিধি অতি নিকটে বলিয়া ছাউনির সকলেই সতর্ক অবস্থায় আছে দেখিলাম। ট্রেঞ্চের বাহিরে কাঁটা যুক্ত তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে এবং ট্রেঞ্চের ধারে ধারে স্যাণ্ডব্যাগ বা থলিতে মাটি বোঝাই করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। একটি উচ্চ মঞ্চ (ওয়াচ্ টাওয়ার) হইতে একজন সৈনিক একটি বৃহৎ দূরবীণ দিয়া দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। ছাউনিতে ২য় সংখ্যক নরফোক্ পল্টনের একটি কোম্পানী অবস্থান করিতেছিল এবং তাহাদের অধিনায়কই ক্যাম্পের কর্ত্তা ছিলেন। অফিসারটির বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে। তিনি সেকেণ্ড লেফ্‌টেনান্ট পদবী ধারী, কিন্তু ইঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সৈনিক কর্ম্মচারীরা পল্টনে ডিসিপ্লিন বা আদেশানুবর্ত্তিতা রক্ষার জন্য কেহ কঠোর পরুষ ভাব অবলম্বন করেন, কেহবা মিষ্ট কথায় বেশী কায পাওয়া যায় মনে করিয়া বিনয়ী ও সুমিষ্টভাষী হন, কিন্তু যাহাদের স্বভাবলব্ধ এই ব্যক্তিত্ব গুণ থাকে তাহারাই উৎকৃষ্ট সামরিক কর্ম্মচারী বলিয়া বিবেচিত হন ও যশের অধিকারী হইয়া থাকেন।

আমরা নরফোক সৈন্য দলের একটি প্রকাণ্ড মেস টেণ্ট খাটাইয়া লইলাম এবং লান্স নায়ক রায়ের আনীত স্পিরিটের ষ্টোভে আহার প্রস্তুত করিয়া লইলাম। অপেক্ষাকৃত সহজে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায় বলিয়া আমরা সফরের সময় ভাত ও খিচুড়ি অপেক্ষা রুটি ও লুচিরই বেশী পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলাম।

পরদিন ভোরে আমরা আবার ষ্টীমারে উঠিতে আদেশ পাইলাম। একদল অশ্বারোহী সিপাহীও আমাদের সঙ্গে সেই ষ্টীমারে উঠিল। ষ্টীমার সমস্ত দিন চলিয়া পূর্ব্বেকার ন্যায় রাত্রে নঙ্গর করিল।

রাত্র প্রায় বারটার সময় কে আমাদের দিকে আসিয়া ডাক্তার ডাক্তার বলিয়া ডাকিতে লাগিল। উঠিয়া দেখিলাম নবাগত অশ্বারোহী দলের কাপ্তেন। বলিলাম আমাদের সঙ্গে কেহ ডাক্তার নাই। তিনি সঙ্গস্থিত মেডিক্যাল পেনিয়ার বা ঔষধের সিন্দুক দেখাইয়া বলিলেন যে তোমাদের সঙ্গে যখন ঔষধ আছে তখন তোমরা নিশ্চয়ই ডাক্তারি জান, আমি যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছি। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাঁহার কাণের বেদনা হইয়াছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেই শিখিয়াছি, কাণের বেদনার ঔষধ জানি না; একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম যে কাণের বেদনার ঔষধ নাই, তবে ঘুমাইবার ঔষধ দিতে পারি। সাহেব বলিলেন তাহাতেই হইবে। নিচে বয়লার হইতে আগুন লইয়া, পট্টী দিয়া সাহেবের কান সেঁকিয়া দিলাম এবং পটাশ ব্রোমাইড-এর দুই গুলি দিয়া দুর্গা বলিয়া শুইয়া পড়িলাম। সকালে উঠিয়া সাহেবকে জীবিত অবস্থায় দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তিনি এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না, তবে দেখিলাম যে অফিসারেরা একটি টেবিলের চারিধার বেড়িয়া হাস্য করিতেছে। টেবিলের উপরকার কানও অয়েল ক্লথ ভেদ করিয়া এক চক্রাকার পোড়া দাগ। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র তাহার উপরই কয়লা শুদ্ধ পাত্রটা গতরাত্রে রাখিয়াছিল।

প্রায় বেলা ১১ টার সময় ষ্টীমারের গতি আবার কমাইয়া দেওয়া হইল। ষ্টীমারের ছাদের উপরে উঠিয়া একদল গোরা সিপাহী হেলিওগ্রাফ বা সূর্য্যরশ্মি

সাহায্যে সংবাদ জ্ঞাপক আয়নার দ্বারা অগ্রগামী ফৌজের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। তাহারা নামিয়া আসিলে আবার ষ্টীমার চলিতে লাগিল। আমরা শুনিলাম যে আমাদের সৈন্তেরা কুট-আল-আমারা অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তুর্কি ফৌজের পশ্চাৎ ধাবন করিতেছে। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই আমরা নদীর তীরে যুদ্ধের নিদর্শন সমূহ দেখিতে লাগিলাম। কোথাও মৃতদেহ ভাসিতেছে, কোথাও একটি যুদ্ধাশ্ব অর্দ্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় আছে, এক স্থানে একটি কামান-বাহী গাড়া নদীর ধারে জলে পড়িয়া আছে, রাশ সংলগ্ন তিনটি মৃত ঘোড়া, বাকি তিনটিকে খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। বোধ হয় গাড়ীটির ঠিক উপর শত্রুপক্ষের সেল্ আসিয়া পড়িয়াছিল।

বেলা ১টার সময় আমরা কুট-অল-আমারা পৌছিলাম। স্যাপার বা খননকারী সিপাহীর দল নদীর তীর কাটিয়া জেটি প্রস্তুত করিতেছিল। আমরা আমাদের জিনিষপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলাম এবং চম্পটী বাবু আমাদের কর্ণেলের চিঠি লইয়া ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাহিনীর এসিস্‌টান্ট-ডিরেক্টার-অফ মেডিক্যাল সারভিসেস্-এর নিকট চলিয় গেলেন। ইনি কর্ণেল পি, হেয়ার, আই এম এস এবং আমারায় ৬ষ্ঠ সংখ্যক বাহিনীর অবস্থান সময়, আমাদের ষ্টেশনারি হসপিটাল সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব লইতেন। সামরিক চিকিৎসা বিভাগের ইনিই নেতা এবং জেনারেল ষ্টাফ ভুক্ত কর্ম্মচারী। মেডিকাল বিভাগের ডিরেক্টর, বস্‌রায় অবস্থান করিতেন। আমাদের আমারা হইতে যুদ্ধে যোগদান করিবার আজ্ঞা, কর্ণেল হেয়ারের অনুমোদনেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

কর্ণেল হেয়ার চম্পটী বাবুকে বলিলেন যে এসিনের যুদ্ধের জন্য তোমাদের আসিতে বলা হইয়াছিল, তাহা ত হইয়া গেল (Essein এর প্রথম যুদ্ধ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯১৫) এখন তোমরা ইচ্ছা করিলে ফিরিতে পার কিংবা যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধ দেখিতে চাও, তবে থাকিতে পার, কারণ শীঘ্রই আরও যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমরা অবশ্য অতি আহ্লাদের সহিতই শেষোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলাম এবং এ, ডি, এম এস্-এর আদেশে ২নম্বর ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অধিনায়ক কর্ণেল হেনেসির নিকট উপস্থিত হইলাম। অনভিজ্ঞতা বশতঃ নদীর ধার হইতে সহরের বাহিরে ছাউনি পর্য্যন্ত প্রায় এক ক্রোশ পথ আমরা আমাদের তাঁবু, রসদ, ঔষধের সিন্দুক এবং নিজেদের জিনিষপত্র নিজেরাই বহন করিয়া লইয়া গেলাম। পরে শুনিলাম এতটা কষ্টের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, চাহিলেই ট্রান্সপোর্ট বিভাগ হইতে দুইখানি গাড়ী পাওয়া যাইত। এই ঘটনার জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত ছাউনীর অন্য লোকেরা আমাদের উপহাস করিত।

আমরা বেলা প্রায় ৪টার সময় ক্যাম্পেল পৌছিলাম এবং No2 Field Ambulanceএর কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলাম। Colonel Hennessy রয়াল আর্ম্মি মেডিক্যাল কোরের লোক এবং সইবার যুদ্ধে কর্ম্মদক্ষতার জন্য সি, বি, বা কম্পেনিয়ন-অব্-বাথ উপাধি ভূষিত।

কর্ণেল হেনেসি আমাদের মিষ্টক থায় অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাম্বু খাটাইয়া লইতে বলিলেন। আমরা তাম্বু দুইটি খাটাইয়া স্বস্বস্থান ঠিক করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যায় সময় পুনরায় আমাদের ফল-ইন্ করান হইল এবং কোন স্থানে আঘাত লাগিলে কিরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয় কর্ণেল তাহার মৌখিক পরীক্ষা লইলেন। অ্যাম্বুলেন্সের সেকেণ্ড-ইণ্ড কমাণ্ড মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে তোমরা সঙ্গে পাচক অথবা মেথর আন নাই তাহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি, সব কাযই নিজেদের করিতে শেখা উচিত।

আমরা রাত্রে স্বপাক আহার করিতেছি, এমন সময় একজন ইউরেশিয়ান ওয়ারাণ্ট অফিসার আসিয়া উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের হাবিলদার কোথায়?" অপেক্ষাকৃত অধিক উদ্ধত উত্তর পাইয়া লোকটি কর্ণেলের কাছে নালিশ করিতে গেল। কিন্তু তিনি, Let the Bengalis alone বলিয়া, পুণার মারহাট্টা, ব্রাহ্মণ ডাক্তার মহাজনীর নিকট আমা-

তাইগ্রিস নদীবক্ষে ষ্টীমারে ভারতীয় সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে

দের কার্য্য সম্বন্ধে আদেশ লইতে বলিয়া গেলেন। ডাক্তার মহাজনী পরম বিনয়ী ও ভদ্র স্বভাবের লোক ছিলেন, এবং প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সহিত আমাদের বনিবে বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম। মেসোপটোমিয়ায় আমরা যতদিন ছিলাম ততদিন উচ্চ কর্ম্মচারীদের নিকট সদয় ও সম্ভ্রম সূচক ব্যবহার পাইয়াছি, কারণ বাঙ্গালা দেশের স্বেচ্ছা সেবক বলিয়া আমাদের সম্মান ছিল। অপেক্ষাকৃত অধস্তন কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ আমাদের সহিত অভদ্র ব্যবহার করিতে চেষ্টা পাইত, কিন্তু চড়টা মারিলেই কিল্‌টা খাইতে হয় দেখিয়া তাহারা আমাদের বিশেষ ঘাঁটাইত না। ইহার পর ডিভিসনের সকলের সহিত পরিচিত হইবার পর, সকলেরই আমরা বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলাম।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যূষে এসিনের যুদ্ধে আহত কয়েকটি সৈন্যের ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বাঁধিবার জন্য আমাদের আহ্বান করা হইল। কিন্তু দ্বিপ্রহরেই ইহাদের ষ্টীমারে করিয়া আ-মারা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বৈকালে মেজর ষ্ট্যুয়ার্ট আমাদের লইয়া ট্রেঞ্চ খুঁড়িতে একস্থানে লইয়া গেলেন কিন্তু আমরা আবার ফিরিয়া আসিলাম। বৈকালে আ-মারা হইতে একটি বৃহৎ থলি করিয়া ডাক আসিয়া পৌঁছিল এবং প্রায় মাস খানেক পর আমরা সকলে গৃহের সংবাদ পাইলাম ও দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে পারিলাম। আমার পার্শেলে একটি পরম লোভনীয় জিনিষ ছিল, একটি ছোট টিন ভরা সরিষার তৈল। মাছ মাংস হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শাক শব্জী পর্য্যন্ত ঘি তে রান্না খাইয়া মুখ বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল। সরিষার তৈল দেখিয়া তখনই কয়েকজনে বাজারে মাছের সন্ধানে গেল। পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত হইতে না বলিয়া কিছু কুমড়ার ডাঁটা সংগ্রহ করিলাম। সে রাত্রে স্বদেশী মাছের ঝোল খাইয়া দেশের স্বপ্ন দেখিব ভাবিতেছি, এমন সময় ডাক্তার মহাজনী আসিয়া জানাইল যে আমাদের ব্রিগেড, ১৭ সংখ্যক ব্রিগেডের সাহায্যের জন্য কাল অতি সকালে আজিজিয়া রওনা হইবে। আমরা বাসনপত্র ধৌত করিয়া জিনিষ পত্র বাঁধিয়া ফেলি-

লাম এবং আমাদের তাম্বু ও অন্যান্য জিনিষ আমাদের জন্য আনীত দুইখানি অশ্বতর বাহিত ট্রান্সপোর্ট কার্ট বোঝাই করিলাম।

ভোর চারিটার সময় আমরা ২ নম্বর ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের অন্যান্য লোকেদের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় ব্রিগেডটি চলিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা ৬টায় কুইক্ মার্চ্চের হুকুম পাইলাম। সর্ব্বপ্রথমে একদল স্যাপার ও মাইনার, তাহার পিছনে একটি তোপখানা, তাহার পিছনে তিন দল পদাতিক, তাহার পিছনে ব্রিগেডের অ্যাম্বুলেন্স, তাহার পিছনে একটি ছোট পদাতিক দল ও আর এক অংশ তোপখানা, তাহার পিছনে ট্রান্সপোর্ট বিভাগের গাড়ীতে রসদের জিনিষপত্র ও একদল রেসালা—এই ভাবে ব্রিগেড কুচ্ আরম্ভ করিল। বাম পার্শ্বে নদীর ধার, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় আধ মাইল দূরে থাকিয়া ব্রিগেডের পার্শ্ব বা ফ্ল্যাঙ্ক্ রক্ষা করিয়া অশ্বারোহীর দল চলিতে লাগল। এই দল ব্যতীত প্রায় আধ মাইল আগে আর একটি অশ্বারোহীর দল ভ্যান্‌গার্ডের (সম্মুখ রক্ষক) ও সংবাদ সংগ্রাহক (স্কাউট) দলের কার্য্য করিতে করিতে চলিল।

ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য মেসোপটেমিয়ার ভূপৃষ্ঠ নদী হইতে সমকোণে বহির্গত বহুসংখ্য নালায় পরিপূর্ণ। এ সময় এগুলি শুষ্ক ছিল, কারণ শীতকালেই এদেশে জল-প্লাবন হইয়া থাকে। যে নালা গুলির পাড় অপেক্ষাকৃত ঢালু, সেগুলি আমরা সহজেই অতিক্রম করিয়া গেলাম, কিন্তু যাহাদের পাড় একেবারে খাড়া, সম্মুখবর্ত্তী স্যাপারের দল সেগুলি কোদালি দিয়া কাটিয়া ঢালু করিয়া দিল এবং কামানের চাকা যাহাতে স্থানটি ধূলিতে পরিণত না করে সেজন্য তাহার উপর বিচালীর টুকরা প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য সৈন্যদল অপেক্ষা, স্যাপার ও মাইনার সৈন্যদলের অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া ইহারা অপেক্ষাকৃত বেশী বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকে।

কুচ্ করিতে করিতে মেসোপটেমিয়ার অসহ্য গরমে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় সিপাহী সূর্য্যাহত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে আমরা ট্রান্সপোর্ট কার্টে তুলিয়া দিলাম। প্রতি সিপাহীকে মেডিক্যাল অফিসারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহাদের বাস্তবিক কোনও অসুখ করিয়াছে কিনা। যাহারা অল্প শ্রমেই কাতর হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মার্চ্চ করিতে বাধ্য করা হইল। মেজর ল্যাম্বার্ট (Lambert) আমাদের বলিলেন যে এ বিষয়ে আমরা যদি সাবধান বা কড়া না হই, তাহা হইলে ব্রিগেডের তিন হাজার সিপাহীই সেই ৩০ খানি অ্যাম্বুলেন্স কার্টে উঠিতে চেষ্টা করিবে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধে আহত ও রুগ্ন সিপাহীদের স্থানান্তরিত করিবার জন্য অশ্বতর বাহিত অ্যাম্বুলেন্স কার্টই ব্যবহার করা হইত। ইহার সংখ্যাও পর্য্যাপ্ত ছিল না এবং সেই জন্য সাধারণ ট্রান্সপোর্ট কার্ট গুলিও এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইত এবং হাঁসপাতাল ষ্টীমারের অভাবে সাধারণ ষ্টীমারের ডেকে আহত সিপাহীদের লইয়া যাওয়া হইত। যুদ্ধের মধ্য অবস্থায় এবিষয়ে যে তুমুল আন্দোলন মেজর কার্টার উপস্থিত করেন ও যাহার ফলে একটি রয়েল কমিটি অনুসন্ধানের জন্য গঠিত হয় তাহা প্রায় সর্ব্বজন বিদিত।

বেলা বারটার সময় আমরা নদীর তীরে হল্ট্ করিলাম। আমরা কুট হইতে ১২ মাইল পথ আসিয়াছি। শুনিলাম যে বৈকালে ছটার সময় পুনরায় মার্চ্চ করিতে হইবে। সেই প্রখর রৌদ্রে খোলা মাঠের ভিতর বিশ্রাম কিরূপ আরামদায়ক তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সে মরুভূমির ভিতর একটিও বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল না। আমরা আমাদের ষ্ট্রেচার গুলি খাড়া করিয়া তাহাতে কম্বল লট্‌কাইয়া কোনও রকমে একটু ছায়ার যোগাড় করিয়া লইলাম এবং অতিকষ্টে কিছু আহার প্রস্তুত করিয়া লইলাম। কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার জন্য একটু ছায়ার বন্দোবস্ত করিব কি? তিনি বলিলেন, "ধন্যবাদ, আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।" ইহার পর রৌদ্রে বিশ্রাম করা আমাদেরও

অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রখর রৌদ্রে সর্ব্বদা মাথায় টুপি রাখিতে হইত ও মেরুদণ্ডের উপর একটি কাপড়ের পট্টি, জামার সহিত সেলাই করিয়া লইতে হইত। মস্তকে, গলদেশে, অথবা মেরুদণ্ডে রৌদ্র লাগিলে সর্দ্দিগর্ম্মি অবশ্যম্ভাবী। মেসোপটেমিয়ার গরমের উপর আর একটি সর্ব্বদা বিরক্তি-জনক ব্যাপার, সে দেশের অগণিত মাছি। আমরা ইহার দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়াছিলাম। এ প্রখর রৌদ্রে মাঠের ভিতরেও ইহারা আমাদের পরিত্যাগ করে নাই। যখন আমরা মার্চ্চ করিতাম তখন আমাদের টুপির উপর ইহারা বসিত এবং ব্রিগেডের সহস্র লোকের টুপি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইত। পাঠকেরা বোধ হয় ব্যাপারটি সহজে বুঝিতে পারিবেন যদি আমকাঁঠালের সময় নিজের দেশের কথা ভাবেন। সে সময় যেখানে ফল থাকে তাহার চারি পাশে যেরূপ অসংখ্য মাছি আসিয়া পড়ে, সেইরূপ আমাদের মাথার উপর মাছির ঝাঁক মার্চ্চের সময় টুপি ছাইয়া বসিত। ক্যাম্পে মাছির দৌরাত্ম্য কমাইবার জন্য বহুসংখ্যক ফ্লাইপেপার বা মাছি মারিবার আঠাযুক্ত কাগজ রাখা হইত। সেগুলি মাছিতে বোঝাই হইয়া কার্পেটের বুনিবার ন্যায় দেখাইত, কিন্তু তবুও মাছির সংখ্যা কমিত না।

বৈকালে ৬টার সময় পুনরায় কুচ্ সুরু হইল। অপেক্ষাকৃত শীতলতার জন্য রাত্রের মার্চ্চে বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না, এবং আমরা রাত্রি দশটায় আরও ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নদীর তীরে হল্ট করিলাম। যখন এক একটি সৈন্যের দল সফরে বাহির হয়, তখন ব্রিগেডের অগ্রসরের গতি ঘণ্টায় তিন মাইল করিয়া ধরা হয়। দিনে আঠার মাইলের বেশী মার্চ্চ সাধারণতঃ করা হয় না। ১৮ মাইলের বেশী পথ যাইলে তাহাকে ফোর্সড মার্চ্চ বলা হয়। এসিনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তুরস্ক বাহিনী যখন পলায়ন করিতে থাকে, তখন ১৭ সংখ্যক ব্রিগেড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং আজিজিয়া নামক স্থানে ছাউনি ফেলিয়া অবস্থান করে। তুর্কিরা যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের আক্রমণ করিতে পারে, সেই জন্য আমাদের ফোর্সড্ মার্চ্চ করাইয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল। আমরা দ্বিতীয় দিনের মার্চ্চের পর যখন রাত্রের বিভোয়াকের (অথবা উন্মুক্ত স্থানে বিশ্রামের) আয়োজন করিতেছি, তখন কাপ্তেন কল্যাণকুমার মুখার্জ্জির সহিত দেখা হইল। ইনি কয়েকদিন আমারায় আমাদের হাঁসপাতালে অতিথি হইয়াছিলেন। ইঁহার নিরহঙ্কার ব্যবহারের জন্য আমাদের সকলেই ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম এবং ইনিও তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা, ও অন্যান্য উপদেশ আমাদের প্রদান করিতেন। ইনি বলিলেন যে তোমরা মার্চ্চের পর প্রায় দুঘণ্টা ধরিয়া বিশ্রাম কর

কূট-এল-আমারা রাজপথের দৃশ্য

ও তাহার পর পাক করিতে যাও, তাহা না করিয়া হল্টের হুকুম হওয়া মাত্র অন্যান্য সিপাহীদের ন্যায় পাকের আয়োজন করিয়া আহার সমাধা করিয়া লইও, কারণ অনাহারে বা অল্পাহারে মার্চ্চ করিলে শীঘ্রই দুর্ব্বল হইবে এবং হঠাৎ যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাহইলে অকর্ম্মণ্য

হইয়া পড়িবে। আমরা ইঁহার উপদেশ অনুসরণ করিলাম এবং তাহার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দতার সহিত কুচ্ করিতে পারিতাম। কর্ণেল হেনেসিও আমাদের উপদেশ দিলেন যে হল্ট হওয়া মাত্র নদীতে স্নান করিয়া আসিও, তাহা হইলে পায়ে ফোস্কা পড়িবে না এবং শ্রমেরও লাঘব হইবে

তৃতীয় দিনে আমরা ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আজিজিয়া পৌছিলাম। দূর হইতে ৭ ব্রিগেডের ছাউনীর তাঁবু গুলি দেখিয়াই যেন পথ পর্য্যটনের শ্রমের অনেকটা লাঘব হইল। শেষ দিন মার্চ্চে আমাদের দলের অনেকেই অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের আলিপুরে শিক্ষাধীন অবস্থায় কখনও লম্বা কুচ্ করান হয় নাই এবং দুইদিনে ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, সে গরমে যে আমরা অনভ্যস্ততার জন্য অকৃতকার্য্য হইব, তাহা বেশী বিচিত্র কথা নহে। আমাদের নেতা চম্পটী বাবু সর্ব্বাপেক্ষা মোটা ছিলেন, কিন্তু শুধু প্রবল মানসিক বলে একবারও ফল্ আউট্ না করিয়া বরাবর ঠিক চলিয়া আসিয়াছিলেন।

আজিজিয়া আসিয়া আমরা সংবাদ পাইলাম যে বুলগেরিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছে। কর্ণেল আমাদের তাঁবু খাটাইয়া লইতে বলিলেন এবং আমরা তাঁবু খাটাইয়া কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

এলোরা

(১)

সাঁচি হইতে এলোরা যাইতে আমাদিগকে ইটারসি জংশনে গাড়ী বদল করিতে হইবে, কেন না আমাদের বম্বে পর্য্যন্ত মেলের টিকিট ছিল; অতএব আমরা ইটারশি অভিমুখে চলিলাম। ভূপালে আসিতে দেখিলাম একটা মিলিটারী কার সংযুক্ত ট্রেণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইংরাজ সৈনিকে পূর্ণ। উহারা সোনাভনা হইতে মীরাট চলিয়াছে। সৈনিকদের ভিতর অনেকেই ছোকরা—১৬ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর হইবে। সকলেই বেশ প্রফুল্ল, হাসি তামাসা করিতেছে। ঐ ট্রেণ খানিতে অফিসারদের নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র ক্যারেজ আছে। আর একটাতে দেখিলাম ঘোড়ার জন্য সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। আমাদের গাড়ীতে দুইটা বড় বড় কক্ষ, ছিল - লোহার মোড়া (Collapsible) দরজা দিয়া ভাগ করা। পার্শ্বের কক্ষে একজন ভদ্রলোক রাজনীতিক কথোপকথন করিতেছিলেন। তিনি বাঙ্গালীদের উচ্চ প্রশংসা করিতেছিলেন—১৯০৬ সালে তাহারা দেশের জন্য যে নির্ভীকতা, যে আত্মোৎসর্গ, যে স্বদেশ প্রীতি দেখাইয়াছিল তাহার সহিত অসহোযোগ আন্দোলনের তুলনা করিতেছিলেন। অধুনা স্বর্গগত মতিলাল ঘোষ, দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশনেতৃগণের স্বার্থত্যাগ, স্বদেশ প্রেম ও নির্ভীক বীরত্বের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন। স্বদেশীয়দিগের চক্ষে বাঙ্গালী যে আজ আর 'ভেতো' বাঙ্গালী নহে ইহা উপলব্ধি করিয়া মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিলাম।

আর ত্রিশ মাইল অতিক্রম করিয়া বুদনি নামক ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এখানকার দৃশ্য পরম রমণীয়—অনেকটা দার্জ্জিলিং প্রদেশের মত। ঢালু জমির উপর দিয়া যাওয়াতে ট্রেণ বেগ সংযমিত করিয়া মন্থর গতিতে চলিতেছিল। কোন কোনও স্থলে ঠিক ট্রেণের নিম্নেই গিরিদরী প্রায় চারি পাঁচ শত ফুট গভীর,
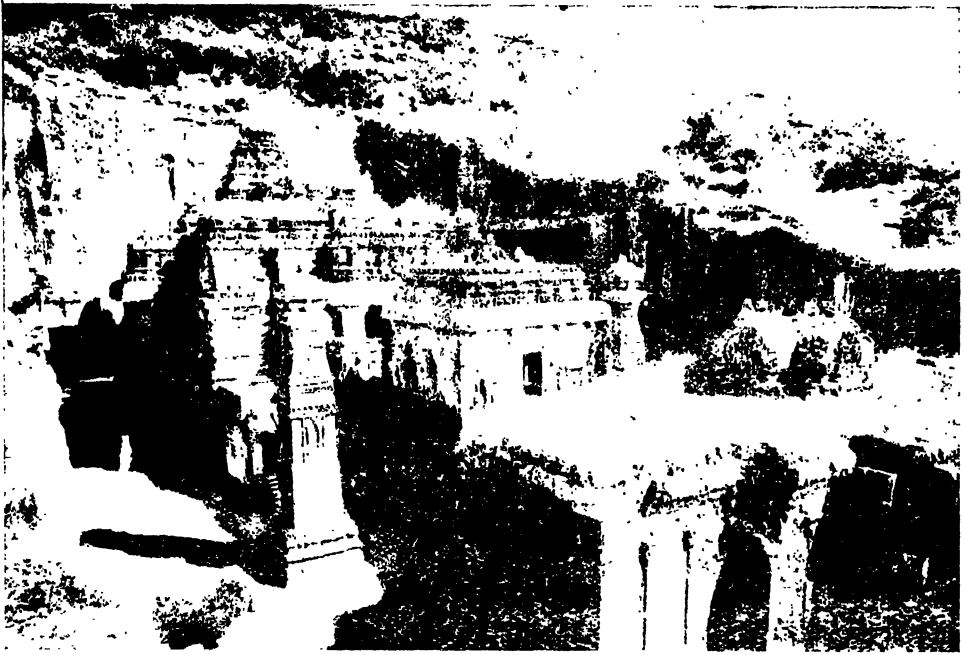
এলোরায় পাথরে কাটা কৈলাস মন্দির

তাহারই ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া কোনও প্রকার নিজের পথ কাটিয়া চলিয়াছে। পর্ব্বত শিরোভাগস্থিত মহীরুহ পর্ব্বত কূটকে যেন আরো উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। এ শোভায় আমরা মুগ্ধ হইলাম।

ক্রমে হোসাঙ্গাবাদে আসিলাম। আমাদের কক্ষে জব্বলপুর নিবাসী একজন প্রবীণ বাঙ্গালী উকীল উঠিলেন; আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক—স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক—তাঁহার তদ্দেশীয় বন্ধুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় ইটারসিতে গাড়ী পৌঁছিল—গাড়ী হইতে দেখিলাম রামলীলা হইতেছে; একবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা হইল।

বম্বে মেল আসিতে তখনও তিন ঘণ্টা বাকি। ট্রেণ হইতে নামিয়া গোকুল বাবু একটা অঙ্কের সমাধানে ব্যাপৃত রহিলেন; তাঁহাকে সমাধিস্থ দেখিয়া সত্যবাবু ও আমি আধিভৌতিক ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিলাম। নিকটেই বাজার ও রামলীলার রঙ্গমঞ্চ। সেই শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তথায় গেলাম। পরে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া গোকুল বাবুর জন্য কিছু খাবার লইয়া রামলীলার নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে। কেরোশিন তৈলের 'ডিবিয়া' ও মশালের প্রচুর ধূমের আবরণ মধ্যে দ্বিতীয় মেঘনাদের মত লুক্কায়িত মেঘনাদ-হন্তা সৌমিত্রী, তদগ্রজ রামচন্দ্র, জনক-দুহিতা সীতা ও বৃহল্লাঙ্গুলধারী মারুতীকে বংশমঞ্চে আবিষ্কার করিলাম। সীতা রামের গলা জড়াইয়া বিড়ি সেবন করিতেছেন, মারুতী সম্ভবতঃ তাঁহার 'অ্যাড্‌ভেঞ্চরের' কথা কহিতেছেন, সৌমিত্রী পাণ চিবাইতে চিবাইতে তাহা শুনিতেছেন ও মৃদু হাস্য করিতেছেন। অতএব অভিনয় দর্শনের সুখলাভে বঞ্চিত হইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম গোকুল বাবুকে না বলিয়া চলিয়া যাওয়াতে তিনি অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন। আমাদের খাবারগুলি স্পর্শ মাত্রও করিলেন না। হা সৌমিত্রী, হা মারুতি, হা দাশরথি

তোমাদের পণ্ড অভিনয় দেখিতে গিয়া এ কি বিপদ হইল!

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ইটারসি ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রভাতে বেলা আটটার সময় মানমাড্ জংশনে আসিলাম। নিকটেই ধর্ম্মশালা আছে—ঘরগুলি ছোট ছোট, পাথর দিয়া গাঁথা, জানালা নাই। স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লইয়া L. N. Katdare নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের হোটেলে উপস্থিত হইয়া ভোজন করিলাম। খাটি ঘৃত সংযোগে ভাত ডাল (ওয়ারণ্), তরকারী ও অতি নরম রুটী উদরস্থ করিলাম। ভাতের সহিত রুটী দিবার ব্যবস্থা এ দিকের প্রথা। ভ্রমণ বৃত্তান্তে এ সকল সামান্য কথার উল্লেখ করিয়া অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিতান্ত গর্হিত তাহা জানি, তবুও পাঠকদের ভিতরে যদি কেহ এই সব দেশে যান তবে তাঁহারা এই অপ্রয়োজনীয় সংবাদে কিঞ্চিৎ উপকৃত হইতে পারেন এই ভরসায় তাহার উল্লেখ করিতেছি। এই ষ্টেশন হইতে H E H The Nizam's guaranteed State Railway আরম্ভ হইয়াছে। এলোরা যাইতে হইলে এলোরা রোড, দৌলতাবাদ, অথবা আরঙ্গবাদে নামিতে হয়। এলোরা রোড হইতে কোনও যান পাওয়া যায় না, আরঙ্গাবাদ হইতে টোঙ্গা পাওয়া যায়। কিন্তু দৌলতাবাদ হইতে এলোরার গুহামন্দিরগুলি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বলিয়া আমরা দৌলতাবাদেই নামিলাম।

ষ্টেশনটী ক্ষুদ্র। এই রেলওয়ের প্রত্যেক ষ্টেশনেই একজন করিয়া কনেষ্টবল থাকে। ইহারা 'লাল-পাগড়ী' নহে;—নীল ও পীতের ডোরাকাটা তাহাদের পাগড়ী। এবম্ভূত কনেষ্টবলকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে গুহামন্দির যাইবার কোনও যানাদি মিলিবে কি না। আমরা 'না' বুঝাইবার জন্য যেমন করিয়া দুইবার ঘাড় নাড়ি, সেও সেইরূপ করিয়া ঘাড় নাড়িল। গাড়ী পাইব না ভাবিয়া পিত্ত চমকাইয়া গেল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার সেই ঘাড় নাড়া! তবে তাহার সহিত 'হঃ' যুক্ত হইল। ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও তেমনি করিয়া ঘাড় নাড়িয়া yes বলিতে বুঝিলাম—এই ঘাড় নাড়ার অর্থ 'হাঁ'—আমাদের দেশের 'না'—ঠিক উল্‌টা।

কনেষ্টবলের সাহায্যে দুইখানি বন্দ গাড়ীর যোগাড় হইল। যাতায়াতে আমাদের সর্ব্বসমেত ৮ টাকা গাড়ী ভাড়া দিতে হইয়াছিল, অবশ্য বকৃশিষ ছাড়া। রাস্তায় গাড়োয়ান আমাদের কথায় সায় দিয়া প্রত্যেক বারে 'হঃ' বলিয়া তেমনি করিয়া ঘাড় নাড়ায় হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে জট পাকাইয়া গিয়াছিল। আমরাও One must be a Roman in Rome পন্থার অনুসরণ করিয়া ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিলাম। একদিনে এত সহিবে কেন?

ষ্টেশন হইতে কিয়দ্দূর আসিতে ফাঁড়ি হইতে একজন লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া আসিল। ভাবিলাম কি আবার প্রমাদ ঘটায়! কিন্তু দেখিলাম সে সব কিছুই নয়। কামাল পাশার লড়াই সম্বন্ধে টাটকা খবর জানিবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া ছুটিয়াছে। খবর বলিয়া দিতে সে আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আমরা পথিপার্শ্বস্থ এক বৃদ্ধার নিকট কিছু "সীতাফল" ক্রয় করিলাম। "সীতাফল" আমাদের আতা। এদিককার সমস্ত জায়গায় আতাকে 'সীতাফল' বলে। সীতা কি এই ফল খাইতে ভাল বাসিতেন?

ইহার পর ফটক দিয়া দুর্গ-প্রদেশে প্রবেশ করিলাম—চারিদিকে পর্ব্বত প্রাকার দিয়া বেষ্টিত। দুর্গটী এক পাথরের তৈয়ারী শুনিলাম। আরও কয়েক মাইল অগ্রসর হইতে দেখিলাম—পথ পাহাড়ের উপর দিয়া ক্রমে উচ্চে উঠিতেছে। তথায় আমাদিগকে শকট হইতে অবতরণ করিতে হইল। সেই সময়ে ডিনামাইট দিয়া পাহাড় উড়াইয়া নূতন পথ তৈয়ারী করিতেছিল। কোন কোনও স্থলে বড় বড় শিলাখণ্ড দিয়া ঘেরা চৌবাচ্ছায় জল ধরা রহিয়াছে। এহেন একটা চৌবাচ্ছায় নামিয়া দেখিলাম, একটা পাথরে অনেকটা তেল-সিঁন্দুর লেপা রহিয়াছে—বোধ হল পূজার চিহ্ন।

প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা খুলদাবাদ নামক গ্রামে প্রবেশ করিলাম—দেখিয়া বোধ হইল গ্রামটী মুসলমান প্রধান। ক্রমে সে গ্রাম ত্যাগ করিলাম। সূর্য্য ডুবু ডুবু করিতেছে এমন সময় আমরা রোজা নামক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ডাকবাঙ্গলায় উঠিলাম। ইহার সুপারিন্টেন্ডেণ্ট একজন পার্শী ভদ্রলোক—সপরিবারে পার্শ্বের বাড়ীতে বাস করেন। এইখান হইতে গুহামন্দির কিঞ্চিন্ন্যূন মাইল খানেক হইবে। বাঙ্গলায় দুইটা কক্ষ আছে—আমরা একটাতে আশ্রয় লইলাম।

সন্ধ্যা হইতেই একেলা আমি ডাকবাঙ্গালার সম্মুখে পাদচারণা করিতে লাগিল। আজ মহাষ্টমী। স্নিগ্ধ নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সমস্ত দিনের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। একটা নীরবতা বিরাজ করিতেছে। এই সুদূর প্রবাসে দিবসের সমস্ত সংক্ষোভ ও উত্তেজনার প্রশমনান্তে মন বাঙ্গালার পল্লী-ভবনে পূজার দালানের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দীপমালায় আলোকিত, নৃত্য-গুঞ্জন শিশুদের কাকলীতে গুঞ্জিত, কুসুম ও অগুরু ধূপের মিশ্রিত সুরভিতে সুবাসিত, ভক্তিমতী শুদ্ধান্তবাসিনীগণের সঙ্কোচ-দৃষ্টিতে শুচীকৃত —সেই পবিত্র দৃশ্য নয়নের উপর ভাসিয়া উঠিল। সংবৎসরের পর আজ আত্মীয় বন্ধু সকলে দেবী সমক্ষে মিলিয়াছে। রুদ্ধ প্রীতির উৎস বহিয়া চলিয়াছে—একটা কোমল দীপ্তিতে সকলের আনন উদ্ভাসিত হইয়াছে, নিরাশার সমাধিস্তূপের উপর আশার বৈজয়ন্তী উড়িতেছে; কলগুঞ্জন, স্মিতহাস্যে সেই স্থানে এক অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হইয়াছে। আজ যে বাঙ্গালীর প্রধান উৎসবের দিন! ক্রমে সে কলগুঞ্জন, সে মধুর আলাপন, সে স্মিতহাস্য থামিয়া গেল। চিত্রার্পিতের মত সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চারিদিকে স্তব্ধ—নিঝুম—স্পন্দহীন। কি মহান্ এই গম্ভীর ভাব। এই যে সন্ধি-পূজা আরম্ভ হইল! সুদূর বাঙ্গালা হইতে মনকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া সম্মুখে চাহিলাম। শৈলকূট জ্যোৎস্নার অমৃত কলস নিঃসারিত দ্রব রজত ধারায় স্নাত হইতেছে। অদূরে কৈলাস। সেথায় মা রহিয়াছেন। এই সন্ধিপূজার শুভক্ষণে মাথা নত করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম।

সেই মহিমময় সৌন্দর্য্য উপভোগের অবকাশে বেদনা-জড়িত অতীত ঘটনাসমূহ স্মৃতির কবাটে আঘাত করিতে লাগিল। প্রাচীন দেবগিরি এই কতক্ষণ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কত প্রাচীন, কত প্রাচীন সে দেবগিরি! শিবপুরাণোক্ত সেই দেবপর্ব্বত। যাদব বংশপ্রদীপ ভিল্লম প্রতিষ্ঠিত দাক্ষিণাত্যের কৌস্তুভমণি এই সে দেবগিরি। ভাস্করাচার্য্য পৌত্র লক্ষ্মীধর সূনু চঙ্গদেব চতুর্ব্বর্গ, চিন্তামণি প্রণেতা অসংখ্য দেবকুল রচয়িতা হেমাদ্রি; মুগ্ধবোধ প্রণেতা গোস্বামী বোপদেব অপূর্ব্ব যশঃরশ্মিচ্ছটায় এই দেবগিরিকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। দেবগিরিরাজের পরিণয়পাত্রী দেবলাদেবী এলোরার উপকণ্ঠে শ্যেনধৃত কপোতের ন্যায় আলাউদ্দিন প্রেরিত অশ্বারোহী সৈন্য কর্ত্তৃক দিল্লীতে মাতার নিকট নীত হইয়া সুকবি আমীর
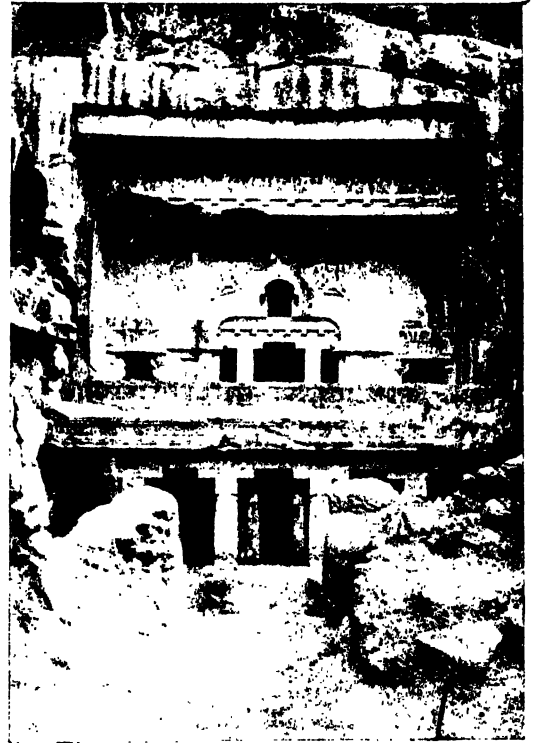
এলোরা বিশ্বকর্ম্মা চৈত্য গৃহ

খুসরুর উদ্দীপনা জাগাইয়াছিলেন! যৌবনমদোদ্দীপ্ত কূটবুদ্ধি অসমসাহসী আলাউদ্দিন দেবগিরির সম্পদে আকৃষ্ট হইয়া সাতশত মাইল অতিক্রম করিয়া যাদবরাজ রামদেবকে আক্রমণ করিলেন। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে মুগ্ধ যাদবরাজ সুপ্রসিদ্ধ গিরিদুর্গে আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন; দেবগিরির অতুলধন মুসলমান সৈন্যকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল। অপ্রমেয় হেমরত্নাদির বিক্রয়ে যাদবরাজ বীরদর্প লাঞ্ছিত হৃতগৌরব অধীন জীবন ক্রয় করিয়া লইলেন। পরে দেবগিরি মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আরও কিছুকাল পরে বিকৃতমস্তিষ্ক তুঘলক বংশীয় মহম্মদের অদ্ভুত খেয়াল দেবগিরিকে দেখিতে হইল। দেবগিরিই আর বলি কেন? হিন্দুর দেবগিরি এখন মুসলমানের দৌলতাবাদ হইল। মহম্মদ তুঘলকের সখের রাজধানী নৃশংস অত্যাচার পীড়িত দিল্লীবাসীর প্রজাগণের তপ্তনিঃশ্বাস ক্রুর অভিশাপে শুকাইয়া উঠিল। তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের কত পরিবর্ত্তন এই দেবগিরি না দেখিয়াছে!

এলুর অথবা এলোরার প্রাচীন নাম এলপুর, ইল্বলপুরের অপভ্রংশ। রামায়ণে পড়িয়াছি যে বাতাপি ও ইল্বল নামক দুই রাক্ষস, ব্রাহ্মণবধ করিত। ইল্বল ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক মেষরূপী ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইত। তাঁহারা মাংস ভোজন করিবার পর ইল্বল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিত। বাতাপিও ব্রাহ্মণের শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্গত হইতেই ব্রাহ্মণগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। পরিশেষে অগস্ত্য মুনি মেষরূপী বাতাপির মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলেন। তখন ইল্বলের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া যায়।[১] গল্পই হউক আর সত্যই হউক, ইল্বল ও বাতাপির নামে দুই নগরের নাম হইয়াছিল ইল্বলপুর অথবা এলোরা, এবং বাতাপিপুর অথবা বাদামী। এই বাদামী চালুক্য ও রাষ্ট্র কূটগণের রাজধানী ছিল।

১। বাল্মীকি রামায়ণ—আরণ্য।

রাত্রি ৯৷৷৹ টার সময় স্বীয়কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন কৈলাস দেখিব এই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া কোনও প্রকারে রাত কাটাইয়া দিলাম। প্রাতে উঠিয়া চা পান শেষ করিয়া গাড়োয়ানকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস এবং অন্যান্য গুহা দর্শন করিতে চলিলাম। পশ্চিম মুখে প্রায় এক মাইল উৎরাই গিয়া আমরা ১৬ নম্বর গুহা কৈলাসে উপস্থিত হইলাম। এই রাস্তা অথবা 'ঘাট' দশাবতার গুহার ছাদের উপর দিয়া কৈলাসের দক্ষিণ দিকে নামিয়া গিয়াছে। একেবারে দক্ষিণের গুহাগুলি বৌদ্ধযুগের, তাহার পর ক্রমে উত্তর দিকে ব্রাহ্মণ যুগের ও একেবারে উত্তরে কিঞ্চিৎ দূরে জৈন দিগের গুহা মন্দির। রাস্তার দক্ষিণ দিকে কতকগুলি মন্দির ব্রাহ্মণ যুগের ও আরও দক্ষিণের বাকি মন্দিরগুলি বৌদ্ধযুগের। এই প্রবন্ধে আমি কেবল ব্রাহ্মণ যুগের স্তুক মন্দির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কৈলাসের পর ক্রমে উত্তরদিকে গিয়া পুনরায় ফিরিয়া রাস্তায় পড়িলাম, তথা হইতে দক্ষিণে দশ অবতার ও রাবণ কা খই দেখিলাম।

কৈলাস। ফার্গুসন ও বর্জ্জেস তাঁহাদের Cave temples of India নামক পুস্তকে[২] লিখিয়াছেন—"রাষ্ট্রকূট বংশীয় চতুর্থ নৃপতি দন্তিদুর্গ মহাপরাক্রান্ত এবং প্রখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে তিনি নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসিত ভূমিভাগে এলোরার মত অন্যান্য অনেক গুহা মন্দির ছিল। তিনি মহাদেব শিবের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত সেবক ছিলেন। অমিততেজা শক্তিমান রাজা যে তাঁহার ইষ্টদেবতার নিমিত্ত কৈলাসের মত মন্দির রচনা করিয়া দিবেন তাহা আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বংশধরের ভিতর দুইজন মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন—তৃতীয় গোবিন্দ (৭৮৫—৮১০ খৃঃ) এবং

২। Cave Temples of India, Fergusson and Burrgess (London 1880) p. 450.

অমোঘবর্ণ। অনেকে অনুমান করেন যে এই দুই রাজাই কৈলাস মন্দির রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু রচনার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় তাহা ঠিক নয়। এই দুই নৃপতির আমলের রচিত হইলে উহাতে বহু উত্তরকালের রচনা ভঙ্গীর নিদর্শন থাকিত। যাঁহারা চালুক্য নৃপতিগণের রাজধানী বাদামী নগরের অনতিদূরে পট্টদকল নামক স্থানে বিশাল শিবমন্দিরের পরিকল্পনা এবং সৌধ সম্বন্ধীয় উপভূষা ও তৎস্থাপন পদ্ধতির সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে বলিবেন যে এই কৈলাসমন্দিরের রচনাপদ্ধতি দন্তিদুর্গের আমলের। উভয় মন্দিরের সংবিধান, পরিমাণ ও আয়তন একই;—রচনা ভঙ্গী এক —এমন কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্রভূষাও একেবারে মিলিয়া যায়। সম্ভবতঃ এই দুই মন্দির একই শিল্পীর রচিত ...পাষাণ হইতে খোদিত যত গুহামন্দির ভারতবর্ষে আছে তাহাদের সকলের অপেক্ষা এই কৈলাস মন্দির বিস্তৃত ও বহুশ্রম-সম্পাদিত। মন্দির গঠনে নিয়োজিত প্রভূত শ্রমের পরিমাণ, মন্দিরের বৃহৎ আয়তন ও শিল্প সৌষ্ঠব পর্য্যালোচনা করিলে মিশর অথবা অন্যান্য দেশের প্রাচীন শিল্পের তুলনায় কৈলাস কখনই ক্ষুণ্ণগৌরব হইবে না।"

স্মিথ, হ্যাভেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে দন্তিদুর্গের খুল্লতাত রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ এই মন্দির রচনা করিয়া দেন। ৩ পট্টদকলের শৈবমন্দির ফার্গুসন ও বর্জ্জেসের মতে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মহিষী দ্বারা রচিত, হ্যাভেলের মতে বিক্রমাদিত্যের রচিত। ৪ এই কৈলাস মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণের নিমিত্ত Havell কৃত Ancient and Medaeval Architecture of India দ্রষ্টব্য। এই কৈলাসের গুণকীর্ত্তন করিয়া M. Bandrillart বলিয়াছেন—"এই কৈলাস মন্দিরের বিরাট ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে যখন দাঁড়াই তখন সব টীকা ভাষ্য যেমন ম্লান হইয়া যায়, মানব কল্পনা যেমন বিমূঢ় হইয়া যায়—এমন আর কোথাও হয় না। বিশাল গরীয়ান সৌধ মণ্ডপ দর্শনে মানববুদ্ধি স্তম্ভিত হয়। হিন্দুদিগের ভাস্কর্য্য শিল্প ও ধর্ম্ম সমৃদ্ধির বিস্ময়কর বিকাশ দেখিতে পাই এই মন্দির গুলির বিরাট মহিমায়, চিত্রভূষার অসীম বৈচিত্র্য, তক্ষণ শিল্পের নানা সূক্ষ্ম নিপুণতায়। ৫ ফার্গুসন ও বর্জ্জেসের প্রশংসা উদ্ধৃত করিতেছি—"Kailas must always remain a miracle of patient industry applied to well defined purpose. It far excels both in extent and in elaboration any other rock-cut temple in India, and is and must always be considered one of the most remarkable monuments that adorn a land so fertile in examples of patient industry and of the pious devotedness of the people to the service of the gods."

অতঃপর কৈলাস মন্দিরের বর্ণনা করিব। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমরা উত্তর ও দক্ষিণ কোণে দুইটী বিশালকায় গজরাজ দেখিলাম। দক্ষিণ দিকের গজরাজের ঈষৎ অঙ্গহানি হইয়াছে। এই দুই গজরাজের সন্নিহিত তদন্তরবর্ত্তী দুইটী জয়স্তম্ভ রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমরা বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় শিববাহন বৃষভ 'নন্দীর' দ্বিতল মণ্ডপ রচিত হইয়াছে। উপরের তলা একদিকে গোপুরমের সহিত ও অন্য দিকে প্রধান মন্দিরের সহিত কপোত অথবা ভাস্কর্য্য ভূষার বেষ্টনী (frieze) দ্বারা সংযুক্ত।

৩। Vincent Smith—Early History of India, p. 428. এবং Havell, Aryan Rule in India pp. 228, 229.

৪। "These Seventh-century temples, rivalling the more famous temples of Greece in their noble design and superb craftsmanship mark the time when Badami was the Capital of the Chalukyan Kings; for they, like the Choles, were the patrons of Saivism. The last one of their line, Vikramaditya II (Circa 733-747) built the splendid temple of Virupaksha at Pattadakal, which must have been one of the great centres of Brahmanical learning in the South.—Havell, Aryan Rule p. 242.

৫। A. S. W. I., p. 2.

৬। Cave Temples p. 462.

এই দ্বার মণ্ডপের উত্তর পার্শ্বেই পূর্ব্বোক্ত জয়স্তম্ভ রহিয়াছে—দুইটাই চতুষ্কোণ স্তম্ভ, ৪৫ ফুট উচ্চ। এই জয়স্তম্ভের শিরোভাগে এককালে ত্রিশূল ছিল।

এই মণ্ডপ ও মন্দিরের কার্ণিশ ও স্তম্ভ পীঠের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাচীর গাত্রে বৃহদাকার গজরাজ, অদ্ভুত অঙ্গ-বিশিষ্ট শার্দ্দূল ও পুরাণোক্ত নানা জীবজন্তু খোদিত দেখিলাম। কোথাও বা তাহারা ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া পরস্পরকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতেছে। কোথাও মৃষ্ট পিষ্ট করিতেছে; কোথাও বা তাহারা শান্তিতে আহার গ্রহণ করিতেছে। তেজঃপূর্ণ সজীব মূর্ত্তিগুলি শিল্পীর রচনা শক্তির প্রভূত পরিচয় দিতেছে। এই সব পরস্পর-বিবদমান জন্তুগুলি বিবাদের মধ্যেও একই কার্য্যে নিয়োজিত—সকলেই পৃষ্ঠদেশে অথবা শিরোভাগে কৈলাস মন্দির ধারণ করিয়া আছে। এই জন্তুগুলির উপরে ভীষণ যুদ্ধের দৃশ্য দেখিলাম—মহাভারতের কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঘোর সংগ্রামে ব্যাপৃত। অন্য অংশে বানরগণ পরিবৃত রাম দশাননের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। যে স্থলে মণ্ডপের সহিত মন্দির যুক্ত হইয়াছে তাহার নীচে কালভৈরব ও মহাযোগী দুইটী মূর্ত্তি আছে।

মন্দিরাভ্যন্তরের প্রাচীরের পলস্তারার উপর ও বহির্দ্দেশের কোনও কোনও প্রাচীর গাত্রে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, এখনও তাহার সামান্য নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় ইহাকে রঙ্-মহল বলিত। উপরতলার মন্দিরের দুই দ্বারদেশে প্রকাণ্ড গদাধারী শৈব দ্বারপাল দ্বাররক্ষা করিতেছে। সোপান শ্রেণী দিয়া নামিয়া আসিয়া নীচের বারান্দায় একটা শ্রী অথবা গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি দেখিলাম, প্রত্যেক হস্তে পদ্ম চারিটা হস্তী ঘট হইতে বারিধারা ঢালিতেছে।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

হারার সুখ

(গল্প)

আমাদের বংশাবলীর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমি আই এ পাসের পর বি-এ ক্লাসে পড়িতেছিলাম।

এমন সময় দিদিমা মাকে গিয়া ধরিলেন, "শিবুর বিয়ে দিতে তুমি আর খুঁৎ খুঁৎ ক'রো না বউমা! ষেঠের কোলে শিবুর আমার আঠারো উনিশ বছর বয়স হ'ল। সময়ে বিয়ে দিলে এতদিন নাতির মুখ দেখ্‌তে বাছা! মায়ের মন ভারীতে ছেলের ভাল হয় না বলেই এতকাল আমার চুপ করে থাকা; নইলে এমন সোমত্ত ছেলে ঘরে রেখে মানুষ কি চুপ করে থাকতে পারে গা?"

দিদিমার মতে আমি সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিয়াই বিবাহের উপযুক্ত পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই দিদিমার অনুগ্রহপ্রার্থীর দল তাঁহার ভাবী নাত-বৌয়ের সন্ধান জানাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়া অনেকগুলি বছর অতিবাহিত করিয়াছে, কিন্তু মার বুদ্ধি কৌশলে, মিনতি ও অশ্রুজলে দিদিমার সাধের নাত-বৌয়ের এখনও শুভাগমন ঘটে নাই।

দিদিমা সেকালের মানুষ। কিন্তু তাঁহার রীতি প্রকৃতি সেকালের সীমা ছাড়াইয়া একেবারে মান্ধাতার আমলে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। নির্ব্বোধ মানব গাছের বাকল ও বনের ফল পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের অসীম দুঃখ আপনারাই যে ডাকিয়া আনিয়াছে এ বিষয় লইয়া

আমার পিতার সহিত দিদিমার প্রায়ই আলোচনা হইত। এ কালের কোন কিছু যে ভাল থাকিতে পারে অনেক যুক্তি তর্কের দ্বারা কেহই এপর্য্যন্ত দিদিমাকে সেটা হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হয় নাই।

বাবা খুব বেশী সেকালে না জন্মিলেও দিদিমা নিজের আদর্শে তাঁহার পুত্রটিকে গড়িয়া লইয়াছিলেন। মায়ের ইচ্ছা ও আদেশের উপর বাবা ভ্রমেও হস্তক্ষেপ করিতেন না, কেহ করিলে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন না।

দিদিমার নিষ্ঠা ও সংস্কার যতই প্রবল হোক না কেন, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণটি স্নেহে করুণায় সমুজ্জ্বল ছিল। পুত্রবধূর অনুনয়ে বিনয়ে দিদিমার অনেক কালের অনেক সংস্কার হঠাৎ প্রত্যাহার করিতে দেখা যাইত। সেই জন্যেই পুরুষানুক্রমের টোলের বিদ্যার পরিবর্ত্তে আমার ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলন।

দিনের মধ্যে খুব কম করিয়া দশ পনের বার আমার বিবাহের প্রসঙ্গ তোলা দিদিমার নিকটে নিত্যকর্ম্মেরই অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। একাধিক বার একই. আলোচনায় মার কাণ ঝালাপালা হইয়াছিল কিনা তাহা জানি না; আমার যে হয় নাই ইহা আমার বিলক্ষণ রূপে জানা ছিল। বিবাহের প্রসঙ্গে আমার হৃদয়টী কি একটা অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় পুলকোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। যৌবনারম্ভের অনতিকাল পূর্ব্বেই আমার হৃদয়ের গোপন প্রদেশে একটি অতুলনীয়া সুন্দরী কিশোরীর অম্লান মুখচ্ছবি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। কল্পনা যোগে তাহার সহিত যে আমার প্রেমালাপ ও হাস্য-কৌতুক চলিত ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সুতরাং মার মুখে দিদিমার কথার প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য আমি সুশীল বালকের মত পাঠ্য-পুস্তকে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া কর্ণযুগল সজাগ করিয়া রাখিলাম।

দিদিমার প্রস্তাবে প্রতিদিনের মত মা আজ ম্লান মুখ অবনত করিলেন না। প্রসন্ন নয়নে দিদিমার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "শিবুর বিয়েতে এবার আমি মন ভার করব না মা, আপনি বিয়ের আয়োজন করুন। শিবু এখন বড় হয়েছে, দুটো পাসও করেছে, আমার আর আপত্তির কোন কারণ নেই। আমার সাধ"—

বলিতে যইয়া মা হঠাৎ থামিয়া গেলেন। দিদিমা আশ্বাসের স্বরে বলিলেন, "তোমার কি সাধ ছিল বল, বল্‌তে বল্‌তে থামলে কেন বউমা?"

মা একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "আমার অনেক দিনের ইচ্ছা আমার বেল ফুলের মেয়েটাকে বৌ করি। তাদের অবস্থা ত ভাল; মেয়েটি দেখতে শুনতে সুশ্রী; ইস্কুলে লেখাপড়া শিখছে, অথচ ঘর কন্নার সব কাযই জানে; খুব লক্ষ্মী মেয়ে।"

দিদিমা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লিখুনে পড়ুনে মেয়ের নাম কি বৌমা? বয়সই বা কত? শিবুর সঙ্গে মানাবে ত?"

"বেশ মানাবে মা, মেয়েটির বয়স বছর পনের হবে, নাম মালবিকা।"

দিদিমা গালে হস্তার্পণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মাগো, এমন ছিষ্টিছাড়া নাম তো কোথায়ও শুনিনি; ভদ্রলোকের মেয়ের নাম মালু আলু, ছি ছিঃ ঘেন্নায় মরে যাই। তা—বেছে বেছে ছেলের সম্বন্ধটা খুব ঠিক করে রেখেছ বৌমা,—পনের বছরের ধাড়ী মেয়ে সাত ব্যাটার মার বয়সী না হলে শিবুর ভরা-ডুবী হ'বে কিসে? আমি বেঁচে থাকতে আমার বাড়ীতে এমন বৌ আনার সাধ তোমায় পরিত্যাগ করতে হ'বে।" বলিতে বলিতে দিদিমা প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। মা আহত হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "যেখানেই আপনি বিয়ে দেবেন মা, কোথায়ও ছোট মেয়ে পাবেন না, সবার ঘরেই পনের ষোল। এ মেয়েটী জানাশুনোর মধ্যে, হলে ভাল হ'ত।"

"অমন ভাল মেয়ে মাথায় থাকুক। ইস্কুলে ইলি বিলি পড়ুনে, বুড়োমেয়ে আমি চাইনে বৌমা! আমার শিবপ্রসাদের মত চাঁদ ছেলের আবার মেয়ের অভাব? তুমি দেখে নিও আট বছরের একটি ফুট্‌ফুটে গৌরী এনে আমি হরগৌরীর মিলন করিয়ে দেব।

এখনি ঘটক ঠাকুরকে খবর পাঠাচ্ছি।" বলিয়া দিদিমা চলিয়া গেলেন।

মা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনার ঘরে উঠিয়া গেলেন। আমি কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। চক্ষের সম্মুখে বই খুলিয়া কোন অপরিচিতার ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেলাম। তাহার মালবিকা নামটী অকস্মাৎ আমায় যেন বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। এ কাব্যগন্ধী নামের রস ও মাধুর্য্য আমার কাছে একেবারে অনাস্বাদিত নহে, আমি ইতিমধ্যে এ রসের কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়াছিলাম। তাই আমার হৃদয় বীণার নীরব তারগুলি সহসা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল "মালবিকা, মালবি"—অন্তরের সহিত রসনাও ধীরে, অতি ধীরে প্রতিধ্বনি তুলিল "মালবিকা, মালবি—"। আমি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম; যাহাকে দেখি নাই, আজিকার পূর্ব্বে যাহার নাম শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না, হঠাৎ তাহার প্রতি এত হৃদয়োচ্ছ্বাস কেন? এ ভাবাবেগ কবি হৃদয়েই সম্ভব, আমার পক্ষে অসম্ভব, অপ্রত্যাশিত! কিন্তু অপ্রত্যাশিত হইলেও তাহার চিন্তা হইতে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিবৃত্ত হইতে পারিল না। সে কোথায় থাকে, কোন স্কুলে কোন শ্রেণীতে পড়ে, দেখিতে কাহার স্থায়, গায়ের বর্ণ কেমন—এমনি শত সহস্র প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল। আমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিভৃত ছাদে গিয়া আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মানসী-বধূর চিন্তা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল, দিদিমাকে গিয়া বলি—"আমায় আর কারু সঙ্গে বিয়ে দিয়ো না, আমি মালবিকাকেই চাই।" মনে মনে জল্পনা কল্পনা করিয়া দ্রুত পদক্ষেপে দিদিমার ঘরে গিয়া ডাকিলাম "দিদিমা"।

দিদিমা মালাজপ শেষ করিয়া অনুচ্চস্বরে ঠাকুর দেবতার নাম আবৃত্তি করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার শুষ্ক মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি সরসোজ্জল চক্ষু আমার পানে তুলিয়া পরিহাসের স্বরে বলিলেন—"আজ অসময়ে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন ভাই? রাই কিশোরীর ভাবনায় পড়ার কথা বুঝি ভুলে গেছ? ঘটককে তাড়া দিয়েছি—এক মাসের মধ্যেই, বুঝেছ?"

বলিয়া দিদিমা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। আলোকোজ্জল কক্ষে দিদিমার হাসির সম্মুখে অনেক চেষ্টাতেও আমি আমার হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। আমার গোপন কথা শুনিয়া বাবা মা কি মনে করিবেন, এই কথা ভাবিয়া লজ্জায় দিদিমার কাছে হৃদয়ের দ্বার খোলা হইল না।

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ক্ষীণ আশার প্রদীপ শিখাটি লুকাইয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলাম। দিদিমা বিপুল উদ্যমে আমার উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে মাতিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে ঘটক ঘটকীর আনাগোনা আরম্ভ হইল। কিন্তু কেহই দিদিমার মনের মত অর্দ্ধ রাজত্ব সহ অষ্টম বর্ষীয়া চম্পক-গৌরীর খবর আনিতে পারিল না। দেখিয়া শুনিয়া দিদিমা অষ্টমের স্থানে দশম করিলেন—তথাপি কোন সুবিধা হইল না। দীন দরিদ্র গৃহের শ্যামলা দশমা ও একাদশী দুই একটার খবর পাওয়া গেল বটে, কিন্তু আটহাজার দশহাজার-ওয়ালাদের ঘরে পঞ্চদশী ও ষোড়শীর ন্যূন কেহ নাই।

দিদিমার পরাজয়ে আমি বেশ একটু জ্বালাময় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। যাহার যে জিনিষটির প্রতি অধিক আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে বঞ্চিত করাই বুঝি সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম! সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম হইলেও সকলের প্রতিই তিনি বিরূপ নহেন, ভাবিয়া আমার আশাহত শীর্ণ হৃদয়-নদী জোয়ারের উচ্ছ্বাসে ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। মালবিকার মধুর নামটি হৃদয়ের তটে তটে বড় সুখেরই আঘাত করিয়া জানাইল—"ওরে প্রেমিক, ওরে মুগ্ধ, পাবি, পাবি, তোর বাঞ্ছিতাকে পাবি।"

কিন্তু এ আশার আশ্বাস সফল হইল না। আমার বাসনার পুষ্পদল পদদলিত করিয়া কয়েক-দিনের পর দিদিমার নির্দ্দেশ মত বাবা একটি মেয়ে দেখিতে গিয়া বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। এক বয়স ছাড়া মেয়েটি নাকি দিদিমার সম্পূর্ণ আদর্শ অনুযায়ী—ভাবী বধূর পিতা ধনী

নামে বিখ্যাত না হইলেও নিঃস্ব নহেন। বিবাহে দশ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। মেয়েটি দেখিতে ভাল; বিভার 'ব' শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না। মেয়ের বাপ মেয়ের বয়স বলিয়াছেন বারো বছর, কিন্তু বাড়ন্ত গড়ন বলিয়া বড় দেখায়। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইলেও পিতার কর্ম্মস্থলে তাহাদের থাকিতে হয়। নামটি দিদিমার খুবই পছন্দসই 'জগৎ তারিণী'। মেয়েটি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের গৃহের উপযুক্ত বধূ হইবার স্পর্দ্ধা রাখে।

কে বলে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য কে বলে দিদিমার পরাভব? দুর্ব্বলের পরাভবই যে অনিবার্য্য। অক্ষমের অশ্রুজলই বুঝি বিধাতার অতি প্রিয় কৌতুকের উপাদান!

যে আশার স্বপনে বিভোর হইয়া মরম কোণে একটি অজানা অস্পষ্ট আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি তাহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মুছিল কি? আঁকা যত সহজ মোছাও কি তেমনি? না, তা নয়। প্রত্যক্ষ জিনিষের চেয়ে কল্পিত জিনিষই বেশী লোভনীয়, তাহার আকর্ষণ প্রবলতর। কল্পনা তুচ্ছ নহে, কল্পনা ক্ষণিক নহে! কত কবির মহাকাব্যে, ঔপন্যাসিকের মহান চরিত্র অঙ্কনে কল্পনার অসীম প্রভাব দেদীপ্যমান!

আমি কল্পনায় যাহার মূর্ত্তি গড়িয়া যাহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে অবশেষে জগৎ তারিণীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলাম। নগদ, অলঙ্কার ও দান সামগ্রী পাইয়া দিদিমা উৎফুল্ল হইলেন, বাবারও আনন্দের অভাব দেখিলাম না। যে মা একদিন মালবিকাকে বধূ করিবার সাধ করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় সেই স্বর্গ সুধার পরিবর্ত্তে নিরক্ষরা জ্ঞান বুদ্ধি শূন্যা জগৎতারিণীকে পাইয়া বড় আদরের হৃদয়ের ধনের মত বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। ইহাকেই বলে স্ত্রী চরিত্র! যেমন লঘু তেমনি অন্তঃসার-শূন্য! আশাও নাই নিরাশাও নাই! ইহারাই প্রকৃত সুখী! ইহাদের সুখে আমি সুখী হইতে পারিলাম না; আমার সুখ স্বতন্ত্র।

আত্মীয় কুটম্বিনীগণ বধূ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"দিয়েছে থুয়েছে বেশ, বৌটি হয়েছে ভাল। কিন্তু ক'নের বাপ জুয়াচুরী করে একটা মিছে কথা বলেছে—এই নাকি বারো বছরের মেয়ে! বারো বছরের মেয়ে আমরা কি আর চোখে দেখিনি গা? এর বয়স যদি ষোল বছরের একদিন কম হয় তাহলে আমরা কাণ কেটে কুকুরের পায়ে দেব—" ইত্যাদি।

দিদিমার মনোনীতা পাত্রীর এ অপবাদ তিনি নির্ব্বিবাদে হজম করিলেন না। তিনি বধূর বয়স আরও দুইবছর কমাইয়া গায়ের জোরেই প্রচার করিলেন বধূ দশম বর্ষীয়া; পশ্চিমের জলবায়ুর গুণেই বালিকার নিতান্ত অকালে যৌবন প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহা প্রমাণের জন্য বধূকে আমার শয্যা ভাগিনী না করিয়া দিদিমা তাহাকে আপনার বিছানায় শোয়াইয়া তাহার মাতৃবিচ্ছেদ বেদনা কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে চেষ্টা করিলেন। কাযেই বধূর সহিত আমার আলাপ হওয়া দূরের কথা, পরিচয় পর্য্যন্ত হইল না।

লোকের মুখে শুনিলাম সে সুন্দরী, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে শ্বশুর মহাশয় মেয়ে লইয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল একবছর তিনি মেয়ে পাঠাইবেন না। ইতিমধ্যে আমি নিবিষ্ট মনে বি-এ পড়িয়া দেশ বরেণ্য হইয়া উঠিব। তাঁহার 'শিশুকন্যা' একবছরে শ্বশুর ঘর করিবার অনেকটা উপযুক্ত হইবে। এ অবস্থায় অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিলে আমি যে দুঃখিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না, কারণ মালবিকাকেই আমি কল্পনা করিয়াছিলাম, আমার সদ্যোজাগ্রত নবীন প্রেমে দীপ্ত হৃদয় প্রীতির পুষ্পহার মালবিকার কণ্ঠে পরাইতে ব্যগ্র হইয়াছিল; সে গৃহলক্ষ্মী অথচ জ্ঞান প্রতিভা সম্পন্না ইহাতেই আমাকে বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। যে হৃদয় আসনে বাণীর গৌরবে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম সেখানে বর্ণজ্ঞানশূন্য মূর্খ জগৎতারিণীকে বসাইতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। প্রথম হইতেই তাহার প্রতি

একটা অশ্রদ্ধা ও বিরাগের ভাব আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সে আমার সংস্রব হইতে দূরে চলিয়া গেল বলিয়া আমি বেশ একটু আরাম অনুভব করিলাম।

আমার লেখা পড়ার সুবিধার নিমিত্ত একবছরের মত জগৎতারিণীকে এখান হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইলেও আমি কিছু পড়াশুনায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। রাজ্যের প্রেমের বই পড়িয়া বায়স্কোপ দেখিয়া সভা সমিতিতে যোগ দিয়া একটা বিমলানন্দে আমার দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মাসের পর মাস গত হইয়া পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। পড়াশুনায় আর অবহেলা করিতে পারিলাম না। আলমারির মাথার উপর হইতে ধূলি ধূসরিত পাঠ্য পুস্তকগুলি নামাইয়া বন্ধন মুক্ত মনটাকে পুস্তকের অক্ষরের মধ্যে বন্দী করিতে চেষ্টা করিলাম! মন বন্ধন স্বীকারে অসম্মত ছিল না, কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার সমস্ত সংকল্প ওলট পালট হইয়া হৃদয় নদী বিপরীত মুখে ধাবিত হইল।

"বিশ্ব-বীণা" মাসিক পত্রিকায় একদিন অকস্মাৎ শ্রীমতী মালবিকা দেবীর ক্ষুদ্র একটি কবিতা পাঠ করিয়া, 'কবি' হইবার অদম্য পিপাসা আমার অন্তরে সহসা জাগিয়া উঠিল। আমি কিছুতেই আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারিলাম না।

মালবিকা নামটি যদিও আমি ভুলিতে পারি নাই, কিন্তু সে নামের উজ্জ্বলতা আমার হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে মলিন হইয়া গিয়াছিল। ক্ষত শুকাইয়া গেলেও ক্ষীণ দাগটুকু ছিল। বহুদিনের পর কবিতার নীচে ছাপার অক্ষরে মালবিকা নাম নিরীক্ষণ করিয়া আমার আঘাত আবার নূতন আকার ধারণ করিল। এ যে আমারই একমাত্র ধ্যানের দেবী সেই মালবিকা, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। মন বলিল, "এ সুযোগ হেলায় হারাইও না। তোমার অনন্ত প্রেম, অমূল্য ভালবাসা তাহাকে নিবেদন করার ইহাই মাহেন্দ্র সুযোগ, একমাত্র উপায়! কবিতায় তুমি নিজেকে প্রকাশ কর! ব্যক্ত কর! সেই অসীমের উদ্দেশে জীবন-তরণী ভাসাইয়া দাও। ঘুরিয়া ফিরিয়া তরণী হয় তো একদিন তোমার লক্ষ্য স্থলে পৌছিবে।"

অতি উৎসাহে, অখণ্ড মনোযোগ দিয়া কবিতা লেখা আরম্ভ করিলাম। অনেক বিনিদ্র রজনী প্রভাত করিয়া, "চকোরের তৃষা" নামক একটি কবিতা হইল বটে, কিন্তু কবিতাটি জন সমাজে প্রকাশ করিতে গিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম—কল্পনায় আকাশ-কুসুমের আবাদ হইলেও মর্ত্ত্যে তাহার স্থান নাই। বলিতে লজ্জা করে "বিশ্ব-বীণা" সম্পাদকের জুতার কাদা অশ্রুজলে ধৌত করিবার পর আমার "চকোরের তৃষা" "বিশ্ব-বীণায়" স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল। তাহাও বারান্তরে এ সাহসের কার্য্য না করিবার প্রতিশ্রুতিতে।

"চকোরের তৃষা" প্রকাশিত হইবার পরের সংখ্যা "বিশ্ব বীণায়' মালবিকা দেবীর "চাতকিনীর আশা" শীর্ষক একটি কবিতা দেখিয়া বিস্ময়ে, আনন্দে আমি অভিভূত হইলাম। কবিতাটী সত্যই অতুলনীয়; যেমন ভাষা তেমনিই গভীর প্রাণস্পর্শী ভাব। সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া তরুণ কবি তাহার প্রণয়াস্পদকে সান্ত্বনা দিতেছে—

"ক্রুদ্ধ হয়ো না, ক্ষুণ্ণ হয়ো না, প্রিয়তম আমার,
মিলিব গো,তোমাতে আমাতে অবিচ্ছেদ মিলনে মিলিব।"

আমার অকিঞ্চিৎকর রচনায় ইহা যে প্রত্যুত্তর তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমি মালবিকার প্রতি কেবল অনুরক্ত নহি, সেও যে তাহার শুভ্র, সুন্দর, নির্ম্মল জীবন আমাকে আপনি অর্পণ করিত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আমার সর্ব্বশরীর হর্ষাবেগে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আমি যেমন মার মুখে তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে না দেখিয়াই হৃদয় দান করিয়াছি, সেও যে তাহাই। আমরা কি এক পথের পথিক, এক মন্ত্রের উপাসক?

নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া "চাতকিনীর আশার" অনেক উত্তরই লিখিলাম; বরষার বারিধারার মত কবিতার পর কবিতায় দুই তিনখানি খাতা ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু যাহার উদ্দেশে এত উদ্দীপনা, এত ব্যাকুলতা, এ পূজারীর পূজাপোকরণ সেখানে প্রেরণ করিতে পারিলাম না। মালবিকার যেমন বিশ্ব বিজয় করিবার ক্ষমতা আছে, দীন আমি সে সম্পদ আমি কোথায় পাইব? যে যেন আপনার মহত্ত্বে, আপনার প্রভাবে দুর্জ্জয় "বিশ্ববীণা" জয় করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আমার তো সে ক্ষমতা নাই; তাই পরাজয়ের লজ্জা গায়ে মাখিয়া ভক্তের মত দেবতার উদ্দেশ্যে আমার নবীন হৃদয়ের প্রীতির অঞ্জলি খাতার বুকে ফুটাইতে লাগিলাম।

বাবা মা ভাবিলেন আমি পরীক্ষার পড়া লইয়া মগ্ন হইয়া আছি—কিন্তু আমি যে কিসের পড়া লইয়া ব্যস্ত হইয়া ছিলাম তাহা এক অন্তর্য্যামী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিত না। পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে হঠাৎ আমার বিবেক সজাগ হইয়া উঠিল। তখন আর সময় ছিল না, তবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা দিতে হইল এবং কবিতা লেখা কাব্য পড়ার মধ্যে আমার অকৃতকার্য্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন জানিবার উৎকণ্ঠা লইয়া আরও দিনকয়েক কাটাইলাম।

ইতিমধ্যে "বিশ্ববীণায়" মালবিকার নূতন একটি কবিতা বাহির হইল "নীরব কেন"? হায়, আমি যে নীরব নয় তাহা কেমন করিয়া জানাইব! সংকল্প করিলাম মার নিকট হইতে মালবিকার ঠিকানাটি কৌশলে জানিয়া আমার রচনা সম্ভার হৃদয়ের পূজা তাহার কাছে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু সাধারণ খাতার কদর্য্য কাগজে বাঁকা চোরা অক্ষরে কাটাকুটি করিয়া প্রীতি উপহার দিলে তো চলিবে না। প্রতি রেখায় প্রাণের ভালবাসা ঢালিয়া প্রতি অক্ষরে গভীর অনুরাগ আঁকিয়া সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাগজে আমার হৃদয়-মুক্তার মালা যে গাঁথিতে হইবে।

একখানি মূল্যবান খাতা কিনিয়া গাঢ় লালবর্ণের কালিতে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে লেখা আরম্ভ করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মার নিকট হইতে মালবিকার ঠিকানা জানিবার সুযোগ খুজিতে লাগিলাম। এমন সময় সদ্য আনন্দধারায় স্নাত হইয়া মা আমাকে সংবাদ দিলেন যে তাঁহার 'বেলফুলের মেয়ে' মালবিকা প্রথম বিভাগে বিশেষ সম্মানের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কেন জানিনা এ সংবাদ আমাকে প্রসন্ন করিতে পারিল না। ফুলে ঢাকা কাঁটার মত হৃদয়ের গোপন আবাসে কিসের ব্যথা যেন বাজিতে লাগিল। কবিতা লিখিয়া সে আমাকে পরাভব করিয়াছে, আবার এবারকার পরীক্ষায় সে অতি সহজে উত্তীর্ণ হইল। আমি যদি—বেশী ভাবিতে পারিলাম না।

কয়েকদিন পরে জানিলাম আমার আশঙ্কা অমূলক নহে, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি। বাবার মুখ গম্ভীর হইল। মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। আমি লজ্জায়, দুঃখে শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দিদিমার মুখে খই ফুটতে লাগিল। যদিও তাঁহার মতেই জগৎতারিণীকে একবছরের জন্য পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, তিনি সে সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া মার উপর ঝাল ঝাড়িতে লাগিলেন-"আহা, বাছা আমার মনের দুঃখে এইটে করে ফেল্লেগো। যুগ্যি ছেলে আর ঘরে বৌ নেই।—এ কি কম দুঃখের কথা? আমিই যেন বুড়ো হাবড়া হয়েছি—বোধ সোধ নেই; তা'বলে মায়েরও কি বৌয়ের কথা মনে করতে নেই?"

এবার মা মনে না করিলেও দিদিমা মনে করিলেন, সেই দিনই লোক দিয়া শ্বশুর মহাশয়ের নিকট অবিলম্বে জগৎ-তারিণীকে রাখিয়া যাইবার নিমিত্ত পত্র লিখিলেন এবং উদ্বেলিত হৃদয়ে বধূর প্রতীক্ষায় আহার নিদ্রা কিয়ৎ পরিমাণে কমাইয়া ফেলিলেন। সুখের বিষয় বেশীদিন দিদিমাকে প্রতীক্ষা করিতে হইল না। সেদিন দ্বিপ্রহরে বরষার বারিধারার মধ্যে তারিণী তাহার কাকার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার শ্বাশুরীঠাকুরাণী মেয়ের ঘর করিবার দ্রব্যাদি এমন সুচারুভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া দিয়াছিলেন, যাহা দেখিমাত্র দিদিমা প্রসন্ন হইয়া স্বীকার করিলেন—"হাঁ ভদ্রলোকের মেয়ে এনেছি বটে, কুটম্বিতা করতে জানে। আর কোথাও শিবুর বিয়ে দিলে এমনটি পাওয়া যেত না।" কেবল দিদিমা নহেন, আশাতীত তৈজস পত্র পাইয়া বাবা ও মাও যথেষ্ট উৎফুল্ল

হইলেন। আজিকার দিনে সকলের চেয়ে বেশী আনন্দিত হইবার কথা যার, সে কিন্তু আনন্দিত হইতে পারিল না।

বিষাদের অশ্রুজল চক্ষে লুকাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া আমি নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। জগৎ তারিণীর জন্যই আমি এমন বিড়ম্বিত হইয়াছি, তাহাতে আমার একটুও সংশয় রহিল না।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলাম, দিদিমা এবার সাধিয়া বৌয়ের মুখ দেখাইলেও আমি দেখিব না; লজ্জা, বিনয়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দিদিমার মুখের উপর জবাব দিব "তোমার পছন্দের বৌ লইয়া তুমি ঘর কর। আমার প্রয়োজন নাই; যাহাকে প্রয়োজন ছিল তাহাকে পাইলে আজ আমার এ দুর্গতি হইত না। আমি ফেল করিয়াছি আমার অক্ষমতায় নয়; ইহার জন্য একমাত্র দায়ী তুমিই।"

সমস্ত দ্বিপ্রহরটা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কত কি এলোমেলো চিন্তায় সময় কাটিতে লাগিল। বৌয়ের মুখ সাধিয়া দেখাইবার জন্য দিদিমা একবারও আসিলেন না। দিদিমার সাড়া না পাইয়া বুঝিলাম, তিনি পাশের বাড়ীতে নবপ্রাপ্ত জিনিষের সমালোচনার্থ গমন করিয়াছেন। আমিও বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম, এমন সময় মার একটি কথায় আমার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া মা বলিতেছেন, "শিবুকে এই খাবার রেকাবখানা দাওগে তো মালবি—সেই ঘরেই তার জলের কুঁজো আছে এক গেলাস জল ভরে দিয়ো।"

এতদিন পরে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলাম মা মালবিকাকে কত স্নেহ করেন, কত ভালবাসেন। তাহাকে না পাইয়া তাহারই নামে অন্যকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার অনাবিল মাতৃস্নেহ চরিতার্থ করিতে চাহিতেছেন। ক্ষোভে, দুঃখে আমার হাসি পাইতেছিল। হায় মা, কাহাকে কি বলিয়া ডাকিতেছ? তোমার দুধের পিপাসা কোথাকার কোন পঙ্কিল জলে নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস করিয়াছ? যে যাহা নহে তাহাকে তাই বলিয়া ডাকিলেই কি একমাত্র নামের জোরে মিথ্যা সত্য হইতে পারে?

পুনরায় মার কণ্ঠে শুনিলাম, "লজ্জা কি মা, যাও খাবার নিয়ে যাও।" কিয়ৎ কাল পরে ঘরের কাছে মৃদু পদশব্দ হইল। আমি জানালার কাছের চেয়ার খানায় বসিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

ধীরে ধীরে জগৎ-তারিণী গৃহে প্রবেশ করিল। খাবার রেকাব খানা, টেবিলের উপর নামাইয়া গেলাসে জল ভরিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া একবার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। পরে কি মনে ভাবিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া স্থির শান্ত-কণ্ঠে বলিল "মা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন, খেতে বলে দিলেন।" আমি যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইতে, দুইটি উৎসুক কালো চোখের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল—বর্ষণ-শ্রান্ত মেঘযুক্ত আকাশের কোণে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিলেন। সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু গবাক্ষ পথ দিয়া জগৎ তারিণীর মুখের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে সে মুখ দেখি নাই, কিন্তু আজ মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই অতি সুকুমার নবীন কিশলয় তুল্য কোমল মুখখানি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব তাহা বুঝিলাম না। প্রথমেই বলিলাম, "মা তোমায় কি বলে ডাকছিলেন?" বধূ হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিল, "আমার যা নাম তাই বলেই ডাকছিলেন।"

তাহার জ্যাকামিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সুন্দর মুখের খাতির না করিয়া আমি কঠোর স্বরে বলিলাম, "তোমার নাম ত জগৎ তারিণী; মা মালবি বলে ডেকেছেন বলেই তুমি মালবি হবে না; মালবি হতে তোমার সাতজন্ম কেটে যাবে—মালবি হওয়া মূর্খের কায নয়।"

জগৎতারিণী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সহাস্যে বলিল, "আমাকে মহামূর্খই বল আর যাই বল আমি মিছা কথা বলি না; আমার নাম জগৎতারিণী নয় মঞ্জুলিকাও নয়, আমি মালবিকা।"

সহসা আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হইয়া আসিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল। বিমূঢ়ের মত বিহ্বল হইয়া আমি উচ্চস্বরে বলিলাম, "তুমি যদি মালবিকা, তবে তোমার জগৎতারিণী নাম হ'ল কেন? আর বিশ্ব-বীণায় তোমার কবিতাই বা বের হ'ল কি করে? তুমি কোথা থেকে কেমন করেই বা ম্যাট্রিক দিলে?"

"এলাহাবাদ বালিকা বিদ্যালয় থেকে আমি ম্যাট্রিক দিয়েছি। সেখান থেকেই 'বিশ্ব-বীণায়' কবিতা পাঠিয়ে দিতাম। এখানকার মা আমার মাকে চিঠি লিখে আমাকে দেশে এনে দেখাতে বলেছিলেন, আমার বারো বছর বয়স, লেখাপড়া কিছু জানি না, জগৎতারিণী নাম এসব কথা মা বলতে বলেছিলেন।"

বলিতে বলিতে মালবিকা সলজ্জ মুখ নত করিল। তাহার মুখে যতটুকু শুনিয়াছিলাম, তাহাই আমার চূড়ান্ত শোনা হইয়াছিল,—ইহা অপেক্ষা বেশী শুনিবার দরকারও ছিল না। হারিয়া গিয়া মানুষ যে এত আনন্দিত হইতে পারে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া মালবিকাকে বক্ষে চাপিয়া "হারাঃসুখ" মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

বাদল-দোল

কে তোদের দোল দিল, তাই বল্,
ও তাল-খেজুর, ও বেণুবন, নারিকেলের দল—
কে তোদের দোল দিল, তাই বল।

শাখায় শাখায় পাতায় পাতায়
অমন করে' কে আজ মাতায়,
অচঞ্চলে কে করল আজ উচ্ছল চঞ্চল!

ওপার হ'তে আষাঢ় এল চিকণ কালো বেশে,
ইসারাতে সেই কি তোদের ডাক্ দিল আজ হেসে?

তারি হাওয়ার হাতছানিতে
জাগল কি আজ আচম্বিতে
মর্ম্মরিত হাজার শাখার হরষ-কোলাহল?

মোর মনে আজ তোদের মতন অম্‌নি আকুলতা,
বুকের 'পরে আছড়ে মরে মনের যত ব্যথা;
তোদের উতল বাহুর ঘেরে
আজকে আমায় জড়িয়ে নেরে
অম্‌নি করে' দুলুক আমার হৃদয় টলমল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অভাবনীয় বিপদ।

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া, শয্যায় পড়িয়া গত রাত্রের দৃশ্য স্মরণ করিতে করিতে মল্লিকের মনে ধারণা জন্মিল যে, কিশোরী প্রতিদিন গভীর রাত্রে ক্যালকাটা রোড হইতে চোরের মত নিঃশব্দে পাহাড় বাহিয়া উঠিয়া আসে, সত্যবালা সজাগ থাকে, সে নিজ কক্ষদ্বার খুলিয়া দেয় এবং নিভৃত শয়নকক্ষ মধ্যেই উভয়ের মিলন হয়। গতরাত্রে সে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে, তাহাতে এইরূপ

অনুমান করা তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কতদিন ধরিয়া এই ব্যাপার চলিতেছে কে জানে! রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। ইদানীং সতীর ব্যবহারে তাহাকে বিবাহ করিবার স্পৃহা মল্লিকের মনে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়াই আসিতেছিল; গত রাত্রির ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সে অভিপ্রায় সে এক কালে পরিত্যাগ করিল; কিন্তু সতী ও কিশোরীকে জব্দ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সতীর সতীপনা ভাঙ্গিয়া দিয়া, জনসমাজে তাহাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিতে হইবে; এবং কিশোরীকেও বিধিমতে জব্দ করিয়া দিতে হইবে।

শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া মল্লিক যথারীতি ঘোষ ভিলায় গিয়া দর্শন দিল। সেখানে ঘোষ গৃহিণী ও বীণার সহিত বাক্যালাপ করিয়া, যথারীতি বারান্দায় চেয়ার টানিয়া বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ ও সিগারেট ভস্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল। একবার মাত্র সত্যবালার সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়াছিল—কিন্তু সত্যবালা সগর্ব্বে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। মল্লিক আজ মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, "দাঁড়াও, গরবিনি! তোমার দেমাক্ আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি, আর বেশী দেরী নেই!"

আজ সারাদিন মল্লিকের আর অন্য চিন্তা রহিল না, কি উপায়ে বৈরনির্য্যাতন করিবে তাহাই কেবল সে চিন্তা করিতে লাগিল। একবার ভাবিল, পুলিসে গিয়া, দারোগাকে বলিয়া, দুইজন কনেষ্টবল আনিয়া তাহাদের লুকাইয়া রাখি; কিশোরী যাই আসিয়া সত্যবালার ঘরে প্রবেশ করিবে, অমনি তাহাকে গ্রেপ্তার। তাহার পর ভাবিল, না, তাহাতে কায নাই; ওরূপ করিলে একটা পুলিস কেস হইয়া দাঁড়াইবে, কলিকাতার খবরের কাগজে কাগজে উহা ছাপা হইবে; একজন গণ্যমান্য বিলাত ফেরতের গৃহে বিদ্যাসুন্দর রর অভিনয় দেখিয়া দেশ শুদ্ধ লোক ছি ছি করিবে—কেলেঙ্কারীটা আর জনসমাজে প্রচার করিয়া কায নাই! তার চেয়ে বরং নিজেই তাহাকে ধৃত করিয়া, ঘোষগৃহিণীকে জাগাইয়া ব্যাপারটি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া, ঘা কতক উত্তম মধ্যম দিয়া, "কাল সকালে পুলিসে দিব" বলিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া ঘোষ ভিলায় ফেলিয়া রাখিয়া, প্রভাত হইলে আর এক দফা প্রহার দিয়া ছাড়িয়া দিলেই ভাল হয়। কিশোরীও জব্দ হয়; সতী যে কি শ্রেণীর মেয়ে তাহাও উঁহার বাড়ীর লোকে বেশ বুঝিতে পারে।

সারাদিনে যতগুলি কার্য্যপ্রণালী মল্লিকের মাথায় আসিল, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া সে বিবেচনা করিল; কেবল, নিজে কিশোরীকে ধৃত করা সম্বন্ধে তাহার মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। তাহার অপেক্ষা কিশোরীর বয়স কম, এবং স্বাস্থ্যও ভাল; হাতের পায়ের হাড়গুলা বেশ মোটা ও মজবুদ—গাঁটা গোঁটা চেহারা,—শারীরিক বল পরীক্ষায় কিশোরীর সহিত সে পারিয়া উঠিবে কি? তাহার উপর, সে ছোরা-ছুরি সঙ্গে রাখে কি না তাই বা কে জানে?—রাখাই কিন্তু সম্ভব। কিশোরীকে ধরিতে গিয়া শেষে কি হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে? অবশেষে মল্লিক স্থির করিল নিজে চেষ্টা করিয়া কায নাই, ঐ পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলুকে লাগাইয়া দিলেই ঠিক কার্য্যোদ্ধার হইবে। মংলুর দেহে যথেষ্ট বল আছে;—পাহাড়িয়া জাতি, ছুরিছোরাকেও সে গ্রাহ্য করিবে না। কিছু বখ্‌শিসের লোভ দেখাইলেই সে একার্য্যে রাজি হইতে পারে।

সন্ধ্যার পর নিজ বাসায় গিয়া মল্লিক তাই ভৃত্যকে ডাকিল—"বেয়ারা!"

"হুজুর"—বলিয়া মংলু আসিয়া দাঁড়াইল।

মল্লিক হুকুম করিল, "পেগ দেও।"

মংলু যথারীতি একটা ট্রের উপর হুইস্কির ডিক্যাণ্টার প্রভৃতি আনিয়া, প্রভুর পার্শ্বস্থিত টেবিলের উপর রক্ষা করিল। মল্লিক খানিকটা হুইস্কি ঢালিয়া লইয়া, সোডা মিশাইয়া পান করিতে করিতে বলিল, "মংলু, তুম চোর পাকাড়নে সকে গা?"

মংলু সবিস্ময়ে বলিল, "চোর? কাঁহা হুজুর?"

"ঘোষ মেম সাহেবকা কোঠী মে।"

মংলু তাহার সেই ক্ষুদ্র নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আভি আয়া?"

মল্লিক তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল। এই চোর লোকটা যে কে এবং কি কারণেই বা তাহার অবির্ভাব হইয়া থাকে, সেটুকু শুধু অপ্রকাশ রাখিয়া, কখন চোর আসিবে এবং কি উপায়ে তাহাকে ধরিতে হইবে ইত্যাদি আর সকল কথাই তাহাকে বলিল। অবশেষে মল্লিক বলিল, "তুম চোর পাকড়ো, হাম তুমকো দশ রুপিয়া বখ্‌শিস দেঙ্গে।"

মংলু বলিল, "বহুৎ খু হুজুর"—কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল না।

* * * *

রাত্রি বারোটা বাজিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে মল্লিক তাহার শয়ন কক্ষের আলো নিবাইয়া, জানালাটি খুলিয়া প্রতীক্ষায় রহিল। মংলু যথাস্থানে গিয়া লুকাইয়া বসিয়া আছে; চোর বারান্দায় উঠিয়া যাই মিস্ সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি মংলু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিবে এবং চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে এইরূপ বন্দোবস্ত।

ঘড়িতে ১২টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিক দেখিল, নিম্নস্থ ক্যালকাটা রোড হইতে একটা মানুষ হামাগুড়ি দিয়া পাহাড় উঠিয়া ঘোষ ভিলার হাতার প্রান্তভাগে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, ঘোষভিলা হইতে একটি নারী মূর্ত্তিবাহির হইয়া আসিয়া, সেই নর-মূর্ত্তির সমীপবর্ত্তী হইল। তাহার পর উভয়ে সেই খানে যেন অন্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল,—মল্লিক আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

মল্লিক অনুমান করিল, উহারা ওখানে বসিয়াছে—একটা উচু পাথরের আড়াল পড়িয়াছে বলিয়া উহাদিগকে আর দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। উহারা দুইজনেই নামিয়া যাইতেছে না ত? একবার ইচ্ছা হইল, জুতা যোড়াটা খুলিয়া রাখিয়া, নগ্নপদে বাহির হইয়া উহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এই অন্ধকারে, পাহাড়ের অত কিনারায় যাইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করিতে লাগিল, মংলু এখনই ছুটিয়া আসিয়া চোরকে ধরিবে—কিন্তু মংলুর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তখন মল্লিকের স্মরণ হইল, মংলুর প্রতি আদেশ আছে, চোর বারান্দায় উঠিয়া, মিস সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিতে গেলেই সে ছুটিয়া আসিয়া ধরিবে। চোর বারান্দায় উঠে নাই, সুতরাং সে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—বেটার ঘটে যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি আছে!

চোরের আবির্ভাবের পর প্রায় দশ মিনিট অতীত হইলে, ঠিক গত রাত্রের ন্যায়, উভয় মূর্ত্তি আবার সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া উঠিল। গতরাত্রির ন্যায়, উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল, এবং চুম্বনের শব্দও যেন শুনা গেল। তাহার পর স্ত্রীমূর্ত্তি ফিরিয়া বাড়ীর দিকে গেল, পুরুষ মূর্ত্তি হামাগুড়ি দিয়া সাবধানে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিল।

এই সময় মংলু নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে চুপি চুপি বলিল, "হুজুর, চোর তো বারান্দামে আয়া নেই। হাতামে আকে বৈঠা, মিস সাহেবকা সাথ বাতচিৎ কিয়া, আভি চলা যাতা হায়।"

মল্লিকের ইচ্ছা করিল, তাহার নাকের উপর দম্ করিয়া এক ঘুঁসি বসাইয়া দেয়; কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিল, "তুম দৌড়কে যাও, আভি উস্কো পাকড়ো। পাকড়কে, উস্কো ঘোষ সাহেবকা হাতা মে লে আও—হামভি আতা হায়।"

"বহুৎখু হুজুর"—বলিয়া মংলু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মল্লিক সেই বাতায়ন পথে দেখিল, মংলু উভয় হাতার মধ্যবর্ত্তী তার ডিঙাইয়া, যে স্থানে প্রণয়ীযুগল বসিয়া ছিল, সেই স্থান অবধি গেল, এবং তাহার পর, ক্যালকাটা রোডের দিকের পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মল্লিকও তখন বাহির হইল; এবং ঘোষভিলার হাতার প্রান্তে গিয়া, নিম্নে চাহিয়া দেখিল, অস্পষ্ট

আলোকে দুই জন লোক ক্যানকাটা রোডের উপর ঝাপ্‌টা ঝাপটি করিতেছে। দেখিয়া, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মংলু, পাকড়ো পাকড়ো, ছোড়ো মৎ, হামভি আতা হায়।"—বলিয়া সে সাবধানে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদূর নামিয়া, নিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ড এত নীচু বলিয়া বোধ হইল যে, নামিতে আর তাহার সাহস হইল না; সেই খানে পাথরের উপরে বসিয়া নিম্নে চাহিয়া রহিল, এবং পুনরায় হাঁকিল, "মংলু, ছোড়ো মৎ—ছোড়ে মৎ।"

পাথরের উপর দিয়া ছুটাছুটির জুতার শব্দও সে পাইল। চোর ও ধৃতকারী দূরে চলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইল তাহার পর আর্ত্তকণ্ঠে শব্দ উঠিল—"বাপ্‌রে বাপ —জান গিয়া!" মল্লিক অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল— "যাঃ, বোধ হয় বুকে ছুরী বসিয়ে দিলে।"—বলিয়া, আর কোনও শব্দ যদি শুনিতে পায়, এই জন্ম কাণ খাড়া করিয়া রহিল; কিন্তু আর কোনও শব্দ পাইল না—সমস্তই নিস্তব্ধ।

সেই মুক্তস্থানে বসিয়াও, মল্লিকের দেহ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। দেখিল, ইংরাজি কাপড় পরা এক মূর্ত্তি, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ফিরিয়া আসিতেছে ভাবিল, কিশোরী ত আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছে, যদি উঠিয়া আসিয়া আমার বুকেও ছুরি বসাইয়া দেয়?—তখনই সে তাড়াতাড়ি, ঘোষভিলার হাতায় উঠিয়া, নিজ বাসায় গিয়া, সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া, অন্ধকার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল, কিন্তু আততায়ীকে দেখিতে না পাইয়া স্থির করিল, সে এতক্ষণ প্রস্থান করিয়াছে—এইবার একবার নামিয়া গিয়া, মংলুর অবস্থা কি হইয়াছে দেখিলে হয় না? আবার ভাবিল, কিশোরী যদি চলিয়া না গিয়া থাকে? তা ছাড়া, মংলু কখনও জীবিত নাই—নামিয়াই বা ফল কি? যে গিয়াছে সে ত গিয়াছেই! তার সঙ্গে নিজেকে বিপদে জড়াই কেন?—এই ভাবিয়া সেজানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া, পোষাক ছাড়িয়া,খানিকটা হুইস্কি ঢালিয়া এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিদায়।

কিশোরীকে বিদায় দিয়া আসিয়া, সত্যবালা তাহার দ্বারটি বন্ধ করিয়া যখন শুইতে যাইতেছিল, তখন সেও ক্যানকাটা রোডের দিক হইতে মল্লিকের কণ্ঠস্বরে "মংলু পাকড়ো পাকড়ো ছোড়ো মৎ" এবং অবশেষে "বাপরে বাপ জান গিয়া" শব্দটা শুনিয়াছিল। শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়াছিল।

সতী তখন বেশ বুঝিতে পারিল, মল্লিক কিশোরীকে ধরিবার জন্ম মংলুকে পাঠাইয়াছে—এবং মংলু তাহাকে ধরিয়াছে। কিন্তু "বাপরে বাপ জান গিয়া" শুনিয়া সতী কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি গিয়া পশ্চাতের জানালা খুলিয়া কাণ খাড়া করিয়া রহিল, কিন্তু আর কোনও রূপ শব্দ শুনিতে পাইল না। তবে দেখিল, ইংরাজি কাপড় পরা এক মূর্ত্তি, নিম্ন হইতে হাতায় উঠিল, এবং তার ডিঙাইয়া পার্শ্বস্থ হাতায় প্রবেশ করিল। সতী বুঝিল যে মল্লিক ফিরিয়া গেল। কিন্তু তথাপি তাহার ভয় গেল না; বুক দুড়্ দুড় করিতে লাগিল। কি হইবে! কিশোরীর যদি কোনও অনিষ্ট হইয়া থাকে,—তাহা হইলে কেমন করিয়াই বা আমি জানিতে পারিব? কোথায় কাল বেলা ৯টার সময় বিবাহ, আজ হঠাৎ এ কি অভাবনীয় কাণ্ড!

খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সতী প্রায় পনেরো মিনিট এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় দেখিতে পাইল, কিশোরী যেখান দিয়া উঠিয়া আসে, ঠিক সেইখান দিয়া দ্বিতীয় একজন মনুষ্য মূর্ত্তি উঠিয়া তাহাদের হাতায় আসিল। সেই তরল অন্ধকারে, লোকটাকে কিশোরীর মতই দেখাইল সতী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। অপেক্ষা করিতে লাগিল। লোকটা বাড়ীর দিকেই আসিল; এবং ক্ষণকাল পরে, সতীর বদ্ধ দ্বারের বাহিরে, কুকুরে আঁচড়াইলে যেমন শব্দ হয়, সেইরূপ একটা শব্দ উত্থিত হইল।

সতী ক্ষিপ্রপদে দ্বারের কাছে আসিয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

সেইরূপ চাপা গলায় উত্তর আসিল, "আমি কিশোরী, খোল।"

সতী কম্পিত হস্তে দ্বার খুলিয়া দিল। কিশোরী বলিল, "একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। একটা লণ্ঠন দিতে পার ?"

সতী কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?"

কিশোরী বলিল, "মল্লিকের চাকর মংলু আমায় আক্রমণ করেছিল। হুড়োহুড়িতে, আমরা দুজনে রাস্তার শেষে গিয়ে পৌঁছেছিলাম—তার পর, আমি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাকে একে ধাক্কা দিই; তাতে সে গড়াতে গড়াতে নীচে চলে গেছে—যদি খদে পড়ে গিয়ে থাকে, তবে তার অস্থিচূর্ণ হয়ে গেছে। একটা লণ্ঠন দাও, আমি তাকে খুঁজে দেখ্‌বো—যদি বেঁচে থাকে, তবে তার প্রাণ বাঁচাবার উপায় করবো।"

সতী, কিশোরীর বাহুর উপর হস্ত রাখিয়া বলিল, "আমি লণ্ঠন দিচ্ছি, কিন্তু একলা তোমায় ত আমি যেতে দেবো না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

কিশোরী বলিল, "না না, তুমি কোথা যাবে ?"

সতী বলিল, "তা হলে তুমিও যাবে না। আমি এই রাত্রে তোমায় একলা যেতে দেবো না।"

কিশোরী বলিল, "পাহাড়ের গা দিয়ে তুমি কি নামতে পার ? যদি পড়ে যাও ত সর্ব্বনাশ হবে। তা ছাড়া, মল্লিকও বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও আছে। আমি যখন মংলুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিলাম, তখন দু'বার তার গলার স্বর শুনেছি।"

সতী বলিল, "আমিও শুনেছি। সে নিজের বাসায় চলে গেছে আমি দেখেছি। সে থাকুক আর নাই থাকুক, আমার বাড়ীর লোকদের কাছে জানাজানি হোক্ আর না হোক্—এ বিপদে আমি কখনই তোমায় একলা ছেড়ে দেবো না—আমিও তোমার সঙ্গে থাক্‌বো। "পাহাড়ের গা দিয়ে নামা ওঠার কথা বল্‌ছ, সে আমার খুব অভ্যাস আছে—ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস আছে। সে জন্যে তুমি কিছু ভয় কোর না।"

কিন্তু কিশোরী কিছুতেই রাজি হইল না। অনেক করিয়া সতীকে বুঝাইল। বলিল, "দেখ, সে লোকটা কোথায় পড়ে আছে, এই রাত্রে কেবল মাত্র একটি লণ্ঠনের সাহায্যে খুঁজে পাওয়া একরকম অসম্ভব হবে। তবু, মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে একবার খুঁজে দেখা এইমাত্র। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত দিচ্ছি, বেশীদূর নীচে অবধি আমি যাব না—নিজের জীবনকে বিপন্ন করবো না। তুমি লণ্ঠনটা দাও, আমি একটু খুঁজে দেখে আসি। তুমি জেগে থাক, আমি এখনই আবার ফিরে আস্‌বো।"

সতী তখন নিজ গোসলখানা হইতে একটি হরিকেন লণ্ঠন আনিয়া কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী বলিয়া গেল, "আমি আধঘণ্টার ভিতরই ফির্‌বো।"

* * *

অর্দ্ধঘণ্টা পরে কিশোরী ফিরিয়া আসিল। সতী দ্বার খুলিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল ?"

কিশোরী বলিল, "আমি অনেকটা দূর অবধি নেমে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও তার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। খুব নীচু খদে গিয়ে বোধ হয় সে পড়েছে। সে আর বেঁচে নেই। বাইরে চল, এখন আমার নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কি করবো স্থির করেছি তা বলবো।"

উভয়ে বাহির হইয়া, পূর্ব্বস্থানে গিয়া বসিল। কিশোরী বলিল, "দেখ, আমি এখন খুনের দায়ে পড়লাম। ইচ্ছাপূর্ব্বক না করলেও, ঘটনাক্রমে, আমার দ্বারায় একটা খুন হয়ে গেল। স্বয়ং মল্লিক তার সাক্ষী। মল্লিক এই রাত্রেই পুলিসে খবর পাঠিয়েছে কি না জানি না, কাল সকালে নিশ্চয়ই পাঠাবে—তখন আমি গ্রেপ্তার হব। সুতরাং, এখনই আমার গা ঢাকা দেওয়া দরকার। এই রাত্রেই আমি দার্জ্জিলিঙ ছেড়ে পালাবো স্থির করেছি।"

সতী কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে ?"

কিশোরী বলিল, "রেলের পথে, কলকাতার দিকে নয়। কারণ ঐ দিকেই পুলিস আমায় খুঁজবে। ভাবছি, ঠিক উল্টো দিকে, টিবেটের পথে আমি যাব। কিছুদূর গেলেই, ইংরেজ রাজ্যের সীমানা পার হয়ে যাব। তখন আর কিছু ভয় থাকবে না। বছর খানেক পরে, এ দিকে সব গোলমাল মিটে গেলে, আমি ফিরে আস্‌বো, কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি কি বল ? এই ভাল মৎলব নয় ?"

সতী, পূর্ব্ববৎ চাপা কান্নার ভিতর হইতে বলিল, "এই বোধ হয় এখন ভাল।"

কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সতীকে বক্ষে বাঁধিয়া

সাশ্রুনয়নে বলিল, "তবে, এখন আমায় বিদায় দাও। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত, তুমি আমারই থাকবে ত?"

সতী, কিশোরীকে বুকে বাঁধিয়া বলিল, "আমি তোমরই থাক্‌বো—তোমারই থাকবো—আমরণ আমি তোমারই থাকবো। তুমি ফিরে আসবার আশায় বেঁচে থাক্‌বো।"

কিশোরী সতীকে বারম্বার চুম্বন করিয়া বলিল, "এখন তবে বিদায়। একটা কথা। তোমার কাছে টাকা আছে?"

"আছে। এনে দেব?"

"না। আমি এখন স্যানিটেরিয়মেই যাচ্চি। দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে, ভোর হবার আগেই দার্জ্জিলিঙ ছেড়ে চলে যাব। কাল তুমি স্যানিটেরিয়মে গিয়ে, আমার হিসেব মিটিয়ে নিয়ে, আমার জিনিষপত্র আর কুকুরটিকে এনে তোমার কাছে রাখ্‌বে।"

সতী বলিল, "তা রাখ্‌বো।"

তখন, অনাবিল অশ্রুজলে পরস্পরকে পরিষিক্ত করিয়া, উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

শাস্তি (উপন্যাস)

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল প্রণীত। ডবল ক্রাউন, ষোলপেজী, ৩৮০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধান, মূল্য আড়াই টাকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রেমে মসগুল হইয়াছেন; তিনি আর উপন্যাসে হাত দেন না। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা বাহির হয় হোমিও-প্যাথিক মাত্রায়। বন্ধুবর্গের তাড়া খাইলে, চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি উত্তর দেন—বুড়া বলদ হাল টানিতে অক্ষম। কথা সাহিত্যে দুই জন প্রতিভাশালী লেখক ক্রমশঃ ইঁহাদের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

"কৃষ্ণকান্তের উইলের" রোহিণী, "বিষবৃক্ষের" হীরা এই সব আঁকিতে গিয়া বঙ্কিম বাবু ঘোমটার পিছনে খেমটা নাচান নাই। প্রভাত বাবু কখনও ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের সতী আঁকিয়া পাঠক পাঠিকাকে হতভম্ব করেন নাই।

স্বামীর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে, কি প্রকারে পরি টি রূপে আত্মবঞ্চনা করিতে হয় ও পরের চোখে ধূলা দিতে হয়, সেই বিদ্যায় ম্যাট্রিকিউলেট—রবিবাবুর "নষ্টনীড়ের" চারুলতা; গ্র্যাজুয়েট—শরৎবাবুর "গৃহদাহের" অচলা; এবং রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার—রবি বাবুর "ঘরে বাইরের" বিমলা। শেষোক্ত এই অপূর্ব্ব উপন্যাসের প্রতি পৃষ্ঠা ভাষার ঝঙ্কারে, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে ও শিল্পীর চাতুর্য্যে মনকে অভিভূত করে, কিন্তু বরাবর একটা অশুচি ভাব থাকিয়া যায়।

কয়েক ধাপ নামিয়া, "চরিত্রহীন" উপন্যাসে শরৎ বাবু গণিকার সাবিত্রীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

ডাক্তার নরেশচন্দ্র "শাস্তি" উপন্যাসে, সবাইকে টেক্কা দিয়া শাস্তি দিবার মানসে, কুলবধূ গোপা ও তাহার প্রণয়ী কমলকে এক হোটেলে এক ঘরে ছয় মাস পুরিয়া বালিশ আড়াল দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন। সুবিদ্বান্‌ ও মনীষী লেখকের Apotheosis of prostitutesকে অনুকরণ করিতে গিয়া, নিম্নশ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের কি দশা হইবে, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়।

"শাস্তির" আখ্যান-বস্তু এই :—

ভবানীপুরের তরুণ উকিল শুভেন্দুভূষণ রায়ের স্ত্রী গোপা "প্রীতির অবতার, আনন্দের ফোয়ারা, জীবন্ত সেবা।" ঐ পাড়ার এক বাটীতে একটা মহিলা সভা ছিল—উদ্দেশ্য অসহযোগ প্রচার। প্রায় শতাধিক ভদ্রমহিলা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া সভায় চলিতেছেন—"বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।" গোপা গান গাহিতে গাহিতে ঐ দলের সঙ্গে সভাস্থলে উপস্থিত হইল। হরিশ মুখার্জি পার্কে যে সভা হইল, গোপা তাহাতে বক্তৃতা করিল। এক দল ভলান্টিয়ার "গোপা মাইকী জয়" বলিয়া সসম্মানে তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

গোপার স্বামী শুভেন্দু অসহযোগের বিরোধী ছিল। ব্রেসলেট, ব্রোচ আর হার সভার ভিক্ষার ঝুলিতে দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া শুভেন্দু স্তম্ভিত ও বিরক্ত হইল।

পর দিন আর এক স্থানে সভা। একটী সুদর্শন

যুবক—নাম কমল—আসিয়া বলিল, "চলুন মা, আপনার দশ হাজার সন্তান আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত গোপা বলিল, "কিন্তু আমার স্বামী এখনো ফেরেন নি।"

"কিন্তু মা, এ যে দেশের ডাক, মহাপুরুষের সম্বোধন, একে অগ্রাহ্য করা কি আপনার উচিত হবে? আমাদের ভারত-মাতা যে আপনাকে একটা প্রকাণ্ড কাজ দিয়ে জন্ম দিয়েছেন মা। আপনার মাথায় রাজটীকা দিয়ে দিয়েছেন, আপনি কি স্বামীর জন্যে এ কর্ত্তব্যে পেছ-পা হবেন?" (১৯ পৃ)।

স্বামী বাটীতে ফিরিবার অপেক্ষা না করিয়া গোপা সভায় চলিয়া গেল। তথায় গিয়া বলিল—"সকল বাধা ভেঙ্গে অগ্রসর হও। ঘরের বন্ধন, ভালবাসার মোহ, আত্মীয় পরিজনের দুঃখ, সব ভুলে যাও—ভুলে যাও স্বামী, পুত্র, পরিজন—জান, তোমার কেউ নাই, আছে কেবল তোমার দেশ।" (২৩ পৃ)।

শুভেন্দু গোপাকে তিরস্কার করাতে, দুই সপ্তাহ সে কোন সভাসমিতিতে গেল না।

কমল আসিয়া রোজ সাধ্য-সাধনা করিত, শেষে চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইত। আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছিল, এমন সময়ে অসহযোগের ঝোঁকে সে কলেজ ছাড়িয়া দেশের কাজে লাগিয়া গেল। তাহার বয়স কুড়ি বছর। গোপা নিঃসন্তান বয়স বাইশ বছর। গোপা রূপসী, কমল অসামান্য রূপবান।

এক দিন কমল আসিয়া গোপার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আজ তোমার না গেলেই চলবে না, নইলে আমি পা জড়িয়েই পড়ে থাকবো।" (৩৪ পৃ)

"পাগল ছেলের রকম দেখ" বলিয়া গোপা কমলের হাত ধরিয়া তুলিল। একটু জোর করিয়াই তাহাকে উঠাইতে হইল। সে ইহাতে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল। আর যাহাকে সে টানিয়া উঠাইল, সেও এ স্পর্শ বেশ আনন্দের সঙ্গেই অনুভব করিল। এক দণ্ড দুই জনে নীরব হইয়া কেবল পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করিল। তারপর ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কমল মাটির দিকে চক্ষু নামাইল, তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।" (৩৫ পৃ)

খানিক পরে গোপা বলিল, "চল বড় বাজারে যাই, এখনি গিয়ে পিকেটিং আরম্ভ করি। মায়ের ডাক এসেছে, আমায় বেরুতেই হবে।" মহাত্মা গান্ধীর আদেশ-মত গোপা জামা-টামা অনাবশ্যক মনে করিল। "গোপা তার কাপড় খানা গায়ের উপর জড়াইয়া শেষে কোমরে আঁটো করিয়া বাঁধিয়াছে, শক্ত কাজের জন্য। তাহাতে তাহার অপরূপ অঙ্গ-সৌষ্ঠব এত বেশী দেখা যাইতেছিল যে তাহাকে লইয়া বড় বাজারের গুণ্ডার ভিড়ে যাইতে কমলের মন সরিতেছিল না।" (৩৮ পৃ)।

যে কনষ্টেবলের হস্তে গোপা লাঞ্ছিত হয়—যে "নির্লজ্জ বাসনার দৃষ্টিতে তাহার অর্দ্ধ অনাবৃত দেহের দিকে চাহিয়া আত্মসংবরণ করিতে পারিল না" (৪১ পৃ) কমল তাহার মাথা ফাটাইয়া দিল। গোপা ও কমল হাজতে গেল। "আজ কমলের চক্ষের সম্মুখে কেবলি ভাসিয়া উঠিতেছে গোপার মুহূর্ত্ত-দৃষ্ট অর্দ্ধ অনাবৃত দেহের মূর্ত্তি। সে চক্ষু বুজিয়া একাগ্রচিত্তে কেবল আবৃত্তি করিয়া গেল, "মা, মা, মা"—"গোপা-মা" "গোপা মা"। (৫৮ পৃ)।

কমলের দুই বৎসর ও গোপার এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইল।

কমল বড় মানুষের ছেলে। সে টাকা দিয়া জেলের মেট ও তিন চারটী ওয়ার্ডারকে হস্তগত করিল। তাহাদের সাহায্যে সে গোপার সহিত চিঠিপত্র চালাইতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি জেলে মেয়েদের ফাটকে গোপার যাহারা জুড়িদার ছিল, তাহাদের অশ্রাব্য কথা বার্ত্তা শুনিয়া গোপা প্রথম প্রথম শিহরিয়া উঠিত। ক্রমে ক্রমে সে সহবাসনীদিগকে বরদাস্ত করিতে পারিল। "সে ক্রমে বিশ্বাস করিল যে পৃথিবীতে সতী নারী বাস্তবিক কেউ নাই, দুই একটি নিতান্ত মূর্খ ছাড়া। কোন্ কোন্ লোকে কবে ধর্ম্ম-মায়ের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, কে বিমাতাকে অঙ্কশায়িনী করিয়াছে, এসব খবর এক ডাকে গোপা বলিয়া দিতে পারিত।" (৬৪ পৃ)।

"দিবারাত্রি এই সব আলোচনা। কাজেই গোপার শরীর ও মন অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিত এবং অনেক সময়েই সেই উত্তেজনা কমলকে আশ্রয় করিত।" (৬৩ পৃ)। "শুভেন্দুর বিমল প্রেম স্মরণ করিয়া সে অনেক সময় নিজের অপরাধের গভীরতা অনুভব করিয়া কাঁদিয়া মরিত।" (৬৫ পৃ)

এক রাত্রে পাঁচ শত বন্দী জেল হইতে পলাইল। ধুবড়ীতে আসিয়া কমল ও গোপা এক মুসলমানের হোটেলে আশ্রয় লইল। হোটেলওয়ালাকে কমল পরিচয় দিল গোপা তাহার স্ত্রী।

"কমল মাচানের দিকে চাহিল। সুপ্ত সুন্দরীর এই অযত্নবিন্যস্ত রূপরাশি তাহার সকল সংযমের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিল।" (৭৬ পৃ)। "গোপার

শরীরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে চোরের মত গোপার ওষ্ঠাধরে চুম্বন দিয়া আবার উঠিয়া বসিল।" (৭৭ পৃ)। "এই ভাবে থাকিতে থাকিতে সে গোপার পায়ের তলায় ঘুমাইয়া পড়িল।

"ঘুমের ঘোরে গোপা তাহার বুকের উপর দিয়া পা চালাইয়া দিয়াছে। সে পা সরাইল না, কমলের দেহ-স্পর্শের অনুভূতিতে তার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তার মনে একটা মস্ত আকাঙ্ক্ষা হইল, ওই ওষ্ঠাধর ও গণ্ড চুম্বনে ভাসাইয়া দিতে।" (৭৮ পৃ)। "কমলের বুকের ভিতর আলগোছে মাথা রাখিয়া সে নিবিড় স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিল।" (৭৯ পৃ)।

এই ভাবে ছয় মাস কাটিল। ক্রমে উভয়ে পরস্পরের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল।

খবরের কাগজে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে মাপ করিয়াছেন শুভেন্দুর এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া, গোপা স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিল।

স্ত্রীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া শুভেন্দু মৃতপ্রায় হইয়া ছিল। স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য এক বিলাত-ফেরত বন্ধু "বোহেমিয়া ক্লাবে" যাতায়াত করিবার নেশা ধরাইলেন। ঐ ক্লাবে বিবাহ ও প্রণয় সম্বন্ধে এই ভাবে আলোচনা চলিত :—

মিসেস চ্যাটার্জ্জী "প্রেম সে জিনিসই নয় যাকে নিয়ে তুমি রোজকার ঘর সংসার করবে। ......লোকে ভালবাসাটা বিবাহের দ্বারা বেঁধে সংসারে লাগাতে যায়, তাই থেকেই ত' ভালবাসার যত tragedy সৃষ্টি হয়।"

বীরেন গাঙ্গুলী। "তা হলে বলতে চান যে বিয়ে জিনিসটা উঠে যাক?"

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। ..."আমি বিয়েটা ওঠাতে বলছি না আপনাদের। আপনারা গিন্নীদের সঙ্গে সুখে ঘর কন্না করতে থাকুন। কিন্তু সেই যে ঘরকন্নার চুক্তি, propagation of the species এর সেই যে একটা সাময়িক বন্দোবস্ত, তাকে Love নাম দেবেন না, দোহাই আপনাদের।" (১৭১ পৃ)।

বীরেন। "বিয়েটা থাকবে, অথচ তার ভিতর ভালবাসা থাকতে পারবে না; তবে ভালবাসাটা পাওয়া যাবে কোথায়?"

মিসেস চ্যাটার্জ্জী। "চিরদিন যেখানে পাওয়া যায়—পরকীয়ায়।" (১৭৫ পৃ)।

গোপা শুভেন্দুর নিকট মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমি—আমি—অপরাধিনী।" তাহার পর মাটীতে লুটাইয়া স্বামীর পা জড়াইয়া বলিল, "আমি তোমার দয়ার ভিখারী।" (২০৪ পৃ)।

"শুভেন্দুর সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া অবিশ্বাসিনী পত্নীর কলুষিত স্পর্শে একটা কম্পন বহিয়া গেল।" সে স্বামী সত্যস্বরূপের কাছে ছুটিল। তিনি বলিলেন, "তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে বউমাকে তাঁর স্থানে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা। তার পর তাঁর অন্তরের শুচিতার জন্য তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে ব্রতী করা।" (২১৫ পৃ)।

গোপার ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হইল। শুভেন্দুর কাকী অলকার গৃহিণীপনায় তাহার সিকি আহারও জুটিত না এবং প্রত্যহ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত।

কমল জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মে মন দিল। স্বামী সত্যস্বরূপের নিকট দীক্ষা লইতে গেল, তাঁহার নিকট নিজের কলঙ্কের কাহিনী বিবৃত করিল।

স্বামীজী বলিলেন, "তুমি ঠিক কথা বলছো, কমল, যে কলুষিত চিত্তে স্পর্শ করা ছাড়া, তুমি তার ধর্ম্মনাশ কর নি।" (২৬৮ পৃ)।

"তাকে চুম্বন করেছি, বুকের ভিতর চেপে ধরেছি এই পর্য্যন্ত।" (২৬৯ পৃ)।

স্বামীজী শুভেন্দুকে বলিলেন, "তুমি হস্তী মূর্খ। পাপ তিনি কোনও দিনই করেন নি।" (২৭০ পৃ)। "যাও তুমি ঘরে গিয়ে মা লক্ষ্মীকে তাঁর অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর গে।" (২৭১ পৃ)।

"পিছন হইতে পা টিপিয়া আসিয়া শুভেন্দু গোপাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল।...স্বামীর প্রতি যে সে অভিমান করিবে, এতটুকু প্রেমও তার অন্তরে অবশিষ্ট ছিল না। শুভেন্দু তার ভাব দেখিয়া কতকটা থতমত খাইয়া গোপাকে ছাড়িয়া দিল।...ছাড়া পাইয়া গোপা ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়া আচমন করিয়া মালা হাতে বীজমন্ত্র জপ করিতে বসিল।" (শেষ পৃষ্ঠা)।

ডাক্তার নরেশচন্দ্রের বর্ণিত "বোহেমিয়া ক্লাব" (১৭০ হইতে ১৯৭ পৃষ্ঠা) ছাড়া, আর কোথাও "শান্তি" পঠিত হইলে, পাঠককে "আচমন করিয়া মালা হাতে বীজমন্ত্র জপ করিতে" হইবে।

শ্রীগৌরহরি সেন।

কলিকাতা

১৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাতৃমূৰ্ত্তি

(চিত্রকর —শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র গুহ

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ
২য় খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩০

২য় খণ্ড
৩য় সংখ্যা

বৌদ্ধযুগে স্ত্রীশিক্ষা

সে আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। সদয়-হৃদয় বুদ্ধদেব তখন সংসার-তাপ-পীড়িত নর-নারীকে মুক্তির নব বারতা দান করিতেছিলেন। চারিদিকে অপূর্ব্ব ভক্তি-ব্যাকুলতার, বিপুল চেতনার ও একটা মহিমময় নব জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সুগতের মঙ্গল মন্ত্রোচ্চারণে যাহা কিছু অশিব, যাহা কিছু অসত্য মুছিয়া গিয়াছে। জীবলোকের সমস্ত দৈন্ত ও খেদের, সমস্ত নিরাশা ও অতৃপ্তির অবসান হইয়াছে। নিত্য নব আনন্দের উচ্ছ্বাস,—শুধু মহা আশার কথা। আকাশ, বাতাস মুখরিত করিয়া চারিদিকে শুধু সেই একই উদাত্ত আশ্বাস বাণী ধ্বনিয়া উঠিতেছে—

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি ॥

নগর ও জনপদকে আচ্ছন্ন করিয়া ক্রমে এই ব্যাকুল আহ্বান বাণী শাক্যরাজ্যের সীমা ছাইয়া ফেলিল। অমৃতের উদ্বেলিত মধুময় ধারা লাভ করিবার জন্ত সমস্ত বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শাক্যগণ উন্মুখ পিপাসাভরে, অনন্তচিত্তে তথাগতের রাতুল চরণে ছুটিয়া চলিলেন। সুবিশাল কপিলাবস্তু নগরী অনাথা-আলয়ে রূপান্তরিত হইল।

স্বামী-বিচ্ছেদ-ব্যথিতা বহু রমণীর একান্ত অনুরোধে গৌতমের মাতৃসমা পুণ্যবতী মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ভগবান্ বুদ্ধের নিকট নারীসঙ্ঘ স্থাপনের কথা বলিতে স্বীকৃত হইলেন। এ সময়ে বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুর নিকটবর্ত্তী নিগ্রোধারাম বিহারে স্বর্গগত পিতা শুদ্ধোদনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধানের নিমিত্ত অবস্থান করিতেছিলেন। পঞ্চশত মহিলা সঙ্গে লইয়া প্রজাপতি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাহুল ও নন্দ ভিক্ষুকত্ব গ্রহণ করিয়াছে, মহারাজ শুদ্ধোদন মৃত; বিশাল কপিলাবস্তুর রাজপুরী জনহীন। অতএব তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিনীগণকে সঙ্ঘ-সেবিকা করিয়া লওয়া হউক।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ নারীজাতিকে সঙ্ঘমধ্যে

গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও পূর্ব্ব বুদ্ধগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে যে নারীজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা বুঝিয়াও, লোকমত আশঙ্কায় এবং সঙ্ঘের শুভ কামনায় বুদ্ধদেব অনুমতি দিতে অসম্মত হইয়া দৃঢ়-স্বরে বলিলেন, "নারি, অপাপবিদ্ধ সঙ্ঘমধ্যে প্রবেশের প্রয়াস পাইও না।"

ব্যর্থ মনোরথ রমণীগণ ক্রমে তিনবার অনুনয় করিয়াও যখন বুদ্ধদেবকে সম্মত করাইতে পারিলেন না; তখন তাঁহার বিরাগভাগিনী হইবার ভয়ে ভগ্নমনে প্রস্থান করিলেন।

বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু হইতে বৈশালীতে প্রস্থান করিবার পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী উপস্থিত রমণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগবান্ বুদ্ধ আমাদিগকে ভিক্ষুণী হইবার অধিকার দানে বিরত হইয়াছেন সত্য, এস আমরা নিজেরাই ভিক্ষুণীর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হই; তিনি কখনও আমাদিগকে বিমুখ করিতে পারিবেন না।" গৌতমীর কথায় রমণীগণ সকলেই আনন্দিত মনে নিজ নিজ কেশরাশি মুণ্ডন ও চীরধারণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে গৃহ হইতে চিরবিদায় লইলেন।

সর্ব্বসুখ ত্যাগী সঙ্ঘ সেবকগণের কোন প্রকার যানারোহণ নিষিদ্ধ জানিয়া তাঁহারাও পদব্রজে বৈশালীর দিকে যাত্রা করিলেন। যে সকল অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুল-ললনা কিছুমাত্র শ্রমসাধ্য কার্য্যে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিতেন, অন্তঃপুরবাসে অতি মসৃণ গৃহতলে মৃদু মন্দ ভ্রমণে যাহাদের সুকুমার ললাট ঘর্ম্মজলসিক্ত হইত, শত সুখ ও অধীর বিলাসের মধ্য দিয়া যাঁহাদের সহজ সরল নিঃশঙ্ক দিনগুলি অতীত হইত, আজ বৈরাগ্য-ব্যাকুলচিত্তে তাঁহারা অমৃতপদ লাভের আশায় অশোক মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। কোমল রাতুল চরণতল তাঁহাদের কঙ্করময় পথে শতছিন্ন হইয়া গেল। ক্ষুৎপিপাসা তাঁহাদিগকে নিদারুণ পীড়া দিতে লাগিল—শত বাধা অভীষ্টলাভের পথে ব্যবধান সৃজন করিতে লাগিল, তবুও গমনের বিরাম নাই। সর্ব্ব দুঃখ, শোক, বিরহ, দহন চিন্তা দূরে পরিহার করিয়া ভক্তি-আনত চিত্তে বুদ্ধ-মহিমা স্মরণ করিয়া দৃঢ়পদে তাঁহারা মুক্ত, দীপ্ত, মহাজীবনের আশায় নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিলেন।

বহুমাননীয়া শাক্য রমণীগণ গৃহ ছাড়িয়া বুদ্ধের চরণে শরণলাভের জন্য চলিয়াছেন, এ সংবাদে শত শত লোক আহার্য্য, পানীয়, যান বাহনাদি লইয়া পথিমধ্যে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই বিষয়-বিতৃষ্ণ রমণীগণ দৃঢ়চিত্তে কোনও প্রকার সাহায্য লইতে অস্বীকার করিলেন।

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, কোন এক ম্লান সন্ধ্যায় রক্তাক্ত ধূলি-ধূসরিত চরণে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বৈশালীর বিহার দ্বারে উপনীত হইলেন। পরদুঃখ-কাতর আনন্দ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সহিত তাঁহাদিগকে সে অবস্থায় দেখিয়া মধুর সম্বোধনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীগণের ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া বিগলিত হৃদয়ে আনন্দ স্বয়ং বুদ্ধদেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। আনন্দের নিকট আমূল বিবরণ শুনিয়া বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "আনন্দ, নারীকে সঙ্ঘ-সেবিকা করিবার প্রার্থনা করিও না।" কিন্তু চিরভক্ত আনন্দ এ উত্তরে নিরাশ হইলেন না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "রমণীগণ যদি সঙ্ঘসেবিকা পদে বৃতা হন তাহা হইলে সোতাপত্তি মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবেন কি না?" [নির্ব্বাণের প্রথম সোপান আশ্রয় করিয়া চিরমুক্তি লাভে সফলকাম হইতে পারিবেন কি না]

বুদ্ধদেব বলিলেন, "নির্ব্বাণলাভের অধিকার স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েরই সমান।" তখন আনন্দ বলিলেন, "আপনি উপদেশ দানকালে বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী চব্বিশজন বুদ্ধ স্ত্রীজাতিকে সঙ্ঘমধ্যে প্রবেশাধিকার দান করিয়াছিলেন, অতএব পুরুষেরই ন্যায় স্ত্রীজাতির সঙ্ঘ সেবিকা হইবার অধিকার আছে।" এই বলিয়া আনন্দ, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বুদ্ধের প্রতি শৈশব অবস্থায় মমতা ও যত্নের কথা বর্ণনা করিয়া, পুনরায়

তাহাদিগকে সঙ্ঘসেবিকা করিবার জন্ত সানুনয়ে প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধদেব আনন্দের কথায় সম্মতিদান করিয়া বলিলেন, "আনন্দ, স্ত্রীজাতি এই অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইলে সঙ্ঘের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত এবং এই সত্য ধর্ম্মের মহিমা সহস্র বৎসর কাল অম্লান রহিত। কিন্তু অধিকার দান হেতু ইহা পাঁচশত বৎসরের অধিক স্থায়ী হইবে না।"

নারীসঙ্ঘ স্থাপন করিয়া বুদ্ধদেব মহীয়সী তাপসিনী গৌতমীকেই সঙ্ঘ-নেত্রীপদে অভিষিক্তা করিলেন। পবিত্র চরিত্রা নিষ্ঠাবতী গৌতমীও নারীজাতির অখণ্ড কল্যাণ কামনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিতা করিয়া শিক্ষা ও দীক্ষা গুণে অর্হৎ পদ লাভ করিয়াছিলেন।

সেই অতীতযুগে ভারত মহিলাগণ জ্ঞানের বিমল আলোকে যেরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন, জগতের ইতিহাস পাঠে সেরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

যে সকল মহিলা গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তথাগতের চরণে আশ্রয়লাভ করেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। ইঁহাদের রচিত গাথাগুলি পাঠ করিলে আমরা সে সময়কার স্ত্রীশিক্ষার পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হই এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত সামাজিক প্রথারও একটি সুস্পষ্ট মনোরম চিত্র আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

বিলাস তরঙ্গে প্রবহমান রাজ প্রাসাদেই হউক, অথবা অনশন-কাতর দরিদ্রের পর্ণ কুটীরেই হউক, এই বিদ্যা ও ধর্ম্ম লাভ করিবার একটা বলবতী বাসনা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইত।

মন্তাবতীরাজ কৌঞ্চের প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত দুহিতা সুমেধা প্রথম যৌবনেই চরিত্র মাধুর্য্যে ও শাস্ত্রজ্ঞানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বহু ধনসম্পত্তিশালী বারণবতী-রাজ অনিকরত্তা ইঁহার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সুন্দরী সুমেধা বুদ্ধের প্রতি বিশেষ অনুরক্তির জন্য জনক জননীকে সংসারের অনিত্যতা এবং তজ্জন্ত সঙ্ঘসেবিকা হইবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। মর্ম্মাহতা জননী সন্ন্যাস ধর্ম্মের কঠোরতা বিশেষ করিয়া তনয়াকে বুঝাইতে চাহিলেন; সংসারের সুখ-কথায় তাহার তরুণ চিত্তকে বিমুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। বিদ্যাবতী সুমেধা অসার ভোগ বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সন্তান-বৎসলা জননীর আঁখিজল, মমতাময় জনকের করুণ দৃষ্টি ও বারণবতী রাজের সানুনয় কৃতাঞ্জলি উপেক্ষা করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে চিরবিদায় লইলেন এবং সুগতের চরণ আশ্রয় করিয়া অবশেষে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

বিদ্যালাভ যে শুধু ভদ্র মহিলা-মণ্ডলীতে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে; নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও ইহা প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। এই সকল স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা হইয়া অমিতাভের চরণোপান্তে নিঃশেষে শরণ গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

সদ্ধর্ম্মের অন্যতম সাধিকা কর্ম্মকার কন্যা সুভা প্রথম জীবনে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। যৌবনে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া সংসার ভোগে অনাসক্তি বশে সঙ্ঘনেত্রী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কঠোর ধর্ম্মসাধনে রত হন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিয়া, সংসার-সুখের মধুর বিচিত্র বারতা দানে তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার প্রয়াস পাইতেন। একদা সুভা তাঁহাদিগকে চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে ধর্ম্ম কথা ব্যাখ্যা করিয়া এই ব্যর্থ প্রয়াস হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এই একান্ত ভক্তিপরায়ণা ধ্যান নিরতা রমণী পরম শান্তি লাভ করেন। ইঁহার শিক্ষা, কঠোর সাধনা, সংযম ও নিষ্ঠা জনমণ্ডলীকে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণের বিদ্যার অত্যুজ্জ্বল আভাস আমরা আজিও পালি সাহিত্যে প্রাপ্ত হই। ইঁহারা এক নিপাত— এক শ্লোকের রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিপাত অর্থাৎ বহুশ্লোক যুক্ত রচনা দ্বারা আপনাদের জীবন-কাহিনী এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান বিকাশের কথা ভাবময়ী ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

বৈশালীর অপূর্ব্ব যৌবনলাবণ্য মণ্ডিতা, ধনরত্ন শালিনী পতিতা রমণী অম্বপালী সশিষ্য বুদ্ধদেবের কোটি

গ্রামে আগমন বার্ত্তা শ্রবণে, বিচিত্র যানারোহণে তাঁহার দর্শনপ্রার্থিনী হইয়া আগমন করিলেন। ভগবান তথাগতের স্নিগ্ধ মধুর ধর্ম্মোপদেশ তাঁহার নিভৃত হৃদয়ের সমস্ত দৈন্ত ও মলিনতা ধৌত করিয়া জীবনে যেন বিলসিত নবরাগময় প্রভাত আনিয়া দিল। তাঁহার শুষ্ক ঊষর হৃদয় কাহার অমৃত-সরস স্পর্শে যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অশিক্ষিতা চিরবিলাস-বর্দ্ধিতা নারীর স্বপ্নময় মোহময় অঞ্জন যেন নিমিষে নয়ন কোণে লুপ্ত হইয়া গেল। ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে বারনারী সশিষ্য বুদ্ধদেবকে পরদিন মধ্যাহ্নে স্বীয় গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্ত আমন্ত্রণ করিলেন। মহামনা গৌতম তাঁহার আহ্বানে মৌন সম্মতি দান করিলেন।

বৈশালীর লিচ্ছবিগণও বুদ্ধের আগমন সংবাদ শ্রবণে বহু কারুকার্য্যখচিত যান সমূহে আরোহণ করিয়া বুদ্ধদেবকে আমন্ত্রণ অভিপ্রায়ে কোটি গ্রামে আসিতেছিলেন। অম্বপালী পরদিবস বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন জানিয়া তাঁহারা লক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে, এমন কি স-জনপদ বৈশালীর বিনিময়ে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বুদ্ধের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশালিনী অম্বপালী লিচ্ছবিগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃতা হইলেন না।

তৎপর দিবস শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত বুদ্ধদেব পতিতা কামিনীর গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। আহার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে যুক্তপাণি অম্বপালী নিবেদন করিলেন, "দেব, অন্ত হইতে এই অম্বপালি বন আমি বুদ্ধ ও ভিক্ষুবর্গের সেবায় উৎসর্গ করিলাম।" কুসুমিত-যৌবনা, অতুল বিত্তবতী, বিলাসিনী নারী জগতের সমস্ত আকর্ষণ ও প্রলোভন দূরে পরিহার করিয়া পবিত্র নির্ব্বাণ ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর অম্বপালী তাঁহার আবাসবাটিকাও সঙ্ঘের সেবা-কামনায় দান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের পর বহুকাল পর্য্যন্ত অম্বপালী সঙ্ঘ-সেবিকা ছিলেন। জীবন সন্ধ্যায় জরা আসিয়া যখন তাঁহার ললিত তনুকে বিশীর্ণ ও মথিত করিল, তখন অম্বপালী সুমধুর গাথায় হাস্তময় যৌবনের চঞ্চল রূপ-গরিমাকে অসার প্রতিপাদন করিয়া বিংশতি শ্লোক রচনা দ্বারা বুদ্ধ-মহিমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিলেন।

এমন ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ জাল, তুলিকা-অঙ্কিত ভ্রূ-যুগল, সুনীল আনত আঁখি, দেহগৌরব বর্ত্তুল বাহু দুটি—এ সমস্তই জরায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার, কোকিলের ন্তায় সুস্বরে নিত্য উপবন ঝঙ্কৃত হইত—আজ সে সুস্বর বিলীন। তবুও এই জর ম্লান, দুখ-গেহ দেহের প্রতি এত মায়া কেন? প্রাচীর-স্খলিত জীর্ণ প্রলেপের ন্তায় এই রূপদীপ্তি ঝরিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ভগবান্ অমিতাভের স্নিগ্ধ সত্যবাণী শাশ্বত ও অনাহত। কত যুগ পূর্ব্বে এক পতিতা পল্লী-নারী সুশিক্ষিতা হইয়া এমন মধুময়ী শ্লোকাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে সত্যই বিস্ময় বিমুগ্ধ হইতে হয়।

যে সকল মহিলা সংসারে বিগতস্পৃহ হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শান্ত, সুশীতল আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র একুশটি থেরীর জীবন কাহিনী এবং তাঁহাদের রচিত গাথা প্রচলিত আছে। কাল মাহাত্ম্যে যদিও শত শত থেরী-কাহিনী ও তাঁহাদিগের অমৃত নিঃস্যন্দিনী শ্লোকাবলী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা অতীত যুগে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার সুস্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হই। এই সকল প্রতিষ্ঠাবতী, পুণ্যময়ী ললনা ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, তথা সাহিত্য গঠনে যে অশেষ আন্তরিকতার ও দূর দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, প্রকৃতই তাহা প্রাচীন ভারতের গৌরবের বিষয়।

শ্রাবস্তী পুরীর শ্রেষ্ঠিকন্তা পটাচারা কোন ধনী বণিক পুত্রের সহিত পরিণয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া এক দরিদ্র যুবকের প্রেম-প্রার্থিনী হইয়া গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন। দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া সাধ্বী পটাচারা স্বামীর সহিত দূরদেশে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ কাল প্রবাস যাপনের পর স্বজন-বিধুরা রমণী শ্রাবস্তী নগরীতে পুনরাগমনের জন্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা হেতু এ অনুরোধ

উপেক্ষিত হইল। গৃহ নির্ম্মাণ উপলক্ষ্যে কাষ্ঠ আহরণে জঙ্গলে গমন করিয়া যুবকের সর্প দংশনে মৃত্যু হইল। স্বামীর সন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন সময়ে পতিহারা অসহায়া রমণী নিষ্ঠুর নিয়তি বিধানে নয়নের মণি-স্বরূপ পুত্র দুটিকে এক এক করিয়া চিরতরে বিসর্জ্জন দিলেন।

উন্মাদিনী, বিবশা রমণী শ্রাবস্তী নগরে আসিয়া জানিতে পারিলেন, প্রবল ঝঞ্ঝা তাঁহাদের গৃহকে ভূমিসাৎ করিয়া স্নেহময় ভ্রাতা ও জনক-জননীকে চিরদিনের জন্য প্রোথিত করিয়াছে।

প্রলাপবাদিনী, আত্মহারা নারী আপনার বিরাট হাহাকারে পথিক-জন-চিত্ত ভারাক্রান্ত করিয়া গগন-লগ্ন প্রাসাদময়ী শ্রাবস্তী পুরীর রাজবর্ত্ম মাঝে বিচ্ছিন্ন মনে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পটাচারার সুকৃতিবলে ভগবান্ সিদ্ধার্থের আগমনে সে সময়ে শ্রাবস্তী নগরী পবিত্র হইয়াছিল। প্রতিনিয়ত নির্ব্বাণকামী শ্রাবস্তী-বাসিগণ আকুল অন্তরে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে ধর্ম্ম-সুধা পানের নিমিত্ত সর্ব্বদুঃখ নিবারণ বুদ্ধের চরণতলে সমবেত হইতেছিলেন। সংসার-সংগ্রাম দলিতা, সর্ব্বস্বহারা রমণী নরদেবতার পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। করুণাপারাবার গৌতম স্নিগ্ধ-মধুর উপদেশে তাঁহার শোক-তাপ দূরীভূত করিয়া তাঁহাকে নব-ধর্ম্মে দীক্ষা দান করিলেন।

এই পটাচারা শিক্ষা ও জ্ঞানে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, কোন সময়ে এককালে পঞ্চশত রমণীকে ধর্ম্ম-মহিমা গানে মুগ্ধা করিয়া দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। জগতের-ইতিহাসে ইহা অতুলনীয় নহে কি?

গৃহধর্ম্মনিরতা বিদ্যাবতী মহিলাগণের বিবরণ পালি সাহিত্যে থেরীগণের শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবন-কাহিনীর ন্যায় সুলভ নহে। যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা সঙ্ঘজীবন লাভ করিয়া সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন, বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে বিশেষ করিয়া শুধু তাঁহাদেরই জীবন-কথা আখ্যাত হইয়াছে।

পুণ্যভূমি বিহারের মধ্যে শত স্মৃতি-বিজড়িত নালন্দা গ্রামে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত মঠর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও শারিকা নামে এক কন্যা ছিল। পুত্র ও কন্যা উভয়েই বেদাদ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। শারিকা এক সময়ে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভ্রাতাকে পরাস্ত করেন। শারিকার সহিত লোক-প্রসিদ্ধ তিষ্যের পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিদুষী শারিকা স্বামীর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে পরাভূত হন কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন।

অতীত ভারতে অবরোধ প্রথার কঠোরতা নারীকে সামাজিক আন্দোলন হইতে বঞ্চিতা করে নাই। সমাজের প্রতি স্পন্দনে নারীর সজীবতা অনুভূত হইত এবং তাঁহাদের অসংখ্য মঙ্গলময় অনুষ্ঠান তাঁহাদিগকে চির-বরণীয়া ও স্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে।

সৌভাগ্যবতী সাধ্বী বিশাখা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও মাঙ্গলিক কর্ম্মানুষ্ঠানে সতত যত্নবতী ছিলেন। মঙ্গলময় বুদ্ধ যে সময় শ্রাবস্তী নগরে, অনাথপিণ্ডিকের জেতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন পুতশীলা বিশাখা ভিক্ষুগণের সহিত তাঁহাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনে আমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধদেবের আহার সমাপন হইলে ভক্তি-বিনত চিত্তে বিশাখা একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সঙ্ঘের কল্যাণ কামনায় পাত্র চীবর-ধারী ভিক্ষুগণকে বর্ষাবাস যাপনের নিমিত্ত বস্ত্রদান, আগত ও প্রস্থানোদ্যত পরিব্রাজকগণকে অন্নদান, পীড়িত ও শুশ্রূষা নিরত সঙ্ঘসেবকগণকে ঔষধ ও পথ্য দান করিবার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধদেব, বিশাখার এই নিঃস্বার্থ দান কামনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে পূর্ণ সম্মতিদান করিলেন।

বিশাখার অন্নসত্রে প্রতিদিন অসংখ্য সদ্ধর্ম্ম সেবক স্বেচ্ছাহার ও বিশ্রামে পরিতৃপ্ত হইয়া সানন্দচিত্তে স্বীয় গন্তব্য পথে প্রস্থান করিত। এতদ্ভিন্ন বিশাখা ভিক্ষুণীগণের বসন-দৈন্য দূর করিবার প্রার্থনাও বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার আদেশানুসারে আমরণ তাঁহাদিগকে স্নান বস্ত্র দান করিয়া চির-যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন।

সত্য-পুণ্য-বিজড়িত বৌদ্ধ-সঙ্ঘের সহিত বিশাখার নাম

বিশেষরূপে সংসৃষ্ট। তিনি নিরন্তর পুণ্য কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়া বৌদ্ধ নারীসঙ্ঘের প্রভূত উপকার সাধন করেন। শ্রাবস্তীর রমণীর পূর্ব্বারাম বিহার এই মহিমা-মণ্ডিতা প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার দানের অন্যতম নিদর্শন।

সিপ্রাতটবর্ত্তিনী বৈভবশালিনী উজ্জয়িনী পুরীর শ্রেষ্ঠিকন্যা ইসি দাসীর জীবনে ক্রমে তিনবার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অভাগিনী তৃতীয়বার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া পিতা মাতার নিকট দলিত জীবন পরিত্যাগ অথবা প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রার্থন করিলেন। এমন সময় সহসা একদিন ভিক্ষুণী তাপসিনী জিনদত্তা শ্রেষ্ঠীর গৃহে পদার্পণ করিলেন। অতিথি সৎকার শেষে ইসিদাসী জনক-জননীর পদ-বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন। অপূর্ব্ব সাধনবলে পূর্ব্ব কর্ম্মডোর তাঁহার মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিল। পূর্ণব্রত হইয়া পরিতপ্তা রমণী সর্ব্ব দুঃখ অন্তে নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। ইসিদাসী তাঁহার সমগ্র কাহিনী চৌত্রিশটি গাথায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত নারীশিক্ষারও বিস্তৃতি হয়। ব্রহ্ম ও সিংহল প্রভৃতি দেশেও রমণীগণ শিক্ষা বিষয়ে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ক্যোখ নামক নরপতির রাজত্ব কালে ব্রহ্মদেশে সাহিত্য চর্চ্চা সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। বহু ক্লেশ ও যত্নপূর্ব্বক মহিলাগণ ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদি আলোচনা করিতেন এবং বিশিষ্টরূপে পারদর্শিনী হইয়া জটিল সমস্যার সমাধান করিতেন। ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে ইঁহারাও ভারতরমণীগণের সমকক্ষ ছিলেন।

বিদ্যা-বিনয় নম্রা সিংহল রাজকুমারী আনুলা সঙ্ঘ-সেবিকা হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমণীর শিক্ষা দীক্ষা পুরুষের নিকট হইবে না, ইহাই ছিল বুদ্ধদেবের আদেশ। সিংহলে তখনও নারীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সিংহলরাজের একান্ত অনুরোধে সদ্ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক মহারাজ অশোক সঙ্ঘমিত্রাকে বোধিদ্রুম শাখা লইয়া সিংহলে যাইবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। সঙ্ঘমিত্রাও বোধিদ্রুম শাখা লইয়া সিংহলে উপস্থিত হইলে সুবিখ্যাত আচার্য্য তিষ্য তাঁহাকে সম্মান ও আদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন এবং সিংহলে নারীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য রমণীগণকে সুকঠোর নিয়মের অধীনে থাকিতে হইত। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের বাসাধিকার একই বিহারে ছিল না। কামনা-পরিহীনা হইয়া নির্জ্জনধ্যান ধারণায় নিযুক্ত রহিয়া বিনয় ও নম্রতার সহিত সরলভাবে তাহাদিগকে জীবন-যাপন করিতে হইত। পরিধেয় বসন, আসন, যান, ভেষজ এমন কি উৎসব ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে বুদ্ধদেব কঠোর নিয়ম বিধি-বদ্ধ করেন।

থেরিগণ ভিক্ষুদিগকে সর্ব্বদা অভিবাদন করিতেন। সঙ্ঘের নিয়মাবলীর কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে অপরাধী গুরু দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন আকাঙ্ক্ষায় অথবা জীবন যাত্রা পথে সুতীব্র নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতা হেতু যে সকল রমণী সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা যে এক চির আনন্দময় মঙ্গললোকের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় গাথাগুলি পাঠে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সকল শ্লোকের মধ্য দিয়া সদ্ধর্ম্ম পরায়ণ নর- নারীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভাবরাজি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত।

সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া ভিক্ষুণীগণকে কোন থেরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইত। প্রত্যহ কার্য্য ও বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে তাহার সিদ্ধি নিহিত ছিল। সাধন-মার্গে অগ্রসর হইয়া জাতিস্মর হইবার দৃষ্টান্ত থেরীগণ মধ্যে বিরল নহে।

জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে হয়ত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভীষণ পাপের দৃশ্য এবং সঙ্ঘে তাহার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। অধ্যয়ন, গ্রীষ্মাবাস প্রভৃতির নিয়ম অত্যন্ত কঠোরতার সহিত প্রতিপালন করিতে হইত।

যতদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ এই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিলেন, ততদিন বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা অটুট ছিল এবং সঙ্ঘ সেবক ও সেবিকাগণ গৃহপতিগণের নিকট

পূজা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সাধারণতঃ একই নিয়মের বশবর্ত্তী থাকিতেন।

এই সকল বিদুষী মহিলাগণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে স্বতঃই মনে হয়, প্রাচীন ভারতের ললনাগণ আমাদের নয়ন সমক্ষে কি মহিমময় আদর্শই না স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সমাজের প্রতি স্তর জ্ঞান ও শিক্ষার সম্যক্ বিকাশে কি গরিমোজ্জ্বল সফলতাই না লাভ করিয়াছিল! নারী—মাতা, কন্যা, ধর্ম্মোপদেশিকা; নারী—বিদ্যাবুদ্ধিশালিনী ও সমাজে প্রতিষ্ঠাবতী; নারী—বিচার শক্তিতে পুরুষ-যশঃপ্রার্থিনী, স্বার্থ-কলুষবিহীনা, ভক্তি অবদান ভরে নমিতা ও নিখিলের কল্যাণকামনায় নিয়ত নিযুক্তা।

আজি বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে নারী সেবিকাসঙ্ঘ বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি অতীত যুগের গৌরব রমণীগণের স্মৃতি, ছন্দঝঙ্কৃত শ্লোকরাশিতে অটুট রহিয়াছে।

শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী।

বিদ্যাপতির কাব্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বহুদিনের একান্ত সাধনার পর, বহু নয়ননীরে দেহ মন ধৌত হইলে পর বাঞ্ছিতের সহিত বাঞ্ছিতের মিলন হইল। সেই মিলন-ক্ষণে বুঝি কুঞ্জের পাখী নীরব হইল, আকাশের চন্দ্র আকাশে লুকাইল—অনন্ত অখণ্ড নীরবতা সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া রহিল। জাগিয়া রহিল শুধু চারিটী অতৃপ্ত আঁখি। ভাব বিভোর স্পন্দহীন দেহে, বাক্যহীন মৌনবদনে সে দিন শুধু তৃষিত নয়নের সহিত তৃষিত নয়নের মিলন ঘটিল। দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়াও ত সাধ মিটে না—চক্ষের পলক ত পড়েনা—সমস্ত বিশ্বের সকল ভাষা তখন নয়নের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া প্রেমানুরাগ ব্যক্ত করিতে লাগিল। হৃদয় যখন ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া কূলপ্রবাহিনী গঙ্গা হয় তখন কি আর মুখে বাক্য সরে? তখন—

দুহু দুহু বদন হেরি দুহু আকুল
বিদ্যাপতি কবি গাই।

সে নয়ন যে তখন "বহুল দিবস ভুখল ভ্রমর"—সে তখন চাহে "পিউব চাঁদ চকোর।" সে নয়নে তখন এত আকুলতা—এত আবেগ—এত তৃষা যে বাঞ্ছিতের চক্ষু দেখিতে অধর দেখা হয় না, অধর দেখিতে নয়ন দেখা ঘটে না। যাহার চক্ষু অঙ্গের যেখানে পতিত হইল সেইখানেই শিথিল হইয়া লাগিয়া রহিল—সম্পূর্ণ রূপ আর একসঙ্গে দেখা ঘটিল না।

জকর নয়ন জতহি লাগল
তর্তহি সিথিল গেলা।
তকর রূপ সরূপ নিরূপএ
কাহুঁ দেখি নহি ভেলা॥

তুলিকার এই একটি স্পর্শে গূঢ় প্রেমের এইরূপ নানা তত্ত্ব প্রেমের কবি যেরূপ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, উহাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠে—উহাই বিদ্যাপতির বিশিষ্টতা। এই সকল খণ্ডচিত্রই দেখাইয়া দেয় যে বিদ্যাপতি কিরূপ নিপুণতার সহিত মনুষ্যহৃদয় পাঠ করিয়াছিলেন।

জয়দেবের শ্রীরাধিকার সহিত যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তিনি "মদন মনোরম ভাবিতা" "কোকিল কলরব কূজিতা" কন্দর্পজ্বর জনিত চিন্তাকুলা, তখন তিনি হরিবিরহে আবাসকে বিপিন বলিয়া ভ্রম করিতে-

ছেন; যেন সে বিপিন দাবদহনজ্বালায় পরিপূর্ণ—তাঁহার নিজের নিশ্বাস বায়ু যেন দাবানলশিখা—তখন—

সরস মসৃণপি মলয়জপঙ্কং
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥

পল্লবশয্যা তখন তাঁহার অগ্নিশয়ন হইয়াছে, কপোল আর পাণিতল পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছে না—তিনি ভাবিতেছেন—

"বিফলমিদমমলমপি রূপ যৌবনম্"

কিন্তু বিদ্যাপতির রাধিকা বারংবার সখীজন কর্ত্তৃক অভিসারে যাইবার জন্য অনুরুদ্ধা হইয়াও কহিতেছেন—সখি দোহাই তোর, আমাকে ছাড়্। আমি সে পিয়ার কাছে যাইব না—আমি অবলা সরলা—না জানি বচন-চাতুরী, না জানি কিছু—আমি না বুঝি ইঙ্গিত, না জানি মান। আমি যাবনা সখি, যাবনা।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হম নহি যাএব সে পিয়া ঠাম্ ॥
বচন চাতুরি হম কিছু নহি জান।
ইঙ্গিত ন বুঝিয় ন জানিয় মান ॥

শ্রীরাধিকার আর একটা শঙ্কা ছিল—"অপযশ ভীতি।" তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"তোহেঁ পর নাগর হমে পর নারি।" আরও বলিতেছেন—

ভল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম।
জস্ অপজস দুই রহ গএ ঠাম ॥

—শুধু যশ এবং অপযশই এ সংসারে থাকে আর কিছু থাকে না। এ বিচার সেই কালের যখন—চতুরে চতুরে গুপ্ত প্রেম, পরের কাছে তাহা কহা যায় না।

চেতন চেতন গুপুতি পিরিতি
পর কহহ ন জাই।

কবি কহিলেন—হে যুবতি! আমার কথা শুন। এ কথা অতি সত্য। তুমি আপনার মনের মধ্যে মনকে স্থির কর—পরের বিবেচনায় তোমার কি আসে যায়? পরের যে কোন বিবেচনাই নাই।

ভন বিদ্যাপতি সুনহ জউবতি
সরূপ মোর বচনা।
অপন মনা থির পএ চাহিঅ
পরে বিবেচনে কোনা ॥

মুক্ত প্রেম ত কোন বাধাই মানে না—প্রিয়তমের আশায় হৃদয় যে নবঘনের ন্যায় রোদন করে—

নয়নক নীর থির নহি বান্ধই
পঙ্ক কএল মহি রোই ॥

দুই নয়নের গঙ্গা যমুনা ধারা যে শুষ্ক কঠিন নীরস পৃথ্বীতলকে দিবানিশা পঙ্কে পরিণত করে। সকল ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিতের জন্য আত্মদানই ত শ্রেষ্ঠ প্রেম। সেই প্রেমের প্রতিমা বিদ্যাপতির রাধা। তিনি শেষে অভিসারে যাওয়াই স্থির করিলেন। তাঁহার অন্তর কহিতে লাগিল—ভয় কি অগ্রসর হও - জান না কি

"যে কর সাহস তা হো সীধি"

—সাহস না করিলে কি সিদ্ধিলাভ হয়? দূতী ডাকিয়া কহিল—

চল চল সুন্দরি সুভ কর আজ।
ততমত করইত নহি হো কাজ ॥
গুরুজন পরিজন ডর কর দূর।
বিনু সাহস সিধি আস ন পূর ॥
বিনু জপলে সিধি কেও নহি পাব।
বিনু গেলে ঘর নিধি নহি আব ॥

শ্রীরাধিকা অভিসারে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। কিন্তু সকল বন্ধন কি মুহূর্ত্তে টুটে? তাই "খনে অনুমতি খনে মানয় ভীতি।"

সুন্দরি চললিহু পহু ঘর না।
চহু দিশ সখি সব কর ধর না ॥
জাইতহুঁ লাগু পরেম ভর না।
জইসে সসি কাঁপ রাহু ডর না ॥
জইতেহি হার টুটিএ গেল না।
ভূষণ বসন মলিন ভেল না ॥
রোএ রোএ কজলি বহায় দেল না।
অদকহি সিন্দুর মেটায় গেল না ॥

পথে যাইতে যাইতে প্রথম মিলনের পূর্ব্বাতঙ্কে শ্রীমতীর দেহলতা কাঁপিতে লাগিল—জইসে সসি কাঁপ রাহু ডর না। তিনি কাতর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—সখি সখি, দোহাই তোমাদের—আমাকে সেখানে লইয়া যাইও না। আমি যে বালিকা। মিলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় নাথ যে আকুল হইয়াছেন। তাঁহার সেই তৃষিত হৃদয়ের ব্যাকুল আলিঙ্গন ত আমি সহিতে পারিব না। এ মালতী মালাটী সখি, করীর করে অর্পণ করিস্ না। সে যে প্রেমের কাঙ্গাল; আমার এ ক্ষুদ্র প্রেমে তাঁহার তৃষা মিটিবে না—"ন পূরে অলপ ধনে দারিদ পিয়াস।"

সখীরা কোন কথা শুনিল না, কোন রাধা মানিল না। শ্রীরাধিকাকে লইয়া পরম যত্নে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাখিয়া গেল। লজ্জা এবং ত্রাস উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত আকুল করিল। অন্তর, তখন মিলন চাহে, বিলম্ব সহে না—কিন্তু দেহ অগ্রসর হয় না—"অন্তর দাহিন, বাহরে বামা।" অন্তর বাহিরকে জয় করিতে পারিল না, স্বভাব-সুলভ লজ্জা ও প্রথম মিলনের পূর্ব্বাতঙ্কই জয়ী হইয়া রহিল। যাহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় আকুল, চরণ বিক্ষেপ মাত্রেই তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, তবুও চরণ চলিল না—"ঠাঢ়ি ভেলি হি ধনি"—শ্রীমতী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। "আঙ্গো ন ডোলে।" "হেম মুরত জনি মুখহুঁ ন বোলে।" সে যেন নিশ্চল হেম প্রতিমা—মুখে বাক্য নাই, দেহে গতি নাই, নয়নে পলক নাই। "পহিল হি রাধা মাধব ভেট। চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট॥" নয়নের অঞ্জন তখন নিরঞ্জন হইয়া গেল,

"মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল।"

তখন—"অথির মাধব ধরু রাহিক হাথ"—সে কোমল মধুর সরস স্পর্শে মুহূর্ত্তে বিশ্ব মধুর হইয়া গেল। পুলকে শরীরে স্বেদ ঝরিল, দেহে রোমাঞ্চ হইল—মনে হইল যেন,

জনম পঙ্গু জনি ভেটল সুমেরু।

সেই অপূর্ব্ব মিলনের কীর্ত্তন বাঙ্গলার বহু বৎসরের সাহিত্য—সেই অপূর্ব্ব প্রেমের গান বাঙ্গলার সকল কবির কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া আসিতেছে। সে প্রেমের রীতি—

"ভাল বাসিবে বলে' ভাল বাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥"

সেই মিলনের ক্ষণে শ্রীরাধার প্রাণ আকুল হইয়া চণ্ডীদাসের ভাষায় বলিয়াছিল—

শ্যাম, ছাড়িয়া না দিব তোরে।
পরাণ যেখানে　　রাখিব সেখানে
এমন মন মোর করে॥
লোক হাসি হউ　　কুল জাতি যাউ
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তোমা হেন নিধি　　ঘটাইছে বিধি
আর তোমা কোথা পাব॥

তখন উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হৃদয় গলিয়া গিয়া নয়নের পথে প্রবাহিত হইল। মুখের কথা অর্দ্ধস্ফুট হইয়া রহিল—কহিতে কহিতে কথার শৃঙ্খলা ভুলিতে লাগিলেন—

দুহু দোহা হেরি মুখ হৃদয় বাঢ়য় সুখ
বোলত ভুলত পাতি॥

পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রকে কালো করিয়া মধ্যে মধ্যে যেমন মেঘ আসিয়া বিশ্বকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে—পরিপূর্ণ মিলনের সেই সুখকে শল্যবিদ্ধ করিয়া তখন কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যে এখনই ত বিরহ আসিবে, বিচ্ছেদ ঘটিবে—

বিরহ বিষানলে দুহু তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্ধ।

তখন নিমেষ যে যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল—হৃদয়ে ধরিয়াও মনে হইতে লাগিল দূরে, বহুদূরে কোথায় আছে সে। যদি আরও নিকটে পাইতাম, যদি অন্তরের অন্তরে তাহাকে রাখিতে পারিতাম! এক নয়নে কত হেরিব—হে ইন্দ্র তোমার চরণে ধরি, আমাকে সহস্রলোচন কর। নয়নে পলক পড়িলেই মনে হয়, সে বুঝি দেশান্তরে আছে—আর দেখিতে পাইব না—আর হৃদয় ধরিবে না।

দুঁহু কোরে দুঁহু কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥

এইরূপে—"বিছোহ বিফল ভেল দুহুক পরাণ।
গরগর অন্তর ঝরয় নয়ান।"

রজনী প্রেমিক প্রেমিকার পরিতৃপ্তির অপেক্ষা রাখে না, অলক্ষিতে যে কেমন করিয়া কাটিয়া যায় তাহা বোঝা যায় না—ঊষার বাতাস কোন্ পথে নিঃশব্দে আগমন করিয়া নিশার প্রদীপকে কম্পিত করিয়া দেয় তাহা প্রেমিক প্রেমিকা জানে না। "পেমক গতি দুরবার।"

গগন মগন হোঅ তারা।
তইঅও ন কাহ্ন তেজয় অভিসারা॥

শ্রীরাধা দেখিলেন—কুমুদবন্ধু চন্দ্রের দীপ্তি মলিন হইয়াছে, অরুণের চারু চম্পকবর্ণ বিকশিত হইয়াছে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গের মধুর গানে কুঞ্জভবন মুখরিত। আর ত সময় নাই—আর ত সময় নাই! এখনও পথ নির্জ্জন, পথিক চলিতেছে না। গৃহে ফিরিবার এই ত অবসর—

হে হরি! হে হরি! শুনিয় শ্রবণ ভরি
অব ন বিলাসক বেরা।

হে হরি আর ত বিলাসের সময় নাই। ঐ দেখ গগনের নক্ষত্র "সে হো অবেকত ভেল"—ঐ শোন "কোকিল কয়ইছ কেরা"—চন্দ্রের কণ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ মলিন হইয়াছে। "নগরক ধেনু ডগরকই সঞ্চর," প্রস্ফুটিত কমল দেখ মুদিত হইল। সখা, সখা, "দে মেরানী রে!"—বিদায় দাও, বিদায় দাও। "বেলা হলো মরি লাজে—কেমনে শিথিল কবরী আবরি চলিব পথেরি মাঝে।" বিদায়ের কাল আসিল! হায় হায়, "দিঠিহুক ওত দেসাঁতর রে"—কক্ষ প্রাচীরে সংলগ্ন চিত্র পুত্তলিকা যেমন এ উহার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া রহে, রাধামাধবও বিদায়ের ক্ষণে তেমনি রহিলেন—

ভিতক চীত পুতলি সন দুহু জন
রহল বিদায়ক বেলা।

প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি পড়ু
চেতন অচেতন ভেলা॥

সহচরীগণ প্রমাদ গণিল। তাহারা "ঘন ঘন গগন হি চায়"—

রজনী পোহাওল সব জন জাগল
সে ডরহি অধিক ডরায়।

কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

নিতুই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি ক্ষয়॥

উভয়ের প্রেম এইরূপ নিত্য নূতন হইয়া দেখা দিতে লাগিল বটে, কিন্তু অবাধ মিলনের পরিতৃপ্তি ঘটিল না। আবার কুঞ্জে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া—

হরিণ নয়নি ধনি চকিত নিহারনি
অতি উতকণ্ঠিত ভেলা।

ভাবিলেন, হায় হায়, কোন্ দারুণ বিধি এমন প্রেম সৃজন করিল? সে যদি প্রেমই গড়িল তবে "কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মঝু দেহ?" যদি কুলবতী না হইতাম তাহা হইলে ত দিবানিশা প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতাম। "বচহ সজনি অব কি করি উপায়।" শুধু ত ঘরের সপত্নীর ভয় নহে—সেই দগ্ধবিধি আমার তনু, মন, জীবন সকলকেই যে আমার সপত্নী করিয়া গড়িয়াছেন—

সজন সভ জন তনু মন জীবন
সৌতিনি করি বিহি দেলা।

মন প্রিয়তমের জন্য আকুল, কিন্তু তনু ত বারবার অভিসারে যাইতে সাহস করে না। এ যে আমার অসহ দুঃখ—প্রাণ ত আর সহ্য করিতে পারে না। ব্যথায় হৃদয় আমার শতধা দীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু মুখে ফুটিতে পারে না। এ যাতনা ত প্রকাশ করিতে পারি না; পাছে গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত হয়। এ যে আমার সখি চোর রমণীর আকুল রোদন—মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া উঠে—

চোর রমণি জনি মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।

আমি মূঢ় পতঙ্গ, দীপের লোভে ধাইলাম, শেষে পুড়িয়া মরিলাম—

দীপক লোভে শালভ জনি ধায়ল
সে ফল ভুঞ্জইতে চাই॥

কাহুকে আশা দিয়া ভাল করি নাই—"ভল ন কএল মঞে দেল বিসবাস।" আমি যে পিঞ্জরে বদ্ধ শারি—ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিঞ্জরের লৌহ কবাটে মাথা ভাঙ্গিতেছি, বাহির হইতে পারি না—এ বন্দী দশাও ত সখি, সহিতে পারি না। কেমন করিয়া তবে কুঞ্জে যাইব?

সহই ন পারিয় চলই ন পারি।
ঘন ফিরি যৈসে পিঞ্জর মাহা সারি॥

মন বলিল—তবে কবাট খুলিয়া বাহির হও না কেন? কুলের পিঞ্জর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিতাম, কিন্তু "কুল গুণ গৌরব অতিশয় সৌরভ"—তাহা যে ছাড়িতে পারি না।

পার না? তবে তাঁহাকে পাইবে না। শ্রীমতী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। দেখিলেন—

অগমনে প্রেম, গমনে কুল জাএত

কি করি? কি করি? প্রেম রাখি কি কুল রাখি? হরিণী যেমন ব্যাধের ভয়ে দশ দিকে ব্যাকুল হইয়া ধায়, আমিও তেমনি ব্যাধের ভয়ে দশদিক ভ্রমিয়া আকুল হইতেছি। আকাশের চন্দ্র পর্য্যন্ত আমার শত্রু। আজ শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া সে আমার অভিসার পথকে আলোকে উজ্জ্বল করিয়াছে, গৃহের বাহির হইলেই লোকে আমাকে দেখিবে। ভাবিয়াছিলাম আজ অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, তাই পথে আসিতে সাহস করিয়াছিলাম। কিন্তু হায় "আএ তুলাএল পঞ্চদশী"—পূর্ণিমা আসিয়া আকাশ ব্যাপিল। এ কি হইল? হে চন্দ্র! দয়া কর—আজ আর আকাশে থাকিও না—"চন্দা জনু উগ আজুকি রাতী।" হে জলধর তোমাকে কোটি রত্ন দিব—আজ অন্ধকারে পৃথিবী ঢাক।—জড় প্রকৃতি কাহারও কথা শুনে না, সে মমতাহীন। তুমি যখন কাঁদ সে তখন হাসে, তুমি যখন হাস সে তখন কাঁদে। চন্দ্র শ্রীরাধিকার বিরহ ব্যাথায় এতটুকু সহানুভূতিও দেখাইল না। সে যেমন জ্বলিতেছিল তেমনি জ্বলিতে লাগিল। এ দিকে—

এক দিস কাহু অওকা দিস
সুবিদিত বংস বিসালা।
দুই পথ চঢ়লি নিতম্বিনি
সংশয় পড়ু কুলবালা॥

শেষে সঙ্কল্প হইল—"সখি হে আজ জাএব মোহী।" যখন আশা দিয়াছি, কথা দিয়াছি, তখন যা থাকে কপালে শ্যামদর্শনে নিশ্চয়ই যাইব।

ঘর গুরুজন ডর ন মানব
বচন চুকব নহী।

আজ সখি, মনের মত করিয়া সাজিব—চন্দন আনিয়া অঙ্গে লেপিব। গজমতির হার গলায় পরিব, চক্ষে অঞ্জন দিয়া আমি আজ শ্যামদর্শনে যাইব। এক চন্দ্র কেন সখি, আজ বহু চন্দ্র গগনে উদয় হইয়া শ্যামধরণীকে স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় সমুজ্জ্বল করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায়না। আজ আর আমি আত্মগোপন করিব না; নীলবাসে দেহ ঢাকিব না—চঞ্চল চরণেও চলিব না। আমি আজ সখি,—

ধবল বসনে তনু ঝপাওব
গমন করব মন্দা।
জইও সগর গগনে উগত
সহসে সহসে চন্দা॥
ন হমে কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে।

রুদ্রদেবের পিঙ্গল জটা হইতে নিঃসৃতা ভাগীরথী যেমন একদিন বাধা ভাঙ্গিয়া সাগরসঙ্গমে চলিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই, সেইরূপ—

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা॥

একলি কএল পয়ান।
পন্থ বিপথ নহি মান॥

তাঁহার চিত্ত তখন নলিনীদলে নীরের ন্যায় অস্থির বেগে চলিতে চাহে, কিন্তু জালবেষ্টিতা হরিণীর মত পথে খসিয়া খসিয়া পড়ে—

চলএ চাহ খসি পুনু পড় খসি খসি
জালক ছেকলি হরিণী।

গগনে তখন দারুণ ঘনমেঘ উদিত হইল, "সঘন দামিনি ঝলকই"

কুলিশ পতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই।
সজনি আজু দুরদিন ভেল।

তা হউক না, কুঞ্জে যে যাইতেই হইবে। আমার প্রাণপ্রিয় যে আমারই আশায় সেখানে একাকী বসিয়া আছেন—

কন্ত হমরি নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল।
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
সাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরই মোর॥

আমার শ্যাম যে আজ একাকী বসিয়া আমারই পথ চাহিয়া আছেন—আমি কি ঘরে থাকিতে পারি? আসুক তুফান, পড়ুক বজ্র, যমুনা লক্ষশির তুলিয়া নৃত্য করুক, দামিনী কড়্ কড়্ নাদে ডাকিয়া বেড়াক—

সাম নাগর, একলে কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥

বুঝি অভিসার পূর্ণ হইবে না—বুঝি সংশয় পড়িল—এ যে দেখিতেছি—

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিশ পরএ দুরবার।
গরজ তরজ সন রোসে বরিস ঘন
সংসয় পড় অভিসার।

দেখিতেছি রজনী কালো কাজল উদ্গিরণ করিতেছে; চারিদিকে ভীম ভুজঙ্গগণ ভ্রমণ করিতেছে—দুর্ব্বার কুলিশ পতিত হইতেছে। একি বিষম দুর্দ্দিন! মেঘগর্জ্জনে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে—বুঝি বা অভিসারে সংশয় পড়িল!

যাহা হয় হউক আমি নিরস্ত হইব না—প্রেম কি কখনও পরাভব মানে? চাঁদেও কলঙ্ক বহন করে; রাহুর আক্রমণও সহ্য করিয়া পরাজয় মানে—কিন্তু প্রেম চিরজয়ী। কে আমার পথে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে?

পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য বল রোধে তার গতি?

যাহার অনুরাগ দৃঢ় তাহার আর ভয় কোথায়?—"কত এ ভীতি জেঁৗ দৃঢ় অনুরাগে।"

বরাহ মহিস মৃগ পালে পলায়
দেখি অনুরাগিনী বাঘ ডরায়॥

ঘন ঘোরা রজনী, চারিদিকে অন্ধকার, অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছে—কালিন্দী কল্লোলিনী। শ্রীরাধিকা সেই দারুণ সময়ে অভিসারে বাহির হইলেন।

এক গুনে তিমির লাখ গুনে ভেল।
উতরহু দখিন ভান দূরে গেল।

অন্ধকারে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম আর চিনিতে পারা যায় না—

পথ পীছর বড় গরুয় নিতম্ব
খস কত বেরি নহী অবলম্ব॥

ইহারই নাম সাধনা—ইহারই নাম বাঞ্ছিতকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা। শ্রীরাধা মিলনের সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সন্তরণে যমুনা পার হইলেন; ভাবিলেন যমুনে, তুমি নদী নও, গোক্ষুর জলমাত্র! পথে পদে পদে ভুজঙ্গম লঙ্ঘন করিলেন, "নিসি নিসাচর সঞ্চর সাথ।" কিন্তু মাধবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না।

এত কএ অইলিহুঁ জীব উপেখি।
তইঅও ন ভেলে মোহি মাধব দেখি॥

হায়রে দুরদৃষ্ট! জীবন উপেক্ষা করিয়াও সঙ্কেত-কুঞ্জে আসিলাম, তবুও পাইলাম না! বিদ্যাপতির রাধা আশা-ভঙ্গে কহিলেন—তবে কি আমি শেষে খলের কথায় প্রতারিত হইলাম?—"পিসুনক বচনে কইলি পরতীতি।" কথিত সময়ে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া জয়দেবের রাধা বলিয়াছিলেন—"মম বিফলমিদমমল রূপ যৌবনম্"—কুঞ্জে শ্যামের দেখা পাইলাম না, আমার এ রূপ যৌবন দেখিতেছি বৃথা হইল। একজন মূর্ত্তিমতী আকাঙ্ক্ষা, আর একজন জীবন্ত ভোগ। একজন রুদ্রাক্ষমালা, আর একজন রত্নহার। একজন প্রেম, আর একজন কাম।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

সুমেধ

(বৌদ্ধ আখ্যায়িকা)

যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপে অমরাবতী নামে নগর ছিল। নাগরিকেরা দীর্ঘজীবী এবং সর্ব্বপ্রকার আপদ্মুক্ত ছিল। অকালমৃত্যু অধিবাসীদিগের অজ্ঞাত থাকায় নগরের নাম অমরাবতী হইয়াছিল। অশেষ সৌন্দর্য্যশালী ও সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পদের অধিকারিণী অমরাবতী, ইন্দ্রের নন্দন কাননের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তাহার পদ্ম পুষ্প শোভিত, ইতস্ততঃ সন্তরণকারী স্বর্ণময় রাজহংস যুক্ত জলাশয় সমূহ, স্বর্ণময় ফলভারে অবনত ফলোদ্যান, সুস্বরপক্ষিসমাকুল, বিচিত্রবর্ণ পুষ্পময়াকৃত দূরবিস্তীর্ণ বৃক্ষরাজি তাহাকে সৌন্দর্য্যের স্বর্গপুরীতে পরিণত করিয়াছিল। নগরের সর্ব্বত্র স্বর্গীয় সুখ বিরাজ করিত, কারণ জনসমূহ একদিকে যেমন উচ্চজাতিসম্ভূত, তেমনিই অপরদিকে ধর্ম্মপ্রাণ ছিল।

এই অমরাবতী নগরে এক বিত্তশালী উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে, একমাত্র পুত্ররূপে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আনন্দ এবং মাতা ভাসী নামে অভিহিতা হইতেন। পিতামাতা একমাত্র পুত্রের নাম সুমেধ রাখিয়াছিলেন। সুদর্শন বালককে অল্প বয়সেই সত্যানুসন্ধানে উৎসুক দেখিয়া পিতামাতা পুত্রকে জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র তক্ষশিলাতে প্রেরণ করিলেন। বিখ্যাত অধ্যাপকগণ সেখানে শিক্ষাদান করিতেন এবং অমরাবতীর প্রতিভাবান ছাত্রসমূহ ঐ স্থানেই শিক্ষালাভ করিত।

অল্পকালেই সুমেধ স্বীয় গুরু দিক্‌প্রমুখের নিকট বেদাদি শাস্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিলেন। গুরুদেব ব্যক্ত করিলেন যে, কুমারের আর তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিবার কিছুই নাই।

শৈশবেই সুমেধ অমরাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তায় সমস্ত নগরী চমৎকৃত হইল। দেশ দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থীরা তাঁহার নিকট আগমন করিল এবং সুমেধ তরুণ বয়সেই গুরুর পদে বৃত হইলেন।

সুমেধ ধনরত্ন পরিবেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু পার্থিব ঐশ্বর্য্যে তাঁহার আসক্তি ছিল না। দৈহিক সুখ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইল। তিনি একাকী চিন্তামগ্ন হইয়া থাকিতে পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন।

এই প্রকারে সুমেধ যখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হইল।

পিতামাতা যে কত ধনী ছিলেন, সুমেধ নিজে তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। যেদিন তাঁহার কোষাধ্যক্ষ রাশি-

বর্দ্ধন পৈতৃক ধনসম্পত্তি দেখিবার জন্ত তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, সেদিন তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনিচ্ছায় সুমেধ কোষাধ্যক্ষের অনুগমন করিলেন। কোষাগারস্থ অমূল্য রত্নরাজি বালক নীরবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"ইহা আপনার স্বর্গীয় পিতার পরিত্যক্ত, এইটী আপনার মাতৃদেবীর অধিকারে ছিল, ঐটী আপনার পিতামহের সংগৃহীত"—কোষাধ্যক্ষ একটী একটী করিয়া রত্নরাজির কাহিনী সুমেধের নিকট বিবৃত করিতে ছিলেন। "তাঁহারা সকলেই স্বর্গগত হইয়াছেন। এক্ষণে এই বিপুল ধনরাজির অধিকারী একমাত্র আপনি। আপনি কিরূপে এই ধনরাজির ব্যবহার করিবার বাসনা করেন ?"

জ্ঞানবৃদ্ধ বালক মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "আমাকে চিন্তা করিবার অবসর দাও।"

সুমেধ স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"মধুমক্ষিকা যেরূপ মধু সঞ্চয় করে, মদীয় পিতৃপুরুষগণও সেই প্রকার ধনসঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বর্গগত। মক্ষিকা যেরূপ স্বীয় সযত্ন সঞ্চিত মধু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, অপরে তাহা উপভোগ করে, সেইরূপ আমার পিতৃপুরুষগণও কোনও রত্নই সঙ্গে লইতে সমর্থ হন নাই। আমার অর্থ আমি দানে নিয়োজিত করিব এবং অন্তকালে তাহার সুফল আমার সঙ্গী হইবে। পিতৃপুরুষগণ প্রদর্শিত মার্গ আমি অনুসরণ করিব না।"

সুমেধ কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন, নগরমধ্যে যেন ঘোষণা করা হয় যে, তিনি দানের জন্ত স্বীয় কোষাগার উন্মুক্ত করিতেছেন, দরিদ্রমাত্রেই মনোমত দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে।

পুষ্পরেণুর সুমিষ্ট গন্ধ যেরূপ মক্ষিকাকে আকর্ষণ করে, সুমেধের অর্থভাণ্ডার সেইরূপ দরিদ্রগণকে আকর্ষণ করিল। কেহ স্বর্ণ, কেহ রত্ন, কেহ শস্য, কেহ গবাদি পশু, কেহ বা বস্ত্র ভিক্ষা করিল। কেহই বিফল মনোরথ হইল না, সকলেই আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যাপেক্ষাও অধিক প্রাপ্ত হইল। অবিরত জনস্রোত সুমেধের গৃহে প্রবেশ করিতেছে ও তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে – সকলেরই মুখে আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতার বাক্য। সকলেই পরিপূর্ণ হস্ত, সন্তুষ্ট চিত্ত ও প্রসন্ন বদন। দেখিয়া সুমেধের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।

যখন ভাণ্ডারের সমস্ত ধন নিঃশেষিত ও গৃহ জন-কোলাহলশূন্য হইল, তখন সুমেধ স্বীয় সৌধশিখরে গমন পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের অন্তঃসার-শূন্যতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি চিন্তা করিলেন—"জন্ম দুঃখ, জীবন দুঃখ, বার্দ্ধক্য দুঃখ, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু দুঃখ এবং ব্যাধি দুঃখ। ঐ সকল দুঃখই আমাকেও আক্রমণ করিবে। ঐ দুঃখ সমূহ হইতে মুক্তির একমাত্র উপায় নির্ব্বাণ লাভ। শরীর একাধিক পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন; অতএব উহাতে আসক্তি মূঢ়তা; কারণ যাহা সংযোগে উৎপন্ন, বিয়োগেই তাহার অবসান হইবে। দেহ অশুদ্ধ পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, অতএব উহাতে অনুরক্তি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যাহা শুদ্ধ এবং অবিনাশী তাহারই সন্ধান করিতে হইবে। তাহা নির্ব্বাণ। একমাত্র নির্ব্বাণই জীবকে পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি দানে সমর্থ। আমি নির্ব্বাণের অনুসরণ করিব।

"সংসারে দুঃখ বিদ্যমান। যাহা দুঃখকে বিনাশ করিতে সমর্থ, আমি তাহাই লাভ করিতে সচেষ্ট হইব। যাহা সংসারের[১] গতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাই আমার একমাত্র কার্য্য।"

"উত্তাপ ও অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করে, শীতল বায়ু ও বারি জীবদেহ স্নিগ্ধ করে। উত্তাপ ও অগ্নি যদ্রূপ শীতল বায়ু ও বারি সংস্পর্শে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ কামনা ও বিদ্বেষের অগ্নি, নির্ব্বাণের শীতল বায়ু সংস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়। যখন দশবিধ[২] পাপ সংসারে বিদ্যমান,

---

১ এস্থলে 'সংসার' শব্দের অর্থ 'অবিরাম জীবনস্রোত, পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু।'

২ দশবিধ পাপ। দৈহিকপাপ চতুর্ব্বিধ—জীবহিংসা, চৌর্য্য'

তখন পাপের হন্তাও অবশ্যই বিদ্যমান। পাপের অস্তিত্ব নিষ্পাপ অবস্থার অস্তিত্বকে প্রমাণ করিতেছে। এই নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ।"

একাকী নির্জ্জনে বালক সুমেধ এই প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। চিন্তাতরঙ্গের মধ্যে তাঁহার মনে প্রশ্ন উদিত হইল—এই চিন্তা, এই সত্যানুসন্ধান কি তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের ধর্ম্মপথানুসন্ধানের ফল নয়? সহসা তাঁহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে স্বীয় পূর্ব্ব জীবন উন্মুক্ত হইল। সুমেধ স্ত্রীমূর্ত্তিতে, নতজানু হইয়া পচ্চেক ৩ বুদ্ধের সম্মুখে সমাসীন। ভগবচ্চরণে যথাবিধি দানান্তে স্ত্রীমূর্ত্তি কাতর নয়নে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ভগবন্! দূর ভবিষ্যতে দাসীর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির আশা আছে কি না ব্যক্ত করুন।" উত্তর হইল যে, স্ত্রীমূর্ত্তি সুদূর ভবিষ্যতে কল্পান্তরে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন। সেই অবধি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির প্রয়াস যুগ হইতে যুগান্তরে, মূর্ত্তি হইতে মূর্ত্ত্যন্তরে অবিশ্রান্ত অপ্রতিহতভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে ও বিকাশলাভ করিয়াছে।

সুমেধ বোধিসত্ত্ব ছিলেন; তিনি ধ্যানস্থ হইয়া স্বীয় অতীত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সুদূর ভবিষ্যতে স্বকীয় বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির নিশ্চয়তাও অনুধাবন করিয়াছিলেন। গন্তব্য স্থান সুদূর এবং দুর্গম, সুতরাং সুমেধ আর বিলম্বে অসমর্থ। "আমি সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণা হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিব। অপরিচ্ছন্নদেহ ব্যক্তি যদি সম্মুখস্থ সরোবরের জল দ্বারা নিজ দেহকে পরিষ্কৃত করিতে অক্ষম হয়, তাহাতে জলকে দোষ স্পর্শে না। আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করিব।

"কামনার কর্দ্দমে লিপ্তদেহ মানব কেবল মাত্র নির্ব্বাণের নির্ম্মল নীরে স্বীয় দেহ পূত করিতে সমর্থ। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ স্বীয় দেহকে মলনির্ম্মুক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে দোষ তাহারই; জলের নয়। স্ফটিকস্বচ্ছ জল সম্মুখে ক্রীড়ারত থাকিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

"দস্যুদল একজন পথিকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। এমন একটী পথ পথিক জ্ঞাত আছে, যাহা দস্যুদিগের অজ্ঞাত। ঐ পথ অবলম্বন করিলে পথিক পলায়নে সমর্থ। যদি সে উক্ত পথ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে কি পথের দোষ? ইহা নিঃসন্দেহ তাহার নিজের দোষ। বাসনা সমূহই দস্যুদল এবং তাহাদের অজ্ঞাতপথই নির্ব্বাণের মার্গ।

"এই মার্গ আমার জ্ঞাত; আমি যদি ইহা অবলম্বন না করি, তবে আমার দোষ।" সুমেধ এই প্রকার চিন্তা করিলেন। মানবজীবনের সারশূন্যতা তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে অসমর্থ হইল। দাবাগ্নিকালে হস্তিরাজ যেরূপ এক অরণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যান্তর অনুসন্ধান করে, সুমেধও সেইরূপ স্বীয় শূন্য গৃহ ও তৎসঙ্গে গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

মৃগচর্ম্ম ও বল্কল সম্বলিত সন্ন্যাসী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সুমেধ একাকী হিমালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই স্থানে একটী সরোবরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে তিনি বাস করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তথায় একটী প্রাসাদের আবির্ভাব হইল। সুমেধ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা দেবরাজ শাক্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুমেধ প্রাসাদের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলেন যে, ইহা তাঁহার অমরাবতীস্থ বাসভবন অপেক্ষাও মনোহর। কিন্তু এরূপ রমণীয় আবাসে অবস্থান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কারণ তিনি পার্থিব সমস্ত কামনা বিসর্জ্জন দিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছিলেন। নিমেষেই ইন্দ্রজাল প্রসূত প্রাসাদ অন্তর্হিত হইল।

অবশেষে গৃহত্যাগী সুমেধ নির্ব্বিরোধে ধ্যানমগ্ন হইবার অবসর পাইলেন। তিনি আসনস্থ হইয়া ক্রমানুসারে 'অনিত্য', 'দুঃখ' ও 'অনাত্মা'কে স্বীয় ধ্যানের বিষয়ীভূত

ব্যভিচার, সুরাসক্তি। বাক্যজনিত পাপ ত্রিবিধ—মিথ্যাবাক্য, রূঢ়বাক্য, শাঠ্য। মানসিক পাপ ত্রিবিধ—দ্বেষ, ভোগাসুরক্তি, অবিদ্যা।

৩ বুদ্ধ ত্রিবিধ 'শ্রাবক'বুদ্ধ, 'পচ্চেক বুদ্ধ ও সম্যক্ সম্‌-বুদ্ধ। শাক্যবংশীয় গৌতম বুদ্ধ শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত।

করিলেন। তিনি দিবারাত্র ত্রিবিধ উপায়ে (উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান ও ভ্রমণ নিরত হইয়া) ধ্যান করিলেন।

সপ্ত দিবসের মধ্যেই সুমেধ ঋদ্ধিলাভ করিলেন। ঋদ্ধি বলে তিনি দেবদিগের বাসস্থান স্বর্গসমূহে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সুমেধ যেস্থানে তপস্যানিরত ছিলেন, তাহারই নিকটস্থ রামবাগমপুর নামক নগরে উৎসবের আয়োজন হইতেছিল। বুদ্ধ দীপঙ্কর নগরে পদার্পণ করিবেন, তাই এ উৎসবের আয়োজন। সুমেধ বুদ্ধের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। একদিন তিনি বায়ুপথে নগরে আগমনকালে উৎসবের আয়োজন দেখিলেন। সুমেধ নগরবাসিগণকে উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ভগবান বুদ্ধ দীপঙ্কর নগরে দান গ্রহণের জন্য আগমন করিতেছেন। কল্প কল্পান্তরে এক এক বুদ্ধের আবির্ভাব হয়; সেই দুর্লভদর্শন বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং সুমেধের অতি নিকটেই অবস্থিত। মহাপুরুষের দর্শনলাভের আশায় বোধিসত্বের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইল। তিনি দীপঙ্করের অভ্যর্থনায় নিজকে নিয়োজিত করিবার বাসনা করিলেন। নাগরিকগণকে স্বীয় বাসনা ব্যক্ত করিলে তাহারা সুমেধকে গহ্বরসঙ্কুল ও অতিশয় কর্দ্দমাপ্লুত একটী স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ স্থানকে পরিপূর্ণ করতঃ উহার সজ্জীকরণে নিযুক্ত করিল।

মনে করিলে সুমেধ স্বীয় ঋদ্ধি বলে দেবলোক হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া কিংবা সুমেরুর উচ্চ চূড়া হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই গহ্বরগুলি পূর্ণ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তদ্দণ্ডেই দেবরাজ শাক্যের উদ্যানস্থ কল্পবৃক্ষ হইতে স্বর্গীয় বসন আনয়ন করিয়া তদ্দারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা অতি অনায়াসসাধ্য। হৃদয় দেবতার অভ্যর্থনায় নিজের দেহকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত না করিলে তাঁহার তৃপ্তি অসম্ভব। তাই বোধিসত্ব অস্ত্র সাহায্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া গহ্বর পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। সংসাররূপ মহাগহ্বরকে স্বকীয় ধর্ম্মবলে যিনি পূর্ণ করিতে সমর্থ, সেই মূর্ত্তবুদ্ধ সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় শ্রমনিরত হইলেন।

সুমেধ কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তথাপি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথাসময়ে সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে বুদ্ধ দীপঙ্কর শিষ্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন। সুমেধ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই, বুদ্ধকে অর্পণ করিবার জন্য একটী পুষ্পও চয়ন করা হয় নাই—তিনি কি করিবেন? "আমি স্বীয় দেহ মহাপুরুষের পদমূলে অর্ঘ্য দান করিব।" সুমেধ কৃতসংকল্প হইলেন।

কর্দ্দমোপরি মৃগচর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক সুমেধ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তদুপরি শয়ন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে একমাত্র প্রার্থনা জাগরিত ছিল—"আমি যেন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'ধর্ম্ম' তরীর সাহায্যে দেব ও মানবকে সংসারসমুদ্র অতিক্রম করাইতে সমর্থ হই।"

ক্রমে দীপঙ্কর উপনীত হইলেন। তাঁহার পবিত্র বুদ্ধদেহ হইতে ষড়বর্ণ জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। সম্মুখস্থ ভূতলশায়ী দেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীপঙ্কর মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার হৃদয়ের বাসনা জ্ঞাত হইলেন। তিনি স্বীয় দিব্যদৃষ্টি সাহায্যে অবগত হইলেন যে, দূর ভবিষ্যতে কল্প কল্পান্তরে সুমেধ বৌদ্ধ গৌতম রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।

দীপঙ্কর শিষ্যগণকে কহিলেন—"এই যে ধরাশায়ী সন্ন্যাসী দেখিতেছ, ইনি অসাধারণ মানব। মূর্ত্তি হইতে মূর্ত্তান্তরে, জন্মে জন্মে ত্যাগের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, সর্ব্বশেষে কপিলবস্তু নগরে নৃপতি শুদ্ধোদন ও রাজ্ঞী মহামায়ার পুত্ররূপে ইনি জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি রূপবতী রাজকন্যা যশোধরার পাণিগ্রহণ করিবেন এবং ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সংসারত্যাগী হইবেন। ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ধ্যান নিরত হইবেন ও তথায় সর্ব্ববিধ ক্লেশ হইতে বিমুক্ত ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া গৌতম বুদ্ধ নামে খ্যাত হইবেন।"

অতঃপর দীপঙ্কর ভবিষ্যৎ বুদ্ধকে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান

পূর্ব্বক, দান গ্রহণের নিমিত্ত নগরীতে প্রবেশ করিলেন।

তৎপরে জন্মে জন্মে সুমেধ একাগ্রচিত্ত হইয়া দশবিধ 'পারমিতা' লাভ পূর্ব্বক বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কপিলবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থরূপে জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে পৃথিবীতে তাঁহার শেষ জন্ম রাজপুত্র বেসান্তর রূপে। ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বুদ্ধগয়ার পবিত্র বোধিবৃক্ষতলে তিনি আমাদিগের সর্ব্বশেষ বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীকিরণকুমার রায়।

এলোরা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা প্রদক্ষিণ পথে মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ দিকের বারান্দায় উঠিলাম। সেখানে নানামূর্ত্তি রহিয়াছে যথা (১) অন্নপূর্ণা; (২) বংশীমূর্ত্তিতে শিব —বিষ্ণুর ন্যায় গদাচক্র শঙ্খধারী, সম্মুখে একটা মূর্ত্তি মিনতি করিতেছে; (৩) চতুর্হস্ত বিষ্ণু, কালীয়নাগের লাঙ্গুল ধরিয়া তাহার বক্ষোদেশে পদন্যাস করিয়া আছেন, এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে তরবারি; (৪) বরাহ পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন হস্তে শঙ্খ ও চক্র, পদতলে অহি; (৫) গরুড়ারোহী চতুর্হস্ত বিষ্ণু; (৬) ষড়্‌ভুজ বামনাবতার বিষ্ণু, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, তরবারি ও চর্ম্ম, এক পদ বলির মস্তকে আরোপিত; (৭) চতুর্ভুজ বিষ্ণু গোবর্দ্ধন ধরিয়া রহিয়াছেন; (৮) শেষ নারায়ণ শেষ নাগের উপর শয়ান, নাভি হইতে উদ্গত পদ্মের উপর ব্রহ্মা আসীন; (৯) নরসিংহ মূর্ত্তি; (১০) এক ত্রিমুখ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি শিবলিঙ্গ উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইতেছে, (১১) শিব ও তাঁহার বাহন নন্দী; (১২) অর্দ্ধ নারীমূর্ত্তি।

এই বারান্দা হইতে আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গেলাম। পাথরের ঘুলঘুলি কাটিয়া আলো প্রবেশের পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু স্তম্ভযুক্ত একটা বৃহদায়তন গৃহে প্রবেশ করিলাম—সম্ভতঃ তাহা সভা গৃহ হইবে, অনেকটা দরবার হলের ন্যায় মনে হইল। আরও এধার ওধার ঘুরিয়া আমরা নামিয়া পূর্ব্বদিকের বারান্দায় মন্দিরের পিছনে আসিলাম। তথায় বিষ্ণু ও শিবের ও তাঁহাদের সম্পর্কিত নানা মূর্ত্তি রহিয়াছে। তথায় গোবিন্দ রাজা ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি দেখিলাম।

তাহার পর অগ্রসর হইয়া উত্তর দিকে লঙ্কেশ্বর মন্দিরে আসিয়া পড়িলাম। প্রধান মন্দিরের পরে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোবিন্দ (খৃঃ-৭৬৫-৮১০) অথবা অমোঘবর্ষের সময়ে ইহা রচিত। এখানে মহিষাসুরমর্দ্দিনী অর্দ্ধনারী, ভৈরব, বীরভদ্র, শিব পার্ব্বতী ও তাণ্ডবনৃত্যকারী নরকপাল সম্বদ্ধজটা শিবের মূর্ত্তি দেখিলাম। অন্ধকার সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া একটা সুন্দর হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। চমৎকার শিল্প কৌশল সমন্বিত শতোত্তর বিরাট স্তম্ভ একটা নীচু ছাদের ভার বহন করিয়া রহিয়াছে। স্তম্ভের কারুকার্য্য ও পরিকল্পনা (design) বিভিন্ন।

এই ভাস্কর্য্য শিল্পের দ্বারা মণ্ডিত লঙ্কেশ্বর এবং কৈলাসের বিরাট মহিমায় আমরা বিস্মিত হইলাম— বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শিল্পী মূক শৈল হইতে সজীব মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে—দৃঢ় শৈলখণ্ড যুগ যুগ ধরিয়া সেই শিল্প অক্ষতভাবে থাকিতে পারিত। কিন্তু দৈবের লীলা বিচিত্র— কলাদস্যু ও ধর্ম্মান্ধ প্রতিমা-চূর্ণকারীদের অত্যাচারে

তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। আলাউদ্দিন যখন দেবগিরি জয় করিয়া রাজা রামদেবকে এলোরা সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন তখন প্রথম এই মূর্ত্তিগুলির দুর্দ্দশা হয়; বিকৃত মস্তিষ্ক মহম্মদ তুঘলকের দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপনের সময় দ্বিতীয়বার নিগ্রহ হয়। শেষ প্রতিমাভঙ্গ ব্রত ঔরঙ্গজেব উদ্‌যাপন করেন।

কৈলাস ত্যাগ করিয়া আমরা কয়েকটি গুহা দেখিয়া রাস্তা দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী অতিক্রম করিয়া ২৭নং গুহা (গোয়ালিনী) ২৮ ও ২৯নং গুহা পর্য্যন্ত আসিলাম। ২৯নং গুহা সম্বন্ধে Havell বলিয়াছেন—"The Duma Lena at Ellora, which is almost an exact copy on a larger sca'e of the Elephanta temple may have been partly excavated in Harsha's time."৭ ২৮নং গুহায় শিবপার্ব্বতীর বিবাহ দেখিলাম। ২৮ ও ২৯নং গুহার মধ্যে একটা জলপ্রপাত দেখিলাম, এখন ক্ষীণ। এই মন্দিরগুলি ছাড়াইয়া আরও উত্তরে কিছু দূরে জৈনদিগের দুইটী মন্দির আছে, তাহাদের নাম ইন্দ্র সভা ও জগন্নাথ সভা। এগুলি কৈলাসমন্দিরের সমসাময়িক হইবে ও বাদামীর চালুক্য নৃপতিগণের আমলে রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কপালের দোষ তাহা দেখা হইল। এতদূরে সঙ্গীগণ যাইতে রাজি হইলেন না। যাহা হউক, এই উত্তর দিকের হিন্দুমন্দিরগুলির মধ্যে **রামেশ্বরগুহা** সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। দক্ষিণ দিকের মন্দিরে দেওয়ালে একটা বৃষ; চতুর্ভুজ কঙ্কালসার এক মূর্ত্তি হস্তে প্রশস্ত খর্ব্বাকার খড়্গ ধারণ করিয়া আছে; আর একটা কঙ্কালমূর্ত্তি ইহার পা ধরিয়া আছে। পশ্চাতে কালী এক হস্তে ইহার কেশ ধারণ করিয়া আছেন; অন্য (বাম) হস্তে ছিন্ন নরমুণ্ড, গলদেশ সর্পবেষ্টিত। সর্পোপবীতধারী আর এক কঙ্কালমূর্ত্তি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিকট হাস্য করিতেছে। অপর এক স্থলে গণেশ, সপ্তমাতৃকা ও একজন বাস্তকর রহিয়াছেন—সপ্তমাতৃকাগণের অভিজ্ঞানগুলি বোধ হয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বভাগে শিব তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন। স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া দেবতাগণ ঊর্দ্ধে মেঘান্তরাল হইতে তাহা অবলোকন করিতেছেন। নিম্নে পার্ব্বতী অনুচরগণ সহিত সেই দৃশ্য দেখিতেছেন। শিবের পদদ্বয়ের মধ্যে একটা ভৃঙ্গিমূর্ত্তি নৃত্য করিতেছে।

উত্তরদিকের দৃশ্যে শিবপার্ব্বতীর বিবাহ—বামভাগের একেবারে পশ্চিম অংশে ব্রহ্মা, তাঁহার সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত; ইহারই অপর পার্শ্বে শ্মশ্রুবহুল একটা মূর্ত্তি—তাহার পিছনে দুই পুরুষমূর্ত্তি। তাহার পর পর্ব্বতী, পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁহার পরিচারিকা, এবং ঘটবাহী এক পুরুষ মূর্ত্তি। শিব পার্ব্বতীর হস্তধারণ করিয়া আছেন—সম্মুখে গণেশের একটা ছোট মূর্ত্তি; এবং অপর চারিটা অনুচর। তন্মধ্যে একজনের হস্তে একটা শঙ্খ।

আর একটা দৃশ্যে পার্ব্বতী তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, হস্তে মালা রহিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার অনুচরী নতজানু হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার বাম ভাগে বালক সহিত একটা স্ত্রীমূর্ত্তি। যোগী শিব তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন—পশ্চাতে পদ্ম, ঊর্দ্ধদেশে কল। তাহার পরে দক্ষিণ দিকে বোধ হয় মকরকেতন কামদেব, এবং রতিদেবী; পশ্চাতে আর একটি নারী-মূর্ত্তি। এই দৃশ্যের অধোদেশে আমোদ প্রমোদে রত একসারি শিবগণ। তাহার পর মহিষাসুরীর মূর্ত্তি।

এই দিকের মন্দিরগুলি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। রাস্তা পার হইয়া দশাবতার মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

দশাবতার—ফার্গুসন ও বর্জ্জেস বলেন যে ইহার পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গী যোগাই আম্বা, ভার্দ্দি ও কন্নবাস্থিত শিল্প সৌধের মত। গুহাটি দ্বিতল; নীচের তলায় আমরা মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি দেখিলাম—ছিন্নমুণ্ড মহিষের স্কন্ধদেশ হইতে মহিষাসুর নির্গত হইয়াছে; তপায় সূর্য্য অথবা বিষ্ণু, পার্ব্বতী, ভবানী, গণপতি, অর্দ্ধনারী, পঞ্চতপঃ-পরায়ণা পার্ব্বতী, ও শিব পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দেখিলাম—সেই মূর্ত্তিগুলি পাথরের দেওয়াল হইতে খুদিয়া বাহির করা।

৭। Havell, Aryan Rule in India, p. 211.
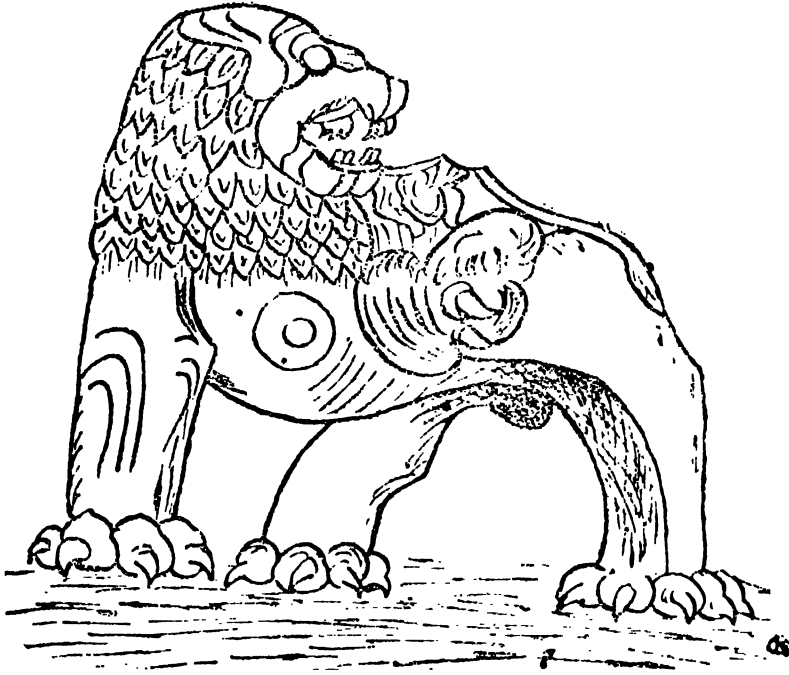
কৈলাস—মণ্ডপের উপরিস্থিত সিংহমূর্ত্তি

আর একটা ভীষণ ভৈরবের মূর্ত্তি দেখিলাম। Cave Temples গ্রন্থ হইতে তাহার বিবরণ দিতেছি। ভৈরব সম্মুখে একপদ অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন; খণ্ডিত নর-মুণ্ডমালা কটিদেশ অতিক্রম করিয়া দোদুল্যমান, পরিহিত দ্বিপ-চর্ম্ম ঈষৎ উত্তোলিত; কালকূট ফণী তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে; মুখ গহ্বর হইতে ভীষণ দশনাবলী দৃষ্ট হইতেছে; ত্রিশূলবিদ্ধ এক মূর্ত্তি যন্ত্রণায় কাতর হইয়া নির্দ্দয়ের নিকট যেন দয়া ভিক্ষা করিতেছে। ভৈরব বামহস্ত দ্বারা আর একটা মূর্ত্তিকে তাহার পাঞ্জিদেশ ধরিয়া উত্তোলিত করিয়া সেই বিকট আহ্লাদে ডমরু বাজাইতেছেন, এবং তৃষ্ণা নিবারণকল্পে তপ্ত রক্ত পাত্রে ধরিতেছেন। কঙ্কালসার অতীব বিশীর্ণ কালী মূর্ত্তি (?) ৮ নিম্নে তাঁহার লম্বা দেহ বিস্তার করিয়া আছেন—তাঁহার বিশাল মুখ, চুলগুলি ঝোপের মত, চক্ষু ডুবিয়া গিয়াছে, দক্ষিণহস্তে বক্র ছুরিকা, অন্য হস্তে পাত্র অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, যেন সেই পাত্রে হতভাগ্য বধ্যের শোণিত পতিত হইয়া লেলিহান রসনা সিক্তিত করে। তাঁহার মস্তকের পশ্চাতে ধ্বংসের সূচক পেচক বিরাজ করিতেছে। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে Vincent Smith যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ৯ হিন্দুদের

৮। ? এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন আমার।

৯। "The religion which finds expression in imagery so truly devilish is not a pleasant subject of contemplation and no amount of executive skill or cleverness in the production of scenic effect can justify, on artistic grounds, such a composition, so frankly hideous. Its claim to be considered as a work of art rests solely upon its display of power in a semibarbaric fashion. The horror of the subject and its treatment is not redeemed any ethical lesson. Indeed Puranic and Tantric Hinduism concerns itself little with ethics." V. A. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon, p. 214.

ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে না বুঝিয়া তাহার উপর বেপরোয়া কলম চালানর ইহা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পরদৃশ্য অষ্টভুজ মহাদেবের ভয়ঙ্করমূর্ত্তি। এই তাণ্ডবের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা দক্ষিণ ভারতের মন্দির বর্ণনা করিবার সময় লিখিব। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম শিবদুর্গা চৌসার ১০ খেলিতেছেন। নন্দী ও হৃষ্ট শিবগণ রহিয়াছে। তাহার পর শিব পার্ব্বতীর বিবাহ—পার্ব্বতী শিবের বামভাগে দাঁড়াইয়া আছেন —সম্মুখে চতুর্ম্মুখ (অঙ্কনে ত্রিমুখ— অগত্যা!) ব্রহ্মা বসিয়া পৌরোহিত্য করিতেছেন, উপরে দেবগণ স্বস্ব বাহনে আরোহণ করিয়া বিবাহ দেখিতে আসিয়াছেন। পর দৃশ্যে দেখিলাম কৈলাস পর্ব্বতের নিম্নে রাবণ। সর্ব্বশেষে শিবলিঙ্গ হইতে উদ্গত মহাদেব মার্কণ্ডেয়কে যমের কবল হইতে রক্ষা করিতেছেন।

মন্দির দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে আবার গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি —চারিটা গজ তাঁহার উপর বারিবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতেছে। দুইজন অনুচর বারিকুম্ভ যোগাইতেছে। দেবীর একহস্তে পদ্ম, অন্যহস্তে সীতাফল। ১১ পরের দৃশ্যে ব্রহ্মা ও বরাহ পূজিত বহ্নিজ্বালা বেষ্টিত লিঙ্গাভ্যন্তরবর্ত্তী শিবমূর্ত্তি দেখা গেল। অপরাপর দৃশ্য—(১) গিরি গোবর্দ্ধন ধারী ষড়্‌ভুজ বিষ্ণু; (২) অনন্তশয়নে বিষ্ণু ১২ নাভিপদ্মে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী চরণ সেবা করিতেছেন; (৩) গরুড়ারোহী বিষ্ণু; (৪) পৃথিবীধারী বরাহ; (৫) বামনাবতার বিষ্ণু এবং (৬) নরসিংহ।

১০। দাবার ছকে পাশা দিয়া খেলাকে চৌসার বলে।

১১। ইহাই বর্জ্জেশ ও ফার্গুসনের অনুমান। ইহা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে যে এই প্রদেশে সীতাফলের প্রাচুর্য্যের নিমিত্ত লক্ষ্মীকে সীতাফল ধারণ করিতে হইয়াছে।

১২। রঘুবংশ দশম সর্গঃ—

ভোগিভোগমাসাসীনং দদৃশুস্তং দিবৌকস.।
তৎফণামণ্ডলোদর্চির্ম্মণিদ্যোতিত বিগ্রহম্ ॥ ৭ ॥
শ্রিয়ঃ পদ্মনিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে।
অঙ্কে নিক্ষিপ্তচরণমাস্তীর্ণ কর-পল্লবে ॥ ৮ ॥

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যেরূপ ধরণের দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত ছিল, দশাবতারে সেই অক্ষরে লিখিত চৌদ্দ লাইন লিপি আছে। পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাতে রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণের নাম আছে। আমি তাহা হইতে কতক কতক উদ্ধৃত করিতেছি:—

ওঁ নম (শিবায়)। অর্দ্ধকৃষ্টে গরিষ্ঠে শিশুতরা জানুলগ্নং কুমারং বামার্দ্ধেনাপনেতুং ইত্যাদি।

চতুর্থ লাইন—বিদ্বিষাং দন্তিবর্ম্মা সুহৃত্ত্যজা যেন গতাপি ভুভৃতা...

৭ম লাইন—সুনুনৃপোঽভুৎ মান্যো গোবিন্দরাজা হরিরিব হরিণাক্ষীজনপ্রার্থনীয়ং॥

৮ম লাইন—কলিকলুষজুষ্কা মবারী রাজশ্রী কর্করাজঃ...

১০ম লাইন—র্ণাশ্রমানশেষাং তনয়াস্তস্য স্ববর্ম্ম সুষসিতুং শ্রীদন্তিদুর্গ রাজা সকলমহীপালনাথোঽভুৎ যস্য হরেরিব চরিত্রং নাতিক্রান্তৈর্নভারিভিঃ কৈশ্চিৎ শক্যমনুকর্ত্তুমমলং নরপতিভির্নাপি সাম্প্রতিকৈঃ দণ্ডেনৈব জিগায় বল্লভবলং যঃ সন্ধ্যভূপাধিপং কাঞ্চীশং য কলিঙ্গকোশলয়ো শ্রীশৈলদেশেশ্বরং শেষান্ মানব লাট তক্কনৃপতীনন্যাংশ্চ নীত্বা

রাবণ কা খই। দশাবতার শেষ করিয়া 'আমরা রাবণ কা খই' নামক ১৪নং গুহায় আসিলাম। দশবতারে যে সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এখানে তাহারই অনেক পুনরাবৃত্তি দেখিলাম—যথা (১) মহিষাসুরমর্দ্দিনী, (২) শিব পার্ব্বতীর চৌসার ক্রীড়া (৩) শিবের তাণ্ডব নৃত্য—তাঁহার দক্ষিণে মূর্ত্তিগুলি বংশী ও মুরজ বাজাইতেছে পশ্চাতে বৃষ, বামে পার্ব্বতী ও শিবগণ, উপরিভাগে বামে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং দক্ষিণে ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্র, মেষারূঢ় অগ্নি এবং অপর দুই মূর্ত্তি; (৪) কৈলাস পর্ব্বতের নিম্নভাগে রাবণ; ১৩ সন্ত্রস্তা পার্ব্বতী শিবের

১৩। শিশুপালবধ প্রথম সর্গঃ—

সমুৎক্ষিপন্‌যঃ পৃথিবীভৃতাং বরং
বরপ্রদানস্য চকার শূলিনঃ।

কণ্ঠগ্রহণ করিয়াছেন, দশস্কন্ধকে মহাদেব পদদ্বারা চাপিয়া রাখিয়াছেন; (৫) ভৈরব; (৬) তাহার পর এক সঙ্গে (group) কতকগুলি মূর্ত্তি—কাল, গণপতি, সপ্ত মাতৃকা, এবং শিব। এই দেবীগণ সকলেই চতুর্ভুজা—সকলের ক্রোড়ে শিশু এবং নিম্নে বাহন—যথা চামুণ্ডা, পেচকারূঢ়া; ইন্দ্রাণী ঐরাবতারূঢ়া; বারাহী বরাহরুঢ়া; লক্ষ্মী গরুড়ারূঢ়া; কৌমারী শিখিবাহনা, মহাদেবী বৃষভবাহনা ও ব্রাহ্মী স্বয়ম্বতী হংসবাহনা।

উত্তরদিকের দেওয়ালে—১ ত্রিশূল ধারিণী চতুর্ভুজা ভবানী, ২ পদ্মাসনা লক্ষ্মী—নাগগণ ঘটনিঃসৃত বারিধারায় তাঁহাকে স্নান করাইতেছে, ৩ শেষ নাগের উপর চরণ স্থাপিত করিয়া বরাহ—পৃথিবী ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।—নাগমূর্ত্তিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া আছে।

এসব শেষ করিয়া আমরা বৌদ্ধমন্দির গুহা গুলি দেখিতে গেলাম।

আর একটি হিন্দু মন্দিরের নাম ঘৃষ্ণেশ্বর—মহাদেবের জ্যোতির্লিঙ্গ এথায় আছেন। ঔরঙ্গজেব এই মন্দির ভগ্ন করিয়া দিবার পর এখান হইতে উত্তর পশ্চিমাংশে প্রায় দুই মাইল দূরে—ইন্দোরের অহল্যাবাই এই সুন্দর মন্দির রচনা করিয়া দেন। কিন্তু হায়, তাহার দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না। লম্বোদরগ্রস্ত বন্ধুর কাতর দৃষ্টি সে পথে কাঁটা হইয়া রহিল! হিন্দুদের পবিত্র বারোটা তীর্থের ১৪ অন্যতম ঘৃষ্ণেশ্বর, তোমার নিকট বিদায় লইলাম, অপরাধ লইওনা।

(২)

অতঃপর আমরা বৌদ্ধগুহা মন্দির গুলিতে আসিলাম।

তিন থল—১২ নম্বর গুহা। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে দেখিলাম—বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি এক পদ গুটাইয়া হাটুর উপর হাত দুইখানি রাখিয়া বসিয়া আছেন। এই মূর্ত্তি দ্বারা বোধ হয় সঙ্ঘ সূচিত হইতেছে। তাঁহারই বামভাগে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি; তাঁহার শিরোভূষায় সম্মুখদেশে স্তূপ, তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন, বামপদ পদ্মাসনের উপর গুটান, দক্ষিণ পদ ঝুলান, ইহাকে ললিতাসন মুদ্রা কহে। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হাঁটুর উপর বরমুদ্রায় স্থাপিত, বামহস্তে পদ্মের মৃণাল রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি তারা অথবা প্রজ্ঞার, বোধ হয় ধর্ম্ম সূচিত করিতেছে। ইহার দুই পার্শ্বে স্থূলকায় মূর্ত্তি—দক্ষিণপদ আসনের উপর উত্তোলিত—বোধ হয় বুদ্ধের। এই মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধ রত্নত্রয় সূচিত করিতেছে—ইহার মন্ত্র

বোধিসত্ত্ব

ওঁ সর্ব্ববিঘ্নে হোং।
ওঁ প্রজ্ঞায়ে হোং॥
ওঁ মণিপদ্মে হোং॥

এই "ওঁ মণিপদ্মে হুং" মন্ত্রটী তীব্বতীয় বৌদ্ধ দিগের মন্ত্র।১ এই তারামূর্ত্তি বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্রের

ত্রসদ্বারাত্রিসূতাসসম্ভব
স্বয়ংগ্রহাশ্লেষসুখেন নিষ্ক্রয়ং॥ ৬০॥
এবং রঘুবংশ চতুর্থ সর্গঃ—
পৌলস্ত্যতুলিতস্যাদ্রেরাদধানে ইব হ্রিয়ম্॥ ৮০॥

১৪। এই বারোটি তীর্থ ঘৃষ্ণেশ্বর, কাটিওয়াড়ে সোমনাথ, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, নর্ম্মদা দ্বীপমধ্যে ওঁকার, নাসিক সমীপে ত্র্যম্বক, আহমাদনগর সমীপে নাগনাথ, দাক্ষিণাত্যে বৈদ্যনাথ, পুণায় সন্নিহিত ভীমা নদীর নিকটে ভীমশঙ্কর, কেদারেশ্বর, কাশীতে বিশ্বনাথ, শ্রীশৈলপর্ব্বতে মল্লিকার্জ্জুন ও রামেশ্বর।

১। এতৎসম্বন্ধে Waddell's Lhasa and its Mysteries এবং Buddhism নামক পুস্তকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

প্রসিদ্ধ লোচনীও হইতে পারেন। ফার্গুসন ও বর্জ্জেসের মতে, তিন থলের দ্বিতলটী ভারতবর্ষে যত বৌদ্ধ গুহা আছে—তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। প্রাচীর গাত্রে উত্তরদিকে সাতটী এবং দক্ষিণ দিকে সাতটী সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দটী বিশালকায় বুদ্ধমূর্ত্তি পদ্মাসন নামক যোগাসনে বসিয়া আছেন। উত্তরদিকের প্রত্যেক মূর্ত্তির হস্তদ্বয় ক্রোড়ে স্থাপিত—এই মুদ্রাকে জ্ঞানমুদ্রা কহে। প্রত্যেক মূর্ত্তির শীর্ষদেশ ভামণ্ডল বেষ্টিত, পশ্চাতে বিভিন্ন ক্রমের পত্রাকার ভূষা। ইঁহারা শেষ সপ্তবুদ্ধ—(১) বিপশ্বী, (২) শিখি, (৩) বিশ্বভূ, (৪) ক্রকুছন্দ, (৫)

মঞ্জুশ্রী
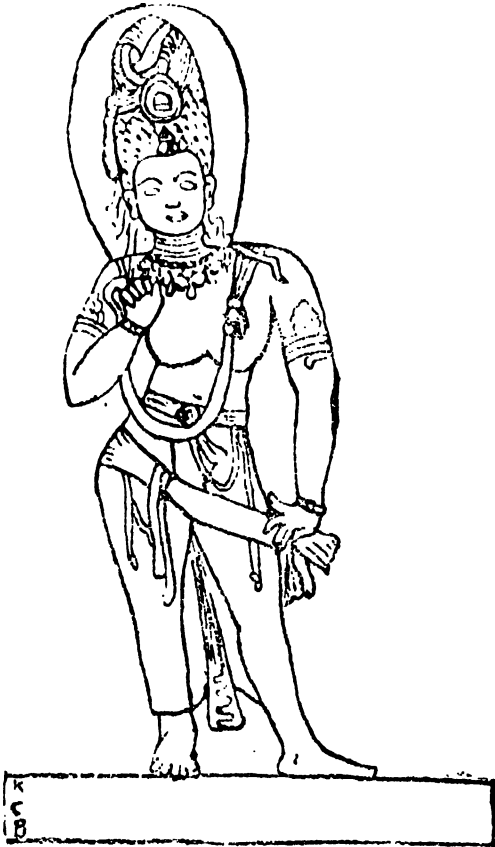
কনকমুনি, (৬) কশ্যপ এবং (৭) শাক্যসিংহ। পশ্চাতের ক্রম প্রত্যেকের বোধিক্রম সূচত করিতেছে। এই বোধিক্রমগুলি ক্রমান্বয়ে—(১) পাটলী, (২) পুণ্ডরীক, (৩) শাল, (৪) শিরীষ; (৫) উদুম্বর, (৬) ন্যগ্রোধ এবং (৭) পিপ্পল অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষ। সাঁচি স্তূপের তোরণ বর্ণনায় সময় স্তূপ এবং বোধিক্রমের উল্লেখ করিয়াছি। উত্তরদিকের তোরণের সম্মুখভাগে সর্ব্বোচ্চ অধঃপ্রস্তারে পাঁচটী স্তূপ এবং দুইটী ক্রম, এবং প্রত্যেক ক্রমের সম্মুখে সিংহাসন; দক্ষিণ তোরণের পশ্চাৎ দিকের সর্ব্বোচ্চ অধঃপ্রস্তারে তিনটী স্তূপ এবং তদন্তর্ব্বর্ত্তী চারিটী ক্রম; পূর্ব্বদিকের তোরণের সম্মুখভাগের অধঃপ্রস্তারের দুই অন্তে ক্রমনিম্নস্থ সিংহাসন এবং বাকিগুলি স্তূপ; এবং পশ্চিম তোরণের সম্মুখভাগের সর্ব্বোচ্চ অধঃপ্রস্তারে চারিটী ক্রমনিম্নস্থ সিংহাসন এবং তিনটী স্তূপ—শেষ সপ্তবুদ্ধের দ্যোতক।২

দক্ষিণ দিকের প্রাচীরগাত্রে ইহারই অনুযায়ী ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় সাতটী মূর্ত্তি রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা —(১) বৈরোচন, (২) অক্ষোভ্য, (৩) রত্নসম্ভব, (৪) অমিতাভ, (৫) অমোঘসিদ্ধি, (৬) বজ্রসত্ত্ব, ও (৭) বজ্ররাজ অথবা মানুষী বুদ্ধও হইতে পারেন।

ললিতাসনমুদ্রায় আর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি রহিয়াছেন। বোধ করি তিনি অক্ষোভ্যের শক্তি লোচনী হইবেন।

২। Guide to Sanchi (Sir. J. Marshall) p. 48—"Back-Top Architrave : In the central section are three Stupas alternating with four trees with thrones in front of them, adorned by figures both human and divine. These represent the SIX BUDDHAS OF THE PAST (viz. Vipassi, Sikhi Vessabhu, Kakusandha, Konagamana and Kassapa) and Gautama Buddha—three symbolised by the stupas and four by the trees under which each respectively attained enlightenment. The tree on the extreme right is the pipal tree of Gautama Buddha and the one next to it is the banyan tree of Kassapa Buddha."

Pp. 44, 43, 48, 52, 60, 62 and 68 of Guide to Sanchi দ্রষ্টব্য।

তাঁহার এক হস্তে বজ্র রহিয়াছে। অন্য চারটী মূর্ত্তি বৈরোচনশক্তি বজ্রধাতেশ্বরী, রত্নসম্ভবশক্তি মামুখী, অমিতাভশক্তি পান্দরা এবং অমোঘসিদ্ধিশক্তি তারা হইবেন। অপর পাঁচটী স্ত্রীমূর্ত্তি সম্ভবতঃ সমন্তভদ্রশক্তি সীতাতারা, বজ্রপাণিশক্তি উগ্রতারা, রত্নপাণিশক্তি রত্নাতারা, পদ্মপাণিশক্তি ভৃকুটীতারা এবং বিশ্বপাণি-শক্তি বিশ্বাতারা হইবেন।

ডনথল—তিনথল গুহা অতিক্রম করিয়া আমরা ডনথল নামক আর একটী বৌদ্ধগুহায় প্রবেশ করিলাম। এই গুহার বারান্দা ১০৩ ফুট লম্বা ৯ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ। এখানে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি উচ্চ চতুষ্কোণের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে স্কন্ধদেশে দুই গন্ধর্ব্বমূর্ত্তি আছেন। অপর দুই মূর্ত্তি তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছেন। তাঁহারা অব-লোকিতেশ্বর (বা পদ্মপাণি) এবং মঞ্জুশ্রী (বা বজ্রপাণি) হইবেন। এই মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তির পার্শ্বে আরও তিনটী পুরুষ মূর্ত্তি আছে। তাঁহাদের শিরোভূষা উচ্চ ও তাহা ভামণ্ডল বেষ্টিত। বিপরীত ভাগে তিনটী দেবীমূর্ত্তি আছেন। প্রত্যেকেরই হস্তে সবৃন্ত প্রসুন। তাঁহারা তারা অথবা বোধিসত্ত্বসমুচ্চা হইবেন। ইহার পরেই মন্দির কক্ষে সিংহাসনের উপর বুদ্ধদেব পদ্মাসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার হস্ত ভূমিস্পর্শমুদ্রায় রক্ষিত। উর্দ্ধ-পাণিতল বামহস্ত তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপিত, দক্ষিণহস্ত জানুর উপর দিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়াছে—করতলের পশ্চাদ্ভাগ বাহিরের দিকে। এই মূর্ত্তির চারিকোণে চারিটী সশস্ত্র বামনমূর্ত্তি রহিয়াছে। জানুর সম্মুখভাগে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি ঘট ধারণ করিয়া আছেন—সম্ভবতঃ সেণানীর কন্যা সুজাতা বুদ্ধদেবকে উত্তপ্ত দুগ্ধ নিবেদন করিতেছেন।

বিশ্বকর্ম্মা চৈত্যহল—১০নং গুহায় আসিলাম। ইহাকে স্থানীয় লোকেরা 'সুতার কা ঝোপড়া' বলে। বিশ্বকর্ম্মা সুতারগণের (সূত্রধরগণের) দেবতা। পালি সাহিত্যে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যায়। শক্রের (সক্ক) দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া কখনও তিনি
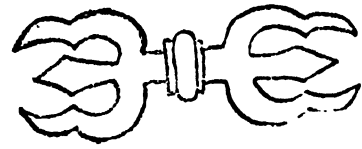
Indian Vajra.
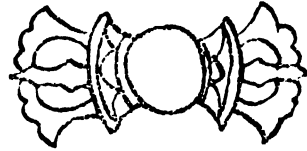
Chinese Vajra

বজ্র

সন্ন্যাসীগণের জন্য হিমবন্ত প্রদেশে গঙ্গাতীরে অথবা কবিত্থ বনে গোদাবরীতীরে, পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন; কখনও বা দশবল বুদ্ধের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিবার নিমিত্ত সোপানশ্রেণী রচনা করিয়া দিতেছেন; কখনও বা বহুদূর বিস্তৃত মণি মাণিক্যের বিশাল হর্ম্ম্য রচনা করিয়া দিতেছেন। স্থানীয় সূত্রধরগণ প্রায়ই এখানে তাহাদের দেবতাভ্রমে বুদ্ধ-দেবের পূজা করিতে আসে। এই স্থানে এই বিশ্বকর্ম্মা চৈত্যহল ব্যতীত দ্বিতীয় চৈত্যহল আর নাই। এই মন্দিরের মধ্যভাগের দুই পার্শ্বে দুইটা বিভাগ (aisles) আছে পরিমাণ—৮৫´১০´´ × ৪৩´২´´ × ৩৪´) মধ্যভাগে ও পার্শ্বে দুই বিভাগের মধ্যে আটাইসটি চৌদ্দ ফুট উচ্চ অষ্টাস্র স্তম্ভ আছে। এই মধ্যভাগের একেবারে অন্ত দেশে একটা উচ্চ ডগোবা আছে—তাহার ব্যাস ১৫॥ ফুট এবং উচ্চতা ২৭ ফুট, ইহারই সহিত যুক্ত ১৭ফুট উচ্চ দ্বারোপরিস্থ ভূষা আছে। তথায় অনুচর পরিবৃত একটী বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। শিরোভাগের খিলানে বোধিদ্রুম এবং গন্ধর্ব্বগণ বিরাজ করিতেছেন। এই খিলানের ছাদ পূর্ব্বে পঞ্জরযুক্ত কাষ্ঠ খণ্ডের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। প্রস্তরে নির্ম্মিত হইলেও

এই চৈত্যহলের ছাদে তাহারই অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরে আলোক প্রবেশ নিমিত্ত উপরে তিনটা বড় বড় জানালা আছে। মন্দিরের মধ্যভাগের তোরণে স্তম্ভের উপরিভাগে ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় আসীন অনুচরগণ পরিবৃত বহু বুদ্ধমূর্ত্তি চিত্রিত দেখা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বাদামীস্থিত হিন্দুগুহা এবং ঐহোলস্থিত বৈষ্ণব মন্দিরে যেমন হাস্যকৌতুকময় বামনমূর্ত্তি অথবা গণ লক্ষিত হয়, এখানেও তদ্রূপ বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির নিম্নে গণ প্রদর্শিত হইয়াছে। অজন্তায় ১৯ এবং ২৬নং গুহায় এই রকম দৃশ্য দেখা যায়।

এই খিলানের ঊর্দ্ধদেশে পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত নাগ ও নাগীমূর্ত্তি হইতে ছাদের পঞ্জরগুলি বাহির হইয়াছে। নাগ মূর্ত্তিগুলি পূজা করিতেছে ও নাগিনী মূর্ত্তিগুলির দক্ষিণ হস্তে একটা করিয়া ফুল আছে। বুদ্ধমূর্ত্তির বামভাগে অবলোকিতেশ্বর অথবা পদ্মপাণির মূর্ত্তি এবং দক্ষিণে চতুর্ভুজ ধর্ম্মের মূর্ত্তি দেখা যায়—তাঁহার হস্তে মালা, ত্রিশূল এবং কুপী।

ডাগোবার পরিমাণ স্থূলতঃ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে (২৬´১০´´ উচ্চ, ১৫´ ৬´´ ব্যাস) ইহা পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত প্রশস্ত এবং অপ্রশস্ত বহু খোপে বিভক্ত। এই খোপ গুলির মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি আছেন। তিনি পদ্মের উপরে চরণ ন্যস্ত করিয়া ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় বসিয়া আছেন। কোথাও কোথাও তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছে। ইহারই সম্মুখভাগে ১৬´১০´´ উচ্চ একটী প্রস্তর খণ্ডের উপর ১০´১১´´ উচ্চ এক বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় আসীন রহিয়াছেন। অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী নামক দুই বোধিসত্ত্ব তাঁহার দুই দিকে আছেন। উপরের তোরণে উপচার হস্তে দুইটী করিয়া চারিটী গন্ধর্ব্ব এবং বোধিদ্রুম খোদিত হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা চৈত্যে একটা লেখ আছে—তাহা বৌদ্ধদিগের সুবিখ্যাত মন্ত্র। তাহা এই—

যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো,
হ্যবদত্তেষাং চ যো নিরোধ এবং বাদি মহাশ্রমণঃ।

তদর্থ—যাবতীয় বস্তুই হেতু হইতে উদ্ভূত হয়, সেই
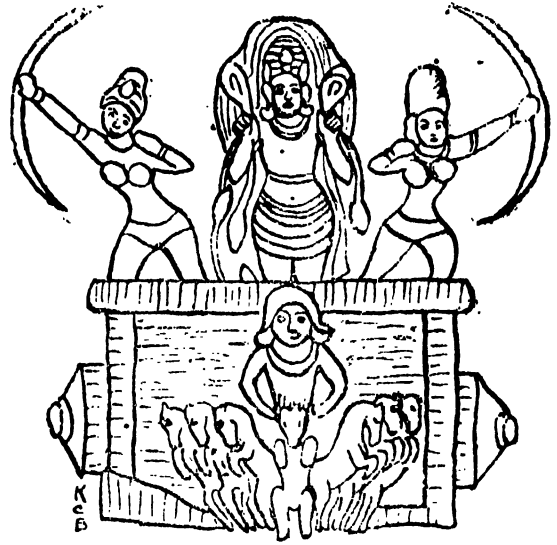
কুম্ভারওয়ার গুহায় সূর্য্য মূর্ত্তি

হেতু তথাগতদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—কোনও বস্তুই রহিবে না, মহাশ্রমণ (বুদ্ধদেব) এই কথা বলিয়াছেন। —এই মন্ত্র সারনাথে আবিষ্কৃত একখানি প্লেট এবং বহু Clay seal এ, এবং ডক্টর বার্ডদ্বারা খনিত কাণহেরি স্তূপে পাওয়া গিয়াছে। এই মন্ত্রটী আফগানিস্থান, ত্রিহুত, শিঙ্গাপুর, ও নবদ্বীপে আবিষ্কৃত লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং নেপাল, তিব্বত, চীন ও সিংহলদেশের সাহিত্যে তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে।

এই বিশ্বকর্ম্মা চৈত্যহল সম্বন্ধে হ্যাভেল যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—গুপ্তযুগের শিল্পে ও স্থপতি কৌশলের অন্ততম নিদর্শন এলোরাস্থিত তথাকথিত বিশ্বকর্ম্মা চৈত্য। ইহার নির্ম্মাণকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। বিশ্বকর্ম্মা সুপ্রসিদ্ধ সৌধ নির্ম্মাতাগণের (master builders) ইষ্টদেবতা ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা শ্রেণীবদ্ধ (guild) রাজমিস্ত্রীদিগের সমিতি ভবন ছিল। এবং ইঁহারাই বোধ হয় শৈল খোদিত করিয়া এলোরাস্থিত মন্দির

৩। এই মন্ত্র সম্বন্ধে—J. A. S. B. IV. pp. 133, 211, 286, 713; Hardy's Manual of Buddhism (2nd Ed.) p. 201 : Schlagenweit's Buddhism in Tibet p. 17 দ্রষ্টব্য।

গুহাগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"If this were the mason's chapel of Ellora, we have here a specially significant record of the great co-operative guilds which played so important a part in the social economy of India. The members of these technical corporations recognised no distinction of sect, so far as their business as craftsmen was concerned, and the Visvakarma Chaitya House was in all proablity the Guild Hall of Ellora, not an ordinary Chapter House or Chaitya Hall for Buddhist monks."৪

ভাবার্থ—পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে নানাবিধ ব্যবসায়িগণ সমবায়নীতিতে সঙ্ঘ অথবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নিজের স্বার্থ রক্ষা করিত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই বিশ্বকর্ম্মা চৈত্য। এই সঙ্ঘ জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে গঠিত হইত। এই চৈত্যটী তাহাদেরই গণ-ভবন, সাধারণ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের চৈত্যমন্দির নহে।৫

৯-৫ নং গুহা সকলকে বর্জ্জেস ও ফার্গুসন Mahr.-wada নামে অভিহিত করেন। গুহাগুলি ছোট ছোট, কোনও বিশেষত্ব নাই। একেবারে দক্ষিণ অন্তে অবস্থিত চারিটী গুহা আছে; তাহাদিগকে Dhedwada group বলে। এটী নীচ জাতি লোকের পল্লী অথবা উথের (স্থবির) দিগের (থেরওয়ারা) পল্লী ছিল—তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। এই গুহাগুলির রচনাকাল ৩৫০-৫৫০ খৃষ্টাব্দ।

দুই নম্বর গুহায় তারা অথবা পাদ্মরার মূর্ত্তি আছে—ফুল হস্তে দুইজন অনুচর আছে। শিরোভাগে বিদ্যাধর। মুকুটে একটী ডাগব রহিয়াছে—এই চিহ্ন অক্ষোভ্যের, অতএব সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার শক্তি লোচনী হইবেন। পশ্চাদ্ভাগে প্রাচীর গাত্রে একটী ক্ষুদ্র ডাগব উৎকীর্ণ রহিয়াছে—কিন্তু কোনও পূজক অথবা পূজার বস্তু উৎকীর্ণ হয় নাই।

চারি নম্বর গুহায় পদ্মপাণি অথবা অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি আছে—তিনি পদ্মের উপর পদ ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার অভিজ্ঞান চিহ্নগুলি যথা—১ বাম স্কন্ধে বিলম্বিত মৃগাজিন, ২ দক্ষিণ হস্তে মালা, ৩ স্ত্রীমূর্ত্তি (শক্তি) দ্বারা পরিবৃত; তাহাদের একজনের হস্তে মালা, কুপী ও ফুল। ঊর্দ্ধদেশে দুই দিকে বুদ্ধের মূর্ত্তি—একটীতে তিনি অভয়মুদ্রায় বসিয়া আছেন।

বর্জ্জেস ও ফার্গুসন এলোরাস্থিত বৌদ্ধগুহা এবং অন্যান্য স্থলের বৌদ্ধগুহার মধ্যে অনেক অন্তর দেখিতে পান। যথা—এলোরাতে মাত্র দুই এক স্থলে ডাগোবা দেখা যায়। অজন্তা, অমরাবতী, বোরো বুদর, সাঞ্চি এবং ভারহুতে যে ফণাধর নাগমূর্ত্তি দেখা যায় তাহা এখানে নাই। কাণহেরি এবং অজন্তায় বুদ্ধদেবের হয় কোনও অনুচর নাই, আর থাকিলেও দুই জনের অতিরিক্ত দেখা যায় না; এবং এই দুই স্থলে শক্তি (তারা) মূর্ত্তি নাই। এলোরাতে বুদ্ধদেবের ছয়, আট, দশ, বোধিসত্ত্ব অনুচর আছেন; এবং প্রাচীর গাত্রে বহু শক্তিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অতএব এই সব বিষয়ে এলোরা হইতে সাঁচি, ভারহুত, অমরাবতী ও বোরো বুদরের অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা বলেন যে এলোরাস্থিত এই বৌদ্ধগুহাগুলির ভাস্কর্য্যবস্তু যোগাচার্য্যগণের পুরাণের সহিত তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ ঐক্য পরিলক্ষিত হয় যে, আমরা অনায়াসে

৪। Havell's Aryan Rule in India pp. 185, 186.

৫। Guild অথবা শ্রেণী সম্বন্ধে Dr. R. C. Majumdar's Corporate life in Ancient India, Indian Antiquary (Guilds & Corporations in Ancient India) pp. 228-231, Vol XLIX (1920) দ্রষ্টব্য।

Carpenter's guilds সম্বন্ধে Jataka II. 14, Town of Carpenters, IV. 99. Ushardata's Nasik Inscriptions etc. দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এই কারুকার্য্যগুলি তাঁহাদেরই রচিত। এই যোগাচার্য্য সম্প্রদায় মহাযান তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, আর্য্যাসঙ্গের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; ঐতিহাসিক তারানাথের মতে বুদ্ধ হইতে ৯০০ বৎসর এবং নাগার্জ্জুন হইতে ১০০ বৎসর পরে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। ভাস্কর্য্য বস্তুগুলি এই কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যোগাচার্য্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও অবস্থিতির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এখন কেবলমাত্র নেপালে এবং তাহার উত্তরাংশে তাঁহাদের অস্তিত্ব দেখা যায়।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

মিলন-পথে

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তৈল বাঁচাইবার জন্য দিনের আলো থাকিতেই রান্না শেষ করিতে হইত, তাই মাধবী বৈকাল বেলা রান্না করিতেছিল। এমন সময়ে গোবিন্দ দাসের প্রতিবেশিনী তুলসী মঞ্জরী আসিয়া ডাকিল, "মাধবী, মাধবী লতিকা!"

মাধবী রান্না ঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া সহাস্যে বলিল, "এদিকে এস ভাই মঞ্জরী।"

ভিজা কাঠের ধূমে মাধবীর মুখ চক্ষু ঈষৎ স্ফীত ও রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। চক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছিয়া পিঁড়ি পাতিয়া তুলসী মঞ্জরীকে বসিতে দিয়া তাহার কোলের মেয়েটিকে সাদরে হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইল। তার পর তুলসী মঞ্জরীকে বলিল, "কি সৌভাগ্য আমার! আজ কত দিন পরে তোমার দর্শন পাওয়া গেল।"

তুলসী বলিল, "আমি তো তোমার মত বিদ্বান নই ভাই, মুখ্যু সুখ্যু মেয়েমানুষ। তোমার মত ক'রে বলতে পারব না। সোজা কথায় বলছি, কাযের বড়ই ঝঞ্ঝাট ছিল, তাই এত দিন আসতে পারিনি।"

"তোমার বোষ্টম ঠাকুরটির খবর কি?"

"সে তো বাড়ী নেই, বোনের বাড়ী বেড়াতে গেছে কাল। বাড়ী থাকলে কি আজও আসতে পারতাম? কপাল আমার!"

মাধবী হাসিয়া বলিল "দু'দণ্ডও চোখের আড়াল করতে চায় না না কি? এত ভালবাসা!"

"ভালবাসাই বটে! দু'দণ্ড সুস্থ দেখতে পারেনা। কেবল কায কর, কায কর। একটু জিরুবার যো নেই, একটু বেড়াবার যো নেই, জ্বালাতন করে খেলে! আর সয়না ভাই।"

"তা এখন কি করতে চাও মঞ্জরী?"

"করব আর কি? আমার কপাল, কপালের ভোগ ভুগছি। দু'দিন সে এ-দিক সে-দিক থাকলে মনে হয়, বালাই গেছে। ওকি, হাসছ কেন? সত্যিই বল্‌ছি ভাই, তামাসা করছি নে। সেদিন—"

মাধবী জানিত, তুলসীর মুখের অর্গল খুলিলে তাহা বন্ধ করা কঠিন। "পাণ নিয়ে আসছি" বলিয়া সে উঠিয়া গেল। কিছুকাল পরে তুলসীর জন্য গোটাদুই পাণের খিলি এবং তাহার মেয়ের জন্য কয়েক খানা বাতাসা লইয়া ফিরিয়া আসিল। মাধবী তুলসীর হাতে পাণ দিল। তুলসী পাণের খিলি দুইটা এক সঙ্গেই মুখে পুরিয়া বলিল, "বাতাসা এনেছ কেন?"

মাধবী বলিল, "তোমার মেয়ের জন্যে।"

তুলসী খুসী হইল, কিন্তু বলিল, "থাক্, থাক্, আবার বাতাসা কেন?"

মাধবী কোন কথা না বলিয়া মেয়েকে বাতাসা

খাওয়াইতে লাগিল। মেয়েটি কতক বা খাইল, কতক বা লালাযুক্ত হইয়া পড়িয়া তাহার এবং মাধবীর হাত ও কাপড় ভিজাইয়া দিল। খাওয়ান শেষ হইলে মাধবী ভিজা গামছা লইয়া মেয়েটিকে মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া বলিল, "মঞ্জরী নাও ভাই, তোমার মেয়ে। আমার ভাত বোধ হয় হয়ে গেছে।" বলিয়াই হাঁড়ি হইতে দু'চারিটি ভাত তুলিয়া টিপিয়া দেখিয়া উনুন হইতে হাঁড়িটা নামাইয়া ফেন গালিতে লাগিল। তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি রাঁধতে হবে?"

মাধবী বলি, "কিছু না। ওবেলার মোচার ঘণ্ট আর মাছের ঝোল আছে।"

"তবে শীগ্‌গির হাত ধুয়ে আমার চুলটা বেঁধে দে ভাই।"

"খুকীর বাবা যখন বাড়ী নেই, তখন আজ আবার সাজগোজের কি দরকার?"

তুলসী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "মরণ আর কি! তার জন্যেই আমার চুল বাঁধা কিনা। আজ সে বাড়ী নেই, ভাবছি, ঝুলনের ঠাকুর দর্শন ক'রে আসব। তার জন্যে কি আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম করার যো আছে? আজই তো ঝুলন শেষ, তুই ও তো যাবি?"

প্রশ্ন শুনিয়া উৎসব দর্শনের জন্ম মাধবীর মনটা লুব্ধ হইয়া উঠিল। সে প্রথম দিনেই শুধু গিয়াছিল, আর তো যায়ই নাই। আজই তো ঝুলন শেষ, যদি বাঁচে, তবেই তো আগামী বৎসরে ঝুলন দেখিতে পাইবে। সে খানিকটা ভাবিয়া বাহিরের পানে চাহিল। বর্ষার দিনশেষের ম্লান আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মৃদু সূর্য্যালোক আকাশে ও পৃথিবীর বুকে ঝিকমিকি করিতেছে। বেলা আর বেশী নাই। ঝুলন দেখিতে গেলে ঘরের কায সন্ধ্যার মধ্যে সারিয়া যাইতে পারে বটে; কিন্তু অশোকের বাড়ী এবেলা আর যাওয়া হয় না। না-ই বা হইল। রোজই তো মাধবী দু'তিন বার সেখানে যায়। সময় মত একবার না গেলে কেনই বা অশোক রাগ করিবে? সে কি বোঝে না, মাধবীরও ঘর সংসার, সাধ আহ্লাদ, সবই আছে? সে তাহার কেনা দাসী তো নয়। তাহার জন্ম কেন সে পূর্ণিমার ঠাকুর দর্শনের পুণ্য এবং উৎসবের আনন্দ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে?

তুলসী মাধবীকে মৃদু ঠেলা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ ক'রে ভাবছিস কি মাধবী? উঠবিনে? আমার চুল বেঁধে দিবিনে?"

মাধবী চমকিত হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত ধুইয়া তুলসীর চুল বাঁধিতে বসিয়া গেল। খালিমুখে থাকার অভ্যাস তুলসীর বড় ছিলনা। সে তাহার নির্ব্বাক শ্রোতার কাছে অক্লান্ত অনর্গল ভাবে পতিগুণ কীর্ত্তন করিয়া যাইতে লাগিল। সে এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "শোন্ ভাই, মিন্সে এমন, কোন রকম অপছন্দ হ'লে মুখ ফুলিয়ে ব'সে থাকবে; কিছু বলবে না। ওর চেয়ে গালমন্দ দেওয়া ঢের ভাল। কি বলিস ভাই?"

তুলসীর কথাটা শুনিয়া মাধবী সহসা সচকিত হইয়া উঠিল। অশোকের সেদিনকার অব্যক্ত অভিমান ক্ষুব্ধ মুখখানা তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তুলসী রাগিয়া বলিল, "তুই ভাই, বড় কমবক্তি হয়েছিস। আমরা মুখ্যু বলে, আমাদের কথার জবাবটাও কি দিতে দোষ?"

খোঁচা খাইয়া লজ্জিতা মাধবী বলিল, "ভাই, রাগ করিসনে, আমি অন্যমনা ছিলাম।"

তুলসী খোঁপায় হাত দিয়া কেমন হইয়াছে, তাহা আন্দাজে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "সন্ধ্যার পরেই তো আখড়ায় যাবি? আমায় ডেকে নিতে ভু'লে যাসনে।"

"আমি তো আজ যেতে পারব না, কায আছে। মা'র সঙ্গে যেও তুমি।" বলিয়াই মাধবী তুলসীকে আর কোন প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়া ঘরে ঢুকিল। তুলসী খানিক অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর, ছোট জাতের মেয়ে লেখাপড়া শিখিলে কেমন বিগড়াইয়া যায়, নিজের জাতকে কেমন তুচ্ছ করে, ইহারই অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে

বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ী যাইয়াও সে মাধবীর যত্ন, আদর এবং দেমাকের কথা শীঘ্র ভুলিতে পারিল না। যে দেমাক! অমন যত্নের মুখে আগুন! এত দেমাকই বা কিসের? সে তো তাহারই মত বোষ্টমের মেয়ে। যাক্, অমন মেয়ের কাছে না যাওয়াই ভাল। তার যেমন মরণ নাই, তাই সে যায়।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময়ে রাসমণি ঝুলন দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। মায়ের ভাত লইয়া মাধবী এতক্ষণ জাগিয়া বসিয়াছিল। মা আসিয়া সাড়া দিতেই সে দরজা খুলিয়া দিল। রাসমণির হাত মুখ ধোওয়া হইলে মাধবী তাহাকে ভাত বাড়িয়া আনিয়া দিল। আহার করিতে করিতে রাসমণি মেয়েকে বলিল, "মোহান্ত কত দুঃখ করলেন, মাধবী কেন এল না? তার মত তো কেউ ঠাকুর সাজাতে পারে না। প্রথম দিন তো তাকে জোর করেই ধরে এনেছিলাম'। মোহনগঞ্জ থেকে বাবুদের বউরা আজ ঠাকুর দেখতে এসেছিল।"

কয়েক গ্রাস ভাত গলাধঃকরণ করিয়া রাসমণি আবার বলিল, "কত বা গয়না তাদের, আর কি সুন্দরই বা কাপড়-চোপড়। সাজ-গোজেই ওদের সুন্দর দেখায়। নইলে আমাদের ঘরের বউদের চেয়ে ওরা এত কি বেশী সুন্দর?"

আবার কিছু সময় আহার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, "সেই বাবুটি বৃন্দাবন না কি নাম, তিনিও এসেছিলেন; যে বাবুটি তোকে আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন।"

এই কথার পরও মাধবী চুপ করিয়া আছে দেখিয়া, এতক্ষণে রাসমণির হুঁস হইল, ভাত দিয়া অবধি মাধবী এতটা সময় চুপ করিয়াই আছে। সে সহসা প্রশ্ন করিল, "তোর কি আজ অসুখ করেছে মাধু?"

মাধবী সংক্ষেপে বলিল, "না।"

"তবে আজ শেষ দিনটায় ঝুলন দেখতে গেলিনে কেন? কত তো সেধেছিলাম।"

"অশোকদার ওখানে ঢের কায ছিল যে। সে সব সেরে আসতেই সন্ধ্যা হলো। তারপর এসে ঘরের কায শেষ করলাম। তোমার সঙ্গে গেলে তো এসব হ'তো না মা।"

"তা, আজ অশোকের ওখানে না গেলেই হতো।"

"কি ক'রে হয় মা? তাঁকে দেখতে তো বাপ, মা, ভাই, বোন কেউই নেই।"

"ষাট! ষাট! কি যে বলিস তুই। উমা মা আমার সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে বেঁচে থাক। আমার মাথায় যত চুল তত বছর তার পেরমাই হোক্।"

মাধবী হাসিল, বলিল, "উমাদি তো এখানে থাকে না। এত দিনের মধ্যে একবারও এল না। অশোকদার কাছে তার থাকা না থাকা দুই-ই সমান।"

"অমন কথা বলতে নেই। মা নেই, বাপ নেই, উমা এখানে কার কাছে আসবে?"

রাসমণি আহার শেষ করিয়া আচমন করিয়া আসিলে মাধবী তাহার হাতে পাণ দিতে গেল। রাসমণি বলিল, "ওটা রেখে দে, কৌটায় গোটা কত আছে।"

রাসমণি যেখানেই যাইত, সেইখানেই পাণ ও দোক্তা ভরা একটা কৌটা তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। এই দুইটা জিনিসের সঙ্গ ছাড়া হইয়া সে একদণ্ড টিকিতে পারিত না। সে কৌটা খুলিয়া পাণ মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে মোলায়েম সুরে বলিল, "কেন মা, তুই এতরাত জেগে রয়েছিস? রাঁধা ভাত দু'টো কি আমি আর বেড়ে খেতে পারতাম না?" গোবিন্দ এতক্ষণ নিঃশব্দে বিছানায় পড়িয়া ছিল। এবার আর থাকিতে পারিলনা, বলিল, "খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে, মুখে ও কথাটা বলা আর বেশী কষ্ট কি?"

এই সুস্পষ্ট সহজবোধ্য আক্রমণেও কি জানি কেন রাসমণি শান্ত স্বরেই বলিল, "আমি না বল্লেও কি অত বড় মেয়ে বুঝে সুঝে একটা কায করতে পারে না?"

"পারবে না কেন, ভয়ে করেনি।"

"তা বটে! তুমিতো বাড়ীতেই ছিলে, ওকে শুতে বল্লে না কেন?"

"সেও ভয়ে।"

"বেশ! আমি সব সময়েই তোমকে জ্বালাতন করি নাকি?"

"ঠিক তা করনা বটে,—যাক্। ঘুমোও এখন রাত বড় বেশী নেই।"

"আমার কথা শুনলেই তো তোমার গায়ে জ্বালা ধরে। মরণ হ'লে বাঁচতাম। পোড়া যমও তো আমায় চোখে দেখবে না।"

অশ্রুপাত অদূরবর্ত্তী জানিয়া শঙ্কায় গোবিন্দদাস চুপ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া স্ত্রীকে জানাইতে চেষ্টা করিল যে, সে ঘুমাইতেছে। কিন্তু এই চিরপরিচিত ছলনায় রাসমণি ভুল করিল না। সে নিজের দুরদৃষ্টকে তথা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধিক্কার দিতে দিতে আঁচলে ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক পরে সে বুঝিল, তাহার বেদনার কাহিনী শুনাইবার জন্য কন্যা বা স্বামী কেহই আর জাগিয়া নাই। তখন অগত্যা তাহাকে চুপ করিতে হইল। দারুণ অভিমানে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে ঘুমে ঢুলিয়া ঢুলিয়া তাহাকে যাইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণও করিতে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনেক দিন পরে পরিষ্কার রৌদ্রে উঠান ভরিয়া গিয়াছে দেখিয়া রাসমণি মেয়েকে বলিল, "মাধু, আজ কিছু ঘুঁটে দিলে তো পারিস।" মাধবী ঘরে বসিয়া একটা ছেঁড়া কাপড় রিপু করিতেছিল। সে বলিল, "সেলইটা আগে শেষ হ'য়ে যাক্ মা।"

রাসমণি বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোর সেলাই শেষ করা পর্য্যন্ত কি রোদ ব'সে থাকবে বাপু? পোড়া শরীল এক দিনও ভাল থাকে না, নইলে এসব তুচ্ছ কাযের জন্যে কে তোর খোসামোদ করতে যেত? তোদের মত বয়সে দিনরাত সমান ভাবে খাটতাম, গতর নিয়ে একটি দিনও ব'সে থাকিনি। তোদের যে কি আলিস্যি!"

তথাপি মাধবী সেলাই করিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না।

গোবিন্দদাস উঠানে বসিয়া গরুর ঘরের ভাঙ্গা বেড়াটা মেরামত করিতেছিল, স্ত্রীর কথা শুনিয়া সে নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। রাসমণির মাধবীর মত বয়সের ইতিহাস তাহার উত্তম রূপেই জানা ছিল। সুন্দরী স্ত্রীটিকে সে বরাবরই সশঙ্ক আদরে আবৃত করিয়া রাখিত; বিশেষতঃ প্রথম যৌবনে। মাধবীর জন্মের পূর্ব্বের এবং শৈশবে স্ত্রীর 'শরীর খারাপের' জন্য মেয়েলি কাযে ও রান্নায় গোবিন্দ এক রকম দক্ষ হইয়াই উঠিয়াছিল। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, তাহার মনে না থাকিবার কোনও কারণই নাই। তবে এখন ঐ একরোখা মেয়েটা মাধবী বাপকে ত কোন কাযই করিতে দেয় না। কিছু করিতে গেলে এমনি প্রচণ্ড বাধা দেয় যে, তাহা অতিক্রম করা গোবিন্দ দাসের শক্তিতে কুলাইয়া উঠে না। এই মেয়েমানুষ জাতটার শক্তির মাপকাঠি গোবিন্দ আজিও খুঁজিয়া পাইল না—অতটুকু মেয়ের চোখ রাঙ্গানি দেখিয়া সে ভয় পায় কেন? ধমকাইয়া কাড়িয়া লইয়া কায করিলেই তো পারে। কিন্তু সে তো দূরের কথা, মাধবীর একটা মৃদু ধমকেই তাহাকে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে হয়। তাহার একটি মাত্র মেয়ে,—জমিদার বাবু যাহাকে কত আদর করিতেন—সে কিনা আজ ঘরের ষোলআনা খাটুনি খাটিয়া মরে! আর তাহার অক্ষম বাপ মৌন ব্যথায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখে!

রাসমণির অদম্য খেয়ালের জন্যই অমন অল্প বয়সেই, অমন বরের সঙ্গেও মাধবীর বিবাহ দিতে হইয়াছিল। ধীরে সুস্থে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিতে পারিলে হয়তো তাহার বৈধব্য ঘটিত না। এতদিনে দু'টি ছেলের মা হইয়া বসিত, স্বামীর স্নেহে আদরে কত সুখে থাকিত, নাতিদের লইয়া কি আনন্দেই গোবিন্দ দাসের দিনগুলা এক এক মুহূর্ত্তের মত হইয়া কাটিয়া যাইত। অবশ্য বৈষ্ণবদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বা কণ্ঠী বদল নিষিদ্ধও নহে, নিন্দনীয়ও নহে। অনেকেই তাহা করে এবং মেয়ের কণ্ঠী বদলের জন্য এখন রাসমণিও একটু খানি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তা হোক্, সে আর স্ত্রীর কথায়

অমন তাড়াতাড়ি করিবে না, দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় করিবে।

পায়ের শব্দ পাইয়া গোবিন্দ দাস মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, রাসমণি পাণের কৌটাটি হাতে লইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতেছে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাওয়া হচ্ছে?"

রাসমণি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "যমের বাড়ী।"

গোবিন্দ দাস হাসিয়া বলিল, "সে যাওয়ার রকম এমন নয় গো। এখন কোথা যাচ্ছ শুনি?"

"পিতুর বাড়ী" বলিয়াই রাসমণি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ দাস জানিত, এত দিনের বাদলা রাসমণিকে প্রায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, আজ সে মুক্তির আনন্দে কয়েক ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইবে।

মাধবী সেলাই শেষ করিয়া ঘুঁটে দেওয়ার জন্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল, গোবিন্দ দাস এক গাদা গোময় লইয়া বসিয়া গিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া মাধবী বলিল, "বাবা, একি করছ তুমি? এখ'নি সব নষ্ট করে ফেলবে। ওঠ, ওঠ।"

তর্ক করা বৃথা জানিয়া গোবিন্দ দাস হাত ছাড়াইয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমি এক সময়ে ঢের ঘুঁটে দিয়েছি।"

মাধবী ঘুঁটে দিতে দিতে সহাস্তে বলিল, "আমি তখন বড় হইনি, তাই।"

"তা বটে। তুই কার কাপড় সেলাই করছিলি? তোর কাপড় কি ছিঁড়ে গেছে মা?"

"না বাবা, আমার কাপড় ছিঁড়ে যাবে কেন? অশোক দাও তো তাঁর বাবার মত দু'তিন খানা কাপড় আমাকে দিয়ে থাকেন, তুমি ও তো দাও। বিপিন খুড়োর মেয়ের কাপড় সেলাই করছিলাম, খুড়ী তো সেলাই করতে সময় পায় না।"

"তার সেলাই তোর মত ভাল হয় না, তাই বল। বকবে ব'লে তোর মা'র কাছে বুঝি সে কথা বলিস নি?"

মাধবী হাসিল, পিতার কথার জবাব দিল না। গোবিন্দ দাস হাত ধুইতে গেল। হাত ধুইয়া আসিয়া সস্নেহে মেয়ের কপালের চুল গুলি সরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাজার কি আনতে হবে বল্ মা। আজ যে হাটবার।"

"আজ নাই বা গেলে বাবা, গরুর ঘরটা নিয়ে সকাল থেকে বড় খেটেছ। আমি যদি তোমার ছেলে হতাম, তবে এসব কাযে তোমাকে এত খাটতে হতো না।"

গোবিন্দ দাস মনে মনে বলিল, "আমার মেয়ে হাজার ছেলের সেরা।"

মাধবী আবার বলিল, "আমি তোমার ছেলে হ'লে তুমি খুব খুসী হ'তে, নয় বাবা?"

পিতা কন্যাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "না মা। তা না হ'লে ছেলের দরদ এমন করে কে বুঝত? আমি মা-ই ভালবাসি, জন্ম জন্ম যেন আমার মাকেই পাই। আমি ছেলে চাইনে। ছেলের অভাব তো আমার কখনো মনেও হয় না মা।"

মাধবী লজ্জায় গর্ব্বে মুখ নত করিয়া তাড়াতাড়ি ঘুঁটে দিয়া যাইতে লাগিল। গোবিন্দদাস কিছুকাল পলকহীন চোখে মেয়ের আনত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া দাওয়ায় যাইয়া তামাক সাজিয়া খাইতে বসিল। তামাক খাওয়া শেষ হইলে ছাতা ও গামছা খানি হাতে লইয়া মেয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার বল্ মা, কি আনতে হবে।"

পিতাকে হাটে যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া মাধবী বলিল, "হলুদ আর তেল আনতে হাব, ডালও কিছু আনতে হবে। আর ভাল তরকারী যদি কিছু পাও।"

"তোর মায়ের পাণের কথা বল্লি না যে মাধু?"

"সে তো তোমার জানাই আছে?"

গোবিন্দ দাস চলিয়া গেল। মাধবী ঘুঁটে দেওয়া শেষ করিয়া হাত পা ধুইয়া ঘরের কাযে লাগিয়া গেল। ঘরের জিনিসগুলা অগোছাল হইয়া ছিল। সেগুলি গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতে দিতে সে মৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল, "আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাইগো।"

গানটা আর অগ্রসর হইতে পাইল না। তুলসী মঞ্জরী আসিয়া বলিল, "ভবেছিলাম, আর আসব না।"

মাধবী তুলসীকে আদর করিয়া বসাইয়া স্মিত মুখে বলিল, "আমি তা জানতাম।"

তুলসী উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "জানতিস যদি তবে চার পাচ দিনের মধ্যেও একদিন গেলিনে কেন? আমাদের বাড়ী গেলে কি তোর জাত যেত নাকি?"

"আমাদের তো জাত যাবার উপায় নেই ভাই, শ্রীচৈতন্য দেবের ব্যবস্থা।"

"অত শত জানিনে। তা তুই একটি বারও গেলিনে কেন, বল।"

"আমি তো ভেবেছিলাম, রাই কিশোরীর মান ভাঙ্গাতে ব্রজ কিশোরই এসে হাজির হয়েছেন।"

"সে তো আসেনি আজও। বড়ীতে আর টিকতে পারলাম না, তাই তোর কাছে ছুটে এসেছি ভাই।"

মাধবী সুর করিয়া বলিল, "বিরহ আগুনে জ্বলিয়া!"

তুলসীমঞ্জরী বৈষ্ণবের মেয়ে, বিরহ জিনিসটা তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয় না। সে কাব্য উপন্যাস না পড়িয়াও শব্দটার অর্থ বুঝিত। সে সতেজে সজোরে বলিল, "বিরহ কিসের? আমি তার জন্তে ভেবে ভেবে মরি কি না।"

তার পর একটু খানি ভাবিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেদিন আখড়ায় একটা কথা শুনে এলাম। সে কি সত্যি ভাই মাধবী?"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

তাহার কণ্ঠে বিস্ময় বা আগ্রহের আভাসও নাই, দেখিয়া তুলসী একটু বিস্মিতা হইল, বলিল, "সেদিন আখরায় এক বড় বাবু তোর গান শুনে নাকি তোকে একটা আংটি দিয়ে গেছেন। সত্যি?"

মাধবী বাক্স হইতে আংটিটা বাহির করিয়া আনিয়া তুলসীকে দেখাইয়া বলিল, "এই তো সেই আংটি।"

তুলসী আংটিটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল, "এর দাম কত হবে মাধবী?"

মাধবী বলিল, "কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশী হবেনা।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তুলসী বলিল, "এ-ত টা-কা? একটা গানের দাম?"

মাধবী কথা বলিল না, সুপারী কুচাইতে লাগিল। তুলসী বলিল, "সেই বাবুটি নাকি ঝুলনের ক'দিনই এসেছিলেন, মোহান্তের কাছে তোর খোঁজও করেছিলেন।"

মাধবী নিরুদ্ধ ক্রোধকে উচ্চহাস্যে রূপান্তরিত করিয়া বলিল, "তারপর সেদিন তোর দেখা পেয়ে বুঝি খুব খুশী হ'য়ে গেলেন?"

এই রসিকতায় তুলসীমঞ্জরী হাসির আবেগে প্রায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমি তোর মত সুন্দর, না গলা অমন মিষ্টি? দুধের সাধ কি ঘোলে মিটে? যা হোক এতদিনে আমার মাধবী লতার কপাল খুললো, ঠাকুর দর্শনের পুণ্যির ফল অমনি হাতে হাতে।"

এই নারী সমাজের এই রূপ চিরন্তন পরিহাস মাধবীর গা সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ কেন যেন ইহা তাহার কছে অত্যন্ত কদর্য্য ঠেকিল, ইহা যেন তাহার দেহমন বিষাইয়া তুলিল। তবু সে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "না ভাই, কোন আশাই নেই, বৃন্দাবন বাবু জাত বৈষ্ণব নন্।"

মাধবীর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তুলসী আরও খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল, "তাতে কি আসে যায়? মন যখন মজেছে, তখন কণ্ঠী বদলটাও হ'য়ে যাবে।"

তুলসীর মেয়েটি এতক্ষণ সকলের অলক্ষ্যে একখানা ছুরি লইয়া নিজের মনে খেলা করিতেছিল। ছুরিটা কিছুক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার বোধ হয় মনে হইল, ইহা একটা সুস্বাদু খাদ্য। তাই সে ছুরিখানা মুখে দিল। মুখে দিয়া আবার টানিয়া বাহির করিতেই কচি ঠোঁট খানি কাটিয়া গেল। বেদনা পাইয়া মেয়েটি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাধবী ও তুলসী ব্যস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল, রক্তারক্তি কাণ্ড। তুলসী সভয়ে ব্যস্তভাবে মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইল। মাধবী পরিষ্কার ভিজা নেকড়া লইয়া মেয়ের ঠোঁট পরিষ্কার করিয়া দিল। মেয়েকে শান্ত করিতে দু'জনেরই কিছু

সময় লাগিল। শেষে মেয়ে শান্ত হইয়া খেলা করিতে নামিলে তুলসী অত্যন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠে অপরাধীর মত বলিল, "মাধবী, একখানা চিঠি লিখে দিবি ?"

মাধবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়, কা'র কাছে রে ?"

"আমার ননদের বাড়ী।"

"কেন, সেখানে কেন ?"

তুলসী এবার মুখ নীচু করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "এত দিনতো বাড়ী ছেড়ে কখনো সে থাকে না ; কি জানি, অসুখ বিসুখ হ'লো নাকি ?"

হাসিতে হাসিতে মাধবীর মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া তুলসী লজ্জিতা হইল। মুহূর্ত্তপরে সে মাথা তুলিয়া দর্পিতার ভঙ্গিতে বলিল, "তার অসুখের জন্তে আমার ভারি ভাবনা কিনা। তবে খবর না নিলে বাড়ী এসে বকতে পারে তো !"

কিন্তু তুলসীর সুরে তেজ তেমন বাজিল না। মাধবী তাহাকে বিশেষ করিয়াই জানিত; সে আর কথা কাটাকাটি না করিয়া চিঠি লিখিয়া দিল। তুলসী চিঠি ডাকঘরে দেওয়াইবার জন্ত উঠিয়া গেল।

তুলসীকে কোন মতে বিদায় দিয়া মাধবী আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তবে বৃন্দাবন বাবুর আংটি ও মাধবীকে লইয়া আখড়া বাসিনীদের মধ্যে অনেক আলোচনাই হইয়া গিয়াছে! স্বামীর চিন্তায় মন খারাপ থাকায় তুলসী হয়তো সব কথা বলিতেও পারে নাই। এই শ্রেণীর নারীর রসনায় এ হেন মুখরোচক চর্চ্চা যে কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং তাহারা যে অবশেষে কি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে, তাহা অনুমান করা ত কিছু মাত্র কঠিন নয়। এই সব কথা যদি সালঙ্কারে অশোকের কাণে উঠে? ব্যর্থ রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায় মাধবীর মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। তবু ভাগ্য যে মা বাবা সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু মোহান্ত লোকটা কি দুষ্ট! সে কিনা আশাতীত প্রণামী পাইয়া প্রতিদানে বৃন্দাবনের তৃপ্তি সম্পাদনের জন্ত মাধবীকে এমন ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত করিয়া তুলিল! মাধবী মোহান্তকে কোন দিনই শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করিবার কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। ঠাকুর্দ্দা না বলিলে সে কিছুতেই সে গাহিত না। কিন্তু এমন অনুরোধ করিতে তাঁহারই বা গরজ হইল কেন ?

"মাধু, কৈ মা, তুমি ?"

পিতার আহ্বানে চমকিত হইয়া মাধবী ব্যস্ত পদে বাহির হইয়া আসিল। তারপর পিতার হাত হইতে বাজারের জিনিসগুলা নামাইয়া রাখিয়া তাহাকে হাত মুখ ধুইবার জন্ত জল গামছা আনিয়া দিল। গোবিন্দ দাসের হাত মুখ ধোয়া হইলে তাহাকে তামাক সাজিয়া দিল।

রাত্রে আহারাদির পর মাধবী আজ একটু সকাল সকাল শুইতে গেল। অন্তদিন শুইবার আগে সে গোবিন্দ দাসকে খানিকটা ভাগবত বা চৈতন্ত চরিত পড়িয়া শুনাইত। গোবিন্দ দাস ভাবিল, শ্রান্তি বশতঃ মাধবী শুইয়া পড়িয়াছে, সে আর কিছু বলিল না। ঘণ্টা খানেক পরে মাধবীকে নিদ্রিতা ভাবিয়া সে স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "আমার কাছে এসে একটা কথা শোন।"

স্বামীর রকম দেখিয়া রাসমণি ভীতা হইল। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা গো? আমার যে ভয় করছে।"

"আজ বৃন্দাবন সা'র চাকরটা আমায় বললে, বাবুর মা বলেছেন, গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, তোমার মেয়ে যেন মাঝে মাঝে তাঁকে গান শুনিয়ে আসে। শুনলে, বেটার আস্পর্দ্ধা!"

"সে মুখ পোড়াকে কি বল্লে তুমি ?"

"আমি বল্লাম, আমরা গরিব বটে, কিন্তু আমাদেরও মান ইজ্জত আছে। কিন্তু কথায় কি হয়? বেটাকে দু'ঘা বসিয়ে দিতে পারলে ঠিক হ'তো। আমার মেয়ে যাবে গান শোনাতে! হুঁ্যাঃ! বেটার কি আস্পর্দ্ধা!"

"আমার সঙ্গে দেখা হ'লে খ্যাংড়াপেটা ক'রে দেব। আমি কতদিন না তোমাকেও বলেছি, সোমত্ত মেয়ে এমন ভাবে রাখতে নেই। কেশব কত সাধাসাধি

করছে, এখনো রাজি হও—কি বল? কথা কইছনা কেন?"

"আচ্ছা, ভেবে দেখছি" বলিয়া গোবিন্দ বোধ করি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। নিদ্রিত মাধবী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর সে পারিত পক্ষে আখড়ায় যাইবে না, গান গাহিবে না, মোহান্তর কোন কথা শুনিবে না। রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না, যাহা হইল, তাহাও স্বপ্নময়। সে অধীর ভাবে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

নারীর সম্মান ও অবরোধপ্রথা

পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নারী-চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কেহ বা তাহার নাম দিয়াছেন নারী বিদ্রোহ, কেহ নারী জাগরণ, কেহ বা অন্য কিছু। নারীর অধিকারের পরিপন্থী যতগুলি বিষয় অন্যান্য দেশে আছে, আমাদের দেশে তার চেয়ে একটী বেশী আছে—তাহা অবরোধ প্রথা। আমাদের দেশ ও তুর্কীস্থান ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এমন কড়াকড় পর্দ্দা নাই। কিন্তু অল্পবিস্তর মাত্রায় অন্যান্য দেশেও পর্দ্দা আছে—অবশ্য আমাদের দেশের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

'আমাদের দেশ' এখানে একটু সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইল—তাহা আমাদের বাংলা দেশ। কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের পর্দ্দাপ্রথা ভীষণ রকমের শক্ত জিনিষ।

কেহ কেহ মনে করেন যে আমাদের দেশে পূর্ব্বে অবরোধপ্রথা আদৌ ছিল না। একথা খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও অসূর্য্যম্পশ্যা নারীর উল্লেখ আছে, সুতরাং কোন না কোন প্রকারের অবরোধ প্রথা পূর্ব্বেও আমাদের দেশে ছিল—উহা মুসলমানের আনীত ও আমাদের অজানিত বস্তু নয়।

কিন্তু আমাদের অজানিত না হইলেও মুসলমান রাজত্বের সময় এই পর্দ্দা আমাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে মুসলমানদের ভয়ে হিন্দুরা অবরোধ প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করে। এ কথা কতদূর সত্য জানি না। শুধু ভয়ের বশে একটা জাতি এরূপ একটা প্রথা অবলম্বন করিল—অথচ বাঙ্গালী তখন বর্ত্তমানের বাঙ্গালী হইতে অনেক শক্তিশালী ছিল। তাই একথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশও মুসলমানদের অধীনে ছিল। সে সব দেশে ত পর্দ্দাপ্রথা এমন মারাত্মক ভাবে আধিপত্য করে না।

আমাদের বাংলা দেশে পর্দ্দাপ্রথার এরূপ আধিপত্যের দুইটী কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বত্রই বিজেতা বিজীতদের উপর নিজেদের আদর্শ চাপাইতে চেষ্টা করে এবং মুসলমানদের পক্ষে সে চেষ্টাও স্বাভাবিক। আমরা নাকি অনুকরণ করিতে জগতে অদ্বিতীয়, সুতরাং মুসলমানদের পর্দ্দার অনুকরণ করা অতি সহজেই সম্পন্ন হইল।

দ্বিতীয়তঃ বিজেতার প্রথার অনুকরণ করা স্বাভাবিকও বটে। তাঁহারা স্ত্রীলোকের প্রতি যাহা সম্মানজনক ব্যবহার বলিয়া মনে করিতেন, আমরাও তাহাই মনে করিতে লাগিলাম। এবং বেগমদের অনুকরণে

বড় ঘরের ঘরণী হইবার লোভে মেয়েরাও হয়ত তাড়াতাড়ি অন্দরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন।

তারপর আরও একটী কারণ আছে। মেয়েদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে হিন্দুদের নিজস্ব মতও খুব উদার ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুসলমান আগমনের পূর্ব্বেই আমাদের দেশে কিছু কিছু অবরোধ প্রথা ছিল—মুসলমান পর্দ্দার আগমনে সোণায় সোহাগা মিশ্রিত হইল—এবং সমাজ কর্ত্তারাও উহাকেই সমাজের আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ভারতের অন্যান্য জাতির উপর মুসলমান আদর্শ এত কার্য্যকর হয় নাই। তাহার নানা কারণ আছে। তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান অবস্থার দিকে এখন একবার দৃষ্টিপাত করা যাক্। কোনও মহিলা লিখিয়াছেন যে আমাদের দেশে অবরোধ প্রথা নাই। সু-খবর। সাপের বিষ নাই বলিলেই যদি না থাকিত তাহা খুব ভাল হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখ এই যে তাহা হয় না। সেদিন মানসীতে (আষাঢ় ১৩৩০) শ্রীমতী সরযূবালা মিত্র লিখিয়াছেন অবরোধ ভঙ্গিতে "......যাঁহারা আন্দোলন করেন তাঁহারা কি নারীজাতির মা ভগিনীর উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে পারেন?" এমন কি পথে ও সভাতে নাকি 'ভদ্র'গণ মহিলাদিগকে বিদ্রূপ করেন।

দেখা যাইতেছে যে 'আমাদের দেশ' ছাড়া আরও দেশ আছে এবং সেই সব দেশের মেয়েদের অবরোধ নাই। কিন্তু তাঁহাদের দেশের পুরুষরা নারীদের সম্মান রক্ষা করিতে জানেন, কেবল আমাদের দেশেরই 'ভদ্র'গণ পর্য্যন্ত তাহা জানেন না।

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে মেয়েদের সম্মানে তফাৎ আছে সত্য, কিন্তু লেখিকা মহাশয়া যতটা বলিয়াছেন ততটা কি? আর এই বিভিন্নতার কারণই বা কি? অন্যান্য দেশে মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন, অথচ কেহ বিদ্রূপ করে না; কিন্তু আমাদের দেশে সভাতে দেখিলেও বিদ্রূপ করে। এই দুই দেশের মেয়েদের অবস্থার বিভিন্নতার প্রধান কারণ এই যে, একটিতে অবরোধ আছে অন্যটিতে নাই।

অবরোধের জন্য আমাদের দেশের মেয়েরা জড়ভরত হইয়া আছেন, অন্য দেশে নারী তাঁহার উপযুক্ত স্থানে আছেন (উভয়ের তুলনায়), সুতরাং তিনি সম্মানও পাইতেছেন।

অবরোধের ফলে ঘরের বাহিরে এই নারী আমাদের নিকট এক 'আজব চিজ্', সুতরাং এই মনোভাব থাকা পর্য্যন্ত নারীর পক্ষে উপযুক্ত সম্মান পাওয়া সম্ভবপর নয়।

নারী ও পুরুষের মাঝে অস্বাভাবিক ব্যবধানের সৃষ্টি করাতে আমাদের মনোবৃত্তিও অস্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমাদের sex consciousness লজ্জাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অস্বাভাবিক ব্যবধান দূর করাতেই তাহার প্রতীকার আছে, তাহার বৃদ্ধিতে নয়।

রাস্তায় বাঙ্গালী মহিলা দেখিলে বাঙ্গালী যত ভূতগ্রস্তের মত চাহিয়া থাকে অন্য জাতীয় মহিলা দেখিলে ততটা নয়। অপর পক্ষে কোন ইউরোপীয় একজন ইউরোপীয় মহিলা দেখিলে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না—কিন্তু বাঙ্গালীমহিলা দেখিলে একটু মুখব্যাদান করে বটে। ইহার কারণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে' যথেষ্ট প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু মানুষের 'স্বাভাবিক অধিকারে' বোধ হয় কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং নারী ও পুরুষের অধিকার "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে" সমান হওয়ার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। সুতরাং নারীরা পর্দ্দার বাহিরে আসিলে বা লেখাপড়া শিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

'যে দেশে যে বিষয় তুচ্ছ মনে করিয়া কেহ কিছু গ্রাহ্য করে না, সেই বিষয়টা যদি ভাল হয় তবে 'এদেশে তাহাতে বহু নিন্দা' হইবে কেন, আর হইলেই বা সেই ভয়ে জড়ভরত হইয়া থাকিব কেন তাহা বুঝা যায় না। সমাজ জিনিষটা আছে মানুষের সেবা করিবার জন্য, মানুষ ছাড়া সমাজ বলিয়া কোন অদ্ভুত জিনিষ নাই,

সুতরাং মানুষের পক্ষে যদি ভাল হয় তবে সমাজ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ঘরের বাহিরে আসিলেই যে লজ্জা 'বাপ বাপ ডাকিয়া ছুটিয়া পলাইবে,' সে লজ্জার অর্থ কি তাহা বুঝি না। পর্দার ভিতরে থাকিলেই যে অত্যন্ত লজ্জাবতী হওয়া যায় তাহাও সত্য নয়।

"সুতরাং যে দেশে পুরুষ নারীর সম্মানের মূল্য জানে না সে দেশে অবরোধ প্রথা না মানিয়া উপায় নাই।" লেখিকা মহাশয়ার কথা যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে যে 'এ দেশে' কতকগুলি পশু পুরুষ আছে মানুষ নাই। 'নারীর সম্মানের মূল্য জানে না' অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন কালেই নয়? তাঁহার কথাটা সত্য বলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই দেশেই না "যত্র নারী তত্র গৌরী" বচন প্রচলিত ছিল? আজ যদি সে দেশের অধঃপতন হইয়া থাকে, নারীর দুর্দ্দশার [লেখিকা মহাশয়া সম্ভবতঃ 'দুর্দ্দশা' স্বীকার করিবেন না] জন্ম কতটুকু তাহা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন কি? 'নারী পূজা' 'নারী সম্মান' 'মাতৃভাব' মুখস্থ করিলেও সমাজে পরিবারে নারীর বাস্তব অবস্থা দেখিলে সেই 'মুখস্থ' কথা 'আকাশস্থ' হইয়া যায়। সুতরাং ঘরের কোণে থাকিলে নারীর সম্মান লাভের সম্ভাবনা নাই, তাঁহাকে সমাজে পরিবারে তাঁহার উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষ শুধু আকাশের দিকে চেয়ে হাওয়া খেয়ে থাকে না, বাস্তব জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ। সুতরাং যদি নারী সত্যই তাঁহার প্রাপ্য সম্মান চান ত তাঁহাকে অবরোধের গণ্ডীর বাহিরে আসিতে হইবে, সত্যকার শক্তি স্বরূপিণী হইয়া শক্তি বিতরণ করিতে হইবে। সমাজ তখন জগদ্ধাত্রীকে সত্যকার পূজা দিবে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে ত বহু মহিলা সেই পূজা পাইতেছেন। সুতরাং দোষ এদেশের নয়, দোষ অবস্থার।

সম্মান রক্ষা করিবার জন্ম লেখিকা মহাশয়া অবরোধের মধ্যেই থাকিতে চাহিয়াছেন। অন্ত সময়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে অবরোধ নারীদিগকে কি সম্মান দিতেছে দেখা যাক্।

অমুকের (অর্থাৎ বাড়ীর ২।১ জন ব্যতীত পৃথিবীর সকলেরই) সামনে বাহির হইও না—সে দেখিয়া ফেলিবে, (আর তুমিও তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে সে কথাও বটে) দেখা মাত্রেই কিছু হয় না, সুতরাং তাহার পিছনে আরও কিছু আছে। সে কথা পিছনেই থাকুক।

গাড়ী করে যাওয়া হচ্ছে। ভীষণ গরমের মধ্যেও দরজা জানালা সব বন্ধ—শীল মোহর করিলে আরও ভাল হয়। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হইল, মানুষে দেখিয়া ফেলিবে। আচ্ছা, তার পর? তার পর আর কি? একেবারে সাড়ে সর্ব্বনাশ! বাকীটুকু পর্দার আড়ালেই থাকুক।

এই হইল অবরোধ প্রথার ও তাহার নিয়ামক মনোভাবের বিশ্লেষণ। অবরোধ নারীদিগকে এই সম্মান দিতেছে।

তাহার দুই একটা প্রমাণও দিতেছি। যখন জেনানা পার্কের কথা প্রথম উত্থাপিত হয়, তখনকার কথা মনে আছে। গোঁড়া হিন্দু সমাজের 'মুখপত্র' বলিয়া পরিচিত কলিকাতার কোন কাগজ লিখিলেন—"যদি অজাতশ্মশ্রু 'ষোল বৎসরের' কোন 'যুবক' মেয়ে সাজিয়া পার্কে ঢুকিয়া পড়ে?" অবশ্য কেবল যুবক ঢুকিলেই কিছু হয় না, তার পর 'আরও কিছু' আছে। এই মন্তব্য অশ্লীল বলিয়া "সঞ্জীবনী" মত প্রকাশ করিলে, 'মুখপত্র' মুখ জোড়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ সব 'মুখপত্রের' সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এরূপ পরিচয়ই পাওয়া যায়। অবরোধ প্রথার চরণে অঞ্জলি দেওয়ার ইহাই আশীর্ব্বাদ।

কেহ কেহ অভিজ্ঞের মতের দোহাই দিতেছেন। ভূপালের বেগমের মত দেওয়া হইয়াছে। বেগম সাহেবা বলিয়াছেন, "আমরা নিজেরাই (অর্থাৎ মেয়েরা) আমাদের জন্ম এইরূপ ব্যবস্থা (অর্থাৎ অবরোধ) করিয়া রাখিয়াছি।" বেগম সাহেবা যথেষ্ট 'অভিজ্ঞা' সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার কথা সত্য নয়। ইহার প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

"ব্যবস্থা করিতে পারিলে পর্দ্দা শিক্ষার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।" 'ব্যবস্থা করিতে পারিলে' অর্থাৎ ব্যবস্থা মোটেই সম্ভবপর নয়। "আমরা নিজেরাই পর্দ্দার ব্যবস্থা করিয়াছি" "পর্দ্দার মধ্যেই সম্মান" ইত্যাদি বলিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু মানুষ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে। 'ভিতরেই ভাল, বাহিরে ধুলা কাদা' বলিলে শৃগাল ও দ্রাক্ষার গল্প মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন তাহা চালনা করিয়া নিজের মঙ্গল করিবে বলিয়া, পরের কথার উপর জীবন মরণের ভার দিবে বলিয়া নয়। সংসারটা গতিশীলও বটে সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে না পারিলে, আর যাহাই হউক না কেন, মঙ্গল হইবে না। সুতরাং 'হিতোপদেশের' শ্লোকের সাহায্যে পথ নির্দ্দেশ করিতে গেলে ঘুরপাক খাওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা।

যে হেতু পুরাতন তদ্ধেতু বহু মূল্যমান মনে করিয়া হাজার বছরের আবর্জ্জনা আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। আর চোখের সামনে যাহা দেখিতেছি, তাহাই সনাতন ও জাতীয় জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করা ঠিক চক্ষুষ্মানের উপযুক্ত নয়।

'হিন্দুত্বে'র দোহাই পাড়িয়া কোন প্রথার সমর্থন করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখা উচিত যে, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেও 'হিন্দুত্ব' ছিল, আর তাহা বর্ত্তমানের তথাকথিত 'হিন্দু আচার' হইতে বিভিন্ন। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রয়োজন হইলে আমরা আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিয়াছি (আর সেই জন্য বাঁচিয়াও আছি বোধ হয়) 'সনাতনত্বে'র দোহাই দিই নাই। পিছনের দিকে চাহিলেই দেখিতে পাইব যে নারীর বর্ত্তমান অবরোধ বা অন্যান্য দুর্দ্দশা পূর্ব্বে ছিল না, আর আমরা যে আন্দোলন করিতেছি তাহা অহিন্দু নয়।

মানুষ অতীতের জ্ঞান লইয়া বর্ত্তমানের সাহায্যে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলে, আর পশু বর্ত্তমানকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে একথা মনে রাখিলে ভাল হয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত।

দেশত্যাগী

(গল্প)

এতকাল পরে দেশত্যাগী সনাতন পাল হঠাৎ তাহার পূর্ব্বপুরুষের গ্রামখানিতে ফিরিয়া আসিতে গ্রামময় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের অনেকেই আসিয়া কুশলপ্রশ্নের অছিলা করিয়া তাহার এই আকস্মিক আগমনের কারণ জানিতে প্রয়াস করিল, কিন্তু সুবিধা হইল না। সনাতন সকলেরই সহিত বেশ মিষ্টমুখে আলাপ করিল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই এই লোকগুলার উৎকণ্ঠা তৃপ্ত হইতে দিল না। কারণ, এ রহস্যটুকু তাহার নিকট মন্দ লাগিল না যে, গ্রামের এই লোকগুলা তাহারই পিতৃপিতামহের এই গ্রামে তাহাকেই ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কতখানি বিস্মিতই না হইয়া উঠিয়াছে! তবে এটুকু তথ্য সনাতন অনেককেই জানিতে দিল যে এই দীর্ঘকাল প্রবাস-বাসের ফলে সে এখন একজন রীতিমত পাশ-করা ডাক্তার হইয়াছে। কেহ কেহ এই আনন্দ-সংবাদে একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া কহিল,—আহা, বেঁচে থাক, বাবা, বেঁচে থাক! নিবারণ দাদার ছেলে তুমি, সেও তো বড় একটা কেউকেটা ছিল না। দেশটা একেবারে ছেড়ে দিলে বাবা, তা নইলে আর ভাবনা কি ছিল বল!

কিন্তু, দুইদিনের ভিতর এই সব শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভাবনা সত্যসত্যই দূর হইয়া গেল। কেন না, সকলেই দেখিল, সনাতন তাহার অর্দ্ধভগ্ন ভিটাটুকুর রীতিমত

সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আটদশজন রাজমিস্ত্রী ও মজুরে মিলিয়া শীঘ্রই নিবারণ পালেদের প'ড়ো বাড়ী খানার চেহারা বদ্‌লাইয়া ফেলিল। এবং সদর দরজার মাথার উপর একখানা ছোট সাইনবোর্ড আঁটিয়া দেওয়া হইল, তাহাতে লেখা রহিল,—"গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বিচক্ষণ চিকিৎসক—শ্রীযুক্ত সনাতন পাল। সকালে বিকালে গরীবদের বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া থাকেন।" গ্রামের লোকেরা সাম্‌নে অনর্গল. সহানুভূতি এবং জনান্তিকে নানারকমের কাণাকাণি সুরু করিয়া দিল।

তবে, ইহার কারণও একটু ছিল। সনাতনের এই দেশত্যাগের ভিতরে যে একটা পঙ্কিল কাহিনী প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তাহার দাগটুকু আজও অনেকের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। অতি শৈশবেই সনাতন মা-বাপ হারাইয়া তাহার এক বিধবা পিসীমার স্নেহে বড় হইয়াছিল। পৈতৃক বিষয়-আশয় তাহার যাহা ছিল, তাহা হইতে বেশ স্বচ্ছল ভাবেই তাহাদের দিন কাটিয়া যাইত। উপরন্তু, পিসীমার যত্নে সনাতন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া লেখা-পড়া আরম্ভ করিয়াছিল। বাল্য হইতেই তাহার মেধার পরিচয় পাইয়া স্কুলের শিক্ষকগণ তাহাকে রীতিমত উৎসাহ দিতেন এবং ভালবাসিতেন। কিন্তু, লেখাপড়া শিখিলেও সে তাহার উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত স্বভাবটাকে সংশোধন করিতে শিখে নাই; এবং এই জন্যই বোধ করি সে তাহার গ্রামের অনেকেরই বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল।

যখন তার বয়স সতের-আঠার বৎসর, সেই সময় সনাতনের পিসীমার স্বর্গলাভ হইল। সনাতন তখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। পিসীমাকে হারাইয়া সে খুব খানিকটা কাঁদিল। কলিকাতায় তাহার এক জ্ঞাতি-খুড়া থাকিতেন, তিনি সনাতনকে নিজের কাছে লইয়া আসিতে চাহিলেন, কিন্তু, সনাতন গ্রামের মায়া ত্যাগ করিতে পারিল না। ফাঁকা বাড়ীতে সে নিজে-হাতে রন্ধনাদি করিয়া পেট ভরাইতে লাগিল, তবু গ্রাম ছাড়িয়া গেল না।

সনাতনের বাড়ী হইতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে গ্রামের কতকটা প্রান্তভাগে নীলমণি মল্লিকের বাড়ী। প্রথমা স্ত্রীর বন্ধ্যাবস্থায় মৃত্যুর পর নীলমণি এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়া অতি সত্বর একটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিল, এবং তাহার নাম রাখিয়াছিল পদ্মাবতী। পদ্মার বয়স সনাতনের অপেক্ষা বছর পাঁচ-ছয়ের ছোট। প্রতিদিন স্কুলে যাইবার সময় সনাতন দেখিত, মল্লিকদের বাড়ীর সাম্‌নেকার বকুল গাছটার তলে এই ছোট সুন্দর মেয়েটী অপরাপর ছেলেমেয়ের সহিত খেলা করিতেছে। কোন দিন বা সে একা বসিয়াই একরাশ ঝরা বকুলফুল জড় করিয়া মালা গাঁথিতেছে। প্রত্যহ এই জায়গাটা দিয়া যাইবার সময় সনাতন অন্ততঃ দু'একমিনিট অপেক্ষা না করিয়া স্কুলের দিকে পা বাড়াইতে পারিত না। দু'চারিদিন সামান্য খুঁটিনাটি সূত্র ধরিয়া সনাতন এই মেয়েটীর সহিত সাধিয়া গিয়া আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পদ্মা অত্যন্ত মুখচোরা ও লাজুক বলিয়া এ আলাপটুকু জমিতে চাহিত না।

এম্‌নি করিয়া দিন কাটিতেছিল। সনাতন পদ্মা দুজনেই বড় হইল। বাল্যের গণ্ডী কাটাইয়া পদ্মা কৈশোরে পা দিয়া, স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মত ঢল ঢল করিতে লাগিল, এবং সনাতনও যৌবনের কুহক-স্পর্শে এই রূপরাশি সম্যক্ উপলব্ধি করিবার মত দৃষ্টি পাইল। সনাতন এখনও তেমনি করিয়া স্কুলে যাইত, কিন্তু পদ্মা আর সে অতীতের মত সেই বকুলতলায় বসিয়া খেলা করিত না বা মালা গাঁথিত না। তথাপি সনাতনের ব্যাকুলদৃষ্টি প্রত্যহ এই জায়গায় আসিয়া মল্লিকদের বাড়ীর চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছাড়িত না। হতাশ হইয়া সে স্কুলে যাইত; কিন্তু সেখানে পড়াশুনায় মন দিতে পারিত না। বাড়ী ফিরিয়াও সে পদ্মাকেই ভাবিত। এবং এই লইয়া কত সম্ভব ও অসম্ভব রঙীন কল্পনারাশির ভিতর নিজেকে হারাইয়া ফেলিত।

হঠাৎ একদিন দুইজনের দেখা হইয়া গেল। স্কুলের পথে বড় দীঘিটার এক কোণে যে একটা ঝাঁকড়া

বটগাছ আছে, তাহারই নীচে বই-খাতা নামাইয়া রাখিয়া সনাতন জল খাইবার জন্ত ঘাটের দিকে যাইতেই চমকিয়া উঠিল। যাহার কথাটা সে একান্ত তন্ময়ভাবে এতক্ষণ ভাবিতে-ভাবিতে আসিতেছিল, সেই যে ঐ ঘাটের জলে বুক পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া! সনাতনের মনে হইল, সত্যই যেন ঐ দীঘির মৃদুসঞ্চালিত কালো জলের উপর একটা দেবতাবাঞ্ছিত পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে! প্রথমটা সে কোন কথাই কহিতে পারিল না। পরে একমুখ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিয়া উঠিল, "কি ভাগ্যি! আজকাল যে আর দেখাটি পাবার যো নেই!"

কিশোরীর সিক্ত গণ্ড দুটী একটা রক্তিম মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল। সে লজ্জায় মাথা নামাইয়া লইল। কিন্তু, সনাতনের বুকের ভিতরটা যেন হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত উঠিতে পড়িতে লাগিল। এক আঁজলা জল খাইয়া সে ঘাট হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু স্কুলে গেল না। বটগাছটার গুঁড়ির আড়ালে সে চোরের মত লুকাইয়া রহিল।

স্নান সারিয়া পদ্মা বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেই হঠাৎ সনাতন আড়াল হইতে একেবারে তাহার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। পদ্মা শিহরিয়া উঠিল। ত্রস্তমুখের উপর খানিকটা হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "স্কুল যাওনি?"

সনাতন সোজা জবাব দিল, "নাঃ স্কুলে যাব না।" বলিয়া হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া পলকমধ্যে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "পদ্মা, আমি তোমায় বিয়ে করবো। তুমি আমার হবে ত?"

এমন হঠাৎ এ কথাটা পদ্মা স্বপ্নেও আশা করে নাই। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া সে অস্ফুটে কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল।

নীলমণি মল্লিকের বাড়ী দীঘি হইতে বড় বেশী তফাতে নহে। সনাতন পদ্মার হাত না ছাড়িয়া উন্মত্ত আগ্রহে কি একটা কথা বলিবার পূর্ব্বে ইতস্ততঃ চাহিতেই দেখিতে পাইল, খানিকটা দূরে স্বয়ং নীলমণি মল্লিক। সনাতনের মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গেল; পরমুহূর্ত্তেই সে পদ্মার হাত ছাড়িয়া বইগুলি বগলে তুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সেদিন যখন সে স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যার তারাটী পূর্ব্বাকাশে দিপ্‌দিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। চোরের মতই সনাতন ধীরে ধীরে তাহার নির্জ্জন ঘরে ঢুকিয়া একেবারে মাদুরের উপর শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। বাড়ীর বাহিরে আসিতেই যেন তাহার মাথায় সহসা বজ্রপাত হইল। তাহার বাড়ীর সাম্‌নে লোকে লোকারণ্য, প্রায় সমস্ত গ্রামখানার লোক আসিয়া সেখানে জড় হইয়াছে। ভিড়ের ভিতর হইতে দুই তিনজন লোক আসিয়া সনাতনের হাত ধরিয়া ফেলিল। এবং সনাতন ইহার কোনরূপ কৈফিয়ৎ চাহিবার পূর্ব্বেই, ঝঞ্ঝাপাতের মত কিল ও চড় নির্ব্বিচারে তাহার দেহের সর্ব্বত্র পড়িতে সুরু হইল। সনাতন ধরাশায়ী হইল। পড়িয়া-পড়িয়া দেখিল, ভিড়ের এক পাশে দাঁড়াইয়া নীলমণি মল্লিক গম্ভীর মুখে একটা থেলো হুঁকায় টান দিতেছে।

২

ইহাই হইতেছে সনাতনের দেশত্যাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সে তার বিষয়-আশয় সমস্তই বিক্রয় করিয়া খুড়ার কাছে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই ভিটাটুকু পরহস্তগত হইতে দেয় নাই। মনে-মনে সে দিন যে কল্পনাটুকু করিয়া সে তার বাটীতে চাবি দিয়া গিয়াছিল, আজ—এতকাল পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিল। ডাক্তারি পাশ করিবার পর এতদিন সরকারী চাকুরীতে ঘুরিয়া সে বেশ দু'পয়সা জমাইয়া লইয়াছিল। তাহারই জোরে সে এখানে আসিয়া স্বাধীন ব্যবসা সুরু করিয়া দিল। সহর হইতে শীঘ্রই সে একটি ছোটখাট ঘোড়া কিনিয়া আনিল; তাহাতে চড়িয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে লাগিল।

সেদিন বিকালবেলা সে যখন পাশের একখানা গ্রাম হইতে নিজের গ্রামে আসিয়া ঢুকিল, সেই সময় তাহার নজরে পড়িল, তাহার বামপার্শ্বেই খানিকটা দূরে সেই বড় দীঘিটার পানে। এই দীঘির পানে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন কি একটা বিষম ঘা খাইয়া আহত হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় কাহার এক আকুল কান্নায় সন্ত্রস্ত হইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, একটী সুন্দর সুকুমার বালক তাহার ঘোড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হইতে গিয়া হোঁচট খাইয়া একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেছে। সনাতন তড়াক্ করিয়া ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িল। ছেলেটীর কপালের খানিকটা জায়গা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সনাতন তাহার গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া, একটু জলের জন্ত ঘাটের দিকে আসিতেছিল, কিন্তু মধ্যপথেই তাহাকে থামিতে হইল। সাম্‌নেই সে দেখিল, একটী যুবতী একটা কলসী কক্ষে লইয়া সেই দিকে আসিতেছে, তাহার পিছনে আরও একটি শিশু। সনাতনের দেহের রক্ত মুহূর্ত্তের জন্ত নিশ্চল হইয়া পড়িল, কেন না, বারেকের দর্শনেই সে চিনিয়াছিল—রমণী সেই পদ্মা ছাড়া আর কেহই নহে! পদ্মা ত সহসা এই সাক্ষাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড়টা জোরে টানিয়া দিতে গেল। কিন্তু সনাতন ততক্ষণে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল,—"তোমারই ছেলে বুঝি? ঘোড়াটার ভয়ে ছুটতে গিয়ে পড়ে গেছে। একটু জল কপালে দাও।"

বলিয়া বালককে কোল হইতে পদ্মার নিকট নামাইয়া দিল। পদ্মা কলসী হইতে জল লইয়া ছেলের ললাটে দিতে-দিতে কহিল, "দস্যি ছেলে যদি একটু দাঁড়িয়ে থাবে! আপনি না দেখতে পেলে ত—"

সনাতন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া মৃদু হাসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "যে-কেউ দেখ্‌তে পেলেই এটুকু করত বোধ হয় পদ্মা! তার জন্যে আমার মোটেই বাহাদুরী নেই!' বলিয়া আর কোন কিছু না বলিয়াই সে ঘোড়ায় উঠিয়া প্রস্থান করিল। পদ্মা স্থিরনেত্রে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

সনাতনের গ্রামে ফিরিয়া আসার কথাটা অবশ্য এতদিন পদ্মার কাণে উঠিতে বাকী ছিল না; তবে, আজ এই প্রথম তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। সনাতনের পুনরাগমনের কথাটা শুনিয়া অবধি পদ্মা যদিও একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া তাহার অন্তর্যামীর নিকট এইটুকুই প্রার্থনা করিতেছিল, যেন ঐ লোকটীর সহিত তাহার জীবনে আর কখনও দেখা না হয়; তথাপি অন্তর্যামী তাহা শুনিলেন না। দেখা হইল; এবং সে দেখা এমনভাবে হইল যে, ঘোম্‌টা দিয়া বা অপর কোন উপায়ে তাহাকে ব্যর্থ করিবার উপায় রহিল না।

কিন্তু, সে যাহাই হউক, পদ্মার মনে ইহার জন্ত কোনরূপ অনুশোচনাও দেখা গেল না। বরং তাহার ছেলেটীর প্রতি সনাতনের এই সহৃদয় ব্যবহারে সে নিজের মনকে এইটুকু বুঝাইয়া একটা গভীর স্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল যে, অজ্ঞাত দিনের সেই পঙ্কিল কাহিনী—তাহারই জন্ত সমস্ত গ্রামের সম্মুখে সেই নির্য্যাতনের ইতিহাসটাকে সনাতন এখনও পর্য্যন্ত বুকের ভিতর জমা করিয়া রাখে নাই। সুতরাং সনাতন ফিরিয়া আসা অবধি পদ্মার মনের কোণে যে একখানা কুণ্ঠার মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, আজিকার এই সামান্ত ঘটনায় সেটা হঠাৎ একেবারেই পরিস্কার হইয়া গেল; উপরন্তু এ বিশ্বাসটুকুও তাহার কোমল নারী হৃদয়ে কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়া গেল যে, এই সনাতন হইতে বরং উপকারেরই প্রত্যাশা করিতে পারিবে, অপকার নহে।

কিন্তু নিজেরই মনে-মনে ভাজিয়া চুরিয়া পদ্মা এই যে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া বসিল, তাহার যাচাই হইয়া গেল—প্রায় মাসতিনেক পরে একদিনের একটা ঘটনায়। সে কথা পরে বলিতেছি।

৩

এই সুদীর্ঘ ৭।৮ বৎসরের ভিতর নীলমণি মল্লিকের সংসারের অনেকটাই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। বছর ৫।৬ হইল নীলমণি সংসার ছাড়িয়া মহাপ্রস্থান করিয়া-

ছিল। মৃত্যুর বছরখানেক পূর্ব্বে সে পদ্মার বিবাহ দিয়াছিল; এবং স্নেহের মেয়েটাকে চোখের আড়াল করিবার ভয়ে পাত্রের নিকট হইতে ঘরজামাই থাকিবার প্রতিশ্রুতি লইয়াছিল। জামাতাও সহজেই ইহাতে সম্মত হইয়াছিল, কেন না, সংসারে আপনার বলিতে তাহার বড় একটা কেহ ছিল না।

কিন্তু, ব্যাপারটা যত সোজা বলিয়া নীলমণি ভাবিয়াছিল, তত সোজা হইল না। নীলমণির মৃত্যুর সময় সকলেই সংবাদ পাইল যে, তাহার স্ত্রী পাঁচ মাস গর্ভবতী। যথাসময়ে মল্লিকগৃহিণী এক পুত্র প্রসব করিলেন। পদ্মার প্রাণে আনন্দ ধরিল না।

কিন্তু, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার মাতার ব্যবহারে পদ্মা ও তাহার স্বামী এই সত্যটাকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিল যে, তাহার পিতার পরিত্যক্ত যা-কিছু জমী-জায়গা, তাহার উপর ষোল-দাবীদাওয়া এখন এই ক্ষুদ্র শিশুর—তাহাদের নহে। বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে পদ্মার জননী ছেলে কোলে করিয়া বাপের বাটী চলিয়া গেলেন, এবং সেখান হইতে শীঘ্রই কন্যাজামাতাকে জানাইয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে বড়-জোর বসত বাটিখানি ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু জমীজমার উপস্বত্ব কিছুই পাইবে না। পদ্মা চোখের জল মুছিতে-মুছিতে স্বামীকে সহরে চাকুরীর চেষ্টায় পাঠাইয়া দিল।

সেদিন দীঘির ধারে সেই সাক্ষাতের পর আরও কয়েকদিন সনাতন ঐ দিকে যাইতে যাইতে দুই তিনটি হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে ধূলাবালি লইয়া খেলা করিতে দেখিয়াছিল। সনাতনের ঘোড়া ছুটিতে দেখিলেই শিশুগুলি হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। সনাতন প্রায়ই ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাদের একটু আদর করিত, কোনদিন বা তাহাদের ভিতর যেটী সবচেয়ে বড়, তাহার হাতে দু'একটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া পিঠ চাপড়াইয়া, নিজের পথে চলিয়া যাইত। কিন্তু, প্রতিবারেই যেন এমনি করিয়া এই পরের ছেলে কয়টিকে আদর করার জন্য তাহার নিজেরই মন অশান্তভাবে বিদ্রোহ করিতে চাহিত। সনাতন জোর করিয়া এই অনুযোগের কণ্ঠরোধ করিয়া নিজের কাযে মন দিত।

* * *

আষাঢ় মাস। কয়দিন হইতেই আকাশে সূর্য্যের বড় দেখাসাক্ষাৎ নাই। পদ্মা তাহার রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া ছেলেদের ভিজা জামা-কাপড় ও কাঁথাগুলি লইয়া একে একে আগুনের তাপে ধরিয়া শুকাইয়া লইতেছিল, সেই সময় দুলেদের মুটুর মা পদ্মার বড় ছেলে পটলকে কোলে লইয়া বাড়ী ঢুকিয়াই কহিল, "এই নে বাছা তোর লক্ষি ছেলের কাণ্ডটা দেখ্!"

পদ্মা মুখ ফিরাইতেই পটল খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে আসিয়া একেবারে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুটুর মা কহিল, "বোসেদের বাড়ীর ঐ ভাঙ্গা ইটকাট গুলোর ওপর বসে' সব খেলা হচ্ছিল; হঠাৎ পা পিছলে পড়ে' গিয়েছে। একটু চুণ কি আর কিছু গরম করে' পা'টায় দিয়ে দাও, নইলে ভারী ব্যথা হবে।"

পদ্মা ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার হাঁটুর উপর চুণ গরম করিয়া দিতে লাগিল; কিন্তু ছেলে অনবরত দেহের নানাস্থানে যন্ত্রণার উল্লেখ করিতে করিতে শেষে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈকালে কিন্তু পদ্মা ছেলের গায়ে হাত দিয়াই বুঝিল, তাহার স্পষ্ট জ্বর দেখা দিয়াছে। সে উঠিয়া বসিল বটে, কিন্তু নড়িতে-চড়িতে যেন তাহার নিতান্তই কষ্ট হইতে লাগিল। পদ্মা শঙ্কিতচিত্তে তাহাকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া পাঁচটী পয়সা তাহার মাথায় ঠেকাইয়া তুলসীতলায় পুঁতিয়া রাখিল।

কিন্তু পয়সার লোভে দেবতা ভুলিলেন না। দিন শেষ হইয়া সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, পটল ততই প্রবল জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িতে লাগিল। পদ্মা মাথায় হাত দিয়া বসিল। স্বামী বিদেশে; মাস শেষ হইয়া আসায় তাহার হাতের পয়সাও ফুরাইয়া গেছে। তাহার উপর, গ্রামে যে স্বল্পাস্থ হাতুড়ে ডাক্তার মহাশয় এতদিন তাহাদের চিকিৎসা করিতেন, কিছুদিন যাবৎ তিনিও অসুখে পড়িয়া। এ অবস্থায়—

একা এই রুগ্ন ছেলেকে লইয়া পদ্মা কি করিবে তাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠিল না। একবার ভাবিল, সহরে লোক পাঠাইয়া স্বামীকে আসিতে বলে, কিন্তু, কাল সকালে ভিন্ন কেহই এই বর্ষায় ততটা পথ ভাঙ্গিয়া সহরে যাইতে চাহিবে না!

পদ্মা ছেলের শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া জানালা খুলিয়া দেখিল, বাহিরে টিপি টিপি বৃষ্টিও সুরু হইয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিল। তাহার মনে হইল, তাহাকে একাকিনী এই দুর্দ্দশায় ফেলিয়া দেবতারাও যেন রহস্য দেখিতেছেন। দুই চোখের ধারা নীরবে তাহার গাল বাহিয়া বুকের কাপড় ভিজাইয়া দিল। জানালা বন্ধ করিয়া পুনরায় সে ছেলের কাছে বসিল। একপাশে মিট্‌মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই আলোকে সে ছেলের মুখখানির পানে চাহিয়া স্তম্ভিতার মত বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পটল দুই চোখ কপালে তুলিয়া আবোল-তাবোল দুইচারিটা কি বকিতে সুরু করিতেই পদ্মার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি খানিকটা ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া সে ছেলের কপালে জলপটী লাগাইয়া বাতাস করিতে লাগিল। একটু পরেই পটল ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন সেই নিস্তব্ধ ঘরে একা রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া বসিয়া পদ্মার মনে হঠাৎ আশার খানিকটা উজ্জ্বল রশ্মি বিজলীর মত দীপ্ত হইয়া উঠিল। এই একান্ত দুঃসময়ে সে আর-একজনের শরণাপন্ন হইতে পারে ত! তাহার এই বিপদে সনাতন কি তাহাকে সাহায্য করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। সে ত আসিয়া অবধি ছেলেগুলির প্রতি বরং স্নেহের ব্যবহারই করিয়া আসিয়াছে!

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া পদ্মা এই সনাতনের প্রসঙ্গটা লইয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল; তাহার ফলে তাহার ক্ষীণ আশাটুকু আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

ছুলেদের মুটুর মা প্রতিরাত্রে আহারাদির পর পদ্মার বাড়ীতে শুইতে আসিত। আজ সে আসিয়া পৌঁছিতেই সজল চোখে তাহার পানে চাহিল। মুটুর মা ব্যাপার দেখিয়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িল। পদ্মা কিন্তু সহসা চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুটুর মা'কে বলিল, "তুমি এইখানে ততক্ষণ বোসে একটু বাতাস কর না ছুলে পিসী, আমি একটুখানি আসচি!"—বলিয়া সে একখানা গামছা টানিয়া লইয়া একেবারে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪

আজ এই অলস বাদল-রাত্রে একা বিছানার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া পড়িয়া সনাতন আকাশ-পাতাল কি যে সব ভাবিতেছিল, তাহার আদি-অন্ত বোধ করি সে নিজেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না। কিছুতেই তাহার চোখে আজ নিদ্রা আসিতে চাহিল না। পড়িয়া-পড়িয়া সে একে একে তিন চারিটা সিগারেট পুড়াইয়া ফেলিল, তথাপি তাহার চোখের পাতা ঢুলিয়া আসিল না। তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তাক হইতে একটা সাদা বোতল বাহির করিয়া তাহার উদরস্থ খানিকটা তরল পদার্থ গেলাসে ঢালিয়া পান করিয়া ফেলিল। পরে গেলাস ও বোতল যথাস্থানে রাখিয়া সে যেমন আলো নিবাইয়া শয়ন করিতে যাইবে, অমনি সদর দরজায় কাহার ঘন করাঘাত শুনিয়া সে বাহিরে আসিল। উঠানে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই হস্তস্থিত হরিকেনের আলোটা যাহার মুখের উপর পতিত হইল, আজ এই অবস্থায় তাহার নিজেরই তাহাকে দেখিবার কল্পনা বোধ করি সনাতন অতি-বড় বিকারের ঝোঁকেও করিতে পারিত না। বিভ্রান্তের মত সে পিছাইতে গিয়া পড়ি-পড়ি করিয়া রহিয়া গেল। পরে আত্মসম্বরণের জন্য নিজের ভিতর দ্বন্দ্ব করিতে করিতে কোন রকমে বলিয়া ফেলিল, "পদ্ম! বড্ড জল, উপরে এস—"

পদ্মা দাওয়ায় উঠিয়া আসিয়া মাথার ভিজা গামছাখানা খুলিয়া কম্পিতস্বরে কহিল, "বড্ড বিপদে পড়ে

আজ আমি তোমার কাছে এসেচি, আমার বড় ছেলে পটলের বড্ড জ্বর—"

সনাতন স্তব্ধভাবে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পদ্মার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; কথাগুলা তার কাণে গেল কিনা সন্দেহ। ধীরে ধীরে সে পশ্চাতের তক্তাখানার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "হুঁ, তারপর? আমার বাড়ীতে আজ—"

পদ্মা আবার কহিল, "আমার ছেলে,—পটলের বড় জ্বর—"

"ছেলের জ্বর"—আপনা-অপনিই সনাতনের মুখ দিয়া কথাটা প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু যেন সে ইহার ঠিক অর্থবোধ করিতে পারিল না। নির্জ্জন রাত্রে একাকিনী এই যুবতীর পানে চাহিয়া-চাহিয়া তাহার মস্তিষ্কের শিরায়-শিরায় যেন সেই কোন্ অতীতের অগ্নিময় স্মৃতিটাই তখন উপদ্রব সুরু করিয়াছিল। এই কথাটাই যেন একটা বিরাট পাষাণের মত অটল হইয়া তাহার হৃদয়ের উপর চাপিয়া বসিতেছিল, একদিন সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়া নিতান্ত নির্ম্মমভাবে তাহাকে যে অপমান করিয়াছিল, সে শুধু এই ইহার জন্যই! ইহারই জন্য সে দেশত্যাগী হইয়াছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত সে থাকিয়া থাকিয়া নিজের জীবনের চারিপাশে একটা কলঙ্কের ঘৃণিত গণ্ডী অনুভব করিয়া আসিতেছে। তাহার এই সমস্ত দুর্দ্দশার জন্য দায়ী এই—এই পদ্মা ছাড়া আর কেহই নহে!

পদ্মা অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "তুমি কি ভাব্‌ছ? বড় বিপদ বলেই আজ আমি—"

হঠাৎ সনাতন খাড়া হইয়া বসিল। মুখ কুঁচ্‌কাইয়া তিক্তহাসি হাসিয়া কহিল, "তা জানি পদ্মা! বড় বিপদ বলেই তুমি এসেছ! কিন্তু, তবু আস্‌তে হয়েচে। আচ্ছা, ভেবে দেখ দিকি, আজ এই অন্ধকার রাত্তিরে যদি কেউ তোমায় আমার বাড়ীতে একলা দেখে, তা হলে কি ভাববে?"

পদ্মার ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপর যেন কোন বিষধর সর্প একটা ছোবল বসাইয়া দিল। কিন্তু বাড়ীতে পীড়িত পুত্রের মুখ মনে পড়িতে সে ইহাও সামলাইয়া ফেলিল। কোনরকমে শুধু বলিল, "তুমি আমায় মাপ কর। একথা আজও তুলছ কেন?"

সনাতন আবার তেমনি অস্বাভাবিক ভাবে হাসিল। বলিল, "কেন তুলছি? আজই তো একথা তোল্‌বার পরম সুযোগ পেয়েছি পদ্মা!"

পদ্মা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি, পটলের আমার বড় অসুখ—তাকে বাঁচাও! হাতে আজ আমার একটা টাকাও নেই; তাই তোমার কাছে—"

সনাতন হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "টাকা? কিছু দরকার নেই। আমি যাচ্ছি চল! তোমার ছেলের অসুখ, আমি দেখবো না? আলবৎ দেখবো। তার জন্যে আমার যা কিছু পাওনা সে তো তুমি শোধ দিয়েছ পদ্মা! আজ এই নিঝুম রাত্তিরে বাড়ীতে তোমায় যে এতক্ষণ আমি একলা পেয়েছি, তার বদলে আমি আজ তোমার জন্যে মরতেও পারি যে!"

পদ্মা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পাশের দেওয়ালটা ধরিয়া ফেলিল। সনাতনের এই কুৎসিত ইঙ্গিত তাহার বুকের যে যায়গাটায় গিয়া আঘাত করিল, তাহার কাছে পুত্রের বিপদাশঙ্কাও মুহূর্ত্তের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে কাঁদিতেও পারিল না। শুধু একবার ক্রুদ্ধ আহতের মত গ্রীবা বাঁকাইয়া চোখ তুলিয়া বলিল, "থাক্, আর তোমায় যেতে হবে না। তোমার সে অপমানের চারগুণ শোধ তো তুমি আজ নিয়ে নিলে! আমি চল্লুম—"

বলিয়া সেই আর্দ্র নৈশ বাত্যার মতই একেবারে সে দাওয়া হইতে নীচে নামিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সনাতন যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, সেই অবস্থায় পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে যখন পুনরায় সেই তক্তার উপর বসিয়া পড়িল, তখন মনে হইল, তাহার দেহের ভিতরকার যা-কিছু শক্তি, সমস্তই যেন তাহাকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

৫

সে রাত্রিও প্রভাত হইল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া সনাতন যখন ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন আজিকার এই জাগরণ তাহাকে এক জন্ম হইতে জন্মান্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে। অনেকক্ষণ সে সেই বিছানাতেই উবু হইয়া বসিয়া থাকিয়া, পরে মুখ হাত ধুইয়া একেবারে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

এখান হইতে সাধারণ পথ না ধরিয়া একটা পুকুরের ধারে ধারে গেলেও নীলমণি মল্লিকদের বাড়ী যাওয়া যাইত। সনাতন একা এই দিক দিয়া তেঁতুল গাছের তলায় তলায় অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মল্লিকদের বাটীর হাত চার পাঁচ দূরে একটা শেওড়াগাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক নিস্তব্ধ, এত নিস্তব্ধ যে, সনাতনের বুকের পাঁজরগুলা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সনাতন আরও একটু অগ্রসর হইল; ভাবিল এখনো হয় ত ইহারা ঘুমাইতেছে। পীড়িত ছেলেকে লইয়া পদ্মা নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সে যখন আসিয়াছে, তখন আজ তাহার ছেলেকে দেখিয়া যাইবে; পদ্মা যত আপত্তি করুক শুনিবে না। আর, যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কাল রাত্রের ব্যবহারের জন্ম পদ্মার কাছে—

হঠাৎ সনাতনের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। বাড়ীর ভিতর হইতে কে অস্পষ্ট ভাঙ্গা গলায় গোঙাইয়া গোঙাইয়া কাঁদিতেছে না? সনাতন আরও কাছে সরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইল না। কান্নার শব্দ এবার উচ্ছ্বসিত হইয়া এই নিস্তব্ধতা ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল,—"বাবারে আমার! আমার মাণিক! ঘুম কি আর তোর ভাঙবে না ধন?"

সনাতনের চারিপাশে সমস্ত নীরব প্রকৃতি যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া প্রলয় নৃত্য সুরু করিয়া দিল। একান্ত ত্রস্ত এবং নিঃসহায় ভাবে সে গাছের আড়ালে যেন আত্মরক্ষার জন্যই দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। পরে কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই একরকম ছুটিতে ছুটিতে সে সেই এলোমেলো পতিত জমির উপর দিয়া ফিরিয়া চলিল। তার মনে হইতে লাগিল, পিছনে পিছনে অসংখ্য অশরীরী হিংস্র প্রাণী যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে!

* * * *

অমন লক্ষ্মীপ্রতিমা পদ্মার ছেলেটির এই আকস্মিক মৃত্যুতে সারা গ্রামে একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। কিন্তু আজ সমস্ত দিনরাত্রির ভিতর কেহই আসিয়া সনাতন ডাক্তারকে খুঁজিয়া পাইল না; এবং তার পরের দিন সকলেই আসিয়া দেখিল, ডাক্তারের বাড়ী পূর্ব্বের মতই চাবিবদ্ধ রহিয়াছে, আর দরজার মাথার সাইনবোর্ডখানিও কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

হিন্দী সাহিত্য

আজও আমাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন হিন্দী সাহিত্যের নাম শুনিলে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিতে ছাড়েন না, "রাবিশ—কাটখোট্টা ভাষা!" তাঁহাদেরই সন্দেহ ভঞ্জনের চেষ্টায় আজ সাহসে ভর করিয়া হিন্দী সাহিত্যের একটী গৌরব গরিমার উজ্জ্বল চিত্র লইয়া উপস্থিত হইলাম—কতদূর যে ইহাতে সাফল্য লাভ করিব তাহা বলিতে পারি না।

বর্ত্তমান হিন্দী সাহিত্যে উন্নতি অবনতি প্রায় কিছুই হয় নাই; ভাষা বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থির ভাবে আছে। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা থাকা

সত্ত্বেও বর্ত্তমান যুগে এক বাঙ্গালা সাহিত্য ভিন্ন আর ইহা কোনও প্রাদেশিক সাহিত্য অপেক্ষা হীন নয় একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দীভাষা অন্য কোনও ভাষা অপেক্ষা ভাব প্রকাশ ক্ষমতায় হীন নয় একথা যাঁহারা এই ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় রাখেন তাঁহারাও স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমি যে যুগের আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি, সে যুগে হিন্দী-সাহিত্য ছিল রসের ভাণ্ডার, ধর্ম্মের খনি, প্রেমের সাম্রাজ্য। যাঁহারা সে সময় হিন্দী-সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের অনুপম রসভাব, সুললিত-শব্দ বিন্যাস চাতুরী ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাস্তবিক অনেক স্থলেই প্রশংসার্হ। তাঁহাদের ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যের তুলনায় জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাও অনেক স্থলে হীনপ্রভ হইয়া যায়।

এখন বটে ইহার গৌরব লুপ্ত হইয়াছে, এখন বটে ইহার সৌভাগ্য সূর্য্য ম্লান হইয়াছে, এখন বটে ইহার কুঞ্জে সেরূপ উচ্ছ্বাসময়ী গীতি আর শ্রুত হয় না। এখন ইহার ছন্দের সেরূপ লালিত্য নাই,—ভাষার সে তেজ নাই,—ভাবের সে মাধুর্য্য নাই;—কিন্তু একদিন অনেক শ্রেষ্ঠ কবিই ঊষার অরুণ কিরণের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া হিন্দী-কাব্য-কুঞ্জের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ বিষাদের সুরে-বাঁধা বীণাহস্তে আসিয়া হিন্দী-কাব্যে করুণ রসের গীতি রচনা করিয়াছিলেন, প্রণয়ের মাধুরী যেরূপ সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যেরূপ ভক্তি-রসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন—আমার বিশ্বাস তাহা জগৎ-সাহিত্যের তুলনায় কাহারও অপেক্ষা কোন বিষয় হীন নয়।

স্বীকার করিতেই হইবে এক সময় হিন্দী-সাহিত্যের গৌরব ও গরিমার দিন ছিল। তখন কবিতা কানন হইতে কবিরা নানা পুষ্প চয়ন করিয়া হার গাঁথিয়া কবিতা সুন্দরীকে নানা সাজে ভূষিত করিতেন। তাঁহাদের ঝঙ্কৃত বাণী সর্ব্বত্রই এক নবীন আনন্দের উৎস বহাইয়া দিত। তাঁহাদের আশ্বাসবাণী উত্তর ভারতের ঘরে ঘরে শান্তির সংবাদ বহিয়া আনিত—সঙ্গে সঙ্গে সব গৃহ হইতেই হাসির ফোয়ারা ছুটিত; তাঁহারা হিন্দি-কাব্য কাননে কমলবাসিনী বাণীর চরণে যে সব কবিতাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পদতলে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বালিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আসন জগতের শ্রেষ্ঠ-কবি-সমাজে উচ্চ স্থানেই নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু জগৎ যে তাঁহাদের চেনে না, জগৎ তাঁহাদের সাহিত্যের সহিত পরিচিত নয়। "চিনিল না কেহ, জানিল না কেহ" তাঁহারা ধরার পান্থশালা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেউ না চিনুক—তাঁহারা যে নিজেদের কবিতায় নিজেরাই মুগ্ধ ছিলেন নিজেদের সৌরভে নিজেরাই আমোদিত হইতেন। তাঁহারা জগতের অন্তরালে চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছেন। আর তাঁহাদের হৃদয়-কুঞ্জে ফুল ফুটিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিবে না। কিন্তু তাঁহারা যে সাহিত্য-তপোবনে অগুরু সৌরভ ছড়াইয়া গিয়াছেন, সেই সাহিত্য চিরদিনই নবীন সাহিত্যিকদিগের হৃদয়ে তাঁহাদের স্মৃতি জাগ্রত রাখিবে।

আজ বঙ্গভাষা এতদূর সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিয়াছে যে, বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ইংরাজীর সমকক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু একদিন হিন্দী-ভাষা ইহার চেয়েও উচ্চ শিখরে পৌছিয়াছিল—তাহার ভাগ্যাকাশে প্রভাতের তরুণ তপনের ন্যায় এক এক দিক্‌পাল কবি উদিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার মত হিন্দী-সাহিত্যও সমগ্র ভারতে নিজের প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিল।

বঙ্কিমবাবুর অমূল্য উপন্যাসগুলি ও গীতাঞ্জলি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি অনুবাদিত হইবার পর হইতে ভারতীয় অন্যভাষা-ভাষীর ভিতর অনেকে বঙ্গভাষার বিশাল তরুমূলে আশ্রয় লইবার জন্য আকুল আগ্রহে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এই উন্নতির মূলে আমরা হিন্দী-ভাষাকেই বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের

প্রায় সমস্তই শ্রেষ্ঠ পুস্তকের অনুবাদ করিয়া হিন্দী ভাষা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিতেছে, তাহার জন্তই বিভিন্ন প্রদেশে বঙ্গভাষা শিখিবার আগ্রহ দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; বঙ্গভাষা নিজের আধিপত্য সমস্ত ভারতে দৃঢ় করিতেছে। ইহাতে যে হিন্দী-সাহিত্য উপকৃত হইতেছে না তাহা নয়, কিন্তু আমাদের সাহিত্যও ইহাকে আশ্রয় করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছে।

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সাহায্যে আমার এক বন্ধু "বঙ্গবীণা" নাম দিয়া আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে একখানি হিন্দী পুস্তক লিখিয়াছেন—তাহার প্রচার অতি দ্রুত হইতেছে। ইহার অনুবাদ মারাঠী গুজরাতী প্রভৃতি ভাষায় অতি শীঘ্রই হইবে—ইহাতে যে বঙ্গভাষার প্রতিপত্তি আরও বাড়িবে সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। পুস্তকটী পড়িয়া হিন্দী ও অন্যান্ত ভাষাভাষী দিগের মধ্যে বাঙ্গলা-ভাষা শিখিবার আগ্রহ যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা আমি সচক্ষে দেখিয়াছি। ইহা দেখিয়াই হিন্দী সাহিত্যের এক কবি-বন্ধু অনুযোগ করিয়াছেন যে, আমরাও যদি বাঙ্গলা-মাসিকে হিন্দী-সাহিত্যের আলোচনা মাঝে মাঝে করি (যেমন রসিক বাবু করিতেন) তাহা হইলে হিন্দীর অনেক উপকার হয়।

প্রথম যুগ।

(৭০০ হইতে ১৩৪৩ সম্বৎ অবধি)

হিন্দী ভাষা বিশেষ করিয়া যুক্ত প্রদেশ, বিহার, বুন্দেলখণ্ড, বঘেলখণ্ড, ছত্তিসগড় আদিস্থানে প্রচলিত। ধরিতে গেলে আমাদের বাংলাদেশ ছাড়া সমস্ত উত্তর ও মধ্য ভারতে হিন্দী নিজের প্রাধান্ত বিস্তৃত করিয়াছে, এই স্থানের বাসিন্দাদের ইহাই মাতৃভাষা। ইহার উৎপত্তির বিষয়ে মতভেদ আছে। কাহারও মতে ইহা দেবভাষা সংস্কৃতের একটী অংশ অথবা কন্যা বলিলেও চলে—এবং অনেকের মতে ইহার জন্ম প্রাকৃত ভাষা হইতে—হিন্দি প্রাকৃত ভাষারই এক আকৃতি। ডাক্তার গ্রীয়ারসন ইহার জন্ত অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দীর অধিকাংশ ক্রিয়া প্রাকৃত হইতে বাহির হইয়াছে, অনেকগুলি আবার সংস্কৃত ফারসী আদি ভাষা হইতেও বাহির হইয়াছে। শেষ সকল শব্দকে হিন্দী সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফারসী, আরবী, ইংরাজী, চিনী, ফ্রেঞ্চ আদি ভাষা হইতে আমদানি করিয়াছে।

পণ্ডিতগণের মতে হিন্দী তিনটী প্রধান ভাগে বিভাজিত - পূর্ব্বী, মাধ্যমিক ও পশ্চিমী। ইহার অতিরিক্ত রাজপুতানী ও পঞ্জাবী ভাষার একটী নূতন বিভাগ "ঠেট পশ্চিমী" মিশ্র বন্ধু দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধ গুজরাতী আদি ভাষার সহিতও আছে। হিন্দী হইতে অনেকগুলি শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে—যেমন মৈথিলী, মগধী, ভোজপুরী, আবধী, বঘেলী, ছত্তীসগড়ি, উর্দ্দু, রাজপুতানী, ব্রজভাষা, কনৌজী, বুন্দেলী, বাগরু, দক্ষিণী আদি ভাষা। এতগুলি শাখা প্রশাখা কিছু সহসা বাহির হয় নাই—ইহার বিকাশ বহু শতব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে হইয়াছে। একটি ভাষা বহুদূর চলিতে চলিতে ক্রমে অন্য অন্য ভাষার আকৃতি ধারণ করে। ঠিক এই দশা হিন্দী ভাষারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাই ইহার উপশাখা এতগুলি। ইহাই একমাত্র কারণ যে হিন্দীর উৎপত্তিকাল কেহই নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই।

কোন কোনও পণ্ডিতের মতে হিন্দীর উৎপত্তি ৭০০ সম্বতে হইয়াছে। কারণ পুষ্য নামক প্রথম হিন্দী কবি ৭৭০ সম্বতে দোহা ছন্দে একটি অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কর্ণেল টডও "রাজস্থানে" হিন্দী সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থের রচনাকাল ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম হিন্দী কবি পুষের কোনই রচিত কবিতা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। চিতোরের রাণা খুমণি ৮৬৯ হইতে ৮৯০ সম্বত পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে মুসলমান ভারত আক্রমণ করে, সেই সময় বহু রাজা দ্বারা খুমণি সাহায্য পাইয়াছিলেন। হিন্দুর সমস্ত শক্তি যদি এক জায়গায় হয় তাহা হইলে জগতের কোন শক্তিই

তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। মুসলমানও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়—ইহারই বর্ণনা কোন ভাট কবি দ্বারা সেই সময় বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে পুস্তকটীও নষ্ট হইয়াছে। কর্ণেল টড রাজস্থানে বলিয়াছেন এই ভাট কবি রচিত "খুমান রাসো গ্রন্থের অনুকরণে সম্রাট আকবরের সময় আর একটী খুমানরাসো লিখিত হয়। ফিরদৌসী হইতে জানিতে পারা যায় ১০৭৫ সম্বতের কাছাকাছি সুলতান মহম্মুদ কালিঞ্জর আক্রমণ করেন। তখন রাজা নন্দ বুদ্ধিমানের ন্যায় মহম্মদের প্রশংসায় একটী উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সুলতান এই প্রশংসায় আনন্দিত প্রাণে কলিঞ্জর আক্রমণ করিবার বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করেন। উপরন্তু অনেকগুলি দুর্গ দিয়া রাজার মনস্তুষ্টি করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে রাজা নন্দও একজন কবি ছিলেন।

সাদের পুত্র অস উতও একজন হিন্দী প্রেমিক ছিলেন। ইঁহার রচনাকাল ১১৮০ সম্বৎ। কুতুব আলি নামে একজন মুসলমান কবি হিন্দিকাব্যে একটী প্রার্থনাপত্র রচিত করিয়া শোলাঙ্কীর রাজা জয়সিংহের নিকট পাঠান। রাজা জয় সিংহের রাজত্বকাল ১১৫০ হইতে ১২০০ সম্বত অবধি। অতএব কবি কুতুব আলিও নিশ্চয় নিজের কবিতাগুলি এই সময়ের মধ্যেই রচনা করেন। বিকানির নিবাসী কবি দান "সম্বত সার" নামীয় গ্রন্থ ১১৯১ সম্বতে প্রণয়ন করেন! বর্ত্তমান কাব্যের প্রণেতা কবি আকরাম কৈজ ১২০৫ হইতে ১২৫৮ সম্বত পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্য রচনা করেন, সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তরত্নাকর পুস্তকও অনুবাদিত করেন। ইঁহার আশ্রয়দাতা ছিলেন জয়পুর নরেশ মাধোসিংহ। তাহার পর হিন্দী সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি চন্দ বরদাঈ প্রকাশিত হইলেন।

দেখিতে গেলে চন্দ বরদাঈই হিন্দি সাহিত্যের প্রথম কবি। ইঁহার গ্রন্থ "পৃথিরাজ রাসো" হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তকের তালিকাভুক্ত। হিন্দী সাহিত্যের নবজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে ইঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইঁহার জন্ম অনুমান ১১৮৩ সম্বতে লাহোরে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই আজমীরে বাসা বাঁধিয়া ছিলেন এবং সেই স্থানেই পৃথ্বীরাজের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। তিনি পৃথ্বীরাজের শেষ অবস্থা অবধি তাঁহার নিত্য সহচর ছিলেন। ইঁহারই সাহায্যে পৃথ্বীরাজ শাহবুদ্দিন গোরীকে তীর দ্বারা মারিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কবি চন্দ প্রণীত 'রাসো' হইতে জানিতে পারা যায় সে যুগে রাজা মহারাজদিগের দরবারে হিন্দীর যথেষ্ট আদর ছিল। সে জন্য হিন্দী কবি প্রায় সকল রাজসভায় শোভাবর্দ্ধন করিতেন। ইহা হইতে সহজে অনুমান করা যায় সে যুগে ছোট বড় অনেক কবিই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের নাম কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। এই যুগে জানিত কবির মধ্যে কোনই ব্রাহ্মণ কবি হিন্দী সাহিত্য রচনা দ্বারা সাহায্য করেন নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে সে যুগের ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতকেই শুধু সম্মান করিতেন হিন্দীভাষা তাহাদের নিকট তুচ্ছ নগণ্যের মধ্যে ছিল।

এই খানে "হিন্দী সাহিত্যের" প্রথম যুগ শেষ হইল। এই যুগে কবি চন্দ ও তাঁহার পুত্র কলহনের রচনা ছাড়া আর কোনও কবির কবিতা এখনও অবধি হস্তগত হয় নাই। এই যুগের হিন্দী প্রাকৃত ভাষার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিল যদিচ ইহাতে হিন্দীর ভাব বেশির ভাগটা আসিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় যুগ।

(সম্বৎ ১৩৪৪ হইতে ১৪৪৪ অবধি)

প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ কবি চন্দ ও তাঁহার পুত্র কলহন ছাড়া দ্বিতীয় যুগের প্রথম গ্রন্থ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ১৩৪৪ সম্বতে লিখিত ভূপ ত কবি বিরচিত "ভাগবত দশমস্কন্ধের" হিন্দী অনুবাদ। ১৩৫৩ সম্বতে নাল্হ নামে এক কবি বীষলদেব রাসো গ্রন্থের রচনা করেন।

ইহার ও কবি চন্দের ভাষায় অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইঁহার ভাষা 'রাজপুতনা" ভাষার কোণ ঘেঁসিয়া গিয়াছে এবং ইঁহার কবিতাও সাধারণ।

নল্লসিংহ কবি "বিজয় পাল রাসো" নামক গ্রন্থ ১৩৫৫ সম্বতে প্রণয়ন করেন। রাজা বিজয়পাল গ্রন্থ কর্ত্তা নল্লসিংহকে সাত শত গ্রাম এবং আরও অন্যান্য বহুমূল্য সামগ্রী পারিতোষিক স্বরূপ দিয়াছিলেন। পুস্তকের ভাষা প্রাকৃত মিশ্রিত। অনুমান ১৩৫৭ সম্বতে রণথম্ভোরের অধীশ্বর হম্মীরদেবের রাজ দরবারে অবস্থান কালে কবি শার্ঙ্গধর "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" "হম্মীর কাব্য" ও "হম্মীর রাসো" নামে তিনটি পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার ভাষা বর্ত্তমান ব্রজ ভাষার সহিত অনেকটা মেলে।

উক্ত কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খুসরো নামে জনৈক মুসলমান কবি হিন্দী সাহিত্যে উদিত হইলেন। তাঁহার পরই মহাত্মা গোরখনাথের কবিতাকাল আরম্ভ হয়। খুসরো পারস্য ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যেও তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। ইনি হিন্দী ভাষায় অনেক গুলি পুস্তক প্রণেতা। ইহাঁর সময় পারস্য ও হিন্দি ভাষার সংমিশ্রণে এক নূতন ভাষা উর্দ্দুর সৃষ্টি হয়। ইঁহার মৃত্যু ১৩৮২ সম্বতে হইয়াছিল। মহাত্মা গোরখনাথের কবিতাকাল ১৪০৮ সম্বৎ। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থের লেখক। ইনি আবার "গোরখনাথ পন্থ" আবিষ্কার করেন। হিন্দী সাহিত্যের প্রথম গদ্য-লেখক মহাত্মা গোরখনাথ—হিন্দী-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় থাকিবেন, কারণ তিনিই প্রথমে গদ্য লেখার প্রচলন হিন্দী-সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করেন।

এই কালে পূর্ব্বকাল অপেক্ষা হিন্দী আশাতীত ফল ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই যুগে হিন্দী প্রাকৃতের হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে হিন্দী-ভাষা সুরদাস ও তুলসীদাসের সময় অন্য আকার ধারণ করিল। এই যুগে মহাত্মা গোরখনাথ আবার গদ্য-রচনার সৃষ্টি করিয়া হিন্দী-সাহিত্যের আসন আরও উচ্চে তুলিয়া দেন। এই যুগেও অনেক ছোট বড় কবি হিন্দী-সাহিত্যাকাশে নব-রবি তেজে প্রকটিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সময়ের গুণে তাঁহাদের গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নামও চিরদিনের জন্য হিন্দী-সাহিত্য হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

এই যুগেরও অতি অল্প কবির রচনা হস্তগত হইয়াছে। যদি হিন্দী-সাহিত্য-প্রেমিকদিগের অনুসন্ধিৎসার উৎসাহ এইরূপ বজায় থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনেক ফললাভ হইতে পারে।

পূর্ব্বে প্রেম-কাব্যের অত্যন্ত অভাব ছিল—হিন্দী-সাহিত্য রাজা মহারাজদিগের গুণকীর্ত্তনেই ব্যস্ত ছিল। অনেক কবিই এই পথের পথিক ছিলেন। অবশেষে ভূপতি কবি ভাগবতের অনুবাদ করিয়া সকলের জন্য একটা নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন। সহসা হিন্দী-কবিদিগের মন ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সেই জন্য শাস্ত্রানুবাদ ও ধর্ম্ম প্রচারের নিদর্শন আমরা তৃতীয় যুগে দেখিতে পাই। মহাত্মা গোরখনাথ ইহার বীজ আরও দৃঢ়রূপে রোপিত করিলেন। কিন্তু মুসলমান কবি চিরদিনই প্রেমিক—তাঁহারা যেমন প্রেমের মহিমা বোঝেন, তেমন অতি অল্প কবিই বোঝেন। তাহাদের কাব্যও নারী-মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত। তাঁহারা নিজেদের কাব্যে বেশীর ভাগ স্ত্রীজাতির বন্দনা করিতেই ভাল বাসেন। এই পথের পথপ্রদর্শক দাউদ ও খুসরো। দেখাদেখি অন্যান্য কবির হৃদয়েও প্রেমের ঢেউ খেলিল। এক দিকে ধর্ম্মের তরঙ্গ, অন্য দিকে প্রেমের উৎস—কবিদিগের হৃদয়ে আপন আপন আধিপত্য দৃঢ় করিল। রাজা মহারাজাদিগের গুণকীর্ত্তন এই দুইয়ের স্রোতে ভাসিয়া গেল। কবি চন্দ কিন্তু পৃথ্বীরাজ রাসো লিখিয়া একাধারে প্রেমধর্ম্ম ও গুণ কীর্ত্তন এক স্থানে বাঁধিয়া দিলেন। সে জন্য তাঁহার একটী মাত্র গ্রন্থ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—সুধী সমাজে তাই তাঁহার এত আদর।

এই দুই যুগের মধ্যে কবি চন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁহার গ্রন্থ "পৃথ্বীরাজ রাসো" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। দুই যুগেই কেহ কোন ভাষা স্থির করিতে পারেন নাই।

চন্দ প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষায় রচনা করিতেন; দ্বিতীয় যুগে "অবধী" "ব্রজভাষা" "রাজপুতনা" "পাঞ্জাবী" ইত্যাদি সব ভাষাই কবিরা ব্যবহার করিতেন। মহাত্মা গোরখনাথ পূর্ব্ব প্রান্তে বাস করিতেন, তবুও তিনি ব্রজভাষাকে নিজ রচনায় বাহন করেন। সে সময় ব্রজভাষা ছাড়া আর কোন ভাষায় গদ্য রচনা আরম্ভ হয় নাই। মহাত্মা গোরখনাথই প্রথম ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন যিনি হিন্দী সাহিত্যকে উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় যুগ।

(সম্বৎ ১৪৪৫ হইতে ১৫৬০ পর্য্যন্ত)

এই যুগের প্রথমেই কবি বিদ্যাপতির আবির্ভাব। তাঁহার ঝঙ্কৃত বাণী, যে সময় বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের কাব্যকুঞ্জে পুষ্প চয়ন করিতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সমস্ত বাংলা দেশে শান্তির উৎস বহাইয়া দিতেছিলেন। প্রভু চৈতন্যদেব ইঁহার কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইতেন। ইঁহার নাম চিরদিন ভারতবর্ষে সজাগ থাকিবে—কারণ বঙ্গ-ভাষা যেমন বিদ্যাপতিকে নিজের সন্তান বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, হিন্দী ভাষাও সেইরূপ তাঁহার আদর করেন। হিন্দী-সাহিত্যে ইনিই প্রথমে "হিন্দি-বাণী"কে নাট্য সাহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম হিন্দী সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার বলিয়া চিরস্মরণীয় থাকিবে।

চিতোরের রাণা কুম্ভ ১৪৭৯ হইতে ১৪৬৯ পর্য্যন্ত সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইনিও একজন হিন্দী-ভাষায় কবি ছিলেন। বহু হিন্দী কবিকেও তিনি নিজের সভায় আশ্রয় দিয়াছিলেন। "গীত গোবিন্দের" সরল টীকা ইনিই করিয়াছিলেন—কিন্তু গ্রন্থটী এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অনেকের মতে প্রসিদ্ধ মীরাবাঈ ইঁহারই পত্নী ছিলেন, কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

তাহার পর হিন্দী সাহিত্যে পরে পরে এই যুগে স্বামী রামানন্দ, নারায়ণ দেব, জয়দেব, সেননাথ, ভবানন্দ, রোহিদাস, মহাত্মা অঙ্গদ, উমাপতি, কবীর, চরণ দাস, নানক—ইত্যাদি অনেকানেক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই যুগে ধর্ম্মের ঢেউ সমস্ত ভারতবর্ষেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যাপতি ও জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও নিজেদের গানের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন। এই যুগটী সাধুসন্ন্যাসীরই যুগ ছিল। মহারাণা কুম্ভ হিন্দী-কবিদিগকে আশ্রয় দিয়া হিন্দীর গৌরব আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। হিন্দী-সাহিত্য চতুর্দ্দিকে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাজা মহারাজাদিগের মঙ্গল কীর্ত্তন ধর্ম্মের জোরে চাপা পড়িল—ধার্ম্মিক সাহিত্য নিজের আসন আরও দৃঢ় করিল। সঙ্গে সঙ্গে দামো ও কুতবন চন্দ আদি কবি দিগের প্রবর্ত্তিত প্রেম-কাহিনীর লিখিবার প্রণালী আরও বর্দ্ধিত হইল। এই যুগে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের জন্য ব্রজভাষার মাহাত্ম্য আরও বাড়িল।

এই তিনযুগের মধ্যে হিন্দী সাহিত্য-জগতে অনেক কবিই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতরে চন্দ বরদাঈ, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও কবীরদাস ছাড়া আর কোনও কবি এত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। অন্য প্রবন্ধে "হিন্দি-সাহিত্যের" অন্যান্য যুগের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব; হিন্দি-সাহিত্য কিরূপ উন্নতিলাভ করল তাহা বিশেষরূপে দেখাইব।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থাপ্যধন

(গল্প)

গৌড় নগরের এক ধনাঢ্য বণিকের গৃহে এক নিরাশ্রয় বালক আশ্রয় পাইয়াছিল। বণিক তাহাকে রাজপথ হইতে একরূপ কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন।

বালকের নাম ছিল কেশব। বণিক তাহাকে ভালবাসিতেন। স্বজাতীয়ের ছেলে জানিয়া চাকরের ন্যায় খাটাইতেন না। তাহার কায ছিল নারায়ণের পূজার জন্য ফুল তুলসী তোলা, এবং বণিকের কন্যা ও পুত্রকে খেলা দেওয়া। কেশব বার বৎসর বয়সে বণিকের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল। তখন বণিকের কন্যা মুক্তার বয়স পাঁচ আর পুত্র মাণিকের বয়স তিন। বণিকপত্নী কিন্তু কেশবকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। সর্ব্বদা নানা কাযে তাহাকে খাটাইতেন। তিনি স্বামীর ভয়ে পারিতেন না, তাহা না হইলে এই হতভাগাকে তাড়ানই বোধ হয় তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।

দুপুর বেলা খোকা ও খুকি মায়ের নিকট থাকিত, তাই কেশব অবসর পাইয়া বণিকের বৈঠকখানা ঘরে গিয়া তাঁহার পুঁথি সকল লইয়া দেখিত। একদিন বণিকপত্নী ইহা দেখিলেন। দেখিয়াই নিষ্ঠুরতার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ পড়া হচ্ছে! সখ্ দেখে আর বাঁচিনে!" কেশবের মুখ শুকাইয়া গেল।

পরদিন কেশব মনিবের বৈঠকখানা তালাবদ্ধ দেখিল। নদীর স্রোতের মুখে বাঁধা দিলে, সে যেমন বাঁধকে ছাপাইয়া উঠে এবং ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ এই বালকের পড়িবার ইচ্ছায় বলপূর্ব্বক বাধা দিয়া বণিক-পত্নী তাহার ইচ্ছা বাড়াইয়া দিলেন। সেই দিন হইতে তাহার সম্মুখে একখানি পুঁথি পড়িলে সেখানি না পড়িয়া সে ছাড়িত না। কাহারও নিকট একখানি ভাল পুঁথি দেখিলে সে গোপনে লিখিয়া লইত।

এইরূপে তাহার কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

(২)

তখন বঙ্গেশ্বর সুলেমান্ কর্‌রাণীর শাসনের শেষভাগ। রাজধানী টণ্ডায়। সুলেমান্ কর্‌রাণী সম্রাট্ আকবরের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিয়াছিলেন। রাজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দাউদ্ খাঁ সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। প্রথমে সামান্য যুদ্ধের পর মোগল সেনাপতি মনাইম খাঁর সহিত সন্ধি হইল। কিন্তু দাউদ কিছুদিন পরেই সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিলেন। এবার সম্রাট্ স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মোগল সৈন্যের আক্রমণ হইতে পাটনা রক্ষা করিতে পারিবেন না ভাবিয়া দাউদ পাটনা ছাড়িয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মোগল সেনাপতিগণ সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন। মোগল সেনাপতিগণ তথাপি নিরস্ত হইলেন না। কটকের নিকট উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। দাউদ পরাজিত হইলেন। আবার সন্ধি হইল। দাউদ উড়িষ্যায় অধিকার পাইলেন। সেনাপতি মনাইম খাঁ বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বঙ্গের রাজধানী পুনরায় গৌড়ে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। সৈন্য ও রাজ কর্ম্মচারিগণ গৌড়ে গেলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু দিন পরেই গৌড়নগরে মহামারী দেখা দিল। সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। মৃতের সৎকার হইল না। লোক নগর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। মনাইম খাঁও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বণিকের গৃহে কোন পীড়া হয় নাই। কেশব পূর্ব্ববৎ নারায়ণের পূজার আয়োজন করিয়া ও প্রভুর পুত্র কন্যাকে খেলা দিয়া দিন কাটাইতে-ছিল। নগরের অধিবাসিগণ পলাইতেছে দেখিয়া বণিক-পত্নী স্বামীকে গৃহ ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া-

ছিলেন। তিনি পলায়ন উচিত ভাবিয়াও অনেক দিনের পৈতৃকবাস ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ দুই চারি ঘর গৃহস্থ ব্যতীত নগরী প্রায় জনশূন্য।

একদিন তাঁহার বাটীতেও নিষ্ঠুর ব্যাধি দেখা দিল। মুক্তা একদিন প্রাতঃকালে ভেদ ও বমন করিয়া একবারে শয্যা গ্রহণ করিল। তাহার মাতা পিতা ভয়ে অস্থির হইলেন। চিকিৎসা করাইবেন, কিন্তু চিকিৎসক নাই। বণিক পত্নী কাঁদিয়া বলিলেন, "এই জন্তেই আমি বাড়ী ছেড়ে যেতে চেয়েছিলাম।"

তাঁহার স্বামী নির্ব্বাক। কেশব অনেক খুঁজিয়া একজন চিকিৎসক আনিল। চিকিৎসক ঔষধ দিলেন, সমস্তদিন ও রাত্রি মুক্তা অজ্ঞান অবস্থায় রহিল। সকালে তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতাপিতা একবারে হতাশ হইলেন। বণিক পত্নীকে বলিলেন, "যা হবার হয়েছে, এখন চল মাণিককে আর নারায়ণকে নিয়ে চ'লে যাই।" বণিক পত্নী নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। কথাটা কেশবের ভাল লাগিল না। সে ভাবিল, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা। সে আবার চিকিৎসকের বাটী গেল। গিয়া শুনিল চিকিৎসক পলাইয়া গিয়াছেন। সে আরও যেখানে চিকিৎসক থাকিতেন, সেখানে খুঁজিল। কাহাকেও পাইলনা। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলে খুঁজিল। সেখান হইতে কেহ গৌড়ে আসিতে চাহিল না। অবশেষে অপরাহ্ণের সময় সে ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল।

ফিরিয়া দেখে বাটীতে কেহ নাই। প্রাঙ্গনে মুক্তার মৃতদেহ বস্ত্রাবৃত পড়িয়া আছে। সে যাইবার সময় প্রভুকে বলিয়া যায় নাই। সে ভাবিল, বণিক সপরিবারে পলায়ন করিয়াছেন, এবং ভাবিয়াছেন কেশব পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় লোকাভাবে মুক্তার মৃতদেহের সৎকার করা হয় নাই।

কেশব মুক্তার মুখের ঢাকা খুলিল এবং অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিল। সে যে তাহাকে বড় ভালবাসিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একবার উঠিল, এবং ঠাকুর লইয়া গিয়াছেন কি না দেখিবার জন্য মন্দিরের দুয়ারে গেল। কপাট ফাঁক করিয়া দেখিল সিংহাসনে নারায়ণ শিলা রহিয়াছেন। সে ভাবিল ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় ঠাকুর লইয়া যাইতে পারে নাই।

আজ দুই দিন ঠাকুরের পূজা হয় নাই। পুরোহিত পলায়ন করিয়াছিলেন। নূতন পুরোহিত পাওয়া যায় নাই। কেশব দেখিল, দুই দিন পূর্ব্বে যে তাম্রপাত্রে ঠাকুরকে স্নান করান হইয়াছিল তাহা তেমনি মেঝের উপর পড়িয়া আছে। সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, পাত্রে চরণামৃত একটু পড়িয়া আছে। তাহার কি মনে হইল, সেইটুকু লইয়া আসিয়া মুক্তার মুখে ঢালিয়া দিল। তাহার পর কেশব তাহার মুখ নাড়িয়া সেটুকু মুখের ভিতরে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিল। আস্তে আস্তে তাহা উদরে প্রবেশ করিল। কেশব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই মুক্তা এক নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চোখ মেলিল। কেশব আনন্দে "জয় নারায়ণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মুক্তা একবার 'কেশবদা' বলিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

কেশব ভাবিল, আর তাহাকে বাহিরে রাখা উচিত নয়। সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘরের ভিতর শোয়াইল। নারায়ণের দুয়ারে শত প্রণাম করিয়া মুক্তার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

রাত্রি শেষে মুক্তা কথা কহিল। বলিল, "কেশবদা মা বাবা কোথায়?"

কেশব বলিল, "আছেন।"

মুক্তা বলিল "আমার কাছে নেই কেন?"

কেশব বলিল, "রাত জেগে তাঁরা ক্লান্ত হয়েছেন তাই ঘুমুচ্ছেন।"

মুক্তা আর কোন কথা কহিল না।

সকালে কেশব বলিল, "মুক্তা, একটু একলা থাকতে পারবে?"

মুক্তা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, মা আছেন, আমি একলা থাকব কেন?" আর না বলিলে চলে না দেখিয়া কেশব বলিল, "তাঁরা এখানে নেই।" মুক্তা চমকিয়া বলিল "কেন?" কেশব বলিল, "আমি ফিরে এসে

ব'লছি।" মুক্তা বলিল, "তোমার কত দেরী হবে?" কেশব ব'লল "তোমার জন্তে একটু দুধ আনব, লক্ষ্মীটী আমার, একটু কষ্ট ক'রে থাক, থাকবে ত?" মুক্তা বলিল, "আচ্ছা।"

কেশব কিয়ৎক্ষণ পরে দুধ আনিল, এবং জাল দিয়া ঠাকুরের ঘরে নামাইয়া দিল। সে গলায় কাপড় দিয়া যোড় হস্তে বলিল, "ঠাকুর আমি ত ব্রাহ্মণ নই, তোমার পূজা ক'রতে পারলাম না। এই দুধটুকু প্রসাদ ক'রে দাও মুক্তাকে আমার।"

গরম দুধ পান করিয়া মুক্তা সুস্থ হইল। তাহার মাতাপিতা কোথায় বলিবার জন্ম কেশবকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কেশব আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। মুক্তা শুনিয়া ভীতা হইয়া বলিল, "কেশব দা, কি হবে? কেশব আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি, আমি তোমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাব। তোমার একটু বল পাওয়ার অপেক্ষা করছি।"

দুই দিন পরে সে মুক্তাকে পথ্য রাঁধিয়া দিল। আর দুই দিন পরে ঠাকুরের সিংহাসন মাথায় লইয়া ও মুক্তাকে সঙ্গে লইয়া গৌড় নগর ত্যাগ করিয়া গেল। তখন গৌড় প্রায় জনশূন্ত হইয়াছে।

৩

গৌড় ধ্বংসের পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মনাইম খাঁর মৃত্যুর পর দাউদ খাঁ সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশ দখল করেন। কিন্তু মোগল সেনাপতি কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। বঙ্গদেশ এখন মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত।

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে একখানি গোশকট রাজমহল সহরের একটী সঙ্কীর্ণ রাস্তার উপর দিয়া যাইতেছিল। দুই দিকে অট্টালিকা শ্রেণী, মধ্যে গাড়ীখানি যাইতেছে। গাড়ীর অগ্রে অগ্রে এক যুবক। গাড়ীর বলদ ঘোড়া ও চালক ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহার অধিক ক্লান্ত হইয়াছিল অগ্রবর্ত্তী যুবক। তাহার হস্তে একটী কাপড়ের ছোট পুঁটুলি আছে। তাহা সে এক একবার মাথায় লইতেছে।

গাড়ীর চালক বলিল, "আর পারি না মশায়, এই খানেই থামালাম।" যুবক কিছু না বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া একটী বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিল, "একটু থাকবার স্থান পাব কি?" কিছুক্ষণ পরে গৃহস্থ আসিয়া বলিল "না এখানে হবে না।" তখন যুবক চালককে বলিল, "আর একটু এস বাপু, আর দুই একটা বাড়ী দেখি।" সে বিরক্তভাবে বলিল, "আপনি সমস্ত সহর খুঁজে একটু আশ্রয় পেলেন না আমার গরু আর চলছে না।"

এমন সময় দূরে একটী বাড়ীর দ্বারে এক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার শুভ্র উপবীত তাঁহার শরীরের সৌষ্ঠববর্দ্ধন করিতেছিল। তাঁহার মুখে পবিত্রতার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি যুবককে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, "কোথায় যাবে তুমি?" যুবক কহিল, "আমরা এখানে অপরিচিত, একটু আশ্রয় ভিক্ষা করি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "গাড়ীতে কে আছে?" যুবক বলিল, "আমার ভগিনী।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এইখানে গাড়ী থামাও।" গাড়ী থামান হইল।

যুবক ডাকিল, "মুক্তা বাইরে এস!" গাড়ীর ভিতর হইতে একটী যুবতী বাহির হইল। তাহার নিখুঁত সৌন্দর্য্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। বর্ষার নদীর ন্তায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের বন্তা ডাকিয়াছিল। তিনি ডাকিলেন, "এস মা, বাড়ীতে এস!" মুক্তা নামিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" যুবক বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম কেশব।"

৪

কয়েকদিন পরে ব্রাহ্মণের বহির্ব্বাটীর কক্ষে ব্রাহ্মণ ও কেশব বসিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কেশব, মুক্তা তোমার ভগিনী নয় ত, তুমি স্বচ্ছন্দে তাকে বিবাহ

করতে পারে।" কেশব বিনীতভাবে বলিল, "তাহলে স্বাপ্যধন গ্রাস করার অপরাধ হবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তার পিতা ত তাকে মৃত অবস্থায় ফেলে গিয়েছিলেন। তুমিই ত নারায়ণের কৃপায় তাকে ফিরিয়ে এনেছ। সে রত্ন নারায়ণ তোমাকেই দিয়েছেন।" কেশব বলিল, "সে আমার প্রভুকন্যা। আমি অজ্ঞাত কুলশীল। আমি তাকে বিবাহ করলে যে তার মা বাপের মর্যাদার হানি হবে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন "সে সম্বন্ধও ত কেটে গিয়েছে। আর তার মা বাপ বোধ হয় বেঁচে নেই।" কেশব বলিল "বেঁচে বোধ হয় নেই। আমি কোন স্থানও খুঁজতে বাকী রাখি নি। তাকে সঙ্গে করে প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ফিরেছি। এখন তাকে যোগ্য বরে সমর্পণ করতে পারলে আমার বুকের ভার কমে যায়।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি নিঃসম্বল, কিরূপে বিবাহ দেবে।"

কেশব বলিল, "সেই জন্তেই ত আপনার সাহায্য চেয়েছি। কয়েক স্থানে বিবাহের প্রস্তাব করে বিফল হয়েছি।"

ব্রাহ্মণ পুনরপি বলিলেন, "তুমিই বিবাহ কর, আমি বিবাহ দিব।"

কেশব বলিল, "আমি তা কিছুতেই পারব না। আমি তার পিতার আশ্রিত ছিলাম, আমি বিবাহ করলে সে মনে মনে আমাকে হেয়জ্ঞান করতে পারে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আমার পত্নীর নিকট যা জ্ঞাত হয়েছি তাতে সে তোমা ব্যতীত আর কাকেও চায় না।"

কেশব যেন কিসের একটা ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তা আমার অবিদিত নেই। যখনই তার সামনে বিবাহের কথা বলেছি, তখনই সে বলেছে কেশবদা তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তবে বিবাহের আপত্তি কি?"

কেশব বলিল, "শুধু স্বার্থ দেখলে চলবে না। আমি এখন তার অভিভাবক। যাতে সে কোন কষ্ট না পায় তা ত আমাকে করতে হবে? আমি বিবাহ করলে, তার পিতামাতা যদি এ সংসার ছেড়ে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁহাদের আত্মাও সুখী হতে পারবে না।"

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "কিন্তু আমার মনে হয় এ বিবাহে তোমরা সুখী হতে পারতে। আচ্ছা, তুমি কি তার প্রতি আসক্ত নও?"

কেশব চমকিয়া উঠিল।—ব্রাহ্মণ, দেবতা, একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

সে আর কথা কহিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর অমত করো না, আমি আশীর্ব্বাদ করছি মুক্তাকে বিবাহ করে সুখী হও।"

কেশব ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আর অনুরোধ করবেন না, আমি তার অভিভাবক। আমার সহায় হীন সম্বল হীন অবস্থা স্মরণ করে' কিছুতেই বিবাহ করতে পারব না। যাতে এইখানে একটি ভাল পাত্রে তাহাকে অর্পণ করতে পারি তা করুন। আর সময় নেই, তার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।"

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন "আচ্ছা।"

৫

ব্রাহ্মণের অনুরোধে তাঁহার এক ধনাঢ্য যজমানের পুত্রের সহিত মুক্তার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরদিন বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইল। শিবিকা প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণের কন্যা মুক্তাকে সাজাইয়া দিল।

যাত্রার পূর্ব্বে মুক্তা একবার কেশবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। দেখিল, বহির্ব্বাটীর এক ঘরে পালঙ্কের উপর কেশব উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সে তাহার নিকটে গিয়া ডাকিল, "কেশবদা—"

কেশব চকিতভাবে মুখ তুলিল। মুক্তা দেখিল

কেশবের চক্ষে অশ্রুধারা। তাহার চক্ষেও অশ্রুর বন্যা আসিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া মুক্তা কেশবের পদধূলি লইল। কেশব আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "মুক্তা, আমার দুটো অনুরোধ রাখতে হবে।"

মুক্তা গদ্‌গদ স্বরে বলিল, "কি, বল।"

কেশব বলিল, "তোমার শ্বশুর বাড়ীতে সহোদর ভাই ছাড়া আমার অন্য পরিচয় দিও না।"

মুক্তা বলিল, "সেই পরিচয়ই দিব।"

কেশব বলিল, "আর তোমার পিতার ঠাকুর আমি নিয়ে চল্‌লাম, তুমি অনুমতি দাও!"

মুক্তা বলিল, "দাদা তুমিই ঠাকুর সেবার উপযুক্ত, ও ঠাকুর এখন তোমার।"

কেশব বলিল, "যখন নিজে অক্ষম হব, তখন তোমার কাছে ঠাকুর নিয়ে আসব।"

মুক্তা বলিল, "তুমি এখন কোথায় যাবে?"

কেশব বলিল, "যেখানে হোক একটা কুড়ে বেঁধে, ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিষেক করিয়ে ঠাকুরের সেবার বন্দোবস্ত করব।"

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব।

তৎপরে মুক্তা বলিল, "আমাকে একটা জিনিষ দেবে?"

কেশব বলিল, "তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।"

মুক্তা বলিল, "বল, বিয়ে করে সংসারী হবে।"

কেশব কি ভাবিয়া লইল। পরে একটু হাসিয়া বলিল, "কেনরে, আমার ত কেউ নেই, তবে আমার বন্ধন কেন? নারায়ণের সেবায় জীবন কাটাব মনে করেছি?"

মুক্তা বলিল, "না দাদা, তা হবে না। বল বিয়ে করবে।"

এই বলিয়া সে কেশবের দুই পা ধরিল। অনেক ভাবিয়া কেশব বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

পরদিনই কেশব ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন

(প্রতিবাদ)

কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট, বিখ্যাত সাহিত্যসেবী, দেশমান্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর "কালিদাস বাঙ্গালী কি না?"—এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ শ্রাবণের সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি আমাদের "কালিদাস সমিতির" উপর একটু অবিচার করিয়াছেন। যদি আমরা উক্ত প্রবন্ধে আরোপিত বিষয়ের ষোল আনা রকম উত্তর দিতে যাই তবে তাঁহার সহিত আমাদের অকারণ বৈরিতা আসিয়া উপস্থিত হইবে।—আমাদের এই ঘরের খেয়ে পরের বেগার খাটা রূপ সাহিত্য সেবায়, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া কাহারও সহিত অকারণ বৈরিতা আনয়ন করা আমাদের "কালিদাস সমিতির" মূল উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। আমরা যে পথ ধরিয়া এতদিন এই কালিদাস-তত্ত্ব প্রচার কার্য্য চালাইতেছি, তর্ক শাস্ত্রের মতে তাহার নাম "জল্প"। অর্থাৎ আমরা কেবল আমাদের নিজেরই মত প্রচার করিব, অপরের মত খণ্ডন বা উল্লেখ করিব না। আমাদের যতীন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু

এখানে ক্ষেত্র অন্যরূপ। শ্রীযুক্ত যতীন বাবু "কৃষ্ণনগর সাহিত্য পরিষদের" একজন অসাধারণ সদস্য। তিনি যখন "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র মত প্রধান পত্রিকায় এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তখন উদাসীন থাকিলে আমাদের কৃষ্ণনগরে কালিদাস তত্ত্ব প্রচারের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। কাযেই এক্ষেত্রে যতীন বাবুর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহার আরোপিত বিষয় গুলির মধ্যে ৬টি কথায় মাত্র আমাদের পক্ষের একটু সমর্থন দিলাম।

যতীনবাবু লিখিয়াছেন—(মা ও ম, ৫০৩ পৃঃ ২য় প্যারা) আমরা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছি—আমাদের পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তকের ১৮টি কারণের মধ্যে "অধিকাংশ প্রমাণই খণ্ডিত হইয়াছে। সেই জন্য সেই পুস্তকের আর পুনর্ম্মুদ্রণ হয় নাই।"

আমাদের উত্তর—**এ কথা আমরা কাহাকেও বলি নাই।** আমরা বলিয়াছি—আমাদের প্রথম কারণটিই কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। অন্য প্রমাণের আর আবশ্যকতা নাই; সেই জন্য অপর প্রমাণ গুলি আর পুনর্ম্মুদ্রণ করা হয় নাই।

২। কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের স্বপক্ষে আমাদের নির্দ্ধারিত ১ম কারণের বিরুদ্ধে, শ্রীযুক্ত যতীন বাবু মন্তব্য করিয়াছেন—(মা ও ম, ৫০৯ পৃঃ ৪র্থ ছত্র) "কালিদাস তাঁহার ঋতুসংহারে কেবল বঙ্গদেশের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন যাহা অন্যত্র প্রচলিত ছিল না—এরূপ সিদ্ধান্ত আসিতে পারে না। যদি শকাব্দ * অনুসারে তিনি বর্ষারম্ভ গণনা করিয়া থাকেন, তবে তাহা যেমন বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল তেমন ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত ছিল।"

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য—**ভারতের অন্যত্র সৌর মাসে বৈশাখ মাস হইতে শকাব্দ গণনা প্রচলিত নাই** আমাদের এ কথা ত আর অনুমান নহে ইহা একটি প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা এই প্রত্যক্ষ সত্য প্রমাণের জন্য ভারতের সমুদয় প্রদেশের ৭।৮ খানি পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়া বিচার স্থলে দেখাইতে প্রস্তুত আছি। শ্রীযুক্ত যতীন বাবু সৌর মাসে ১লা বৈশাখ শকাব্দের নব বর্ষারম্ভ—এ কথা লিখিত আছে এই রূপ একখানি অ-বঙ্গ দেশীয় পঞ্জিকা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করুন, সমুদয় বিবাদ মিটিয়া যাইবে। ন্যায়শাস্ত্রে লেখে "প্রত্যক্ষে বিরোধাভাবঃ"।—প্রত্যক্ষে আবার বিরোধ কি? এই রূপ পঞ্জিকা বাহির করিলেই যতীন বাবুর জয় এবং আমাদের পরাজয়। কৃষ্ণনগরের যে কোনও বিদ্বন্মণ্ডলীর সভাতে, যতীন বাবুর নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে আমরা আমাদের পাঁজির তাড়া লইয়া গিয়া উপস্থিত হইব। যতীন বাবুর পাঁজি খানি দেখিলেই আমরা পরাজয় স্বীকার করিয়া সিংড়িগড্ডায় কালিদাসের স্মৃতি মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিব।

কালিদাস সমিতির পক্ষ হইতে
নিবেদক
শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য।

---

* কৃষ্ণনগরে কালিদাস তত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়া আমরা যতীন বাবুর নিকট এতদূর অপরাধী হইয়াছি যে তিনি আমাদের মুদ্রিত পুস্তকে যে কয়টি মুদ্রাকর প্রমাদ আছে তাহার উপরেও আমাদের উপহাস করিতে ত্রুটি করেন নাই।

কালিদাস বাঙ্গালী

যিনি "ধ্রুবতারা" লিখিয়া বঙ্গের নরনারীর নিকটে সুপরিচিত হইয়াছেন, অর্ঘ্য লাভ করিয়াছেন, যশোলাভ করিয়াছেন, নানা সময়ে নানা উপন্যাস, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতির পর খ্যাতি উপার্জ্জন করিয়াছেন; সেই সুপ্রসিদ্ধ সুলেখক খ্যাতনামা রাজপুরুষ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ বাহাদুর আজ আবার তাঁহার সেই মধুর লেখনী ধারণ করিয়াছেন। সেই লেখনীর মুখে আজ কোনও দেশের চিত্র, নদনদীর চিত্র, বন উপবনের চিত্র, বা নরনারীর চিত্র বাহির হয় নাই; বাহির হইয়াছে কালিদাসের একান্ত ভক্ত, নিজের জন্মভূমিকে কালিদাসের জন্মভূমি করিবার জন্ম একান্ত ব্যগ্র, একান্ত অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রদর্শিত কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন এই মতের সমর্থক প্রমাণ সমূহের বিরুদ্ধে।

কাব্যতীর্থ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা ছলে আমিও একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধটি "সাহিত্য সভায়" পঠিত হইয়াছিল। সভ্যবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা সেই সভায় দাঁড়াইয়া আমার প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একব্যক্তি ভিন্ন কেহই আমার অনুকূলে মত দেন নাই, সভাপতির সহিত সকলেই আমার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে জন্ম আমি দুঃখিত হই নাই; দুঃখিত না হইবার দুইটি কারণ আছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যেমন বিচার সভা বসিত, এখনও কচিৎ কদাচিত বসিয়া থাকে; তাহাতে একজন পূর্ব্ব-পক্ষবাদী, একজন উত্তর পক্ষে থাকেন ও একজন মধ্যস্থ থাকেন। তাহাতে একেবারে সহস্র যুক্তির আবির্ভাব হয় না, এক একটি যুক্তিরই আলোচনা হইয়া থাকে। বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি একটি যুক্তির অবতারণা করিলেন, প্রতিপক্ষ সেই যুক্তির উপরে দোষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, মধ্যস্থ প্রত্যেকের প্রত্যেক কথা ওজন করিয়া তাহার বলাবল পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, এই ভাবে বিচার চলিল। সাহিত্য সভা, সাহিত্য পরিষৎ ও সাহিত্য সম্মিলন প্রভৃতিতে এভাবে কোন বিচার হয় না। প্রবন্ধ লেখক বা বক্তা একটি মত সমর্থন করিবার জন্ম একটির পর একটি যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; করিতে করিতে সহস্রাধিক যুক্তি প্রদর্শিত হইল। সভ্যবৃন্দের মধ্যে পেন্সিল লইয়া কেহ কেহ সঙ্ক্ষেপে যুক্তি গুলির মধ্যে কোনও কোনটির সারমর্ম্ম কাগজে টুকিয়া লইলেন, কেহ কেহ বা নিজের স্মরণ শক্তির সবলতার উপরে আস্থা স্থাপন করিয়া টুকিয়া লওয়া অনাবশ্যক মনে করিলেন। প্রবন্ধের বা বক্তার সমালোচনা করিবার জন্ম তাহারাই দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বক্তৃতার ভাষায় জলদগম্ভীর স্বরে রসভাবের অবতারণা করিয়া, সহস্র হস্ততালীতে উৎসাহিত হইয়া, কেহ বা প্রবন্ধের বা বক্তার অনুকূলে, কেহ বা প্রতিকূলে আত্মমত ব্যক্ত করিলেন। হয়ত. তৎপূর্ব্বে কোন দিন তাঁহার এবিষয়ে অণুমাত্র চিন্তা করেন নাই। এইরূপ সভার সমালোচনায় মতের কোন মূল্য আছে আমি মনে করি না; সুতরাং দুঃখিত হই নাই। এইটিই আমার দুঃখিত না হইবার প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃতি স্বাভাবিক; যে বাঙ্গালী জাতি আত্মবিস্মৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমরণ তাহার পোষণ করিবে; সেই জাতিকে আত্মবিস্মৃতির হাত হইতে মুক্ত করা কঠিন; এজন্তও আমি দুঃখিত হই নাই। রাম যুধিষ্ঠিরের সময়ের কথা বলিতেছি না, তৎপরে যে সকল মহামনীষা সম্পন্ন গ্রন্থকারগণ জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে নিজের নিজের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন

করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী, অন্যই ভারতের অন্যান্য স্থানের, বাঙ্গালী কি ইহা অবগত আছেন?

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কালিদাস বাঙ্গালী এই মতের প্রচারের জন্য যে সকল সভা সমিতি করিয়াছিলেন, সেই সেই সভায় কোন কোন সভায় আমাকেও আহ্বান করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্য ও শরীরের অস্বাস্থ্য নিবন্ধন আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার একখানি পুস্তিকা পাইয়াছিলাম; পুস্তিকা পাঠ করিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়ের লিখিত সমস্ত প্রমাণ গুলি দেখিলাম। তাঁহার সমস্ত প্রমাণ গুলিই কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের সাধক হইতে পারে না, কতগুলি প্রমাণ বাঙ্গালীত্বের মনে করিয়াছিলাম। কালিদাস বাঙ্গালী বা অন্যদেশীয়, তাঁহার পুস্তকে তাহার কোন চিহ্ন আছে কিনা জানিবার জন্য আবার তাঁহার পুস্তক গুলি পাঠ করিয়া দেখি; তাহাতে আমারও কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য, আমি যোগী নহি আমার যোগজ প্রত্যক্ষ নাই, সেই প্রত্যক্ষের বলে আমি কালিদাসকে বাঙ্গালী জানিয়া তৎসাধক অন্যান্য প্রমাণের সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। কালিদাসের পুস্তক পড়িয়া কালিদাস বাঙ্গালী বুঝিয়াছি; তাহাই প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কালিদাস বাঙ্গালার কোন্ জিলার কোন্ গ্রামের কোন্ ধাত্রী সূতিকাগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অবধারণ করিতে পারি নাই; কালিদাসের পত্নীর ও জন্মভূমিরও অবধারণ হয় নাই।

আমি সেই প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহা আমার স্মরণে নাই। "সাহিত্য সংহিতায়", "অর্চ্চনায়" আমার সেই প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। সিংহ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমার প্রবন্ধের উল্লেখ করেন নাই। সভাসমিতিতে মৌখিক সমালোচনা ঠিক হয় না পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লিখিত প্রবন্ধের লিখিত সমালোচনাই ঠিক; তাহা যদি আবার একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তির হাতে পড়িয়া হয়। সিংহ মহাশয় যদি এই প্রসঙ্গে আমারও প্রবন্ধের সমালোচনা করিতেন, তবে তাঁহার উপকার হউক না হউক, আমার যথেষ্ট উপকার হইত। আমি যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি, সেগুলি নির্দ্দোষ আমি বলিতে সাহস করি না; যানি পশ্যন্তদাসীনাঃ কর্ত্তা তানি বা পশ্যতি" সুতরাং ভ্রম থাকা বিচিত্র নয়। প্রকৃত ভ্রম দেখাইলে তাহা মানিয়া লইবার শক্তি ও অভ্যাস আমাদিগের আছে; সুতরাং কোন পক্ষেই অসন্তোষ আসিবে মনে করা যায় না। আমি সিংহ মহাশয়কে ও "মানসী ও মর্ম্মবাণীর" অন্য পাঠক পাঠিকাকে সেই প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করি। "সাহিত্য সংহিতা" ও "অর্চ্চনা" নিয়মিত পাইলেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না, তাহা হইতে প্রমাণগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেও পারিলাম না। যে দুই চারিটি স্মরণে আছে; তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে।

১। এক বাঙ্গালা দেশেই পত্নীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বুঝাইতে "সম্বন্ধী" শব্দের ব্যবহার আছে, অন্য দেশে এইরূপ ব্যবহার নাই। "সম্বন্ধী" শব্দ আছে, বৈবাহিককে বুঝাইতে। ভবভূতিও "স সম্বন্ধীপ্যান্তঃ" বলিয়া বৈবাহিককে গ্রহণ করিয়াছেন। কালিদাস রঘুবংশের সপ্তম সর্গের ১ম শ্লোকে "স্বসারমাদায় বিদর্ভনাথঃ" ইত্যাদি বলিয়া, "স্বসারং" ভগিনীকে লইয়া বিদর্ভনাথ পুরপ্রবেশ করিতেছিলেন,—এইরূপ বলিয়া সেই সর্গেই ১৩ শ্লোকে "সম্বন্ধিনঃ সন্ম সমাসসাদ"—রাজকুমার অজ সম্বন্ধীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এইরূপ লিখিয়াছেন। ইন্দুমতী যে ভোজরাজের ভগিনী ছিলেন, কালিদাস তাহা অন্য শ্লোকেও বলিয়াছেন। "সাহিত্য সভায়" সভ্যবৃন্দের মত যদি কোন পাঠক পাঠিকা বলেন, "অন্যদেশেও পত্নীর জেষ্ঠ ভ্রাতাকে বুঝাইতে "সম্বন্ধী" শব্দের ব্যবহার থাকিলেও থাকিতে পারে", তাহা হইলে আমি নাচার। "থাকিলেও থাকিতে পারে" "থাকিলেও থাকিতে পারে" ইহা দ্বারা প্রতিবাদ হয় না। যাঁহারা এদেশের বা অন্যদেশের ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন,—"সন্দেহাত্মক বাক্য দ্বারা কখনই প্রতিবাদ হয় না।" অন্যের এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতে

পারে, আমার এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিতেছি, উড়িষ্যায়ও ছিলাম, মিথিলাতেও ছিলাম, অন্তদেশেও গিয়াছি; উত্তর পশ্চিম, পঞ্চনদ, মিথিলা, উড়িষ্যা মালব প্রভৃতি দক্ষিণাপথে কোন স্থানেই পত্নীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বুঝাইতে "সম্বন্ধী" শব্দের ব্যবহার নাই। সত্য বটে ঋষিরা ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কোন সময়ে এক আধটি বৈদিক (আর্ষ) শব্দের ব্যবহার করিতেন; "সম্বন্ধী" শব্দ বৈদিক শব্দও নয়, বঙ্গভাষাও সে সময়ে সমৃদ্ধিশালী ভাষা হয় নাই যে কালিদাস সেই শব্দের ব্যবহার করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে প্রয়াস পাইবেন। পক্ষান্তরে "সম্বন্ধী" শব্দ সংস্কৃত শব্দ, প্রাদেশিক শব্দ নয়; কেবল দেশভেদে তাহার অর্থভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস মালববাসী হইয়া বঙ্গদেশের ব্যবহারকে আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন; ইহা কখনই হইতে পারে না।

২। বঙ্গদেশে কন্যাদাতা বরকে একটি বরণ যোড় দিয়া বরণ করেন; বর সেই যোড়টি সেইখানেই পরিধান করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করে। অন্তদেশে এই আচার কখনই নাই। বরণের পরে, সেই বরণের বস্ত্র পরিধানের পরে বরকন্যার পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়; এই সাক্ষাতের নাম মুখচন্দ্রিকা। মুখচন্দ্রিকা এক বঙ্গ দেশেই আছে, অন্তদেশে নাই; মুখচন্দ্রিকা বলিলে অন্ত দেশের লোক কিছুই বুঝিবেন না। ভবদেব ভট্টের দশকর্ম্মপদ্ধতি বঙ্গদেশের পুস্তক, অন্যদেশের নয়। এই পুস্তকে ভবদেব ভট্ট এই মুখচন্দ্রিকা "স্ত্র্যাচারসিদ্ধঃ" বলিয়া স্ত্রিয়াচারের ভিতরে ফেলিয়াছেন। রঘুনন্দন মুখচন্দ্রিকাকে শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার জন্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা দ্বারা কিরূপ শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি না। রঘুবংশে স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর সহিত রাজকুমার অজের সাক্ষাৎ হইলেও কালিদাস আবার "ভোজোপনীতঞ্চ দুকূলযুগ্মং"—ভোজরাজপ্রদত্ত বরণের দুকূলযুগ্ম গ্রহণ করাইয়া "দুকূলবাসাঃ স বধূসমীপং" সেই দুকূল বাস পরাইয়া অজকে ইন্দুমতীর সমীপে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কুমারসম্ভবেও মহাদেবকে বাঘ-ছাল ছাড়াইয়া হিমালয়ের প্রদত্ত বরণের দুকূল যুগ্ম পরাইয়া কালিদাস পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন। মুখচন্দ্রিকার মধ্যে আমরা দুইটি শব্দ পাইতেছি, একটি মুখ, দ্বিতীয়টি চন্দ্রিকা; চন্দ্রিকা শব্দের অর্থ চন্দ্রের কান্তি। কালিদাস কুমারসম্ভবের ৭ম সর্গের ৭৪ শ্লোকে মুখচন্দ্রিকা না বলিয়া যে "আনন চন্দ্রকান্ত্যা" বলিয়াছেন; তাহা দ্বারা যে মুখচন্দ্রিকা বলা হইয়াছে, ইহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

৩। বঙ্গদেশে বিবাহের পরে সেই রাত্রে বাসর-ঘরে লইয়া মৃত্তিকায় পাতিত শয্যায় বর-কন্যাকে প্রথমে বসাইয়া মেয়েরা বর-কন্যাকে লইয়া নানাবিধ ঠাট্টা তামাসা করে, পরে সেই শয্যায় তাহাদিগকে শয়ন করাইয়া চলিয়া যায়। এ আচারও অন্ত দেশে নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বিবাহের পর বর বাসায় চলিয়া যায়। দাক্ষিণাত্যদিগের ভিতরে এরূপ কোন আচার নাই, দাক্ষিণাত্যেরা দিবসেই বিবাহ সম্পন্ন করে, তাহাদিগের ভিতরে বিশেষ কোন রাত্রিকৃত্য নাই। মিথিলা বঙ্গদেশেরই একটি পল্লী বলিলেই হয়, সেখানের আচারে বাঙ্গালার আচারের কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য আছে। কালিদাস কুমারসম্ভবে শিব-পার্ব্বতীকে বাসর-ঘরে লইয়া গিয়া ভূমিতে পাতিত শয্যায় বসাইয়া রমণীদিগের সহিত হাস্ত-পরিহাসে যোগ দেওয়াইয়াছিলেন।—"কনক কলস-যুক্তং ভক্তিশোভাসনাথং ক্ষিতি বিরচিত শয্যাং কৌতুকাগারমাগাৎ" ৭ম সর্গের ৯৪ এই শ্লোকে ও ৯৫ শ্লোকে তাহা ব্যক্ত আছে।

৪। যে দাক্ষিণাত্যেরা মাছের নামে সাত হাত সরিয়া যায়, যে দেশে অদ্যাপি মাছের বিকি-কিনি নাই, সেই দেশে রোহিত মৎস্তের ব্যবসায় অসম্ভব। নাগর শ্যালক একজন ভদ্রবংশীয় হইয়া কি বলিয়া মাছের পেটে ছিল শুনিয়া তাহার অবধারণের জন্ত আংটির ঘ্রাণ লইল? এবং গন্ধ লইয়া বলিল, "হাঁ, ঠিক মাছের পেটেই ছিল, আঁস্টা গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।" যাহারা মাছের ব্যবহার করে না, তাহাদিগের একজন হইয়া নাগর শ্যালক কি করিয়াই বা মাছের গন্ধ বুঝিল?

অভিজ্ঞান শকুন্তলেই ইহা আছে। কালিদাস রঘুবংশের সপ্তম সর্গের "আদাস্যমানঃ প্রমদামিষং তৎ" ৩১শ শ্লোকে বলিয়াছেন। প্রমদারূপ আমিষ বলাতে কালিদাসের মৎস্যপ্রিয়তা প্রতিপন্ন হইতেছে। মৎস্যপ্রিয়তা অবশ্য মৈথিল, উড়িয়া, বাঙ্গালী এই তিনেরই আছে; অন্যান্য প্রমাণ কেবল বাঙ্গালীত্বের সাধক পাইতেছি; এই জন্য কালিদাসকে মৈথিল বা উড়িয়া বলিতে পারি না, দাক্ষিণাত্য বলিবারও সম্ভাবনা নাই।

৫। কালিদাস ঋতুসংহার নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছেন; তাহাতে ধান্যক্ষেত্রের বর্ণন আছে, ইক্ষু-ক্ষেত্রের বর্ণন আছে; যব গোধূম ক্ষেত্রের বর্ণন নাই। জবা, অপরাজিতা, করবীর প্রভৃতি ভারতের সর্ব্বত্র সুলভ পুষ্পরাশির বর্ণন নাই; আছে কেবল বাঙ্গলা দেশের বন-জঙ্গলে যাহা পাওয়া যায়। সেই সকল ফুলের বর্ণন। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—ইহার কারণ কি? উত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন,—ইহা দ্বারা কালিদাস বাঙ্গালী বলা যাইতে পারে না, কালিদাস মহাকবি, যেখানের যাহা ভাল তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। আমরাও স্বীকার করি, কালিদাস বিন্ধ্য পর্ব্বতের বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া বিন্ধ্যাদ্রিবাসীও হয়েন নাই, হিমালয়ের বর্ণন করিয়াও হিমালয়বাসী ভুটিয়া হইতে পারেন নাই, অগাধ অসীম জলধির বর্ণনায় সিদ্ধহস্ততা দেখাইয়া নাবিকের পদ গ্রহণ করিতে ও মেঘদূত লিখিয়া মেঘবাহন ইন্দ্র হইতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি বাঙ্গালা দেশের বর্ণন করিতে যাইয়া যদি বাঙ্গলার বন্য পুষ্পের বর্ণন করিতেন, আমরা কিছুই বলিতাম না। তিনি লিখিতেছেন, ঋতুর বর্ণনা। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হাত হইতে বাঙ্গালার বন-জঙ্গলের পুষ্পরাজি বাহির হইল কেন? আর বাহির হইল কেন রাঢ় দেশের ইন্দ্রগোপকীট ও কন্দলী বন? মানিয়া লইলাম, কালিদাস মহাকবি, তাঁহার কবিত্বের পরিপুষ্টির নিমিত্ত তিনি স্বচক্ষে বা কল্পনার চক্ষে ভারতের দেশ, বিদেশ, বন উপবন সমস্ত দেখিয়াই কবিতা লিখিয়াছেন; তাহা সত্য হইলে তিনি যে কুঙ্কুম মাখাইয়া রমণীদিগের রমণীয়তনুর আরও রমণীয়তা বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই কালিদাস কুঙ্কুমক্ষেত্রের বর্ণন করিয়া কেনই বা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সোণা ঢালিয়া দিলেন না? কেনই বা তিনি দ্রাক্ষালতার সহিত অক্ষোট প্রভৃতি তরুরাজির বর্ণন করিয়া কল্পনার চক্ষে আমাদিগকে দেখাইয়া রসনায় জলসঞ্চার করিলেন না? কেনই বা তিনি উদ্যান শোভাবর্দ্ধক হিমালয়ের সুন্দর সুন্দর তরু-রাজির, সুন্দর সুন্দর মনোহর গুল্মমালার (Fern) বর্ণন না করিয়া একমাত্র দেবদারুর বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন? এইটি ব্যতিরেক প্রবর্ত্তমান হেতু, পূর্ব্বোক্তটি অন্বয়মুখ প্রবর্ত্তন হেতু, আমরা এই উভয় বিধ হেতুর নির্দ্দেশ করিয়া কালিদাসকে বাঙ্গালী সাব্যস্ত করিতেছি, দোষ থাকে, হেত্বাভাস (Fallacy) হইয়া থাকে। পাঠক পাঠিকা তাহার উল্লেখ করুন, নিরস্ত হইব।

৬। বাঙ্গালা দেশে কাগজপত্রে, প্রাচীন গ্রন্থকারের গ্রন্থ সমাপ্তির পরে কবিতায়, লেখকের লিপি শেষের কবিতায় সৌরমাসের কীর্ত্তন দেখিতে পাই, তারিখের নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। ভারতের অন্যত্র সেই সেই কার্য্যে সৌরমাসের ও তারিখের উল্লেখ ছিল না, এখনও নাই। অন্যত্র চান্দ্রমাসের কীর্ত্তন ও তিথির কীর্ত্তন পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। কালিদাস মেঘদূতে তাহা না করিয়া "আষাঢ়স্য প্রতিপদি তিথৌ" না লিখিয়া "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" লিখিয়া সৌরমাসের ও তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন। এইটি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কথা, ইহার উপর কোন দোষ দেখিতে পাই না।

৭। কালিদাস বাঙ্গালা ভাষার রীতি (Idiom) লইয়া সমস্ত কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন। পাঠক পাঠিকা: একটু নিবিষ্টচিত্তে কালিদাসের পুস্তক পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এক্ষণে তন্মধ্য হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। 'চোখ মুদিয়া দিন কটা কাটিয়া দাও' বাঙ্গলা ভিন্ন অন্য ভাষার এ ধরণের কথা নাই; কালিদাস মেঘদূতে বলিয়াছেন—"শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা" ইহার

বাঙ্গালা অর্থ—অবশিষ্ট চারিটি মাস চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দাও।

বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া, ক্ষীণ স্মরণশক্তি লইয়া, আর অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না, দিঙ্‌মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া "আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানং" বলিয়া নিবৃত্ত হইলাম।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

যুগ-প্রশস্তি

একি কল্লোল ! একি কল্লোল !
　　একি তাণ্ডব-ছন্দ নিতি !
গিরি-কন্দরে একি হিন্দোল !
　　উন্মাদ-দোলে সিন্ধু-গীতি !
জাগে সাগরের গুরু গর্জ্জন,
　　ক্ষুব্ধ সলিল ফেনায়ে ওঠে,
ফুলি' ফুলি, বুকে অধীর কাঁদন
　　নিষ্ফল রোষে আছাড়ি' লুটে।
শিলা-বন্ধন কাঁপে থর থর,
　　রুদ্র প্রপাত আঘাতি ফিরে,
অগ্নি-গিরির কারা-গহ্বর
　　শৃঙ্গের ভার টুটিবে কিরে ?
কথা কও কও—ফুকারে সাগর,
　　ধরার বক্ষে কাঁপন জাগে,
স্তব্ধ গগন গণিছে প্রহর,
　　চঞ্চল বায়ু বারতা মাগে—
পঞ্জর কাটি' বাহিরিতে চায়
　　লক্ষ যুগের হারানো বাণী,
স্বপ্ন-বিলাসী শিহরি' হিয়ায়
　　আবরে নয়ন শঙ্কা মানি'।
ওগো ধরিত্রী, অনন্তকাল
　　কণ্ঠ রুধিয়া রহিবে কত,
মিথ্যাছলনে রচি' মায়াজাল
　　স্বপ্ন-মদিরা-আবেশ-রত ?
কথা কও, হের সিন্ধু অধীর,
　　গিরিকন্দরে কোথায় ধারা ?
পাষাণ-মর্ম্মে আঁধারে নিবিড়
　　অনন্ত বাণী কোথায় হারা ?—
সেকি ধূমায়িত বহ্নি তরল,
　　পুঞ্জিত বুকে দহন-জ্বালা ?
শিলা-বন্ধনে বেদনোচ্ছল
　　নির্ঝরের ফেন-ঊর্ম্মিমালা ?
বুক-চাপা সেকি মহা হাহাকার
　　যুগ-নিগড়ের বাঁধন-পাশে ?
মূক বেদনার অশ্রু-বিথার
　　মর্ম্ম টুটিয়া উথলি আসে ?

একি ক্রন্দন ! একি ক্রন্দন
　　গুমরায় ধরা-বক্ষতলে !
একি অস্ফুট মৌন বেদন
　　চঞ্চল সারা ভূমণ্ডলে !
ভাষা নাই তার, ভাষা নাই—নাই,
　　নীরব কণ্ঠ, কাতর আঁখি,
অন্তর-বাণী কাঁপে সারা ঠাঁই
　　স্তব্ধ নিখিলে লুকায়ে থাকি'।
যুগ যুগান্ত করেনি প্রকাশ
　　শত অকল ছন্দ গানে,

মূক মর্ম্মের মিলিল না তাষ
ব্যর্থ-কামনা-ব্যথিত প্রাণে!
সে ব্যথা পুঞ্জ মেঘ-বলাকায়,
সিন্ধু-সলিলে উঠিছে ফুলি',
বিশ্বমানব জাগে অসহায়,
অধীর চিত্ত উঠিছে দুলি'।
পায়ে পায়ে রচি' বিধি শৃঙ্খল,
চিরনিয়মের লৌহকারা,
নয়নে নয়নে বাঁধি' অঞ্চল
অন্ধ ভুবন কোথায় হারা!
কোথা রে সুপ্ত মানবের প্রাণ!
কোথা বিস্মৃত বাসনা আশা!
কোথা রে মুক্ত জীবনের গান!
চিরজনমের মৌনভাষা!

ফেটে পড় মহা ভূমি-কম্পনে
বহ্নিধারায় উগারি' জ্বালা,
ভেঙ্গে যাক্ শিলা ভীমগর্জ্জনে
প্রপাতের ফেন উর্ম্মি-মালা!
—একি ক্রন্দন! একি কলরোল!
দিকে দিকে একি বেদনা জাগে!
একি অনিবার উন্মাদ দোল!—
বন্দী ভুবন মুক্তি মাগে!
দ্বার খুলে দাও!—নব নব গান,
নব আনন্দ বাসনা প্রীতি,
নবীন বিশ্বে দিক্ আ'জ দান
মহামানবের জীবন গীতি।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোন শিকার কোথায় পাওয়া যায়।

অনেক সময়, ক্রমাগত কয়েক দিন আহার না জুটিলে টাইগার (Tiger) ও লেপার্ড (Leopard) মরা গরুর শুক্‌না হাড়ও চিবাইয়া খায়। কুকুর যেরূপ দুই পায় চাপিয়া ধরিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া হাড় কামড়াইতে থাকে, একটী লেপার্ডকে আমি ঠিক সেই অবস্থায় হাড় চিবাইবার সময় শিকার করিয়াছিলাম। জঙ্গলে ঢুকিয়া, দূর হইতেই বনের মধ্যে 'কড়মড়' শব্দ শুনিয়া, নিকটে গিয়া দেখিলাম, একটী লেপার্ড হাড় কামড়াইতেছে। ক্ষুধার তাড়নায়ই হউক, অথবা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চিবাইতেছিল বলিয়াই হউক, আমি যে এত নিকটে গিয়া পড়িয়াছি, তাহা সে একেবারেই টের পায় নাই। বলা বাহুল্য, অতঃপর তাহার মুখের হাড় মুখেই রহিয়া গেল।

অনেকের ধারণা, বাঘ উহাদের শিকার পিঠের উপর ফেলিয়া লইয়া যায়, ইহা অত্যন্ত ভুল।

বিড়াল যেরূপ ইঁদুর ধরিয়া লয়, ইহারাও তদ্রূপ শিকার ধরিয়া, শূন্যে উঠাইয়া, লইয়া যায়। এই জন্যই শিকার লইয়া গেলে, তাহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কোন কোন সময় শিকার অত্যন্ত ভারী হইলে, কামড়াইয়া ধরিয়া, ক্রমাগত 'ছেঁচড়াইয়া' টানিয়া লইয়া যায়; সেই সব স্থানে বনের মধ্যে চিহ্ন পাওয়া যায়। অনেক স্থানে, বনের মধ্যে এক দেড় মাইল দূরেও লইয়া যায়; ঐ সময় রাস্তায় যে সব খাল, নালা ও তাহাদের উঁচু পাড় সম্মুখে পড়ে, তাহা অনায়াসে পার করিয়া লয়। অনেক স্থলে, শিকার করিয়া নিকটে কোন ভাল জঙ্গল পাইলে, সেইখানে উহা রাখিয়া দেয়। শিকার রক্ষা (preserve) করিবার পদ্ধতি ইহাদের

অতি সুন্দর। বনের মধ্যে লতা পাতা ও ঘাস দিয়া ভুক্তাবশিষ্ট, অন্য সময় খাইবে বলিয়া, ঢাকিয়া রাখে। কাক বা শকুন দ্বারা অপচয় না হয়, ইহাই উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে পাথরঘাটা নামক স্থানের শালবনে (আমাদের দেশে শালবনকে গজারী গড়া বলে) শিকার করিতে বাহির হইয়া, এক স্থানে সাত আটটা মরি (kill) ঢাকা অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। তখনও একটী মরির গলার ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প চোঁয়াইয়া রক্ত পড়িতেছিল। কিন্তু সবগুলি মরিই শালপাতা ও বন জঙ্গল দিয়া ভালরূপে ঢাকা ছিল। আমরা ঐ সব মরির নিকটবর্ত্তী বহু স্থান সন্ধান করিয়াও, বাঘ না পাইয়া, আমাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলাম। সেদিন আমরা অন্য স্থানে যাইবার জন্যই বাহির হইয়াছিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় ঐ স্থান দিয়া ফিরিবার সময় দেখা গেল, প্রত্যেকটী মরিই, স্থানান্তরিত হইয়া ঢাকা অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাদ্বারা, তখন এই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রাতে আমাদের সাড়া পাইয়াই, বাঘটা অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল; অথবা সে এমন কোন ছোট জঙ্গলে ছিল, যেখানে আমরা তাহার অস্তিত্ব সন্দেহই করিতে পারি নাই। তখন অসময় বলিয়া আর না ঘাটাইয়া তাঁবুতে ফিরিয়া গেলাম।

পরদিন প্রত্যুষে, পুনরায় লোক পাঠাইয়া দেখা গেল, মরিগুলিকে আবার সরাইয়া রাখিয়াছে। সেদিন আসিয়াও বাঘের সন্ধান পাই নাই। কিন্তু তাঁবুতে ফিরিবার সময়, আমার সুচতুর ভৃত্য রবি ও হাতীর দারোগা আস্রবালী খাঁকে ২টী বন্দুক দিয়া, দুই গাছে উঠাইয়া, রাখিয়া যাই। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে না আসিতেই, শুষ্ক পত্রের উপর মচ্‌মচ্‌ শব্দে বাঘ আসিতেছে মনে করিয়া, দূর হইতেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া, আস্রবালী বন্দুক আওয়াজ করিয়া দেয়। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, আওয়াজের প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই, হুড়মুড় করিয়া বাঘের পলাইবার শব্দও তাহারা শুনিতে পায়। খানিক পরে চারিদিক নিস্তব্ধ হইলে, তাহারা ক্যাম্পে ফিরিয়া আইসে। নিকটেই গ্রামে, তাহাদের জন্য একটী হাতী রাখা হইয়াছিল। ইহারা যদি সাহস করিয়া আর কিছুকাল থাকিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই বিফল হইত না। পরদিন আবার লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, 'মরি' গুলিতে শকুন পড়িয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত উত্যক্ত (disturbed) হওয়াতে বাঘ ঐ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

কোন বাঘ কোন কারণে, তাড়া পাইয়া মরির নিকট হইতে সরিয়া গেলেই, মরিতে শকুন পড়ে; তখন আর উহা বাঘ স্পর্শ করে না। কিন্তু বাঘ মরির নিকটে থাকিলে, কাক বা শকুন কিছুই পড়িতে দেয় না; দুই একটা পড়িতে চেষ্টা করিলেও, উহাদের তাড়াইয়া দেয়। কোন কোন সময় দুই একটা মৃত শকুনও মরির নিকট দেখা যায়।

মুচিরা অত্যন্ত লোভী ও দুর্দ্ধর্ষ মনুষ্য। কোন স্থানে মরির সংবাদ পাওয়া মাত্রই, ইহারা সেই স্থান যতই দুর্গম হউক না কেন, ঠিক যাইয়া হাজির হয়। দূর হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া বা 'হো হা' করিয়া চেঁচাইয়া, যে কোন উপায়েই হউক, বাঘ তাড়াইয়া মরির চামড়া খুলিয়া আনিবেই। চামড়া খুলিয়া আনিলে পর, বাঘ আর সে মরি স্পর্শ করে না; তখন কাক শকুনের কপাল জোটে।

মুচিদের যন্ত্রণায়, অনেক সময়, শিকার করা কঠিন হইয় দাঁড়ায়। দুই এক স্থলে এই সব মুচিদের খুব শাসিত করিয়া, তবে শিকার করিতে পারিয়াছি।

অনেকেরই ধারণা বাঘ ১০।১২ হাত লম্বা হয়। কেহ কেহ ১৩ হাত লম্বা বাঘ দেখিয়াছেন বলিয়া, গল্প করিতেও ছাড়েন না। তখন প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিলে, অত্যন্ত বিরক্তও হন দেখিতে পাই। বলা বাহুল্য, ইহা একেবারে মিথ্যা কথা। জানি না, সে যুগে হাতীর পরিবর্ত্তে ম্যামথ্‌ (mammoth) ছিল, সেই যুগের বাঘও বার তের হাত হইলে হইতে পারে। সাধারণতঃ টাইগার (Tiger) ৯ কি ৯।০ ফিটের মধ্যেই দেখা যায়, ইহাই বেশ বড় আকারের (full-grown) বাঘ। ১০ ফিট কি তদূর্দ্ধ বাঘ, শিকারীর গৌরব

বর্দ্ধন করে সত্য, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুব কম। আমি নিজে ১০ ফিট ২ ইঞ্চি বাঘ মারিয়াছি। আমাদের শিকার পার্টিতে, এই আকারের বাঘ আরও মারা পড়িয়াছে। ১০ ফিট ৪ ইঞ্চির ঊর্দ্ধে বাঘ বড় একটা দেখা যায় না। শুনিয়াছি, কুচবিহারের শিকার তালিকায় (calendar) ইহা অপেক্ষা বড় ২।১টী বাঘের উল্লেখ (record) আছে।

শিকার হইয়া গেলে, তখন তখনই মাপ লওয়ার নিয়ম। ২।৩ ঘণ্টা পরে শক্ত (stiff) হইয়া গেলে, মাপ লইলে ঠিক হয় না। অনেকে ছাল ছাড়াইয়া লইয়াও, মাপ নিয়া থাকেন, তাহাও বিশুদ্ধ হয় না। বাঘটীকে লম্বা করিয়া শোয়াইয়া, নাকের ডগা (অগ্রভাগ) হইতে, মাথা ও পিঠের উপর দিয়া ফিতা ঘুরাইয়া লেজের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত (from the tip of the nose to the end of the tail) মাপ লওয়াই নিয়ম। বাঘ শিকার করিয়া ওজন করাও নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বদা সুবিধা হয় না বলিয়া, অনেক স্থানেই ইহা লইবার চেষ্টা করা হয় না। ওজন সম্বন্ধে, আমার অনেক শিকারীর সহিত মতদ্বৈধ আছে। কারণ সচরাচর বাঘ একটী মরিকে ৩।৪ দিন ধরিয়া আস্তে আস্তে আয়েস করিয়া খায়। উরু বা বুক হইতে, ইহারা প্রথম খাওয়া সুরু করে। 'মরি' বৃহদাকার ষণ্ড বা গাভী হইলে, তাহার ককুদ (haunch) বা স্তন (ওলন—udder) হইতে খাইতে আরম্ভ করে। কোন কোন সময় বাঘ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে, একটী প্রকাণ্ড ষাঁড়ের কেবল খুর ও মস্তক ব্যতীত, একদিনে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় মারা পড়িলে, যে ওজন হইবে, তাহা প্রকৃত বলিয়া আমার ধারণা নয়। কিন্তু অনেকে একথা স্বীকার করিতে চান না। ২।৩ দিন রীতিমত আহার করিবার পর, শিকার করিলে যে ওজন হইবে, তাহা কতকটা ঠিক বলিয়া ধরিলেও ধরা যায়।

Leopard (লেপার্ড) ও (Panther) প্যান্থারএর সহিত, Tiger (টাইগার) এর চরিত্রগত কতক কতক সাদৃশ্য থাকিলেও, কোন কোন বিষয়ে কতকগুলি অসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়।

আকারের পার্থক্য দিয়া লেপার্ড ও প্যান্থারের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্যান্থার, লেপার্ড অপেক্ষা আকারে কিছু বড়, গুলেও (spot) সাধারণ কিছু পার্থক্য থাকে। লেপার্ডের গুল, ঘন সন্নিবিষ্ট ও ভিতরের দিকে অপেক্ষাকৃত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়; প্যান্থারের গুল তত ঘন হয় না। ইহা ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য আছে কিনা তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারের বিষয়। কিন্তু ইহাদের উভয়েরই লেজ, টাইগার অপেক্ষা শরীরের তুলনায় অনেক বড়। ইহাদিগকে বাঙ্গলার বহুস্থানে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অল্প বিস্তর দেখা যায়। দেশভেদে ইহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। আকারে টাইগার অপেক্ষা ছোট হইলেও, ইহারা সৌন্দর্য্যে ও পরিচ্ছন্নতায় শ্রেষ্ঠ। কোন সময়ই গায়ে কাদা বা মাটি থাকিতে দেয় না। লেপার্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফিট ৪।৫ ইঞ্চি কি বড় জোর ৭॥০ ফিটের অধিক কদাচিৎ বড় হয়।

ইহারা বড় জঙ্গলে প্রায়ই থাকে না, সচরাচর গ্রাম্য জঙ্গলে থাকিতেই ভালবাসে। বড় গরু ইহারা ধরে না, ছোট বাছুর ও গ্রাম্য কুকুরই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। কদাচিৎ প্রকাণ্ড গাভী বা ষাঁড়ও শিকার করিয়া ফেলে। বোধহয় ইহারা নিজেদের সামর্থ্য বুঝিয়াই শিকার করিবার চেষ্টা করে। ক্ষুধার জ্বালায় নিতান্ত অস্থির না হইলে, বোধহয় বড় গরু ধরে না। গ্রামের মধ্যে অনেক সময় ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া, ইহারা মানুষকে বড় ভয় করে না। টাইগারের সহিত ইহাদের ডাকেরও পার্থক্য আছে। টাইগার 'হালুম হালুম' করিয়া ডাকে। শব্দও খুব গম্ভীর এবং বহুদূর হইতে শোনা যায়। কিন্তু লেপার্ডগুলি 'হ্যাঁকুর হ্যাঁকুর' করিয়া ডাকে; এই জন্যই আমাদের অঞ্চলে টাইগারকে 'হালুম' বাঘ ও লেপার্ডকে 'হ্যাঁকা' বাঘ বলে। লেপার্ডের ডাকের শব্দ কতকটা করাত দিয়া কাঠ চেরার শব্দের মত। অনেক সময় ঘটিতে মুখ দিয়া ছেলেপিলেরা লেপার্ডের 'হ্যাঁকুর হ্যাঁকুর' ডাকের অনুকরণ করে।

অত্যন্ত বর্ষার সময় বা নীচে অপ্রচুর জঙ্গল থাকিলে, লেপার্ডকে কখনও কখনও গাছে চড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। টাইগার অপেক্ষা ইহারা বৃক্ষারোহণে অধিকতর পটু। সাধারণতঃ ইহারা বেত ও কাঁটা জঙ্গল পছন্দ করে। ইহারাও যোড়ায় যোড়ায় থাকে এবং অনেক সময়, গ্রাম্য জঙ্গলেই প্রসব করে। টাইগার ও লেপার্ড সাধারণতঃ ২টী 'বাচ্চা' প্রসব করে; কোন কোন সময় ৩,৪টীও প্রসব করিতে দেখা যায়। শাবক স্তন্যপান ত্যাগ করিলে, কিছুদিন মাতা, ভুক্ত খাদ্য বমন করিয়া শাবকদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তারপর শাবকগুলি মাংস খাইতে অভ্যাস করে। প্রথম প্রথম ইহাদিগকে মাতা লেজ নাড়িয়া 'খাপ' ধরা শিক্ষা দেয়। গৃহপালিত বিড়ালের মধ্যে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়। ইহার পরই ব্যাং, গোসাপ ইত্যাদি ধরিয়াই, ইহাদের শিকারের 'বর্ণপ রচয়' হয়। এইরূপে 'বাল্যশিক্ষা' শেষ করিয়া, ক্রমে উচ্চশ্রেণীতে প্রোমোশন পাইতে থাকে।

লেপার্ড ও টাইগার, সন্তরণেও বেশ পটু। ইহাদের সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, কোন খরস্রোতা নদী পার হইবার সময়, স্রোতের টানে ভাসিয়া গেলে, পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া, সোজাসুজি পার হইবার চেষ্টা করে। ইহাও ভুল, কারণ অনেক স্থলে নদীর এক পারে জলে নামিবার ও ভাটিতে অপর পারে জল হইতে উঠিবার চিহ্নও দেখা যায়।

কোন কোন সময়, শিকার না জুটিলে, লেপার্ড মাছও খায়। আমাদের এতদঞ্চলে, বর্ষার সময় নদী বিল প্রভৃতিতে বাঁধ দিয়া, গৃহস্থেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'চাই' বা 'বাইর' পাতিয়া, মাছ ধরে। এই সব 'বাইর' বাঁশের মোটা মোটা চটা দিয়া তৈয়ার করিয়া থাকে। ইহাতে বড় বড় মাছও ধরা পড়ে। ব্রহ্মপুত্রের এক খালে একবার ঐরূপ এক 'বাইরে', মাছের লোভে এক লেপার্ড প্রবেশ করিয়া, আর বাহির হইতে পারে নাই। প্রাতে বাঁধের মালিক আসিয়া, মাছের পরিবর্ত্তে, ব্যাঘ্রমহাশয়কে আটকিয়া থাকিতে দেখিয়া, গ্রাম হইতে কোঁচ, টেটা সহ লোকজন আনিয়া বাইরের মধ্যেই উঁহার মাছখাওয়ার সখ মিটাইয়া দেয়।

ব্রহ্মপুত্র নদে ইহা অপেক্ষা আরও অদ্ভুত একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। ই, বি, রেলওয়ের বিন্নাগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট, কুষ্টিয়া গ্রামে, ব্রহ্মপুত্রে মাছধরার জন্য এক ব্যক্তি, প্রায় একটী বাঁশের মত কঞ্চির ছিপে, খুব বড় 'বঁড়শীতে' জিওল মাছ গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। সর্ব্বত্রই বর্ষাকালে বড় বড় চাইন, বোয়াল ইত্যাদি মাছ ধরার এইরূপ বঁড়শী ফেলিয়া রাখিতে দেখা যায়। প্রাতে বঁড়শী তুলিবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আসিয়া দেখে যে, মাছের পরিবর্ত্তে একটী বাঘ বড়শীতে আটকিয়া আছে। ব্যাঘ্রটী বঁড়শী সমেত 'জিওল' মাছ একেবারে গিলিয়া ফেলায়, এই অবস্থা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ঐ ব্যক্তি অতঃপর লোকজন সংগ্রহ করিয়া উঁহার ব্যাঘ্রলীলা শেষ করিয়া দেয়।

লেপার্ডের মত ছোট আকারের আর এক রকম জীব আছে; উঁহাদিগকে fishing cat বলে। অনভিজ্ঞেরা অনেক সময় উঁহাদিগকে ছোটজাতীয় লেপার্ড বলিয়া ভ্রম করে। উঁহাদের গায়ের রং একটু কাল্‌চে এবং গুল (spot) অপেক্ষাকৃত ছোট ও সম্পূর্ণ কালো হয়। লেপার্ড ও প্যান্থারের গুলের সহিত, ইহাদের পার্থক্যই এই যে, ইহাদের গুল সম্পূর্ণ কালো, লেপার্ড ও প্যান্থারের গুল, পীতবর্ণ চামড়ার উপর, কালো আংটীর মত (ring shaped) দেখায়।

লেপার্ড ও প্যান্থার ব্যতীত 'চিতা' নামক আর আর একপ্রকার বাঘ আছে; উঁহাদিগকে হান্টিং লেপার্ড বলে। উঁহারা দৈর্ঘ্যে একটু ছোট হইলেও, উচ্চতায় সাধারণ লেপার্ড অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের 'গুল'ও 'ফিশিং ক্যাট' এর গুলের মত। ইহাদের পায়ে থাবা নাই, শৃগাল কুকুরের মত নখ বাহির করা। ইহারা বেশ পোষ মানে, কুকুরের মত শিকল দিয়া বাঁধিয়া লইয়া, পালকেরা সর্ব্বত্র বেড়ায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদ্বারা শিকার করার পদ্ধতি, এখনও প্রচলিত আছে। মাঠে, যেখানে কালো হরিণ (Black Bucks) দেখা

যায়, তাহার খানিক দূর হইতে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, উহারা একবার ভাল করিয়া দেখিয়াই, মাটীর সঙ্গে 'লুটী মারিয়া' এমনভাবে যাইতে থাকে যে, দূর হইতে হরিণগুলি কিছুই টের পায় না। কাছাকাছি, আয়ত্তের মধ্যে গিয়াই ভয়ানক জোরে লাফ দিয়া শিকারের উপর পড়ে। তখন পালকেরা যাইয়া বহু কষ্টে, ঐ শিকার হরিণের কোনও স্থান হইতে, এক টুকরা মাংস কাটিয়া উহাকে দিয়া ছাড়াইয়া লয়। সাধারণতঃ, ইহাদিগকে লইয়া চলিবার সময় চক্ষে ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হয়।

লোকালয়ে থাকে বলিয়া, অনেক সময়, লেপার্ড গৃহস্থের বেড়া ভাঙ্গিয়া, গোয়াল হইতে ছোট ছোট বাছুরও ধরিয়া লয়, এই সব কারণে ইহাদের সাহসও অত্যন্ত বেশী। এইজন্ত ইহাদের খোঁয়াড় বানাইয়া ধরা সহজ। আমি মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী ঘোষবাড়ী গ্রামে, দুইবার দুইটাকে এই ভাবে ধরিয়াছিলাম। হাত চারেক লম্বা ও হাত দুই আন্দাজ প্রস্থ করিয়া, মোটা বাঁশ চিরিয়া 'ফাল্‌টা' বানাইয়া তাহা বেশ ঘন করিয়া পুঁতিয়া, যাহাতে উহাদের হাত প্রবেশ না করে, এইরূপ মজবুত করিয়া খোয়াড় প্রস্তুত করিতে হয়। উপরে টিন বা তক্তা দিয়া বন্ধ করিয়া, জঙ্গল ঢাকা দিয়া রাখা হয়। ভিতরে ছাগল রাখিবার জন্ত ছোট করিয়া পার্টিসন দিয়া, একটী কুঠুরি তৈয়ার হয় এবং ইন্দুরের কলের দরজার মত, তক্তা দিয়া একটী দরজাও করিতে হয়।

দুই এক দিন উহার ভিতর ছাগল কি ভেড়া রাখিয়া দিলেই, খাওয়ার লোভে গিয়া বাঘ উহাতে পড়ে। গোয়াল ইত্যাদি হইতে, অনেক সময় বাছুর লয় বলিয়া, ইহাদের সাহসের মাত্রাও বাড়িয়া যায়, কাজেই খোঁয়াড়ে ঢুকিতে ইহারা দ্বিধা বোধ করে না।

এইরূপে ধৃত একটী মাদী লেপার্ড, আমি বাড়ী আনিয়া অনেকদিন পুষিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে এমন পোষ মানিয়াছিল যে, বাহির হইতে তাহাকে 'সুন্দরী' বলিয়া ডাক দিলে, খাঁচার শিকের নিকট মুখ বাড়াইয়া দিত, তখন বাহির হইতে উহার মুখে হাত দেওয়া যাইত। কিছুদিন পর আমি উহাকে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী Ezra সাহেবকে দিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর প্রায় সকলেই উহার মুখে হাত দিতে পারিত। কিন্তু গঙ্গাচরণ লাহিড়ী নামক এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়ী থাকিতেন; তাঁহার সঙ্গে উহার কেমন আড়ি ছিল যে তিনি নিকটে গিয়া 'সুন্দরী' বলিয়া ডাক দিয়া তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু নাড়া দিলেই ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিত; তখন আর আমাদের কাহাকেও মানিত না। ইহার কারণ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

ইহাদিগের শিকার করিয়া খাইবার পদ্ধতি অতি চমৎকার। মধ্যে মধ্যে আমরা খাঁচায় ছাগল দিয়া দেখিয়াছি যে ঐ স্বল্পায়তন স্থানেই রীতিমত থাপ পাতিয়া ছাগলের টুঁটি কামড়াইয়া ধরিত। একেবারে মরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আর তাহাকে ছাড়িত না। প্রথম উহার রক্ত চাটিয়া খাইয়া ফেলিত, পরে উহার পেটের ১০।১২ আঙ্গুল পরিমিত স্থানের লোম, কামড়াইয়া কামড়াইয়া এমন ভাবে তুলিয়া পরিষ্কার করিত যে স্থানটী দেখিতে ঠিক আজকালকার বাবুদের ক্লিপ দিয়া ছাঁটা মস্তকের চামড়া দেখা যাওয়ার মত হইত। উহার মুখের ভিতর যে লোম প্রবেশ করিত, তাহা জিভ দিয়া এমন ভাবে পরিষ্কার করিত যে, একটী লোমও মুখে থাকিত না। পরে মুখ কাত করিয়া পরিষ্কৃত স্থানটী এমন ভাবে কামড়াইয়া, চামড়া কাটিয়া ফেলিত যে, ঠিক ছুরি দিয়া কাটার মত (incision) হইত। ঐ incisionএর উভয় পার্শ্বে পা দিয়া, এমন ভাবে চাপা দিত যে, উহার নাড়িভুড়ি গুলি বাহির হইয়া পড়িত। কোন কোন সময় ঐ কাটা স্থান দিয়া মুখ প্রবেশ করাইয়া, প্লীহা যকৃতও খাইত। তাহাতে মুখে যে রক্ত লাগিত, উহা জিভ দিয়া চাটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ফেলিত।

একটা প্রচলিত কথা আছে যে ক্ষুধার চোটে বাঘে ধান খায়। বাস্তবিক বাঘে ধান খাক্ আর নাই খাক্, আমার জানিত কোন স্থানে একটী খোঁয়াড়ে এক

বানর ধরিয়া খাইবার জন্য বাঘ নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে

যোড়া লেপার্ড পোষা হইত। প্রথম প্রথম উহাদের আহারের বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। পরে পালকের অমনোযোগে কিছুদিন উহাদিগকে আহার দেওয়া হয় নাই। ফলে একদিন দেখা গেল ক্ষুধার জ্বালায় বাঘিনীকে বাঘে মারিয়া খাইতেছে।

আর একটী হাস্যোদ্দীপক গল্প এখানে বলিতেছি। কোন বিশিষ্ট স্থানে, তত্রত্য বড় লোকের একটী পোষা টাইগার ছিল। তাঁহার 'লড়াইয়ে' ভেড়ারও খুব সখ ছিল। হঠাৎ একদিন একটি ভেড়া ছুটিয়া, তাঁহার সুয়োরাণীর প্রিয় দাসীর হাঁটুতে ঢুস্ দিয়া জখম করিয়া ফেলে। রাজার নিকট সেই অভিযোগ পৌছিলে, তিনি বিচার করিয়া এই গুরুতর অপরাধের জন্য ঐ ভেড়ার প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিয়া, উহাকে বাঘের মুখে সমর্পণের ব্যবস্থা করিলেন। রাজাদেশ পালিত হইলে, ভেড়া বেচারার মনের ভাব যে কি হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করা ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই। বাঘটি ভেড়াকে পাইয়াই যখন উহাকে ধরিবার জন্য, এক কোণে থাপ পাতে, তখন বেচারা ভেড়া, নিরুপায় হইয়া আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, ক্রমাগত পিছু হটিতে থাকে। যে মুহূর্তে দেওয়ালে উহার পিছন ঠেকিল, ভয়ঙ্কর বেগে ধাবিত হইয়া, শেষ চেষ্টা করিবার জন্য, বাঘের এর মাথায় এমন প্রচণ্ড বেগে ঢুস্ মারে যে, তাহাতে উহাকে একেবারে সরিষার ফুল দেখাইয়া দেয়। ইহার পরই বাঘের লাফালাফিতে, ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক বিষম আলোড়িত হইয়া উঠিল। ভেড়া যে দিকে যায়, বাঘও তাহার বিপরীত দিকে পালায়, আর কিছুতেই ভেড়াটিকে ধরিতে সাহস করে না। দুনিয়াই শক্তের ভক্ত। কিন্তু মহারাজের ন্যায়-বিচারে, ইহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ লঙ্ঘন হইতে পারে না বলিয়া, পরদিন পুনরায় উহার চারি পা বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

সর্ব্বত্রই দেখা যায় আত্মশক্তি ছাড়া আত্মরক্ষা হয় না। সব যুগেই সর্ব্বত্র, দুর্ব্বলে সবলে এই সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। যেখানে আত্মশক্তির বিকাশ হয়, সেইখানেই রক্ষা পাওয়া যায়; অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য্য।

এইরূপে একটী ঘোড়ার দ্বারা একটী বাঘিনী (tigress) কিরূপে জব্দ হইয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে বলিব।

বানর গুলি সাধারণত অত্যন্ত দুষ্ট জীব। কিন্তু লেপার্ড গুলি, ধূর্ত্ততায় ইহাদিগকেও অনেক সময় পরাস্ত করে। বানরের স্বভাবই এই যে, বাঘ দেখিলেই তাহারা পিছু নেয়। বাঘ চলিবার সময় বানর গুলিও উপরে উপরে গাছের ডালে ডালে লাফাইতে লাফাইতে অব্যক্ত শব্দ করিয়া নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গি করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে যায়। লেপার্ড গুলিও এমনি ধূর্ত্ত যে কখন কখনও ঘুমাইবার ভান করিয়া, মাথা গুজিয়া পড়িয়া থাকে; বানর গুলি তখন দূর হইতে উকি ঝুকি দিয়া আস্তে আস্তে নিকটে আসিতে থাকে। কোন কোনটী বা সত্যই ঘুমাইয়া আছে কি না তাহা পরীক্ষার্থ, খুব নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। এদিকেও ধূর্ত্ত বাঘ চোখ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া উহাদের কার্য্য কলাপ দেখিতে থাকে। যখনই তাহার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে মনে করে, তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া খপ্‌ করিয়া একটীকে ধরিয়া ফেলে।

আমাদের জমিদারীর অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে, হনুমান শ্রেণীর আর এক প্রকার বানর আছে; উহাদিগকে 'আঙ্গুল' বলে। ইহাদিগকে সময় সময়, এই প্রকারে, লেপার্ড কর্ত্তৃক হত হইতে দেখা যায়।

লেপার্ড ও টাইগারের মাঝামাঝি আর এক শ্রেণীর বাঘ আছে, তাহাদিগকে Jaguar (জাগুয়ার) বলে; উহাদিগকে আমেরিকায় পাওয়া যায়। টাইগার

লেখক ও তাঁহার নিহত ব্যাঘ্র

অপেক্ষা ইহারা বড় না হইলেও, প্রতিযোগিতায় ২১ ধাক্কা সামলাইতে পারে। এই জন্যই এই গুলিকে অনেকে আমেরিকান টাইগার বলিয়া অভিহিত করে। কলিকাতা পশুশালায় অনেক সময় ইহাদিগকে দেখা যায়। লেপার্ডের সঙ্গে ইহাদের মুখের ও গুলের পার্থক্য আছে। লেপার্ডের মুখ ও মাথা একটু লম্বা, কিন্তু জাগুয়ারের মুখ মাথা একটু গোল ছাঁচের হয়। আর গুলও লেপার্ডের গুল অপেক্ষা, যেন একটু বড় বলিয়াই মনে হয়।

এতদ্দেশে কোন কোন স্থানে, ব্লাক লেপার্ড নামক আর এক রকম বাঘ আছে। তাহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও একটু ছিপ্‌ছিপে রকমের হয়। ইহাদের চক্‌চকে কালো চামড়ার মধ্যে, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ গুল থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে পাবনা অঞ্চলে এইরূপ একটী বাঘ খোঁয়াড়ে ধরিয়া, পাবনা টাউনে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। পশুশালায় এগুলি সর্ব্বদা দেখা যায়।

আমাদের দেশে আর এক রকম ছোট জাতীয় বাঘ আছে তাহাদিগকে 'ফুলেশ্বরী' বাঘ বলে। উহারা অনেক সময় গাছে চড়িয়া থাকিতে ভালবাসে। বাস্তবিক 'ফুলেশ্বরী'রা যে নামেই অভিহিত হউক, উহারাও ছোট জাতীয় লেপার্ড।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

কাশ্মীর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৭শে অক্টোবর—আজ আহারাদি করিয়া হারোয়ান যাইব স্থির করিলাম। হারোয়ান এখান হইতে "নিষাদ" ও "সালে" বাগের রাস্তায় ১২ মাইল দূরে। সেখান হইতে শ্রীনগর সহরের জল সরবরাহ হয়। Mr. J বেলা ১টার উপস্থিত হইবা মাত্র উভয়ে বাহির হইলাম। টঙ্গা ভাড়া করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম অদ্য লাট সাহেব 'সালে' ও 'নিষাদ' দেখিতে যাইবেন বলিয়া টঙ্গা মেলা দুষ্কর। বাহির হইয়া আর ফিরিতে ইচ্ছা হইল না, অবশেষে ৫৲ টাকায় এক টঙ্গা স্থির করিয়া উভয়ে ১-৩০ মিনিটে বাহির হইলাম। রাস্তায় Mr. J-এর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া লিখিয়া আসিলাম যে ফিরিবার পথে দেখা করিব।

'গুপকর্' ও 'চশমাশাহী' ছাড়াইয়া আমরা হ্রদের ধারে সুন্দর সফেদা এভিনিউ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পাশেই পুলিশ পাহারা দাঁড়াইয়া লাট সাহেবের যাইবার রাস্তা রক্ষা করিতেছে। একটু পরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম "বাবা গোলাম দিনের জিয়ারত" ছাড়াইয়া আমরা নিষাধ বাগানের পার্শ্বে পৌছিলাম। লাটসাহেব সহচরগণ সহ ফিরিতেছেন অজুহাতে আমাদের গাড়ী আটকাইয়া রাখা হইল। আমরা তখন নামিয়া নিষাধ দেখিতে লাগিলাম। আজ সেই সুন্দর বাগানের সমস্ত ফোয়ারা গুলি বেগে জলের উৎস ছুটাইতেছে, আর নহর দিয়া নানা ভঙ্গীতে সেই স্বচ্ছ জলরাশি আসিয়া এক প্রপাতের সৃষ্টি করিয়া ডাল হ্রদে পড়িতেছে। ১৫।২০ মিনিট পরেই লাট সাহেবের ও দলের মোটর গুলি চলিয়া গেল, আমরাও পুনরায় রাস্তা চলিতে লাগিলাম। আর একটী সুন্দর গ্রাম অতিক্রম করিয়া দুই পাশের ফলের বাগান এবং কদাচিৎ আঙ্গুরের

নিষাধ বাগ ও ডলহ্রদ

কিন্তু গাড়োয়ান নামিয়া ঘোড়ার 'বান' টানিয়া দুধ বাহির করিয়া দিতেই ঘোড়া আবার চলিতে লাগিল।

সেই সুন্দর ঝরণা ধরিয়া আমরা উইলো বনের মধ্য দিয়া হারোয়ানের হ্রদের উপর পৌঁছিলাম। হুহুঙ্কার শব্দে sluice gate দিয়া জলরাশি বাহির হইতেছে। আমরা উপরে উঠিয়া হ্রদের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলাম।

সম্মুখে একটী বাঁধ দিয়া এই জলরাশিকে বদ্ধ রাখা হইয়াছে এবং sluice gate হইতে নল দিয়া ১২ মাইল দূরে শ্রীনগর সহরে লওয়া হইয়াছে। আমরা বাঁধের উপর দিয়া বামদিকে গিয়া দেখি সম্মুখে এক শীর্ণকায়া নদীর শুষ্কপ্রায় গর্ভ। এইটী 'তেলবন নদী বানাসা' একটী বাঁধ দিয়া এই নদীর, অধিকাংশ জলরাশিকে হ্রদের মধ্যে আনা হইয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বামদিকে নদীর অপর পারে মহাদেব পর্ব্বতের তুষার শৃঙ্গ দণ্ডায়মান, ডান্ দিকে গুপ্‌করের পর্ব্বতমালা, মধ্যে জঙ্গলপূর্ণ অপ্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া তেলবল' নালা উপল খণ্ডে প্রতিহত হইয়া মৃদু নাদে ডাল হ্রদের দিকে চলিতেছে! এখান হইতে এই নালার উৎপত্তি স্থল পর্য্যন্ত সমস্ত উপত্যকা হইতে মানুষের বাস উঠাইয়া দিয়া এই জলরাশিকে নির্ম্মল রাখা হইয়াছে। এখন উপত্যকার ভালুক, চিতাবাঘ বিশেষতঃ এক রকম হরিণ ও তিতির পক্ষী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

একটী মোড় ঘুড়িতেই দেখি একটী সাহেব ও মেম পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছে—বোধহয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া একজনের উপযুক্ত স্থানই যে দুইজনে দখল করিয়া আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। আমি অপ্রস্তুত হইয়া "sorry" বলিতেই সাহেব হাসিয়া

বাগানের মধ্য দিয়া আমরা 'সালে' বাগে পৌঁছিলাম। এখানেও আজ ফোয়ারা ও নহরে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে।

এই বাগান ছাড়াইতেই ডান দিকে হারোয়ান হইতে উৎপন্ন এক অতি সুন্দর প্রস্রবণ আরম্ভ হইল। এইখানে ঘোড়াটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। বহু চেষ্টায়ও তাহাকে চালাইতে না পারিয়া গাড়োয়ান বলিল "হুজুর,ইহার এক বাচ্চা আছে, তাহাকে দুধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে তাই চলিতেছে না।" কথাটা বিশ্বাস হইল না, কারণ কাশ্মীরীরা প্রায়ই সত্যকথা বলে না।

বলিল That's all right। নামিয়া সম্মুখে ফিরিতেই দেখি Mr. J—তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আমার পত্র পাইয়া এখানে আসিয়াছেন। টঙ্গা তখনই বিদায় দেওয়া হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাদিগকে "ইয়াসিন্" প্রদেশের নানাবিধ সৌন্দর্য্যের গল্প শুনাইতে লাগিলেন। 'ইয়াসিন' গিলগিতের অপর পারে, সেখানে নাকি জলের পরিবর্ত্তে ফলের রস ব্যবহৃত হয়।

নামিয়া আসিয়া দেখি Mr. J মোটরে বসিয়া আছেন। আমরা উঠিয়া বসিলাম, মোটর চলিতে লাগিল। হঠাৎ চারিদিকে ক্রমে অন্ধকার হইয়া মেঘ জমিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ শীত, আমরা জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখি প্রায় জমিয়া গিয়াছি। চা পান করিয়া গরম হইলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি সুরু হইল।

২৮শে অক্টোবর—সকাল বেলা উঠিয়া দেখি আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু বেজায় শীত। আজ বাঙ্গালী পোষাকে এখনকার কোনও পদস্থ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শঙ্কর পর্ব্বতের পাদদেশে গিয়াছিলাম—আর সেলাম নাই! ফিরিবার সময় Mr. J এর প্রকাণ্ড মোটরে আমি একা। তখন Resideucyতে লাট সাহেবের ফিরিবার বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছে এবং রাস্তার দুই পাশে পুলিশ দাঁড়াইয়াছে। লোক জনকে যাইতে দিতেছে না, কিন্তু মোটরের কোন বাধা নাই। অনেক পুলিশ বোধ হয় বড় আদমী বিবেচনায় হাত তুলিয়া আমাকে সেলাম করিল।

২৯শে অক্টোবর—আজ আকাশ অতিশয় পরিষ্কার। খুব সকালে অর্থাৎ ৮টায় উঠিয়া চা পানান্তে হাঁটিয়া গুপকরের দিকে রওনা হইলাম। বেশ রোদ উঠিয়াছে, একটু হাঁটিতেই শীত কাটিয়া গেল। একটু

নিষাধ বাগ

গুলমার্গ
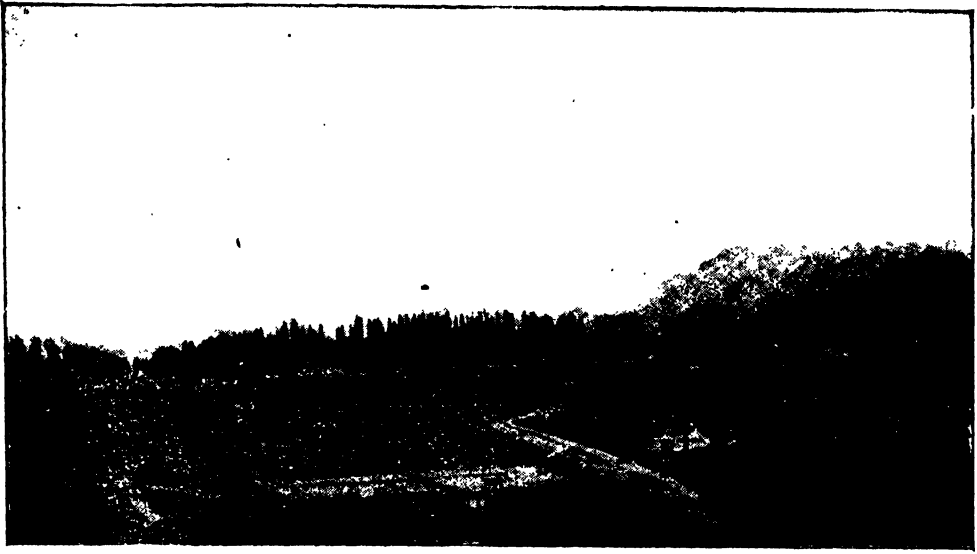
কায ছিল, সারিতে ১২টা বাজিয়া গেল। পুনরায় হাঁটিয়া বাসায় ফিরিলাম। শঙ্কর পর্ব্বতের পাশ দিয়া আসিতেই দেখি দূরে গুলমর্গের শৃঙ্গ উপত্যকা সমস্ত গভীর তুষারপাতে আচ্ছাদিত। যতদূর দৃষ্টি যায় বিরাট রজত প্রাকার উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে।

৩০শে অক্টোবর—আজ আর সকাল বেলা বাহির হইলাম না। প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি উঠানের ঘাসগুলি যেন একটু সাদা বোধ হইতেছে! পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম তুহিন (Frost)। একটী পাতা তুলিয়া দেখিলাম, অতি সূক্ষ্ম তুষার আকারে হিম জমিয়া আছে, কিন্তু পাতাটি শুষ্ক, দুইহাতে চাপিয়া ধরিতেই ভিজিয়া উঠিল। ইহা বরফ পাতের পূর্ব্ব সূচনা। আহারাদির পর গুপ-করে Mr. Jএর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহারা বাড়ী ছাড়িয়া ডাল হ্রদের মধ্যে হাউস বোটে উঠিয়া গিয়াছেন। বলিলেন শীতের সময় হাউস বোটে থাকাই নাকি সুবিধাজনক। আজ প্রথম শ্রীনগরের এক বিশেষত্ব এই হাউস বোটের ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিলাম।

প্রথমে সম্মুখে খানিকটা খালি যায়গা, তথায় চেয়ার পাতিয়া চা পানের ব্যবস্থা হইতে পারে বা গল্প গুজব চলিতে পারে। তাহার পর ভাঁড়ার ঘর (pantry), তাহার পর দরজা এবং ড্রয়িং রুম, সুন্দর আসবাব পত্র ও বৈদ্যুতিক আলোক। তাহার পর ভোজনাগার। তাহার পর শয়ন ঘর ও গোসলখানা এবং বাক্স জিনিষ পত্র রাখিবার গুদাম। ফলতঃ একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী বলিয়াই ভ্রম হয়। ছাদের উপর জলের চৌবাচ্চা হইতে গোসলখানা প্রভৃতিতে জল সরবরাহ হয়।

আজ দেওয়ালী। রাত্রে Mr. Jর সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। বিশেষ উৎসব কিছুই নাই। পাঞ্জাবীদের সকল বাড়ীই তৈল প্রদীপে সজ্জিত, কিন্তু কাশ্মীরীদের বাড়ীতে বিশেষ কোন চিহ্নই নাই। বাজারে মিঠাইয়ের দোকানে বেজায় ভিড়। Mr. Jর বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। একখানি পশমী কাপড় বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর থালা রাখিয়া আহার—কারণ পশম সকড়ি হয় না। এই জন্যই পণ্ডিতানীদের —ফেরণের আস্তিন হাত হইতে প্রায় ৯ ইঞ্চি লম্বা থাকে, তাহার উপর রুটী ইত্যাদি লইয়া তাহারা আহার করে।

৩১ অক্টোবর—৩রা নভেম্বর—এই সুদূর বিদেশে স্থানীয় বাঙ্গালী যুবকেরা থিয়েটারের উদ্যোগ করিয়াছে। তাহারা কাহার নিকট শুনিয়াছে যে আমি নাকি এ বিষয়ে ওস্তাদ, সুতরাং তাহাদের রিহার্সেল প্রভৃতি দেখিয়া সাহায্য করিতে হইবে। ফলে সমস্ত বিষয়টাই ঘাড়ে করিয়া লইতে এ কয়দিন ঐ ব্যাপারেই কাটিয়া গেল এবং অনুরোধে ঢেঁকি গিলিয়া আমাকেও দুইটি আবৃত্তি করিয়া দর্শকগণকে শুনাইতে হইল। নিরস্ত-পাদপে দেশে আমার মত এরণ্ডোহপি ক্রমায়তে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? ১লা নভেম্বর রাত্রে থিয়েটার হইয়া গেল। দর্শকগণ এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে পুনরায় সামনের রবিবার অভিনয় হইবে স্থির হইল।

শীত ক্রমেই বেশী হইতেছে। সকালবেলা মাঠের ঘাস একেবারে সাদা দেখায়।

৩রা নভেম্বর বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া চিত্রকর য—বাবুর বাড়ীতে কাশ্মীরের নানাস্থানের যে সমস্ত ফটোগ্রাফ দেখিলাম, তাহাতে কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলিবার কারণ বেশ বুঝা যায়। সেখান হইতে বাহির হইয়া চেনার বাগের দিকে গেলাম। আজ চেনার বাগ যেন রক্তবর্ণ বেণী পরিয়া বিবাহের সাজে সজ্জিতা নব বধুর মত দয়িতের অপেক্ষায় রহিয়াছে। মনে হয় যে এ স্থান হইতে আর কোথায়ও পাইব না। কিন্তু বসিবার উপায় নাই, না হাঁটিলেই জমিয়া যাইবার উপক্রম!

৪ঠা নভেম্বর আজ Mr. Qএর সহিত আমি ও Mr. J গুলমার্গ যাইব স্থির ছিল। কিন্তু বেলা ১টার সময় Mr. Q চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে আজ নানা কারণে যাইতে পারিবেন না, আগামী পরশ্ব তারিখে যাইবেন।

তখন আমরা বেড়াইতে বাহির হইয়া "মীরা" কদল পর্য্যন্ত যাইতেই সেই পরিচিত আহ্বান—"হুজুর শিকারা পর লে যাগা?" ফিরিয়া দেখি এক মুসলমান বালক। Mr J বলিলেন "চল।" শিকারা 'ঝেলম' নদীতে পড়িলে আর একখানা শিকারা আমাদের পাশ দিয়া যাইতেই বাইচ আরম্ভ হইল। একখানা অপর খানাকে অতিক্রম করিতেই সে ঘুরাইয়া দিয়া পথরোধ করে। আমরা আনন্দে এই ব্যাপার দেখিতেছিলাম। ক্রমে উত্তর

ক্লাবগৃহ গুলমার্গ
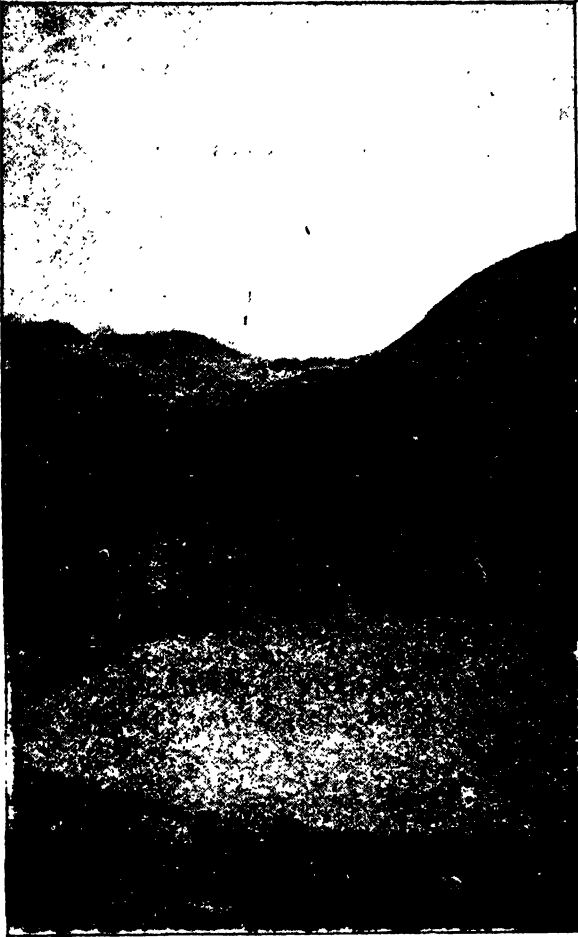
আফার ওয়াটস্থিত হ্রদ গুলমার্গ

পক্ষে ঝগড়া আরম্ভ হইল। তখন আমরা মিটাইয়া দিলাম। আমাদের নৌকায় তিনটী মুসলমান বালক মাঝি, তাহারা বেজায় আমুদে। নানা ভঙ্গীতে নৌকা চালাইয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।

বাসায় আসিয়া চা পানান্তে, সন্ধ্যার পর এক বন্ধু হাউসে বোটে গান শুনিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেখানে রওনা হইলাম। বৈদ্যুতিক আলোকে খচিত এক বিচিত্র হাউসবোটের কক্ষে ফরাস পাতা, তথায় আমরা গিয়া বসিলাম। কাশ্মীরী নর্ত্তকীর নাচগান দেখিব ও শুনিব বলিয়া অতিশয় কৌতূহল হইয়াছিল। কিন্তু প্রবেশ করিতেই সে আশা ভাঙ্গিয়া গেল। একটি সুন্দরী পাঞ্জাবী এবং একটী সুশ্রী কিন্তু মলিনা বালিকা আসিয়া আসরে উপবেশন করিবামাত্র। এক ওস্তাদজী এস্রাজ ও আর একটী বাঁয়া তবলা বাজাইতে আরম্ভ করিল, আর উভয়ে কোকিলকণ্ঠে সপ্তমে উর্দ্দু সঙ্গীত আলাপন আরম্ভ করিল। গায়িকা নানারূপ ভঙ্গী সহকারে গান করিতে লাগিল। বিশেষ যে বুঝিলাম তাহা নয়, কিন্তু সেই নদীবক্ষে বৈদ্যুতিক আলোকখচিত নৌকাবক্ষে তাহা বড়ই মিষ্ট লাগিতেছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা কাণে বাজিতেছিল। আর মনে হইতেছিল যে এই পরিবার গুলির জীবন কেমন? সমস্ত পরিবার হাউস বোটে থাকিয়া গান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, আর শীতের সময় দেশে ফিরিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র ১১ বৎসরের কোকিলকণ্ঠী বালিকার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মনটা দমিয়া যাইতেছিল।

৩ই নবেম্বর—সকাল বেলা উঠিতেই থিয়েটার পার্টির যুবকবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। আজই থিয়েটার করিতে হইবে—শুভস্য শীঘ্রং। আর কোথায়ও বাহির হওয়া হইল না। সন্ধ্যার সময় সকলে ধরিয়া বসিলেন যে আমাকে একটী গম্ভীর এবং একটী হাস্যোদ্দীপক আবৃত্তি করিতে হইবে। কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। আবৃত্তি করিতে বাহির হইয়াই দেখি, আসরে ভরপুর বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী ছাড়া কয়েকটী ইংরাজ অধ্যাপক সপত্নীক উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং বিষয়গুলি ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিয়া আরম্ভ হইল। ফলে কাশ্মীরে আসিয়া থিয়েটার করা ও বক্তৃতা করা দুইই হইয়া গেল। আমি ষ্টেজ ম্যানেজার। অভিনয়ের বিষয় "হরিশ্চন্দ্রের" শেষ গর্ভাঙ্ক ও "বিবাহ-

বিভ্রাট"। রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে বেশ প্রশংসার সহিত শেষ হইল।

গুল্‌মার্গ

৬ই নভেম্বর—সকালবেলা উঠিয়া হাঁটিয়া গুপকরে মিঃ জে-র সহিত দেখা করিতে গেলাম। এই পরিবারের সহিত বেশ হৃদ্যতা হইয়াছে। মিসেস্ জে তখন নৌকার বসিবার ঘরে একটী ছেলেকে খাওয়াইতে ছিলেন, উঠিয়া আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইনিও অতিশয় অমায়িক। একটু পরেই মিঃ জে শয়নঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। স্থির হইল তাঁহারা প্রতরাশ করিয়া লইলেই আমার সহিত আমার বাসায় আসিবেন এবং আমরা Mr J কে লইয়া গুল্‌মার্গ যাইব।

১১—৩০ এ আমরা বাহির হইলাম। বাসায় পৌছিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া লইয়া ওভার-কোট ও দস্তানা লইয়া মোটরে উঠিলাম।

১—১০ এ আমরা সহরের ক্ষুদ্র গলির মধ্য দিয়া তৃতীয় সেতু পার হইয়া অপর পারে পৌছিলাম। আর খানিকটা গিয়া আমরা সপ্তম অথবা শেষ সেতু পাইলাম। এইখানে একটী বাঁধ দিয়া এক কৃত্রিম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই খানেই দুধগঙ্গা নদী আসিয়া ঝেলমে মিলিত হইয়াছে। দুধগঙ্গা পার হইয়া আমরা একটী বৃহৎ পল্লীর ভিতর দিয়া চলিলাম—এইটী "ছাতা-বল"। আর খানিকটা যাইতেই আমরা সফেদাশ্রেণী সমন্বিত সেই ভুবনবিখ্যাত বরমূলার রাস্তায় পড়িলাম। গাড়ী এইবার বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। মিঃ জে দক্ষ চালক, মোটর ৩০ মাইল হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত বেগে ছুটিতে লাগিল। মোটরের পশ্চাতে পতিত সফেদা পত্রে, ধূলা ও ধূমে অন্ধকার হইয়া চলিতে লাগিল।

প্রায় ৯ মাইল যাইয়া আমরা চৌমাথায় পৌছিলাম। এখান হইতে বামদিকে গুলমার্গের রাস্তা গিয়াছে। ১৯ মাইলের পর গুলমার্গ। এ রাস্তাও তেমনি সুন্দর, ইহাতেও তেমনিই সফেদার শ্রেণী। একটু গিয়াই আমরা একটী স্বল্পতোয়া নদীর সেতুর উপর দিয়া পার হইয়া গেলাম।

বেশ পরিষ্কার আকাশ, সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা বড় বেশী বোধ হইতেছে না। প্রায় ৩.৪ মাইল গিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, পীরপঞ্জল পর্ব্বতরাজির উচ্চ প্রাকার তুষারমণ্ডিত অসংখ্য শৃঙ্গরাজি উচ্চে ধরিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, আর সম্মুখে গুলমার্গের রজত শৃঙ্গ। অথচ দূরে না চাহিয়া দেখিলে মনে হয় যেন বাঙ্গলার সেই সুজল, সুফল শস্যশ্যামল প্রান্তর—কেবল গাছগুলি বদলাইয়া গিয়াছে!

৩—১৫ আমরা 'টং মার্গে' পৌছিলাম। বাহিরে "মেমসাব্" হইলেও মিসেস্ জে ভারতীয় রমণী। তিনি একটী বড় ঠোঙ্গায় মিষ্টান্ন ও পাণ আনিয়াছিলেন। কিছু জলযোগ করিয়া আমরা ঘোড়ার খোঁজ করিতে লাগিলাম। একটী পাহাড়ী বালক তখনই দৌড়িয়া ঘোড়া আনিতে গেল। একটু অপেক্ষা করিয়া আমরা হাঁটিয়াই রওনা হইলাম, কারণ সময় বেশী ছিল না।

'টং মার্গ' পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এখান হইতে ৩ মাইল গিয়া এবং ৩০০০ ফিট উপরে উঠিয়া তবে গুল্‌মার্গ। শুনিলাম রাস্তায় বরফ নাই, 'গুল্‌মার্গ' না গেলে বরফ ছুঁইতে পারিব না। স্থির করিলাম যেমনেই হউক না কেন 'গুল্‌মার্গ' পৌছিতেই হইবে। মিঃ জে অসুস্থ ছিলেন, তিনি খানিকটা গিয়াই নিরস্ত হইলেন। এইখানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, পর্ব্বতের পাদ-দেশে দুই দিক হইতে দুইটী পার্ব্বত্য নদী ছুটিয়া আসিয়া কলনাদে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। উপর হইতে সেই মৃদু কলনাদ নবপরিণীতার সলজ্জ প্রণয়-সম্ভাষণের ন্যায় মধুর শুনাইতেছিল। পদতলে বিস্তৃত উপত্যকা পীরপঞ্জলের পদমূল স্পর্শ করিতেছে, আর তাহার মধ্যে সফেদাশ্রেণী খেলার ঘরের মত শ্রীনগর যাইবার রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

ইতিমধ্যে দুইটী সহিস ২টী ঘোড়া আনিয়া হাজির করিল। আমি এবং মিঃ জে অশ্বারোহণে পাহাড়ের পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিলাম। দার্জ্জিলিং-এরই রাস্তার মত, কিন্তু তুলনায় পথ অতি খারাপ।

সহিসেরা পাকদণ্ডী দিয়া চলিল। প্রায় একমাইল গিয়া আমি ঝাউগাছের শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অতি নির্জ্জন পথ—জনপ্রাণীর চিহ্নও নাই। সমস্ত লোক 'গুলমার্গ' ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। May হইতে September পর্য্যন্ত Season। সুতরাং এই নভেম্বর মাসে লোকজন না থাকিবারই কথা। হঠাৎ বামদিকে চাহিয়া দেখি, নালার মধ্যে কতকগুলি সাদা দোবরা চিনির মত কি পদার্থ রহিয়াছে। এই তো বরফ—মনে হইল লাফাইয়া খাদ পার হইয়া সেইদিকে যাই।

কিন্তু আবশ্যক হইল না। ২।৩ বাঁক যাইতেই চারিদিকেই সেই চিনির স্তূপ। দেখিতে দেখিতে রাস্তার পাশে—ক্রমে রাস্তার উপরেই বরফস্তূপ। সেই বরফ গলিয়া জল হইয়া এই বিশ্রী পথঘাটকে আরও বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছে। ঘোড়া কখনও রাস্তার উপর দিয়া, কখনও বরফমিশ্রিত কাদার উপর দিয়া, কদাচিৎ বা বরফের উপর দিয়া চলিতেছে—পদে পদে পদস্খলন হইতেছে।

এই অন্ধকার ঝাউগাছের বনের মধ্যে অপরিচিত পথে চারিদিকে বরফ স্তূপের মধ্যে আমি একা! মিঃ জে তখনও অনেক নীচে। গাটা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। অতি সাবধানে অশ্বচালনা করিতে লাগিলাম।

একটা শব্দ শুনিয়া দেখি মিঃ জে আসিতেছেন। আমি একটু অপেক্ষা করায় তিনি উঠিয়া আসিলেন। আমরা ঝাউবন ছাড়াইয়া একটু দ্রুত অশ্বচালনা করিতে লাগিলাম। একটু পরেই 'গুল্‌মার্গ' রেসিডেন্সির নিকট আসিয়া দেখি, সহিসেরা অপেক্ষা করিতেছে। আমরা ঘোড়া হইতে নামিয়া চলিলাম।

একটী রাস্তা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। তাহা প্রায় ৩ ফিট বরফে ঢাকা। তাহার উপর দিয়া চলিতে গিয়া পা হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া গেল, কিন্তু ভিজিল না! মনে হইল যেন চিনির গাদায় পা ডুবাইয়া দিয়াছি। সহিস বলিল যে সকাল বেলা হইলে এ বরফ এত শক্ত থাকিত যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পারা যাইত। সমস্ত দিন রৌদ্রের উত্তাপে বরফ এরূপ হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে আমরা অশ্বারোহণে উভয়ে বাজারের দিকে চলিলাম।

"গুলমার্গ" শব্দের অর্থ ফুলের স্থান, কিন্তু এখন এ একেবারে "বরফ মার্গ" হইয়া আছে। স্থানটি একটী পাহাড়ের মস্তকে বাটীর মত। বাটীর গর্ত্তের মধ্যে ক্ষুদ্র সহর। এখন একেবারে রূপার বাটী হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাস্তা প্রায় ২ ফুট বরফে ঢাকা। তাহারই মধ্যে প্রায় ১ ফুট চওড়া স্থান একটা পায়ে চলা রাস্তার মত এখনও বরফ শূন্য করিয়া রাখা হইয়াছে। কারণ এখন এখানে অনেক কুলী মজুর বড়লোকের বাড়ী নির্ম্মাণের কার্য্য করিতেছে। এই ক্ষুদ্র রাস্তা ধরিয়া আমরা বাজারে প্রবেশ করিলাম। বাজার জনশূন্য, দোকান পাট বন্ধ। ঘরের চালের উপর ১ ফুট, ২ ফুট এবং কোথায়ও বা আরও বেশী বরফ জমিয়া রহিয়াছে; আর তাহা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির জলের মত জল পড়িতেছে।

এখান হইতে আমরা সাহেবদের ক্লাব ও পোলো গ্রাউণ্ডের দিকে চলিলাম। সমস্ত মাঠ একটী বরফের গদি। লোভ সামলাইতে না পারিয়া বরফের উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। এখানে আর চিনি নয়—মিছরি। কোথায়ও বা ঘোড়ার পা ঢুকিয়া পড়িতে লাগিল, আবার কোথাও বা বরফ চূর্ণ হইয়া ছিটিয়া উঠিতে লাগিল, আর সেই সেই বরফ চূর্ণের গায়ে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ মক্ করিতে লাগিল।

তখন ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া Mr. J সেই জমাট বরফের উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার পদানুসরণ করিলাম। বরফের উপর লাঠির চাপ দিয়া নাম লেখা হইল। স্থানটি ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না। কিন্তু পাঁচটা বাজিয়া যায়, শ্রীনগর ফিরিতে হইবে। মিঃ জে অসুস্থ, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ দিক ও দিক আর

একটু ঘুরিয়া রেসিডেন্সি ব্রিজ্-এর উপর হইতে দূরে বিস্তৃত ভারতের বৃহত্তম পরিষ্কার জলের হ্রদ 'উলার' এর জল রাশি একবার দেখিয়া লইয়া এবং পর্ব্বত মস্তকে সাগর সমতল হইতে ১৪৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত "আফরয়াত" হ্রদের অবস্থান অনুমান করিয়া নামিতে আরম্ভ করিলাম।

বরফ গুলি মোটরের মধ্যে রাখিয়া সইসদিগকে বখসিস দিয়া রওনা হইলাম। উতরাইটা নামিয়া আসিয়া সমতল পথে ভীষণ বেগে মোটর ছুটিতে আরম্ভ করিল। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা দেখিতে দেখিতে একটি ডাকবাংলোতে পৌছিলাম। সেখানে চৌকিদার হুকুমমত কাফির সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, মোটর আসিতেই সমস্ত হাজির করিল। মিসেস্ জে কাফি প্রস্তুত করিলেন; আমরা ২ কাপ করিয়া পান করিয়া শরীর গরম করিয়া লইলাম।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। আমরা একটী ক্ষুদ্র চেনার অ্যাভিনিউ-এর ভিতর দিয়া চলিতেছি। মোটরের শব্দে দলে দলে কাক গাছ ছাড়িয়া উড়িতে লাগিল, আর চেনার পাতার রাশি পুষ্পবৃষ্টির মত আমাদের গায়ে পড়িতে লাগিল।

১৯ মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা শ্রীনগরের সফেদা শ্রেণী যুক্ত রাস্তায় পড়িলাম। ভীষণ বেগে মোটর ছুটিতে লাগিল, আর সেই নৈশ বাতাস যেন শাণিত ছুরিকার মত চোখে মুখে বিঁধিতে লাগিল। বাতাস কতটা ঠাণ্ডা তাহা এই বলিলেই বুঝা যাইবে যে, মোটরের মধ্যে বরফের ডেলা গলা দূরে থাক, আরও শক্ত হইয়া মিছরির মত হইয়া গেল।

৬ ৪০ এ বাসায় ফিরিয়া আমরা বন্ধু বান্ধবকে সেই গুলমার্গ হইতে আনীত বরফ উপহার দিলাম। আবার গরম চা পান করিয়া শরীর গরম করিয়া লওয়া গেল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

ভিটা সমস্যা

এতকাল পরে আমরা বাঙালীরা "দুঃখ সাগর সাঁতারি পার" হতে চলেছি, কিন্তু নৌকোর তলা ফুটো হয়ে যে জল উঠ্‌ছে,—তার উপায় কি? সভা-সমিতি, হুজুগ-হাঙ্গামা করে' আমরা হোমরুল পাবার জন্ম উঠে-পড়ে লেগেছি, আমাদের এ চেষ্টা প্রশংসনীয়,—তাতে সন্দেহ নেই! কিন্তু হোমরুল পাবার আগে যে আমাদের "হোম" বলবার কোনো জিনিষ বা জায়গা থাকবে,—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! বাঙালী তার যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েছে; নিরন্ন বাঙালীর ভিক্ষাই এখন জীবিকা। তবু একটা সান্ত্বনা ছিল যে, ভিক্ষালব্ধ যা খুদ-কুঁড়ো পাওয়া যায়, দিনান্তে তাই ফুটিয়ে খেয়ে, মনের আনন্দে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় মাথা গুঁজে থাক্‌তে পেতাম; এখন ক্রমে সে জায়গাটুকুও ধীরে ধীরে যেতে বসেছে। সব গিয়ে আমাদের গাছতলা সার হয়েছে, কিন্তু গাছতলাও যে আর থাকে না; এটুকু গেলে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে, রৌদ্র বৃষ্টি, ঝড়-ঝাপ্‌টা সবই যে আমাদের সহ্য করতে হবে!—এর উপায় কি?

আমরা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, তাই আমাদের চাল-চুলো, পিতৃপিতামহের ভিটেটুকু পর্য্যন্ত বিদেশীরা এসে গ্রাস করে বসছে; আর আমরা আশ্রয়হীন অবস্থায় পথে এসে দাঁড়াচ্ছি। কল্‌কাতার কথা না বলাই ভাল, কেন না অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে কিছুদিন পরে বাঙালীদের নিজস্ব এক হাত জায়গাও এখানে থাক্‌বে না; আর মারওয়াড়ীরা ত স্পষ্টই বলেছে,—কল্‌কাতাটা আমরা

কিনবো। তা ছাড়া বাঙলার বড় বড় সহরে, গ্রামে,—এক কথায় বাঙলার সর্ব্বত্র মাড়ওয়াড়ী ও অন্যান্য বিদেশীরা জায়গা কিনছে, বড় বড় বাগান বাড়ী করে, স্থায়ী ভাবে তারা বাঙলায় বস-বাসের চেষ্টা করছে। লেলুয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া থেকে আরম্ভ করে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত, এদিকে রামরাজা'লা থেকে আরম্ভ করে খড়্গপুর পর্য্যন্ত, ও দিকে দম-দম থেকে রাণাঘাট পর্য্যন্ত যে সব বড় ও হালফ্যাশানে সাজান নূতন বাগান বাড়ী চোখে পড়ে, সে সবই মারওয়াড়ীদের। এরা শ্যেনের মত সুযোগের প্রতীক্ষা করে, কোথাও একটু জায়গা বিক্রী হচ্ছে শুনলে, অমনি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ দামে সেটা কেনে। বিদেশ থেকে বাঙলায় এসে এরা ধনকুবের হয়েছে, ভিটে মাটী কিনে বাঙালার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হয়ে বসবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমাদের এখনও ঘুম ভাঙেনি, এখনও আমরা স্বপ্ন দেখছি; আর বাঙলা দেশের মাথা যাঁরা, তাঁরাও আড়চোখে নিঃশব্দে এদের কাণ্ড কারখানা দেখে যাচ্ছেন। বিদেশীরা বাঙলায় এসে ঐশ্বর্য্য ও সম্মানে শীর্ষস্থানীয় হয়েছে, কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ বাঙালী বাঙলার বাইরে গেছেন, আর শতে শতে প্রতি বছর দেশ-ছাড়া হচ্ছেন, এঁরা নিজেদের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি করতে পেরেছেন কি? ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই আমি ঘুরেছি, সব জায়গায়ই দেখি, দৈন্য-দরিদ্রতার পেষণে বাঙালীরা ত্রাহি ত্রাহি করছে। বাঙলার বাইরে গিয়েও বাঙালীরা কেরাণীগিরী, ওকালতি, ডাক্তারী আর মাষ্টারীই করছে। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে শতকরা একটি সংসারের অবস্থা এক রকম সচ্ছল। সমগ্র ভারতে প্রবাসী-বাঙালীদের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও সম্মানে যাঁরা শীর্ষ-স্থানীয়, আঙুলের রেখায় তাঁদের গণনা করা যায়। বাঙলা ছেড়ে দেশ-বিদেশে ছুটাছুটি করে কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে আমরা জীবন ধারণ করছি মাত্র, এই মরু-মরীচিকার পিছনে লক্ষ্যভ্রষ্টের মত ছুটে বেড়িয়ে, যা আমাদের নেই—তা পাচ্ছি না; যা আছে তা হারাচ্ছি। আর আমাদের এই পরিত্যক্ত অনাদৃত সোণার বাঙলায় বিদেশীরা এসে তাদের স্থায়ী বাসভবনের ভিত্তি স্থাপন করছে। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বাঙলা দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস করবার একটা আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মারওয়াড়ী ও অন্যান্য বিদেশীদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছে, তাদের এ আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক; ধীরে ধীরে তারা সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণও করছে।

বাঙলা দেশ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই নানা প্রকার অসুবিধা এবং কতকগুলা জিনিষ, দুষ্প্রাপ্য না না হলেও, সহজপ্রাপ্য নয়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জলকষ্ট, বিশেষ মারওয়াড়ীদের দেশ মারবাড়, জয়পুর, যোধপুর, বিকানের, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে জলের অভাব আরও ভীষণ ও ভয়াবহ। যাঁরা প্রত্যক্ষ করেন নি, তাঁরা এদেশবাসীদের জল ও অন্যান্য জিনিষের অভাবজনিত কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। মানুষের দ্বারা এসব দেশে জল তোলা অসম্ভব। যদি কোন ষণ্ডা-মার্ক গোছের লোক একাযে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে এক বাল্তি জল তুলতে, তার অন্ততঃ ১৫ মিনিট লাগবে। আড়াই পো ঘটির দুবটি জলশৌচ ও হাতমুখ ধুতে পেলে, এদেশের লোক ধন্য হয়; স্নানের নামে ঘটিখানেক জলে এরা মাথা ভিজোয়। ধূলিরাশির এত আধিক্য যে বিনা মেঘেই কখন কখনও চতুর্দ্দিক অন্ধকার হয়ে পড়ে; আর গ্রীষ্মকালে এদেশে যে ভীষণ অবস্থা হয়, তা বর্ণনাতীত। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিছুই সস্তা নয়, সুলভতার বিষয়ে বাঙলাদেশ সব দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এদেশে ভদ্রলোকের আহারোপযোগী চাল টাকায় ২ সের, মুগ কড়াই প্রভৃতি ডাল টাকায় ২সের, গম ৪ সের, ঘি আধসের, চিনি পোনে দুসের, গুড় তিন সের। যে পশ্চিমাঞ্চল দুধ-ঘিএর জন্য প্রসিদ্ধ, সে দুধ-ঘিও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। যোধপুর, বিকানের, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে তরি-তরকারি পাওয়াই যায় না; আজমীর বাঁদীকুই, রেবাড়ী, হিসার, যশল্মীর সর্ব্বত্র একই অবস্থা, প্রধান কষ্ট জলের। কোন কোন স্থানে জলের চিহ্ন মাত্র নেই, হাজার হাত নিচু ইঁদারা থেকে জল পাওয়া যায় না; মশক পূর্ণ করে উটের পিঠে স্থানান্তর থেকে জল আনা হয়। এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা

৯০ জন মারওয়াড়ী এরা বাঙলায় গিয়ে দেখে, কোন কষ্ট বা কিছুরই অভাব নেই, সব জিনিষই প্রায় হাতের কাছে রয়েছে, কাযেই নিজের মরুময় উসর দেশ ছেড়ে এরা বাঙলায় থাকবার জন্যে এত উৎসুক।

যে দেশেতে চল্‌তে গেলেই "দলতে হয় রে দুর্ব্বা কোমল"—সেই দেশ ছেড়ে মূর্খ আমরা এদেশ-সেদেশে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছি, আর আমাদের এই সোণার বাঙলায় বিদেশীরা এসে অর্থ ও ঐশ্বর্য্য ত আত্মসাৎ করছেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাপ পিতামহের ভিটেটুকুও হস্তগত করবার চেষ্টা করছে। পঙ্গুর মত বসে আমরা কেবল দেখছি; নিজের সম্পত্তি রক্ষা করবার কোন চেষ্টাই করছি না।

কলকাতার গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা বাস করেন এমন সব গলিতে, যেখানে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; থাকেন জঘন্য বাড়ীতে, তাকে অন্ধকূপ বল্লেও চলে; হাত-পা ছড়িয়ে বসবার জায়গা পর্য্যন্ত নেই। আর এঁদের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিমাসে অসম্ভব হারে ভাড়া দেন। আমাদের দেশে আমাদের গঙ্গাস্নানের জন্যে ঘাট করে দিয়েছে মারওয়াড়ীরা, হরিরাম গোয়েঙ্কা বেদিং ঘাট, ঝুনঝুনওলা বেদিং ঘাটে স্নান করে আমরা পুণ্য অর্জ্জন করি। ভাতের সঙ্গে ভিটে টুকুও যে আমরা হারাতে বসেছি, সেটুকু রাখবার উপায় কি?

বঙ্গের প্রত্যেক ভূম্যধিকারী,—তা তিনি একছটাক, এককাঠা, একবিঘা বা ৫০০ শত গ্রামের মালিক হোন না কেন, তাঁদের সকলের কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা,—ভিক্ষা,—নিবেদন এই যে, দশগুণ দাম পেলেও তাঁরা যেন আর বিদেশীর হাতে জমী না বিক্রী করেন। দুপয়সা কমে ভাইকে দেওয়া ভাল, তবু দশ পয়সা লাভে পরকে দেওয়া ভাল নয়; তাতে আমাদের সমূহ অনিষ্ট হবে। বঙ্গের Land Holders' Associationএর প্রত্যেক সভ্যের কাছে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরাও এবিষয়ে একটু মনোযোগ দিন। একটা শাখা সমিতি স্থাপন করে,' বিদেশীদের হাতে যাতে আর জায়গা না বিক্রী হয় সেই চেষ্টা করুন। অনিবার্য্য কারণে যাঁরা জমী বিক্রী করতে বাধ্য হন, তাঁদের উপযুক্ত বাঙালী খরিদ্দারের সন্ধান দেওয়া, উচিত মূল্যে জায়গা বিক্রী করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাযের ভার যদি এঁরা নেন, তাহলে স্বদেশ ও স্বজাতির অশেষ উপকার হবে।

আর কিছু দিন আমরা এমনি নির্ভাবনায় চুপ করে হাতগুটিয়ে বসে থাকি যদি, তাহলে অল্পদিন পরে বাঙলা দেশে বাঙালীর নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি আর বড় বেশী থাকবে না। "আমরাও একদিন শিক্ষিত ও সভ্য ছিলুম, একদিন আমাদেরও সব ছিল"—বলে' মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে, অতীতের স্মৃতি সম্বল করে' দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে, অতীতের দিনগুলো ফিরে আসবে না, বা আমরাও অতীতে ফিরে যেতে পারব না। যে জীবনে স্পন্দন নেই,—সে জীবন অসার, প্রাণহীন! আমরা কি চিরদিন এমনি প্রাণহীন জীবন বহন করব?

এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, যাতে আধ হাত জায়গাও আর বিদেশীদের না বিক্রী করি। যদি অনিবার্য্য কারণে কাউকে জমী বিক্রী করতেই হয়, তিনি যেন উচিত মূল্যে সেটা বাঙালীর কাছেই বিক্রী করেন।

এখন থেকে চোখ চেয়ে দেখে আর চোখ বুজে ভেবে যদি আমরা ভিটে-মাটি রক্ষা করবার চেষ্টা না করি, তা হলে এই বিদেশীরা একদিন অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে আমাদের বাঙলা থেকে তাড়িয়ে দেবে! আমরা "পর-দাসখতে সমুদায়" দিয়েছি, "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হতে চলেছি, অবশেষে কবির বাণী সার্থক করে আমাদের কি—"শেষ নিবেশ রসাতলে" হবে?

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

গল্প লেখিকার বিপদ

(গল্প)

হেমন্তের ম্লান রৌদ্র-বিভাসিত মধ্যাহ্ন। নিস্তব্ধ পথের দুই পার্শ্বের দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়া আহার করিতে গিয়াছে। গৃহস্থ বাড়ীর সদর দরজা রুদ্ধ। সকলেই বিশ্রাম সুখে শয়ান। কলিকাতা হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীর নিভৃত কক্ষে বসিয়া একটি কিশোরী নিবিষ্ট মনে পুস্তক পাঠ করিতেছিল। একরাশি ভিজা চুল তাহার পিঠের উপর এলায়িত। শিথিল অঞ্চলটি তাহার আলতা পরা ছোট পা দুখানির কিয়দংশ আবৃত করিয়া মেঝের উপর লুটাইতেছিল। মধ্যাহ্নের অলস সমীরণ ধীরে ধীরে গবাক্ষের রঙ্গীন পর্দ্দা দোলাইয়া বারান্দার টবের ফুল গাছগুলির শাখাপত্রে কম্পন তুলিয়া, তরুণীর স্তূপাকারে ছড়াইয়া পড়া চুল লইয়া খেলা করিতেছিল। কোথা হইতে নানাবর্ণের এক ঝাঁক পায়রা উড়িয়া আসিয়া মেয়েটির অনতিদূরে ছাতের আলিসার উপর বসিয়া তাহাদের বিচিত্র ভাষায় ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। সেই শব্দে সচকিত হইয়া মেয়েটি হাতের বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া আলমারীর কোণ হইতে একটি চায়ের টিন বাহির করিল। তাহার মধ্য হইতে কয়েক মুঠা ধান বারান্দায় ছড়াইয়া দিয়া সে পথের ধারের জানলাটির নিকটে দাঁড়াইল। ঘনকৃষ্ণ নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি ক্ষণকাল বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া টেবিলের নিকটে ফিরিয়া আসিল। দেয়ালের গায়ে ব্রাকেটের উপর রক্ষিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া, একখানা নীল রঙের খাতা দেরাজের মধ্য হইতে টানিয়া লইয়া কিশোরী লিখিতে বসিল। প্রথমে কয়েক ছত্র লিখিয়া, কাটিয়া, তাহার সঙ্গীহীন হৃদয়টা ধীরে ধীরে লেখার মধ্যে তন্ময় হইয়া গেল। সে নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতার সহিত খাতা খানির বুকে রেখার পর রেখার মালা গাঁথিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পর সিঁড়িতে মৃদু জুতার শব্দ হইল, কিন্তু লেখিকার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। একটি একুশ বাইস বছরের যুবক সিঁড়ির মাথায় জুতা খুলিয়া হাতের বই দুইখানা জানলার উপর রাখিয়া মৃদুমন্দ পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে গৃহে প্রবেশ করিল। যুবকের সুন্দর মুখখানি সকৌতুক হাসিতে সমুজ্জ্বল। যুবক মেয়েটির দিকে অগ্রসর হইতেই মেয়েটি হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চমকিয়া উঠিল। আনন্দে তাহার ডাগর চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লুণ্ঠিত শাড়ীর অঞ্চলখানা মাথায় তুলিয়া দিয়া দীপ্ত মুখে কিশোরী কহিল, "ভেবেছিলে আমি বুঝি তোমার পায়ের শব্দ টের পাব না? তুমি জুতো খুলেই চল, আর খালি পায়েই চল, আমি কিন্তু তোমার সবই টের পেয়ে থাকি। আচ্ছা তখন-না ব'লে গেলে তোমার চারটে পর্য্যন্ত কলেজ, ছুটোর সময়ই যে বড় পালিয়ে এলে?"

"না এসে কি করি? হঠাৎ তোমার কথা মনে হ'য়ে কিছুতেই যে থাকতে পারলাম না; তুমি তো আমায় ভুলে বেশ মনের সুখে কি সব লিখছিলে আরতি, কিন্তু আমি যে তোমায় ভুলে এক মিনিটও থাকতে পারি না।"—বলিয়া সুব্রত স্ত্রীর চিবুকটিতে হাত দিয়া অনুচ্চকণ্ঠে গান ধরিল :—

মধুর সে মুখখানি
কখনও কি ভোলা যায়,
জমায়ে চাঁদের সুধা
বিধি গড়েছিল তায়।"

স্বামীর বাহুবন্ধনে ধরা না দিয়া, আরতি আস্তে আস্তে কহিল, "আর মধুর মুখের কথা শোনাতে হবে না গো, থাম। সত্যি, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ছেলেখেলা এখন কি আর ভাল দেখায়? মা যদি কাশী থেকে এসে শোনেন তুমি কলেজ কামাই ক'রে সমস্ত দিন আমাকে নিয়েই"—

"তুমি কি অসত্যবাদী, আরতি! অম্লান মুখে বলে ফেল্লে আমি সমস্ত দিন তোমাকে নিয়েই কাটাই? সেই দশটায় বেরিয়ে ছুটোয় ফিরলাম, অর নাম সমস্ত দিন? আমাদের দেড় বছর মাত্র বিয়ে হ'য়েছে—এখনি ছেলেখেলা থামিয়ে বুড়ো হবার উপদেশ দিচ্ছ—তুমি কি নিষ্ঠুর! আর বছর বি-এ ফেল হবার পর সবাই বলেছিল, আমি তোমাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পড়াশুনা না করেই ফেল হয়েছিলাম। তাই এবার তুমি খুব সাবধান হ'য়েচ, সহজে ধরা দিতে চাও না। কিন্তু এটা তোমার বড় অন্যায়। পরীক্ষায় আরবারে পাশ হই নি, এবার অবশ্য হ'তে পারব; কিন্তু যেদিনগুলো যাচ্ছে, এ আর ফিরে পাওয়া যাবে না।"

লজ্জিতা আরতি প্রেমপূর্ণ নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার কলেজের কাপড় জামাগুলি আলনায় সাজাইয়া রাখিল। চেয়ারখানা একটু ঠেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জল-খাবার নিয়ে আসি?"

"খাবার জন্যে ব্যস্ত কি আরতি? পথের দুধারেই তো মেলা খাবার মেলে—কিন্তু এ মুখখানি যে কোথাও মেলে না।" বলিয়া সুব্রত আরতিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। সেই প্রেম-প্রীতি পূর্ণ বক্ষে মাথা রাখিয়া পুলকে মুদ্রিত-নয়না আরতি কি এক অনির্ব্বচনীয়, মধুর স্বপ্নে বিভোর হইয়া গেল।

২

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাদে মাদুরের উপর বসিয়া সুব্রত আরতির প্রতীক্ষা করিতেছিল। তখনো রজনীর অন্ধকার আলো-ভরা ধরণীর বুকে নামিয়া আসে নাই। মেঘমুক্ত নির্ম্মল নীল আকাশের কোণে সবে চাঁদ উঠিয়াছে।

চুল বাঁধিয়া, গা ধুইয়া, একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পরিধান করিয়া, রূপার ডিবায় গুটি কয়েক পাণ লইয়া আরতি নিঃশব্দে স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মাদুরের উপর ডিবাটি রাখিয়া অঞ্চলের মধ্য হইতে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিয়া বলিল, "দেখ, একটা নূতন জিনিষ এসেছে।" সুব্রত হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর হস্ত হইতে পুস্তকখানা লইয়া বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মধুকর তুমি কোথায় পেলে আরতি? 'ভুল' গল্পটা যে তোমারি লেখা দেখছি। তোমার লেখা ওরা কোথা থেকে পেলে?"

"অনেক দিন আগে তরু বেড়াতে এসে 'মধুকরে' আমার লেখা পাঠাতে বলেছিল, তরু মধুকরের গ্রাহিকা কিনা;—তাই একটা গল্প পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মধুকর সম্পাদক মনোমোহন বাবু আমাকে একখানা চিঠিও লিখেছেন।" বলিয়া খামে ভরা চিঠিখানা আরতি স্বামীর নিকটে রাখিল। সুব্রত চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া নীরবে পাঠ করিল। 'মধুকর' সম্পাদক অতি বিনয়ের সহিত আরতির লেখার প্রশংসা করিয়া তাহার নিকটে পুনরায় রচনা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। কিন্তু চিঠিখানা পড়িয়া, আরতির নব-প্রকাশিত গল্পটি দেখিয়া সুব্রত প্রীত হইতে পারিল না। তাহার তরুণ হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে কিসের ব্যথা যেন বারবার বিঁধিতে লাগিল।

আরতি তাহাকে গোপন করিয়া অপরিচিত যুবকের নিকটে হৃদয়ের সুধাভাণ্ড কেন খুলিয়া দিল? আরতি যে তাহারই, তাহার মুখের মধুর হাসি, চোখের অমৃত-ময় দৃষ্টি, কণ্ঠের ললিত-মধুর ঝঙ্কার—সর্ব্বোপরি হৃদয়ের নব-নব উচ্ছ্বাস সমস্তই যে বিধাতা একমাত্র সুব্রতের জন্যই সৃজন করিয়া দিয়াছেন। স্বামীর অজ্ঞাতসারে অপরের নিকট চিঠি লেখা এবং গল্প পাঠানো যে তরুণী নারীর পক্ষে কতবড় গর্হিত কার্য্য, তাহার পরিণাম স্মরণ করিয়া সুব্রত শিহরিয়া উঠিল। আরতির বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাহার চক্ষে জল আসিল। হায়! সে যে সর্ব্বস্ব বিকাইয়া স্ত্রীকে ভালবাসিয়াছে। তাহার নিকটে যে সুব্রতের কিছুই লুকান নাই। আর সেই স্ত্রী একজন অপরিচিত পুরুষের কাছে প্রেমের গল্প পাঠাইয়া, চিঠি লিখিয়া, তাহার জ্যোৎস্না-বিলসিত হৃদয়ে নিরাশার কালিমা নিক্ষেপ করিল!

অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুব্রত কহিল, "তুমি মুখে যাই বল না আরতি, কিন্তু মন তোমার আমায় মানুষ বলে স্বীকার করে না; যে বি-এ ফেল করেছে সে আবার মানুষের মধ্যে গণ্য হ'বে কেমন ক'রে? তাই এতবড় একটা কায করেচ আমায় জিজ্ঞাসাও করনি।"

সুব্রতের কথা শুনিয়া আরতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বক্ষের মধ্যে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস উছলিতে লাগিল। সে যে বড় আশা করিয়া তাহার জীবনের প্রথম গোপন অনুশীলনের ফল স্বামীকে দেখাইতে আসিয়াছিল—ভাবিয়াছিল তাহার উত্তম দেখিয়া স্বামী নিশ্চয়ই আনন্দে অভিভূত হইবেন। তাঁহারই উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার হৃদয়-নদীর তটে কত সুখের আঘাত লাগিবে। কিন্তু তাহার ভুল ধারণা মুহূর্ত্তের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল। সে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি ওকথা বল্লে আমার খুব কষ্ট হয়। তরু বলেছিল মাসিক পত্রে রাম-শ্যাম সবাই গল্প লেখে, ও জিনিষটি না হলে এখন কাগজই চলে না; তুই দু একটা যা লিখেছিস এবার পাঠিয়ে দে।" তাই আমি তোমায় না জানিয়ে পাঠিয়েছিলাম; ভেবেছিলাম লেখা ফারত আসবে; তখন তোমায় সব জানাব।"

"তোমার প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ও সবার আগে আমার জান্‌বার কথা আরতি; আমার চেয়ে তরু তোমার অন্তরঙ্গ নয়; তা সে বাল্যবন্ধুই হোক্ আর প্রাণের সখীই হোক্। কিন্তু আমি বরাবরই লক্ষ্য করেচি তুমি আমার চেয়ে তাকেই বেশী ভালবাস।"

সুব্রতর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল। সে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া চন্দ্র তারায় ভূষিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। সামান্য একটি তুচ্ছ ঘটনায় তাহার অনাবিল, উচ্ছ্বসিত প্রেমধারার প্রবাহ অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। অনুতপ্ত, ব্যথিত আরতি স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া নীরবে নতমস্তকে আপনার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সুব্রত যে আজ তাহাকে তাহার বাল্য-সখী তরুর প্রতি অধিক ভালবাসার অনুযোগ করিল, ইহা খণ্ডন করিবার জন্ম গভীর প্রেম-পূর্ণ প্রতিবাদ করিতে সে সাহস করিতে পারিল না। হায়! বিমূঢ়া কি-কথা বলিতে কি-কথা বলিয়া অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া বসিবে? সামান্য কৌতুকের জন্ম যাহা করিয়াছে তাহা কেমন করিয়া ফিরাইয়া আনিবে?

৩

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আরতি স্থির করিল সে আর গল্প লিখিবে না। যাহাতে স্বামী অন্তরে আঘাত পান, তেমন কাযে হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু তাহার তরুণ হৃদয়াবেগ কিছুতেই বক্ষের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছিল না। সে কোনও উপায়ে বাহিরে প্রকাশ হইতে চায়। বিশেষতঃ যশের পিপাসা তাহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 'মধুকরের' পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে নিজ নামটি চক্ষের সম্মুখে আনন্দ রস বিকীর্ণ করিতে লাগিল, গল্পটি পড়িয়া কিছুতেই যেন আরতির তৃপ্তি হইত না। সে বেশ ভালরূপেই জানিত, যত বড় বড় খ্যাতনামা সাহিত্যিক সকলেরই হাত খড়ি প্রথমে কবিতা, পরে ছোট গল্পের মধ্য দিয়াই। তাই আজ মুগ্ধা কিশোরী আপনার মনের মধ্যে একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিল। সেই মায়ারাজ্যের মাঝে বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের পাশে আপনার স্থান দেখিয়া গর্ব্বে, আশায় তাহার হৃদয়খানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কয়েকদিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইতস্ততঃ করিয়া সে সুব্রতকে গোপন করিয়া পুনরায় গল্প লেখা আরম্ভ করিল। স্বামীর সাড়া পাইলেই তাঁহার চক্ষের সম্মুখ হইতে সযত্নে খাতা, কাগজগুলি লুকাইয়া ফেলিত—যেন কত বড় অপরাধের কায করা হইতেছে।

সেদিন দ্বিপ্রহর বেলা; তরু বেড়াইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মধুকরে এবার কোন গল্প পাঠালি আরতি?"

"কিছু পাঠান হয়নি ভাই। সেদিন তিনি গল্প দেখে চিঠি পড়ে বড্ড রাগ ক'রেছেন। তাঁকে না ব'লে গল্প পাঠান যে কতবড় অন্যায় হয়েছিল, তা বলবার নয়।"

"অন্যায় না, তোর মাথা হয়েছিল! এখন তো অনেক মেয়েরাই কাগজে লেখে, অবশ্য তাদের সঙ্গে তোর তুলনা দেওয়া মিছে; কারণ আর সকলের স্বামী বোধহয় সুব্রত বাবুর মত গবুচন্দ্র নয়। আমার সঙ্গে তোর ছেলেবেলা থেকে ভাব, তাই সে সইতে পারে না; সেই স্বামী আবার সম্পাদকের কাছে তোকে লেখা পাঠাতে দেবে, চিঠি লিখ্‌তে দেবে—তবেই হয়েছে!"

স্বামীর নিন্দায় আরতির সহাস্য মুখ অকস্মাৎ মলিন হইয়া গেল। সে ব্যথিত স্বরে বলিল, "তাঁর কোন দোষ নেই তরু, তিনি আমায় খুব ভালবাসেন বলেই—"

আরতির মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া তরু উত্তর করিল, "হাঁগো, হাঁ, আর নিজের মুখে ব'লতে হবে না। তোরই বর কেবল তোকে ভালবাসে না, সকলের বরই সবাইকে ভালবেসে থাকে। তুই যতই ঢাকতে চাস না কেন আরতি, কিন্তু সুব্রত বাবু ভারি ছেলেমানুষ। বাইশ বছরে পুরুষের এত পাত্‌লা বুদ্ধি ভাল নয় ভাই।"

আরতি সখীর প্রতি বিমুখ হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। আজ অন্য কেহ যদি তাহার কাছে সুব্রতের অল্প বুদ্ধির প্রসঙ্গ তুলিত, তবে সে কিছুতেই সহিতে পারিত না; কিন্তু তরুর কথা স্বতন্ত্র। তরুকে সে খুব ভালবাসে, সেই ভালবাসার জোরে তরুর এতটা বাড়াবাড়ি সে সহিয়া গেল। কিন্তু রাগে তাহার মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। তরু সখীর প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়া তাহার গণ্ডে চম্পক অঙ্গুলির টোকা দিয়া কহিল, "বড় যে চুপ করে রয়েছিস? রাগ হয়েছে? পতিনিন্দে শুনে এবার সতীর দেহত্যাগ হবে নাকি? সত্যি কথা বলেছি তাতে রাগ করিস কেন ভাই? তুই হোস্‌ না কেন সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী, তাই বলে সুব্রত বাবু যে তোকে চোখে চোখে হারাণ্‌ সেটা ভাল নয়।"

তরুর চোখে চোখে হারানোর কথা শুনিয়া আরতির গাম্ভীর্য্য আর টিকিয়া রহিল না। সে প্রসন্ন হাস্যের সহিত এবার তরুকে ক্ষমা করিয়া ফেলিল। গভীর ভালবাসার কাছে অভিমান অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। অন্যান্য কথার পর তরু যখন আরতিকে সঙ্গিনী করিয়া শিবপুর বাগানে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল, তখন আরতি 'না' বলিতে পারিল না। তরুর চোখে চোখে হারাণোর বিষের জ্বালা তখনো তাহার অন্তর হইতে নির্ব্বাপিত হয় নাই। স্থির হইল, আগামী কল্য বেলা দশটার পর দুই সখী বটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে যাইবে। সঙ্গে আরতির দিদির ছেলে অতুল থাকিবে। কোনও পক্ষের স্বামী মহাশয়দের লইয়া যাওয়া হইবে না, কারণ ইতিমধ্যে তাঁহারা স্ত্রী-বেচারাদের ফাঁকি দিয়া থিয়েটারে নূতন একটা অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের ফাকি দেওয়াই উপযুক্ত প্রতিশোধ।

৪

সন্ধ্যার ম্লান আভা তখনো আলোভরা, হাস্যভরা ধরণীর বুকে নামিয়া আসে নাই। প্রশান্ত নীলাকাশে সবেমাত্র সন্ধ্যা-তারাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পদ্মকাটা আসনের সম্মুখে একখানি কাঁসার রেকাবে কয়েকখানা গরম লুচি, ফুলকপির ডাল্‌না রাখিয়া আরতি স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "খাবার দিয়েছি, খেতে বোস।" সুব্রত আহারে বসিলে একটা চিনামাটির প্লেটে দুটি সন্দেশ, দুটি বড় বড় রসগোল্লা লইয়া আরতি স্বামীর পাতের কাছে রাখিয়া পাণ সাজিতে গেল। সুব্রতের আহার হইলে তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিয়া, মুখে পাণ তুলিয়া দিয়া আরতি বলিল, "আমি নীচে থেকে চট ক'রে রান্নার যোগাড়টা করে দিয়ে আসি; তুমি একটু বোস। আজ তরু এসেছিল কিনা, তাই কুট্‌নো টুট্‌নো কিছু হয় নি। কাল সে আমায় শিবপুর বাগানে বেড়াতে

নিয়ে যাবার জন্ত জেদ ধরেছে। ওর স্বামী সেদিন তোমাদের নিয়ে থিয়েটার দেখে এসেছেন, তাই কাল ও আমার নিয়ে অতুলের সঙ্গে বেড়াতে যাবে।"

সুব্রত স্মিতহাস্যে কহিল, "তোমার সখীটি বড় দুরন্ত মেয়ে আরতি; স্বামীর সঙ্গে সমানে সমানে চলতে চান; তোমাকেও আবার তাঁর পথে টেনে নেবার ইচ্ছে। আমি যদি তোমায় কাল না যেতে দিই?"

তরুর বিদ্রূপের কশাঘাত আরতি বিস্মৃত হয় নাই। স্বামী তাহাকে না যাইতে দিলে তরু যে কিরূপ তীব্র-ভাষায় কাপুরুষ সন্দিগ্ধ-চেতা বলিয়া সুব্রতের উদ্দেশে আরতির উপর বাক্যবাণ বর্ষণ করিবে তাহা কল্পনা করিতেই আরতির হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সতীনারী অপরের মুখে স্বামীর নিন্দা কোনরূপেই সহ্য করিতে পারে না। প্রিয়তম অপেক্ষা প্রিয়তমের সুনাম তাহাদের বেশী প্রিয়। হাত দুটি যোড় করিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে আরতি বলিল, "কালকের দিনটা তুমি আমায় যেতে বারণ কয়ো না লক্ষ্মীটি, আর আমি কখ্খনো তোমায় ফেলে কোথায়ও যেতে চাইব না।"

স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়া সুব্রত উত্তর করিল, "ভয় নেই, যেয়ো, আমি তোমায় বন্ধ ক'রে রাখবো না আরতি। সন্ধ্যার আগেই কিন্তু ফিরে আসা চাই।" সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া আরতি নীচে চলিয়া গেল।

একা বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া সুব্রত মাকে চিঠি লিখিবার জন্ত চেয়ারখানা টেবিলের কাছে টানিয়া লইল। ব্লটিং বহির মধ্য হইতে একখানা চিঠির কাগজ বাহির করিতেই, তাহার সহিত একখানি লেখা কাগজ বাহির হইয়া আসিল। আরতির হস্তাক্ষর দেখিয়া কৌতূহলী সুব্রত কাগজখানা খুলিয়াই চমকিয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। স্পন্দিতবক্ষে সুব্রত কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে লেখা ছিল :—

প্রিয়তম,

কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার চিঠিখানা পাইয়াছি। চিঠিখানা সমস্ত রাত বুকে করিয়া রাখিয়াছি। এখনো বুক হইতে নামাইতে পারি নাই। তুমি অধীর হইও না; এটা নিশ্চয়ই জানিয়ো "আ", "ম" ছাড়া আর কাহারো নহে। জীবনে মরণে তুমিই আমার একমাত্র প্রিয়তম; আমি তোমারই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জগতের কোন শক্তিই আমাদের মিলন পথের বাধা হইতে পারিবে না। আমাদের অনন্ত অসীম প্রেম; একদিন না একদিন সমস্ত বাধা বিদূরিত করিয়া সৌর-কিরণের মত আলোক বিকীর্ণ করিবে। সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া বর্ত্তমানের দুঃখ, ব্যথা, বিচ্ছেদ সহিতে হইবে।

প্রিয়তম আমার, তোমাকে দেখিতে, তোমার ক্ষণিক স্পর্শের জন্ত আমিও যে তোমারি মত উন্মুখ তা কেমন করিয়া জানাইব? তাই মনে মনে একটি ফন্দী করিয়াছি, কাল আমরা শিবপুর বেড়াইতে যাইব। গরম ঘরে (Hot-house) যাইয়া মাথা ধরার অছিলায় আমি বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িব, সে স্থানটা খুব নির্জ্জন, সাথীদের অজ্ঞাতসারে আমি অবশ্যই তোমার সহিত দুই একটা কথা কহিবার সুযোগ করিয়া লইব। তুমি বেলা তিনটা হইতে সেখানে বসিয়া থাকিবে। আজ আর বেশী লিখিবার অবসর নাই।

ইতি,—

তোমার—"আ।"

সুব্রত দুইহাতে বুক চাপিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। তরুর সহিত আরতির বেড়াইতে যাইবার উদ্দেশ্য সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। অব্যক্ত যাতনায় তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছিল। নারী এমন ছলনাময়ী, নিষ্ঠুর হইতে পারে এটা সে একবারও কল্পনা করিতে পারে নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল "ম" আর কেহ নয়,—এ সেই মধুকর সম্পাদক মনোমোহন বাবু। সুব্রত একদিন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিল। লোকটি এখনও যৌবন-সীমা অতিক্রম করে নাই। জন-সমাজে সুপুরুষ বলিয়া দাবী রাখিবার স্পর্দ্ধা রাখে; সুকবি বলিয়া খ্যাতিও আছে। আরতির পিতা বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া মেয়েকে লেখা-

পড়া শিখাইয়াছিলেন, মনোমোহন বাবুই যে সেই গৃহ-শিক্ষক নহে একথা কে বলিতে পারে? সুব্রত মুদ্রিত নয়নে, অশান্ত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ মর্ম্মান্তিক রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পর সুসজ্জিতা আরতি গৃহে প্রবেশ করিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শুয়ে রয়েচ কেন? অসুখ ক'রেনি তো?"

সুব্রত ইঙ্গিতে জানাইল তাহার অসুখ করে নাই। কথা না বলিলেও স্ত্রীকে নিকটে পাইয়া তাহার শোক-সমুদ্র যেন উছলিয়া উঠিল—দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। ফুলের মত সুকোমল হাত দিয়া আরতি যখন তাহার শীতল ললাট স্পর্শ করিল, তখন আর সুব্রতর অবাধ্য অশ্রু কোন শাসন মানিল না। ফোঁটার পর ফোঁটা ঝরিয়া উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সন্ধ্যার ম্লান আলোকে আরতি তাহা দেখিতে পাইল না। অনেক দিন স্বামীকে গান গাহিয়া শোনান হয় নাই বলিয়া আজ অপরাহ্ণেই সুব্রত স্ত্রীকে অনেক অনুযোগ করিয়াছিল। হঠাৎ সেইটা স্মরণ করিয়া আরতি স্বামীর চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত সেতার বাজাইয়া মধুর স্বরে গান ধরিল:—

"কি রাগিণী বাজালে—মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে; তাহা তুমি জান!"

আজ আরতির এ সঙ্গীত সুব্রতকে যেন বজ্রাঘাতে ভূপতিত করিয়া ফেলিল। সে মনে মনে বলিল "পাষাণী, তোমার মনোমোহনের রাগিণী আমি জানিয়াছি। তুমি কিসে মোহিত হইলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি জানি তুমি তাহার কবিতায়, তাহার রচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছ। তোমার পাপ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার পথে আমি কণ্টক হইব না। ছলনাময়ী, তোমার ছলনারই জয় হইবে। পতঙ্গের পাখা পোড়াইবার মত কাল তুমি অনল-কুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িও; আমি তোমায় বাধা দিব না।"

৫

পরদিন বেলা দশটায় সুব্রত কলেজে যাইবার সময় আরতি আস্তে আস্তে কহিল, "তুমি আমায় না বল্লেও আমি বেশ বুঝিতে পেরেছি, কাল সন্ধ্যে থেকে তোমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মনটাও ভাল নয়, কি হয়েচে আমায় বল?"

আরতির কণ্ঠস্বর স্নেহ-কোমলতায় আর্দ্র। সুব্রত উদাস দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, "তোমার চিন্তা করতে হ'বে না। আমার কিছু হয়নি। যাও তুমি প্রস্তুত হওগে, আজ না কোথায় বেড়াতে যাবে? দেরী করছ কেন?"

আরতির উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই সুব্রত একখানা নোটের খাতা হাতে লইয়া সিঁড়ি দিয়া খুট খুট করিয়া নামিয়া গেল।

কি এক আশঙ্কায় আরতি বিষণ্ণ অন্তরে বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর মনে কি যেন অপ্রকাশিত ব্যথা জমাট বাঁধা হইয়া অনবরত পীড়ন করিতেছে, এটা সে স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল; কিন্তু সেটা যে কিসের নিমিত্ত, কোথা হইতে কি উপায়ে তাহার সূচনা হইতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। স্বামীর বিষাদ-মলিন মুখচ্ছবি সে ভুলিতে পারিল না; তাই নীরবে, তেমনি অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে তরু আসিয়া যখন হাঁক ডাক আরম্ভ করিল, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। বারান্দায় হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর চিন্তাতেই যে আরতি এতক্ষণ বাহিরে যাইবার বেশভূষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এই সত্য কথাটার অবতারণা করিয়া তরু সখীকে অনেকগুলি তীক্ষ্ণ কথা শোনাইয়া দিল,—কিন্তু আরতি আজ আর হাসিয়া হাসিয়া সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। নিতান্ত অনিচ্ছায়, গম্ভীর মুখে সে যখন একখানা সাধারণ শাড়ী, আর একটি সাদা ব্লাউজ পরিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল তখন তরু একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, আরতি আজ এমন বেশে এলি কেন?

বরের সঙ্গে না বেরুলে ভাল কাপড় জামা পরবার মানা আছে নাকি? মুখখানা তো পেঁচার মত ক'রে রয়েছিস, হাসি দেখবার একজন ছাড়া আর কি লোক নেই?"

তরুর অত্যাচারে আরতিকে মনের দুঃখ মনে চাপিয়া হাসিগল্পে যোগ দিতে হইল।

সমস্তদিন বটানিকেল গার্ডনে বেড়াইয়া আরতি যখন বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথের দুই পাশে আলোকমালা প্রজ্জলিত হইয়াছে, ফুলওয়ালা "চাই বেল ফুল" করুণ স্বরে হাঁকিয়া যাইতেছে। একটি তরুণ মুখের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য অভিমানে ছল ছল আরক্ত নেত্রের মধুর ভঙ্গী স্মরণ করিতে করিতে আরতি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আশাপূর্ণ নয়নে ঘরখানির দিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। তাহার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বামী হয়ত অভিমান করিয়া ছাদে গিয়া বসিয়া আছেন ভাবিয়া সে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া দেখিল ছাদ জনশূন্য। বিষণ্ণ অন্তরে গৃহে ফিরিয়া আরতি শ্রান্ত ভাবে খাটে বসিল। ঝি টেবিলের উপর বাতিটি মৃদু করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ সেই দিকে চাহিয়া আরতি দেখিল, আলোর নিকটে একখানি চিঠি চাপা দেওয়া রহিয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া সে পড়িল, খামের উপর তাহারই নাম লেখা; হস্তাক্ষর সুব্রতের। উদ্বেলিত হৃদয়ে আরতি চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

"আরতি,

আমি চলিলাম। আমি তোমাকে বড় ভালবাসিতাম —তাই আমার ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হইতে দিলাম না। তুমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছ, সে পথের পথিক কোনও দিন সুখী হইতে পারে নাই। তুমি হইবে কিনা—তাহাও জানি না; তবু আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরসুখী হও। আমাকে অনুসন্ধান করিও না। আমি আর গৃহে ফিরিব না। এ জগতে আমাদের দেখা শুনা হইবার সম্ভাবনা নাই। জানি ইহাতে তোমার কোনই ক্ষতি হইবে না। পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সুখী হও। ইতি

তোমার হতভাগ্যস্বামী

সুব্রত।"

চিঠিখানা মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া আরতি ব্যাকুল-কণ্ঠে ডাকিল, "হরির মা।"

বাড়ীর পুরাতন দাসী "হরির মা" বারান্দায় তুলসী গাছের টবের নিকটে বসিয়া মালা জপ করিতেছিল; আরতির ডাকে বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "কিগো, বৌদি ডাক্‌চ কেন? তুমি যে ঘরে এসে আমার সঙ্গে হুমরি তুমরি করবে তা আমি আগেই ভেবে রেখেচি। দাদা বাবুকে কি বলেছিলে? তিনি তো গোঁসা করে কোথায় চলে গেছেন। তোমার গোঁসা ভেঙ্গে তুমি ঘরে এলে; এখন তিনি এলেই প্রাণটা জুড়োয়।"

আরতি জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় গেছেন হরির মা? কখন গেছেন? কি বলে গেছেন; শীগ্‌গির করে বল আমায়।"

"বেলা তিনটা নাগাদ দাদাবাবু ঘরে এসে সাত তাড়াতাড়ি বাক্স পেটরা খুলে ওই যে কি বলে, এতবড় ব্যাগ না থলে, তাইতে পুঁথি ভরে,কাপড় ভরে, একেবারে 'পগার পার'। পিছু পিছু ডাক্‌লুম কোথায় যাচ্ছ দাদা বাবু, ব'লে ক'য়ে যাও, ছেলেমানুষ রাগের মাথায় কোথায় গেছে, ফিরে এসে আমাকে গালাগালি ক'রবে। উত্তর করলে 'আমি পত্তরে সব লিখে গেলুম, সে তোমায় কিছু কইবে না।' এ কথারও আমি ছাড়্‌মু না, তখন তোমায় বল্‌লে পেত্যয় করবে না বৌদি, আমার হাতের মধ্যে একখানা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে দাদাবাবু হন্ হন্ করে চলে গেল।"—বলিয়া "হরির মা" অঞ্চলে বাঁধা নোট খানি আরতিকে দেখাইল।

"তোমার মালা জপ এখন রেখে দাও হরির মা; আমার বড় বিপদ। নিধিকে কিংবা ঠাকুরকে সঙ্গে করে এক্ষুণি গিয়ে তরুকে নিয়ে এস! গাড়ী ভাড়া করে যাও। অতুলের মেসেও খবর দিয়ে তাকে আসতে

বলো।" বলিয়া আরতি ঘরের মেঝের লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাত নয়টার সময় তরু আসিয়া সুব্রতের পত্র পড়িয়া আশ্বাসের স্বরে কহিল, "তুই এত ব্যস্ত হ'য়ে কাঁদছিস কেন আরতি? ছিঃ, ছেলেমানুষের মত কাঁদে না! সুব্রত বাবু নিশ্চই কাশীতে মার কাছে গেছেন। অভিমানের মূল কারণ হচ্ছে আজ তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলে। মানুষ যে এমন অপদার্থ হয় সেটা আমার ধারণা ছিল না।"

ভিজা চক্ষু হইতে সখীর পানে অনল বর্ষণ করিয়া আরতি কহিল, "তরু, আজ তুই দয়া করে তাঁর নিন্দা আমার কাছে করিস্ নে। যিনি সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েগেছেন তাঁর সম্বন্ধে একটু ভেবে কথা বল্।"

"হাঃ, হাঃ, ভেবে কথা কব। সন্ন্যাসী হবার উপযুক্ত লোক! যে নাকি জন্মে মার কোল আর স্ত্রীর আঁচল ছাড়া আর কিছু জানে না, সে সন্ন্যাসী না হলে হ'বেই বা কে?" বলিয়া তরু আরতির ভূলুণ্ঠিত মাথাটি সযত্নে কোলে তুলিয়া লইল। অঞ্চল দিয়া তার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছাইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "তোর কিছু ভয় নেই। আজ তো আর কাশীর ট্রেণ নেই—কাল তুই অতুলকে নিয়ে কাশীতে রওনা হোস্। সেখানে গেলেই তোর রথ দেখা পাথর কেনা সবই হবে।"

"যদি তাঁকে সেখানে না পাই, তাহলে আমি কি করবো ভাই?"

"আমার মাথা আর মুণ্ডু কর্‌বি। নিশ্চই পাবি, নিশ্চই পাবি; না পাস্ মনিকর্ণিকার ঘাটে ডুবে মরিস্।"

৬

সবে প্রভাত হইয়াছে। তখনও জন কোলাহলে কাশীর অপ্রশস্ত রাস্তা ঘাট মুখর হইয়া উঠে নাই। কেবল দুই এক জন স্নানার্থিনী স্নানে বাহির হইতেছিল।

বাঙ্গালী টোলার একখানি ক্ষুদ্র বাড়ীর সম্মুখে আরতি অতুলের সহিত গাড়ী হইতে নামিয়া স্পন্দিত বক্ষে ভিতরে প্রবেশ করিল। আশায়, আশঙ্কায় তাহার অন্তরে যেন সমুদ্র মন্থন চলিতেছিল। প্রতি পাদক্ষেপে পা দুখানি অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আরতি কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—মা।

মা নিকটেই ছিলেন। স্নানে যাইবার কাপড়, গামছা গোছাইয়া লইতেছিলেন, সহসা বধূর অপ্রত্যাশিত কণ্ঠ স্বরে তিনি চমকিয়া বাহিরে আসিলেন। শুষ্ক মলিন বেশে বধূকে দেখিয়াই মুহূর্ত্তে বুঝিয়া ফেলিলেন যে, ছেলে সেখানকার সকলের অজ্ঞাতসারে গোপনে মায়ের কাছে পলাইয়া আসিয়াছে। বধূর সহিত কোনও বিষয়ে মনান্তর হওয়াই যে তাহার এখানে আসিবার প্রকৃত কারণ সেটা মনে মনে উপলব্ধি করিয়া, মার অধরে হাস্যছটা ফুটিয়া উঠিল। প্রণতা বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া, অতুলকে বসিতে আসন দিয়া মা কহিলেন, "কাল সুব্রতকে দেখেই আমি বুঝেছি, ও যেন কি অনর্থ বাধিয়ে এসেছে। আমি দু তিন দিনের ভিতরেই কলকাতায় ফিরে যেতাম, তা ছেলের আমার এ তরটুকুও সইল না। তুমি এসে ভালই করেচ মা। অন্নপূর্ণা, বিশেশ্বর দর্শন ক'রে, বেড়িয়ে টেড়িয়ে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

এখানেই আসিয়াছে একথা শুনিয়া আরতির অশান্ত অন্তকরণ শান্ত হইল। কি উদ্বেগে যে তাহার দুইরাত দুইদিন কাটিয়া গিয়াছে তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী ব্যতীত অপরের হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নাই। অন্যান্য কথার পর বধূর দিকে চাহিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে মা বলিলেন, "সুব্রত বুঝি এখনো ঘুম থেকে উঠেনি; দেখো গে তো মা; সিঁড়ির বাঁয়ের ঘরে সে শুয়ে আছে।"

আরতি ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া দেখিল সুব্রত শয্যাত্যাগ করিয়া মেঝের উপর একখানি কুশাসন পাতিয়া গীতা খুলিয়া বসিয়া আছে। পূর্ব্বের দিকে মুক্ত গবাক্ষ দিয়া প্রভাতের হাস্যময় রৌদ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া ঝলমল করিতেছে। সুব্রতর মুখখানি চিন্তাপূর্ণ গম্ভীর। বিশৃঙ্খল কেশগুলি সমীরণ স্পর্শে গৌর ললাটের উপর বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আরতি দ্বারের নিকট

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অকস্মাৎ সুব্রতের সম্মুখে গিয়া বসিল।

সুব্রত হঠাৎ চক্ষু তুলিয়া আরতিকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। অধোবদনে ক্ষণকাল চিন্তার পর পুনরায় পত্নীর দিকে চাহিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। দুই রাত্রি একদিন মাত্র সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, ইহারই মধ্যে কি মানুষের এত পরিবর্ত্তন সম্ভব? এ কি তাহার সেই বড় আদরের, বড় স্নেহের আরতি? তাহার প্রভাত পদ্মের মত প্রস্ফুটিত মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছে। ঢল ঢল বিশাল নয়ন যুগল কোটরগত হইয়াছে। এই কি তাহার সেই অবিশ্বাসিনী স্ত্রী? কঠিন স্বরে সুব্রত বলিল, "আরতি, তুমি এখানে এসেছ কেন? আমি তো তোমার সুখের পথে বাধা হইনি; তুমিই বা আমার শান্তির পথে বাধা দিতে এসেছ কেন?"

আরতি কাঁদিতে কঁাদিতে বলিল, "তুমি ছাড়া আমার সুখ কোথায়? কি অপরাধে আমায় ত্যাগ ক'রে এসেছ?"

সুব্রত পূর্ব্ববৎ কঠোর স্বরে বলিল, "কি অপরাধে, তাই জানতে এসেছ? তবে দেখ কি অপরাধ।" পাঞ্জাবীর পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া সুব্রত স্ত্রীর চোখের কাছে খুলিয়া ধরিল।

উৎসুক চোখের দৃষ্টি একবার চিঠিখানার উপর মেলিয়া আরতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রাণাধিকা পত্নীর অশ্রুবর্ষণে সুব্রত আর স্থির থাকিতে পারিল না। স্ত্রী যে তাহার অবিশ্বাসিনী একথা ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গেল। আরতিকে কাছে টানিয়া লইয়া সুব্রত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কাঁদছ কেন, আরতি? বল লক্ষীটি, এ চিঠি তুমি কাকে লিখেছিল? মিথ্যা বলে অপরাধ বাড়িয়ো না। মনোমোহন বাবুর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ, কতদিন হল ভালবাসা হয়েছে?"

আরতি স্বামীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল, "তুমি বলছ কি? এতদিন আমায় দেখে শুনে অবশেষে তোমার মুখে এই কথা? তোমাদের জাতের মত সবাইকেই ভাব নাকি? মনের মধ্যে এত বিষ পুষে রেখেছ অথচ একটি বারও মুখের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পার নি?"

ভীত হইয়া সুব্রত বার দুই মাথা চুলকাইয়া, কাসিয়া বলিল, "তোমায় অবিশ্বাস তা নয় আরতি, তবে কিনা এই চিঠিখানা—অর্থাৎ তুমি কাকে লিখেছিলে, সেইটে না জেনেই—"

"হ্যাঁ, তাই স্ত্রীকে ত্যাগ করে পালিয়ে আসাই সহজ ভেবেছ—তবু জিজ্ঞাসা করনি। ও আমি একটা গল্প লিখছিলাম, তারই মধ্যের চিঠি।"

"গল্পের চিঠিই যদি তবে "অ" "ম" ছাড়া কাহারও নহে" লিখেছিলে কেন?" বলিয়া সুব্রত অপরাধীর মত কাতর দৃষ্টিতে আরতির দিকে চাহিল।

আরতি অঞ্চলে মুখ মুছিতে মুছিতে উত্তর করিল "অ" "ম" লিখেছিলাম সে হচ্ছে গল্পের নায়িকা "আশালতা" তার ভাবী স্বামী "মোহিতের" কাছে চিঠি লিখ্ছিল। তোমার সঙ্গে বটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেটা খুব নির্জ্জন জায়গা, তাই সেই জায়গায় দেখা করবার কথা লিখেছিলাম!"

ইহার পর হতাশ প্রেমিক আনন্দের আবেগে স্ত্রীকে বক্ষে বাঁধিয়া যাহা বলিয়া ভিক্ষা চাহিয়া লইল সেটা জয়দেবের অতুলনীয় মধুর পদাবলীরই অনুরূপ—

'দেহি পদপল্লব মুদারম্।"

শ্রীগিরিবালা দেবী।

আশ্বিনে

১

সেই তো আশ্বিন নব এসেছে আবার
ভরি লয়ে তরণী সোণার।
তেমনি বরষ পরে
আনিয়াছে ঘরে ঘরে
অপরূপ সুষমা-সম্ভার।
ধরণীর শ্যামাঞ্চল
রবিকরে ঝলমল,
নীলাকাশ কোলে শুভ্র মেঘের বিস্তার।

২

তেমনি শেফালিগন্ধ ভেসে আসে ধীরে
শিশিরার্দ্র প্রভাত সমীরে।
দোয়েল আপনা ভুলে
গাহে গান নদীকূলে
কলহংস আসিয়াছে ফিরে।
জলে স্থলে সুনির্ম্মল
ফুটেছে কুসুমদল,
আসিছে আনন্দময়ী বিশ্বের মন্দিরে।

৩

হে আশ্বিন! আগে যবে হৃদি দ্বারে এসে।
দাঁড়াইতে অতিথির বেশে—
কত শৈশবের প্রীতি,
কত যৌবনের গীতি
জাগিত সে একটি নিমেষে।
শুনিয়া উৎসব বাঁশী
হৃদয় যাইত ভাসি'
কোন্ দূর নিরুদ্দেশ স্বপনের দেশে।

৪

হের আজি রুদ্ধ সেই অন্তর আমার—
তোমা তরে খুলিবে না আর।
পুরাণো সে সুরে আজি
আর উঠিবেনা বাজি
সেই মোর বীণা—ছিন্নতার।
আজি সে মন্দিরে চাই—
কই, সেথা দেবী নাই!
ব্যর্থ পূজা আয়োজন—পত্রপুষ্প ভার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

সত্যবালা

(উপন্যাস)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিং ত্যাগ।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া আসিয়া কিশোরীমোহন নিজ কক্ষদ্বারের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র, খাটের পায়ায় শিকলে বাঁধা টমি কুকুর লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিল। তাহাকে খুলিয়া দিয়া, আদর করিয়া, কিশোরী একখানি ঈজি চেয়ারে লম্বমান হইবামাত্র, টম লাফাইয়া তাহার কোলের উপর বসিল। টমিকে আদর করিতে করিতে, কিশোরীর মনে হইল, আরাম করিবার সময় ত এ নহে; মল্লিক যদি থানায় খবর

পাঠাইয়া থাকে—পাঠানোই সম্ভব,—তবে হয়ত পুলিস এতক্ষণ তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্ত থানা হইতে বাহির হইয়াছে। সে তখন উঠিয়া পড়িল। টমিকে আবার বাঁধিল। ইহাতে টমি বিস্মিত হইয়া মনিবের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; কারণ রাত্রে সে বরাবর খোলাই থাকে, ছেঁড়া কম্বল পরিপূর্ণ বেতের ঝুড়িটিতে শুইয়া সে নিদ্রা যায়।

কিশোরী বাক্স খুলিয়া, তাহার টাকার থলি বাহির করিয়া দেখিল, তাহাতে কিঞ্চিদধিক ২০০৲ টাকা রহিয়াছে। মাত্র ২।৩ দিন হইল, কলিকাতা হইতে মণি অর্ডার যোগে তাহার ২০০৲ টাকা আসিয়াছিল; পিয়ন তাহাকে ফরম দিয়া যখন ব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া গণিয়া থাকে থাকে টেবিলের উপর সাজাইতেছিল, তখন কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "নোট নেহি হায়?" পিয়ন বলিয়াছিল, "নেহি হুজুর, আজ নোট নেহি মিলা।"—এখন কিশোরী ভাবিল, পিয়ন যে নোট না দিয়া সবগুলি রূপার টাকা দিয়া গিয়াছে, সে ভালই হইয়াছে—কারণ সে শুনিয়াছিল, পাহাড় অঞ্চলে, ইংরাজ রাজ্যের সীমানার বাহিরেও অনেকদূর পর্য্যন্ত, ইংরাজের টাকার খুব আদর আছে। গোটা দশেক টাকা বাহিরে রাখিয়া, কিশোরী থলির মুখ বন্ধ করিল। ফ্লানেলের শার্টগুলি, গরম মোজাগুলি, এক টিন বিস্কুট, একটি এনামেলের গেলাস,—এইসব জিনিসগুলি তাহার হাতব্যাগে ভরিয়া লইল। স্যানিটেরিয়মের লাইব্রেরী হইতে শরচ্চন্দ্র দাস প্রণীত, মানচিত্র সম্বলিত "লাসা ও মধ্য তিব্বত ভ্রমণ" ইংরাজি পুস্তকখানি পড়িবার জন্ত সে লইয়াছিল, পরের দ্রব্য হইলেও, সে বহিখানিও কিশোরী ব্যাগের মধ্যে লইল। আর লইল, দার্জ্জিলিং আসিবার সময়, পাহাড়ের দৃশ্য দেখিবার সময় সে নীলামে একটি দূরবীণ কিনিয়া লইয়াছিল, সেটী, এবং টেবিলের উপর একটা প্লেটে দুইটা আপেল ও একটা কমলা নেবু ছিল, এই ফল তিনটী। কিছু ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত, কিন্তু আর ত কিছুই ছিল না, কেবল ছিল একবোতল ঈনোজ্ ফ্রুট সল্ট—কলিকাতা হইতে সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা কোনদিন খুলিবারও প্রয়োজন হয় নাই সেই বোতলটিও সঙ্গে লইল। বিছানা হইতে নিজ র‍্যাগ দুই খানি তুলিয়া ব্যাগের গায়ে বাঁধিয়া কিশোরী বাহির হইবার জন্ত যখন প্রস্তুত হইল, রাত্রি তখন প্রায় দুইটা।

টমির ঝুড়ির নিকট হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া তাহার গা চাপড়াইয়া সজলনয়নে কিশোরী বলিল, "টমি, এখন চল্লাম। যদি বেঁচে থাকি, আর তুই বেঁচে থাকিস, তবে হয়ত একদিন আবার দুজনে দেখা হবে। নইলে এই পর্য্যন্ত। যাহোক, তোকে বেশ ভাল আশ্রয়েই রেখে যাচ্ছি, তুই কোনও কষ্ট পাবিনে। এখন বিদায়।"—বলিয়া কিশোরী ঝুঁকিয়া, কুকুরের মুখে চুমো খাইল; তাহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া টমির গাত্রলোম আর্দ্র করিয়া দিল।

দরজাটি বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া, তালা দিয়া, চাবিটি তালাতেই লাগাইয়া রাখিল; কারণ কল্য প্রাতে সত্যবালা, হিসাব মিটাইতে এবং তাহার জিনিষপত্র ও কুকুর লইতে আসিবে। স্যানিটেরিয়ম তখন সুপ্তিমগ্ন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে—চন্দ্রালোকে স্যানেটরিয়মের হাতা পার হইয়া ফটকের নিকট আসিয়া দেখিল, একজন ভৃত্য কোনও কারণে তাহার শয়নকক্ষের বাহিরে আসিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত্তা রাতমে কাঁহা যাতেহেঁ হুজুর?" কিশোরী বলিল, "সূরয উগা দেখনে যাতেহেঁ।"—দার্জ্জিলিঙে আগত অনেক ভদ্রলোকই রাত্রি থাকিতে উঠিয়া, সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্ত টাইগার হিলে গিয়া থাকেন, ভৃত্যও তাহাই মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কিশোরী তখন কার্ট রোডে উঠিয়া, শঙ্কিত নয়নে এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কোনও পুলিস প্রহরী দেখিতে পাইলনা। সে তখন রাস্তা ধরিয়া উত্তরাভিমুখে চলিল। তিব্বতযাত্রী শরচ্চন্দ্র দাস কোন্ পথে দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সে পুস্তকেও

পাঠ করিয়াছিল, এখানে ভ্রমণের সময় হেমচন্দ্র একদিন সে পথটি তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছিল।

মার্কেটের কাছাকাছি দুইজন কনেষ্টেবলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। "সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইতেছি" এই কৈফিয়তে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, ক্রমে কিশোরী দার্জ্জিলিঙ নগরের প্রান্ত সীমায় পৌঁছিল। পথের উভয় দিকে চাহিয়া দেখিল, কোনও কোনও পুলিস তাহাকে ধরিতে আসিতেছে না।

চন্দ্র তখন আর উচ্চে উঠিয়াছে। আকাশে আজ মেঘ নাই—বিমল চন্দ্রালোকে পার্ব্বত্যপথ অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্টরূপেই দেখা যাইতেছিল। কিশোরী ধীরে ধীরে পার্ব্বত্য পথ অবতরণ করিতে লাগিল। পথ নির্জ্জন। ক্রোশ খানেক অতিক্রান্ত হইলে মাঝে মাঝে দেখিল দুই তিনজন করিয়া ভুটিয়া, পৃষ্ঠে ফল বা মৎসের বোঝা লইয়া দার্জ্জিলিঙ অভিমুখে যাইতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া কিশোরী পশ্চাতে দেখিতে লাগিল—পশ্চাদ্ধাবনকারী কোনও পুলিশ দৃষ্টিগোচর হইল না।

উৎরাই শেষ হইয়া যখন চড়াই আরম্ভ হইল, তখন শেষ রাত্রের সেই কনকনে শীত সত্ত্বেও, কিশোরীর দেহ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। একে চড়াই ভাঙ্গিতে হইতেছে, তাহার উপরে সেই মোটা ওভারকোট গায়ে এবং হাতে সেই ভারি ব্যাগ, অল্পক্ষণেই কিশোরী শ্রান্ত হইয়া পড়িল। পথের ধারে একটা বৃহৎ পাথরের উপর বসিয়া, কিশোরী হাঁফাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর কিশোরী দেখিল, চন্দ্রের জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বদিকে নেপাল সীমান্ত-স্থিত গিরিমালার উর্দ্ধদেশে আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিতেছে—এইবার সূর্য্যোদয়ের সময় উপস্থিত। কিশোরী ভাবিল, তিনজনের নিকট বলিয়া আসিয়াছি, সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইতেছি—তা, সূর্য্যোদয়টা এইখান হইতেই দেখিয়া লই।

সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত কিশোরী সেখানে বসিয়া রহিল। সূর্য্যোদয় হইলে, আবার উঠিয়া কিশোরী পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর হইতে দেখিল পথের দুই ধারে একটি গ্রামের মত রহিয়াছে, এবং তাহার অপরদিকে একটা নদী বহিয়া যাইতেছে। কিশোরী অনুমান করিল, উহাই বোধ হয় মানচিত্রে দৃষ্ট গক্ নামক বসতি, এবং ঐ নদীই বোধহয় এ পারে বৃটিশ রাজ্য এবং ওপারে "স্বাধীন সিকিম"এর সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। কিশোরী ভাবিল, বৃটিশ রাজ্যের সীমা পার হইলে এবার নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধুলাভ।

কিশোরী যখন গক্ গ্রামের মধ্যে পৌঁছিল, বেলা তখন ৮টা। এক স্থানে দেখিল, প্রায় ১০।১২ জন লোক বসিয়া আছে, মধ্যস্থানে একটি বৃহৎ কটাহে চা সিদ্ধ হইতেছে; সেই ফুটন্ত চা, একটা টিনের মগে করিয়া তুলিয়া এক ব্যক্তি সকলকে পরিবেষণ করিতেছে। তাহাদের কিছু দূরে একখানা পাথরের উপর কিশোরী বসিল। লোকগুলা চা পান করিতে করিতে আড়চোখে আড়চোখে কিশোরীর পানে চাহিতে লাগিল। একজন যুবাবয়স্ক ব্যক্তি দল হইতে সরিয়া আসিয়া, কিশোরীকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, চা পিওগে?"

পথ হাঁটিয়া, নিদ্রার অভাবে, কিশোরীর শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "থোড়া দেও"—বলিয়া ব্যাগ হইতে তাহার এনামেলের গেলাস বাহির করিয়া যুবকের হাতে দিল। যুবক গেলাসটি লইয়া কটাহ-স্বামীর নিকট হইতে এক গেলাস চা আনিয়া কিশোরীর সম্মুখে নামাইয়া রাখিল।

কিশোরী এক চুমুক পান করিয়া দেখিল, চায়ের যে আস্বাদে আমরা অভ্যস্ত, ইহার আস্বাদ সেরূপ নহে; তবে আস্বাদটা মন্দও নহে। কিশোরী চা পান করিতে লাগিল; যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব তুম দার্জ্জিলিঙ সে আতা হায়?" কিশোরী মস্তক সঞ্চালনে উত্তরে জানাইল যে তাহাই।

"কাঁহা যাগা ?"

কিশোরী বলিল, "পাহাড় দেখ্‌নে।"

"বড়া পাহাড় ?"

"হাঁ।"

"বহুৎ দূর।"

চা পান করিয়া, গেলাসটী উবুড় করিয়া রাখিয়া কিশোরী হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথা ?"

যুবা, নদীর অপর পারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "মিটো গাং। তিন পাহাড় বাদ।"

"তুমি কোথায় যাইতেছ ?"

"দার্জ্জিলিঙ।"

"কি জন্য ?"

"চাকরির চেষ্টায়।"

"সেখানে তোমার চেনা লোক আছে ?"

"আমাদের গ্রামের ৪।৫ জন লোক আছে। আমি পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙে চাকরি করিতাম। বৎসর খানেক হইল, চাকরি ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম।"

কিশোরী বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি তুমি এমন সুন্দর হিন্দী কহিতে শিখিয়াছ ? তোমাদের রাজা কে ?"

যুবা বলিল, "সিকি অং।"

"দার্জ্জিলিঙে তুমি কি চাকরি করিবে ?"

"আমি সেখানে সাহেবদের তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা দিই। এবার গিয়া, সে কার্য্যও করিব; নিজেও একটু ইংরাজি শিখিব ইচ্ছা আছে।"

"কত মাহিনা পাইবে ?"

"৫০৲।৬০৲ টাকা রোজগার করিতে পারিব। করিলে কি হইবে; দার্জ্জিলিঙে যে খরচ! অর্দ্ধেক ত খাইয়াই ফেলিব। তা ছাড়া ইংরাজি শিখিবার ব্যয়ও লাগিবে।"

কিশোরী মুহূর্ত্ত কাল কি ভাবিল; তাহার পর বলিল, "তুমি আমার চাকরি করিবে ? আমি তোমায় মাসে ২৫৲ বেতন দিব, এবং খোরাকও যোগাইব। তুমি আমায় তিব্বতীয় ভাষা শিখাইবে, আমিও তোমায় ইংরাজি শিখাইব।"

যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে দার্জ্জিলিঙে ফিরিবেন ?"

কিশোরী বলিল, "যেখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়, আমি সেই অবধি যাইব। তাহার পর ফিরিব।"

যুবক বলিল, "দুই মাস লাগিবে। এ দুই মাস আমি বসিয়া থাকিব সাহেব ?"

"বসিয়া থাকিবে কেন ? এখন হইতেই তুমি আমার কাযে ভর্ত্তি হও। আমার সঙ্গে চল। আবার আমার সঙ্গে ফিরিবে।"

যুবা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তাহার পর কহিল, "সাহেব, আমি আপনার সহিত যাইতে পারি, যদি আমার পিতার অনুমতি পাই। আমাদের গ্রাম এখান হইতে অধিক দূরে নহে; এক বেলার পথ। আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারি। আপনার দেখা কোথায় পাইব ?"

কিশোরী বলিল, "চল না, আমিও তোমাদের গ্রামে যাই। তোমার পিতা যদি তোমাকে যাইতে দেন, তবে কাল সকালে উঠিয়া আমরা আবার রওয়ানা হইতে পারিব। তোমার নাম কি ? তোমরা কোন জাতি ?"

"আমার নাম ফুরচিং। আমরা পূর্ব্বে তিব্বতের অধিবাসী ছিলাম; আমার পিতা সেখান হইতে বাস উঠাইয়া এ দেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। আমরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। আপনি কি ইসাই ?"

কিশোরী বলিল, "না, আমরা হিন্দু।"

"এখানে কি আর বিলম্ব করিবেন ?"

"না, এখানে বিলম্ব করিয়া আর কি হইবে ? চল এই বেলা ওঠা যাউক—বেলায় বেলায় তোমাদের বাড়ী পৌঁছিতে পারিলেই ভাল। একটা কথা—রাস্তায় আর কোনও গ্রাম পাওয়া যাইবে কি ? কিছু খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক ত ?"

ফুরচিং বলিল, "রাস্তায় আর কোথাও খাদ্য

পাওয়া যাইবে না। এখান হইতেই কিছু সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।"

কিশোরী তাহার পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ফুরচিং-এর হাতে দিল। টাকাটি লইয়া ফুরচিং বলিল, "আপনি এইখানে বসিয়াই বিশ্রাম করুন, আমি কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, ফুরচিং কয়েকটা কমলা লেবু, দুই খানা বড় চাপাটি রুটি এবং ছয়টা সিদ্ধ করা ডিম আনিয়া হাজির করিল। বলিল, রুটি বানাইতে ডিম সিদ্ধ করিয়া লইতে বিলম্ব হইয়া গেল।

তখন উভয়ে উঠিয়া, নদীতীর অভিমুখে চলিল।

এই নদীর নাম রাম্মম। গিরিনদী সচরাচর যেমন খরস্রোতা হয়, ইহাও তাহাই। কিশোরী দেখিল, নদীর এ পার ও পার পর্য্যন্ত একটি বাঁশের পুল। নদীর মাঝখানে একটি বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে, সেতুর মধ্যভাগ তাহারই উপর স্থাপিত। সেতুর উভয় দিকে কতগুলি লোক মাছ ধরিতেছে—আকার দেখিয়া কিশোরী বুঝিল উহারা লেপচা। ফুরচিং বলিল, "সাহেব, একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা মাছ কিনিয়া আনি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা বৌদ্ধ, তোমরা মাছ খাও?"

"খাইতে দোষ নাই, মারিতেই দোষ। আমি ত মারিব না, উহারা মারিয়াছে, আমি সেই মরা মাছ কিনিয়া আনিব।"—বলিয়া ফুরচিং মৎস্য শিকারীদের নিকট গিয়া, অনেক দর দস্তর করিয়া, আড়াই সের আন্দাজ একটা মাছ কিনিয়া আনিল।

কিশোরী বুঝিল, আজ রাত্রে তাহারই আতিথ্যের জন্য ফুরচিং এই মাছটি এখন হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিল। পকেটে হাত দিয়া বলিল, "কত দাম দিতে হইবে?"

ফুরচিং বলিল, "আপনি যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহারই কিছু আমার নিকট অবশিষ্ট ছিল। আর কিছু দিতে হইবে না।"

এক হাতে মাছ, অপর হাতে র‍্যাগে জড়ানো ব্যাগটি লইয়া অগ্রে অগ্রে ফুরচিং, পশ্চাতে কিশোরী, উভয়ে সাবধানে সেই বাঁশের পুল পার হইয়া অপর পারে গিয়া উঠিল। এইবার, আবার চড়াই আরম্ভ হইল। পথের এক দিকে পর্ব্বত, অপর দিকে খদ নামিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে বহু সংখ্যক শাল বৃক্ষ, বায়ু ভরে দুলিতেছে। খদের দিকে শস্যক্ষেত্র—ধান্য ক্ষেত্র আছে, স্থানে স্থানে তুলার গাছ এবং এলাচির ক্ষেত্রও দেখা যাইতে লাগিল।

চড়াই উঠিতে উঠিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। এক স্থানে পর্ব্বত গাত্র হইতে কল কল স্বরে ঝরণার জল নামিতেছিল। ফুরচিং বলিল, "আর খানিকটা উঠিতে পারিলেই, মিটো গাং-এর রাস্তা আমাদের ডান দিকে পড়িবে। এইখানে বসিয়া, একটু বিশ্রাম করিয়া, কিছু আহার করিয়া লউন সাহেব।"

কিশোরী এত শ্রান্ত হইয়াছিল যে তাহার পা আর চলে না। ঝরণার নিকট গিয়া, মুখে হাতে জল দিয়া আসিয়া, শাল বৃক্ষের নিম্নে একটা পাহারের উপর সে বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে, চাপাটি, আণ্ডা, ফলগুলি দ্বারা উভয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, ঝরণার জল পান করিয়া, আবার চড়াই উঠিতে লাগিল।

ফুরচিং-এর অনুসরণে উৎরাই নামিয়া, আবার চড়াই উঠিয়া কিশোরী যখন মিটোগাং গ্রামে পৌছিল, তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজে। ফুরচিংদের কুটীরের সম্মুখে খোলা জায়গায় কয়েকটা গরু ও ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। দুইটী শিশু ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। ফুরচিং কিশোরীকে একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গেল; ঘরটির এক পার্শ্বে গরুর খাদ্য স্তূপাকারে রক্ষিত, অপর পার্শ্বে একটি কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মিত আছে। কিশোরী সেই কাষ্ঠ মঞ্চের উপর বসিয়া বলিল, "আমাকে জল আনিয়া দাও। আমি হাত পা ধুইয়া, এই খানে শুইয়া একটু ঘুমাইব। আমি আর বসিতে পারিতেছি না।"

ফুরচিং অদৃশ্য হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক বালতি জল ও একটা টিনের মগ আনিয়া কুটীরের বারান্দায়

স্থাপন করিল। কিশোরী ইতিমধ্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, ফ্যানেলের রাত কাপড় পরিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া, তোয়ালে হাতে করিয়া বসিয়া ছিল। জল পাইয়া কিশোরী যেন কৃতার্থ হইল; হাত মুখ ধুইতে লাগিল। ফুরচিং জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কিছু খাইবেন কি?"

কিশোরী চক্ষু ঘুমে প্রায় ঢুলিয়া আসিতেছিল। বলিল, "কিছু না, এখন কেবল ঘুমাইব। তোমার বাবা কোথায়?" বলিয়া ব্যাগ হইতে নিজ র‍্যাগ দুই খানার বাঁধন খুলিতে লগিল।

ফুরচিং বলিল, "বাবা ক্ষেতে কায করিতে গিয়াছেন; এখনও ফেরেন নাই, সন্ধ্যার পর ফিরিবেন।"

—বলিয়া সে অদৃশ্য হইল। একমিনিটের মধ্যে একটা বাঁশের চোঙা হাতে করিয়া আনিয়া বলিল, "ইহা পান করুন দেখি।"

চোঙাটি লইয়া কিশোরী বলিল, "ইহা কি?"

"মাড়োয়া। সাহেব লোকেরা যেরূপ বিয়ার পান করেন, ইহাও সেইরূপ। ভুট্টাদানা চোয়াইয়া ইহা আমরা প্রস্তুত করি। পান করিলে শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইবে; খুব আরামে ঘুমাইবেন; দেহের বল ফিরিয়া আসিবে।"

কিশোরী সেই বাঁশের চোঙাটি নাকের কাছে ধরিয়া ঘ্রাণ লইল। গন্ধটি মন্দ বোধ হইল না। বলিল, "দেখ, আমি কিন্তু কখনও সরাপ পান করি নাই। ইহা পান করিলে আমার নেশা হইবে। ইহা লইয়া যাও।"

ফুরচিং হাসিয়া বলিল, "না সাহেব, ইহা সরাপ নহে—বিয়ার। আপনি নির্ভয়ে পান করুন। কোনও মন্দ ফল হইবে না।"

কিশোরী তখন ব্যাগ হইতে তাহার এনামেলের গেলাসটি বাহির করিয়া, আধ গেলাস পরিমাণ মাড়োয়া তাহাতে ঢালিয়া লইয়া, একটু একটু করিয়া পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর, একখানি র‍্যাগ পাতিয়া, একখানি গায়ে দিয়া, পাঁচ মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধের উপদেশ।

কিশোরীর যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল ঘরে মিট মিট করিয়া একটি কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে, দ্বারটি ভেজানো রহিয়াছে। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল রাত্রি ৯ নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। উঠিয়া দ্বার খুলিতেই, ফুরচিং কোথা হইতে আসিয়া বলিল, "সাহেব, আপনি খুব ঘুমাইয়াছেন!"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, আমি খুব ঘুমাইয়াছি বটে। ঘুমাইয়া, আমার শরীরটা সুস্থ হইল।"

"এইবার আপনার খাবার লইয়া আসি?"

কিশোরী এখন বেশ ক্ষুধা অনুভব করিতেছিল। বলিল, "আন।"

অল্পক্ষণ পরে ফুরচিং একটা কাঠের থালায় এক থালা ভাত, একটা কাঠের বাটীতে এক বাটী তরকারি এবং একটা কাঠের চামচ আনিয়া হাজির করিল। একটা টিনের মগে ভরিয়া জলও আনিয়া দিল। কিশোরী সেই জলের কিয়দংশের সাহায্যে হাত মুখ ধুইয়া ভোজনে বসিল।

তরকারিটায় মাছ, আলু, পেঁয়াজ ও মূলা মিশ্রিত ছিল। রন্ধন প্রণালী বাঙ্গালীর পক্ষে উপভোগ্য না হইলেও, ক্ষুধার জ্বালায় তাহাই যেন কিশোরীর তখন অমৃত বোধ হইল। থালার ভাত অধিকাংশ নিঃশেষ করিয়া, আচমন করিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা আসিয়াছেন?"

"আসিয়াছেন।"

"তিনি কি বলিলেন?"

"তিনি আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনি?"

"ডাক"—বলিয়া কিশোরী তাহার সেই কাষ্ঠ মঞ্চে বিস্তৃত শয্যার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই ফুরচিং তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। "সেলাম সাহেব"—বলিয়া বৃদ্ধ

মেঝের উপরেই বসিতে যাইতেছিল; কিশোরী অনুরোধ করিয়া তাহাকে নিজ শয্যার উপরে বসাইল।

বৃদ্ধ বসিয়া হিন্দীতে বলিল, "শুনিলাম আপনি হিন্দু। পর্ব্বত দেখিবার জন্য দার্জ্জিলিঙ হইতে বাহির হইয়াছেন। আপনার নিবাস কোন্ স্থানে?"

কিশোরী বলিল, "কলিকাতায়।"

"আপনি বাঙ্গালী বাবু? বেশ বেশ। বাঙ্গালীরা বড় ভদ্রলোক হয়। একবার আমি দার্জ্জিলিঙ গিয়াছিলাম, তখন কয়েকটী বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারাও কলিকতা হইতে আসিয়াছিলেন।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কলিকাতাও গিয়াছিলেন না কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না, কলিকাতায় কখনও যাই নাই। কলিকাতায় শুনিয়াছি ইংরাজগণ নাকি বড় ভারি সহর বানাইয়াছে। অনেক দিন হইতে, কলিকাতা যাইবার কলিকাতা দেখিবার আমার বাসনা ছিল। কিন্তু হইয়া উঠে নাই। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি এখন আর ঘর ছাড়িয়া কোথায় যাইতে ইচ্ছা করেনা।"

"আপনি এখানে চাষবাস লইয়া বেশ সুখেই আছেন বোধ হয়?"

"আছি, একরকম। অবস্থা বেশ সচ্ছল নয়, তাই বড় ছেলেটিকে দার্জ্জিলিঙে চাকরি করিতে পাঠাইতে হইয়াছিল। উহার নিকট শুনিলাম উহাকে আপনি সাথী করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; ও আপনাকে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দিবে, আপনি উহাকে ইংরাজি শিখাইবেন।"

"হাঁ, আমার তাহাই অভিপ্রায়। এখন আপনার মত কি?"

"আমার কোনও আপত্তি নাই। আমাদের শাস্ত্র ও বেশ ভাল করিয়াই পড়িয়াছে। আপনাকে বেশ শিখাইতে পারিবে। বড় বুদ্ধিমান ছেলে। সে যাহাই হউক, আপনি যে অত দূরে, অত দুর্গম দেশ ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়াছেন, আপনার সেরূপ সাজ সরঞ্জাম কিছুই ত দেখিতেছি না?"

কিশোরী বলিল, "কি কি সাজ সরঞ্জাম আবশ্যক হইতে পারে তাহা ত আমার জানা নাই; কাযেই সেসব কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"

বৃদ্ধ কিশোরীর র‍্যাগ খানি অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া বলিল, "প্রথমতঃ গাত্রাবরণ। এই দুই খানি বিলাতী কম্বলে কি আপনার শীত ভাঙ্গিবে? এ কি দার্জ্জিলিঙ? যত উত্তরে যাইবেন, ততই শীত বাড়িবে। সব দিন ঘরের মধ্যে আশ্রয় পাইবেন না। রাত্রে হয়ত কোনও গিরিগুহায়, নয়ত খোলা আকাশের তলেই শুইয়া থাকিতে হইবে। তখন শীতে মারা যাইবেন যে! এই দুই খানি বিলাতী কম্বল ছাড়া, মোটা ভুটিয়া কম্বল খান কতক আপনার সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

"এখানে কম্বল কিনিতে পাওয়া যাইবে না কি?"

"ভুটিয়ারা দার্জ্জিলিঙে কম্বল বেচিয়া, মাঝে মাঝে এই পথে ফিরিয়া যায়। এই গ্রামের দুই একজন ব্যাপারী তাহাদের অবিক্রীত কম্বল সস্তায় কিনিয়া রাখে। চেষ্টা করিলে কম্বল এখানে পাওয়া যাইতে পারে।"

"খান চারেক কম্বল যদি কিনি, কত দাম লাগিবে?"

"কুড়ি টাকার কমে হইবে না। ভুটিয়ারা দার্জ্জিলিঙে গিয়া ইহার দ্বিগুণ দামেই এ সব বিক্রয় করিয়া থাকে।"

কিশোরী বলিল, "তবে অনুগ্রহ করিয়া কল্য আমাকে চারিখানি কম্বল কিনিয়া দিবেন। আর কি আমার আবশ্যক হইবে?"

"পোষাক। আপনার এ ইংরাজি পোষাক দেখিলে এ দেশের লোক আপনাকে মুস্কিলে ফেলিবে। বিশেষ আপনার নিকট যখন কোনও রাজকীয় ছাড়পত্র নাই। সিকিমের অধিবাসীরা আপনার প্রতি ততটা দুর্ব্ব্যবহার নাও করিতে পারে, কিন্তু, আপনি যেখানে যাইতে চাহিতেছেন, সেখানে যাইতে হইলে নেপালের সীমার মধ্যে গিয়া পড়িবেন। সেখানে হয়ত আপনাকে ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখিবে, মারিয়াও ফেলিতে পারে।

আপনাকে তিব্বতীয় লামার ছদ্মবেশে যাইতে হইবে।"

"সে পোষাকে আমি এখানে পাইতে পারিব কি?"

"চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে।"

"তবে অনুগ্রহ করিয়া সে পোষাকও আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিবেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, কল্য প্রাতে উঠিয়াই রওয়ানা হইব, তাহা আর হইবে না দেখিতেছি।"

"না, তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? এ ত আপনার দার্জ্জিলিঙ সহর নহে, যে বাজারে গিয়া টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামত দ্রব্য খরিদ করিয়া আনিবেন!"

কিশোরী ভাবিল, দার্জ্জিলিঙের এত কাছে—একদিনের রাস্তা বৈ ত নয়,—দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা কি নিরাপদ হইবে? তবে একটা কথা, এ স্থানটা বৃটিশ রাজ্যের বাহিরে.—এখানে ইংরাজের পুলিস সহসা আসিয়া আমায় ধরিতে পারিবে না। কিন্তু বলাই বা যায় কি? সিকিম নামে স্বাধীন রাজ্য হইলেও, উহা ইংরাজের করদরাজ্য বৈ ত নয়! কিন্তু উপায়ই বা কি? বৃদ্ধ যাহা বলিতেছে, সে ত ঠিক কথাই। ইংরাজি পোষাকে অধিক দূরে যাওয়া ত চলিবেই না! আর, কম্বল না হইলে শীতেই যে মরিয়া যাইব:—সুতরাং অগত্যা কিশোরী ২।১ দিন এখানে অবস্থান করিবে বলিয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ তখন কয়েকটি অন্যান্য কথার পর, গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "রাত্রি অধিক হইল। আপনি এখন শয়ন করুন। আমি আপনার জন্য আর খান দুই কম্বল পাঠাইয়া দিতেছি। এ দুই খানা বিলাতী কম্বলে রাত্রে আপনি শীতে কষ্ট পাইবেন।"—বলিয়া পুত্র সহ সে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, একহাতে কম্বল এবং একহাতে বাঁশের চোঙা লইয়া ফুরচিং ফিরিয়া আসিল। বিছানা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, "আপনি আর খানিক মাড়োয়া পান করিয়া শয়ন করুন, রাত্রে শীত কম লাগিবে। এ দেশে আমরা সকলেই শয়নের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ মাড়োয়া পান করিয়া থাকি।"

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—এই নীতি স্মরণ করিয়া এবার আর কিশোরী আপত্তি করিল না। বিশেষতঃ, আহারের পর সুপারি বা কোনও মশলা চর্ব্বণ করিতে না পাইয়া, তাহার মুখটা খারাপ হইয়া ছিল; "মুখশোধন" হিসাবে, আধ গেলাস মাড়োয়া ঢালিয়া সে পান করিয়া ফেলিল।

শয়ন করিয়া, নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত, সে নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল—কোথায় আমি বিবাহের বর, কোথায় পলাতক খুনী আসামী! আজ বেলা ৯টার সময় যখন আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল, সেই সময় আমি কোথায়? তখন আমি লেপচাগণের সহিত পথের ধারে বসিয়া, সেই উৎকট চা পান করিতেছি। আজ এতক্ষণ, দার্জ্জিলিঙের কোনও ইংরাজি হোটেলে, প্রিয়তমার সহিত ফুলশয্যায় আমার শয়ন করিবার কথা; তাহার পরিবর্ত্তে, পাহাড়িয়ার কুটীরে, কাষ্ঠশয্যায় এই বিড়ম্বনা ভোগ! অথচ, চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বেও ইহা একেবারে স্বপ্নাতীতই ছিল!—আবার কি সুদিন আসিবে? এ জীবনে আর আসিবে কি না কে জানে। আর কি কোনও দিন আমি প্রিয়ার মুখ, আত্মীয়স্বজনের মুখ, দেশের মুখ দেখিব? না, হিমালয়ের সুশীতল বক্ষে আমার চিরসমাধি রচিত হইবে?

সতী এখন দার্জ্জিলিঙে কি করিতেছে, স্যানিটেরিয়মে গিয়া তাহার জিনিস পত্র ও কুকুর লইয়া আসিলে তাহার বাড়ীর লোক তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে ইহাই কিশোরী কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। ক্রমে, মাড়োয়ার প্রভাবে, তাহার চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিল,—শান্তিদায়িনী নিদ্রা আসিয়া তাহার সকল চিন্তা হরণ করিয়া লইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

জলধর গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড।

প্রকাশক—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। সুপার রয়েল ১৬ পেজি, ৬২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের গ্রন্থ-সংখ্যা ছোট বড় মিলাইয়া মোট ৩০ খানি। সুতরাং সমস্তগুলি পৃথক পৃথক ভাবে কিনিয়া পড়া, আমাদের এই দরিদ্র দেশের অনেকের পক্ষেই সুসাধ্য নহে। প্রকাশক মহাশয়েরা জলধর বাবুর "গ্রন্থাবলী" আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া পাঠক সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এই খণ্ডে তাঁহার হিমাদ্রি (ভ্রমণ), পাগল (উপন্যাস), প্রবাসচিত্র (ভ্রমণ), চোখের জল (উপন্যাস), আশীর্ব্বাদ (গল্পগুচ্ছ)—এই সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ ভাল—তবে পৃষ্ঠার মার্জিন অতি অল্প—বাঁধাইতে গেলে অক্ষর কাটিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

এইগুলি হইল বাহিরে কথা। ভিতরের কথা যাহা—রচনার সৌন্দর্য্য—তাহা পাঠকসমাজের অবিদিত নাই। সুতরাং তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। জলধর বাবুর লেখার একটা মহৎ গুণ তাঁহার আন্তরিকতা। প্রোফেসারি ধড়াচূড়া অথবা রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা পরিয়া তিনি পাঠকের নিকট আবির্ভূত হন না—খোলাগায়ে চটিজুতা পায়ে একেবারে ঘরের লোকের মত আসিয়া তাহার মনোহরণ করেন।

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক—ইউ, রায় এণ্ড সন্স, ১০০ গড়পাড় রোড, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১০৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০

পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি কিরূপ চিত্তাকর্ষক ও সদুপদেশ পূর্ণ তাহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। মূল গল্পগুলি বিশেষ ভাবে ছেলেদের জন্যই বিষ্ণুশর্ম্মা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু একালের ছেলেদের সে গুলির রসাস্বাদন করিতে হইলে, সংস্কৃত শেখা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কুলদা বাবু সরল সরস বাঙ্গালায় এই গল্প গুলির মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিয়া ছেলেদের সে অসুবিধা দূর করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পুস্তক খানির ছাপা কাগজ বেশ সুন্দর হইয়াছে।

সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ—১ম খণ্ড।

শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি এ, বি-এল প্রণীত। কলিকাতা এরিয়ান প্রেসে মুদ্রিত ও কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৮৮ পৃষ্ঠা, মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ৸৴ এবং কাগজে বাঁধাই ৸০

এই পুস্তকখানি, আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য লইয়া লিখিত। ভারত প্রসিদ্ধ কয়েকজন সাধুর কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যথা—আচার্য্য শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবা গম্ভীরনাথ, বাবা লছমন দাস, স্বামী ভাস্করানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী শিবনারায়ণ ইত্যাদি। কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীর যোগবিভূতির অনেকগুলি দৃষ্টান্তও বর্ণিত হইয়াছে। শূন্য হইতে রাশি রাশি বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, কলিকাতার বাতাবী সন্দেশ, জনাইয়ের মনোহরা, পশ্চিমের পেঁড়া ও ক্ষীরের মিষ্টান্ন প্রভৃতি চেলা কর্ত্তৃক আহরিত করিয়া দেবসবার্থে গুরুজীর হস্তে সমর্পণ, চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত মহাপুরুষের আবির্ভাব, ক্ষেপা সাধুর দেহ সহসা জ্যোতিষ্মান হইয়া শূন্যমার্গে তাঁহার অবস্থান, ডাকাইতের দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত সাধুগণের উদ্ধারের জন্য মানব মূর্ত্তিতে কালভৈরবের আবির্ভাব এবং ডাকাইতগণকে বিধ্বস্ত করিয়া সহসা তাঁহার অন্তর্দ্ধান, রজনীযোগে হিন্দু ও মুসলমান সাধুগণের দলবদ্ধ ভাবে আকাশমার্গে সঞ্চরণ ও ভূতলে অবতরণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া গঞ্জিকা সেবনান্তর পুনরায় আকাশ মার্গে উড্ডীন্ হওয়া প্রভৃতি যাঁহারা বিশ্বাস নাও করিবেন, তাঁহারাও এই পুস্তকে অনেক সদুপদেশ লাভ করিতে পারিবেন। সংশয়বাদ, কর্ম্মফল, চিত্তশুদ্ধি, একাগ্রতা লাভের উপায় ব্রহ্মচর্য্য পালন, ভক্তি, উপাসনা, তপস্যা প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি এবং সাধু মাহাত্মগণের অভিমত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ন্যায়রত্নের নিয়তি।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা "বাণী" প্রেসে মুদ্রিত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ২৮২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১॥০

এখানি উপন্যাস-গ্রন্থ। লেখক মহাশয় পরলোকতত্ত্ব বিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখিয়া "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পাঠক গণের নিকট সু পরিচিত হইয়াছেন। উপন্যাস রচনায় এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। ইহা, প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গসমাজের একটি চিত্র। এই আখ্যায়িকার প্রধান চরিত্র ন্যায়রত্ন মহাশয়—এই চরিত্র অঙ্কনে লেখক মহাশয় যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রাণ ঢালিয়া এই চরিত্রটি আঁকিয়াছেন। কুটিল বুদ্ধি স্বার্থপর জমিদার বিনয় দত্ত, তাঁহার কন্যা সত্যবালা, ন্যায়রত্ন-কন্যা সুমতি প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সুচিত্রিত। উপন্যাস-খানি করুণরস প্রধান। মোটের উপর এখানি পড়িয়া আমারা আনন্দলাভ করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় এই উপন্যাসের একটি ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"আজ কাল পিপে বোঝাই উগ্র বিলাতী সুরা 'আর্টের' লেবেল আঁটিয়া আমাদের দেশে পাঠকসমাজে যথেষ্ট আড়ম্বর সহকারেই কেরি হইতেছে।" —তাঁহারই ভাষায় আমরাও বলি, "গ্রন্থকার মহাশয়··· যে নব্যতন্ত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ উপন্যাসলেখকগণের প্রবর্ত্তিত কলার অনুসরণে··· আর্টের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারের সুরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্গীয় যুবক-সমাজের বহবাভাভের চেষ্টা' করেন নাই তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সাধনা শিক্ষা সোপান।

ইহা, কুমার পরিব্রাজক গ্রন্থমালার ২১শ সংখ্যক গ্রন্থ। বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের সাধুজীবনের সারগর্ভ উপদেশের আভাস মাত্র লইয়া, তৎ-শিষ্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাস মহাশয় ইহা রচনা করিয়া-ছেন। শীলসাধন, ভক্তি সাধন, জ্ঞান সাধন প্রভৃতি বিষয়গুলিকে অবলম্বন করিয়া, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে লেখক মহাশয় যে উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। পুস্তিকা খানি বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে; ম্যানেজার, ... বেনারস সিটি এই ঠিকানায় এক আনা ... ব্যয় পাঠাইলেই বহিখানি পাওয়া যায়।

স্মৃতিচিহ্ন

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০

এই পুস্তকখানিতে লেখিকা মহাশয়ার চারিটি গল্প অথবা সামাজিকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের স্মরণ হয়, কয়েকমাস পূর্ব্বে এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনের প্লাকার্ড আমরা কলিকাতার রাস্তায় দেখিয়াছিলাম। সেই প্লাকার্ডে যেন লেখা ছিল ইহা ইন্দ্রিয় লালসা, ব্যভি-চার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতির জ্বলন্ত-চিত্র। প্লাকার্ডের নকল রাখি নাই, স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি। এই প্লাকার্ড পড়িয়া অত্যন্ত ঘৃণা ও লজ্জা অনুভব করিয়া-ছিলাম। আমরা পুরুষেরা দুইটা পয়সার জন্য অনেক সময় নানারূপ দুষ্কার্য্য করিয়া থাকি;—তাহা সহ্য হয়। চুরি, ডাকাতী, জাল, মিথ্যা মোকর্দ্দমা করি, তাহা পেটের দায়েই করি; এবং মদনানন্দ মোদক জাতীয় উপন্যাস লিখি—তাহাও ঐ কারণেই। কিন্তু একজন পুরমহিলাকে ওরূপ কার্য্য করিতে দেখিলে, লজ্জা রাখিবার যে ঠাঁই থাকে না। সম্প্রতি সমালোচনার্থ পাইয়া বহিখানি পড়িলাম; পড়িয়া, আমাদের মন হইতে সে গ্লানি বিদূরিত হইল। প্রথম গল্পটিতে ব্যভিচার ভ্রূণহত্যার উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু উহা ঐ সকল কদর্য্য ব্যাপারের জ্বলন্ত চিত্র নিশ্চয়ই নহে। ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, গল্পের একজন পাত্রী (লেডি ডাক্তার) ঐরূপ দুষ্কার্য্যকারী একজন পুরুষের প্রতি কষিয়া চাবুক চালাইয়াছেন;—কোথাও মদনানন্দ মোদকের ছিটাফোঁটা পর্য্যন্ত নাই। —তবে, এ রচনাটিকে ঠিক গল্প বলা যায় না এ কথা যথার্থ, অনেকটা বক্তৃতার মতই। অপর তিনটি গল্প সুখপাঠ্য।

শারদীয়া সংখ্যা

আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা আমাদের শারদীয়া সংখ্যা হইবে; উহা ২০শে আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। যে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা ইতিমধ্যে স্থান ত্যাগ করিবেন, তাঁহারা পত্রদ্বারায় আমাদের সময় মত জানাইলে, কার্ত্তিক সংখ্যা সেই নূতন ঠিকানায় তাঁহাদিগকে পাঠাইব।

ধারা বাহিক উপন্যাস বা প্রবন্ধগুলি কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে না, সেগুলি আবার অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ ২য় খণ্ড
কার্ত্তিক, ১৩৩০
২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা

ভবানীর ছদ্ম পরিচয়

বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাচীন—ইংরাজী প্রভাবিত আধুনিক যুগকে নব্যযুগ ধরিয়া লইয়া, আমি তৎপূর্ব্ব কালকে প্রাচীন যুগ বলিতেছি—ঐ প্রাচীন যুগে তিনজন কবি তাঁহাদের কাব্যে অবস্থা-বিশেষে ছদ্ম-বেশিনী ভবানীর মুখ দিয়া যে আত্মপরিচয় প্রদান করাইয়াছেন, তাহার দ্ব্যর্থ-ঘটিত ভঙ্গিমা কাব্যাংশে বড়ই মনোরম।

প্রথম, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডী-কাব্যে সিংহলে বিপন্ন শ্রীমন্তকে রক্ষা করিবার জন্ত চণ্ডীকে জরতী বেশে কোটালের কাছে পাঠাইয়াছেন। কোটালকে চণ্ডী আত্মপরিচয় দিতেছেন :—

"প্রভু মোর কুলে বান্দ্য, কুলে শীলে নাহি নিন্দি,
স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন।
তপস্যা করিয়া আমি, দরিদ্র পাইনু স্বামী,
এক বৃষ সবে তাঁর ধন॥
অবলম্বে নাহি ঠাঁই, সমুদ্রে ডুবিল ভাই,
প্রাণনাথ কৈল বিষপান॥
দারুণ দৈবের দোষে, দুই পুত্র নাহি পোষে
কত দুঃখ করিব বাখান॥"

চণ্ডী নিজের পরিচয় দিলেন ঠিকই; কিন্তু কোটাল বুঝিল লৌকিক অর্থে অন্তরূপ। কোটাল বুঝিল, এই জরাগ্রস্তা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী, যে শ্রীমন্তকে উহার নাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতেছে,—উনি কুলে শীলে বন্দনীয় পঞ্চানন ঘোষালের স্ত্রী; বিবাহের পূর্ব্বে ভাল স্বামী পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন—কিন্তু ফলে স্বামী পাইয়াছিলেন এক দরিদ্র, একটীমাত্র বৃষ যাঁর সম্পত্তি। পরে সে স্বামীও বিষপান করিল। দাঁড়াইবার স্থান নাই। এক ভাই ছিল, সেও সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। দুইটী ছেলে আছে বটে, কিন্তু তাহারা জননীকে প্রতিপালন করে না।

এইরূপ করিয়া পরিচয় দিবার সৌন্দর্য্য এই যে, লৌকিক ভাবে দয়া উদ্রেকের নিমিত্ত যাহা বলা দরকার তাহা বলা হইল, অথচ ঐ সব কথাই দেবীর আসল পরিচয়—দেবীপক্ষে। কোটাল কিন্তু তাহা বুঝিল না। কোটাল বুঝিল সাধারণ মানবী পক্ষে। এই যে ভাষার ছলনা, ইহাই ঐরূপ দ্ব্যর্থঘটিত বাক্য-ভঙ্গিমার নিগূঢ় সৌন্দর্য্য। পরিচয় ঠিকই দেওয়া হইতেছে,—কিন্তু যাহার কাছে পরিচয়, সে ভুল বুঝিতেছে, ইহাই পাঠকের আনন্দ।

পরবর্ত্তী কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা-প্রসঙ্গে গাঙ্গিনী পার হইবার জন্ত পাটুনীর কাছে তাঁহার মুখ দিয়া একটী ছদ্ম পরিচয় দেওয়াইয়াছেন—

"ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি, তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গানামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥"

পরিচয়টী পাটুনীর পক্ষে সবিশেষ গুরুপাক হইলেও রচনা-হিসাবে উহা অতি চমৎকার পাণ্ডিত্য পূর্ণ। ভারতচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মুকুন্দরামের চণ্ডী হইতে এই পরিচয়ের ভঙ্গিমাটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারেনা। কিন্তু তিনি নিজের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য গুণে পরিচয়ের এমন শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন যে, পড়িলে মোহিত হইতে হয়; পাটুনীর পক্ষে সব কথা বুঝা সম্ভব নয়, ইহা জানিয়াই অন্নদাঠাকুরাণী আরম্ভেই একটু শ্লেষের সহিত বলিয়াছেন:—

"বুঝহ" ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।

ফলে, পাটুনী মোটের উপর বুঝিল,—

"যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।"

সব কথা তলাইয়া পাটুনী না বুঝুক, কিন্তু পাঠক বুঝিতেছেন যে ঐ পরিচয়টী দ্ব্যর্থঘটিত রচনা হিসাবে চমৎকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও, করুণরস ও হৃদয়গ্রাহিতা হিসাবে পূর্ব্বোক্ত চণ্ডীর পরিচয় অপেক্ষা হীন। কোটালের কাছে জরতী বেশধারিণী চণ্ডীর আত্মপরিচয় পড়িলেই পাঠকের মন করুণরসে আর্দ্র হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদার উপরিউক্ত পরিচয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও কারুকার্য্যে চমৎকৃত হইলেও, উহাতে মন গলে না। অর্থাৎ, উহা করুণরসে হীন।

ইহার পরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালীন কবি দাশরথি তাঁহার পাঁচালীর "কমলে কামিনী' নামক পালায় অনুরূপ পরিচয়ের অবতারণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব-বর্ত্তী দুইজন "বাবাভাল্‌কো" কবি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা জানিয়াও দাশরথিকে ঐ পালায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশে ভগবতীকে সিংহলের দক্ষিণ মশানে আনিয়া কোটালের কাছে নিজের ছদ্ম পরিচয় দেওয়াইতে হইয়াছে—

"শুনরে কোটাল বাছা! করিয়ে কল্যাণ।
দুর্ভাগিনী দ্বিজের রমণীর রাখ মান॥
শুন যদি আমার দুঃখের পরিচয়।
হবে দয়া, পাষাণ হৃদয় যদি হয়॥
বিধিমতে বিড়ম্বনা করিয়াছে বিধি।
পিতা মোর অচল-দেহ, নাস্তি গতি বিধি॥

শিশুকালে সমুদ্রে ডুবিয়া ম'লো ভাই।
দুঃখের সমুদ্রে সদা ভাসিয়া বেড়াই॥
কোথা রই, মাতৃ-কুলে নাহিক মাতুল।
সবে মাত্র স্বামী একটা, সে হইল বাতুল॥
মানের অভিমান রাখেনা; প্রাণের ভয় নাই।
বিষ খায়, শ্মশানে বসে, গায়ে মাখে ছাই॥
দূরে থাকুক অন্য সাধ, অন্নাভাবে মরি।
কখন বা বস্ত্রাভাবে হই দিগম্বরী॥
সামান্য ধন শঙ্খ একটা না পরিলাম হাতে।
স্বামীর এইত দশা আবার সতীন তাতে॥
সে পাগল দেখিয়া, পতির শিরে গিয়া চড়ে।
তরঙ্গ দেখিয়া তার রৈতে নারি ঘরে॥
উদরান্ন জন্য গিয়ে পরাশ্রিত হই।
জগতে কেউ স্থান দেয়না, তিন দিন বই॥
পতির কপালে আগুন কি সুখ ভারতে।
সবে একটী সন্তান, শনির দৃষ্টি তাতে॥
ক'রো না রে কোটাল! আমার শ্রীমন্তের দণ্ড।
আছেরে ব্রহ্মাণ্ডে আমার ঐ ভিক্ষের ভাণ্ড॥"

পরিচয়টী যে নিতান্ত করুণ রসাত্মক হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটী পরিচয়ের অনেক কথাই দাশরথি তাঁহার নিজের ঢঙে বলিয়াছেন। তাহা ছাড়াও তিনি এই পরিচয়ে নূতন কথারও সমাবেশ করিয়া উহার কাব্যশ্রীর বৃদ্ধি করিয়াছেন। রসপরিস্ফুট করিতে দাশু রায় প্রাচীন যুগের একজন অদ্বিতীয় কবি। এই পরিচয়ই তাহার একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের তিনজন প্রাচীন কবি একই বিষয় অবলম্বন করিয়া কে কেমন রসোদ্রেক করিতে পারিয়াছেন, তাহাই দেখাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীর অবতারণা করিলাম। ভবানীর সাক্ষাৎ পরিচয় পাইবার দিন সমাগতপ্রায়। এ সময়ে তাঁহার স্বমুখ-ব্যক্ত ছদ্ম পরিচয় কয়টীর নিবিড় করুণরস পাঠক-পাঠিকাদিগের উপভোগ্য হইতে পারে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

অমূল্য

(গল্প)

আমরা বিহারী—আরা জেলার অধিবাসী। দীপান্বিতা অমাবস্যা—দেওয়ালী এ অঞ্চলে একটা বড় উৎসব। আমাদের বাগান বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড মেলা। অল্প সময়ের জন্য এরূপ বড় মেলা এদেশে সচরাচর হয় না। নানা রকম ফলমূলের দোকান,—মিঠাইয়ের দোকান,—খেলনার দোকান,—জামা কাপড় ও জুতার দোকান,—মনোহারী জিনিসের দোকান সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। নাচ গান, নাগরদোলা, ম্যাজিক খেলা ও নানাবিধ সঙে মেলাটিকে বেশ জমকাইয়া তুলিয়াছে। সহর ও বিভিন্ন পল্লীস্থ সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকারা দলে দলে আসিয়া মেলা দেখিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য! সর্ব্বত্র হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি, দৌড়াদৌড়ি আর কোলাহল!

আমি সকালে উঠিয় মেলার দিকে বেড়াইতে গেলাম। তখন উহা ভালরূপ বসে নাই, দুই একটি করিয়া দোকান পাট আসিতেছে মাত্র; ক্রেতার সঙ্গে বড় বিশেষ সম্পর্ক নাই, কেবল বিক্রেতার দলই আপন আপন পছন্দ মত স্থান অধিকার করিয়া লইতে ব্যস্ত। শুধু অদূরে একটি

যুবককে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। বালার্ক রাগ রেখা সম্পাতে তাহার মুখখানা স্পষ্টরূপে আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। তবে অনুমানে বুঝিলাম—উহার বয়স সতের আঠার বৎসর হইবে, এবং সম্ভবতঃ সে বাঙ্গালী।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর পুনরায় যখন আমি মেলায় আসিলাম, তখন মেলার পূর্ণাবস্থা; শত শত ক্রেতা, বিক্রেতা ও দর্শকের সমাগমে সে বিস্তৃত ময়দানটি পরিপূর্ণ। তখন দেখা গেল, সেই ছেলেটি এক ছবির দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। এবার আমি উহাকে একটু ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইলাম; আমার অনুমান মিথ্যা হইল না, বাস্তবিকই সে বাঙ্গালী।

উহাকে দেখিয়া প্রথমেই আমার মনে একটা কৌতূহল জাগিয়াছিল, কারণ এখানে বাঙ্গালী অতি বিরল; ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে দুই চারিজন—যাঁহারা আছেন তাঁহারা আমার অপরিচিত নহেন, অধিকন্তু তাঁহাদের বাসায় প্রায়শঃই আমার যাতায়াত আছে। কিন্তু এ বয়সের এবং এরূপ চেহারার কোনও বালককে কোথায়ও আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; বিশেষতঃ ছেলেটির চেহারার মধ্যে এমনই একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ছিল, যাহাতে একবার দেখিলে সহসা ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই; অনাবিল গৌরবর্ণ, মুখখানি ভারি সুন্দর। হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ কাহারও এমন সুন্দর মুখ হয়। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং প্রোজ্জ্বল, দৃষ্টি কিছু প্রখর; শারীরিক গঠন বেশ পরিপুষ্ট এবং বলিষ্ঠতা ব্যঞ্জক, ললাট সুপ্রশস্ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পরিধানে একখানি মলিন দেশী ধুতি, গায়ে বোম্বাই ছিটের একটি কামিজ, তাহা পকেট স্কন্ধ এবং কনুইয়ের স্থানে অল্প অল্প ছেঁড়া, কোমরে একখানি মোটা চাদর জড়ান, পায়ে জুতা নাই, মাথার চুলগুলি রুক্ষ ও লম্বা, বোধ হয় অনেক দিন তৈল সংস্পর্শের একান্ত অভাব; তবুও সমগ্র চেহারা খানি যেন লাবণ্যের একটা অফুরন্ত উৎস। আমি একটি স্থূলকায় ব্যক্তির আড়াল হইতে কিছুকাল তাহাকে দেখিয়া, অন্যদিকে চলিয়া গেলাম।

* * * * *

ফিরিয়া আসিবার সময় ছেলেটি আর সে ছবির দোকানে ছিলনা। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, ৫।৬বৎসরের একটী নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র বালক নিকটবর্ত্তী এক মনোহারি দোকানের একটী পিতলের বাঁশী দেখিয়া, তদপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড় একটী বালিকাকে বলিল, "ঐ বাঁশীটা আমায় কিনে দে।" বালিকাটী একটু চমকিয়া উঠিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, "লক্ষী ভাইটী আমার! ওতে আমাদের দরকার নাই, চ'ল এখন বাড়ী যাই।"

বালক ছাড়িল না; বায়না ধরিল—"না, ওটা আমায় কিনে দিতেই হবে।" বালিকা তখন তাহাকে কোলে তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে খানিকটা উঠিয়াই চীৎকার পুর্ব্বক নামিয়া গেল। বালিকাটী তখন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "মা যে শুধু চারটে পয়সা দিয়েছিল, তা'ত ফুরিয়ে গিয়েছে, তোকে পুঁতুল কিনে দিয়েছি, ভুগ্গা কিনে দিয়েছি, আর পয়সা পাব কোথায়?" অবুঝ বালক তাহা শুনিলনা, সে মাটীতে পড়িয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। বালিকাটী মনঃকষ্টে সত্য সত্যই এবার কাঁদিয়া ফেলিল। কতকগুলি হৃদয়হীন লোক তাহাদিগকে ঘিরিয়া আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল। এমন সময় সেই বাঙ্গালী বালকটী পূর্ব্বদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া, ভীড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং ব্যাপারটা বুঝিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুদ্র একটী ব্যাগ হইতে একটী চকচকে সিকি বাহির করিয়া অলক্ষিতে বালিকার হাতের উপর ফেলিয়া দিল। বালিকাটী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিতেই সে তাড়াতাড়ি অপর দিকের জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল। আমি মনে মনে ছেলেটীর সহৃদয়তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তারপর স্নানাহারের সময় আগত দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

* * *

২

অপরাহ্নে আবার আমি মেলার স্থানে বেড়াইতে গেলাম। আমি আগাগোড়া মেলাটি ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কোথাও আর সেই ছেলেটিকে দেখিতে পাইলাম না; মনটা কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। এবার দেখা হইলে পরিচয় লইব, এই উদ্দেশ্যেই এদিকে আসা, নতুবা আমার বৈকালিক ভ্রমণের স্থান অন্যদিকে। অহো কি নির্ব্বুদ্ধিতা আমার! সে কি আমার পরিচয়ের প্রতীক্ষায় সারাদিন এখানে বসিয়া থাকিবে? কোথা হইতে আসিয়াছিল তামাসা দেখিতে—তামাসা দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে। হতাশ ভাবে বাড়ীর দিকে ফিরিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম কে একজন আমাদের বাগান বাড়ীর পুকুরের ধারে একটা প্রকাণ্ড অর্জ্জুন গাছের নীচে মোটা একটা শিকড়ের উপর মাথা রাখিয়া ঘাসের উপর সটান ভাবে শুইয়া আছে। তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া তাকাইতেই আমি থত মত খাইয়া গেলাম। এ যে সেই বালক, যাহাকে আমি এতক্ষণ মনে মনে খুঁজিতেছিলাম। সহসা হারাণো জিনিস হাতে পাইলে মানুষের যেরূপ মানসিক অবস্থা হয়, আমারও প্রায় সেই রূপই হইল। আমি তখন এক প্রকার তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তাহাকে যথার্থ নিদ্রিত বলিয়া বোধ হইল না, যেন একটা ক্লান্তি জনিত অবসাদে চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছে। মুখ খানি নিদাঘ তপ্ত গোলাপ কলিকার মত কিঞ্চিৎ ম্লান; সদ্যঃ অস্তমিত সূর্য্যের শেষ স্বর্ণভ রশ্মিজাল সেই ম্লান মুখের উপর পড়িয়া মুখ খানিকে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়াছে। মাথার লম্বা লম্বা এলোমেলো চুলগুলি তাহার সুপ্রশস্ত ললাট এবং সুগোল কপোলদ্বয়ের উপর ঝাপিয়া পড়িয়া মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরণে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হওয়ায় এক মনোরম নূতন দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার পদশব্দে ছেলেটা ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং একবার মাত্র আমার মুখের উপর আয়তনেত্রের সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, পরক্ষণেই আবার ফিরাইয়া লইল। তাহাকে সন্ধ্যাকালেও এখানে এরূপভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সত্য সত্যই আমি কিছু সন্দিগ্ধ হইলাম। তারপর তাহার পরিচয় লইবার জন্য স্পষ্ট বাংলা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি বাঙ্গালী?"

ক্ষীণকণ্ঠে বালকটী উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"তোমার বাড়ী কোন জিলায়?"

সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "কল্‌কাতা।"

"বেশ! তোমার নাম কি?"

"অমূল্যচন্দ্র সরকার।"

"কায়স্থ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি জন্য এখানে এসেছ?"

"এই, ঘুরতে ঘুরতে।"

"এখানে তোমার কে আছেন?"

"কেউ না।"

"তোমাকে খুব ক্লান্ত বলে বোধ হচ্চে, না?"

সে চুপ করিয়া রহিল। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে ত সেই সকাল থেকে সন্ধে পর্য্যন্ত এখানেই দেখ্‌ছি, তুমি খেয়েছ কি?"

"কিচ্ছু না।"

"কেন, মেলায় ত খুব ভাল ভাল খাবার এসেছিল।"

"তা' কেন্‌বার পয়সা কোথায়?"

"কেন, তোমার সঙ্গে কি টাকা পয়সা কিছু নেই?"

"দু' চার আনা থাকতে পারে।"

"আচ্ছা, কাল কি খেয়েছিলে?"

"এই, পয়সা চারেকের চিঁড়ে মুড়্‌কি।"

"তার আগের দিন?"

"সে দিনও ভাত জোটে নি।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অতঃপর ইহাকে বাজে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাড়াতাড়ি কহিলাম, "তুমি আমাদের বাড়ী যেতে রাজি আছ? এই নিকটেই বাড়ী। আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের বাড়ী সাধ্যমত অতিথিসেবা হয়ে থাকে।"

তখনই সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। আমি

সত্বর তাহাকে উঠিয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে সে তাহার মোটা চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া মৃদু পাদবিক্ষেপে আমার অনুসরণ করিল।

৩

আহারান্তে আমার পাঠাগারের এক অংশে অমূল্যর শুইবার স্থান করিয়া দিতে বলিলাম। কিছুকাল পর ছেলেটির সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখি—সে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। দুই দিন অনাহারের পর পেট ভরিয়া খাইয়া, অবসন্ন ভাবে নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে; এ সময় তাহাকে বিরক্ত করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম। পরদিন প্রত্যুষে গিয়া দেখি, সে অনেক আগেই ঘুম হইতে উঠিয়া আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আমাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর আমি ঘরে ঢুকিতেই কৃতজ্ঞ ভাবে বলিল, "আপনার অনুগ্রহে রাত্রিতে বেশ ছিলাম; এখন যাবার অনুমতি করুন।" আমি একটু বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা যাবে?"

"তার ঠিক নেই।"

"আচ্ছা, এমন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানায় লাভ কি?"

সে চুপ করিয়া রহিল। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাপ মা আছেন?"

"মা নেই, বাবা আছেন।"

"তোমার বাবা কি করেন?"

"মাপ্ করবেন, আমার পারিবারিক পরিচয় সম্বন্ধে এর বেশী কিছু বল্‌তে পারবো না।" আমি বিস্মিত হইলাম। ছেলেটির এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই যে একটা কিছু রহস্য লুক্কায়িত আছে, প্রথম দর্শনেই আমার মনের কোণে সেরূপ সন্দেহের একটা ছায়াপাত হইয়াছিল; অধুনা তাহা অনেকটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। তবুও ঐ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলাম; কারণ, কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এ প্রকৃতি আমি আমার পূজনীয় অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পাইয়াছিলাম, তিনি প্রায়শঃই একথাটি আমাদিগকে বলিতেন। যাহা হউক, আমি তখন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম—

"তুমি অবশ্যই লেখাপড়া জান?"

"হ্যাঁ, কিছু কিছু জানি।"

"ঘুরে বেড়ানর চেয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা কি ভাল নয়?"

"কতক কতক বিষয়ে ভাল বটে।"

"আচ্ছা, এখানে তুমি থাক না কেন?"

"কি কায করবো?"

"এই যা' তুমি পারবে। দেখ, আমি বাংলা সাহিত্যের সাধারণ একজন ভক্ত, যদিও আমি হিন্দুস্থানী। তুমি বোধ হয় শুনে খুসী হবে যে, বাংলা দেশে এবং বাঙ্গালীর সংস্রবে আমার জীবনের অনেক বৎসর কেটে গিয়েছে। কলেজ জীবনের দীর্ঘ ছ' বছর কল্‌কাতায় আমি আমার এক আত্মীয়ের আড্ডাতে ছিলাম।"

"তাতেই ত আপনার মুখে আজ এমন সুন্দর বাংলা শুনছি।"

"তা' ছাড়া আগাগোড়াই ওখানে আমি বাংলা ভাষার চর্চ্চা করছি। বাংলা ভাষা অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অসম্ভব উন্নতি লাভ করেছে, যা' কোনও জাতির কোনও ভাষা কোনও দিন করেছে কি না সন্দেহ। দেখ, তোমাদের দেশের কয়েকজন সাহিত্যিককে আমি আন্তরিক খুব শ্রদ্ধা করি। আমি আমাদের পরিবারের মধ্যে কিছু কিছু বাংলাভাষা প্রচলনের অভিপ্রায় করেছি; তুমি ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পার।"

"কি সাহায্য করবো?"

"এই, দু' চারটি ছেলে পড়ানো।"

"না, মহাশয়! ছেলে পড়ানর মত যোগ্যতা আমার নেই, অন্য কায দিতে পারেন।"

"অন্য কি কায করবে ?"

"এই তামাক সাজা, ঘর ঝাঁড় দেওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, হাট বাজার করা—এই সব।"

তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম ! বাঙ্গালীর ছেলে, বাংলা ভাষায় অবশ্যই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, আর আমাদের বাড়ীর ছেলেরাও পড়িবে কেবল এই ক,খ। সুতরাং তাহাদিগকে সে যেমন তেমন করিয়া বেশ আগ্‌লাইয়া রাখিতে পারিত। মাষ্টারি চাকরি কত আরামের, তাহা উপেক্ষা করিয়া সে চাহিতেছে কিনা সাধারণ ভৃত্যের নিকৃষ্ট কায ! ছেলেটী কি বাস্তবিকই নির্ব্বোধ ? না, ইহা উহার নির্ব্বুদ্ধিতার ভান ? আকার ইঙ্গিতে ত ছেলেটীকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়না। আর ছোট ঘরের ছেলে ত মোটেই নয় যে নীচ কার্য্যের দিকে স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি আসিবে। উহার চোখে মুখেও আভিজাত্যের একটা দীপ্ত আভা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। উহার চরিত্র আমার নিকট প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। তবে একটা কোনও অপ্রিয় পারিবারিক ঘটনাস্রোতই যে উহাকে এতদূর আনিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমি একরূপ নিঃসন্দেহ হইলাম। যাহা হউক, এই সুদর্শন বিদেশী ভদ্রবালকটীকে দিয়া ঐ সকল নীচ কায করাইতে আমার আদৌ প্রবৃত্তি হইল না ; তথাপি যেন তেন প্রকারেণ উহাকে কিছু দিন এখানে আট্‌কাইয়া রাখা দরকার, কারণ ইদানীং প্রায়শঃই পত্রিকায় নিরুদ্দিষ্টের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি তাদৃশ কোনও বিজ্ঞাপন কখনও চক্ষে পড়ে, তবে তখন উহাকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া ছেলেটীকে লইয়া তখন বৈঠকখানায় বাবার নিকটে গেলাম। বাবা আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাসিলেন এবং একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "রাখ্‌তে পার, আপত্তি নেই। চোর বদ্‌মাস না হওয়াই সম্ভব, তবে বল্‌তে পারিনে ক'দিন টিকবে।"

বাবার মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটীর সুগঠিত রক্তাধর প্রান্তে মৃদুহাস্যের এক ক্ষীণ রেখা সন্ধ্যার হিঙ্গুলবর্ণ মেঘের গায়ে চঞ্চল বিদ্যুদ্দামের সচকিত নৃত্যলীলার মত মুহূর্ত্তের জন্য একবার জাগিয়া পরক্ষণেই আবার বিলীন হইয়া গেল। বাবা বা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী আর কেহ তাহা লক্ষ্য না করিলেও, আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল না। আমি বলিলাম, "তা' যে ক'দিন ওর বরাত আছে থাক্‌বে।" বাবা আমার আগ্রহ দেখিয়া আবার হাসিলেন। তার পর ছেলেটীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "থাক বাপু তুমি এখানে। খুব ভাল ভাবে থাকবে, খাওয়া পরা বাদে পাঁচ টাকা করে মাইনে পাবে।"

আমি ভিতরে লইয়া গিয়া তাহাকে কায কর্ম্ম সব বুঝাইয়া দিলাম এবং যাহাতে এখানে তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও রূপ হানি না হয়, তৎপ্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিব বলিয়া মনে মনে দৃঢ় সংকল্প হইলাম।

৩

পূর্ণ চারি মাস হইল অমূল্য আমাদের বাড়ী আসিয়াছে, ইহারই মধ্যে স্বভাবের গুণে সে সকলেরই প্রিয়পাত্র। অধুনা অন্দর মহলে তাহার অবারিত দ্বার, বাড়ীর মেয়েরা অসঙ্কোচে অমূল্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন। তাহার প্রতি মা এবং পিসীমার হৃদয়ের টানও অনেকদিন অনেক কাযে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাবা তাহার পরিচর্য্যায় প্রীত হইয়া একমাস যাইতে না যাইতেই একটাকা মাহিয়ানা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আমার হৃদয়ের অনেকখানি সে ত অনেক দিন আগেই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ইদানীং সে আর এক জনের বড় প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছে,—সে আমার ছোট বোন পার্ব্বতী। দিন রাত্রি সে অমূল্যর পিছু পিছু ফেরে, তাহার নিকট বসিয়া গল্পের লহরী তোলে। অমূল্যর নিকট থাকিলে তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, খেলার ঘর ও খেলার সাথীদের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। অমূল্যও ঠিক আপনার ছোট বোনটির মতই তাহাকে স্নেহ করে ও আদর যত্নে আপ্যায়িত রাখে।

সেদিন অশ্বপৃষ্ঠে বাড়ী ফিরিতেছি, পথে দেখিতে পাইলাম—অমূল্য পার্ব্বতীকে তাহার ছেলেবেলাকার পেরাম্বুলেটর গাড়ীতে চড়াইয়া বরা বর সদর রাস্তা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই গাড়ী খানির সঙ্গে প্রায় আড়াই বৎসর পার্ব্বতীর কোনও সম্পর্ক নাই। এতদিন ইহা ধূলি ধূসরিত অবস্থায় গৃহের এককোণে অনাদৃত ভাবে পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি অমূল্য ইহার ধূলি ঝাড়িয়া ইহাকে মাজিয়া ঘসিয়া একরূপ ব্যবহারযোগী করিয়া হইয়াছে। আমি অমূল্যকে বলিলাম, "ছি অমূল্য! এখনও কি পার্ব্বতীর এ গাড়ীতে চড়্বার বয়স আছে? আর তুমিই বা কেন ওকে নিজে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ? দু'টো সইস্ ত নিয়তই রয়েছে।" সে কোনও উত্তর দিল না, কেবল মৃদুহাস্তে কমনীয় আস্য সুরঞ্জিত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার কার্য্যেই যেন উহার সমধিক আগ্রহ ও মনোযোগ লক্ষিত হয়। আমার শয়ন ঘর, বৈঠকখানা, পাঠাগার সে দিবসে দুই তিন বার করিয়া ঝাঁড় দেয়, ঘরের জিনিসপত্র যথাস্থানে বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে, কোনও স্থানে আবর্জ্জনার লেশমাত্র থাকিতে পারে না। বাস্তবিক অমূল্যর আগমনে আমার গৃহগুলি এক অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

শুধু একবিষয়ে আমি বহুচেষ্টা করিয়াও অমূল্যকে বশে আনিতে পারি নাই, সে তাহার খাওয়া পরার উপর ঘোর ঔদাসীন্ত। কয়েকবার তাহাকে ভাল ভাল জামা কাপড় আনিয়া দিয়াছি, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করে নাই। নূতন জুতা কিনিয়া আনিয়া পীড়াপীড়ি করিলে সে হাসিয়া বলিয়াছিল, "বাবুজি! আমার জুতো না হলেও বেশ চলতে পারে, কিন্তু হয়ত একজন দরিদ্র অর্থাভাবে তাহার ক্ষতদুষ্ট পা খানির চিকিৎসা করতে পারছেনা, খোঁড়া হয়ে আছে, এ অর্থটা ন্যায়তঃ তারই প্রাপ্য।" তাহাকে ভাল খাওয়ান এক বিষম সঙ্কট। খাওয়াইবার জন্ত জেদ ধরিলে সে বলে, "আপাদের এখানে জিভকে সৌখীন ক'রে তুলে শেষে কি মারা যাবো? চিরকাল ত আমি আর জমিদারের আশ্রয় পাচ্ছিনা।"

অন্ধ, খঞ্জ, আতুর দেখিলে সে হাতের কায ফেলিয়া তাহাদের নিকট যায়, মনোযোগ দিয়া তাহাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনে, সাধ্যমত নিজে সাহায্য করে, সময় সময় অন্যের নিকট হইতেও কিছু কিছু আদায় করিয়া দেয়। কাহারও পীড়ার কথা শুনিলে ছুটিয়া গিয়া সে তাহার শিয়রে বসে, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত সেবা শুশ্রূষা করে, সে ঘোড়ার সহিসই হউক, আর বাগানের মালীই হউক সে সম্বন্ধে তাহার কিছু বাছবিচার থাকে না। এক এক সময় মনে হয় সত্য সত্যই বুঝি আমি পথের ধারে একটি অমূল্য মাণিক কুড়াইয়া পাইয়াছি। বাস্তবিক, উহার স্বভাবের মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই, উদারতা দেখিয়া অবাক্ হই, সেবা এবং সংযম দেখিয়া বিস্ময়ের অবধি থাকে না, মহত্ত্ব দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাই।

৪

এই ভাবে প্রায় দশ মাস কাটিয়া গেল। ভাদ্রমাস, শরতের প্রারম্ভ। আজও প্রকৃতি সুন্দরী বর্ষার প্রভাব এড়াইয়া শরতের নির্ম্মল বেশ পরিধান করিতে পারেন নাই। আজিও সকালে সন্ধ্যায় শেফালি কুসুম দিকে দিকে তাহার সুবাস ছড়াইতে আরম্ভ করে নাই। কেতকী, কুরবক ও মালতী ফুলের মনোমদ গন্ধে আজিও উপবনরাজির পথ ঘাট ভরপুর হইয়া উঠে নাই। সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুমুদকহ্লারের মধুপান-মত্ত ভ্রমরকুল আজিও শারদ শ্রীর আবাহন গীতির কলস্বরলহরী তোলে নাই। সরসী বক্ষে শত শত কোকনদ পূর্ণবিকসিত হইয়া আজিও শারদলক্ষ্মীর শুভাগমন ঘোষণা করে নাই। তটিনী এখনও পূর্ণতোয়া, পূর্ণবেগে প্রবাহিতা, এখনও সে প্রিয়বিচ্ছেদ-বিধুরা অলসগতি ক্ষীণাঙ্গীর শোচ্য সৌন্দর্য্যকে বরণ করিয়া লয় নাই। নক্ষত্রপুঞ্জ আজিও তাহাদের উজ্জ্বল হীরক কান্তি মেঘোন্মুক্ত সুনীল অম্বরে দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত করিবার অবসর পায় নাই। পূর্ণশশী আজিও দুর্ভেদ্য মেঘাবরণ ভেদ

ধরিত্রীর বক্ষে তাহার রজতশুভ্র কিরণ ধারা ঢালিবার সুযোগ লাভ করেন নাই।

এই বর্ষা এবং শরতের সন্ধিক্ষণে এক বাদল সন্ধ্যায় আমি আমাদের দ্বিতলের বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছি। বাহিরে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল; হঠাৎ নিম্নে অমূল্যের শয়ন কক্ষের উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, ভিতরের দিক হইতে দরজা বন্ধ। এ সময় কখনও তাহাকে ঘরের ভিতর থাকিতে দেখি নাই। প্রবল ঝড় জলের মধ্যেও এ সময় তাহাকে একবার অবশ্যই বাহিরের মাঠে বেড়াইয়া আসিতে হইবে, এ নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। আজ হঠাৎ তাহাকে ঘরের ভিতর থাকিতে দেখিয়া মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হইল, কোনও অসুখ বিসুখ করে নাই ত? যাহা হউক, তখনই পূর্ব্বদিকে ত্রিতলের সিঁড়ির নিকট সরিয়া গিয়া জানালা পথে তাহার ঘরের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। উপরকার জানালা খোলা থাকিলে এখান হইতে ভিতরের কতকটা অংশ বেশ স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

যাহা দেখিলাম, তাহাতে আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না! দেখিলাম, কয়েকখানি কাগজ—কয়েকখানিকে সাধারণ চিত্র বলিয়াই মনে হইল, দুই এক খানি কোনও কিছুর তালিকাও হইতে পারে। মুখে তাহার বিষম উদ্বেগের চিহ্ন বর্ত্তমান; ক্রোধে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু এক এক বার শিখার মত জ্বলিয়া উঠিতেছে; ওষ্ঠাধর পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হইতেছে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ লাগিতেছে; ললাটের স্নায়ু সকল ফুলিয়া উঠিতেছে, দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, বক্ষস্থল থাকিয়া থাকিয়া স্ফীত হইতেছে। কিছুকাল পরে একখানি পত্রহস্তে সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রোধভরে তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিল, এবং সজোরে চর্ব্বণ করিতে লাগিল। নিতান্ত শান্তশিষ্ট সুবোধ ছেলেটির আকস্মিক এই রুদ্র ভাবের কোনও অর্থোদ্ঘাটন করিতে পারিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল, সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপ ক্রমশঃই আমার চক্ষে অস্পষ্ট হইতে লাগিল, বিশেষতঃ তখন সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় সমাগত বলিয়া সত্বরেই আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

৫

অতি প্রত্যূষে কাহার উচ্চ ডাকে সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখি—বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য গোপাল লাল দাঁড়াইয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে গোপাল লাল। এত সকালে যে? খবর কি?" গোপাল লাল ব্যস্তভাবে বলিল, "কর্ত্তা আপনাকে নীচে ডাকছেন, শীগ্‌গির চলুন, বিলম্ব করবেন না।"

আমি এ ডাকের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, কারণ সাধারণতঃ তিনি এত সকালে কখনও ঘুম হইতে উঠেন না। আর উঠিলেও নীচে যান্ না। অধিকন্ত এত জরুর আমাকে ডাকিবারই বা কারণ কি? যাহা হউক, সত্বর মুখ হাত ধুইয়া বাহির বাড়ী চলিয়া গেলাম। বাবা আমাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ইন্দ্র! ব্যাপারখানা কি? সমস্ত বাড়ী পুলিশে ঘেরাও করেছে কেন?"

আমার ত শুনিয়াই চক্ষুস্থির! "তা, বল্‌বো কেমন করে?" এই রকম একটা সাঙ্কেতিক উত্তর দিয়া তাড়াতাড়ি আমি বৈঠকখানা ঘরের দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া উঠিলাম এবং বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইলাম চতুর্দ্দিকে কেবল লালপাগড়ী! কেবল লালপাগড়ী! সদর দরজায় সম্মুখেই ভীড়টা কিছু বেশী। তখন চতুর্দ্দিক বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বগগনে উষার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং স্পষ্ট দেখা গেল—দুইজন ইউরোপীয়ানও অশ্বারোহণে অদূরে দণ্ডায়মান। আমি অনেক ভাবিয়াও এই অতর্কিত আক্রমণের কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। নামিয়া আসিয়া বাবাকে বলিলাম, "সদর দরজা খুলে দেওয়া হোক, ওদের কি কথা শুনি।"

বাবা তখনই দরজা খুলিবার আদেশ দিলেন।

দারোয়ান দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ সাহেব কয়েকজন সাবইনস্পেক্টরসহ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে একজন বাঙ্গালী বাবুও ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিধানে পুলিশের পোষাক ছিল না। কয়েকজন পুলিশ প্রহরী সঙ্গীন চড়ান বন্দুক হস্তে সদর দরজা আগলাইয়া পাহারায় নিযুক্ত রহিল। ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেব হুকুম জারি করিলেন—"কেহই বাহিরে যাইতে পারিবে না।"

আমাদের বাড়ীর দুই তিনজন প্রধান কর্ম্মচারীকেও ডাকা হইল। আমরা আসিয়া কাছারী দালানের এক সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষে উপবেশন করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "চৌবে জী! আপনার বাড়ী এনার্কিষ্ট আছে।"

প্রথম হইতেই উৎকণ্ঠায় বাবার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর বিনামেঘে বজ্রাঘাত সদৃশ এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কথা সরিল না। তৎক্ষণাৎ চেয়ার খানি সরাইয়া আমাকে আড়াল করিয়া বসিলেন। আমি বহুদিন বাংলা দেশে ছিলাম, বাংলায় তখন বিপ্লববহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বাবার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে আমিই বোধ হয় সেই এনার্কিষ্ট এবং আমাকে ধরিবার জন্যই এই আয়োজন। হা অন্ধ পিতৃস্নেহ! যদি আমি যথার্থই এনার্কিষ্ট হই, তবে কি তুমি আমাকে এই সামান্য চেয়ারের আড়ালে রক্ষা করিতে পারিবে? এক মাত্র জলপিণ্ডের আশা এই পুত্ররত্নের ভাবী বিপদের আশঙ্কায় তিনি এতদূর বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে,জীবনেও আমি কোনদিন তাঁহাকে এরূপ বিহ্বল হইতে দেখি নাই। তিনি ভীরু স্বভাবের লোক নন, দুর্দান্ত এবং তেজস্বী জমিদার বলিয়া এতদঞ্চলে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে, কতবার কত দাঙ্গা এবং খুনী মামলার আসামী হইয়াও তিনি কিছুমাত্র ঘাবড়াইয়া যান নাই। কিন্তু আজ এই সাতরাজার ধন একমাণিকের জন্য সেই পুরুষসিংহ এমন এতটুকু হইয়া গিয়াছেন যে দেখিলে বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক দুই তিন বার ঢোক গিলিবার পর তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমার বাড়ী এনার্কিষ্ট? সাহেব! তোমার ভুল হয়ে থাকবে।"

সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "ভুল হয়নি চৌবে জী! ইংরাজের এরূপ ভুল হয় না।"

"নাম কি তার?"

"সত্যকিঙ্কর রায়।"

"বাঙ্গালী?"

"হ্যাঁ।"

বাবা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার কণ্ঠসংলগ্ন শাণিত কৃপাণ সহসা যেন কোন দেবতার বরে সরিয়া গেল। তাঁহার মুখমণ্ডল মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বাভাবিক দীপ্ত আভা ধারণ করিল। নিমেষে তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সহজভাবে বলিলেন, "ঐ নামের কোনও লোক ত এখানে নেই।"

"অন্য কোনও নামের আছে কি?"

"হ্যাঁ, অমূল্য নামে একটি বাঙ্গালীর ছেলে আজ কয়েকমাস ধরে আমার বাড়ী চাকরি করছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ ছেলেই বটে!"

"এই যে আপনি বললেন, তার নাম সত্যকিঙ্কর রায়?"

"ওরকম ঢের নাম ওর আছে।"

আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওর অপরাধ কি?"

"অনেক—রাজদ্রোহ, বন্দুক চুরি, বোমা মারা, ডাকাতি ইত্যাদি।"

আমি একটু রসিকতা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হাসিয়া বলিলাম, "সে যত বড় বিপ্লববাদীই হউক না কেন, ১৭।১৮ বৎসরের বালক বই আর কিছুই নয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালী ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাকে ধরবার জন্যে আপনাদের এ আয়োজন দেখে মনে হয় এ যেন বিড়ালের বিরুদ্ধে ব্যাঘ্রের বিরাট অভিযান!"

সাহেব কিঞ্চিৎ বিরক্তি পূর্ণ স্বরে বলিলেন—

"ওকে ততটা সহজ মনে করবেন না যতটা আপনি ভাবচেন, অধিকন্তু ভীরু বা দুর্ব্বল সে ত মোটেই নয়; বাঙ্গালীমাত্রেই ভীরু বা দুর্ব্বল এরূপ মনে করা একটা মস্ত ভুল। এরকম যোগাড় যন্ত্র করেও পুলিশের লোক ওকে ধর্‌তে চার্‌ চার্‌বার অকৃতকার্য্য হয়েছে।"

বাবা আমার প্রতি রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমার বাপু ওসব কথায় দরকার কি? তুমি চুপ কর না।" তারপর সাহেবকে বলিলেন, "আপনার এখন কি অভিপ্রায়?"

"ওকে চাই। যদি ওকে এখানে হাজির করে দেন, তবে আর কোন গোলমাল হবে না।"

বাবা বাড়ীর বৃদ্ধ বরকন্দাজ পৃথ্বীসিংকে ডাকিয়া বলিলেন, "অমূল্যকে শীঘ্র এখানে ডেকে দাও।"

বৃদ্ধ বরকন্দাজ "যে আজ্ঞে" বলিয়া চলিয়া গেল। প্রায় ৫ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল তাহার ঘরে সে নাই, বাহিরেও তাহাকে দেখা গেল না। বাবা পুনরায় আদেশ দিলেন—ভিতর বা বাহির যেখানেই থাক, খুঁজিয়া আন। পনের মিনিট পর দারোয়ান আসিয়া পুনর্ব্বার খবর দিল, কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। সাহেবদ্বয় বিচলিত হইলেন, তাঁহাদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। পুলিশ সাহেব ব্যগ্রভাবে বাবাকে বলিলেন, "অনুগ্রহ করে আপনি একবার নিজে লোকজন নিয়ে অনুসন্ধান করুন। অতবড় একটা মানুষ একেবারে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যেতে পারে না; গোয়েন্দা পুলিশ আজ দু'দিন ধরে তা'কে এখানে চোখে চোখে রেখেছে। কাল রাত্রি ৯টার সময় সে যখন শেষবার ফটকে ঢোকে, তারপর হতেই এই ব্যবস্থা। এক হাত ফাঁকে ফাঁকে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী। বাড়ী হ'তে একটা বিড়ালেরও বেরিয়ে যাবার উপায় নেই।"

বাবা চলিয়া গেলেন এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে ভিতর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন, অমূল্যকে পাওয়া যাইতেছে না; আপনারা স্বয়ং আসিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন। সাহেবদ্বয় সবেগে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। তখনই প্রবল বেগে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল; গৃহ দালান, চণ্ডীমণ্ডপ, নাট মন্দির, মালখানা, তোষাখানা বালাখানা, রান্নাঘর, ঠাকুর দালান, গোয়াল ঘর, আস্তাবল, চিলে কুঠুরী, এমন কি মায় পায়খানা পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন ঘণ্টা ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, জিনিসপত্র বার বার উলট পালট করিয়া দেখা হইল, কিন্তু কোথায় অমূল্য? অমূল্য অদৃশ্য!

আমরা দ্বিতলের ছাদ হইতে কেবল নীচে নামিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় গোয়েন্দা পুলিসের অস্ফুট চীৎকারে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম —উত্তর দিকের আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তিনি কি দেখিতেছেন। আমরা সকলেই উৎসুক ভাবে সেখানে গেলাম। দেখা গেল, ছাদের এক কোণে দুই মণ ওজনের একটা লোহার হন্দর পতিত রহিয়াছে, তাহার কড়ার সঙ্গে দুইখানি কাপড় পর পর বাঁধা, এবং সেই কাপড় লম্বিত ভাবে রান্নাঘরের ছাদের উপর গিয়া পড়িয়াছে, এবং প্রাচীরের বহিঃস্থিত নারিকেল গাছের একটা লম্বা শাখা বাতাসে আনিয়া সেই ছাদের এক কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। পুলিস সাহেব তন্ময় ভাবে সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন— "শয়তানটা এই পথে পালিয়েছে। ডাল ধরে ধরে নারিকেল গাছে উঠেছে, নারিকেল গাছ থেকে ঐ আমগাছটায় গিয়েছে, তারপর ঐ আমগাছটায় গিয়েছে, এইরূপে গাছে গাছে পরিখা পর্য্যন্ত গিয়ে সাঁতরিয়ে পরিখা পার হয়ে একেবারে উধাও! শালা একটা আস্ত বানর! দেখ ত কেমন গাছে গাছে পথ করে নিয়েছে! সিপাহীরা নীচে থাকিলেও কিছু টের পায়নি!"

সহসা বাবা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"এই লোহার হন্দরটা' ত উঠানে পড়ে ছিল, ছাদের উপরে এল কি করে?"

বাঙ্গালী বাবুট হতাশ ভাবে বলিলেন, "ওই তুলে এনেছে। ওর শরীরে অসুরের মত বল, বাস্তবিক ভদ্রঘরে এমন দুর্দ্দান্ত ছেলে খুব কম জন্মায়!"

"ও ভদ্রঘরের ছেলে নাকি?"

"সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, ওর বাপ পূর্ব্ববঙ্গের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি।" সকলেই বিরস বদনে চলিয়া গেল। অমূল্যকে ধরিতে পারিলে গোয়েন্দা পুলিশের যে দুই সহস্র মুদ্রা পুরস্কার প্রাপ্তির আশা ছিল, তাহাও তখনকার মত শূন্যে বিলীন হইল।

পরিশ্রান্ত ভাবে লাইব্রেরী ঘরে আরাম কেদারায় শুইয়া এই অদ্ভুত বালকের বিষয় চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ টেবিলের কোণে চাঁপা দেওয়া একখানি "চিরকুটের" উপর দৃষ্টি পড়িল। তাড়াতাড়ি টানিয়া আনিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িতে লাগিলাম। সুন্দর হস্তাক্ষর! ইংরাজীতে লেখা, মর্ম্ম এই—

ইন্দ্রদা!

অতঃপর বোধ হয় আপনি আর আমাকে ভৃত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। চলিলাম! খুব সুখেই আপনাদের বাড়ী ছিলাম, কিন্তু এ সুখ আমার অদৃষ্টে অধিক দিন সহিল না; জানি না, এমন কি মহা-পাপ করিয়াছি, যাহার ফলে এই বিশাল ভারতের কুত্রাপি আমার স্থির হইয়া থাকিবার উপায় নাই। সেই বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে তাড়া খাইতে খাইতে এই সুদূর আরা জিলায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম, এখানেই বা আমার 'সোয়াস্তি' কোথায়? গোয়েন্দা পুলিশ এখানেও আমার পিছু নিয়েছে। তবে ধরা পড়িয়া আন্দামানের অধিবাসী হইতে আমি আদৌ ইচ্ছুক নহি। আমার বিশ্বাস আছে—আপনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না। বাবা ও মা কি মনে করিবেন, জানি না। যাহা হউক একদিন অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবশ্যই আবার আমাদের মিলন হইবে, যদি পরমেশ্বর থাকেন, তবে সে মিলন অবশ্যম্ভাবী! এখন বিদায়!"

আপনার স্নেহের—অমূল্য।

পত্র পড়িয়া অলক্ষিতে আমার চক্ষু হইতে দুইবিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অমূল্য বিপ্লববাদীই হউক আর চোরই হউক, তৎপক্ষে আমার বলিবার বা দেখিবার কিছু নাই। আমি তাহাকে আমার 'পথে পাওয়া' অমূল্য ভিন্ন অন্য আর কিছুই জানি না; তাহাকে আর একবার দেখিবার জন্য আমার বড় সাধ। আমার অন্তরাত্মা আজ সুদীর্ঘ দশবৎসর সেই পলাতকের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীমধুসূদন আচার্য্য।

অভ্রের দেশে

বিহার গভর্ণমেন্ট অর্থবিজ্ঞান ও ইতিহাস শিক্ষার্থী-গণকে নানা প্রদেশের শিল্পব্যবসায়ের কেন্দ্র ও ঐতিহাসিক কীর্ত্তিগুলি পরিদর্শন করিবার সুযোগ দিয়াছেন। বাস্তবিক এই দুই বিষয় যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেছেন, এই সকল স্থান না দেখিলে, তাঁহাদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। ইউরোপে অনেক ছাত্র শিক্ষান্তে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করিতে বাহির হয়—দরিদ্র ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে; তাই বিহার সরকার এই ব্যবস্থা করিয়া বাস্তবিকই ছাত্রসমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

কয়েকটী বিহারী ছাত্র সঙ্গে লইয়া চৈত্রের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে মজঃফরপুর হইতে রওনা হইলাম—কোডারমার অভিমুখে যাত্রাকালে কেহ পুষ্পবৃষ্টি না করিলেও দেবতারা ধূলিবর্ষণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাহার পর উত্তর বিহারের আম্র ও লিচুবনের কোল দিয়া, দিগন্তপ্রসারী কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া আমাদের গাড়ী যখন পালেজা-

ঘাটে গঙ্গাতীরে আসিয়া লাগিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। ষ্টীমারে পার হইয়া পাটনা পৌছিলাম ও তথা হইতে গয়া হইয়া কোডারমা রোড ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ভোর বেলায় নামিয়াই বুঝিলাম যে হ্যাঁ, অভ্রের রাজ্যে আসিয়াছি বটে। চারিদিকে মাটীর মধ্যে অভ্রের টুকরা গুলি চকচক করিতেছিল—এখানে সেখানে অভ্রের স্তূপ।

সকাল হইলেই "মোটর বসে" চাড়িয়া ইন্দরওয়া রওনা হইলাম। ছোটনাগপুর মাইকা সিণ্ডিকেটের অধ্যক্ষ লেন সাহেব সেখানে যাইতে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উচু নীচু রাস্তার উপর এই মোটর গাড়ীখানি যখন বেগে চলিতে লাগিল, তখন আমরা এককালে জাহাজের rolling ও pitching এই দুই প্রকারেরই অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম।

গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র লেন সাহেব আমাদের খনি দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। একটি ৬০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের চারিদিক ঘুরিয়া উঠিবার রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া আমরা পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠিলাম—তাহার পর প্রত্যেকে এক একটি বাতী ও দেশলাই হাতে লইয়া খনির সুড়ঙ্গের মধ্যে নামিলাম। সেই সুড়ঙ্গের মুখের ব্যাস প্রায় ৮ হাত হইবে—সেখান হইতে ঢালু হইয়া পথ ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল এ চলিলাম কোথায়? বাতির ক্ষীণ আলোকে কিছুদুর যাইয়া দেখি যে সেই পথ শেষ হইয়া আসিয়াছে। একটি ছোট সিঁড়ি দিয়া নীচের তলায় নামিলাম, এখানে সোজা হইয়া দাঁড়ান আর সম্ভব হইল না, পথও বড় দুর্গম, অতি সাবধানে না চলিলে, পদস্খলনের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। ক্রমে গুঁড়ি মারিয়া চলিতে হইল। আরও এইরূপ তিনটি সিঁড়ি পাইলাম। বেশ বোধ হইতে লাগিল যে অনেক নীচে নামিয়াছি। এক এক স্থানে এত গরম বোধ হইতেছিল যে, দুই একজন বসিয়া পড়িল,আর তাহারা চলিতে পারিবে বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু লেন সাহেবের উৎসাহে আমরা আরও কিছুদূর নামিয়া পড়িলাম—এখানে উত্তাপ আদৌ নাই—খুব ঠাণ্ডা। কিছুক্ষণ এখানে বসিয়া তৃপ্ত হইলাম। তাহার পর আবার নামিতে আরম্ভ করিলাম। এবার যেখানে পৌছিলাম, সেখানে অভ্র কাটা হইতেছে। কয়েকটী পুরুষ অভ্রের চাপগুলি ক্ষিপ্রতার সহিত কাটিতেছে, সেগুলি ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া স্ত্রীলোক ও বালকগণ বাহিরে লইয়া যাইতেছে। ইহাদের বেশ সবল ও কর্ম্মঠ বলিয়া বোধ হইল। এখানে পর্ব্বতগাত্রে নানাস্থান চক্‌চক্ করিতেছিল—সেই সকল স্থানে অভ্র আছে বোঝা গেল। আমরা যতই নীচে নামিতে লাগিলাম ততই দেখিলাম পথটি কর্দ্দমে পিচ্ছিল। পাহাড়ের প্রাচীর ভেদ করিয়া যে জলধারা এই খনির ভিতরে আসিয়া পড়ে, তাহার নিষ্কাশনের নিমিত্ত pump এর ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক দিন ৪ঘণ্টা করিয়া এই কাযটি চলিলে, আর জল জমিতে পারে না। এই খনির সুড়ঙ্গ পথটীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্রই মোটা মোটা শালের খুঁটা দেওয়া আছে—সেগুলি ঠিক মজবুত আছে কি না প্রত্যহ পরীক্ষা করা খনির তত্ত্বাবধারকের অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ একদিনের অসাবধানতা বশতঃ সেই স্থানটি বসিয়া পড়িতে পারে ও তাহার ফলে অনেক নরনারী মারা যাইতে পারে।

এবার আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। উঠা, নামার অপেক্ষা আরও সহজ বলিয়া মনে হইল। আমরা যখন উপরে উঠিলাম, প্রখর সূর্য্যালোকে আমাদের চোখ ঝলসিয়া গেল।

ব্রিটিশ শাসনের বহুপূর্ব্বেও এই স্থানে অভ্রের কারবার ছিল। তবে তখন জমির উপরে বা ৩।৪ হাত খনন করিয়া যাহা পাওয়া যাইত, তাহাই লোকে দেহসজ্জা ও ঔষধাদিতে ব্যবহার করিত। এই প্রদেশ ব্রিটিশ অধিকারে আসিবার পরে ক্রমশঃ ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী খাসমহলের অধীনে ৯টি খনি ছিল, তাহার প্রত্যেকটিতে ১০ জন মজুর কায করিত। এই খনি গুলিতে কূপ খনন করিয়া গভীর স্তরের অভ্র উত্তোলনের চেষ্টা প্রায়ই কেহ করিত না। ৫০ ফিট

খাদ খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অভ্র তুলিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হইত। এই অভ্র, বাজারে মণ করা ছয় আনা হইতে ১৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইত।

এই ব্যবসায়ের বর্ত্তমান উন্নতির মূলস্বরূপ ছিলেন এফ্, এফ্, ক্রিস্টিয়েন সাহেব। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েকখানি অভ্রের পাত লণ্ডনে পাঠাইয়া চড়া দরে সেগুলিকে বিক্রয় করেন। ঠিক এই সময় তড়িৎযন্ত্র নির্ম্মাতাগণ কোনপ্রকার তড়িৎ রোধক বস্তুর সন্ধানে ছিলেন। আমেরিকায় তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে অভ্রের সে শক্তি আছে ও তাহাকে এই কাযে লাগান যাইতে পারে। সুতরাং যখন ক্রিশটিয়েন সাহেব অভ্রের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার চাহিদাও বাড়িয়া গেল। তিনি প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিয়া আধুনিক খনিজ-বিজ্ঞানুমোদিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কায আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার কারবারের শ্রীবৃদ্ধি হইল। কূপ খনন করিয়া যে যে স্তরে অভ্র পাওয়া গেল, তিনি সেখানে সুড়ঙ্গ চালাইয়া অভ্র উঠাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিলনা যে এত নীচেও অভ্র থাকিতে পারে। ক্রমে আরও কয়েকটি বিলাতী ও দেশী কোম্পানি এখানে কায আরম্ভ করিলেন। ইঁহারা ৩০ বৎসরের জন্য ইজারা লইয়াছেন।

খনি হইতে অভ্রের চাপগুলি কারখানায় পাঠানো হয়। অভ্রের চাপে নানা প্রকারের অভ্রের পাত থাকে, সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া রাখা, কারখানার এক বিভাগের কার্য্য। অভ্রের দুই প্রকার শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে—রঙ অনুসারে ও আকার অনুসারে। স্বচ্ছ অভ্রের দাম খুব বেশী। তাহার পর ঈষৎ লালচে, গাঢ় লাল ও কাল দাগ যুক্ত শ্রেণী। অভ্রের পাতের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়—কতক অংশ এক রঙের, বাকী অপর রঙের। এইগুলিকে প্রত্যেক শ্রেণীর মত করিয়া কাটিতে হয় ও অকেজো অংশটুকুকে বাদ দিতে হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্রের দাম ৫০০ হইতে ১৫০০ টাকা মণ, সর্ব্ব নিকৃষ্টের দামও নেহাৎ কম নহে। কারখানায় রঙ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ হইয়া গেলে, সেগুলিকে চেরা (splitting) হয়। এক পাত অভ্র কয়েকটি পাতের সমষ্টি ; সেগুলিকে একটি ছুরীর দ্বারা দেশী স্ত্রীলোকগণ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত চিরিয়া ফেলে। এই চেরা বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। মানুষের হাত অভ্যস্ত হইলে, কলের মতই কেমন নিখুঁৎ ভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত কায করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এইখানেই দেখা যায়।

এই কোম্পানিগুলি সাধারণতঃ আমেরিকা ও জর্ম্মানীতেই মাল চালান দেয়। অতি অল্প অংশই ভারতবর্ষে বিক্রয় করা হয়। এই বিক্রয়ের কাযটি দেশী মহাজনের : দ্বারাই : হয়। অভ্রের কারবারে মারোয়াড়ী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীরই সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বেশী। বাঙ্গালীও কয়েকজন আছেন। ইঁহারা দালালিও করেন। প্রত্যেক কোম্পানির এক বা দুই-জন বেতনভোগী ক্রেতা আছেন। ইঁহারা আবশ্যক হইলে অন্যান্য খনি হইতে মাল কিনিয়া নিজ কোম্পানীকে সরবরাহ করেন। বেতন ব্যতীত ইঁহারা কমিশনও পান। এইরূপ একজন ব্যবসায়ীর সহিত আমাদের পরিচয় হইল। হুগলী জেলায় তাঁহার নিবাস। সামান্য মূলধন লইয়া তিনি এখানে আসেন, স্বীয় চেষ্টা ও সাধুতার ফলে তিনি এখন লক্ষপতি হইয়াছেন। অভ্রের কারবারে তাঁহার অভিজ্ঞতা অসীম। লেন সাহেব তাঁহার পরিচয় দিয়া বলিলেন—'What he does not know about mica, is not worth knowing". (ইনি অভ্র সম্বন্ধে যাহা অজ্ঞাত নহেন, তাহা জানিবারও উপযুক্ত নহে।)

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্র বড় বড় যুদ্ধের জাহাজে ব্যবহৃত হয়। নিকৃষ্ট অভ্র হইতে আমেরিকায় micanite তৈয়ারী করিয়া নানা কাযে লাগান হয়। অভ্রের চিম্নী কলিকাতার বাজারে উঠিয়াছে। উত্তাপ সহিবার শক্তি ইহার আছে বলিয়া, বড় বড় কলকারখানায়, বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় ইহা নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খনিকগণ সকলেই বেশ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। সাধারণতঃ বাটোয়ার, গোয়ালা, ভুইঞা, তুরি ও

মুশহর জাতির লোকেরাই খনিতে কায করে। ইহারা নিজগ্রামেই বাস করে ও প্রত্যহ আসিয়া কায করিয়া যায়। কেহ কেহ প্রত্যহ ৫।৬ ক্রোশ হাঁটিয়া যাতায়াত করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সারাদিন খাটিয়া পুরুষগণ তিন আনা হইতে পাঁচ আনা হারে মজুরী পাইত, স্ত্রীলোকগণ দুই আনা পাইত। এখন চারি আনা হইতে সাত আনা পায়। ইহারা এত কম মজুরীতেই সন্তুষ্ট থাকে এই কারণে যে, গ্রামেই বাস করিয়া কায করিতে পারে ও প্রত্যেকেরই দুই দশ বিঘা জমি আছে, তাহাও দেখা শুনা করিতে পারে। হাজারিবাগের নিকটে বোকারো রামগড়ের কয়লা খনিতে ও ঝরিয়াতে আজকাল উচ্চ-হারের মজুরীর লোভে ইহারা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে; সেই কারণে অভ্রের খনিতে শ্রমিক সমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। ইহারা সকলেই গভর্ণমেণ্টের খাস-মহলের প্রজা—এখানে খাজনা অতি সামান্য—ইহার লোভেও তাহারা স্বগ্রামে থাকে। ইহাদের অভাব অতি অল্প—কৃষিজাত মোটা চাল ও গ্রামের তাঁতে তৈয়ারী মোটা কাপড়েই ইহাদের চলিয়া যায়। স্বামী স্ত্রীতে প্রত্যহ ॥• বা ॥৵৹ আনা উপার্জ্জন করে—ইহাতে তৈল লবণ প্রভৃতির খরচ চলিয়া যাওয়ার পরেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এই উদ্বৃত্ত অর্থ, তাহারা জমাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এখন তাহা আবার মদ্যপানে উড়াইতেছে। সমবায় সমিতি স্থাপনের ক্ষেত্র এই প্রদেশে যথেষ্ট। সমিতি গঠন করিয়া ইহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ যদি মদের দোকান হইতে বাঁচান যায়, তাহা হইলে ইহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি হইবে। মজুরী বৃদ্ধির ফলে যদি শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহার কার্য্য করিবার শক্তি না বাড়ে, তাহা হইলে সেই বৃদ্ধির সার্থকতা কি? কয়লার খনিতেও আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। যেখানে।৵৹ গাড়ীর স্থানে ॥৵৹ হইয়াছে; এই বৃদ্ধি সেই স্থানের শ্রমিকগণের আলস্য ও মদ্যপান বাড়াইয়াছে। এই অনিষ্ট নিবারণ করিতে হইলে শিক্ষাবিস্তার ও সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে শিখাইতে হইবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মোটরে রওনা হইয়া রাত্রি দশটায় হাজারিবাগে বন্ধুগৃহে পৌঁছিলাম। অভ্রের দেশ ভ্রমণের ক্লান্তি বন্ধুর যত্নে দূর হইতে দেরী হইল না।—পূর্ব্বপরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ, অপরিচিতের সহিত নূতন করিয়া পরিচয় স্থাপনের চেষ্টাতেই একটি দিন কাটিয়া গেল—আবার যে পথে, সেই পথে।

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বড় মেয়ে

(গল্প)

প্রীতি ও তাহার সমপাঠী নীহার স্কুল যাইবার কিছুক্ষণ পরেই, অকস্মাৎ ডাক্তার বাবুর গৃহিণীর ভয়ঙ্কর প্রবল বেগে জ্বর আসিল তিনি আর মাথা স্থির রাখিতে না পারিয়া লেপ কম্বল লইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। বাসাতে চাকর চাকরাণী ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না। ডাক্তার বাবু কোথায় রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন।

ঘণ্টা দুই পরে ডাক্তার বাবু গৃহে ফিরিলেন। আজ প্রবেশ পথেই হাস্যময়ী স্ত্রীকে না দেখিয়া তিনি চিন্তান্বিত চিত্তে একেবারে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লেপ কম্বলে আবৃতা স্ত্রীর রক্তিম নয়নের পানে চাহিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। ললাটে হাত রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কতক্ষণ আগে জ্বর এসেছে?" গৃহিণী বলিলেন, "এই কিছুক্ষণ আগে। সমস্ত

গায়ে ব্যথা আর জ্বর হয়েছে।" আর বেশী কথা বলিতে পারিলেন না।

ডাক্তার বাবু তাপমান যন্ত্রের দ্বারা দেখিলেন জ্বর ১০৫ ডিগ্রীরও উপরে। তিনি সেই মুহূর্ত্তে বেহারাকে ডাকিয়া সিভিলসার্জ্জন সাহেবক আনিতে পাঠাইলেন।

বৈকালে প্রীতি স্কুল হইতে আসিয়া পিসীমার কক্ষে প্রবেশ করিল। নিকটে আসিয়া দেখিল, জ্বরে অচেতন-প্রায় পিসীমা ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। শিয়রে পিসামশায় বসিয়া জলপটি লাগাইতেছেন।

প্রীতি পিসীমা, পিসীমা, বলিয়া তিনবার ডাকিল। এবার পিসীমা কথা কহিলেন। বলিলেন, "মা, আর বাঁচব না রে, তোদের ছেড়ে চল্লাম। তোকে বড় স্নেহে প্রতিপালন করলাম, তোর বিয়েটাও দিয়ে যেতে পারলাম না।" স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমার বড় স্নেহের বড় আদরের প্রীতিকে তোমাকে দিয়ে গেলাম, ওকে সুখী করতে চেষ্টা করো, যেন মা, আমার কখনও দুঃখ না পায়। এতদিন আমি যে ভাবে ওকে রেখেছি, তুমি তার অন্যথ করো না, এই আমার শেষ অনুরোধ।" ইহার পরক্ষণেই হতচেতন হইয়া পড়িলেন।

সিভিল সার্জ্জন আসিলেন, ঔষধ পত্র রীতিমত চলিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল দর্শিল না। ইহার দুই দিন পরেই, পরপারের আহ্বান এড়াইতে না পারিয়া, ডাক্তার বাবুর গৃহ অরণ্য করিয়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। প্রীতি যখন ছয়মাসের, তখনি ডাক্তার গৃহিণী, বৌদির নিকট হইতে ইহাকে আনিয়া কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন। এখন প্রীতির বয়স পনের বৎসর। এই পনের বৎসর যাঁহার স্নেহাঞ্চলে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আজ তাঁহাকে হারাইয়া সে চক্ষে আঁধার দেখিল, সে হৃদয়কে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছিল না।

শ্রাদ্ধ শান্তি চুকিয়া গেল, ডাক্তার বাবুর শোকেরও অনেকটা উপশম হইল। তিনি ধীরে ধীরে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। মাসখানেক অতিবাহিত হইবার পর আবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল, জীবনের রূপ রস গন্ধ এই বয়সে শুষ্ক হইয়া যাওয়া অসম্ভব, স্ত্রীর স্মৃতি বক্ষে পুষিয়া চলিলে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর মিলিবে না। বন্ধু বান্ধবগণও বুঝাইলেন, নইলে বংশলোপ পিণ্ডলোপ পাইবে। অতএব বিবাহ করাই স্থির করিয়া, নূতনের উপযুক্ত করিয়া বাসগৃহ এবং মনোগৃহকে সজ্জিত করিলেন।

২

যথাসময়ে ডাক্তার বাবু, কলিকাতার এক বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিলেন। পুরাতন মুছিয়া নূতন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার সংসার পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। শুধু প্রীতির মনঃকষ্ট ঘুচিল না। প্রতি পদক্ষেপে পিসীমাকে তাহার স্মরণ হইত। আহারের কালে আর কেহ দ্বারে দাঁড়াইয়া শুধায় না। মাথা আঁচড়াইয়া কাপড় পরাইয়া অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখে না। স্কুল হইতে প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় কেহ আগ্রহ ভরে থাকে না—এখন শুধু নিয়মিত সব কায সকলে করিয়া যায়—কোথাও প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। ডাক্তার বাবু মাঝে মাঝে প্রীতিকে বলেন, "মা, যখন যা দরকার হবে, অভাব হবে, তোমার এ পিসীমার কাছে কিংবা আমার কাছে জানাতে কুণ্ঠিত হয়ো না।" এইরূপে তিনি প্রথমাপত্নীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতেন; আর প্রীতি মনের আবেগ চাপিতে না পারিয়া প্রিয়তমা বন্ধু নীহারকে বলিয়া জ্বালা জুড়াইতে চেষ্টা করিত।

৩

প্রীতি এক সময় মনে ভাবিল, সম্মুখে পূজার ছুটিতে দিনকতক পাড়াগাঁয়ে মা'র নিকট যাইবে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একবার মোটে পিসিমার সঙ্গে সে মা'র নিকট গিয়াছিল, তাও ৭।৮ দিন থাকিয়া চলিয়া

আসিয়াছে। মা'র প্রতি তেমন টানও ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি মাতৃসমা পিসীকে হারাইয়া, মা এবং ভাই বোনদের দেখিবার একটা আকাঙ্ক্ষা মনের মাঝে উঁকিঝুঁকি দিতেছিল। সে নীহারকে মত জিজ্ঞাসা করিল, নীহার বলিল, "বেশ তো দিন কতক মা'র আদর খেয়ে এস।"

সেইদিন রাত্রে প্রীতি খাওয়া দাওয়ার পর পিসামশায়ের নিকট গেল। তাঁহার প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইল। নূতন পিসীমা বলিতেছেন, "অতবড় মেয়ের এখনও বিয়ে দিচ্ছ না কেন? বয়স তো কম হয় নি। বিদেশ বলেই কথা হচ্ছে না, নইলে—" তাহার পিসামহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ কমলা, আমি বাল্যবিবাহ মোটেই পছন্দ করি না। অন্ততঃ আর এক বছরে প্রীতি মেট্রিক্‌টা দিক্, তার পর দেখা যাবে। বরের জন্যে কোন চিন্তা নেই, বর হাতেই আছে।"

প্রীতির কর্ণে এই প্রথম বিবাহ-প্রসঙ্গ প্রবেশ করিল। সে আরও কিছুক্ষণ ভিতরে প্রবেশ করিল না। যখন শুনিল, অন্য প্রসঙ্গ হইতেছে,তখন সে কক্ষে প্রবেশ করিল।

ডাক্তার বাবু প্রীতিকে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। দু'একটা অন্যান্য কথার পর মা'র নিকট যাওয়ার অভিপ্রায় সে প্রকাশ করিল। ডাক্তার বলিলেন, "আচ্ছা, যদি দেখবার ইচ্ছা হয়ে থাকে,দিন কতকের জন্যে বেড়িয়ে এস। সেখানে কিন্তু বেশীদিন তোমার সহ্য হবে না। পাড়াগাঁয়ের জল হাওয়া সর্ব্বদা দূষিত এবং অসুবিধা অনেক। আচ্ছা যেও, দরোয়ান এবং তোমাদের বিনোদ দাদা সস্ত্রীক পুজোর সময় যাবে তাদের সঙ্গেই যেতে পারবে। তোমার কি কি প্রয়োজন, কাল একটা লিষ্ট দিও, আর তো বেশী দিন নেই।"

"আচ্ছা দেব"—বলিয়া প্রীতি আপন কক্ষে চলিয়া আসিল।

৪

কালীপুর একটা পল্লীগ্রাম। এখানে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস আছে, গ্রামটী নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়। জমিদারের অনুগ্রহে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। গ্রামের মধ্যভাগে একটী বিধবা ব্রাহ্মণী পুত্র কন্যা লইয়া বাস করেন। কন্যাটী অষ্টমবর্ষীয়া হইবে। আজ তাহার বড়ই আনন্দ; পঞ্চমবর্ষীয় ভাইটীকে লইয়া গ্রামের পথে সে ছুটাছুটি করিতেছে, আজ তাহাদের দিদি কলিকাতা হইতে আসিবে। বালিকার নাম সরযু। সে একবার দিদিকে দেখিয়াছিল, কিন্তু ভাইটির এ পর্য্যন্ত দিদির দর্শন ঘটে নাই। উহাদের বিধবা মাতার মুখেও মাঝে মাঝে ক্ষীণ আনন্দের রেখা ফুটিয়া আবার মিলিয়া যাইতেছিল। তাঁহার চারটি সন্তান। প্রথম তিনটি কন্যা এবং সর্ব্বশেষে এক পুত্র হইয়াছে। যখন দ্বিতীয় কন্যাটি ছয়মাসের, সেই সময় তাঁহার ঠাকুরঝি (ডাক্তার গৃহিণী) তাহাকে সাদরে কন্যাস্নেহে প্রতিপালন করিবেন বলিয়া কলিকাতা লইয়া যান। মেয়ের বাজার দেখিয়া এবং সন্তানহীনা ঠাকুরঝির কাছে সুখে থাকিবে ভাবিয়া, তাহাতে তিনি তখন আপত্তি করেন নাই। আজ বছর দুই হইল কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, সাংসারিক অবস্থা অতি হীন, ভাগের জমিতে কিছু ধান্য পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বড় কন্যাটি রূপের জোরে বিনাপণে এক কেরাণীর করে সমর্পিত হইয়াছে। প্রীতি তাঁহার মধ্যমা কন্যা।

যথা সময়ে গোযান হইতে প্রীতি অবতরণ করিল। ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক রমণী প্রীতিকে দেখিতে আসিয়াছিল। উহার বেশভূষার পারিপাট্যে বালক বালিকাদের চমক লাগিল। বয়স্কা রমণীরা, এত বড় আইবুড়ো মেয়েকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। ব্রহ্মজ্ঞানীদের কন্যার ন্যায় সাজ সজ্জায় আচ্ছাদিত এত বড় হিন্দুর অবিবাহিত মেয়ে কখনও তাহারা দেখে নাই।

মাকে প্রীতি প্রণাম করিল। মাতার কয়েক ফোঁটা সুখ দুঃখ মিশ্রিত অশ্রুও ঝরিয়া পড়িল। প্রীতি কাপড় চোপড় ছাড়িয়া আহারাদির পর ভাই বোন দুটীকে কাপড়, খেলনা, লজেঞ্চস্ বাহির করিয়া দিল।

আজ তাহাদের সুখের সীমা নাই। একবার

দিদির কোলে, আবার সঙ্গীদের নিকট দ্রুত গমন করে। তাহারা এরূপ পোষাক পরিচ্ছেদ আর কখনও ব্যবহার করে নাই। নূতন জিনিষে তাহাদের কোমল প্রাণে নূতন নূতন হাসিতে ভরিয়া উঠিতে ছিল।

শরৎ কাল; সমস্ত গ্রাম খানি সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের নূতন বসন পরিধান করিয়াছে। উদ্ভাসিত চন্দ্রকিরণে মৃদু মৃদু বায়ুর হিল্লোলে বৃক্ষের পত্রে মুক্তা ফলকের ন্যায় শিশির বিন্দু ঝরিতেছে। শেফালিকার শুভ্র শয্যা, পরিপক্ক ধান্য রাশির শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া প্রীতি এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। পল্লীগ্রামের আচার ব্যবহারে নূতনত্ব ঠেকিলেও, সে পাড়ার অনেক বধূদের সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছিল। তাহার ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইলেও, অন্তরালে অনেকে কটু-কাটব্য করিত।

কয়েক দিন পরে প্রীতি একখানা পত্রে জানিতে পারিল পিসীমার একটি খোকা হইয়াছে। এই সংবাদে সে অত্যন্ত পুলকিত হইল। স্কুল খুলিবার এখনও ১০।১২ দিন বিলম্ব আছে, আরও পাঁচ ছ দিন থাকিয়া যাইবে বলিয়া সে মনে করিয়াছে। গ্রামের জমিদার বাটীর শারদীয়া পূজা এবং গ্রামবাসীদের পুলকোচ্ছ্বাস সে প্রাণ ভরিয়া দেখিল। তাহার মনে হইতেছিল দেবী যদি আসেন তবে এই খানেই। কলিকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে থিয়েটার যাত্রার মধ্যে তিনি থাকিতে পারিবেন না। আনন্দময়ীর আগমনস্থান স্বভাবসুন্দর পল্লীগ্রামই বটে।

প্রীতিদের বাড়ী হইতে মাইল খানেক দূরে উহার দিদি শান্তির শ্বশুরবাড়ী। সর্ব্বদা উহারা বিদেশেই থাকে, কি কর্ম্মোপলক্ষ্যে দুজনে একবার বাড়ী আসিয়াছে। একদিন প্রীতি ভাই ভগিনী ও প্রতিবেশিনী ঠাকুরমাকে সঙ্গে লইয়া, দিদিকে দেখিতে গেল। যখন তাহারা উপস্থিত হইল, তখন দিদি বিছানা ঝাড়িতেছিল। ভাই বোনদের দেখিয়া আর তাহার শয্যা বিছান হইল না, তাহাদের ডাকিয়া বসাইল। প্রীতি আসিবার সংবাদ সে পূর্ব্বেই জানিত। এতদিন পরে দুই ভগিনীর দেখা হইল, উভয়ের প্রাণেই এক অভিনব উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ! অনেক গল্প চলিতে লাগিল। পিসীমা কেমন আদর করেন, কলিকাতায় থাকিতে ভাই বোনদের কথা মনে পড়ে কিনা—ইত্যাদি। এমন সময় শান্তির স্বামী অমলের আবির্ভাব হইল। প্রীতি উহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিল, "চিন্‌তে পারেন কি জামাইবাবু?" অমলের মনটায় একটু গোলযোগ হইয়াছিল, তারপর সে অনুমানে বুঝিতে পারিল, ইনি বড় শ্যালিকা।

তিনি সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "তা বলবে বৈকি! তুমি তো খুব খোঁজ নাও!"

কথাবার্ত্তায় বেলা পড়িয়া আসিল। শান্তি কিছু মুড়ি দুধ দিয়া প্রীতিদের ডাকিল, "আর একটু খাবি। কি বা দেব, আগে জানতে পারলেও যোগাড় করতাম। খা, আমি তোর জন্যে চা নিয়ে আসি।"

প্রীতি বলিল, "চা তোমরা খাও নাকি?"

"হ্যাঁ একটু একটু অভ্যাস আছে বৈকি।"

চা লইয়া আসিয়া শান্তি বলিল, "দেখ্ প্রীতি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিস। তোর তো বয়সও হয়েছে, তোর কি বিয়ের কোন যোগাড় করছে না? তোকে কি আইবুড়োই রাখবে নাকি? না, যেদিন তোর পছন্দ মত একজন পাবি সেদিন বিয়ে করবি—সত্যি বল তো?"

"যাও! দিদি যে কি বলো তার ঠিক নেই। ওসব আমি জানিনে আমায় জিজ্ঞাসা করোনা। আর ও জিনিষটার উপর তোমাদের মতন আমার লোভ নেই। এখন বাজে কথা থাক দিদি। সন্ধ্যা হ'ল, আজকের মতন চল্লুম। তোমাকে আর জামাইবাবুকে কাল মা যেতে বলেছেন, অবশ্য যেও।"—দিদির নিকট বিদায় লইয়া জামাইবাবুকে বলিল, "কাল আপনার ও দিদির নিমন্ত্রণ, অবশ্য যাবেন।"

অমল হাসিয়া বলিল, "তোমার এখানে আগমন উপলক্ষ্যে? আচ্ছা, যাব।"

৪

শান্তি আসার জন্য সেদিন প্রীতির গল্পে-স্বল্পে আমোদে

কাটিয়া গেল। বিকালে চমকিত হইয়া শুনিল, প্রীতির নামে এক টেলিগ্রাফ আসিয়াছে। প্রীতির বক্ষ এক অজানিত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে সহি দিয়া টেলিগ্রাম্ খুলিল—তাহাতে পিসামশায়ের কঠিন ব্যারামের সংবাদ।

প্রীতি আর কিছু চিন্তা করিবার অবসর পাইল না। জামাই বাবুকে বলিল, "আমায় রাত্রির ট্রেণেই কলকাতায় নিয়ে চলুন। এ উপকারটুকু আজ করুন!" বলিয়া কাপড় দুইখানা গুছাইয়া, মার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, পিসেমশায় ভাল হোন, আবার আসব।" দিদিকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

যখন প্রীতি কলিকাতার বাসায় পৌঁছিল, তার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর নশ্বর দেহ বিলুপ্ত করিবার জন্ম শ্মশানে লইয়া গিয়াছে। প্রীতি এই নিদারুণ দৃশ্যে পিসিমার নিকটে ছুটিয়া গিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "পিসিমাও চলে গেছে, পিসেমশায়ও আজ ছেড়ে গেলেন, শেষ দেখাও হলো না, ভগবান একি করলে!"

নীহার আসিয়া কত সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু প্রীতি কিছুতেই শান্ত হইল না। এদিকে নূতন পিসিমার নবজাত শিশুও কি ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। নীহার শিশুটিকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। উহার মাতা আসিয়া বহু কষ্টে ডাক্তার গৃহিণীকে স্নান করাইয়া, নব বেশ পরাইয়া দিলেন। বিলুপ্ত চেতনায় স্বামীর যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া কমলাও বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। সংবাদ পাইয়া ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ আসিলেন, এবং ভগিনীকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইলেন।

শোকের প্রবল ধাক্কা একটু নরম হইলে, সুযোগ বুঝিয়া কমলার ভ্রাতা ললিত ভগিনীর নিকট গিয়া বলিতে লাগিল, "কমলা, যা হয়ে গেছে তার জন্মে বৃথা শোক করলে কি হবে? যা'তে ওই ফোঁটাটুকু বাঁচে তার জন্মে চেষ্টা কর। আর শ্রাদ্ধও করতে হবে, তারও যোগাড় চাই। টাকা পয়সা কি আছে না আছে তাও দেখতে হয়। আমার চাকরী আছে, বেশী দিনতো থাকতে পারবো না।"

কমলা বলিল, "দাদা এই নাও চাবি! দেখ কি আছে, আমি ওসব দেখতে পারবো না। আমার হাতে ৩০০৲ টাকা আছে। এই দিয়ে শ্রাদ্ধটা সেরে নাও। ওঃ আমায় এই করবার জন্মে সে রেখে গেল, দাদা!" বলিয়া পুনরায় ক্রন্দন আরম্ভ করিল।

ললিত দেখিল ১৫ হাজার টাকার জীবনবীমা আর এই বাড়ীটি ছাড়া কিছু নাই। কমলাকে বলিল, "এইতো কয়টা টাকা! ক'দিনই বা চাকরি করেছেন! এ টাকাটা ভাঙ্গান হবে না, সুদের দ্বারা তোমায় চালাতে হবে। আর এই বাড়ীটা বেশ বড়, এটা ভাড়া দিলে ৪০।৫০৲ টাকা পাওয়া যেতে পারে। তুমি আমাদের ওখানেই গিয়েই থাকবে চল। কি বল?"

ভগিনী বলিলেন, "তাই করতে হবে দাদা, নইলে আমি একা এ বাসায় কেমন করে থাকবো? তুমি এখন বলে ক'য়ে প্রীতিকে, ওদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।"

শ্রাদ্ধ চুকিয়া যাইবার পর ললিত একদিন প্রীতিকে ডাকিয়া বলিল, "মা, তোমার পিতৃতুল্য পিসেমশায়ের মৃত্যুতে তুমি খুব আঘাত পেয়েছ। কিন্তু দুঃখ করে কোন লাভ নেই। এখন যা'তে ওই খোকাটুকু মানুষ হয় তার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি এখন সেই পাড়াগাঁয়ে যাও, কমলা তো এখানে থাকবেন না। কাযেই তুমি আর কোথায় থাকবে!"

প্রীতি বলিল, "হ্যাঁ, আমাকে তো সেখানে যেতেই হবে। কিন্তু একটা কথা। এতদিন মেয়ের মতন করেই পিসেমশায় আমায় প্রতিপালন করেছিলেন। আজ তাঁর অভাবে কি আমি কিছুই পাব না?"

ললিত বলিল, "কি বলছ প্রীতি! ১৫ হাজার টাকা ত মোটে সম্বল! তা'র থেকে তুমি কি পাবে? তোমার পথ তো খোলাই আছে, তোমার সুখের পথ উন্মুক্ত। এই অল্প বয়সে কমলার অবস্থা আর শিশুটীর কথা একবার ভাব দেখি!"

প্রীতি বলিল, "তা বুঝতে পেরেছি! তাঁকে হারিয়ে আমি সবই হারিয়েছি। আমায় শীঘ্রই তবে রেখে আসুন।" বলিয়া প্রীতি, অশ্রু মুছিতে মুছিতে নীহারদের বাড়ী গেল, এবং নীহারকে সমস্ত বলিল। নীহারের পিতা একজন হাইকোর্টের উকিল, ইঁহার সহিত ডাক্তার বাবুর অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল, প্রীতিকে দেখিয়া তিনি নিকটে ডাকিলেন। নীহারের মুখে সমস্ত শুনিয়া উকিল বাবু বলিলেন, "এরকম যে হবে তা আগেই জানি। তোমার নামে পোষ্টাফিসে ২০০৲ টাকা আছে। তার পাসবুক খানি ওদের কাছে থেকে চেয়ে তোমায় দেব। তাই নিয়ে মার কাছে যাও। ভগবানের কৃপা হলে আবার সুখের মুখ দেখতে পাবে।"

প্রীতি এই টাকার কথা জানিত না। আজ, উকিল বাবুর কৃপায় সে ২০০৲ টাকা পাইল, এবং নিজের যা আসবাব ছিল, তার দু একখানা লইয়া সে ট্রেণে উঠিল। একটী দাসী এবং দরোয়ান মিলিয়া উহাকে কালীপুরে রাখিয়া আসিল।

৫

পূর্ব্বের ন্যায় এবার প্রীতি আসাতে কেহই সন্তুষ্ট হইল না, বিশেষতঃ উহার মাতার সকল আশা ভরসা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এতবড় আইবুড়ো মেয়ের জন্য তাঁহাকে অনেক জ্বালা সহ্য করিতে হইবে ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। এবার শুভানুধ্যায়ী কাকীমা, পিসীমা, ঠাকুমা'রা উহাদের বাড়ীতে আসিয়া প্রীতির মা'কে বলিতে লাগিল—"এই ধাড়ী মেয়েকে রান্না ঘরে ঢুকতে দিলেও যে জাত যায়! রাখবে কি করে শান্তির মা? কলকাতায় বড় হয়েছে, ওর মতি গতি আমাদের জানতে বাকি নেই। ওরা শুধু ফড় ফড় করে বেড়াতে জানে। এখন বিয়েই বা করবে কে? যত জালা তোমাকেই পোয়াতে হবে। মেয়ের সুখ হবে বলে পরের হাতে দিয়েছিলে, এখন তেমনি উল্টো ফল ভোগ করতে হবে।" ইত্যাদি বাক্য বাণে জর্জ্জরিত করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত, আর প্রীতির মা কন্যাকে অপয়াণী করিয়া চোখের জলে বক্ষের ক্ষোভ মিটাইতেন।

প্রীতির কোথাও বাহির হইবার যো নাই, বাহির হইলেই কত স্ত্রী পুরুষের তীক্ষ্ণ চক্ষুর আঘাতে ম্রিয়মাণ হইয়া ফিরিতে হইত। কোথাও এক তিল শান্তি নাই। লেখাপড়ায় মনোনিবেশের চেষ্টা করিলে, মাতার বাক্য বাণে পশ্চাৎপদ হইতে হইত। তিনি বলিতেন, "যদি চাকরী করবার জন্যে এতদিন ধিঙ্গি করে রেখেছিল, তবে এখানে আসা কেন? অত নবাবী এখানে চলবে না। দিনরাত সেমিজ পরে থাকা—অত বাবুয়ানার খরচ যোগাবে কে? যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছিস্ তেমনি করে থাক্। ধান ভানা, কাপড় কাচা থেকে রান্না বান্না সব কায শেখ, যদি গুণ দেখে কোন দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র রাজি হয়। চা'টা খাওয়া ছেড়ে দে। কোন মতে তোকে পার করতে পারলে জাত বাঁচে, মুক্তি পাই। নইলে যে তোর জন্যে সরযূরও দাঁড়াবার স্থান হবে না। এতদিন এত কষ্টে তবু চলছিল, এবার বুঝি হতভাগীর সঙ্গে গাঁ ছাড়তে হবে!—এইরূপে শেষে তিনি ক্রন্দন করিতেন।

দ্বিপ্রহর, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, প্রচণ্ড তাপে গাছ পাতা পশু পক্ষী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বায়ু ধূলিকণা উড়াইয়া এপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিতেছে। পল্লী গৃহস্থ রমণীরা বাসন মাজা শেষ করিয়া দিবানিদ্রার উদযোগ করিতেছে। গ্রামটী তখন মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রতপ্তে শান্ত সুপ্ত। তখন প্রীতি ক্ষুদ্র জানালার পাশে বসিয়া ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছিল, আর ভাই বোন দুটীকে মাঝে মাঝে পড়া বলিয়া দিতেছিল।

প্রীতি অন্যমনস্ক হইয়া জানালা পথে দেখিতে পাইল, অপরিসর রাস্তা দিয়া দুইটী বধূ কলসী কক্ষে জল লইয়া ফিরিতেছে। প্রীতির সমস্ত হৃদয় মন্থন করিয়া এক দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। সে ভাবিতে লাগিল, হায়, তাহার জীবন যাত্রা সাধারণ চিরন্তন গণ্ডীর বাহিরে গেল কেন? ইহাই অনুসন্ধান। বাল্যকাল

হইতে এই শ্যামায়মান ধান্য ক্ষেত্রের পাশে অবাস্থিত মুক্ত মাঠের বাতাসে ধূলা খেলায় সে বড় হইত। আর এতদিনে ইহাদেই মত ঘোমটা দুলাইয়া কলসী কাঁখে পুকুরে যাইত, ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর কর্ম্মের মাঝে জীবন কাটিয়া যাইত, ইহার বাহিরে আর জগৎ সংসারের খবর জানিত না। কিন্তু ভগবান কি নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহার চারিদিক উন্মুক্ত করিয়া চোখের সামনে ধরিয়াছিলেন, যেখানে শুধু বিলাস বাসনা কামনার রঙ্গিন ফানুস তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সবই যে সে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, বরনীয় মনে করিয়াছিল, আজ সে সব ধীরে ধীরে স্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইতেছে। সেই নিত্য নূতন বসনে ভূষণে দর্পণে আসবাবে সজ্জিত অমরাপুরী ত্যাগ করিয়া শান্ত নীরব প্রকৃতির ক্রোড়ে সে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাতে দুঃখ নাই। ইহাতেও বেশ চলিয়া যাইত, যদি নাকি বিবাহরূপ প্রবল শৃঙ্খল না পরিবার অপরাধে চতুর্দ্দিক হইতে এক গোলযোগ না উঠিত। আর দু'বেলা চারিটী অন্ন ও পরণের বস্ত্রের জন্য চিন্তা করিতে না হইত।

হঠাৎ মাতার কঠোর শব্দে প্রীতির চমক ভাঙ্গিল। মা বলিলেন, "দিনরাত শুধু বসে বসে থাকবি নাকি রে? ভাবন করে থাকলেই পেট ভরবে? যা, বাসন কটা মেজে নিয়ে আয়। আর এই নে, ডাক পিয়ন তোর একখানা চিঠি দিয়ে গেল।"

প্রীতি আনন্দিত হৃদয়ে পত্রখানা লইতে গেল। মাতা বলিলেন, "এখন পড়তে হবে না। এ চিঠিতে তোকে খেতে দেবে না পরতে দেবে না। যা আগে কায কর্ম্ম কর, তারপর চিঠি পড়িস্।"

প্রীতি আর কিছু না বলিয়া কম্পিত বক্ষে পত্রখানা আঁচলে বাঁধিল। তারপর বাসন লইয়া পুকুর ঘাটে গেল। তখন ঘাট বেশ নির্জ্জন ছিল; বাসন ক'খানা ঘাটের উপর রাখিয়া হাত ধুইয়া, পত্র খানি বাহির করিল। সেখানি নীহারের লেখা। খুলিয়া পড়িয়া তার চোখে মুখে এক প্রফুল্লতায় ভরিয়া উঠিল। নীহার লিখিয়াছে, "তোমার দুঃখপূর্ণ পত্র খানা প'ড়ে আমিও খুব দুঃখ পেলাম। যাতে শীঘ্রই এ দুঃখের অবসান হয় তার চেষ্টায় আছি। তুমি হঠাৎ একটা কিছু ক'রে বসোনা। এখনি তোমার জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করবার সময় হয়নি। যদি হয় তখন করলেই হবে। তারপর শুভ খবর শোন, এই মাসের ২৮শে আমার বিয়ে। সেই বিকাশই আমার আশা ত্যাগ না করে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছে। তোমাকে নিশ্চয় আসতে হবে, নইলে শুভ উৎসব আমার বিফল হয়ে যাবে। বাবা, মাসীমাকে পত্র লিখবেন, তাঁর বোধহয় কোন আপত্তি হবেনা। দাদা তোমায় আনতে যাবেন, দাদা বিলাত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসেছেন। এখানে এলে সমস্ত কথা জানতে পারবে। তোমার বিরহে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি—শীঘ্র এস।"

এই পত্রখানি পাঠ করিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে বাসন মাজা শেষ করিয়া প্রীতি গৃহে ফিরিল।

৬

কলিকাতার বালিগঞ্জে একটী গৃহে আজ উৎসবের পতাকা উড়িতেছে। আজ নীহারের বিবাহ। প্রীতি মনের মত নীহারকে সাজাইয়া দিল। নীহারও প্রীতিকে মিনতি করিয়া একখানা ভাল শাড়ী পড়াইয়া দিয়াছিল। আজ নীহারের সুখে, প্রীতির সুখ।

বাদ্য বাজিয়া উঠিল। নীহার শুভলগ্নে মনোমত স্বামীকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইল। উভয়ের বিমল আনন্দের মলয়ানিলে সমস্ত গৃহ সুবাসে পরিপূর্ণ। এ সুখ রজনীও অতিবাহিত হইল।

প্রীতিও, নীহারের অনুরোধে সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া এঘর ওঘর আদর অভ্যর্থনা করিয়া অভ্যাগত মহিলাদের আপ্যায়িত করিতেছিল। নীহারের ভগিনী বিজন ডাকিল, "প্রীতিদি, আপনাকে বাবা ডাকছেন।" প্রীতি বিজনের সহিত চলিল। নীহারের দাদা সুনীল উহার পিতার কক্ষ হইতে ফিরিতেছিল, হঠাৎ প্রীতির সহিত মুখোমুখী হওয়াতে সে একবার তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী প্রীতির উপর স্থির রাখিয়া বলিল, "বাবার

কাছে যাচ্ছ প্রীতি, যাও।" বলিয়া একটু হাসিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

প্রীতি এই হাসির অর্থ টুকু বুঝিতে পারিল না। তাহার চোখে মুখের পুলক দৃষ্টি দেখিয়া সে হৃদয়ে এক নূতন ভাবের নতুন পরশ অনুভব করিল। চিন্তিত চিত্তে উকিল বাবুর সম্মুখীন হইলে তিনি বলিলেন, "প্রীতি, তোমায় একটা কথা বলবার জন্ম ডেকেছি। শোন মা, তোমার পিসেমশায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমাদের দুজনের কথা ছিল, সুনীল বিলাত থেকে এলে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। এই স্থির ছিল বলেই, তিনি তোমার বিয়ের জন্তে চেষ্টিত হন নি। আমরাও একথা খুব গোপনেই রেখেছিলাম, কোথাও উত্থাপন করিনি, ভবিতব্য তো বলা যায়না, সেজন্তে পূর্ব্বে তোমরা কেউ শোন নি। তুমি আমাদের বউ হলে আমরা সকলে খুব খুসী হব। সুনীল তো সানন্দে সম্মতি দিয়েছে। এখন শুধু তোমার মতের অপেক্ষা। তোমার মার আপত্তির কিছু নেই তা জানি, তিনি তোমার বিয়ের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছেন বলেই শুনেছি। তুমি বড় হয়েছ, তোমার মতটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

প্রীতি এই সকল কথা শুনিয়া লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। সুনীলের সহিত মেলামেশা থাকিলেও, এদিক দিয়া কল্পনা করিতে সে কোনও দিন সাহস করে নাই। আজ কিছু বলিতে পারিল না। শুধু বলিল, "আপনি চিরদিনই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি যা বলবেন যা করবেন, তাই আমার শিরোধার্য্য।" বলিয়াই উকীল বাবুর পায়ের ধূলা লইয়া, একেবারে নীহারের নিকট চলিয়া গেল।

আর একদিন শুভমুহূর্ত্তে প্রীতির সহিত সুনীলের শুভপরিণয় হইয়া গেল। এবিবাহে প্রীতির মা ও ভাই ভগিনীরা জাতি যাইবার ভয়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পিসিমা ও তাঁহার ভাই ললিত-বাবু সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। পিসিমার কলিকাতার বাড়ীতেই, তাঁহারই খরচে পরিণয় সুচারু রূপে সম্পন্ন হইল।

শ্রীতরুবালা দেবী।

শকুন্তলার পলায়ন

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

অভিনয়ের উদ্যোগ।

তাহাদের সকলের অপেক্ষা তরুণচন্দ্র অল্পবয়স্ক। তাহার বয়স ঊনবিংশ বৎসর। সে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবে মাত্র বি-এ পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্যায়াম করিয়া তাহার দেহ পেশীবহুল ও অত্যন্ত কঠিন হইলেও, সে কিছ খর্ব্বাকার ও তাহার মুখমণ্ডলে স্ত্রীজনোচিত কমনীয়তা ছিল; তাহার উপর, তাহার বিশাল নয়নের বিভ্রম স্ত্রীগণের অনুরূপ।

মোহিতকুমার তরুণের চেয়ে এক বৎসরের বড়।

রাখাল মোহিতের চেয়ে দুই বৎসরের বড়। সে হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসুর পুত্র। সে মোহিত ও তরুণের সহিত একই কলেজে পড়িত। তরুণ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত, মোহিত ও রাখাল চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। এবং বয়সের কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও, এই বালক বা যুবকগণের মধ্যে বেশ সম্ভাব ছিল। তাহাদের পরস্পরের আবাস বাটীও পরস্পরের বাটীর নিকটবর্ত্তী। ইহাও সৌহৃদ্দ্য বৃদ্ধির কারণ।

শীতকালে বড়দিনের ছুটী হইলে, তরুণের জ্যেষ্ঠা

মহাশয় বজরায় চড়িয়া, বন্দুক লইয়া সুন্দরবন অঞ্চলে আবাদ পরিদর্শন ও শিকার অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। তরুণের জ্যেঠা মহাশয়ের নাম তারকনাথ সিংহ রায়; তিনি জমীদারী দেখিতেন ও শিকার করিতেন, তাঁহার অপর কোন কায ছিল না। তাঁহার গায়ে বিপুল বল ছিল। তিনি কাহাকে কিছু না বলিলেও, এবং অত্যন্ত মৃদুভাষী হইলেও, বাটীর লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। এই ভীতি হইতে তরুণও অব্যাহতি পায় নাই; সম্মুখে প্রকাণ্ড বাঘ দেখিলে লোকে যেমন ভয় পায়, তরুণও জ্যেঠা মহাশয়কে সম্মুখে দেখিলে তেমনই ভয় পাইত।

জ্যেঠা মহাশয় আবাদে গিয়াছেন, দশ পনের দিন মধ্যে ফিরিবেন না, ইহাতে তরুণের অত্যন্ত আনন্দ হইল; হৃদয়টা যেন একটা উৎকট উৎসাহে টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল; কেবল মনে হইতে লাগিল, এই সুযোগে কি করিব, কি করিব?

এমন সময় রাখাল আসিয়া প্রস্তাব করিল যে, তাহাদের বাটীতে, পিতামাতা ভাই ভগিনীদের পুরী যাওয়া উপলক্ষ্যে সংস্কৃত শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হইবে। সে স্বয়ং রাজা দুষ্মন্ত সাজিবে; কণ্ব, বিদূষক, ধীবর প্রভৃতিরও ভূমিকা অভিনয় করিবার লোক জুটিয়াছে; বাকি কেবল শকুন্তলা আর অনসূয়া।

মোহিতকুমার রাখালের পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া কহিল, "তরুণ যদি শকুন্তলার পার্ট নেয়, আমি অনসূয়ার পার্ট নিতে রাজি আছি।"

তরুণ বলিল, "আমি পারবো ত?"

মোহিত উৎসাহ দিয়া বলিল, "খুব পারবি। আমি বলবো, হলা সউন্দলে, আর তুই বলবি, হলা অণসূএ। এ আর পারবি নে?"

রাখাল বলিল, "তোরা যদি শকুন্তলা আর অনসূয়ার পার্ট নিতে পারিস, তাহলে আর ভাবতে হয় না। এখনও তিন দিন সময় আছে; এর মধ্যে পার্টগুলো মুখস্থ করে নিতে পারবি ত?"

মোহিত মহা উৎসাহের সহিত বলিল, "খুব পারব। আমার ত সব প্রায় মুখস্থই আছে। তরুণকেও এই তিন দিনের মধ্যে তালিম করে নিতে পারবো।"

অতঃপর অভিনয়োৎসবের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। রাখালদের বাড়ী সম্পূর্ণ খালি ছিল; এবং পূজার দালানটিও বেশ বড়। স্থির হইল, সেই খানেই অভিনয় হইবে। সীন্ ভাড়া করিয়া আনিয়া, পূজার দালানের এক পার্শ্বে রঙ্গমঞ্চ রচনা করা হইল; অপর পার্শ্বে দর্শকবৃন্দের আসনের জন্য বাটীর এবং পার্শ্বের বাটীর সমুদায় চেয়ার ও বেঞ্চি একত্র করা হইল। টিরেট্টাবাজার হইতে রাজার, দৌবারিকের, বিদূষকের পোষাক, গুম্ফ, শ্মশ্রু, অসি, ধনু, শর প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইল; ঋষিবালকদের গৈরিক বসন, জটা, বল্কল, দণ্ড, উপবীত, রুদ্রাক্ষের মালা ও ফলমূল আহরণ করা হইল। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা শকুন্তলা প্রভৃতির জন্য গৈরিক শাড়ী, অক্ষমালা, ও চাঁচর কেশকলাপ আনা হইল। অধিকন্তু শকুন্তলার জন্য বল্কলের একটি ব্লাউজ, বিশেষ ভাবে তৈয়ারীর জন্য ফরমাইস দেওয়া হইল। শকুন্তলার বিরহ শয্যা রচনার জন্য একশত পদ্মপত্র, এবং অলঙ্কার জন্য মৃণাল ও পদ্মকলি, অভিনয়ের দিন সন্ধ্যাকালে আনিবার জন্য বায়না দেওয়া হইল।

এই রূপে সমস্ত উদ্যোগ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চলিতে লাগিল। এই উদ্যোগ উপলক্ষ্যে রাখাল অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

অভিনয়ের দিন সকাল বেলা, নিমন্ত্রণের বিচিত্র কার্ড ছাপিয়া আসিলে, রাখাল স্বয়ং তাহা বন্ধুবান্ধবদের বিতরণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাধা।

রাত্রি এক প্রহরের পরই, বাদকদলের বাদ্যোদ্যম ও দর্শকবৃন্দের ঘন ঘন করতালির মধ্যে অভিনয় আরম্ভ হইল।

ঐকতানিক বাদ্য শেষ হইলে, প্রথমেই সূত্রধার ও নটীর অভিনয় আরম্ভ হইল। উহা শেষ হইলে, আবার

প্রচ্ছদপট পতিত হইল। আবার বাদকগণের মধুর ঐকতানিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল পরে, ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্কেতে, বাদ্য থামিয়া গেল। আবার প্রচ্ছদপট-উত্তোলিত হইল। ভিতরের দৃশ্য অতি মনোরম; বনজ কুসুম বৃক্ষ সকল প্রসূনভারে অবনত হইয়াছে। দূরে ক্ষুদ্র-কায়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে; পার্শ্বে তড়াগমধ্যে শত শত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। অনতিদূরে রথচূড়া দেখা যাইতেছে। রাখাল, রাজবেশে প্রকাণ্ড ধনু হস্তে এক বন্য বরাহকে অনুসরণ করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইল; বন্য বরাহের চক্ষু দুইটা অন্ধকার লতাগুল্মের ভিতর জ্বলিতে লাগিল। সারথি রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া, তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, 'আয়ুষ্মন্!'

দর্শকবৃন্দ উৎসাহান্বিত হইয়া ঘন ঘন করতালি ধ্বনি করিল।

করতালিধ্বনি বিলীন হইলে, রাজা কিয়ৎকাল সূতের সহিত কথোপকথনে সময় অতিবাহিত করিলেন। পরে তাপস বালকগণ জটাজূট পরিয়া, কণ্ঠে অক্ষমালা লম্বিত করিয়া দেখা দিল। তাহারা রাজার সহিত কিছু বাক্যালাপ করিল। তাহার পর, বল্কলের ব্লাউজ পরিয়া, আগুল্‌ফবিলম্বিত পরচুলা ধারণা করিয়া স্ত্রীবেশে তরুণ উদ্‌ভ্রান্তনয়নে দর্শকগণের সম্মুখীন হইল। তাহার পীনোন্নত পয়োধরের উপর, বনজকুসুমের মালা দুলিতেছে; তাহার প্রকোষ্ঠে হরিদ্বর্ণ কাচনির্ম্মিত মৃণাল-বলয় শোভিতেছে; তাহার বিভ্রান্ত বৃহৎ চক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। তাহাকে দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হইল; কেহই তাহাকে তরুণ বলিয়া বুঝিল না; সকলেই মনে করিল, যেন সত্যই পুরাকালের সেই অলৌকিক রূপ লইয়া, যুবতী শকুন্তলা আবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে। রাজরূপী রাখাল সে রূপ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, তরুণের জ্যেঠা মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সিংহ রায় একটি মোটা যষ্টি হস্তে লইয়া, সশরীরে রাখালদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "কৃষ্ণবাবু বাড়ীতে আছেন?"

কৃষ্ণলাল বাবুর একজন কেরাণী থিয়েটার দেখিবার জন্য আহূত হইয়াছিল। সে সেই ডাক শুনিয়া উঠিয়া গেল; এবং তারকবাবুকে দেখিয়া কহিল, "না, তিনি বাড়ীতে নেই; পুরীতে বেড়াতে গেছেন।"

তরুণের জ্যেঠা মহাশয় বলিলেন, "তাই ত, কি করা যায়? আমি বাড়ীতে পৌছেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম, আর তিনি পুরীতে পালিয়ে গিয়ে বসে রইলেন? তাঁকে যে আমার বিশেষ দরকার। আমার আবাদের সীমানা নিয়ে বড়ই গোল বেধেছে। আর বছর যেখানে শিকার করে এলাম, কোথাকার এক ব্যাটা জমীদার এসে বলে কিনা, সে যায়গাটা তার। ব্যাটা ত আমাকে শিকার করতে দিলেই না, উপরন্তু গাছ কাটতে লোক লাগিয়েছে। ব্যাটাকে গুলি করে মারতাম; কিন্তু কৃষ্ণবাবুর পরামর্শ না নিয়ে, সে কায করলাম না। কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। এখন কি করা যায়, বল দেখি?"

কেরাণী কহিল, "যদি বিশেষ দরকার মনে করেন ত আজ রাত্রেই একখানা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করুন।"

তারকবাবু এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কহিলেন, "তাই করতে হবে। আচ্ছা, কৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে এত আলো কেন?"

কেরাণী কহিল, "পূজার দালানে থিয়েটার হচ্ছে।"

তারকবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "থিয়েটার?"

কেরাণী তরুণকে চিনিত না; তাহার জ্যেঠামহাশয়-ভীতির বিষয়ও অবগত ছিল না। সে বলিল, "হাঁ, থিয়েটার। আসুন না, দেখবেন্।"

কিছু কৌতূহল হওয়ায়, তারকবাবু অঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করিয়া দালানে উঠিলেন। তাহাতে দর্শকগণের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল; যাহারা তাঁহাকে চিনিত তাহারা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সব চেয়ে অধিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, রঙ্গমঞ্চে। সেখানে শকুন্তলা হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল; ভীমবাহু রাজা দুষ্মন্তেরও কার্ম্মুক সহসা কাঁপিয়া উঠিল।

শকুন্তলা জনান্তিকে দুষ্মন্তকে বলিল, "এই মাটী করেছে! জ্যেঠামহাশয় কোত্থেকে এসে জুটলেন?"

রাজা দুষ্মন্তও ভয়বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! ষ্টেজের দিকে আস্‌ছেন যে।"

শকুন্তলা নিম্নস্বরে কহিল, "আমাকে চিনতে পারলেই সর্ব্বনাশ হবে।"

জ্যেষ্ঠতাত ইত্যবসরে রঙ্গমঞ্চের দিকে আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বাঃ বাঃ! বনের দৃশ্য ত বেশ হয়েছে। ময়ূর, হরিণ,—দেখি দেখি বনের ভিতর বুনোশূয়রের চোখ দুটো জলছে দেখ। বন্দুকটা আন্‌লে হ'ত। এই যে ধনুর্ব্বাণ হাতে একজন রাজা রয়েছেন। ব্যাটা জমীদার আমার এবারকার শিকারটা মাটী করে দিলে? এ কিসের পালা হচ্ছে?"

দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ বলিল, "অভিজ্ঞান শকুন্তলার অভিনয়।"

জ্যেঠামহাশয় কহিলেন, "বেশ, বেশ! এই গালপাট্টা দাড়ী, এইটি বুঝি রাজা দুষ্মন্ত? আর এইটি বুঝি—ফেরনা গো, কেমন সেজেছ দেখি।"

পর মুহূর্ত্তে একটা ধুপ করিয়া শব্দ হইল; এবং তৎসহ শকুন্তলার অন্তর্ধান হইল। রাজা দুষ্মন্তও পাশ কাটাইয়া পলায়ন করিল, শকুন্তলাকে ধরিতে—যাহাতে সে অভিনয় সমাপ্তির আগে না চলিয়া যায়। কিন্তু শকুন্তলা তখন আলুথালু বেশে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত বিপদ।

তরুণ মনে করিয়াছিল, ছুটিয়া জ্যেঠামহাশয়ের অনেক আগেই সে বাটী পৌছিবে; এবং শকুন্তলার বেশ ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া, ধুতি পড়িয়া, ভালছেলের মত, বসিয়া ইতিহাসের আলোচনা করিবে। তাহার জ্যেঠামহাশয় বাড়ী ফিরিয়া দেখিবেন যে, তাঁহার সুবোধ ভ্রাতুষ্পুত্র রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছে; রাখালদের বাড়ীতে থিয়েটারের কোন খবরই রাখে না। কিন্তু স্ত্রীলোকের ন্যায় বস্ত্র পরিয়া, ফুলভূষায় ভূষিত হইয়া, রাত্রি দশটার পর রাস্তা চলিলে যে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা সে মোটেই ভাবে নাই।

রাজপথে একজন অদ্ভুত বেশধারিণী যুবতীকে আলুলায়িত কুন্তলে ছুটিতে দেখিয়া, পথচারী সকল পুরুষই একটু বিশেষ ভাবে তাহাকে লক্ষ্য করিল; কেহ হাসিল; কেহ প্রণয়-সঙ্গীত গাইল; কেহ ভ্রূভঙ্গী করিল; কেহ রস-কথা কহিল; কেহ বা গা ঘেঁসিয়া চলিল।

একটি গলি রাস্তার মুখে একটিও লোক ছিল না; রাত্রের অন্ধকার সেখানে আরও ঘনীভূত হইয়াছিল। সেই স্থান দিয়া এক দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক গলি রাস্তার ভিতর ঢুকিতেছিল। যুবকের বেশ অত্যন্ত মূল্যবান দেখিয়া, তাহাকে ধনীসন্তান বলিয়া অনুমান হয়। সে সিগারেট ধরাইবার জন্য দেশালাই জ্বালায় হঠাৎ স্থানটী আলোকিত হইল। সেই আলোক তরুণের মুখে পতিত হইল। যুবক তাহার মুখের প্রতি চাহিল, তাহার বিশাল নয়ন দেখিল, রাত্রির অন্ধকারের মত তাহার কেশরাশি দেখিল, তাহার পীনোন্নত উরসে পুষ্পমালার শোভা দেখিল। পরক্ষণে যুবক সিগারেট ও দেশালাই ফেলিয়া দিয়া, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তরুণকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। এবং প্রেমবিজড়িত ভাষায় কহিল, "কোথায় যাবে, সুন্দরী? আমার সঙ্গে গাড়ীতে ওঠ; চল, বাগানবাড়ীতে যাই।"

পার্শ্বে বৃহৎ মোটরগাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। সোফার ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর সাহায্য করিল; আর একজন দরোয়ান জাতীয় লোক, অর্থের লোভে, তরুণকে ধরিল। তিনজনে তরুণের ঘুসী উপেক্ষা করিয়া, বহু চেষ্টায় তাহাকে মোটরগাড়ীতে তুলিল। পরক্ষণে গাড়ী বরাহ-নগরের বাগানবাড়ীর দিকে ছুটিল।

সেখানে পুষ্পবাটিকার মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্য ছিল। তাহা মহার্হ গৃহসজ্জায় সজ্জিত ছিল। প্রভুকে সমাগত দেখিয়া ভৃত্যগণ আলোক জ্বালিয়া দিল। তরুণ সেই গৃহের এক কক্ষে বাহিত হইল। সে মুক্তির কোন

আশা নাই জানিয়া, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, এক সোফায় বসিয়া পড়িল। যুবক তাহার পাশে আসিয়া বসিল। ভৃত্যগণ সুরা, পানপাত্র ও কিছু খাদ্য কক্ষের এক টেবিলে রক্ষা করিয়া, কক্ষদ্বার বাহির হইতে চাবিবন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

যুবক, তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া, কাতর কণ্ঠে কহিল, "ওই পদ্মের মত চোখ তুলে একবার আমার দিকে চাও। একবার একটি কথা কও; বল, এত রূপ তুমি কোথায় পেলে।"

তরুণ যুবকের দিকে চাহিল বটে, কিন্তু রোষ-কষায়িত লোচনে। কথা কহিল বটে, কিন্তু পরুষ বচনে। 'একটি কথা কও,' বলিয়া যুবক যে কথা প্রত্যাশা করিয়াছিল, তরুণের কথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছিল; যুবক, তৃষিত চাতকের ন্যায়, শীতল বারি চাহিয়াছিল, কিন্তু তরুণ নয়নে তাহাকে বজ্রাগ্নি আনিয়া দিয়াছিল।

তথাপি যুবক প্রেম-আশা ত্যাগ করে নাই; প্রেমিকজন সহজে তাহা ত্যাগ করে না। সে কাতর নয়নে ও গদগদ কণ্ঠে তরুণকে নানাবিধ প্রেম কথা কহিল। তাহার রূপ যৌবনের অশেষ প্রশংসা করিল। অবশেষে বলিল, "সুন্দরী, তুমি আমার হও, তোমার সোনার অঙ্গ সোনায় ছেয়ে দিব। এই বাগানবাড়ী তোমায় লেখাপড়া করে দেব।' তোমার মাসহারা বরাদ্দ করে দেব। আর তোমার পায়ের তলায় পড়ে থাকব। অন্য জায়গায় তুমি যে ভালবাসা পেতে তার শতগুণ ভালবাসব। আমার ঘরের স্ত্রীকে এনে তোমার বাঁদী করে রাখব।"

তরুণ বুঝাইয়া বলিল, "আমার ভালবাসায় তোমার কোন লাভ নেই। আমি মেয়ে মানুষ নই। আমায় ছেড়ে দাও; আর তোমার মোটর ক'রে আমায় বাড়ী পৌছে দাও।"

যুবক সুরাপানে উন্মত্ত হয়েছিল। নেশার ঘোরে তরুণের কথা কিছুই বুঝিল না। উন্মত্তের ন্যায় তরুণের মুখচুম্বন করিতে গেল; তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল।

তরুণ যুবকের প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিল না। কঠিন মুষ্টিপ্রহারে তাহাকে কক্ষস্থিত কারপেটের উপর পাতিত করিল।

যুবক সেইখানে পড়িয়া রহিল।

ইত্যবসরে তরুণ পলাইবার চেষ্টা দেখিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে কক্ষদ্বার টানিয়া দেখিল, তাহা কোনও ক্রমে খুলিতে পারিল না। অপর কোনও পথে কক্ষের বাহিরে আসিবার উপায় ছিল না।

যুবক কারপেটে তদবস্থায় পড়িয়া, ও তরুণের পলাইবার চেষ্টা দেখিয়া, একবার বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "ফালিও না প্রিয়সী

ভিকধে ফড়িয়া খভু ছেড় না'খ হাল,
হাজিখে ভিফল হ'লে হথে ফারে খাল।'

তাহার পর অচেতন অবস্থায় নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

তরুণ পলায়নের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া আবার পূর্ব্বোক্ত সোফায় আসিয়া বসিল। এবং চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিল। কিন্তু নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই একটা শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল; সে মনে করিল কে যেন কক্ষদ্বারের চাবি খুলিতেছে। সে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, দ্বার উৎঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু দ্বারপথে দাঁড়াইয়া কে এ যুবতী? তাহার আবির্ভাবে কক্ষের আলোক সকল যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই উজ্জ্বল আলোক তাহার অতি সুন্দর মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইল; শ্বেত সরসিজ যেন সূর্য্যকরে স্নাত হইল; সৌন্দর্য্যের উপর যেন সৌন্দর্য্যবৃষ্টি হইল। রমণীর এমন ভুবনমোহন রূপ তরুণ কখনও অবলোকন করে নাই। সে এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; সেই অপূর্ব্ব রূপ যেন তাহার সমস্ত দৃষ্টিশক্তি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রূপচাঁদ দত্তের পুত্রবধূ।

আমরা কিছু আগের ঘটনা বিবৃত করিব।

রাত্রি এক প্রহর সময় অতীত হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড ভবন মধ্যে এক সুসজ্জিত কক্ষ; কক্ষমধ্যে, কমনীয় কনক করঙ্ক মধ্যে রত্নালঙ্কারের ন্যায়, এক ষোড়শী যুবতী রূপের বিদ্যুৎ শিখা জ্বালিয়া বসিয়া ছিল। যুবতী যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এই রূপসীর নাম শোভনা, সে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী রূপচাঁদ দত্তের পুত্রবধূ। তাহার স্বামীর নাম মণিমোহন দত্ত। সে পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়াছিল। সে বেশ্যাসক্ত ও মদ্যপ; বরাহনগরের বাগান বাড়ীতে প্রত্যহ অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত সুরা এবং বারবনিতা লইয়া অতিবাহিত করিত। কখনও, সুযোগ পাইলে, কুলকামিনীগণকেও অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত এবং সেই বাগান বাড়ীতে বন্ধ করিয়া রাখিত। শোভনা জানিতে পারিলে, কখনও কখনও তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়া, স্বামী কর্ত্তৃক প্রহৃতা হইত।

বাটীতে ভুবনমোহিনী রূপসী ও ষোড়শী এবং পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রহার করিয়া, মণিমোহন কেন বাগানবাটীতে পরকীয়ার জঘন্য প্রেমে উন্মত্ত হইত? শূকর কেন সৌরভময় মকরন্দ অবহেলা করিয়া, পূতিগন্ধময় পুরীষ মধ্যে বিচরণ করে?

শোভনা এক পরিচারিকাকে সমীপাগতা দেখিয়া উন্মুখ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গেছলি সেখানে? কি দেখলি?"

পরিচারিকা কহিল, "আজ এক ছুঁড়ীকে ধরে নিয়ে গেলেন। ছুড়ী কত হাত পা ছুড়তে লাগল; কিছুতেই যাবে না। শেষে একজন হিন্দুস্থানীকে একটা টাকা দিয়ে, তার সাহায্যে কত কষ্টে তাকে গাড়ীতে পুরে নিয়ে গেলেন।"

যুবতী ভ্রমর গুঞ্জনবৎ মধুর স্বরে কহিল, "এ কথা তুই কাউকে বলিস্ নে।"

পরিচারিকা কহিল, "এ কথা কি কাউকে বলবার?"

শোভনা পূর্ব্ববৎ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে বোধ হয় বাগান বাড়ীতে নিয়ে গেছেন?"

পরিচারিকা কহিল, "তাই বোধ হয়। মোটর গাড়োয়ানকে বল্লেন বরানগরের বাগান—জোরে চালাও।"

শোভনা ঈষৎ বিষাদ পূর্ণ স্বরে কহিল, "আজও আমায় সেইখানে যেতে হবে। কোন্ কুলবধূর মাথা খাচ্ছেন, তাকে রক্ষা করতে হবে। তার পর, আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। তুই এক কায কর। আমার মোটর খানা নিয়ে আসতে বল। আমার শাশুড়ীকে বলে আয় যে, আমার সইয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে; আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

পরিচারিকা আদেশ পাল জন্য প্রস্থান করিল। এবং আদেশ পালন করিয়া ফিরিয়া তৎসংবাদ শোভনাকে প্রদান করিল।

শোভনা মোটর গাড়ীতে চড়িয়া রাত্রি দশটার পর বাগান বাটীতে আসিয়াছিল।

মোটর চালক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী শোভনাকে মাতৃ-সম্বোধন করিত; তাহার দ্বারা কোনও কথা প্রকাশ হইবার ভয় ছিল না; বরং আবশ্যক হইলে, শোভনার কার্য্যে সে প্রাণপাত করিতে পারিত। এতদ্ব্যতীত বাগানবাটীতেও শোভনার একান্ত অনুগত ভৃত্যসকল ছিল; তাহারা তাহাদের মা লক্ষ্মীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত।

তাহাদের সহায়তায়, সে স্বামীর সম্পূর্ণ অগোচরে বাগান বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং তাহাদেরই সাহায্যে সে কক্ষের চাবি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঐ চাবির দ্বারা কক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া শোভনা, তরুণের নয়নাগ্রে, স্বর্গের দেবীর ন্যায়, দাঁড়াইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শোভনার পাতিব্রত্য।

তরুণের দিকে লক্ষ্য মাত্র নাত্র না করিয়া, শোভনা ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল। মণিমোহনের

মুখে কাছে আপন সুন্দর মুখ আনত করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইল। স্বামীর মুখে সুরাগন্ধ পাইয়া সে হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিল। তাহার পর, স্বামীর বক্ষে আপন কোমল হস্ত বিন্যস্ত করিয়া তাহার বক্ষের স্পন্দন অব্যাহত আছে কিনা পরীক্ষা করিল; তাহার জ্ঞান জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া, মুখে ও নিমীলিত নেত্রে সুগন্ধী শীতল জলের সিঞ্চন করিল; আপন মুক্তামালা পরিশোভিত শ্বেত কণ্ঠ হইতে বস্ত্রাঞ্চল উন্মোচন করিয়া তদ্দ্বারা তাহার মস্তকে ব্যজন করিল।

এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা মণিমোহন কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে, তাহাকে দাসীর সাহায্যে সযত্নে খট্টাঙ্গের উপর শয়ন করাইল। খাটের উপর হইতে গড়াইয়া যাইয়া আবার কারপেটের উপর পতিত না হয়, তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক দুই পার্শ্বে দুইটি উপাধান রাখিল। স্বামীর নিদ্রাকর্ষণের জন্য, মূর্ত্তিমতী সেবার ন্যায়, পালঙ্কের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, তাহার মস্তকে এবং অঙ্গে কোমল হস্ত বুলাইয়া দিল। মণিমোহন আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

অতপর তরুণের নিকটে আসিয়া কহিল, "চল, তোমায় তোমার বাড়ীতে রেখে আসি।"

তরুণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল; ক্ষণকাল কি ভাবিল; তাহার পর মণিমোহনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "উনি বোধ হয় আপনার স্বামী। আপনি আমাকে মুক্তি দিলে, উনি রাগ করে আপনার উপর কোন অত্যাচার করবেন না ত?"

শোভনার গণ্ডদ্বয় লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, "সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আর ওঁর দিকে তাকিও না, এখন শীগ্‌গির চল।"

তরুণ দৃঢ় স্বরে কহিল, "আমার কথার উত্তর না দিলে, আমি এক পাও নড়বো না।"

শোভনা বিস্মিত হইয়া কহিল, "নড়বে না?"

তরুণ পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "না।"

তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে শোভনা সহসা তরুণের হস্ত ধরিয়া জোরে আকর্ষণ করিল। কিন্তু তাহার কোমল শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তরুণকে একটুও টলাইতে পারিল না। তখন সে পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "মাগী সহজে যাবে না; টেনে হিঁছড়ে নিয়ে যেতে হবে। এ বোধহয় আগে পশ্চিমের কোন যায়গায় কারও বাড়ীতে ঝি ছিল; পাতকুয়োর জল তুলে তুলে হাত দু'খানা করেছে দেখনা যেন বজ্র।"

তরুণীর সেই কমলদলনিন্দিত কোমল করতলের স্পর্শে তরুণের তরুণ হৃদয়ের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রবাহিত হইল; সমস্ত শরীরে পুরুষরক্ত সঞ্চারিত হইল। সে হৃদয়াবেগ কতকটা প্রশমিত করিয়া কহিল, "টানাটানি করবার দরকার নেই; আমি সহজেই যাব। কিন্তু আপনাকে কোনও বিপদে ফেলে যেতে পারব না।"

শোভনা কহিল, "তোমাকে যেতেই হবে। এ কালনাগিনীকে আমার স্বামীর কাছে রেখে, আমি বাড়ী ফিরতে পারব না। ঝি আয় ত, মাগীর কত জোর দেখি।"

অতঃপর পরিচারিকা তরুণের দক্ষিণ হস্ত ধরিল, এবং শোভনা তাহার বাম হস্ত ধরিয়া তাহাকে প্রাণপণে আকর্ষণ করিল। বলা বাহুল্য তরুণের ব্যায়ামপুষ্ট দেহ তাহাতে টলিল না; কেবল হস্তের সুখস্পর্শে তাহার ধমনীতে ধমনীতে রক্ত প্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তাহাকে কোনও ক্রমে স্থানচ্যুত করিতে না পারিয়া, শোভনা কহিল, "তোমার গায়ে ত খুব জোর আছে, দেখছি। জোরে আমরা তোমায় না পারি, কিন্তু দরোয়ানেরা পারবে। তুমি যাবে কিনা বল। নইলে আমি দরোয়ানদের ডাকব। দরোয়ানেরা তোমার কলঙ্কের কথা জানতে পারবে।"

তরুণ স্মিত মুখে বলিল, "আমার কলঙ্কের কথা কিছুই নেই। আপনার স্বামীরই কলঙ্কের কথা প্রচার হবে। আমার সকল কথা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন এতে কারও কলঙ্ক নেই। আমাকে যা ভাবছেন তা আমি নই। আমি মোটেই—"

শোভনা কুপিতা হইয়া বাধা দিয়া কহিল, "আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে। তুমি সহজে যাবে

কিনা বল। নইলে এখনই আমি দরোয়ানদের ডাকবো। তারা আমার হুকুমে মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে আপত্তি করবে না—সে মেয়েমানুষকে আমার স্বামী যতই আদর করুন।”

অগত্যা তরুণ আর কথা না কহিয়া, শোভনা ও তাহার পরিচারিকার সহিত কক্ষের বাহিরে আসিল; এবং সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া, নিম্নতলে গাড়ী বরান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সেখানে শোভনার মোটর ল্যাণ্ডো অপেক্ষা করিতেছিল। পরিচারিকার নিকট অনুমতি লইয়া, মোটর চালক সসম্ভ্রমে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল।

পাছে পলাইয়া আবার তাহার স্বামীর কাছে যায়, এই ভয়ে, সতর্কতা অবলম্বন করিয়া, শোভনা সর্ব্বাগ্রে তরুণকে গাড়ীতে পুরিল; তাহার পর, আপনি উঠিয়া, তরুণের হস্ত ধারণ করিয়া তাহারই পাশে বসিল। শেষে পরিচারিকা গাড়ীতে আরোহণ করিলে, সোফার গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া চালকের আসনে গিয়া বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরচুল।

গাড়ী চলিল। নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া, কদাচিৎ কোনও পথিককে সতর্ক করিবার জন্য বংশীরব করিয়া, শীতকালের শীতল বায়ুর মধ্য দিয়া কলিকাতা অভিমুখে ছুটিল।

তরুণ, তরুণীর পাশে উপবেশন করিয়া, ভাবিল, এই বরবর্ণিনী কি ভাগ্যদোষে, দেবভোগ্যা হইয়া, এমন বর্ব্বরের হাতে পড়িল? বর্ব্বর ইহার মর্য্যাদা কি বুঝিবে? আচ্ছা, সেই মগুপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, পরদার লোলুপ পাষণ্ডকে কি এই রূপসী ভালবাসে? হাঁ বাসে বই কি! এই কতক্ষণ আগে, কত আগ্রহ ভরে, কত যত্নে সেই অচেতন বর্ব্বরের সেবা করিয়াছে; কত যত্নে, কত সাবধানে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়াছে; বিছানা হইতে পড়িয়া না যায়, তাহার জন্য কত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। তাহাকে কুচরিত্র দেখিয়াও, ঘৃণায় তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। আর এই ভালবাসার পরিবর্ত্তে, এই দেবী, এই সৌন্দর্য্যময়ী, এই ষোড়শী কি লাভ করিয়া থাকে? সম্ভবতঃ পাষণ্ড, মাতাল অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া এই দেবীকে অপমান করে; ইহাকে কদর্য্য ভাষায় গালি দেয়; ইহার কোমল অঙ্গ প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া দেয়!

হঠাৎ গাড়ীর চাকা একটা ইষ্টক বা প্রস্তর খণ্ডের উপর পতিত হওয়ায়, গাড়ী অতিশয় আলোড়িত হইল। সেই আলোড়নে শোভনার নিদ্রা কাতর দেহ তরুণের ক্রোড়ের উপর হেলিয়া পড়িল।

তাহাতে তরুণের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল। সে ব্যস্ত হইয়া শোভনাকে টানিয়া লইয়া তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিল।

শোভনাও জাগিয়াছিল। সে কুলটার কলুষিত ক্রোড় ঘৃণাভরে ত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া বসিল। এক্ষণে তাহার তন্দ্রা বিদূরিত হওয়ায় সে একবার পর্দ্দা তুলিয়া, কোন্ স্থানে আসিয়াছে, দেখিয়া লইল। তাহার পর তরুণকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি ব্যবসা কর, না কোনও গেরস্ত ঘরের বউ? আমার স্বামীই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে কি?”

তরুণ বলিল, “আমি দুইএর মধ্যে একটিও নই। আমি যা—”

শোভনা বাধা দিয়া বলিল, “তুমি যা’ আমি তা জানি। সে তোমাকে আর বলে কষ্ট পেতে হ’বে না। কুলবধূরা অমন তোমার মত ফুলের গহনা পরে, চোখে কাজল দিয়ে, অদ্ভুত রকমের কাপড় পরে, চুল এলো করে, তত রাত্রে, ধরা পড়বার জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে না।”

তরুণ বিস্মিতের স্বরে কহিল, “চুল, আমার চুল! আমার এলো চুল? চুলের কথা ত আমার একেবারে মনেই ছিল না। তা’ যদি একটু আগে মনে পড়ত, তাহলে ত এত কাণ্ড কিছুই হত না। এই নিন্ আমার চুল।” এই বলিয়া তরুণ আপন মস্তক হইতে দীর্ঘ পরচুলের রাশি খুলিয়া, শোভনার সম্মুখে ধরিল।

শোভনা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে চুলের গোছা দেখিল। তাহার পর, তরুণের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার মস্তকে চেরা সিঁথি দেখিল, তাহার কজ্জল ভূষিত অতি বিশাল লোচনদ্বয় দেখিল, তাহার রঞ্জিত অধর ও কপোলদ্বয় দেখিল, তাহার পর, মৃদু হাসিয়া কহিল, "ওঃ, বুঝেছি, তুমি বিধবা। বড় কষ্ট পেয়েছ, তুমি; তাই নেড়া মাথায় পরচুল পরে রাস্তায় মানুষ খুজতে বেরিয়েছিলে। তা, তোমার যে রূপ, তা'তে পরচুল না পরলেও চলত। খালি মাথায়, তোমাকে আরও ভাল দেখাচ্ছে; তোমাকে দেখে আমার স্বামীর ত মাথা ঘুরবেই, আমারই চোখ ফেরাতে ইচ্ছা যা'চ্ছে না।"

এই সময় সহসা গাড়ী থামিয়া গেল। চালক সভয়ে বলিল, "তিন জন লোক গাড়ী থামাতে ব'লে, জোর করে গাড়ীতে উঠছে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোটরে ডাকাতি।

দেখিতে দেখিতে দুই ব্যক্তি গাড়ীর পাদানে উঠিয়া গাড়ীর দুই দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মুখ মুখোস দ্বারা আবৃত ছিল। তাহাদের হাতে অনাবৃত দুইখানা চক্‌চকে ছোরা ছিল;—তাহা গাড়ীর ভিতরকার বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের আলোতে দীর্ঘ দীপশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া, শোভনা এবং তাহার দাসী করুণ স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল।

দস্যুগণের মধ্যে একজন বলিল, "গোলমাল কর না। চেঁচালে বুকে এই ছুরী বসিয়ে দেব। একটি কথা না কয়ে, গায়ে যে গহনা আছে খুলে দাও; আর বল যদি, আমরা খুলে নিই।"

শোভনা অবিলম্বে আপনার গাত্রালঙ্কার উন্মোচন করিতে আরম্ভ করিল। দাসীও অশ্রুপূর্ণ লোচনে আপন কণ্ঠের গোট হার ও হাতের অনন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

ইত্যবসরে অপর দস্যু তরুণকে কহিল, "তোমার কি গহনা আছে, খোল।"

তরুণ "এই নাও" বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল।

দস্যু হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। ছিন্নমূল কদলী বৃক্ষের ন্যায়, রাস্তার কঠিন ভূমিতে সশব্দে পতিত হইল। সে আর উঠিল না।

দ্বিতীয় দস্যু এই আকস্মিক ঘটনায় অতি বিস্ময়ে একবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার বিস্ময় অপনীত হইবার পূর্ব্বেই তরুণ ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার দিকে ফিরিয়া তাহার গলদেশে হস্ত প্রয়োগ করিল; এবং কহিল, "সাবধান! গাড়ী থেকে নেমে যাও। নইলে, তোমাকেও ফেলে দেব।"

সে অনন্য উপায় হইয়া, তাহার হস্তস্থিত ছুরী উত্তোলন করিয়া তরুণের বক্ষঃ বিদ্ধ করিল। কিন্তু তরুণের বলশালী ও কঠিন হস্ত দ্বারা তাহার কণ্ঠনালী বদ্ধ থাকায় তাহার শ্বাসরোধ হইয়াছিল; এজন্য ছোরার আঘাতের প্রবলতা যথেষ্ট কম হইয়াছিল। ছোরা তরুণের বক্ষ বিদ্ধ না করিয়া, কেবল মাত্র তাহার কৃত্রিম স্তনে বিদ্ধ হইয়া রহিল। পর মুহূর্ত্তে, রোষান্বিত তরুণ তাহাকে গাড়ী হইতে রাস্তার পাথরে সজোরে নিক্ষেপ করিল। সেই পতনের পর সেও আর নড়িল না। এইরূপে দুই ব্যক্তিকে গাড়ী হইতে দূর করিয়া, তরুণ গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তৃতীয় দস্যু, মোটর চালক বৃদ্ধ পাঞ্জাবীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধরিয়াছিল। সে দুই বন্ধুর পতন শব্দ শুনিয়া তাহাদের কি অবস্থা ঘটিল, তাহা চাক্ষুষ করিবার জন্য, চালককে ত্যাগ করিয়া, পিস্তল লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

পর্দ্দার ফাঁক দিয়া, অন্যের অলক্ষ্যে, বাহিরে কি হইতেছিল, তরুণ তাহা দেখিতেছিল। তৃতীয় ব্যক্তিকে পিস্তল হস্তে নামিতে দেখিয়া, ও তাহাকে পতিত বন্ধুর

দিকে যাইতে দেখিয়া, তরুণ মোটর চালককে সম্বোধন করিয়া জোরের সহিত বলিল, "চালাও।"

চালকও বাধা অপসারিত হওয়ায়, এবং গাড়ীর দুই পার্শ্বে দুই ডাকাতের পতিত দেহ দেখিয়া প্রস্তুত ছিল। এক্ষণে গাড়ীর ভিতর হইতে হুকুম পাওয়ায় তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সেই উচ্চ শ্রেণীর "রেনো কার" তখন পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটিল।

পিস্তলধারী দস্যু, গাড়ী চলিয়া যাইতে দেখিয়া, গাড়ী লক্ষ্য করিয়া দুইবার পিস্তল ছুড়িল। কিন্তু পিস্তলের গুলি ত লাগিলই না, তাহার আওয়াজও গাড়ীর নিকট পৌছিল না।

গাড়ী তখন বেগে ছুটিয়া যেন নিমেষমধ্যে মণিমোহন দত্তের বিশাল ও আলোকোজ্জ্বল অট্টালিকার সুদৃশ্য গাড়ী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

এই সমস্ত ঘটনা—দস্যুকর্ত্তৃক গাড়ী আক্রমণ, স্ত্রীবেশী তরুণের দ্বারা শোভনা ও তাহার দাসীর উদ্ধার সাধন, মোটর চালকের অতি বেগে গাড়ীচালনা, পিস্তলধারী দস্যুর পিস্তলের ব্যর্থ আওয়াজ যেন চক্ষের নিমেষে ঘটিয়া গেল। এই অল্প সময়, ভয়ে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় কাহারও বাক্য বিনিময়ের অবকাশ হয় নাই। শোভনা ভয়-চকিত নয়নে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিল; দাসী কাঁদিতে-ছিল; তরুণ তখনও আপন বক্ষ হইতে ছুরিকা উত্তোলনের কথা ভাবে নাই।

শোভনা একবার তরুণের বক্ষোবিদ্ধ ছুরিকা দেখিয়া, শিহরিয়া উঠিতেছিল, তাহাদের রক্ষাকারিণী এই আঘাত প্রাপ্ত নারীকে কিরূপে বাঁচাইবে—বাঁচিবে কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরিচয়।

গাড়ী থামিলে, শোভনা তরুণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি গাড়ী থেকে নাম্‌তে পারবে ত? তোমার বড্ড লেগেছে, নয়?"

তরুণ বলিল, "আমার কিছুই লাগে নি; আমি অনায়াসে নামতে পারব।"

তথাপি তরুণ গাড়ী হইতে নামিবার সময়, শোভনা সযত্নে তাহার হাত ধরিয়া নামাইল; এবং হাত ধরিয়াই তাহাকে বহির্ব্বাটীর নিম্নতলের এক নিভৃত কক্ষে বসাইল। এবং পরিচারককে কিছু জল আনিবার জন্য পাঠাইল। পরে তরুণের নিকটে বসিয়া মৃদু ও করুণ কণ্ঠে কহিল, "দেখ, তুমি আমার শত্রু হলেও—আমার স্বামীর প্রণয়-পাত্রী হলেও, তুমি যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে' মহা বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছ, সে কথা আমি ভুল্‌তে পারছিনে; কখনও তোমার এ উপকার ভুলতে পারব কি না জানিনে। আমি আমার গহনাগুলি ত কিছুতেই রাখতে পারতাম না; প্রাণ বাঁচাতে পারতাম কিনা তাতেই সন্দেহ আছে। আর আমার স্বামীর যে ধর্ম্মরক্ষা করবার জন্যে, মেয়েমানুষ হয়ে—কুলের বৌ হয়ে রাত দুপুরে বাগান বাড়ীতে গিয়েছিলাম, আমি নিজে বোধ হয় বদমায়েস্‌দের হাতে সেই ধর্ম্ম হারাতাম; তোমার মত, কলঙ্কের বোঝা মাথায় বইতে হইত। আমি সে ভার সহ্য করতে পারিতাম পারতাম না;—মরে যেতাম,—কলঙ্কিনী হলে মরে যেতাম। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়াছে; ধর্ম্ম বাঁচিয়াছে; আমার স্বামীকে ভালবাসবার আবার অবকাশ দিয়েছ। বল, কি করলে তোমার এই উপকারের প্রতিদান দিতে পারা যায়? যে গহনা তুমি ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ, তা ত তোমাকে দেবই; আমার বাক্সে যে টাকা আছে তাও দেব। আর কি দেব, বল? আমার স্বামী ছাড়া, তুমি যা চাইবে তাই দেব।"

তরুণ বলিল, "আমি কিছুই চাইনে। আমি কেবল শীগ্‌গির বাড়ী যেতে চাই।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শোভনা তাহাকে উঠিতে দেখিয়া, ভীত হইয়া তাহার বক্ষোবিদ্ধ ছুরিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "না, না, তোমার এখনই বাড়ী যাওয়া হবে না। আগে ডাক্তার এসে তোমার বুকের ছুরী খানা

বার করে নিক, তোমাকে ওষুধ দিক, তোমার ঘাটা তুলে দিয়ে বেঁধে দিক ; তার পর, আমি গিয়ে, তোমাকে সেই মোটর গাড়ী করে তোমাদের বাড়ীতে রেখে আসব। তুমি যদি গৃহস্থঘরের বৌ হও, আমার সঙ্গে গেলে তোমার কোন নিন্দে হবে না। আমি বাড়ীর লোকদের বলবো যে, ডাকাতরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ; তুমি তাদের সঙ্গে যেতে চাওনি বলে, তারা তোমার বুকে ছুরী মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। আমি বাগানবাড়ী থেকে ফেরবার সময় তোমায় দেখতে পেয়ে, আমাদের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম ; সেখানে জ্ঞান জন্মালে, তোমার কাছ থেকে ঠিকানা জেনে, তোমাকে বাড়ী পৌছে দিতে এসেছি।"

তরুণ তাড়াতাড়ি বলিল, "সে সব আপনাকে কিছুই করতে হবে না।—ডাক্তারও ডাকতে হবে না, বাড়ীও পৌছে দিতে হবে না। বুকের ছুরীখানা আমি এখনই খুলে ফেলছি।"—এই বলিয়া তরুণ ছুরী অপসারিত করিতে উদ্যত হইল।

শোভনা তাহাতে বাধা দিবার জন্য, ক্ষিপ্র হস্তে তরুণের হাত ধরিয়া ফেলিল, এবং কাতরকণ্ঠে বলিল, "না, না, ছুরী খুল' না, খুল' না। আমি শুনেছি যে, এরকম যদি কারও বুকে ছুরী বেঁধা থাকে, তা' খুললেই, পিচকারীর জলের মত, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বার হয় ; আর ডাক্তার কাছে না থাক্‌লে, অতিরিক্ত রক্ত বার হওয়ায় সেই লোক তখনই মারা যায়।"

তরুণ বলিল, "আপনি—আপনি আমার হাত ছেড়ে দিন। ছুরী ত আমার বুকে বসেনি। এ ত আমার বুক নয়। আমি ত মেয়ে মানুষ নই। আমার নাম তরুণচন্দ্র সিংহ রায়। এই দেখুন।"

—এই বলিয়া তরুণ ছুরী খুলিয়া, বল্কলের ব্লাউজ ছিঁড়িয়া কৃত্রিম স্তন অপসারিত করিল ; এবং আপনার পেশীবদ্ধ নগ্ন বক্ষঃ শোভনাকে দেখাইল।

তরুণকে পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া, শোভনা অন্যা অন্তঃপুরিকার মত, লজ্জাবিজড়িত অঙ্গ লইয়া তাহার দীপ্ত চাহনির সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল না। কেবল বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তুমি পুরুষ ! তাই তোমার গায়ে এত জোর, তাই আমরা দুজনে তোমায় টেনে আন্‌তে পারিনি, তাই ডাকাতেরা তোমার ঠেলায় গাড়ী থেকে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু, আমি এ কি করলাম—ছি ছি !"

তরুণ বলিল, "কেন, আপনি কি করেছেন ?"

"আমি আপনাকে স্ত্রীলোক জেনেই, আপনাকে ছুঁয়েছি, গাড়ীতে পাশে বসিয়ে এনেছি। ছি ছি !"

তরুণ বলিল, "তাতে কোন দোষ হয় নি। আমি তোমার ভাই যে, তোমার দাদা। ছোট বোন কি তার দাদার গায়ে হাত দিতে পারে না ?"

তরুণের এই কথা শুনিয়া, তাহার মুখে স্নেহের, শুচিতার অমল দীপ্তি দেখিয়া, শোভনার মনের গ্লানি দূর হইল। বলিল, "তা বেশ, এখন থেকে আমি আপনার বোন হলাম। আপনি কোথা থাকেন, কি করেন ?"

তরুণ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিল।

শোভনা বলিল, "আচ্ছা, আপনি আমার স্বামীকে ঠকাবার জন্যে কেন মেয়েমানুষ সেজেছিলেন তা আমাকে বলুন ত !"

তরুণ বলিল, "আমরা অভিনয় করছিলাম। আমি শকুন্তলা সেজেছিলাম। এখন বুঝেছ ত ? অনেক রাত হল—এইবার যাই।"

"যাবেন ?—আমার মোটর গিয়ে আপনাকে রেখে আসুক।"

তরুণ বলিল, "সেই ভাল। এ বেশে রাত্রে পথ চল্‌তে গিয়ে আবার কোনও মুস্কিলে পড়বো।"—বলিয়া পরচুলটা পরিতে লাগিল।

শোভনা বলিল, "আমার স্বামীর ধুতি কামিজ বের করে দেবো কি ?"

তরুণ বলিল, না, সে ঠিক হবে না। ঘরে ঢুকেছিলাম স্ত্রীলোক, বেরুচ্ছি, পুরুষ, এই বা কেমন কথা ?"

শোভনা, তরুণের প্রকৃত অভিপ্রায়ই বুঝিল—পাছে বাড়ীর চাকর দ্বারবানেরা কিছু মনে করে।"

তরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল। আচ্ছা দাদা, "আসুন তবে" বলিয়া শোভনা তাহাকে প্রণাম করিল।—বাহিরে গিয়া নিজ মোটর ডাকাইয়া তাহাকে উঠাইয়া দিল।

তরুণ বাড়ী গেল না, সেই থিয়েটার যেখানে হইতেছিল, তথায় গিয়া মোটর বিদায় দিল। থিয়েটার তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শকুন্তলার পলায়নে, অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল।

নিজ বেশ পরিধান করিয়া, গৃহে গিয়া সে শয়ন করিল। স্বপ্নে, জ্যেঠামহাশয়ের রুদ্রমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, নিদ্রাঘোরে কয়েকবার চমকিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

হরনাথের বংশরক্ষা

(গল্প)

বড়বাজারের পাল ব্রাদার্সের কাপড়ের দোকানের দুই ভাই অংশীদার—হরনাথ পাল ও প্রিয়নাথ পাল, বি-এ। দোকানের কাজ সারিয়া হরনাথ সখের থিয়েটারে গোঁফ কামাইয়া সখী সাজিত। প্রিয়নাথ সন্ধ্যার পর বই খুলিয়া বসিত। হরিসভার চাঁদা ও গরীব ছাত্রদের সাহায্য হিসাবে খরচ লিখাইয়া হরনাথ ঐটাকা বাগানে খরচ করিত। পাছে দাদার সঙ্গে বিবাদ হয় এই ভয়ে প্রিয়নাথ কোনও আপত্তি তুলিত না।

ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রিয়নাথের যক্ষা দেখা দিল। তাহার পড়িবার খুব সখ ছিল বলিয়া এবং সে স্ত্রীর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল বলিয়া, হরনাথ প্রায়ই বলিত—"বই আর বউ ওটাকে খাবে। বই পড়া মানে মিছি-মিছি পরের ভাবনায় মাথা গরম করা। আর স্ত্রীর আঁচল ধরা হওয়া মানে নিজেকে পুরুষ-বাচ্ছার মজা থেকে বঞ্চিত করা। ফূর্ত্তি না করলে রোগ আসে, আমার বোকা ভাইটা এই সোজা কথাটা বোঝে না।"

প্রিয়নাথের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার যখন হাল ছাড়িল, তখন হরনাথ বুক-ভরা আহ্লাদ ধার-করা আহা-উহুতে ঢাকা দিয়া, দোকানের পুরাতন সরকার যদু ভট্টাচার্য্যকে বলিল, "আপনি যদি প্রিয়র মত বিছানায় পড়েন, আমার দশা কি হবে বলুন দেখি?"

সে হাত যোড় করিয়া বলিল, "কি হুকুম করেন?"

"এই নিন একশো টাকা, কাল ভাল দিন, তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ুন।"

হরনাথের গায়ে-পড়া ভদ্রতায় বৃদ্ধ চমকিয়া গেল।

এক মাস পরে জামাতার নিকট হইতে যদু ভট্টাচার্য্য এই পত্র পাইল :—

"চিরচরনেশু,

ছোট বাবুর পীরা খুব সক্ত। আপনি কাশী যাইলে বরোবাবু আর দুইজন সরকারকে দেষে পাঠাইয়া দেন। তেনার ইয়াররা মদ খায় ও দোকানের খাতা লেখে। এক রাত্রে দোকানের সব পুরানো খাতা পুরে গেল, তাতেই মনে হয় দোকানে ভুত এসে। আপনি শিগ্র এসে রোজা ডাকান। চিরচরনের আসির্ব্বাদে সব কুসল।"

প্রিয়নথের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া, সরকার মহাশয়, দোকানে ফিরিয়া দেখিল যে, পুরাতন খাতাগুলি পোড়াইয়া নূতন খাতা তৈয়ারি হইয়াছ। তাহার ফলে পরলোকগত প্রিয়নাথ দোকানের আট আনা অংশীদার নয়, পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকর। ভট্টাচার্য্যের মাথা ঘুরিতে লাগিল।

"একি হ'ল বড় বাবু?"

"সোজা কথা। ইংরেজ যেমন এডেন ও জিব্রাল্টরে ঘাটি আগলে লোহিত ও ভূমধ্য সাগরে প্রভুত্ব বজায় রেখেচে, আমি তেমনি দোকানের ঘাটি আগলে ছোট-বৌ ও ভাইপোর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখতে চাই।"

"ফাঁকি না দিয়ে, আশ্রয় দিলে, তাঁরা কি বাধ্য থাকবেন না?"

"মুখ সামলে কথা কইবেন, সরকার মহাশয়।"

ভট্টাচার্য্যের চক্ষু দিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

২

বসন্তরোগে প্রথমা স্ত্রী সৌন্দর্য্য হারাইলে, হরনাথ একদিন বলিল, "চেহারাখান যা করেছ, দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। তোমার কষ্ট হবে বলে আর একটা বিয়ে করি নি, হেথা হোথা ঘুরে বেড়াই।"

"আমার কষ্ট হবে ব'লে বিয়ে কর না, না মাতাল লম্পট চোয়াড়কে, সতীন থাকতে, কেউ মেয়ে দিচ্চে না?"

"পতি পরম দেবতা, এ কথাটা একেবারে ভুলেচ? আচ্ছা!"

দ্বিতীয়া স্ত্রী বিজলী আসিয়া যখন প্রথমার পদধূলি লইল, সে বলিল, "তুমি আমাকে পাঁঠা ও চোয়াড়ের হাত থেকে বাঁচাও ভাই। আশীর্ব্বাদ করি, শীঘ্র সতীনের মাথা খাও।"

সতীলক্ষ্মীর কথা ফলিল। তিন মাসের মধ্যেই হৃদ্‌রোগে তাহার মৃত্যু হইল। সম্বন্ধীর চাবুকের চোটে স্ত্রীকে দুই মাস মাসহারা দিতে হইয়াছিল। তাহা বাঁচিল দেখিয়া, হরনাথ আহ্লাদে ফুটি-কাটা হইয়া বলিল, "স্বামী-দেবতাকে অপমান করলে স্ত্রীর তিন মাসও সয় না, এটা না বুঝে শালা আমাকে চাবুক হাঁকড়েছিল।"

বিজলীর আঠার বৎসর বয়সেও সন্তান হইল না দেখিয়া, হরনাথ একদিন রাগিয়া বলিল, "হাঁ গো নতুন গিন্নি, এত মাথা ঘামিয়ে যে লাক টাকার বিষয়টা করা হয়েচে, সেটা কি তোমার দেওরের গোষ্ঠির পিণ্ডি চটকাবার জন্যে? দুই সতীনেরই এক রকমের বদ-মায়েসি - ছেলে হবার নামটি নেই!"

স্থির হইল যে বিজলীর বৈদ্যনাথ দেবের নিকট ধরণা দিবার পরেও, হরনাথের বাবাত্ব প্রাপ্তি না হইলে, সে তৃতীয় পক্ষের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে।

৩

শ্রাদ্ধ চুকিয়া গেলে হরনাথ ভ্রাতৃ-বধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বন্দোবস্ত করিল।

ভাসুরের কাছে গিয়া প্রিয়নাথের স্ত্রী নিবেদন করিল যে তিন বৎসর বাদে ছেলেটার মেডিকাল কলেজে পড়া শেষ হবে; ততদিন যেন তিনি মাসে পঞ্চাশটী টাকা ভিক্ষা দেন। হরনাথ উত্তর দিল, টাকা মুড়ি মুড়কি নহে। দোকানের খাতা-পত্রের ব্যাপার ছোট বউ সমস্তই শুনিয়াছিল, সুতরাং ভাসুরকে বলিতে সাহস হইলনা যে তাহাদের প্রাপ্য মাসে দেড়শত টাকা।

পাঁচ ছয় মাস এই ভাবে কাটিল। তিনকড়ির মার গহনাগুলি বন্ধক পড়িতে আরম্ভ হইল।

পাশের ঘরখানি পাইলে, হরনাথের বড়বাজারের দোকানটি বেশ বাড়ে। কিন্তু বাড়ীওয়ালা দীননাথ ভড় সেলামি চাহিল দেড় হাজার টাকা। রফা হইল যদি হরনাথ তাহার ভাইপোর সহিত ভড় মহাশয়ের নাতনীর বিবাহ দেয়, তাহা হইলে সেলামি দিতে হইবে না।

হরনাথ আসিয়া বলিল, "তিনকড়ি তোমার বিবাহ ঠিক করেছি। নগদ দেড় হাজার টাকা, বড় মানুষ কুটুম্ব, বার মাস তত্ত্ব।"

মা দরজার পাশে আছেন বলিয়া তিনকড়ি মায়ের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

দীনু ভড়ের পাঁচ লক্ষ টাকার বিষয়। পাত্রীটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বেশ মোটা সোটা, একটু দোষ—বোবা। "সেত' ভালই ছোট বৌমা, বাড়ীতে ঝকড়া হবে না।

মেয়েটী হয় বছরের— সেটাও খুব সুবিধা, নিজের মনের মতন করে গড়ে নেওয়া চ'বে।"

তিনকড়ি উত্তর দিল, মা বলছেন, দীনু ভড় জুয়াচোর, দু'বার দেউলের খাতায় নাম লিখিয়েচে। তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতা করবেন না এবং বোবা বৌ আনবেন না।"

তাহাদের ত্রিশ টাকা মাসহারা বন্ধ হইয়া গেল।

৪

অত্যাচারের ফল ফলিল। কবিরাজ বলিল যে হরনাথের ক্লীবত্ব সারিবে না। হাকিমী চিকিৎসা আরম্ভ হইল।

প্রায় এক বৎসর হইল হরনাথ অন্তঃপুরে যায় না। বাহিরের ঘরে মদ, গান ও নাচের মাত্রা বাড়িয়াছে দেখিয়া, বিজলী হরনাথের আসল রোগ বুঝিতে পারিল না। তাহার শরীর এতটা ভাঙ্গিয়া গেল যে হরনাথ তাহাকে বাধ্য হইয়া বৈদ্যনাথ ধামে, স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ার্থ পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে গেল যশোদা ঝি, তাহার ভাই-পো হরিচরণ চাকর এবং একজন পাণ্ডা।

যশোদা বাড়ীর পুরাতন ঝি। বয়স জিজ্ঞাসা করিলেই সে বলিত সাড়ে নয় গণ্ডা—জাঁক করিত যে বছরে বছরে তাহার কথা বদলায় না। স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, ঐ যে আকাশে। ঘুঁড়ি? —ধুৎ, চিল?—ধুৎ মেঘ? —ধুৎ, সুয্যি?—হাঁ। সূর্য্য গোয়ালা গঙ্গায় ডুবিয়া মরে বলিয়া যশোদা কখনও গঙ্গাস্নান করিত না, বলিত মা গঙ্গা রাক্ষুসী।

হরিচরণ ষোল বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া আলুপটল বেচিয়াছে, যাত্রার দলে ডাকাত সর্দ্দার ও হনুমান সাজিয়াছে এবং ব্যারিষ্টারের চাপরাসি ও অবশেষে হরনাথের খানসামা হইয়াছে। তাহার বয়স তেইশ, বিবাহ হয় নাই।

আহারান্তে হরিচরণ হনুমান বা ডাকাত সর্দ্দারের পালা অভিনয় করিয়া রমণীদিগকে হাসাইত। এক সপ্তাহের মধ্যে বিজলীর নিকট ইহা এক ঘেয়ে ঠেকিতে লাগিল। তখন হরিচরণ তাহার পুরাতন মনিব ব্যারিষ্টার জে-ডসের (যোগেন দাস) কন্যা লীলা ও তাহার প্রণয়ী ডক্টর গুপ্টা (সতীশ গুপ্ত) সম্বন্ধে এমন সব রসাল গল্প বলিত এবং মজার কাণ্ড অভিনয় করিত যাহা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া ও দেখিয়া, বিজলীর চাপা নিশ্বাস পড়িত ও ফিক করিয়া হাসি আসিত।

রিষ্ট ওয়াচ, ছড়ি, বোতাম, এসেন্স, জরি-পাড়ের ধুতি, দিদিমণির নিকট হরেক রকমের বকসিস পাইয়া হরিচরণ ঘর বোঝাই করিল।

যশোদা বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি মা ঠাকরুণ, গরিবের ছেলেকে জামাই বাবু সাজিয়ে ওর ঘোঁড়া রোগ ধরিয়ে দিয়ো না।"

বাবা বৈদ্যনাথের কাছে ধরণা দিবার জন্য সাধাসাধি করিলে, বিজলী যশোদাকে উত্তর দিত, আমার বরাতে থাকে আমি ঘরে বসে ছেলে হবার ঔষধ পাব। মন্দিরের পাশে কত লোক হাঁ করে পড়ে আছে বাবার কি সবার উপর দয়া হয়?"

চার মাস পরে যশোদা বুঝিল যে গৃহিণী গর্ভবতী হইয়াছে। সে প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তারপর নিজের নাক কাণ মলিয়া ভাবিল, ঠাকুর দেবতার কাণ্ড, ছিঃ আমার মন এমন!

বিজলী ব্যস্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিল। হরিচরণ আশ্বাস দিয়াছিল—সে এক রাত্রি বাবু মহাশয়কে জোর করিয়া অন্তঃপুরে আনিবে—বাস্। সে ও বিজলী হরনাথের ক্লীবত্ব-প্রাপ্তি সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ করে নাই।

৫

ডাক্তারি পাশ করিয়া তিনকড়ির দেড় শত টাকা মাহিনা হইয়াছে এবং তাহার মা প্রত্যহ পাল্কি চড়িয়া গঙ্গাস্নান করিতেছে, এই শুনিয়া হরনাথ ঈর্ষায় জলিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল আমি এক জনের জ্যেঠা আর একজনের ভাসুর। আমাকে মেনে চলে না এই

পাপে তাদের উৎসন্ন যাওয়া উচিত। কিন্তু হচ্চে তার উল্টা। নাঃ ভগবান নেই।

কিছু দিন পরে তিনকড়ি এক ডেপুটির মেয়ে বিবাহ করিয়া শিক্ষিতা বধূ ও চার হাজার টাকা আনিয়াছে শুনিয়া হরনাথ বলিল—অসম্ভব। সে দিন হুঁকাটা বিনা অপরাধে গুঁড়া হইয়া গেল।

এক দিন মদ খাইয়া যশোদা ও হরিচরণকে এক খানা প্রকাণ্ড ছোরা দেখাইয়া হরনাথ বলিল, "ঠিক করে বল্ বৈদ্যনাথে ছোট গিন্নীর কাছে কে আসত?" যশোদা কানে হাত চাপা দিল ও জিব কাটিল। হরিচরণ ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হরনাথ লজ্জিত হইয়া বলিল, "বা-এ নিয়ে গোল করিস্ নি।"

খুব ঘটা করিয়া হরনাথের ছেলের অন্নপ্রাশনের আয়োজন হইয়াছে। বাড়ী লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার পর ডাক পিয়ন এক খানা বড় লেফাফা দিয়ে গেল। উহা ছিঁড়িয়া হরনাথ চেয়ারের উপর হইতে ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেল।

ডাক্তার ডাক্—বরফ আন্—ওমা একি সর্ব্বনাশ, বাড়ীশুদ্ধ লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিল। তিনকড়ির নিমন্ত্রণ হয় নাই। কুটুম্বেরা তাহাকে ধস্তাধস্তি করিয়া লইয়া আসিল।

"দেখ বাবা, এই ভারি চিঠিখানায় বোধ হয় অনেক টাকা লোকসানের কথা আছে।" এই বলিয়া বিজলী দেবর-পুত্রের হস্তে উক্ত লেফাফাটি দিল।

উহা ভাল করিয়া ছেঁড়া হইল। বাহির হইল, একখানি ফোটোগ্রাফ—হরিচরণ বিজলীর কোলে মাথা রাখিয়া গল্প করিতেছে।

বিজলী দেবর পুত্রের নিকট হইতে ছুটিয়া পলাইল। তিনকড়ি ফোটোগ্রাফ খানাকে জুতা দিয়া ঘসিতে লাগিল।

ফোটোগ্রাফের সঙ্গে একখানা চিঠি ছিল। হরনাথের প্রথম পক্ষের সম্বন্ধী লিখিতেছে :—

"আমি বৈদ্যনাথ ধামে তোর দ্বিতীয় পক্ষের পাশের বাড়ীর তেতলায় ঘরে ছিলাম। দুই দিনে দুই রকমের ফোটো নেওয়া হয়েচে। একখানা তোকে পাঠান হইল একখানা নিজের কাছে রহিল। আমার সোণার লক্ষ্মী বোনটি তোর মতন পশুর হাতে পড়ে চিরকাল কেঁদেচে—কেমন এইবার তার শোধ।"

একগাছা প্রকাণ্ড ঝাঁটা হাতে করিয়া যশোদা হরিচরণকে খুঁজিতে লাগিল। তাহাকে ও ছোট গিন্নীকে পাওয়া গেল না।

৬

প্রায় এক সপ্তাহ হরনাথ কাহারও সহিত কথা কহিল না। কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিত, বংশরক্ষা ও বিষয় রক্ষা ভারি শক্ত।

হরনাথের এই মন্তব্য ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা উহার বাড়ীর দেওয়ালে খড়ি দিয়া লিখিল—উঃ বংশরক্ষা ভারি শক্ত।

বৃদ্ধ উকিল উইলের খসড়া প্রস্তুত করিল। হরনাথ বলিল, তিনকড়িকে দেখাইয়া তার পর নকল করাইবেন।

তিনকড়ি খসড়া উইল পড়িল। যেখানে ছিল— "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার শ্রীমান তিনকড়ি পালের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা, তিনকড়ি সেখানে লাল কালিতে কাটিয়া লিখিয়া দিল, "আমার স্বর্গীয় পিতা ভবনাথ পাল মহাশয়ের নামে উৎসৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

উকিল আসিয়া বলিল, তিনকড়ি ও তাহার মাতাকে ঢের বুঝাইলাম—তাঁহারা কেবলই হাস্য করিলেন।

তিন চারদিন হরনাথ গুম খাইয়া রহিল।

তাহার পর এক দিন ডাকের উপর ডাক পড়িল। তিনকড়ি, তাহার মাতা, উকিল ও যদু ভট্টাচার্য্য হাজির হইল। বিজলী সকলের অজ্ঞাতসারে চোরের মত দরজার আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

"বাবা তিনকড়ি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তুমি

শীঘ্র আমার উইলের খসড়া করে উকিল বাবুকে ও সরকার মহাশয়কে দেখিয়ে আমার সই করিয়ে নাও।"

তিনকড়ি দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজার, বিজলীর জন্য দশ হাজার এবং দাস দাসীদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিল।

খানিকক্ষণ আনচান করিয়া হরনাথ বলিল, "ছোট বৌমার আমাকে কি কিছু বলিবার নেই?"

"আছে বই কি। আপনি গুরুজন; আমার তিনুকে মন খুলে আশীর্ব্বাদ করুন এই ভিক্ষা করচি। বাছা আমার ঢের কষ্ট পেয়েচে, আমি যেন তাকে সুখী দেখে মরতে পারি।"

"আমি মন খুলে আশীর্ব্বাদ করচি, ছোট বৌমা, তোমার ছেলে চিরসুখী হোক। তোমার পুণ্যে প্রিয়নাথের সংসার উথলে উঠচে আর আমার—"

তিনকড়ির মা লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল।

উকিল উইলে হরনাথের ও সাক্ষীদের সহি করাইয়া লইল।

হরনাথ যখন শুনিল যে তিনকড়ি বিজলীকে দশ হাজার টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, সে চীৎকার করিয়া বলিল, হারামজাদীকে এক পয়সাও দিয়ো না।

তিনকড়ি বলিল, "দুটো ভাতের জন্য কি ছোট জ্যেঠাই মা পরের দ্বারস্থ হবেন? তাতে কি আপনার মান বাড়বে?"

হরনাথ খক খক করিয়া কাসিতে লাগিল।

উকিল বলিল, "Quite so" (ঠিক)।

তিনকড়ি ও তাহার মা আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল।

বয়স্থা দেবর-পুত্রের সম্মুখে ঘোমটা টানিয়া বিজলী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কালামুখী কোথায় থাকবে বাবা?"

তিনকড়ি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাহার মা বলিল— "এই বাবার বাড়ীতে, এই হতভাগী বোনের কাছে।"

"সত্যি দিদি? সত্যি বাবা?"—বিজলী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দুই দিন পরে হরনাথ বংশরক্ষা ও বিষয় রক্ষার দুশ্চিন্তা হইতে চিরকালের মত পরিত্রাণ পাইল।

বড় জ্যেঠাইমার ভ্রাতাকে মুরুব্বি মানিয়া, তিনকড়ি হরনাথের শ্রাদ্ধ করিল।

শ্রীগৌরহরি সেন

বিক্রমপুরের পল্লী-কবিতা

আজকাল দেখিতেছি, বিভিন্নদেশের পল্লী-কবিতা সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য, চিত্তসুখ সান্ন্যাল প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই উদ্দেশ্যে অনেক খাটিতেছেন। মহৎকার্য্যের সহায়তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমি বিক্রমপুরের সাহিত্য-সেবার ইতিহাস প্রণয়ন করিবার উপকরণ সংগ্রহের জন্য অনেক দিন বিক্রমপুরের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়াছি। উক্ত উপকরণের সঙ্গে কয়েকটি পল্লী-কবিতাও আমার হস্তগত হয়। তাহা বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কবিতা রচয়িতা ও রচয়িত্রীদের পরিচয়ও বিভিন্ন গ্রামের বৃদ্ধদের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। যদিও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন 'শুনা কথা' খাটে না— তথাপি এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই আমাদিগকে সন্তুষ্ট

থাকিতে হইবে। কেননা, পল্লীগ্রামের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার সুমতি আমাদের আধুনিক। কাযেই 'শুনা কথা' ভিন্ন আমাদের অন্য পন্থা নাই।—

প্রথম কবিতা—

"মন না জেনে দিস্ না নয়ন করিগো মানা।
তারে দিলে নয়ন, জন্মের মতন—
আর ত নয়ন পাবি না॥
মন না জেনে ইত্যাদি। * * *
ঐ নাম নিতে যারা জানে
তারা আছে যোগ সাধনে
তাহা কি জান না॥
ঐ নাম মনপ্রাণে নিতে পার্‌লে, ঘরে রইতে পারে না।
মন না জেনে ইত্যাদি॥ * * *
বিরজা কয় আমি জানি
সে লম্পটের শিরোমণি
তোরা কি জানিস্ না।
আমি জন্মাবধি ঘুরে মর্‌লাম, তবু তারে পেলাম না॥
মন না জেনে * * *॥
তারে নয়ন দিলে পরে
বুঝতে পার্‌বি দু'দিন পরে
কেমন গো ঘটনা।
তারে দেখ্‌তে কালো, কথায় ভালো—
স্বভাব কিন্তু ভালো না॥
মন না জেনে * * *॥
নয়ন নেওয়ার বেলা কত সন্ধি
শেষে নিয়ে করে কপাট বন্দি
ওর মত ভুলাইনা সন্ধি কেহ জানে না॥
মন না জেনে * * *॥
নামের সাক্ষী প্রহ্লাদ ভক্ত
অনলে হয়েছে মুক্ত—
নামের নিশানা।
হরির নাম নিয়ে বাহির হইলে কিছুই মনে থাকে না॥
মন না জেনে * * *॥

কবিতাটির শেষের চারিলাইনের সামঞ্জস্য নাই। প্রথমে হইতেছিল 'নয়নের' কথা—শেষের চারি লাইনে আবার 'নাম' আসিয়া জুটিল। ছন্দেরও তেমন দৃঢ় বন্ধন নাই।—এই কথা কেবল এই কবিতাটির পক্ষেই খাটে না, যে কোন পুরাতন পল্লী-কবিতারই এই দশা।

উপরিউক্ত কবিতাটি বিরজা নাম্নী এক বৈষ্ণবীর রচিত। সেনহাটী গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট জানিতে পারিলাম, সেই গ্রামেই নাকি উক্ত বৈষ্ণবীর বাসস্থান ছিল। ইনি নিরক্ষরা। উক্ত সেনহাটি গ্রামেরই নিকটস্থ গ্রামে আর একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "ইহাঁর (বিরজার) একটি কীর্ত্তনের দল ছিল এবং ইহাঁর রচিত বিস্তর গান আছে। বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই ইহাঁর অনেক গান গীত হইয়া থাকে।"—এই গানটীও পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে (পশ্চিমপাড়া ঢাকা) এক বৈষ্ণবের মুখে গীত হইতে শুনিয়াছিলাম।

এই পৃথিবীতে বাণীর সেবক কত নিরক্ষর, নীরব পল্লী-কবি, কত অজানা, অচেনা, সুদূর পল্লীতে নীরবে বাস করিতেছেন তাহা জানা কঠিন। পল্লীর নীরবতার মধ্যে তাঁহাদের কবিত্ব এবং বর্ণনা, বেশ ফুটিয়া উঠে। এইরূপে অনেক কবি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইতে পারেন নাই। অকালে প্রাণবিয়োগ হেতু অনেক কবির কীর্ত্তিসমূহ তাঁহার সেই নিভৃত পল্লী-কুটীরেই লুপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কবিতা—

"হব আমি পিরীতের পাগল
পিরীত ক'রে চণ্ডীদাসে
পেল মোক্ষ-ফল।
কইলে বইলে পিরীত হয় না
না হইলে সরল।
ও ঘস্‌লে মাজলে কি সুন্দর হয়?
তাই বল।
বিশুদ্ধ প্রেম জান্‌বার কারণ
বিষয় ছেড়ে রূপ সোনাতন
হয়েছে পাগল।

চাইলে কি গো পিরীত মিলে
নয়ক গাছের ফল।
ওই প্রেমে পাগল হয় বিল্বমঙ্গল।
প্রেমে মত্ত পাগল ভোলা,
ঘুচায়ে মদনের জ্বালা,
হয়েছে অটল।
অটল প্রেমে দাগা দিতে
মদন করে ছল
ও ছলে ভরা অমনি হয় তল।
পিরীত ক'রে যেজন মরে
তার জনম সফল।
ও সত্যের পিরীত অতি সুনির্ম্মল।
মরণির আগে মরে
মদনের বাধ্য করে
তার পিরীত আসল।
দুর্য্যোধন কয় হল না প্রেম
প্রেম হইলে হইত হেম
লোহার পরেছে কল।
টিনের উপর সোনার গিল্‌টি
নকলের নকল।
নকল পিরীতের জনম বিফল।

তৃতীয় কবিতা।—

কোকিল করে কুহুধ্বনি,
মুদিত হল কুমুদিনী
বিষাদ অন্তর,
পশ্চিমেতে অস্তাচলে গেল শশধর।
কেহ যায় প্রাতঃস্নান করিতে
কেহ যায় পুষ্প তুলিতে
মাঠে চল্‌ছে কৃষিকর।
নিশি অবসান হ'ল পলায় নিশাকর।
মন্দ মন্দা বইছে বাও
শয্য হইতে তুল্‌ছে গাও
যত নারী নর।
মুখে জয় দুর্গা, শ্রীদুর্গা
বলিছে বিস্তর
ওরে, প্রাতে পঞ্চকন্যা স্মরণ কর।
কত ফুটছে ফুল নানাজাতি
মল্লিকা মালতী যুঁথি,
ওরে, গন্ধরাজ টগর
বকুল ফুলে আকুল হয়ে আস্‌তেছে ভ্রমর।
দুর্য্যোধনরে কর তুমি—
মধুর রসে আদর॥

এই কবিতা দুইটি দুর্যোধন দাস নামক এক উদাসী ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন। আমি ছেলেবেলায় তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে গান করিতে শুনিয়াছিলাম। ইঁহার দলে আরও কয়েকজন লোক দেখিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই সাজ করিয়া 'তামাসা' দেখাইতেন এবং গান শুনাইতেন। এখন দুর্য্যোধন দাস আছেন কি না জানি না। আমাদের গ্রামের, সম্প্রতি পরলোকগত বর্ষীয়ান্ ৺সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন, "দুর্য্যোধন কবিত্বশক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি কিন্তু অশিক্ষিত ছিলেন। নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে হইলে তাঁহার মাথায় 'বাড়ি' পড়িত। এদিকে কিন্তু যে যেবিষয়ে বলিত—কবিতা লিখিয়া দিতে পারিতেন।"

বাস্তবিক, তৃতীয় কবিতাটিতে দুর্য্যোধন যে স্বভাবের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধহয় না যে ইহা একজন অজ্ঞের লেখনী—লেখনীই বা কেন—মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। হৃদয়ে ভাব থাকিলে তাহা বিশুদ্ধ ভাষার অপেক্ষা না করিয়াও ভাব-মাহাত্ম্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

চতুর্থ কবিতা—

"তোমার আশায় চাইয়া আছি—
ওহে দয়াময় এ ভব সাগর তীরে।
আশায় আছি—অধমেরে
তইরা নিবা তুমি নি রে।

কতদিন আর থাকুম চাইয়া
তোমার পদতরী দেও পাঠাইয়া
এ সংসারে থাক্‌তে ইচ্ছা নাইরে ॥

*   *   *

*   *   *

কবিতাটি পশ্চিমপাড়া গ্রামস্থ একটি বারুই বাড়ীতে প্রাপ্ত। লেখকের নাম নিতাই দত্ত। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত আনুমানিক একশত বৎসর পূর্ব্বের একখানি খাতা পাওয়া গিয়াছে। খাতাখানির অবস্থা এরূপ যে, তাহা তুলিয়া ধরা যায় না। বহু স্থানই কীটদষ্ট। অনেক কবিতাতেই এইরূপ ভঙ্গিমা হয়—

নিতাই বলে ওহে দয়ায়
থাক আমার হৃদয়ময়।

*   *   *

দেখা দাও ওহে মীনা (?)
দত্ত চাতক মইল তোমার দর্শন বিনা।

*   *   *

ওহে গুণনিধি, মূর্খ নিতাই প্রতি
হও হে সদয়
জানি না সাধন জানি না ভজন
তুমি আমার সকলময়।

নিতাই দত্তের কবিতাগুলি অধিকাংশই শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া রচিত। কচিৎ দুই একটি মাত্র "দেবী"কে উদ্দেশ করিয়া রচিত হইয়াছে। শব্দের অতি আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখা যায়। 'মীনা' শব্দটি ত কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।

নিতাই দত্তের অন্যান্য কবিতা উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই কার্য্য সফল হইলে, একশত বৎসর পূর্ব্বের পল্লী-কবি ও কবিতা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে।

আমাদের পল্লী-সাহিত্য আবিষ্কারের চেষ্টা অত্যন্ত আধুনিক। যদিও আমরা একার্য্যে এই অল্প দিনেই কতকটা সফলকাম হইতে পারিয়াছি, তথাপি সমস্ত বঙ্গদেশের পল্লী-সাহিত্য আবিষ্কারের পক্ষে কিছুই নহে। কাযেই বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের সকলেরই এই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নভেল রচনাকে 'দুধভাত' খাওয়ার মত সোজা কায মনে করিয়া, বাঙ্গালার সাহিত্যিক অসাহিত্যিক ছেলেবুড়ো সকলেই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।—হউন্, তাঁহাদিগকে সেজন্য কিছু বলিব না। কেবল আমাদের এইমাত্র বিনীত অনুরোধ যে—তাঁহারা যেন অন্ততঃ নিজ গ্রামের সুপ্ত-সাহিত্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। *

শ্রীকামিনীমোহন দাস।

* আমাদের বিক্রমপুরের সাহিত্য সেবীদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন অন্ততঃ আপন আপন জীবনী ও গ্রন্থাদির বিবরণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক, "বঙ্গ-সাহিত্যে বিক্রমপুর" গ্রন্থরচনায় সহায়তা করেন। সাহিত্যিকদের ফটো বা তাহার ব্লকও গৃহীত হইবে। আশা করি, সকলেই এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

---লেখক, (পোঃ পশ্চিম পাড়া ঢাকা)।

নানাদেশের অলঙ্কারের নমুনা

ভীল ভামিনী

তিব্বতীয় তরুণী

গারো গরবিনী

মস্কাট মহিলা

উত্তর ব্রহ্মের উর্ব্বশী যুগল

পূর্ব্ব আফ্রিকার প্রেমময়ী

আবিসিনীয় আদরিণী

ভ্রমণ

ইতিহাস পড়িয়া ও পড়াইয়া হয়রাণ হইয়াও আজ পর্য্যন্ত একটিও ঐতিহাসিক জায়গা দেখা ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই বলিয়া বড় আক্ষেপ ছিল, তাই এবার যখন পূজার ছুটি হইল, দিল্লীতে আত্মীয়রা ছিলেন, চিঠি লিখলাম তাঁহাদের বাড়ী গিয়া দিন কয়েক থাকিলে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে কি না? যথা সময়ে, অনুকূল উত্তরই আসল।

মফঃস্বল স্কুল হইতে প্রথমে কলিকাতা যাইতে হইবে; সেখানে কয়েকদিন পথশ্রান্তি দূর করিয়া দিল্লী যাইতে হইবে। ষ্টেশনে গিয়া দেখি পাঞ্জাব মেল যাত্রীতে ঠাসা। অগত্যা বম্বে মেল ধরিতে হইল, কথা হইল মোগলসরাইএ নামিয়া গাড়ী বদল করা হইবে। যাইবার সময় আবার ছোটকাকার বেনারস দেখিবার ইচ্ছা ছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমিও রাজী কি না। আমি ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। তাই দেখিয়া ছোটকাকা বাকিটুকুও প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আসবার সময় তাহলে আগ্রা দেখে আসবো, কেমন?" আমার ত আনন্দ ধরে না।

মোগলসরাইয়ে নামিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া জিনিষ পত্রগুলি ষ্টেশনে রাখিয়া, আমরা গাড়ী খুঁজিয়া বেড়াতেছি, দেখি আমারই পরিচিত এক পরিবার ঠিক সেই গাড়ীতেই যাইতেছেন। তাঁর স্ত্রী আসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিলেন, নিজের মেয়ে দুটিকে সরাইয়া দিয়া জায়গা করিয়া দিলেন।

বেনারস ষ্টেশনে নামিয়া একটি গাড়ী করিয়া আমরা সমস্ত সহর ঘুরিলাম। সেই প্রচীন হিন্দুরাজত্বের শিল্প নৈপুণ্য স্থপতিবিদ্যা ও তাহার বর্ত্তমান ক্রমোন্নতি দেখিতে বড় ভাল লাগিল। সেকালের কি ছোট ছোট সরু সরু ইট—কতকটা জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথে পথে মন্দির, গলিতে গলিতে তৃষ্ণা নিবারণার্থ পানিফল বিক্রয় হইতেছে, এখানে ওখানে অন্যান্য ফলের দোকানও আছে। সারাদিন ঘুরিয়া মন্দির দেখিয়া এতই তৃষ্ণা বোধ হইল যে, ছোটকাকা আমাকে এক আঁচল ভরিয়া পানিফল কিনিয়া দিলেন। রাস্তার কোণে দাঁড়াইয়া তাহাই খাইলাম—সেখানেও কেউ চেনে না। তা ছাড়া নির্জ্জন সরু গলি, কেহ দেখিতে পাইল কি না সন্দেহ।

গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া এক বেনারসী শাড়ী বিক্রেতার দোকানের সন্ধানে গেলাম। গাড়ী ত দুর্গম গলির ভিতর ঢুকিবে না; নবনির্ম্মিত বড়রাস্তার সামনে গাড়ী রাখিয়া পদব্রজে দোকান অভিমুখে চলিলাম। ছোট কাকা সঙ্গে, কাযেই ভয়ের কারণ নাই। অন্ধকার অন্ধকার গলি, তাহার ভিতর এখানে ওখানে চকমিলানো বাড়ী।

এ দোকান ও দোকান ঘুরিয়া এ কাপড় ও কাপড় বাছিয়া দুইখানি পছন্দমত কাপড় কিনিয়া আমরা দোকান হইতে বাহির হইলাম।

বেনারস হইতে গাড়ী চড়িয়া আবার দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দিল্লীতে যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি বারোটা। হুস হুস শব্দে ট্রেণ আসিয়া দিল্লীর প্রশস্ত প্লাটফরমে দাঁড়াইল। প্লাটফরমে বড় একটা লোক নাই; পিসিমা, দুইটি খুড়তুত ভাইবোন, তাঁহাদের প্রতিবেশী এক শিখ পরিবারের দুই একটি বালক আসিয়াছে। তখন ঈষৎ শীতের ছায়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, দ্রুত পদবিক্ষেপে সকলে ষ্টেশন পার হইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ী যখন গুম্ গুম্ শব্দে ঘোড়ার উচ্চ পাদবিক্ষেপের সহিত চলিতে আরম্ভ করিল, দেখিলাম সুপ্ত প্রশস্ত পথের দুইধার দিয়া নিমগাছের সারি চলিয়া গিয়াছে। পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন নিমের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তাই দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটি পথের দুধারে সারি বাঁধিয়া নিমগাছ রোপণ করিয়াছে।

রাত্রিতে যাইবার সময় ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই; কেবল এদিকে ওদিকে এক আধটি নির্জ্জন লণ্ঠন রজনীর অন্ধকারকে কিয়ৎ পরিমাণে অপনীত করিতেছিল। কিন্তু দিনের আলোতে যখন বাটীর বাহিরে বেড়াইতে যাইতাম, তখন কত নীরব সমাধি ক্ষেত্র দেখিতে পাইতাম। শিক্ষকতার প্রথম বৎসরে নবীন সেনের প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ পড়িয়াছিলাম। সকলই আজ এক সমভূমিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; যেখানে কোনো না কোনো দিন যাইতে হইবেই, যাহার হাত হইতে কাহারো নিস্কৃতি নাই।

কত যে সমাধি ক্ষেত্র পার হইতাম! সমাধির পর সমাধি, যেন কালের করাল হস্তের নীরব সাক্ষ্য দিতেছে। আর একটা জায়গা ছিল যেখানে গিয়া দাঁড়াইলে আমার স্কুলের ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের স্মৃতি সম্মুখে মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইত। আমি যে ঘরে শুইতাম, তাহার এক কোণের দিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ছিল। তাহা দিয়া নামিয়া গিয়া একটি গর্ত্তের মুখে পৌঁছান যায়। গর্ত্তের মুখ এখন ঢাকা। গর্ত্তের ভিতরে নাকি সেই সোপান শ্রেণী মাটীর নীচে চলিয়া গিয়াছে ও গতি পরিবর্ত্তন করিয়া কিয়দ্দূরে যমুনার সহিত মিলিয়াছে। এইরূপ সুড়ঙ্গ দিয়া নাকি বাদশাহেরা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে নদীপথে পলায়ন করিতেন। আমরা যে বাড়ীখানিতে ছিলাম তাহার নাম ছিল ইমাম ধারা—পান্থশালা। বাদশাহের বাড়ী না হইলেও ঐ সুড়ঙ্গের কাছে গেলেই কেমন যেন আমার ভয়ের সঞ্চার হইত। এই ভয় অতিক্রম করিতে না পারিয়া কোনোদিন ঐ গর্ত্তের মুখ খুলিয়া দেখিতে চাহি নাই।

দিল্লীর জাহানারা বাগ দেখিলাম, রোসেনারা বাগ দেখিলাম। গাড়ীর কোচম্যানটীর কি একটা ঝোঁক ছিল, মেয়ে দেখিলেই নাকি, প্রায়ই এই দুই স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাইত। জাহানারার তৃণাচ্ছাদিত সমাধির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, তাহাদের এত কঠোর জীবন, কেন হইয়াছিল? একটি প্রাচীন দুর্গের কঠিন আবরণের ভিতর তাহাদের আজন্ম বাঁধিয়া না রাখিলে ত তাহাদের এত অন্যায় করিতে হইত না, মানবীকে মানবী বলিয়াই তাহাদের বাদশাহ পিতামাতারা ত দেখিতে পারিতেন। কাশ্মীরী গেটের ভিতর দিয়া গাড়ী যখন গুম্ গুম্ শব্দে পার হইয়া বাহিরের মুক্ত মাঠে ছুটিয়া চলিত, তখন যত প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরীর কথা, আমার মনে হইত—সেকালে সকলেই এমনি করিয়া এইরূপ দৃঢ় প্রাচীর দিয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিত।

প্রথম যেদিন দিল্লীতে পৌঁছি, সেদিন ত ভাল করিয়া কিছু দেখি নাই। পরদিন সকালে প্রতিবেশী শিখ পরিবারের ছেলেপুলের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া গেল। সন্ধ্যায় বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, পিসীমা দিল্লীর যে ম্যালেরিয়াতে ভুগিতেছিলেন তাহার আক্রমণে একটি কোচের উপর শুইয়া আছেন। দ্রুত পদবিক্ষেপে সেখানে গেলাম। গিয়া পর্দা তুলিয়া দেখিলাম, পিসীমা কোচের উপর শুইয়া আছেন। আশে পাশে কতকগুলি কুশন রহিয়াছে, আর পাশের ঘরের মৃদু ইলেক্‌ট্রিক আলোর আভায় দেখিলাম তাঁহার পায়ের কাছে ও মাথার কাছে ওড়নাধারী কতকগুলি ছায়া মূর্ত্তি রহিয়াছে। আমি প্রবেশ করিবামাত্র ছায়াগুলি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি থমকিয়া দাড়াইলাম, ছেলে-বেলার আরব উপন্যাসের কথা ও তাহার বর্ণিত সব নারীমূর্ত্তি মনে হইল। পিসীমা হাসিয়া তাহাদের একটি আলোর সুইচ্ টিপিয়া দিতে বলিলেন। কক্ষ ঝলমল করিয়া উঠিল, দেখিলাম কয়েকটি ফুল্ল সুন্দর শিখ বালিকা মূর্ত্তি। একজন শিক্ষিতা মেয়ের আগমনে তাহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পিসীমা তাহাদের হাসিয়া বসিতে বলিলেন। আমি বসিলে তাহারাও বসিল।

ইহার পর ক্রমে তাহাদের সহিত পরিচয় হইল। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে তাহাদের কাষ না থাকিলে এখানে আসিয়া বলিত, "মিস্ সাব্‌জি, কাহিনী বোলিয়ে।" আমিও ভাঙ্গা হিন্দীতে ভাঙ্গা ইংরাজিতে তাহাদের গল্প বলিতাম।

একদিন সকলে মিলিয়া দিল্লীর দুর্গ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন সবেমাত্র জর্ম্মণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে বড় বড় পাগড়ী পরা একগাড়ী শিখ বালক দেখিয়াই হউক বা অন্যকোন কারণেই হউক, এক ঘণ্টা হাঁটাহাটি ঘোরাঘুরির পরও আমরা দিল্লীর দুর্গে প্রবেশাধিকার পাইলাম না। হতাশ হইয়া আমরা চক্‌বাজার ঘুরিয়া, জরি দেওয়া জুতা কিনিয়া, অশোকের প্রস্তর স্তম্ভ দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আর একদিন হুমায়ুন ও তৎসহ পঞ্চাশ ষাট জন ঐতিহাসিক ব্যক্তির শ্রেণীবদ্ধ কবরসমূহ দেখিলাম। মোটরে করিয়া এক দিন কুতব মিনার দেখিতে গেলাম। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিলাম, সের সাহের দুর্গ দেখিলাম, টোগলকাবাদ দেখিলাম। কুতব মিনারে উঠিবার সময় মনে হইয়াছিল, পৃথ্বীরাজের কন্যা নিকটস্থ যমুনা হইতে জল আনিয়া ইহার উপর বসিয়া পূজা করিতেন, তাঁহার সময়ই নাকি ইহার একতলা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয়, পরে স্থানটী মুসলমানের হস্তগত হইলে কুতবুদ্দীন উহা স্বীয় কীর্ত্তির স্মৃতিস্তম্ভ শেষ করেন। কুতবের বাগান ঘুরিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলে আমরা রিফ্রেশমেণ্টরুমে গিয়া জল খাইলাম। স্থানটী বেশ শীতল, ছায়াবহুল।

দিল্লীতে তিন সপ্তাহ ছিলাম। যাহা যাহা দেখিবার, সব দেখিলাম। নূতন রাজধানীর আগমনে দিল্লী তখন নবভূষায় সজ্জিত হইতেছে। দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট, বাঙালী কোয়ার্টার, প্রাচীন দিল্লী, মুসলমান দিল্লী—সব দেখিলাম। এই বিশাল নগরীর দিগ্‌দিগন্ত যেন আমার নিকট সুপ্ত বলিয়া বোধ হইত, যেন কত যুগ যুগান্তরের তাহারা নীরব সাক্ষী।

স্থাপত্য সৌন্দর্য্য দেখিবার সাধ দিল্লীতে মিলিল না। আমাদের সে সাধ আগ্রায় আসিয়া পূরণ করিতে হইল। ভোরের অস্পষ্ট আলোর ভিতর দিয়া গাড়ী যখন গতির বেগ প্রশমিত করিয়া যমুনার লোহারপুল পার হইতেছিল, দূর হইতে নদীর পারে তাজমহল দেখিলাম; এত বর্ণনা শুনিয়াছিলাম যে মনে হইল, এ আর কি? দূর হইতে দোতলা গড়া শাদা বাড়ীর মত দেখাইতেছে।

আগ্রা ষ্টেশনে নামিয়া জিনিষপত্র রাখিয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। এবার আমরা অনেকে ছিলাম—বড়কাকিমা, তাঁর ছেলে মেয়ে, ছোটকাকা ও আমি। নিজামউদ্দৌলা দেখিলাম। সেও যেন আর একটি তাজ। গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের তাজের সুপ্রশস্ত সৌধদ্বারের কাছে লইয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই ফোয়ারা শ্রেণী পার হইবার সময় দেখিলাম, একটি পার্শি পরিবারও আমাদেরই মত দর্শনার্থি হইয়া আসিয়াছেন। ভাবিয়াছিলাম কলিকাতার যাদুঘর চিড়িয়াখানার ন্যায় এসব স্থানে দর্শকের ভিড় দেখিব। কিন্তু, ইহাদের অতিমাত্র নির্জ্জনতায় বরং বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম সরকারী আপিস আদালত তখনও পাহাড় হইতে নামে নাই, তাই নগরী বিরহিণীর মত উদাসিনী।

তাজের ভিতরের কারুকার্য্যের বিচিত্রতা দেখিলাম। নিকট দৃষ্টিতে তাজের বাহিরের মূর্ত্তি স্নিগ্ধ শুভ্র। ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহার শিল্প কুশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পাথরের উপর যে বিচিত্রকলা কলাশিল্পীগণ সৃজন করিয়া তাহাদের অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

তাজমহলের ভিতরের অন্ধকার কক্ষে আমরা নামিতেই সমাধিপার্শ্বে দুই শ্বেতশ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ মুসলমান আজান দিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম নিদ্রিত সমাধি চির-নিদ্রিতই রহিয়াছে, তার পার্শ্বে ফুল, মাথার নিকট ফুল, পায়ের নিকট ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। কত কত কালের আত্মা যেন সেই চীৎকারে সাড়া দিয়া উঠিল। বক্ষে সহসা একটা স্পন্দন অনুভব করিলাম, আর ইতিহাস পঠন ও পাঠনের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। এই মমতাজই একদিন একখানি চিনির খণ্ড দিয়া সম্রাট সাজাহানের মন অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। মনে সেই নওরোজার দিন—যখন শত শত সুন্দরীকে একত্র সংগ্রহ করিয়া বিলাসলিপ্সু সম্রাট তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিয়া আনন্দ

পাইতেন—মনে পড়িল, মুসলমান নারীগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সতীত্বের উপর পদধূলি ঝাড়িয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার পায়ের ধূলি আপন মাথা নত করিয়া গ্রহণ করিতেন। মনে পড়িল জাহাঙ্গীরের মহিষী নুরজাহানকে; আরও মনে পড়িল সাজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজকে—যাঁহাদের প্রেমের কীর্ত্তি আজ সমস্ত পৃথিবীর ভিতরে স্থাপত্যের উৎকৃষ্টতা ঘোষণা করিতেছে ও করিবে। আর মনে পড়িল, তাঁহাদের প্রথম বিবাহের কথা। কবে তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল ইতিহাস ত তাহা ভাল করিয়া বলে না, তবে সেই অপরিণত হৃদয়ের বাল্যবন্ধন, তাহাকেই প্রথম স্থান দিতে হইবে, না যে বন্ধনে তাহাদের নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল যাহার অক্ষয় কীর্ত্তি আজিও পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাকে প্রথম স্থান দিতে হইবে ভাবিয়া পাইলাম না। উভয় যে ঠিক নয় তাহা অন্তরের গোপন কোণে কে যেন বলিয়া দিল। আবার কোন্‌টা ভুল তাহা লইয়াও বিষম সমস্যা বাধিল। যাহা হউক, আগ্রার উদ্যানের সুস্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের আস্তরণের পাশ দিয়া তাহার সুনিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া পার হইয়া, আমরা অন্যত্র গেলাম। রাস্তার ধারের ছোট ছোট দোকান হইতে কতকগুলি ধবধবে শাদা মার্ব্বেল পাথরের জিনিষ কিনিলাম। ছাত্রীদের কথা মনে পড়িল, কতকগুলি পিক্‌চার পোষ্টকার্ড তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য কিনিলাম।

গাড়ী যখন ঘুরিয়া আগ্রার দুর্গদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল তখন রৌদ্রের প্রখরতা বাড়িয়াছে। দূরে যমুনার বাঁকে তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্মুখে যমুনার বালুময় বক্ষে রৌদ্রের আলোক পড়িয়া মরুভূমির ন্যায় ঝিকমিক করিতেছে। এই নদী পথেই নাকি আগ্রার বাদশাহেরা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে নৌকারোহণে পলায়ন করিতেন। এবারও দুর্গপ্রবেশের অবস্থা দিল্লীর ন্যায় হইত, কেবল সরকারী চাকুরীর সুপারিশে প্রবেশাধিকার পাইলাম।

খানিকদূর সাধারণ লাল সুরকীর গুঁড়াঢাকা পথ, একটি আধটি টেরিটোরিয়াল (Teritorial) এখানে ওখানে পাহারা দিতেছে। কিয়ৎ পথ অগ্রসর হইয়া একজন গাইড (Guide) পাওয়া গেল। সে ঘুরিয়া, ঘুরাইয়া আমাদের এখান হইতে ওখানে লইয়া যাইতে লাগিল। কত দুর্গমধ্যে ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ কক্ষ দেখিলাম। মনে হইল এখানেই বোধ হয় তাতার প্রহরীগণ পাহারা দিত, আর সম্রাটের অসন্তোষের পাত্র হইলে গর্দ্দান দিত। দুর্গ মধ্যে অনেক জিনিষই দেখিলাম, চমৎকার শিল্প নৈপুণ্য। ছাদ হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের তলা পর্য্যন্ত শিল্প-কলার পরিচয়। দুর্গ মধ্যে জাহানারা প্রভৃতি মহিলাগণের গহনা রাখিবার সুবন্দোবস্ত ছিল দেখিলাম। দেওয়ালের গায়ে একটি করিয়া গর্ত্ত, তাহার নীচে আলোকের কায করিবার জন্য হলুদ পাথর বসানো। রাত্রে সেগুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিত, তাহারই ভিতর রাজকুমারীগণ তাঁহাদের বহুমূল্য উজ্জল মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণাভরণ রাখিতেন।

তাঁহাদের সীসমহল দেখিলাম। প্রথম যখন প্রবেশ করিলাম, কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহার ভিতর কেবল আমাদের দীর্ঘকায় গাইডের মস্তকের উচ্চ পাগড়ী ঈষৎ দেখা যাইতেছে। ভিতরে লইয়া গিয়া গাইড বলিল "একঠো দেশলাই দিজিয়ে।" একটি দেশলাইয়ে অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র মনে হইলে আমাদের আশে পাশে শত শত হীরকখণ্ড জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের উপর আমাদের অসংখ্য প্রতিবিম্ব। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট কাচ বসানো বলিয়া উহার নাম সীসমহল হইয়াছে। এখানে বেগমেরা স্নান করিতেন, গোলাপ জলের ফোয়ারা খেলিত, মৎস্য হংস প্রভৃতির চিত্রের ভিতর দিয়া বেগমেরা সাঁতার দিয়া বেড়াইতেন। নিকটের একটি দ্বার বন্ধ দেখিলাম, তাহার পরে যমুনা। শুনিলাম, কোনও বেগম বাদশাহের অসন্তোষ উৎপাদন করিলে তাহাকে ঐ দ্বারের আড়ালে

সুড়ঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত, যমুনার সুশীতল গর্ভে তাহার আশ্রয় মিলিত।

যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সারাদিনের ভ্রমণ-ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, অনেক রাত্রিতে ট্রেণ আসিল। গাড়ীতে উঠিয়া, পূর্ব্ব বর্ণিত ষ্টেশনে সমুদয় পার হইয়া আবার কলিকাতায় পৌঁছিলাম। কাণপুরে কতকগুলি মাটীর ফল, মানুষ প্রভৃতি কিনিলাম। মনে হইল এগুলি আমার ছাত্রীদিগকে দেখাইতে হইবে এবং শিখাইতে হইবে কাণপুর কিসের জন্য বিখ্যাত।

ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী বালিকাবিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিল।

শ্রীনিভৃতা দেবী।

সঙ্কট মোচন

(গল্প)

বিনয়ের সঙ্গে আমার তিন বৎসরের আলাপ। রিপণে যখন বি-এ পড়িতাম, তখনও দু'জনে এক মেসে এক ঘরেই থাকিতাম, তারপর ল' কলেজে আসিয়াও দুইজনে এক ঘরেই আছি। কিন্তু রিপণের সেই 'বিনয়ে'র সঙ্গে ল' কলেজের এই 'বিনয় বাবু'র পার্থক্য অনেক। তখন আমার মত বিনয়েরও ছিল, একখানা চৌকী, একটা ট্রাঙ্ক, বইগুলো কতক থাকিত ট্রাঙ্কের উপরে, আর কতক থাকিত বিছানার উপরে, আর ঘরের এককোণে থাকিত একটা চায়ের কেটলি, দুইটা পেয়ালা, গোটা দুই তিন কৌটা আর হুঁকো কল্‌কে। আমার সেই চৌকী তোরঙ্গই এখনও বজায় আছে, কিন্তু বিনয়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার এখন ড্রয়ার সমেত টেবিল হইয়াছে, চেয়ার হইয়াছে;—ঘরখানি নানাপ্রকারের ক্যালেণ্ডার ও দেশ নেতাদের ছবিদ্বারা সুসজ্জিত; তাহার মাথার কাছেই দেওয়ালে টাঙ্গান নিজের সম্প্রতি তোলা একখানা ফটো, চৌকীর তলায় পাম্প, সেলিম, ডার্বি, নাগরা প্রভৃতি চার পাঁচ রকমের জুতা ইত্যাদি। বিনয়ের এহেন পরিবর্ত্তনের কারণ, বি-এ পাশ করার পরই তার 'বিয়ে' হইয়াছে, এবং তাহা কলিকাতাতেই।

বিনয় এম্-এ ও ল' পড়ে; এম-এর বই এখনও কিছুই কেনে নাই, কারণ শীঘ্রই ওটা তাহার ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা আছে। ল' এর বইএর মধ্যে একখানা 'হিন্দু ল' এর নোট, আর একখানা 'রোমান ল' এর নোট—তাহাও পূর্ব্বের মত এখনও ট্রাঙ্কের উপরেই পড়িয়া থাকে। টেবিলটী আয়না, চিরুণী, ব্রাশ, সোপ্‌কেস্, শেভিংষ্টিক্, ক্ষুর, ষ্ট্রপ্, টুথ্ পেষ্ট, টুথব্রাশ, ফাউণ্টেন্ পেন, ইম্পিরিয়াল স্পেশাল, স্মেলিংসল্‌ট্ ইত্যাদিতে একখানি ছোটখাট মনোহারীর দোকানের আকার ধারণ করিয়া থাকিত।

পূজার ছুটীর পর প্রায় একমাস কলেজ খুলিয়াছে, কিন্তু বিনয় মাত্র দশ বার দিন হইল ফিরিয়া আসিয়াছে। রাত্রি এগারটার পর আমি পাশের ঘরের আড্ডা হইতে আসিয়া দেখি, বিনয় গালে হাত দিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি ভাবিতেছে; সম্মুখে একখানি বই খোলা। তাহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাব্‌ছো হে?"

"আর ভাই, আজ কাল দু'টো দিন চিঠি পাইনি!" বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আমার আইবুড়ো নাম এখনও ঘুচে নাই, কাযেই তাহার দীর্ঘনিশ্বাসের কারণটার একটু

হাসিয়া বলিলাম, "দেড় মাস এক সঙ্গে কাটিয়ে সবে ত এই ১০।১২ দিন হ'ল এসেছ। এর মধ্যে ৩।৪ খানা চিঠিও এসেছে, তবু দু'দিন চিঠি আসেনি ব'লে এত ভাবনা!"

আমার কথা শেষ না হইতেই বিনয় হঠাৎ 'প্রতাপ' হইয়া বলিয়া উঠিল,—"তুমি কি বুঝিবে আজন্ম-সন্ন্যাসী!" তারপর সুরটা একটু নামাইয়া বলিল, "সত্যি দেবেশ, মনটা বড় খারাপ হ'য়েছে ভাই! দু'দিন—এরকম কখনও হয় নি। ওঃ এবারে আসবার দিন যে কি কষ্ট হ'য়েছিল তার কি বলবো! অন্যবার ত এই বাগবাজার থেকে আসি, তাতেই কেঁদে ভাসিয়ে দেয়—আর এবারে কোথায় এই বাংলা, আর কোথায় সেই বাংলা মুলুক ছাড়িয়ে কাশী! ইচ্ছে ক'রলেই যাওয়া যায় না—কত দূর! তাঁরা শীতের পর ফিরবেন, আমারও পৌষ মাসের আগে ছুটী নেই। ওঃ! এবার আসবার সময় কি কান্না,—সেও যত কাঁদে আমিও তত কাঁদি; নীচে গাড়ী দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে—শাশুড়ী আমাকে ডাকতে এসে সে দৃশ্য দেখে ফিরে গেলেন। তারপর চোখ মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠলাম। তখনও সে রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদছিল। গাড়ী থেকে যতদূর দেখা যায়—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "আচ্ছা বিনয়, এবারের পুজোর ছুটীটা না হয় শ্বশুরদের সঙ্গে কাশীতে হাওয়া খেয়েই কাটালে। কিন্তু অন্য বারের ছুটীর পর যখন বাড়ী থেকে ফিরতে, তখন তোমার মা এর চেয়ে কত বেশী কাঁদতেন, পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ তোমাকে দেখা যেত ততক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আর চোখ মুছতেন, কিন্তু সে কথা ত এই তিন বছরের মধ্যে তোমার মুখে কোনদিন শুনি নি! তোমার মায়ের সে কান্নার চেয়ে কি তোমার বৌএর এ কান্না কি বড়?"

বিনয় বলিল, "মা ত কাঁদবেনই হে, সেটা স্বাভাবিক; কিন্তু ঐটুকু মেয়ে—ক'দিনেরই বা পরিচয়? তিন চার মাসের বৈত নয়! অথচ আমাকে এত ভাল বেসেছে! সত্যি ভাই, দু'দিন চিঠি না পেয়ে আমার মনটা বড়ই খারাপ যাচ্ছে।"

তাহাকে আর ঘাঁটান সুবিধাজনক নয় ভাবিয়া বলিলাম, "কি বই ওটা পড়ছ?"

বিনয় বলিল, "চয়নিকা। কবি না হ'লে বিয়ে ক'রে সুখ নেই, বুঝেছ দেবেশ! এবারের চিঠিতে এই খানটা টুকে দেব। কি সুন্দর, শোন—

অয়ি প্রিয়া
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়োনা মুখ

* * *

বিনয় ত পড়িতেই লাগিল, আমি কতক শুনিলাম, কতক বা শুনিলাম না। তারপর ঘুমাইবার চেষ্টা দেখিলাম।

২

পরদিন বেলা তখন প্রায় ১১টা, বিনয় ও আমি উভয়েই খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় হরেন বাবু নামক একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "বিনয় বাবু, আপনার একখানা চিঠি আছে।" হরেন বাবুর পরিধানে লুঙ্গী, এক হাতে একখানা কাপড় ও তোয়ালে ঝুলিতেছে; অন্য হাতে একটা সোপ কেস তাহাতে সাবান ও চাবি; দাঁত মাজিতে মাজিতে স্নাওয়াল শু সহ খাবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনয়কে সুসংবাদটী দিয়া তিনি কলতলায় গেলেন। বিনয়ও আহার অসমাপ্ত রাখিয়া চিঠির সন্ধানে ছুটিল, এবং লেটার বক্স অর্থাৎ একটা মুখ খোলা বিস্কুটের টিন হইতে তাহার প্রার্থিত বস্তুটী লইয়া ঘরে ঢুকিল।

আহারান্তে আমি ঘরে ঢুকিয়াই দেখি, বিনয় জামা-জোড়া আঁটিয়া কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "দেবেশ, আমি একবার বাগবাজার যাচ্ছি, বিশেষ দরকার, এসে বলবো।"

আমি ত ব্যাপারটা না বুঝিয়া একটু ভাবিতে

লাগিলাম। ভাবিলাম, বিনয়ের শ্বশুর বাড়ীর সবাই ত কাশীতে, পূজার পূর্ব্বে তাহার শ্বশুর তাঁহার পরিবার বর্গকে লইয়া কাশী গিয়াছিলেন, ছুটী ফুরাইলে আফিস বজায় রাখিতে একাই ফিরিয়াছেন। তবে হঠাৎ বিনয় এত তাড়াতাড়ি বাগবাজার গেল কেন? তাহারা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিল নাকি? তাহাই যদি হইবে তবে কলেজ কামাই করিয়া এত তাড়াতাড়ি যাইবার দরকার কি? সন্ধ্যার পর গেলেই ত হইত! কাহারও কোন অসুখ করে নাই ত! বারোটায় ক্লাশ, আর বসিয়া ভাবিবার সময় ছিল না, ইউনিভার্সিটির দিকে যাত্রা করিলাম।

এম-এ ও ল' ক্লাস সারিয়া সন্ধ্যার সময় মেসে আসিয়া দেখি, বিনয় বিছানার উপর সটান শুইয়া। খাতা ক'খানা নামাইয়াই বলিলাম, "ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি হে? আমি ত আজ একটা লেক্‌চারও মন দিয়ে শুনতে পারি নি। তাছাড়া আজ ফ্যানের তলায় জায়গা পাইনি, ভাল ক'রে ঘুমুতেও পাইনি।"

বিনয় বলিয়া উঠিল, "আর ভাই সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। যা রাগ হ'চ্ছে কি বলবো! সেটা এমন গাধা তা কে জানতো!"

আমি বলিলাম "কে গাধা? কে কি করেছে তাই আগে বল ছাই।"

সে বলিতে লাগিল, "জানই ত দু'তিন দিন চিঠি না পেয়ে আমার মনটা"—

আমি এইবার রাগিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম. "তোমার মণটা দশসের হ'য়ে গিয়েছিল তা জানি, তারপর কি, বল।"

এইবার সে আসল কথা বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল, "হরেন বাবু চিঠির কথা বলতেই আমি ত আধখাওয়া করে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। চিঠি খুলে দেখি, আক্কেল গুড়ুম! একবার সন্দেহ হ'ল আমার চিঠি বটে ত? ঠিকানাটা পাঠ দেখিলাম, আমার নামই ত টাইপ করা। এই নাও চিঠিখানা পড়, ব্যাপারটা বুঝতে পার কি না দেখ।"

এই বলিয়া সে আমার হাতে একখানি চিঠি দিল। নীচের নাম "লীলাবতী" দেখিয়া বুঝিলাম বিনয়ের স্ত্রীর চিঠিই বটে। কিন্তু সম্বোধনে "বাবা" দেখিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ হে, তোমার স্ত্রী লিখছেন তোমাকে, অথচ 'বাবা' বলেছেন এর মানে কি?"

বিনয় বলিয়া উঠিল, 'মানে কি বুঝতে পারবে, পড়ই না আগে।" চিঠিখানি পড়িলাম, তাহা এই—

শ্রীশ্রীহরি
সহায়।

ডি ৩৩ চেলাপুরা,
বেনারস্ সিটি,
২৫ শে কার্ত্তিক, ১৩২৯।

শ্রীচরণেষু,

বাবা, ২দিন হইল আপনার কোন পত্র না পাইয়া আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন আছি। আপনি কবে আসিবেন? দুধ আমরা কেউ খাই না। এখানকার দুধে গন্ধ লাগে, শুধু মেনির জন্য আধসের দুধ লওয়া হয়। আপনি আসবার সময় বেশী ক'রে বিস্কুট আসিবেন। যে বামুনদিদিকে আপনি ঠিক ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন, পরশুদিন আমরা জানলুম সে বামুনই নয়। তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। রাঁধতে মায়ের বড় কষ্ট হচ্চে। কাল অতুলদা' এখানে এসেছিলেন, মা তাঁকে বলে দিয়েছেন একটা বামনী দেখে দেবার জন্যে। আপনি শীঘ্র আসবেন। আসিবার সময় মায়ের ও আমার সেমিজ,আমার সাড়ী,ও মেনির নিকার-বোকার আনবেন। আমরা ভাল আছি। মা আগেকার চেয়ে দুটী খেতে পারছেন। মেনির পেটের অসুখটা নরম পড়েছে। ইতি

আপনার স্নেহের কন্যা
লীলাবতী

এই চিঠিখানি পড়া শেষ হইতেই বিনয় আর এক-খানা চিঠি আমার হাতে দিয়া বলিল, "এইবার দেখ আমার বৌ তার বাবাকে প্রিয়তম বলেছে।"—

বলিয়া হাসিতে লাগিল। চিঠিখানির ঠিকানায় দেখিলাম বিনয়ের শ্বশুরের নাম টাইপ করা, লেখিকা বিনয়ের স্ত্রী, কিন্তু সম্বোধনে 'প্রিয়তম'। চিঠিখানির অবিকল নকল নিয়ে দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীহরি

সহায়।

ডি ৩২ চেলাপুরা,

বেনারস সিটি

২৫শে কার্ত্তিক, রাত্রি ১০টা।

প্রিয়তম উকিলবাবু,

তোমার 'চিঠিখানা যথাসময়ে পেয়েছি। বৌদিদি (অতুদা'র বৌ) দু'তিন দিন হ'ল এখানে এসেছেন, তাঁর জন্যেই চিঠির উত্তর দিতে দেরী হ'য়ে গেল। তোমার চিঠিখানা বৌদির হাতেই প্রথমে পড়েছিল। তুমি খামের মধ্যে যে ছবিখানা পাঠিয়েছিলে সেখানা বৌদিদি আমার আগে দেখেছে এবং মাকেও দেখিয়েছে। আমি তাকে দেখাতুমই, কিন্তু সে আমার আগে দেখলে কেন, তাই রেগে আমি সেদিন রাত্রিতে খাই নি।

আমি আর থাকতে পারছি নে। কলকাতায় থাকতে তুমি শনিবারে শনিবারে আসতে, এখানে কতদিন পরে আসবে জানি নে। দু'টো শনিবার গেল, এখনও ক'টা যাবে জানি নে। রাত্রে ঘুমাই না, তোমার চিঠিগুলি মাথার বালিসের নীচে রেখে শুই।

প্রিয়তম, তুমি চিঠিতে লিখেছ, আমার জন্যে তুমি রোজ রাত্রে কাঁদ। একথা আমি কি জানি নে! কিন্তু বৌদিদি বলছিলেন, প্রথম প্রথম সব শেয়ালের এক রা, বছরখানেক যেতে দাও না, রা বদলে যাবে, কান্নাকাটি সব ভাল হয়ে যাবে, এত ঘন ঘন চিঠিও তখন আর আসবে না।" কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ত একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

এখনও রোজ রোজ বিকেলে আমরা বেড়াতে যাই। কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকতে যেমন আমোদ হ'ত তেমন আর হয় না। প্রায়ই দশাশ্বমেধ থেকে কেদারঘাট পর্য্যন্ত যাই। কোন কোন দিন পঞ্চগঙ্গার দিকে গিয়ে 'বেণীমাধবের ধ্বজায়' উঠি। বেণীমাধবের ধ্বজার ছুটো গুম্বুজেই ছুরী দিয়ে কেটে কেটে তোমার কত নাম লিখেছি, তুমি এলে দেখাব। আজ সকালে সঙ্কোট মোচনে বেড়াতে গিয়েছিলুম। তোমার কি এর মধ্যে ছুটী নেই? শীঘ্র শীঘ্র চিঠি দিও, আর খুব বড় ক'রে—৪।৫ পাতা। চুমু পাঠাইলাম। ইতি—

তোমারই লীলা।

পুঃ—কিরণের বরের সেদিন চিঠি এসেছিল, আমাকে দেখিয়েছিল! কত হাসির কথা আছে, তুমি এলে বলবো।

লীলা।

চিঠি দুইখানি পড়া শেষ হইলে বিনয় বলিল, "এইবার ব্যাপারটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছ। আমি আমার ঠিকানা টাইপ করে কতকগুলি খাম শ্রীমতীকে দিয়ে এসেছি, শ্বশুর মহাশয়ও সেই রকম খামেই তাঁর ঠিকানা টাইপ ক'রে কতকগুলি খাম দিয়ে এসেছেন। শ্রীমতী দু'জনকে দু'খানা চিঠি লিখে, করেছেন কি—ঘুমের ঘোরে আমার চিঠিখানা তার বাবার খামে পুরেছেন, আর আমার খামে পুরেছেন তার বাবার চিঠি। আমি আমার চিঠিখানা প'ড়েই ব্যাপারটা বুঝলাম। শ্বশুর ম'শায় ত আপিসে যান ৯টার সময়, আর কাশীর ডাক ১০টার পর আসে—শ্বশুর আপিস থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাঁর হাতে চিঠিখানা পড়বে না এই ভেবে, তাড়াতাড়ি বাগবাজারে গিয়ে হাজির হ'লাম। ঠাকুরের কাছ থেকে আমার চিঠি ব'লে নিয়ে এসেছি। দেখ দেখি লক্ষ্মীছাড়ী বৌটার কাণ্ড! আচ্ছা শ্বশুরের হাতে প্রিয়তমার এই চিঠিখানা পড়লে কি হ'ত বল দেখি?"

আমি বলিলাম, "হ'ত ভালই—তোমার শ্বশুর ম'শায় বুঝতেন তাঁর মেয়ে তোমার বিরহে কি রকম ছটফট করছে; আর এই সামনেই দু'একদিন ছুটী থাকলে, নিজে না গিয়ে, তোমাকেই কাশী পাঠাতেন।"

বিনয় হতাশভাবে বলিল, "আমার শ্বশুর তেমন নয় ভাই। যাক্ গুরুজনের সম্বন্ধে—কিন্তু বৌটাকে বেশ ক'রে শাসিয়ে দিতে হবে। তার বাবার চিঠিটা ত ফেরত পাঠাতে হ'চ্ছে—তবে বুঝতে পারবে।"

সেই রাত্রিতেই বিনয় খুব রাগিয়া তাহার স্ত্রীকে খুব বড় করিয়াই একখানা চিঠি লিখিল, আর বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিল—"এইবার যেদিন সকটমেচ'নে বেড়াতে যাবে, সঙ্কটা দেবীর পূজা দিও, খুব সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেয়েছ।"

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

(ব্যঙ্গ)

মা আনন্দময়ীর আগমনে, বঙ্গদেশে, কি সহরে কিবা মফঃস্বলে, প্রায় পনেরো আনা লোকই পাছে তাঁহার চরণ দর্শন করিতে হয়, এই ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া যান। আজকাল ইহা একটী বাবুয়ানার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ধনী, কি নির্ধন প্রায় সকলেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করেন, "এবার পূজার বন্ধে কোথায় যাওয়া যাবে হে?" ধনীদের কথা স্বতন্ত্র, গৃহস্থের বা গরিবের বিদেশ ভ্রমণের যেরূপ অবস্থা, তাহা তাঁহারা নিজে বেশ বুঝতে পারেন। আফিসের ছুটী হইতে, ট্রেণে যাওয়, বিদেশে থাকা ও খাওয়া কি সুখকর, তাহা ফিরিবার পর তাঁহাদের আকৃতিতেই বেশ অনুভব করা যায়। কিন্তু বাবুরা ভাঙ্গেন ত মচ্‌কান না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "বাইরে গিয়েছিলাম।"

তারপর ভ্রমণের গল্প। কেহ ট্রামে, কেহ রাস্তায়, কেহবা মাসিক পত্রিকায়। কেহ বলিলেন, "কাশী বেণী মাধবের ধ্বজা হইতে কলিকাতার সন্নিকট কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে সন্ন্যাসীরা গীতা পাঠ করিতেছেন, ইহা আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি।" কেহ বলিলেন, "দিল্লীর কুতবমিনার হইতে দেখিলাম, তারকনাথের মোহন্তের হাতী শুঁড়ে করিয়া হয়রানি তুলিতেছে।" কেহ মাসিকে লিখিলেন, "আমরা পাহাড়ের এমন চড়াই ও উৎরাই পাইলাম যে মানুষের অসাধ্য, কিন্তু আমরা অনায়াসে চলিলাম; এমন বরফের উপর দিয়া চলিলাম যে আমাদের পা ত দূরের কথা, দেহমন সমস্ত অসাড় হইয়া আসিল, প্রায় জ্ঞানশূন্য হইলাম, তবুও অনায়াসে চলিয়াছি।" ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এই সমস্ত শুনিয়া এবং মাসিকে পড়িয়া আমার মনে বড়ই আক্ষেপ হইতে লাগিল যে, আমি এ সমস্ত দেখিতে এবং কাহাকেও এরূপ গল্প করিতে বা কোন মাসিকে লিখিতে পারিলাম না। এই আপশোষে আমি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম যে আগামী সনে মা আনন্দময়ীর আসিবার সময় আমিও একবার দেশ ভ্রমণে বাহির হইব।

প্রতিজ্ঞা তো করিয়াছিলাম; এবং পূজাও আসিল, এখন কোথায় যাইব তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। এই চিন্তায় মন এত খারাপ হইয়াছিল যে তিন বেলা বই খাইতে পারিতাম না।

অনেক চিন্তার পর এবং অনেকের নিকট অনুসন্ধানের পর স্থির করিলাম যে এবার দাক্ষিণাত্যে কালকোঠা ভ্রমণ করিয়া আসিব। এই স্থান পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সেস্থানে নাকি সতীর দক্ষিণ পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল।

এই স্থির করিয়া এবং আবশ্যক জিনিষপত্র লইয়া, শ্রীদুর্গা শরণ করিয়া একেবারে বেলগাছিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমি যে লাইনে যাইব সে লাইন ব্যতীত পূর্ব্বদিকে আর একটী রেল

লাইন গিয়াছে, কোথায় তাহা জানিনা। একটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ঐ লাইন কি বোম্বে, বরদা, না রাজপুতনা, মালোয়া রেলওয়ে?" তিনি আমার কথা শুনিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিলেন। আমি মনে করিলাম, তিনি হয়ত, ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইতেছেন। এমন সময় ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত। আমি তাড়াতাড়ি টিকিট ঘর খুঁজিতে গেলাম। কিন্তু দেখিলাম অনেক লোক ট্রেণে উঠিয়া পড়িতেছে, কাযেই আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। উঠিয়াই পিছনে যে গার্ড ছিল তাহাকে বলিলাম, "মহাশয় আমি তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিতে পারি নাই, তাই আপনাকে বলিয়া উঠিতেছি।" তাহাতে তিনিও হাসিলেন। আমি ভাবিলাম, এ আবার কি?—এমন সময় তিনি বলিলেন, "আমার নিকট টিকিট আছে, দিব।" তার পর বেলা ১১-৯মিনিটে ঢং ঢং করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

কিছুদূর আসিয়া দেখিলাম, ট্রেণ একটু একটু করিয়া চড়াইয়ে উঠিতেছে। যখন সম্পূর্ণ চড়াইয়ে উঠিয়াছে, (পিছনে আর একখানা ইঞ্জিন আছে কিনা দেখি নাই,) আমি ট্রেণ হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে উঃ নীচে কি ভয়ানক খদ! যদি ট্রেণ একটু এদিক ওদিক হয়, তাহা হইলে যে কোথায় পড়িয়া যাইবে তাহা ভাবিলেও গা শিহরিয়া উঠে। আমি আর দেখিতে না পারিয়া চক্ষু বুজিলাম। পরে চাহিয়া দেখি যে, সে খদ ছাড়াইয়া আসিয়াছি এবং এখানেও যদিও খদ, কিন্তু এখানে একটি ট্রেণ লাইন রহিয়াছে। বোধ হয় জি আই, পি, রেলওয়ে লাইন। কিছুদূরে একটী জলপ্রপাত দেখিলাম, শুনিলাম উহা টালা জলপ্রপাত। ঐ ঝরণা হইতে নাকি সমস্ত সহরের জল সরবরাহ করা হয়।

এইবার উৎরাই আরম্ভ হইয়াছে। ট্রেণ গড় গড় ঢং ঢং করিয়া নামিতে লাগিল। এমন সময় সেই গার্ড টিকিট দিতে আসিল। আবার চড়াই, এবারে খদ দেখিলাম না। নীচে একটী নদী বহিয়া যাইতেছে ও অনেক বাণিজ্যের নৌকা ইত্যাদি রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে উৎরাই হইয়া ট্রেণ একটী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ইহা শ্যামবাজার ষ্টেশন। নামিতে সাহসে কুলাইল না, কি জানি যদি ট্রেণ ছাড়িয়া দেয়। গাড়ী হইতেই দেখিলাম, ষ্টেশনে খুব জনতা। সম্মুখে একটী কালীবাড়ী, অপর দিকে দেওয়ালে কত কি লেখা রহিয়াছে। ট্রেণে অতিরিক্ত ভিড়। সম্মুখে, আসে-পাশে দাঁড়াইয়া, কেহ অর্দ্ধ দাঁড়াইয়া,—এমন সময় ট্রেণ আর একটী ষ্টেশনে আসিল। ইহা একটী বড় গোছের ষ্টেশন। এখানে অনেক প্যাসেঞ্জার রহিয়াছে, প্লাটফরমে অনেক গাড়ীও রহিয়াছে।

সিগনাল পাইয়া আমাদের ট্রেণ আবার চলিতে আরম্ভ করিল এবং একটী জংসন ষ্টেশনে থামিল। এখই ষ্টেশনটির নাম হাতিবাগান। ইহা খুব বড় দেখিলাম। পশ্চিম ধার দিয়া একটী লাইন গিয়াছে, বোধ হয় 'গ্রাণ্ডকর্ড' লাইন। এই স্থানে ট্রেণ একটু বেশীক্ষণ দাঁড়ায়। সেই কারণ ষ্টেশনটী ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছায় ট্রেণ হইতে নামিলাম; এবং একটু অগ্রসর হইয়াছি, ইত্যবসরে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমি মনে করিলাম, ছুটিয়া ট্রেণ ধরি, কিন্তু ভরসা হইলনা। ভাবিলাম, "আমি ত ব্রেক্ জার্ণি পাইব, তাড়াতাড়ির কি দরকার?" যখন ট্রেণ পাইলাম না তখন হাতীবাগানটা দেখিবার জন্ম ইচ্ছা হইল।

প্রথম হাতীবাগান কেন নাম হইল অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, এখানে কোনও শিলা কিংবা স্তম্ভ আছে কিনা। গাইডের চেষ্টা করিলাম, পাইলাম না। নিজেই যতটা পারি সংগ্রহ করিলাম। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিবার পর এখানে তাঁর হাতী বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া হাতী বাগান নাম হইয়াছে। সম্মুখে বাজার, তাহার পর একটী প্রকাণ্ড নাট্যশালা। তারপর মিউনিসিপাল আফিস, পুলিশ ষ্টেশন। ডাক বাঙ্গালা এখানে দেখিলাম না, তবে অনেক ছোট ছোট হোটেল আছে। আর বেশী কিছু দেখিতে বা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা না করিয়া, পুনরায় ষ্টেশনে আসিয়া আমার ব্রেকজার্ণীর

ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া ষ্টেসন মাষ্টারকে খুঁজিতেছি, এমন সময় একটী ভদ্রলোক একজন লোহার শিকা-ধারীকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ষ্টেশন মাষ্টার।" কাযেই আমি তাঁহাকে, ঐ টিকিটের ব্রেকজারনী পাইব কি না জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন, "ব্রেকজারনী পাইবেন না।" টিকিটখানি নষ্ট হইল বলিয়া আমি হতাশ হইলাম। তবে যখন বাহির হইয়াছি, যাইতেই হইবে। অতএব আমি আর বৃথা বিলম্ব না করিয়া, আর একখানি ট্রেণ আসিতে তাহাতেই উঠিলাম। কিন্তু শুনিলাম এখানি গ্রাণ্ডকর্ড দিয়া যাইবে না, মেন লাইনে দিয়া যাইবে। তাহাতে আমার আর ক্ষতি কি? আমার গন্তব্য স্থানে যাইলেই হইল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ইহাতে অনেক আরোহী। আমি আমার পার্শ্বের আরোহীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ডি, কে, সিনা।

আমি। সিনা কি মহাশয়? সিংহ কি?

তিনি। পূর্ব্বে তাই ছিলাম। এখন সিনা হইয়াছি।

কাযেই আমি তাঁহাকে ডাইলিউসনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমরা মৌলিক, আমাদের ডাইলিউসন নাই। ঘোষা বা ভোষাদের আছে।" পরে তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, "এস্, কে, পলসেটিলা। পূর্ব্বে আমরা পালিত ছিলাম, এখন পলসেটিলা হইয়াছি। আমরাও মৌলিক, আমা-দেরও ডাইলিউসন নাই।"

ট্রেণ থামিল, ইহা একটী মাঝারী গোছের ষ্টেসন, নাম কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার। ট্রেণ হইতে যতটা পারি দেখিলাম, এখানে অনেক ভাড়াটিয়া গাড়ী এবং রিকসার সুবিধা আছে। ট্রেণ অল্পক্ষণ থামিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

পুনরায় সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম।

আমি। আপনি কোথা যাইবেন?

তিনি। মৃজাপুর।

আমি। আপনি কি মৃজাপুরে থাকেন?

তিনি। আজ্ঞে না।

আমি। তবে ওখানে কোথা যাইতেছেন?

তিনি। বেড়াইতে।

আমি। আপনি মৃজাপুরে আর কখনও এসে-ছিলেন?

তিনি। অনেকবার।

আমি। আচ্ছা ঐ দেশ কি তুলার চাষের জন্ম প্রসিদ্ধ?

তিনি। আজ্ঞে, কৈ তা ত জানি না, তবে ভাল দপ্তরী অনেক আছে বটে।

এমন সময় ট্রেণ আর একটী ষ্টেশনে থামিল। ইহা খুব বড় জংসন, চতুর্দ্দিকে রেল লাইন দেখিলাম। ইহার নাম, "হরিসেন জংসন।" এখানে কত কি বিক্রয় হইতেছে বলিবার নয়। থামিবামাত্র কেহ বলিয়া উঠিল, "এক পয়সা জোড়া বাবু পিত্তল এবং তাঁবা।" ইহার মধ্যে ঝাঁ করিয়া পাখীর মত একটী লোক ট্রেণে উঠিয়া বলিল, "বাবু, ইংলিস্ম্যান সারভেণ্ট।" আমি ভাবিলাম এ আবার কি নূতন কথা শুনি? চিরকালই ত বাঙ্গালীই সারভেণ্ট, ইংলিসম্যান মনিব। ইংলিশম্যান আবার সারভেণ্ট কবে হইল? আর একজন বলিল, "বাবু দুই পয়সায় হিন্দুস্থান।" আমি ত অবাক্। যে হিন্দুস্থানের জন্ম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, সেই হিন্দুস্থান কি না আজ দুই পয়সায় বিকাইতেছে! কালে সবই সম্ভব হয়। আমাদের ট্রেণের সামনে একটী লোককে দেখিলাম, একবার পূর্ব্বমুখ হইয়া দক্ষিণ হাত তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, আবার খানিক পরে উত্তর মুখ হইয়া বাঁহাত তুলিয়াদাঁড়াইতেছে। শুনিলাম ইহার হাত তোলা চাকরী। ইনি পাহারাওয়ালা সাহেব। সাহেব নাম শুনিলেই বাঙ্গালীর গা ছম্ ছম্ করে, বিশেষ আফিসের উপরওয়ালা সাহেব, পাহারা-ওয়ালা সাহেব, বিলেত ফেরত বাঙ্গালী সাহেব এবং বড়লোকের মোসাহেব।

যাহাহউক নানা রকম দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আবার ছাড়িয়া দিল। খানিক আসিয়া একটী মনোহর পুষ্করিণী দেখিলাম। নাম শুনিলাম, গোলদীঘি। কিন্তু ইহার কোনখানেও গোল দেখিলাম না। পূর্ব্বে এক যায়গায় লেখা দেখিয়াছিলাম যে, এই স্থানে সুলভে সোনার শাঁখা পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিলাম যে উহার সমস্তই সোনার, শাঁখের অংশ মোটেই নাই। বুঝিলাম এ প্রদেশে সোনাকে শাঁখ এবং চতুষ্কোণকে গোল বলে। এমন সময় সেই 'সনা ভদ্রলোকটী নামিয়া গেলেন।

ট্রেণ সেই ভাবেই চলিয়াছে। বৌবাজার নামক ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। এখানেও পূর্ব্বেকার মত খুব জনতা, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ইহারও চতুর্দ্দিকে লাইন গিয়াছে। ট্রেণ হইতে দেখিলাম পশ্চিম দক্ষিণ কোণে, "জারমণীন বাবুর জরের যম' নামক বাড়ী। অনেকের বাড়ীর নাম থাকে, "সুশীলাকুটীর, "আসমান কুটীর" "লিলি কটেজ," সুরেশ আশ্রম" ইত্যাদি, কিন্তু "জার-মণীন" বাবুর বাটীর নাম একটু অদ্ভুত রকমের।

এইবার ট্রেণ পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া চলিল। একটু বেশীক্ষণ চলিবার পর দাঁড়াইল। ইহাও আর একটী জংসন। ইহার নাম লালবাজার। আমার বড় দুঃখ যে এতদূর আসিলাম, কিন্তু একটিও পাহাড় বা টানেল দেখিলাম না। লোকের কাছে কি বলিয়া যে গল্প করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

ট্রেণ এইবার একটী "লেকের" ধারে আসিয়া পৌঁছিল। আমার ভারী আনন্দ। পাহাড় দেখি-লাম না, এইবার "লেক" দেখিব। ইহা নিশ্চয়ই চিল্কা, কলাইর, পলিকট, সম্বর বা পুষ্কর হইবেই হইবে। ট্রেণ থামিতে না থামিতেই আমি নামিব কি জিজ্ঞাসা করিব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু পূর্ব্বে নামিয়া ঠকিয়াছি বলিয়া, আগে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে নামিব ঠিক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। একটী ভদ্রলোক বলিলেন, "ইহা লেকও নয়, হ্রদও নয়, ইহার নাম লালদীঘি।" শুনিয়া আমার সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। ভাগ্যে নামি নাই। যাহা হউক ট্রেণ হইতেই লাল দীঘির জল দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ইহাতেও লালের সম্পর্ক নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম এখানকার আদিম নিবাসী সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারীর পুকুর ছিল এবং রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিলেন। সেই কারণ দোলযাত্রা উপলক্ষে ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ফাগ ফেলা হইত। এত ফাগ ফেলা হইত যে ঐ পুকুরের জল কিছুদিনের জন্য ফাগে লাল হইয়া থাকিত। সেই হইতে উহার নাম হইয়াছে 'লালদীঘি'। সম্মুখে একটী স্তম্ভ দেখিলাম, ভাবিলাম, উহা অশোক স্তম্ভ হইতে পারে। কিন্তু শুনিলাম, ইহা অশোক স্তম্ভ নহে 'শোক'স্তম্ভ। ইহার অনতিদূরে একটী ছোট ঘরে কতগুলি ইংরেজকে নবাবের লোক নাকি বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। ঘরটি অত্যন্ত ছোট থাকায় লোকের শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। সেই কারণ ঐ স্তম্ভটি চিহ্ন স্বরূপ রাখা হইয়াছে। এখানে কোনও চটি বা সরাই নাই, কেবল বুট ও ভাড়াই, কারণ চতুর্দ্দিকে কেরাণীর মন্দির দেখিলাম।

ট্রেণ আবার দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিল। পশ্চিমদিকে একটী পর্ব্বতচূড়ায় একটী অতি আশ্চর্য্য ঘড়ি রহিয়াছে, উহার একধারে রেলওয়ে ও অপর ধারে সহর। এইবার ট্রেণ পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব্ব উত্তর করিয়া আঁকিতে বাঁকিতে একটি টারমিনাস ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহা হাইকোর্ট; এইখানে সমস্ত আরোহী নামিলেন, কেবল আমি নামিলাম না দেখিয়া গার্ড আমায় জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কোথা যাইবেন?" আমি আমার গন্তব্যস্থানের কথা বলিতে তিনি বলিলেন, "আপনি ভুল আসিয়াছেন, এ ট্রেণ আর যাইবে না।" আমি প্রমাদ গণিলাম। অগত্যা নামিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কোন দিকে ঐ স্থানে যাইব।" তিনি বলিলেন, পূর্ব্ব-ধরে খানিক যাইলেই একটী ষ্টেশন পাইবেন এবং সেখান হইতে আপনার গন্তব্য স্থানে যাইতে পারি-বেন।

ইহা শুনিয়া আমার মন বড় ক্ষুণ্ণ হইল। মনে করি-লাম আমি কি ঝকমারি করিয়া না জানিয়া শুনিয়া একলা

আসিলাম। বন্ধু বান্ধব সঙ্গী করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা অনেক দূরে দূরে ও বড় বড় যায়গায় যাইবে বলিয়া আমার সহিত মিলিল না। কেহ বলিয়াছিল আমি বন হুগলি যাইব। কেহ বলিয়াছিল আমি বাঘমারি যাইব। কেহ বলিয়াছিল আমি এবার পশ্চিমে অনেক দূর যাইব মনে করিয়াছি, হয় সালকিয়া কিংবা ঘুসুরি। কাযে কাযেই আমি একলা আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যাহা হউক যখন বাহির হইয়াছি তখন ক্ষুণ্ণ হইলে চলিবে কেন।

যখন নামিতেই হইল, তখন এই দেশটি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া যাই, যদি গল্প করিবার বা মাসিকে কিছু লিখিবার পাই। এস্থানের রাস্তাঘাট কি চমৎকার! দুইধারে বড় বড় গাছ, এবং মাঝখান দিয়া রাস্তা গিয়াছে। মধ্যে লর্ড নর্থব্রূকের একটী প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বাটি, শুনিলাম উহা বাঙ্গালার উচ্চ আদালত। দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় উহার ভিতর যাইবার জন্ত অগ্রসর হইলাম। তখন উহা পূজায় বন্ধ ছিল, সুতরাং ভিতরে যাইতে পারিলাম না। বাহির হইতে যতটা পারি দেখিতে লাগিলাম। উহার দেওয়াল ও থামে কি চমৎকার শিল্পকার্য্য। প্রত্যেক থামের মাথায় এক একটি করিয়া কি সুন্দর মনুষ্যের জন্তর ও পাখীর মূর্ত্তি। কত প্রকার কারুকার্য্য তাহা লিখিয়া কি জানাইব। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে পুরীর মন্দিরে বা তাজমহলে এই প্রকার শিল্প আছে কি না সন্দেহ।

ক্রমে একটি রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। দেখি কোথাও লেখা রহিয়াছে, অমুক উকিল, অমুক সলিসিটর, অমুক নোটারী পাবলিক, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুসন্ধানে জানিলাম উহা উকিল পাড়া। এই সমস্ত বাড়ীতে উকিলে এবং মকেলে বড় প্রেম হয়, যে প্রেমে কোকিলের বদলে ঘুঘু ডাকে এবং ফুলের মধ্যে সর্ষে ফুল ফোটে। দক্ষিণ দিকে একটি ছোট পাহাড়ের চূড়া ও ঝরণা রহিয়াছে এবং কত গ্রাম্য পশু উহার জলপান করিতেছে। উহারই সন্নিকটে একটি বৃহৎ নদী দেখিলাম। এখানে গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক, সুইমিং বাথ এবং প্রেসিডেন্সি ব্যাটেলিয়ন রেজিমেণ্টের হেডকোয়াটার। একটী চমৎকার বাগান দেখিলাম। ভিতর দেখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু আমার অল্প সময় বলিয়া যাওয়া হইল না। সুখরাম লক্ষ্মীনারায়ণ বংশীধর মাড়োয়ারী বাবুর ধর্ম্মশালা দেখিলাম। মাড়োয়ারী বাবুদের এই সৎকার্য্যগুলি যে কি চমৎকার তাহা যিনি সপরিবারে ঝড় বৃষ্টিতে গভীর রাত্রে বা দারুণ শীতে বিদেশে যাইয়া এই প্রকার ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় পাইয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন কেহ জানিতে পারেন না। ভারতবর্ষে যতগুলি ধর্ম্মশালা আছে সব গুলি প্রায় মাড়োয়ারী বাবুরা করিয়াছেন। বড় দুঃখের বিষয় যে হরিদ্বারে গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের একটী ধর্ম্মশালা ব্যতীত, বাঙ্গালী বাবুদের এই সৎকার্য্যটী করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। আমাদের ভিতরে অনেক ধনী লোক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এই সৎকার্য্যটী করিতে পারেন। তাঁহারা অধর্ম্মপত্নীর জন্ত ভূরি ভূরি টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সৎকার্য্যে এক মুঠা চাউল দিতে হইলে কুকুর ঠেকাইয়া দেন।

এইবার গার্ড কথিত ষ্টেশনে যাইবার জন্ত আমি বরাবর পূর্ব্বধারে যাইতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইবার পর একটী প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। সম্মুখে একটী ছোট পাহাড়, দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায় সেইদিকে যাইতে লাগিলাম।

ক্রমেই চড়াই আরম্ভ হইল। খানিক যাইয়া আর উঠিতে পারিলাম না, আমাকে যেন নীচের দিকে ঠেলিতে লাগিল। কি করি তবু চলিতে লাগিলাম। বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার অনেক কষ্টে সেই পাহাড়ে উঠিলাম। একটু বিশ্রামের পর সেখান হইতে চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। উত্তর ও পূর্ব্বধারে বড় বড় বাড়ী ও পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পশ্চিমধারে দেখিলাম একটী বৃহৎ নদীর উপর বড় বড় জাহাজের মাস্তুল খাড়া হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ ধারে পুরী সমুদ্র কিনারার ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের মাস্তুলের চূড়া দেখা যাইতেছে। দেখিয়া যে কি আনন্দ হইল তাহা লিখিবার নয়। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে বেলা

বাড়িতে লাগিল। বেশী বেলায় পাহাড়ে থাকা যুক্তি-সঙ্গত নয় ভাবিয়া নামিতে আরম্ভ করিলাম।

ক্রমে উৎরাই আরম্ভ হইল। দূরে সবুজবর্ণ কি চমৎকার সমতল ক্ষেত্র! এ যে কি সুন্দর তাহা ফুটবল খেলোয়াড় ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে উৎরাই শেষ হইয়া আমি রাস্তায় আসিলাম। এখানে আসিয়া এবার কাৎরাই আরম্ভ হইল। তাহার কারণ মোটর নামক এক প্রকার গাড়ীর জ্বালায় অগ্রসর হইবার যোটী নাই। যেমন অগ্রসর হই অমনি এই প্রকার গাড়ী হইতে রামসিঙ্গা বাজিয়া উঠে। কাযেই আবার কাৎরাই। আবার যেই অগ্রসর হইতে যাই, অমনি কত প্রকার জীবজন্তুর ডাকের জ্বালায় আমাকে কেবল "কাৎরাই" হইয়া যাইতে হয়। অনেকে পাহাড়ে চড়াই ও উৎরাই চলাফেরা করিয়াছেন, আমাকে কিন্তু চড়াই উৎরাই এবং কাৎরাই এই তিন প্রকার চলাফেরা করিতে হইল। আজকাল এই প্রকার গাড়ীর জন্য গরীবের চলাফেরা বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। আরও মজা এই যে, এই গাড়ীর কোন কোন চালকেরা রাস্তার লোকদিগকে বোধ হয় কীট পতঙ্গের মত ভাবেন, কিন্তু অনেকে নিজেদের পিছন দেখেন না যে, সেখান হইতে কত ধোঁয়া বাহির হইতেছে। আমিও উঁহাদের এই কার্য্যের জ্বালায় কাৎরাই করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

খুব বড় ষ্টেশন। এরকম আর একটীও দেখি নাই। মাঝখানে মস্ত ওয়েটীং রুম। চারিদিকেই লাইন। ভাবিলাম এইস্থান মোগলসরাই, এলাহাবাদ কিংবা দিল্লী হইবে। কিন্তু পরে শুনিলাম উঁহার নাম ধর্ম্মতলা। কিন্তু ধর্ম্মেরত কিছুই দেখিলাম না।

এবারে বেশ জানিয়া ট্রেণে উঠিলাম। ট্রেণে অতিশয় ভিড়। কষ্টেসৃষ্টে একখানি বেঞ্চে বসিলাম। সময় হইতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে চলিবার পর ট্রেণ নক্ষত্রের মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। কোনও ধারে কিছুই দেখা যায় না। বুঝিলাম এখানি ট্রেণের মধ্যে পুরুষ, তাই এত জোরে যাইতেছে। গাড়ীতে অনেক সঙ্গী মিলিল। মনে একটু ভরসা পাইলাম। তাহাদের অনেকের নিকট কালকোঠার বিষয় জ্ঞাত হইলাম।

ট্রেণ একস্থানে থামিল, শুনিলাম এই স্থানের নাম ভবানীপুর। এই জায়গার বিষয় আমার বলা বাহুল্য। পাঠক পাঠিকা যদি এই স্থানের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া ষষ্ঠ বর্ষ কার্ত্তিক সংখ্যা "ভারতবর্ষে" ৺মনোজমোহন বসু বি-এল মহাশয়ের ভূ-পর্য্যটন পড়িবেন। বোধ হয় গাড়ীর গার্ড, ড্রাইভার, ইঞ্জিন ইত্যাদি বদলাইবার জন্য এস্থানে কিছুক্ষণ বিলম্বের পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এইবার ট্রেণ একেবারে কালিকোঠা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। পৌঁছিবামাত্র যাত্রীরা "কালীমায়ীকি জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

কাপালিকের ন্যায় কপালে সিন্দুর দিয়া কতকগুলি লোক গাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইল, এবং যাত্রী নামিবামাত্র "আমার বাড়ী আসুন, খুব ভাল ঘর দিব," ইত্যাদি বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল।

পিছনে আর না চাহিয়া, পশ্চিমদিকে বরাবর খুব দ্রুত চলিলাম। অনেক দূর যাইবার পর হঠাৎ ঘণ্টার আওয়াজে চমক ভাঙ্গিতেই দেখি, সম্মুখে প্রকাণ্ড মন্দির।

প্রথমে একটী বাসার সন্ধান লইয়া, পরে মন্দিরে যাইব স্থির করিয়া চলিলাম। কিছুদূরে একটী নদীর সন্নিকটে সুবিধামত একটী বাসা পাইয়া সেইখানেই থাকা স্থির করিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমার জিনিষপত্র যথা স্থানে রাখিয়া পূর্ব্বকথিত নদীতে স্নান করিতে গেলাম। সেখানে অনেক লোক স্নান করিতেছে। নদীটির নাম শুনলাম, 'আদি গঙ্গা।' শুনিয়া আমার মনে পড়িল ইহা মনোজমোহন বাবুর সেই দৈনিক-আবিষ্কৃত—Ah! the Ganga.

আমি স্নান কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া, পরে মাকে দর্শন করিবার উদ্দেশে চলিলাম। বাসার অধিকারী আমাকে অভিভাবক-শূন্য দেখিয়া আমার

সহিত লোক দিতে চাহিলেন। আমি রাজি হইলাম না, একাই চলিলাম। বরাবর পূর্ব্বধারে কিয়দ্দূর গিয়া আর পারিলাম না। উঃ কি ভয়ানক ভিড়। অনেক কষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া আরও খানিক গিয়া একটা সঙ্কীর্ণ স্থানে আসিয়া মনে হইল আর যাইতে পারিব না, ফিরিয়া যাই। কিন্তু ফিরিবারও উপায় নাই, অগত্যা চলিতে লাগিলাম। এইবার একটা ফাঁকা যায়গায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দেখিলাম সম্মুখে নাট মন্দির। উত্তরে মার মন্দির এবং দক্ষিণে মহাপ্রসাদ করিবার যন্ত্র। নাটমন্দির ও মার মন্দিরের মাঝখানে একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথ। এই স্থান হইতেই মার চরণ দর্শন মানসে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সে স্থানে এত জনতা যে প্রবেশ করিতে পাইলাম না। কাযেই পার্শ্বের একটা সিঁড়ি দিয়া একেবারে মন্দিরের দরজার নিকট পঁহুছিলাম।

এখানেও জনতা বিশেষ অল্প নহে। প্রবেশ করিতে যাইতেছি এমন সময় একটা পিশাচ প্রকাণ্ড একটা হাত বাহির করিয়া বলিল, "দর্শনী দাও।" আমি বলিলাম, "দর্শনী আবার কি?" তাহাতে সে চোখ মুখ কপালে তুলিয়া পাওনাদারের মত বলিল, "পয়সা পয়সা।" আমি আর তর্ক না করিয়া সেই মত কার্য্য করিলাম এবং ভাবিলাম, এখানেও পয়সা পয়সা! আমি একেবারে মন্দিরের গহ্বরে নামিয়া মায়ের চরণের নিকটে আসিলাম এবং মায়ের প্রকাণ্ড কালীমূর্ত্তি দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলাম।

পিশাচেরা আর আমাকে সেখানে থাকিতে দিল না। অগত্যা আমাকে অন্তদ্বার দিয়া মনের দুঃখে ফিরিয়া আসিতে হইল। ভাবিলাম, মাকে দেখিলাম বটে, কিন্তু মার চরণ ত দেখিতে পারিলাম না। চরণ বোধ হয় কোন ভাগ্যবানের কাছে "লিজ" দেওয়া আছে। কিন্তু পিশাচেরা লোককে বলিতেছে যে, "দর্শনী দাও এবং মায়ের চরণ দর্শন কর।" তাহারা চরণের খবর রাখে না, কেবল পয়সার খবরই রাখে।

মন্দির হইতে বাহির হইতেই দেখি কতকগুলি পিশাচ পিশাচী সকলেই বলে "পয়সা দাও।" আরও দেখিলাম এখানে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কিছু সস্তা, জাতি বা বর্ণের কোন বিচার নাই। সকলেই যাত্রীর গলায় মালা দিতেছে। এমন কি পুরুষ পুরুষকেও দিতেছে, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকেও দিতেছে। কি উড়ে, কি খাজড়, কি বাঙ্গালী, কি খোট্টা যাহাকে পাইতেছে তাহারই সঙ্গে মালা বদল হইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ খোরাকার দরুণ হাত পাতিতেছে। এক একটি লোক যে কত গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমায় অনেকেই ঐ প্রকারে বিবাহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ভাগ্যে আমার নিকট বেহালা ছিল না, নহিলে উহারা আমাকে নীলকমল করিয়া ছাড়িয়া দিত। আমি বিবাহ করিব না এই স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া সকলে আমাকে ত্যাগ করিল।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আমি যখন সর্ব্ব প্রথম মন্দিরে যাই, তখন আমার সঙ্গে একটি দুর্ব্বাসা প্রকৃতির লোক যাইতেছিলেন। জনতার তাঁহার গায়ে যাহারই গা ঠেকিয়াছে তখনই তিনি তাহাকে ধাক্কা দিয়াছেন কিংবা মারিয়াছেন। এই রকমে যে তিনি কত লোককে মারিয়াছেন বলা যায় না। তার পর যখন তিনি নাট মন্দিরের নিকট মুদ্রিত নয়নে মাকে প্রণাম করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে সেই সময় একটি প্রকাণ্ড ষাঁড় যাইতে যাইতে তাঁহাকে এমন ধাক্কা দিয়া গেল যে তিনি একেবারে ভূতলশায়ী হইলেন। একে দুর্ব্বাসা তাহাতে ভূতলশায়ী—তিনি রাগে অন্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, কোনও মানুষ মনে করিয়া উহাকে একেবারে খুন করিবার অভিপ্রায়ে যেই অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি সেই ষাঁড় মহাশয় একবার তাঁহার যুগল শিং নাড়া দিতেই, দুর্ব্বাসা যথা স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার রাগ চাপিতে না পারিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে কালীমাতার উদ্দেশে 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "মা তুমি সুপারি খাও, দেশী কুমড়া খাও, আখ খাও, পাঁঠা খাও, মহিষ খাও, কিন্তু মা, তুমি যাঁড়ের কিছুই করিতে পারনা এই বড়ই দুঃখ।"

মন্দিরের দেখা শুনা করিয়া অন্ত দ্বার দিয়া ফিরিলাম, এবং মার শরীর রক্ষকের চরণ দর্শন মানসে বরাবর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে কাঙ্গালীরা বড়ই বিরক্ত করিতেছিল। দূর হইতে বম্ বম্ শব্দ শুনিতে পাইয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম, কত জটাধারী সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার দ্বারে পড়িয়া আছেন। সম্মুখে ধুনী জ্বলিতেছে। এখানে তিনি নকুলেশ ভৈরব নামে অভিহিত। তাঁহার চরণ দর্শন ও স্পর্শন ইত্যাদি কার্য্য শেষ করিয়া তখনকার মত বাসায় ফিরিলাম।

আহার ও বিশ্রামাদির পর এই দেশটি দেখিবার জন্ত বাহির হইলাম। দক্ষিণদিকে বরাবর যাইতে যাইতে একটা শ্মশানে আসিয়া পড়িলাম। অতি চমৎকার শ্মশান! এমন কখনও দেখি নাই। আহা কি দৃশ্ত! অশ্রুজলে কেহ পুত্রকে ডাকিতেছে, কেহ পিতাকে ডাকিতেছে, কেহবা মাকে ডাকিতেছে। কোথাও জমিদার বাবুদের ছেঁড়া নেকড়া রহিয়াছে, কোথাও সুদখোর দর ভাগা কলসী। কোন চিতায় ঘুসখোরেরা অর্দ্ধদগ্ধ, আবার কোন চিতায় বা ধার্ম্মিকেরা সবে পুড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

যাহারা বিশ্বাসঘাতক এবং যাহারা পুত্রের বিবাহে কন্তার পিতার প্রতি কসাইয়ের ন্তায় ব্যবহার করে তাহাদের চিতা নাকি অন্ত স্থানে হইবে, কেন না তাহারা অনেক জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া যাইবে।

এই শ্মশানটির পশ্চিম দিকে সেই নদী। চতুর্দ্দিকেই পাকা প্রাচীর ও মধ্যে শবদাহের প্রকাণ্ড স্থান। এক ধারে শ্মশানরাজের মন্দির। এই রকম স্থানে ঘটনাচক্রে রাজা হরিশ্চন্দ্র চাকুরী করিয়াছিলেন। শুনিলাম অনেক দেশ দেশান্তর হইতে এখানে শব দাহ করিতে আসে। ইহা কেওড়াতলার শ্মশান নামে বিখ্যাত। আমি শ্মশান হইতে বাহির হইয়া, যেখানে স্নান করিয়াছিলাম সেই ঘাটে আসিলাম। একটী ভদ্রলোক সেখানে বসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় শুনিলাম, এই স্থানের নাম পূর্ব্বে কালীকোঠা ছিল, এক্ষণে কালীঘাট নামে বিখ্যাত।

অদূরে একটী সেতু দেখিতে পাইলাম এবং ওপারে হয়ত 'ব্যাস কালীঘাট' আছে বিবেচনা করিয়া আবার অনুসন্ধানে চলিলাম। উহার নিকট দিয়া একটি রেল লাইন রহিয়াছে, শুনিলাম উহা আলিপুরের দিকে গিয়াছে। তবে কি আমি দিল্লীর নিকট আসিয়াছি? কেন না আমি শুনিয়াছিলাম যে দিল্লীর দশ মাইল দূরে আলিপুর অবস্থিত, যেখানে সার হেন্‌রী বার্ণার বিদ্রোহীদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়াছিলেন। কিন্তু না, উহা সে আলিপুর নয়। উহা চব্বিশ পরগনা আলিপুর। নবাব সিরাজউদ্দৌলার নগর পাল এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া উহার নাম আলিপুর হইয়াছে। এখানে হরিশ চন্দ্রের ঘাট দেখিলাম না, তবে নিকটে হরিশ মুখুজ্যের রোড আছে।

সেতুর উপরে যাইয়া কালীঘাটের দিকে দেখিলাম অর্দ্ধচন্দ্রের মত দেখায় কি না। কিন্তু তখন একটু একটু করিয়া সন্ধ্যাদেবীর আগমনে উহা কৃষ্ণচন্দ্রের মত দেখা গিয়াছিল। আমি সেতুটী পার হইয়া আলিপুরের দিকে যাইতে লাগিলাম। কিছুদূরে দেখিলাম সরকার বাহাদুরের একটী অন্নসত্র রহিয়াছে, এখানে প্রত্যহ বিস্তর লোককে অন্নদান করা হয়। কিন্তু বাজে লোক এখানে অন্ন পায় না। অনুসন্ধানে আরও জানিলাম যে, এখানে ব্যাস কালীঘাট নাই, চেতলা, বেহালা, খিদিরপুর ইত্যাদি অনেক গ্রাম আছে। শুনিলাম কিছুদূরে খিদিরপুরে সেতু বন্ধ আছে কিন্তু রামেশ্বরের কথা কেহ বলিতে পারিল না।

আমি আর অগ্রসর না হইয়া ফিরিলাম। কারণ এখানে মা কালীর আরতি নাকি অতি চমৎকার। তাই দেখিবার ইচ্ছায় একেবারে মন্দিরের ভিতরে আসিলাম। তখন প্রায় আরতি হইবার উপক্রম হইতেছিল। যদিও রাত্রি কিন্তু জনতাও বিশেষ কম নয়। এইবার আরতি আরম্ভ হইল।

অনেকে না দেখিয়া শুনিয়া, থাকেন যে, কাশীধাম

বাবা বিশ্বনাথের আরতি অতি চমৎকার, কিন্তু এখানেও যাহা দেখিলাম তাহাও অতি চমৎকার না বলিয়া থাকা যায় না। আমার মনে হয় দেবদেবীর আরতি সকল স্থানেই চমৎকার।

আরতি ভাঙ্গিবার পর বাসায় আসিয়া ভাবিলাম, এখানে একলা থাকি কি প্রকারে? একে বিদেশ, তাহাতে রাত্রি কাল; আমি কখনও বিদেশে থাকি নাই কাযেই আমি মনস্থ করিলাম যে আজই শেষ ট্রেণে স্বদেশেফিরিয়া যাইব। এই স্থির করিয়া বাসার পাওনা গণ্ডা চুকাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

যথাসময়ে যথাস্থানে আসিয়া একখানি চলন্ত ট্রেণকে থামাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া একেবারে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প আছে, যদি বাঁচিয়া থাকি তবে পাঠক পাঠিকাকে "আর্য্যাবর্ত্ত" ভ্রমণ শুনাইব।

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ পালিত।

লাহোর

সন্ধ্যার পরেই বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। পৌষ মাস। লাহোরে প্রবল শীত সম্বন্ধে নানা ভীতিজনক গল্প শুনিয়াছিলাম। কলিকাতায় যেখানে যাহা কিছু গরম বস্ত্র পাওয়া যায় কয়দিন ধরিয়া তাহাই সংগ্রহ করা হইতেছিল। দুইটি গায়ের লেপ লইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর 'হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকান হইতে প্রকৃত স্বদেশী পট্টু কিনিয়া পোষাক করাইলাম। এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম।

যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। জানালার কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলাম, ঘন কুয়াসা ধরার বক্ষের উপর শুভ্র আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। প্রায় পূর্ণ চন্দ্রের আলোকে কুয়াসা উদ্ভাসিত। আর কিছুই দেখা যায় না। কচিৎ সমীপস্থ দুই একটা আলোক বিন্দু শোভা পাইতেছিল। আমরা শুইয়া পড়িলাম। প্রথমটা তেমন শীত করে নাই। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর গাড়ী যখন মধুপুরের নিকট ছোট নাগপুরের পর্ব্বত পথে ছুটিতে লাগিল, তখন শীতের প্রকোপ বেশ অনুভব করিলাম।

প্রভাত হইল। নবোদিত সূর্য্যের মৃদু কিরণ গুলি সরিষার ক্ষেত্রের উপর বিশ্রাম করিতেছিল। বৃক্ষের দীর্ঘ ছায়াপাতে সবগুলি আলো ও ছায়ায় বিচিত্র বেশে সাজিয়া উঠিয়াছিল। মাঠের মধ্যে দুই একটি মলিন বস্ত্র পরিহিত কৃষক এবং কদাচিৎ কোন কৃষক রমণী দেখা যাইতেছিল। মাঝে মাঝে গ্রামগুলির ঠিক পাশ দিয়া ট্রেণ ছুটিয়া চলিল,—খোলা দিয়া ছাওয়া ঘনবিন্যস্ত কুটীর প্রাঙ্গণে ছেলেরা খেলা করিতেছে, পুরুষেরা খাটিয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিতেছে। গ্রামের ধারেই বৃক্ষপুঞ্জ। চারিদিকে শস্যক্ষেত্র—স্থানে স্থানে অড়হরের দীর্ঘ গাছগুলি শোভা পাইতেছে।

ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই পাটনা পার হইয়াছিলাম। পুলের উপর হইতে শোণের বিস্তীর্ণ নদ সৈকত ও ক্ষীণ জলধারা দেখিতে পাইলাম। প্রত্যূষে আরা ও বক্সার পার হইলাম। গাড়ী যথাসময়ে মোগলসরাই ষ্টেশনে দাঁড়াইল। এখানে আউধ্ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ের ডাক গাড়ীতে উঠিলাম। এই গাড়ী বরাবর লাহোর পর্য্যন্ত যাইবে।

গাড়ী ছাড়িল। একটু পরে আমরা গঙ্গার পুলের উপর আসিলাম। এখান হইতে কাশীর মনোহর দৃশ্য দেখিলাম। উত্তরবাহিনী গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত হইয়াছেন, শীতাগমে জলধারা ক্ষীণকায়। তীরে অবিচ্ছিন্ন সোপান শ্রেণী, কত দেবালয়ের চূড়া,

কত গৃহ, কত প্রাসাদ প্রভাত-সূর্য্য কিরণে শোভা পাইতেছিল। ঘাটে অসংখ্য নর নারী স্নান করিতেছে। ট্রেণের সকল যাত্রী নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া ছিল। সে দৃশ্য দেখিলে হৃদয় আপনা হইতে ভক্তি-পরিপ্লুত হয়।

কাশী ও বেনারস কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে অনেক যাত্রী নামিয়া গেল। গাড়ী আবার চলিল। ডাকগাড়ী, সব ষ্টেশনে থামে না। ১॥० ঘণ্টা ২ ঘণ্টা ছুটিয়া বড় বড় ষ্টেশনে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। সূর্য্যের তেজ বাড়িতে লাগিল। প্রচুর পরিমাণে ধূলি উড়িতেছিল। দুই পাশে প্রান্তর, কোথাও চাষ হইয়াছে। কচিৎ এক আধটি অর্দ্ধবিশুষ্ক জলাশয় দেখা যাইতেছে। রাখাল বালকেরা আম্রকাননে গরু ছাড়িয়া দিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের ট্রেণের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহাদের মাথায় মলিন পাগড়ি, পরিধানে অপর্য্যাপ্ত মলিন বস্ত্র, হাতে দীর্ঘ লাঠি। পথে কখনও পথিক দেখা যাইতেছিল,—দীর্ঘকায়, হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি, জামা পাগড়ী সকলই ধূলিমলিন; পায়ে নাগরা জুতা, কাঁধের উপর রক্ষিত দীর্ঘ যষ্টির প্রান্তে পুঁটুলি। হয়ত কোন স্ত্রীলোক সঙ্গে যাইতেছে। কোথায় ইহাদের বাড়ী? কি কার্য্যে যাইতেছে? আমাদের অজ্ঞাতসারে কত সুখ দুঃখ হাসি কান্নার মধ্য দিয় ইহাদের আড়ম্বরহীন জীবন প্রবাহিত হইয়াছে।

প্রতাপগড়, রায় বেরেলি পার হইলাম। বেলা তিনটার সময় গাড়ী লক্ষ্ণৌয়ের নিকট আসিল। ঘাগরা ও ওড়না পরিহিত দুই চারিটি স্ত্রীলোক মাঠের উপরে দেখা গেল। লক্ষ্ণৌ বড় ষ্টেশন, গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। ষ্টেশনে ফল, মাটির খেলনা, বই প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছিল। লক্ষ্ণৌয়ের পর শাণ্ডিলা। ষ্টেশন হইতে দেখা যাইতেছিল, অনেকগুলি দেবালয়ের চূড়ার উপর অপরাহ্ণের সূর্য্য কিরণ পড়িয়াছে। শাণ্ডিলা ষ্টেশনের নিকটে নৈমিষারণ্য তীর্থ।

অপরাহ্ণের শীতল সমীরণে আমাদের ক্লান্ত শরীর জুড়াইল। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। আলোক মিলাইয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ছাইয়া-ফেলিল। আলো জ্বালিয়া আমরা গাড়ীর জানালা তুলিয়া দিলাম।

রাত্রে শীতে কষ্ট হইতেছিল। সকালে উঠিয়া দেখিলাম, দয়া করিয়া কে গাড়ীর একটা জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই এত শীত। ভোরবেলা আম্বালা ষ্টেশন পার হইলাম। এই বার পাঞ্জাব প্রদেশ।

ক্রমে আলোক আরও পরিষ্কার হইল। সূর্য্যের দুই চারিটি রশ্মি পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িল। ভূমি খুব উর্ব্বরা। বেশ শস্য হইয়াছে। গাছপালাও বেশী—অনেকটা বাঙ্গালা দেশের মত। কেবল মাটির রং বেশী সাদা।

লুধিয়ানা পার হইলাম। তাহার পরেই শতদ্রু নদ (বর্ত্তমান শাতলেজ্)। জলন্ধর পার হইয়া বিপাশা নদী (বর্ত্তমান বিয়াস্)। দুইটি নদীই বেশ বড়।

মাঠের উপর দুই চারিজন কৃষক দেখা যাইতেছিল। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, পায়ে জুতা, গায়ে কম্বল। পাঞ্জাবের গ্রামগুলি দেখিতে নূতন রকমের। কুটীরগুলি খড় বা খোলা দিয়া ছাওয়া নহে, পাকাঘরের মত সমতল ছাদ। দেওয়াল, ছাদ, সবই মাটির। ঘরগুলি মাটির ঢিবির মত দেখায়। গ্রীষ্মকালে ছাদের উপর শুইতে হয় বলিয়া এই ভাবে তৈয়ার করে। গ্রামের চারিদিকে একটা প্রাচীর থাকে। প্রাচীরের ফটকের উপর অল্পবিস্তর কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতীত ইতিহাসে পাঞ্জাবের উপর দিয়া এত রাষ্ট্রবিপ্লব চলিয়া গিয়াছে যে, এই প্রাচীর, গ্রামবাসিদিগের আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য্য ছিল।

বেলা ১১টার সময় গাড়ী অমৃতসহর পৌছিল এবং তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমাদের সুদীর্ঘ ভ্রমণের অবসান করিয়া লাহোর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। জানালার মধ্যে দিয়া দেখিলাম, আমার মান্দ্রাজী বন্ধু শ্রীযুক্ত কুম্ভকোণম্ বেঙ্কটেশ্বর আয়ার তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় বালক শ্রীমান পটাভিরমণকে সঙ্গে করিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত।

লাহোরের প্রধান দেখিবার স্থান জাহাঙ্গীরের সমাধি।

সহর হইতে তিন মাইল দূরে রাবী (প্রাচীন ইরাবতী) নদীর পরপারেই নূরজাহান এই সমাধিভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মর্ম্মরখচিত লাল পাথরের প্রকাণ্ড সমাধি ভবনে সেই গর্ব্বিত সুখান্বেষী সম্রাটের দেহ শায়িত রহিয়াছে। হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরমণ্ডিত। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে এক বিস্তৃত ছাদের উপর উপস্থিত হওয়া যায়। তাহার চারি কোণে চারিটি গম্বুজের উপরে উঠিলে চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। রাবী নদীর বক্রগতি লাহোরের দুর্গ, প্রকাণ্ড বাদশাহী মসজিদ এবং অগণিত সৌধমালা-সমাকুল লাহোর নগর এখান হইতে বেশ দেখা যায়। সমাধি ভবনের সম্মুখে পরিষ্কার বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। এই ভূমিখণ্ডের পশ্চমে সমাধি-সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড সরাই আছে। এক্ষণে তাহার ব্যবহার হয় না।

জাহাঙ্গীরের সমাধির পশ্চিমে আর একটা বৃহৎ সমাধির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহা নূরজাহানের ভ্রাতা উজীর আসফজার সমাধি। এই সমাধির নিকটে রেলওয়ে লাইনের অপর পার্শ্বে নূরজাহানের সমাধি। এই সমাধি ভবনে পাশাপাশি নূরজাহান এবং তাঁহার প্রথম পক্ষের কন্যা লাডলি বেগম শয়ন করিয়া আছেন। সমাধি ভবন অতিশয় ক্ষুদ্র। নূরজাহান নাকি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমাধির উপর আলো বা ফুল রাখা না হয়। কালক্রমে সমাধিভবন ভাঙ্গিয়া যায় এবং গোশালা রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সম্প্রতি সরকার বাহাদুরের উদ্যোগে এবং বর্দ্ধমানের মহারাজের সাহায্যে (তিনি ৫০০০৲ চাঁদা দিয়াছিলেন) এই সমাধি ভবনের সংস্কার হইয়াছে। মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠটি মর্ম্মর মণ্ডিত করা হইয়াছে।

লাহোর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে শালেমার বাগান। শাহজাহান এই বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম একটা বাগান আর কি দেখিব? কিন্তু দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইল। বাগানের মধ্য দিয়া পথ, পথের ধারে ফোয়ারার সারি। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, প্রায় ২০ ফুট নিম্নে একটি সুন্দর জলাশয় শোভা পাইতেছে। জলাশয়ের মধ্যে নানাস্থানে ফোয়ারা; জলাশয়ের উপর একটি সেতু, সেতুর মধ্য ভাগে বসিবার স্থান; জলাশয়ের পাশে স্নানাগার, উদ্যান সকলই মর্ম্মর নির্ম্মিত। এই জলাশয়ের পাশ দিয়া অগ্রসর হইলে আবার পনেরো বিশ ফুট নীচে আর একটি বৃক্ষ লতা শোভিত পরম রমণীয় উদ্যান দেখা যায়। সমস্ত জিনিষটা এমন এক অপ্রত্যাশিত আনন্দের সৃষ্টি করে যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না।

লাহোরের উত্তর প্রান্তে দুর্গ। বাহির হইতে দুর্গের প্রকাণ্ড স্তম্ভ, ফটক, উচ্চ প্রাচীর বিস্ময়জনক দেখায়। কিন্তু দুর্গ মধ্যে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। এই দুর্গের পশ্চিমে বিখ্যাত বাদশাহী মসজিদ। আওরঙ্গজেব এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা লোহিত প্রস্তরে গঠিত; লাল পাথরের উপর মার্ব্বেল পাথরে খচিত লতাফুল প্রভৃতি বেশ সুন্দর দেখায়। মসজিদের আকার অতীব বৃহৎ; উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিশাল প্রাঙ্গণ, চারিদিকে চারিটি উচ্চ গম্বুজ। দুর্গ ও মসজিদের মধ্য ভাগে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান; উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর নির্ম্মিত অনুপম শিল্পকার্য্য সমলঙ্কৃত ক্ষুদ্র দরবার গৃহ। রণজিৎ সিংহ নাকি এখানে দরবার করিতেন। এই দরবার গৃহের নিকটে রণজিৎ সিংহের সমাধি। সমাধিভবন অনেকগুলি হিন্দু দেবদেবীর চিত্রের দ্বারা সুশোভিত।

লাহোর সেক্রেটেরিয়েট আফিসের পাশে আনারকলির সমাধি গৃহ বর্ত্তমান। আনার কলি শব্দের অর্থ দাড়িম ফুলের কুঁড়ি। যাহার এই কবিত্বপূর্ণ নাম, সে আকবরের একজন ক্রীতদাসী ছিল। নৃত্যকালে রাজকুমার সেলিমকে হাসিতে দেখিয়া সে হাসিয়াছিল, এই অপরাধে আকবর তাহার জীবন্ত সমাধ দেন। আকবর নাকি খুব মহৎ লোক ছিলেন। জাহাঙ্গীর সেই সমাধির উপর এক উচ্চ গম্বুজযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং কবরের উপর পারস্যভাষায় যে কবিতা লিখিয়া দেন তাহার অনুবাদ এইরূপ,—

"আমার প্রিয়ার মুখ যদি আর একবার দেখিতে

পাইতাম, হে ভগবান, তাহা হইলে পৃথিবীর শেষদিন পর্য্যন্ত তোমাকে ধন্যবাদ দিতাম।"

কবরের মর্ম্মর নির্ম্মিত আচ্ছাদনের উপর অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের নিদর্শন বর্ত্তমান। ইংরাজ অধিকারের পর এই সমাধিভবন কিছু দিন গির্জ্জাঘর রূপে এবং এক্ষণে Secretariat-এর Record Room রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কবরটী খুঁড়িয়া গৃহমধ্যে এক পাশে রাখা হইয়াছে। সহরের এই পাড়ার নাম আনারকলি।

লাহোরের সর্ব্বাপেক্ষা নূতন জিনিষ দেখিলাম —লাহোর সহর। সহরের চারিদিকে উচ্চপ্রাচীর এখন স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্ম কয়েকটী প্রকাণ্ড ফটক—দিল্লী দরজা, কাশ্মীর দরজা, ভাটী দরজা এই সকল তাহাদের নাম। সহরের মধ্যে বাড়ীর গায়ে বাড়ী, তাহার গায়ে বাড়ী। প্রায় সবগুলি দুই তিন তলা উচ্চ, আলোক বা বাতাসের অবকাশমাত্র নাই। বাড়ীগুলি অতি প্রাচীন। অনেক বাড়ী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাজপথ অতি সঙ্কীর্ণ। পথের দুই ধারে দোকান, দোকানের সম্মুখে ক্রেতার ভীড়, পথে লোকের ভীড়, তাহার মধ্য দিয়া টাঙ্গা নামক দ্বিচক্র অশ্বযানগুলি ছুটিতেছে। এ যেন ঠিক সেই মোগলদের আমলের সহর—কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রাচীন সহরের বাহিরে আধুনিক লাহোর। এই অঞ্চলে Mall বা ঠাণ্ডি সড়ক একটি প্রশস্ত পরিষ্কার রাজপথ। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, বৃক্ষশ্রেণীর পর বড় বড় দোকান। এই রাস্তার এক পার্শ্বে এক বিস্তৃত উদ্যান আছে, তাহা পার্ক বা লরেন্স গার্ডেন্স নামে পরিচিত। উদ্যানের মধ্যস্থানে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় থাকাতে স্থানটি আরও মনোরম হইয়াছে।

পাঞ্জাবে পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী বাঁধে ও ঢিলে ইজার পরে। কৃষকেরা ছোট ধুতির ন্যায় এক খণ্ড বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া রাখে। হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ঘাগরা পরে, মুসলমান স্ত্রীলোকেরা পায়জামা পরে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই জুতা পরে। জুতা না হইলে এদেশে উপায় নাই; কুলি মজুর মুচি মেথর সকলকেই জুতা পরিতে হয়। কারণ শীতকালে নিদারুণ শীত, গ্রীষ্ম কালে অসহ্য গরম।

প্রবাদ এই যে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব, লাহোর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। লবের নাম হইতেই লাহোর নাম হয় এবং লাহোরের নিকটবর্ত্তী কাসুরনগর, কুশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রবাদ বোধ হয় সত্য নহে। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তরদেশে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু লবং তথা।
অভিষিচ্য মহাত্মানাবুভৌ রামঃ কুশীলবৌ॥

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড।

কুশের নগর বিন্ধ্যপর্ব্বত সমীপে, নাম কুশাবতী; লবের নগরের নাম শ্রাবস্তী। * ঐতিহাসিক যুগে জয়পালকে আমরা লাহোরের রাজা দেখিতে পাই। বিজাতীয় আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া ব্যথিত হৃদয়ে জয়পাল এক দিন লাহোর নগরের প্রান্তে চিতায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মুসলমান যুগে লাহোর সাধারণতঃ প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। জাহাঙ্গীর কিছুদিনের জন্য দিল্লী হইতে ভারতের রাজধানী লাহোরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কারণ জাহাঙ্গীর কাশ্মীর অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং কাশ্মীর লাহোরের নিকট। রণজিৎ সিংহের রাজধানী ছিল লাহোরে, সেই বোধ হয় লাহোরের সৌভাগ্যের উচ্চ সীমা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

---

* কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্য পর্ব্বতরোধসি।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা॥
শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য চ। রামায়ণ, উঃ

সুরের হাওয়া

দেশময় সুরের হাওয়া বহিত, থামিয়া গিয়াছে। সুরের সুরধুনী কুলুকুলু নাদে দেশের বক্ষ শীতল করিয়া প্রবাহিত হইত, আর তাহার স্নেহার্দ্র কণ্ঠ শুনি না। দেশময় শুষ্কতা, নিরানন্দ। কবিত্ব নির্ব্বাসিত, রস বিশীর্ণ, প্রীতি উদাসীন। প্রকৃত কলিযুগের কি এতদিনে আরম্ভ হইল?

হইতে পারে দেশে সবই আছে; হতভাগ্য যাহার, সেই রসধারা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আশে পাশেও তো প্রীতিপ্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাই না! জীবনের প্রত্যেক দিনটি পুষ্পের মত একটি একটি করিয়া বিকশিত হইতেছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা জীবনটি তাহার গন্ধে ভরপুর; তারকা খচিত আকাশ সারারাত ধরিয়া নিঃশব্দে মধুবর্ষণ করে; কর্ম্মে আনন্দ, বিশ্রামে আনন্দ, বাহুতে অসীম শক্তি, মনে অপরিমেয় তেজ, হৃদয়ে অনন্ত প্রীতি,—কৈ? একটি জীবনও তো ধারে কাছে দেখি না যাহার ঐ সব আছে।

আগেই কি ছিল? ছিল বলিয়াই তো বোধ হয়। প্রমাণ? প্রমাণ ঘাটে, মাঠে, জলে, স্থলে, শিল্পে ভাস্কর্য্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। স্বল্পাবশিষ্ট প্রাণ লইয়া এই বিপুল আনন্দের সৃষ্টি একবার প্রণিধান কর; ক্ষীণ-জ্যোতি চক্ষু লইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখ।

আচ্ছা, বাঙ্গালা দেশে আসিলে নাকি আগে জাত যাইত? শুধু বাঙ্গালা দেশ নহে, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ, —গোটা পূবের দিকটাই! পশ্চিমেও সুরাষ্ট্র বাদ পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভাবি, কথাটা সত্য ছিল কোন্ যুগে? ঐতিহাসিক যুগের উষাকাল হইতেই তো দেখিতেছি, আর্য্য সন্তান বাঙ্গালার নদীর কূলে কূলে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়াছে, কাহারও জাতি যাইতেছে না। প্রমাণ? ভয় নাই, আজ প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণ দিব না, সুরের হাওয়ার বায়ব্যাস্ত্রে মনুর কলঙ্ক ঘুচাইব।

বঙ্গদেশে আসিলে নাকি "পুনঃ সংস্কারমর্হতি"? কবে এই বিধান প্রচলিত ছিল? ইতিহাসের আদি যুগ হইতে যে আর্য্যগণ এদেশে পরম আনন্দে বসবাস করিতেছেন তাহার প্রাস্তরিক বা তাম্রিক প্রমাণ না হয় হাজির নাই করিলাম, কিন্তু আমাদের সেই নন্দিত পিতামহগণ তাঁহাদের আনন্দের ধারা যে দেশময় ছড়াইয়া গিয়াছিলেন তাহা তো আজিও শুকাইয়া যায় নাই! তাঁহারা নদীর তীরে তীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেন, বঙ্গের নদী গুলিকে তাঁহারা কি ভালই বাসিতেন! তাহাদের জল পানে অবগাহনে তৃপ্ত হইয়া আনন্দ বিগলিত হৃদয়ে তাহাদের নামাকরণ করিতেন। যে আনন্দের আবেগে ঋক্‌মন্ত্র দৃষ্ট হইত, এই নামগুলিও সেই আনন্দের উৎস হইতে উৎসৃত।

শীতললক্ষ্যা!—নামেই যেন চোখ কাণ, দুইই জুড়াইয়া গেল। গোয়ালন্দ হইতে ধপাধপ ধপাধপ করিয়া পদ্মার বক্ষ ভেদ করিয়া যাহার ক্ষীণাঙ্গ বাহিয়া ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জের ঘাটে আসিয়া থামে, তাহা এই নদী। মনের ভাবটা সব সময় প্রকাশ করিয়া বলা নিরাপদ নহে। কিন্তু শীতললক্ষ্যার শান্ত বক্ষের উপর দিয়া কলের জাহাজের নির্দ্দয় গতি যেন আমার বুকে ব্যথার মত বাজিতে থাকে। মনে হয় যেন রজনীগন্ধার স্তবক মাড়াইয়া বুট পায়ে দিয়া মট্ মট্ করিয়া চলিতেছি।

আমাদের ঘরের কাছের নদী এই শীতললক্ষ্যা, অতি-পরিচয়ে অনাদৃতা। মনুর পক্ষের উকীল কোথায়? বলুন দেখি, এই নামটি ঋক মন্ত্রের সামিল হইতে পারে কি না? ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অন্তরঙ্গ প্রীতির নাম কি না এই শীতললক্ষ্যা? আপনি যদি কল্পনা করিতে পারেন যে জাতিপাত-ভীরু কোন খোট্টা আর্য্যসন্তান তীর্থযাত্রায় বাঙ্গালা দেশে আসিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে, এই শ্রবণ মনোমোহন নাম রাখিয়া জাত বাঁচাইয়া খোট্টার দেশে প্রস্থিত হইয়াছে,—তবে আপনি ওকালতিই করিতে থাকুন।

শীতললক্ষ্যা! কোন্ অলিখিত ইতিহাসাতীত যুগে কোন্ ঋষি কবির লক্ষ্য শীতল করিয়াছিলে গো? ঋষির নয়ন যে মিথ্যা দেখে নাই, চক্ষুষ্মান্, চাহিয়া দেখিও। নারায়ণগঞ্জের রেল ষ্টেশনের কদর্য্যতা, পাটের কলের বীভৎসতা পর্য্যন্ত শীতললক্ষ্যার স্নিগ্ধতা ঢাকিয়া ফেলিতে পারে নাই। স্বাস্থ্যকামী, সৌন্দর্য্যপিপাসু ছুটিয়া যাও দার্জ্জিলিঙে, শিলঙে, শিমলায়! একবার একখানা লালডিঙ্গি লইয়া শীতললক্ষ্যার বক্ষে বেড়াইয়া আসিও; জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ-স্মৃতি অর্জ্জন করিয়া ফিরিতে পারিবে।

নৌকা ছাড়িল নারায়ণগঞ্জ হইতে। নারায়ণ গঞ্জের সীমা ছাড়িয়া গেলেই শীতললক্ষ্যা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। কি সে রূপ, কেমন করিয়া বুঝাইব? কেবলি মনে হইত থাকে জুড়াইল, জুড়াইল—দেহ, মন, নয়ন, সকলি জুড়াইয়া গেল! পালভরে তরণী কলকল নাদে ছুটিয়াছে, দুই ধারে গ্রামগুলি যেন মধুতে ভরিয়া রহিয়াছে। গুপারি গাছেরও যে সৌন্দর্য্য আছে, শীতল-লক্ষ্যার বক্ষ হইতে পারের দিকে চাহিয়া তাহা আবিষ্কার করিলাম। আগে ঐ গাছকে মনে হইত যেন স্কুলের একসারসাইজের খাতার রুল। এখন দেখিতেছি যেন মূর্ত্তিমান সুর, প্রাণের বেগে ধরণী বক্ষ হইতে গগনে উৎসৃত।

ঐ যে একটি মঠ এবং ঝাউএ ঘেরা কুঞ্জের মত গ্রাম, সহসা নয়নপথে পতিত হইল উহার নাম মুড়াপাড়া। মস্ত মস্ত জমীদারের বাস, কেহ ফুটবলে ওস্তাদ, কেহ তাহার মিউনিসিপালিটির রাস্তার তদারকে নিযুক্ত। এমন নদীতীরের ঝাউতলার ছায়াশীতল রাস্তা ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও যাইতাম না। গ্রামের নামটা বেজায় গদ্য। বদলাইয়া ফেলিলে ভাল হয়। নামে কি করে বলিতেছেন? কেশব নামটি বদলাইয়া গোবর্দ্ধন রাখুন দেখি মশায়! অমন নধর কান্তিও ম্লান হইয়া যাইবে। শীতললক্ষ্যার নাম বদলাইয়া কি চিংড়িমারী রাখা যায়?

তরণী চলিল। ঐ যে নদীর পূবপারে যেন 'স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা' একটি স্থান দেখা যাইতেছে, উহার নাম কালীগঞ্জ। উহাতে একটা ইংরেজী স্কুল আছে, জমীদারী কাছারী আছে, একজন রায় সাহেব আছেন—আরও কতকি আছে! কিন্তু আমার কাছে, আছে, উহার একটি নদী তীরের রাস্তা, তাহার পারে, কাহার পিতামাতার স্মৃতি চিহ্ন গুটি দুই স্বল্পায়তন মঠ। রাস্তার উপর কি-গাছের যেন আতপত্র। এই স্মৃতিটুকুই শুধু থাকিয়া থাকিয়া মধুবর্ষণ করে।

আরও উত্তরে তরণী চালাও। ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা খাইয়া চাহিয়া দেখি, রেলওয়ে ব্রিজের লৌহ নিগড়ে দৃষ্টি আহত। কোনও রকমে এই কঠোরতার হাত এড়াইতেই দেখি, পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখা দিয়াছে। দুই ধারে লাল মাটির খাড়া পাড়, বিশ পঁচিশ হাত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। মাটি কি লাল! সিন্দুরের মত। শীতললক্ষ্যা অশান্ত মেয়েটির মত উচু পাড়ের গা ঘেঁসিয়া অলক দোলাইয়া ছুটিয়াছে। লাখপুর, একডালা, কাপাশিয়া, গোশিঙ্গা—কতস্থান, কত স্বপ্ন! সহসা শুনি শীতললক্ষ্যা নাম বদলাইয়াছেন, এই নদীর নাম বানার! বানার মানে কি মশায়? বর্ণার?—বর্ণশালী? হইতে পারে। দুই ধারে এত লালমাটির ছড়াছড়িতে বোধ হয় নয়ন আর স্নিগ্ধ হইতেছিল না!

ঐ যে ক্ষুদ্র নদীটি, ঢাকার বুড়িগঙ্গা যাহার জলে আজিও বাঁচিয়া আছে, উহার নাম তুরগ, জনসাধারণে বলে তুরাগ। কি বলেন? নামটি কি চিচুংফা বা হর্জ্জর বর্ম্মন্ প্রদত্ত বলিয়া মনে হইতেছে? রামমাণিক্য পোদেরও অতটা পাণিনি পড়া ছিল বলিয়া মনে হয় না। তুরগ! কি সুন্দর আদরের নাম! যেন একটি পোষা ঘোড়া, ঘাড় বাঁকাইয়া পুচ্ছ উচ্চ করিয়া কেশর ফুলাইয়া সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে পার্ব্বত্য পথে পাষাণ হইতে পাষাণে লাফাইয়া ছুটিয়াছে! তুরাগ দিয়া কোন দিন যাই নাই, কিন্তু উহার নামে উহার যে চিত্র আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে, সাক্ষাৎ পরিচয়েও আশা করি তাহা ম্লান হইবে না। তুরগ বলিতে আমার মনে একটি যত্নচিক্কণ তাজা ক্ষুদ্রকায় মণিপুরী টাট্টুর চিত্র ভাসিয়া উঠে। সাক্ষাৎ পরিচয়ে হয়ত

অন্য রকম দেখিব। কিন্তু যে নামটিতেই কল্পনাকে এতটা আনন্দ দিতে পারে তাহা অসার্থক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

তুরাগের কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইয়া আছেন ঐ যে তন্বঙ্গী, উহার নাম **বংশবতী**। গৃহস্থের ঘরে উহাকে বলে বংশাই। নামটি যেন পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। কালিদাসের কাব্যেই নির্ব্বিন্ধ্যা, শিপ্রা, মালিনীগণের সহিত বেণুমতী নামটি পাইয়াছি নয়? কালিদাসের বেণুমতী ও ঢাকা জেলায় বংশবতী একই কবির রচনা বলিয়া মনে হয় না কি? বংশাই অতি শাদা-সিধা সরল হাস্য পরায়ণা স্নেহময়ী ললনা, মুখে রাগের কথাটি নাই, কুলুকুলু রবে অতি ধীরে ধীরে সমতল মাঠের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক মেঘনাদের মেঘমন্দ্র বংশাই তীর হইতেই উদ্ভূত, বংশাই সলিলেই স্নিগ্ধ।

পড়শী নদীর নাম **ইচ্ছামতী**—মনে পড়িলেই আমার এক সৌন্দর্য্যের প্রতিমা আত্মীয়াকে মনে পড়ে। তিনিও ইচ্ছামতী। কখন কি সাজ ধরিবেন, কখন কোথায় যাইবেন, কখন কি অলঙ্কার পরিবেন, তাহা পূর্ব্বাহ্নে কাহারও অনুমান করিবার যো নাই। সকলেরই অস্থিদগ্ধকারিণী কিন্তু সবাই তাঁহাকে ভালবাসে। তাঁহার ইচ্ছার সম্মুখে কাহারও দাঁড়াইবার যো নাই, আঁখি জলে মিনতিতে তর্জ্জনে অবশেষে তাঁহার ইচ্ছাই বজায় থাকিবে। আমাদের ইচ্ছামতীর আর পূর্ব্ব গৌরব নাই, কিন্তু কিরূপ দুর্দ্দম ইচ্ছা তাহাকে একদা পরিচালিত করিয়াছিল, তাহা একবার ইচ্ছামতীর বাঁকে বাঁকে নৌকা লইয়া ঘুরিয়া আসিলেই পরিচয় পাওয়া যায়।

পূবের দিকে একটা দেশ আছে, আমরা বলি আসাম। প্রাচীনেরা বলিতেন কামরূপ। আর আকাশের তারা গণা যাঁহাদের ব্যবসা ছিল, তাঁহারা ইহার বেশ একটা গালভরা নাম রাখিয়াছিলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। উহার রাজধানীটার নামটা—ছ্যা—গৌহাটি! প্রথম ভাবিয়াছিলাম বুঝি উপক্রমণিকার গৌ. গাবৌ গাবঃ। ওমা! পরে কতকগুলি মস্ত মস্ত কামানের গায়ে লেখা দেখি আহোম রাজ অমুক, গুবাকহাট্যাং যবনং জিত্বা ও গুলি পাইয়াছিলেন! গুবাক জিনিষটা ফেলনা জিনিস নহে, উহার কষায় রসও পাণ রসিকের নিকট বিশেষ আদৃত। কিন্তু গুবাক হাটিতে কাব্য রস বেশী আশা করা যায় না।

আগে ধারণা ছিল, দেশটা আহোম আবর ইত্যাদি আর্য্যেতর মোঙ্গল জাতিরই লীলা নিকেতন। অধুনা শুনিতেছি, উহা নাকি বৈদিক পনি জাতির একেবারে আদিম নিবাস। আসাম হইতে ঘাসি নৌকায় বোঝাই হইয়া নাকি এই পনিরা প্রাচীন কালে সাগর ডিঙ্গাইয়া যাইয়া ফিনিসিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল! তথাস্তু। কিন্তু পনিই হউন আর আহোমই হউন, কেহই পাণিনি পড়িয়া আর্য্যদের ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই খাঁটি মোঙ্গল দুর্গের অভ্যন্তরে ডিহং ডিব্রু হবং ইত্যাদি নদীর নামের মধ্যে সহসা শুনি গৌহাটির অদূরে তিনটি নির্ঝরিণীর নাম—কি মধুর নাম—**সন্ধ্যা, ললিতা, কান্তা**! একেবারে যেন গীতগোবিন্দের মাধুর্য্য ভাণ্ডার মন্থন করিয়া তিনটি নামরত্ন উদ্ধার করিয়াছে গো! এই নামত্রয় গ্রথিত কাব্য যে অমর কবির রচনা, তাঁহাকে প্রণাম করি। কত কবির কাব্যই কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কত কাব্যই তো প্রাণের দায়ে নহিলে কেহ আর এখন পড়ে না। কত কাব্য বুঝিতে আবার কত টীকা টিপ্পনীর দরকার হয়! কিন্তু শ্রুতিমাত্র মাধুর্য্যে মন মাতাইয়া তোলে এখন যে কাব্য, বশিষ্ঠাশ্রমের উপলতলশায়িনী বনান্তরালবাহিনী ক্ষীণতোয়া নির্ঝরিণী-ত্রয়ের ত্রিতন্ত্রীতে যাহা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ঝঙ্কৃত হইতেছে, কত সহস্র বৎসর আরও হইবে,—এমন সংক্ষিপ্ত অথচ এমন প্রাণবান কাব্য জগতে আর একটিও কি দেখাইতে পারিবে? রজনীগন্ধা যেমন সারা রাত ধরিয়া গন্ধ মাধুর্য্যে বাগান আমোদিত রাখে, এই নামত্রয় গ্রথিত কাব্য গোটা আসাম দেশটাকে সারা কলিযুগ ভরিয়া তেমনি সরস রাখিবে।

নদীর নামকরণকারী ঋষি কবিগণ কেবল সৌন্দর্য্যই

দেখেন নাই, ওজস্বিতার ওজনও তাঁহারা করিতে ছাড়েন নাই। **মেঘনাদ**! কি গম্ভীর নাম! সাগরের মোহানার সহিত একাঙ্গ এই নদীর যে ইহা অপেক্ষা সার্থক নাম কি হইতে পারে, আমি কল্পনা করিয়া পাই না। ঐ শ্রেণীরই আর একটি নদীর নাম ঘর্ঘর। নামকরণে স্পষ্টই বিরক্তির চিহ্ন বিদ্যমান। নামদাতার কাণ যেন বড়ই আহত হইয়াছিল!

এরূপ আর কত নাম করিব? আমাদের ঘরের কাছে আত্মীয়াগণের সৌন্দর্য্যেই আমরা অভিভূত, কল্পনায় যে সকল সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে হয় তাঁহারা যে আরও কত সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হন তাহা আর কি বলিব? প্রকৃতির রম্য নিকেতন চট্টলের একটি নদীর নাম কর্ণফুলী। বাঃ, এই পার্ব্বত্য বালিকার উদ্দাম সৌন্দর্য্য এমন নিবিড় চোখে কে দেখিয়াছিল গো? কাণে ফুল গুঁজিয়া পিঠে চুল ছড়াইয়া অতিপিনদ্ধ বল্কলে অনিয়ন্ত্রিতবক্ষা এই বন্যবালিকা পাহাড় হইতে পাহাড়ে ছুটিতেছে। চোখে দেখি নাই, কল্পনায় দেখিলাম, এই বালিকার রূপের তুলনা নাই।

পৃথিবীর সুখ প্রায়,
অর্দ্ধেক তো কল্পনায়।

আর সাগরদাঁড়ীতীরা **কপোতাক্ষ**। আমি বেশ বুঝিতে পারি, যে ঋষি এই নদীর এই নাম দেখিয়াছিলেন, কবিত্বে তাঁহার মগজ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। সুরের হাওয়া তাহার প্রাণে সদাই বহিত। নইলে এমন নাম, যাহা শুনিবামাত্র ধন্য ধন্য করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে, এমন নাম তাঁহার মানস নয়নে ফুটিয়া উঠিত না।

কপোতাক্ষ! নামটিতে কি যে দেখি! দুই ধার যেন শৈবালদলে আচ্ছন্ন চোখের পাতার পিছির মত, মধ্যে স্ফটিকস্বচ্ছ বারিরাশি চলিতেছে কি স্থির হইয়া আছে বুঝা যায় না। নিম্নের উপলখণ্ডটি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে! দু'ধারে তার দীর্ঘ তাল নারিকেলের সারি যেন সারি সারি বীণায় তার।

মরি—মরি! কি নামই রাখিয়াছিলে কবি! **মধুমতী**! কতখানি ভালবাসিলে অন্তরঙ্গতার কি গভীর তলদেশ হইতে এমন মিষ্ট নাম উত্থিত হয়! যে ঋষিগণ বায়ুতে মধু ঝরিতে দেখিয়াছিলেন, সিন্ধু (নদী) গণ মধু ক্ষরণ করিতেছে বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, এই নাম যে তাঁহাদেরই দেওয়া তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারি।

বরেন্দ্রের মহানন্দা, করতোয়া, পুনর্ভবা, আত্রেয়ী যেন তপোবনের প্রান্তবাহিনী স্রোতস্বতীর নাম!—আর আজকালের রুচির নমুনা—বোয়ালমারি, ইলশা মারী, নয়াভাঙ্গনী! খুব ভদ্রঘরের নাম কীর্ত্তিনাশা। —E. D.

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

বক্রেশ্বর

বীরভূম জিলার অন্তর্গত সিউড়ী সহর হইতে বার মাইল পশ্চিমে বক্রেশ্বর পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর শিব চতুর্দ্দশীর দিন হইতে সপ্ত দিবস ব্যাপী একটি প্রকাণ্ড মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঐ সময় এখানে বক্রেশ্বর মহাদেব ও উষ্ণ প্রস্রবণ দর্শনার্থ বহু লোকের সমাগম হয়। ইহা শুধু পীঠস্থান নয়। এখানে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তথায় অবিরত জল ফুটিতেছে, বিরাম নাই। নিকটেই বক্রেশ্বর নামে একটি ক্ষীণকায়া নদী প্রবাহিতা। বর্ষাকালে এই ক্ষীণ-কায়া নদী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বিস্তর ক্ষতি করিয়া থাকে। বক্রেশ্বর বাসীরা এই নদীর জল পানে নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে।

এখানকার প্রস্রবণগুলি দেখিবার জিনিষ। প্রস্রবণ গুলি সমতল ভূমি হইতে প্রায় হাত তিন নিম্নে অবস্থিত। সে গুলির চতুর্দ্দিক চৌবাচ্চার ন্যায় শান বাঁধান। নিম্নের ছিদ্র দিয়া গরম জল বাহির হইয়া যায়। এই জন্য প্রস্রবণগুলি এক একটি কুণ্ড নামে অভিহিত হয়। এখানে জীবকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, সূর্য্যকুণ্ড, যোগকুণ্ড, ব্রহ্মাকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, ক্ষারকুণ্ড, বৈতরণী প্রভৃতি দশ বারটি কুণ্ড আছে। সব কুণ্ডগুলির জল সমান গরম নয়। কোন কোন কুণ্ডের জল একেবারে শীতল। জীবকুণ্ড সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, কাহারও স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী যদি ভক্তিমতী হইয়া স্বামীর অস্থি ঐ কুণ্ডে নিক্ষেপ করে এবং উহার জল স্পর্শ করে, তবে সে তাহার মৃত পতিকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া পায়। এইরূপ প্রত্যেক কুণ্ড সম্বন্ধে কিছু না কিছু প্রবাদ শ্রুত হয়। কিন্তু সে সব বাক্য আর সত্যে পরিণত হয় না।

ইংরাজেরা প্রস্রবণ সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অগ্নিকুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ। উহার জল এত উষ্ণ যে তাহা স্পর্শমাত্র হাতে ফোস্কা পড়ে।

নানাদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে, পৃথিবীর নানাস্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ থাকে সত্য, কিন্তু এরূপ উষ্ণ প্রস্রবণ পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উষ্ণ প্রস্রবণের সন্নিহিত কূপের জল সাধারণ কূপজলের ন্যায় শীতল ও সুমিষ্ট।

মহাদেবের মন্দির-সন্নিহিত একটি বৃহৎ কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি ছোট প্রাচীর আছে, তাহাতে মানুষ পারাপারের জন্য একটি বৃহৎ ছিদ্র আছে। এ কুণ্ডটির জল বেশী গরম নয়। একই কুণ্ডের জলে আবার স্থানে স্থানে গরম ও ঠাণ্ডার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শিব চতুর্দ্দশীর দিন অনেক পুরুষ যাত্রীরা ঐ ছিদ্র মধ্য দিয়া পারাপার হয়। অনায়াসে উহার মধ্য দিয়া পার হইতে পারিলে তাহারা নিজদিগকে নিষ্পাপ বলিয়া মনে করে, এবং উহা পারাপারে অকৃতকার্য্য হইলে এখনও তাহারা আপনাদিগকে পাপী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এইখানে প্রায় শতাধিক শিবমন্দির পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত। অনেক শিবালয় ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বড় বড় কুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসীরা এখানে যোগসাধনে নিযুক্ত আছেন। নিকটেই কালীমাতার একটি প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত। এখানে নিত্য পূজার ও অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা আছে।

কালীমাতার মন্দির সংলগ্ন বৃহৎ কুণ্ডের পার্শ্বে নিত্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের শব দাহ হইয়া থাকে। ১০।১২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও শব এখানে দাহের নিমিত্ত নীত হয়। এই জন্য এই স্থানে শৃগাল কুক্কুর ও শকুনির প্রভাব খুব বেশী।

মহাদেবের সেবার জন্য পালাক্রমে পাণ্ডা নিযুক্ত আছে। তীর্থ দর্শনে আসিয়া তাহাদিগকে কিছু পয়সা দিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া সব কাযই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইয়া দেয়। পাণ্ডারা এখানকার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যাত্রিগণের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা যাত্রিগণকে সমাদরে স্বস্বগৃহে স্থান দেয় এবং তাহাদের পরিচর্য্যার কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা হইতে দেয় না।

প্রায় প্রতিবৎসর মেলার সময় নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এবং উহা ক্রমে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া দেশের বিস্তর লোক নাশ করে।

সিউড়ী সহর হইতে বক্রেশ্বর যাইতে যাত্রিগণের কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। এখানে অশ্বযান পাওয়া যায় এবং ঘণ্টা চার মধ্যেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া সহরে ফিরিয়া আশা যায়।

বক্রেশ্বর প্রকৃতির লীলা নিকেতন। এখানে দর্শনীয় বস্তুর অভাব নাই। চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য বৃক্ষরাজি মস্তক ঊর্দ্ধে তুলিয়া দণ্ডায়মান। পক্ষীর কূজনে সর্ব্বদাই এই স্থান মুখরিত। মানুষ এখানে আসিলে নিজকে ধন্য ও গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করে। এবং স্বচক্ষে প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়া অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীগৌরীহর মিত্র।

শরীরের মুক্তি

(গল্প)

তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর গভীর রাত্রিতে মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। নির্ম্মল প্রভাত দূরে চক্রবাল রেখার কাছে নবোদিত রঙীন সূর্য্যকে অভিনন্দন করিল। সৌম্য মূর্ত্তি সন্ন্যাসিনীর মত মহানন্দা গম্ভীর অচঞ্চল গতিতে প্রবহমানা! স্নান করা ঘাটের উপর একটী কদম গাছের তলায় ভোরের কুয়াসায় গা ঢাকিয়া মহামায়া নদীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তখনও স্নানার্থিনী কেহ ঘাটে আসে নাই। হরিৎ কাশবন দুলাইয়া পুষ্পরেণু বহন করিয়া তরঙ্গ রেখা চুম্বন করিয়া মৃদু মন্দ বাতাস বহিয়া গেল।

কুয়াসার জাল ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। মহামায়া কলসীটা কক্ষে ধারণ করিয়া ললিত চরণভঙ্গে জলের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। দৃষ্টি ফিরাইতেই অকস্মাৎ সে দেখিতে পাইল, একটু দূরে ছোট ছেলের মত কি একটা পড়িয়া! মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা উৎকট ভয় আসিয়া তাহার শরীরকে যেন চাপিয়া ধরিল—উত্তপ্ত রক্তোচ্ছ্বাস বিদ্যুতের মত তাহার সমস্ত শরীরে খেলিয়া গেল। সে এখন উর্দ্ধশ্বাসে পলাইবে, না বুকে সাহস বাঁধিয়া সেই-খানে দাঁড়াইয়া রহিবে, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। মনুষ্য মূর্ত্তির দিকে ব্যথা ব্যাকুল-নয়নে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, 'আচ্ছা মড়া দেখে মানুষ এত ভয় পায় কেন? আমরা ত সর্ব্বদাই মড়া নিয়ে নাড়া চাড়া করছি! শুধু কি তাই? ছাগলটা যখন কেটে আনে, তখন ছেলে মেয়েদের আনন্দ দেখে কে! আর মাছের ত কথাই নাই! তবে—তবে মানুষ মড়ার বেলায়ই কি যত দোষ? তার একটু কাছে গেলেই বিশ্ব-সংসারের ভয় এসে ঘাড়ে চড়ে বসবে কেন?' বলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বসিয়া পড়িতেই তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। 'অ্যাঁ! এ কি? ওটা কি নড়ছে? তাইত! না—না তাই কি হয়? আমার চোখের ভুল!'

ভীত চকিত চিত্তে মহামায়া বসিয়া রহিল। চেষ্টা করিয়াও সে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু সেইদিকেই নিবদ্ধ রহিল। আবার তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—'একি! পাশ ফিরে চোখ মেলে বেশ চাইছে ত! ঐ যে আবার নড়ল! মড়া নয়, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে! আহা! কার বাছা রে?

ভীত কম্পিত পদে মহামায়া গিয়া দেখিল, ছিন্নবৃন্ত কুসুমের মত একটী ছয় সাত বৎসরের বালিকা সর্ব্বাঙ্গে কাদায় ভরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখনও তাহার শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া যায় নাই। তাহার বুকের উপর হাত দিতেই সে একটা অস্ফুট কাতর শব্দ করিয়া, দুই রুগ্ন বাহু বাড়াইয়া মহামায়ার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল, কোটরগত চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মহামায়া আকুল আবেগে সেই বালিকাটীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া, আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই বাড়ী লইয়া গেল। তাহার আর স্নান করা হইল না।

২

কয়দিন হইল, মহামায়া সেই কুড়াইয়া পাওয়া রুগ্না কন্যাটি লইয়া একটী নিভৃত কক্ষে স্থান লইয়াছে। তাহার অমৃতময় স্পর্শে, অক্লান্ত যত্নে মেয়েটী বেশ সবল হইয়া উঠিয়াছে; এখন সে খাড়া হইয়া বসিতে পারে। জীবনের এই পটপরিবর্ত্তনে সে বিস্মিত হইলেও, মহামায়ার অফুরন্ত করুণায় অকৃত্রিম স্নেহে তাহার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত স্মৃতি দূর হইয়া গেল। সে যখন কুসুম কোরক তুল্য ছোট্ট

চোখ দুটী মেলিয়া ব্যথিত দৃষ্টিতে সেই অপরিচিতার দিকে চাহিত, মহামায়া তখন তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আদরে চুম্বনে অভিভূত করিয়া ফেলিত।

অনুরাধা সশব্দ পদ বিক্ষেপে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "দিদি!"

মহামায়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বোন?"

অনুরাধা একটু দূরে সরিয়া, বসিয়া বলিল, "ঐ মেয়েটাকে ছেড়ে কি একটু বাইরেও যেতে হয় না? তুমি কি মনে করেছ বল ত দিদি?"

মহামায়া শান্ত সহজ সুরে বলিল, "আমার ত মনে করবার কিছু নেই বোন! এই যত মনে ক'রেছ তোমরাই!"

অনুরাধা বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে বলিল, "কি যে তুমি বল দিদি, তার ঠিকানা নেই। আমি বলছি, আমার কথা শোন। এখনও বেশী লোক জানাজানি হয় নি! ওকে এক জায়গায় রেখে এস। কি জাতের মেয়ে—"

মহামায়া তেমনি কণ্ঠে বলিল, "জায়গা বল্‌তে ত ওর এক শ্মশানে! অপর জায়গা থাকলে কি ওরকম ভাবে শ্মশানে প'ড়ে থাকৃত? এই মুখখানা দেখে কি তোদের মনে একটুও দয়া হয় না অনু?"—বলিয়া সে করুণ নয়নে সেই শ্মশানে কুড়ান বালিকাটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনুরাধা বলিল, "দিদি, সংসারে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশেই থাকৃতে হয়। শুনলাম সেদিন একজন ভদ্রলোক—তার গলায় নাকি পৈতে ছিল—স্ত্রী এবং এই মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে গরুর গাড়ীতে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল। পথের মধ্যে সেই বাদলা দিনে কি এক রোগে অকস্মাৎ মেয়েটী যখন মারা গেল, তখন সন্ধ্যে হ'তে আর বেশী দেরী নেই। বৃষ্টি আর বাতাসে যেন মাতামাতি করতে লাগল! এ বিপদে তাদের সাহায্য করতে কেউ এল না! তারা দুই স্বামী স্ত্রীতে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে মেয়েটাকে ধরাধরি করে ঘাটের ধারে নিয়ে গিয়ে মুখে একটু আগুন দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে এল!"—অনুরাধা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মুখে আগুন দেওয়া মানুষকে কেউ কি ঘরে আনে? না আন্‌তেই হয়?"

মহামায়া বলিল, "আহা! তাহলে ওযে একেবারে নিরুপায়। একূল ওকূল দুই-ই গিয়েছে! ওর বাপমা এনথ ওকে ঘরে নেওয়া ত দূরের কথা, মেয়ে ব'লেই স্বীকার করবে না। না না—একে আমি প্রাণ থাকৃতে কিছুতেই পথে বসিয়ে রেখে আস্‌তে পারব না।" বলিতে বলিতে অত্যন্ত আবেগ ভরে মহামায়া তাহার কুড়ান মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

ক্রোধে অনুরাধার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল, "ছি ছি! দিদি, তুমি এ পাগলামী ছাড়। তোমার জন্যে সমাজে আমাদের মুখ হেঁট হয়ে গেল! আজ তুমি কিনা সব ছেড়ে দিয়ে মুদ্দফরাসেরও অধম হ'তে ব'সেছ! এখনি তুমি ওকে বাইরে ফেলে দিয়ে এস—আমার কথা রাখ।"

মহামায়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমার জীবন থাকৃতে ওকে আমি ফেলে দিয়ে আস্‌তে পারব না; এতে সমাজ যাই বলুক আর যে শাস্তিই দিক, আমি মাথা পেতে নেবো। যে সমাজ একটা অসহায় বালিকার উপর বিনা বিচারে এমন পীড়ন করে, সে সমাজের শাস্তিতে আমার কিছুই আসে যায় না। আচ্ছা, বল্‌ ত অনু, যদি তোর কল্যাণী আজ এমনি অবস্থায় কোথাও পড়ত? আর এমনি ক'রে কেউ গাছতলায় বসিয়ে রেখে আস্‌ত?"—বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে সে অনুরাধার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনুরাধা এ কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। সে মনে মনে বলিল, "তাই ত। আজ সত্যিই যদি আমার কল্যাণী এমনি অবস্থায় পড়্‌ত? আর এমনি করে তাকে তাড়িয়ে দিত?"

"বৌমা!" ঘরের বাহির হইতে অনুরাধার বৃদ্ধা শাশুড়ী ডাকিলেন।

অনুরাধা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধা তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুমিও কি তোমার দিদির সঙ্গী হ'লে নাকি?" মহামায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি ও মেয়েটাকে কিছুতেই ছাড়বে না? কি জাতের মেয়ে তার ঠিক নেই! তার উপর আবার ম'রেছে মনে করে মুখে আগুন দিয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে এসেছিল। ছি ছি! বামুনের মেয়ে হ'য়ে এত নীচ বুদ্ধি তোমার! শেষটায় ইহকাল পরকাল দুই-ই মাটি করলে?"

মহামায়া বৃদ্ধার মুখের উপর দুই চক্ষু তুলিয়া বলিল, "পরকাল আমার নেই, সে ভাবনাও আমি করিনে। ইহকালটা যেন আমার এমনি ক'রেই মাটি হয়। ভগবান যেন আমার হৃদয় এই নীচ বুদ্ধিতেই ভরিয়ে রাখেন!" —বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল।

৩

শত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া মহামায়া তাহার সেই কুড়ান মাণিক সমাজ-পরিত্যক্তা পদদলিতা মেয়েটিকে লইয়া নিজগ্রাম মাধবপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্মশানে পাওয়া বলিয়া সে তাহার নাম রাখিয়াছিল শ্মশানবাসিনী।

গ্রামের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মুখুজ্জেদের বৈঠকখানায়, কৃষকদিগের তামাকের আড্ডায়, অন্দরে মেয়ে মহলে সর্ব্বত্র তীব্র আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "বামুনের মেয়ে হ'য়ে ডোমের কায!" কেহ বলিল, "এমন মেলেচ্ছ হাওয়া গায়ে লাগলেও গা অপবিত্তির হ'য়ে যায়!" কেহ বলিল; "বাপের জন্মেও এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখি নি!" উদার প্রশান্তমনা মহামায়া নীরবে নত মুখে এ সব শুনিয়া যাইতে লাগিল, একটা কথাও বলিল না। শাস্ত্রের নিষ্ঠুর নিষেধ, সমাজের বিকট ভ্রূকুটী তাহাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারিল না। রামতনু বাঁড়ুজ্জে প্রাচীন লোক, উপাধিধারী পণ্ডিত। তাঁহার ব্যবস্থা গ্রামের লোক বেদবাক্যের মত মানিয়া থাকে। তিনি মহামায়াকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন, "ওগো! তুমি বিধবা স্ত্রীলোক, সব মরে গিয়ে তোমার একটী মাত্র মেয়ে। তাকেও শেষটায় পথে বসালে? তারও ত বিয়ে দিতে হবে!"

মহামায়া নীরবে উদার নীল আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না।

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ছি ছি! এমন কায কি মানুষে করে? সব শাস্ত্রের বাইরে! একেবারে ম্লেচ্ছের মত কায হয়েছে! এখনও দশ জনের হাতে পায়ে ধরে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হও।"

মহামায়া দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "এই ম্লেচ্ছের মত কাযে যদি একজনের জীবন রক্ষা হয়—অগতির গতি হয়,—তা কি আপনাদের শাস্ত্র বিহিত কাযের চেয়ে কম গৌরবের? একে মরণের মুখে ফেলে দিলেই কি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করা হতো? এই কি ধর্ম্ম?"

গ্রামের লোক কেহই আর তাহার বাড়ী আসিল না। সকলেই ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইল। সে সেই নীরব ভবনে নীরবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিল। সমাজের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা, লোক-সাধারণের তীব্র প্রতিবাদ কোনটাতেই তাহার সেবাপরায়ণা নারী প্রকৃতি সায় দিল না; বরং আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জনহীন বদ্ধ ভবনে থাকিয়া তাহার প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠিত, সে তখন কন্যা চারুশীলা আর শ্মশানবাসিনীকে লইয়া কত রূপকথা, কত দেশ বিদেশের গল্প বলিত।

শুক্লপক্ষের চাঁদ যেমন প্রতিদিন কলায় কলায় ভরিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, শ্মশানবাসিনীর অঙ্গসৌষ্ঠব তেমনি পূর্ণ হইতে লাগিল। তাহার দিকে স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া মহামায়ার দুইচক্ষু জলে ভরিয়া আসে;—"কেন, আমি একে কুড়িয়ে আন্‌তে গিয়েছিলাম? এখন একে নিয়ে কি করব? এর উপায় কি হবে? যদি কোনও সদুপায় না হয়, তবে ওর মরণই ভাল ছিল! জানিনে, ভগবান, তোমার মনে কি আছে!"

একটীর পর একটী কত চিন্তা তাহার মনে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারে অসাড় করিয়া ফেলিত। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদায় দূর করিয়া দিয়া সে কার্য্যে মন দিত।

৪

"ও বাড়ীর মেয়েরা আমাকে ছুঁতে চায়না কেন মা? আমি কাছে গেলে ওরা আমার গায়ে ধূলো দিয়ে দূরে স'রে যায়।"—বলিয়া শ্মশানবাসিনী একদিন মায়ের কোলে মুখ লুকাইল।

মহামায়া কন্যার নত মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহার সুন্দর নিটোল গণ্ডে একটী স্নেহের চুম্বন দিয়া বলিলেন, "ওদের কাছে যেওনা শ্মশানী! ওরা বড় দুষ্টু। তুমি আমার কাছেই থেকো।"

"চারুর গায়ে ত কেউ ধূলো দেয়না মা! আমাকে দেখলেই ওরা গায়ে ধূলো দিতে আসে, আর হাত তালি দেয়!"

চারুশীলা মাতার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা! দিদিকে দেখলেই ওরা স'রে যায়; বলে ওকে ছুঁতে নেই।"

শ্মশানবাসিনী কাঁদ কাদ হইয়া বলিল, "আমাকে ছুঁলে কি হয় মা? আমি কি দোষ করেছি?"

ঘৃণার উত্তাপ যে কত নিদারুণ হইয়া শ্মশানবাসিনীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, তাহা একমাত্র মহামায়া ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই উপলব্ধি করিতে পারিত না। শ্মশানবাসিনী যাহাতে এতটুকু ব্যথা না পায়, তজ্জন্য সর্ব্বদাই তাহাকে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত পক্ষিশাবকের মত আপনার অটুট স্নেহের আবরণে ঘিরিয়া রাখিত। সে তাহার মঙ্গল হস্ত শ্মশানবাসিনীর মাথায় মুখে বুলাইয়া দিতে দিতে দুই চক্ষে স্নেহ বিকীর্ণ করিয়া বলিল, "তুমি কিছু দোষ করনি মা! এই যে আমি তোমাকে ছুঁচ্ছি।"

"কাকীমা!"

মহামায়া সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, ভ্রাতুষ্পুত্র ললিত তাহার পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! একি! এই আচারভ্রষ্টা, সমাজ পরিত্যক্তার গৃহে, ধর্ম্মের অনুশাসন, শাস্ত্রের সুব্যবস্থা অমান্য করিয়া ললিত আসিল কোন সাহসে? এত সহজে এমন অসঙ্কোচে ত তাহার বাড়ী এ পর্য্যন্ত কেহ কোন দিন আসে নাই! তাহাকে কি দিয়া অভ্যর্থনা করিবে, কি বলিবে, সে প্রথমে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

ললিত তাহার পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, "অনেকদিন তোমাকে দেখি নি কাকীমা, তাই আজ দেখতে এসেছি।"

মহামায়া উদ্গত ব্যথা হৃদয়ে চাপিয়া বলিল, "আমাকে দেখতে আসাও যে পাপ রে ললিত! সমাজ যাকে বাইরে ফেলেছে, শাস্ত্রে যাকে হীন করেছে, তার হাওয়াতেও যে মানুষ দূষিত হয়ে যাবে! তুই ত সেদিন-কার ছেলে।"

ললিত সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি ওসব ব্যবস্থা মানিনে কাকীমা! নিষ্ঠুর শাসনের শিকলে আমরা সমাজকে বাঁধবার যতই চেষ্টা করব, ততই আমরা ধর্ম্ম হ'তে দূরে সরে যাবো।"

মহামায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি ধর্ম্ম যে কি বস্তু তাও জানিনে—ধর্ম্মের ভাণও করিনে! তখন যা কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা হয়েছিল, তাই ক'রেছিলাম। এতে যদি দোষ হয়ে থাকে ললিত, তা'র ভাগ আর কাউকে নিতে বলিনে। এ হতভাগিনী সামান্য নারী হলেও, সে ভার হাসিমুখে বইতে পারবে।" বলিতে বলিতে দুই বিন্দু অশ্রু তাহার চোখের কোণে টল টল করিয়া উঠিল।

ললিত অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "না কাকীমা, এতে তোমার একটুও দোষ হয়নি। লোকে তোমাকে যে চোখেই দেখুক আর যাই বলুক, কিন্তু ধর্ম্মের চোখে তুমি পতিত নও। তারা যেদিন তোমার এই কাযকে ঘৃণা না করে', হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়ে হাসি মুখে বরণ করে নেবে, সেই দিন আমাদের প্রকৃত সমাজ তৈয়ারী হবে।"

"নিজের জন্যে আমি একটুও ভাবিনে, আমার এতটুকু দুঃখও হয় না। আমার যত ভাবনা, যত দুঃখ এই অভাগী শ্মশানবাসিনীকে নিয়ে। জানিনে, এত বড় সংসারে আমাকে কেউ সাহায্য করবে কি না।"

ললিত কহিল, "আমি তোমাকে সাহায্য করব কাকীমা। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় মহামায়ার মুখখানা ভরিয়া উঠিল। আজ সে শান্ত সহজভাবে অনেক কথা বলিল, অনেক দিন সে এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই। আজ অজস্র কলকণ্ঠে হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার অবরুদ্ধ ভারাক্রান্ত মন যেন স্বচ্ছ স্নিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। তাহার মুখে যেন একটা নিরানন্দের ম্লানিমা বিরাজ করিত, স্বর্গীয় মাধুর্য্য আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া দিল। ললিত আজ যেন তাহাকে আর একটা নূতন মানুষ দেখিতে পাইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে ভাবিল, প্রকৃত মানুষকে মানুষ বাছিয়া লইতে পারে না। বাহিরের কার্য্যে যেটা ঘটিয়া উঠে, সেটাকে সমাজের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

সন্ধ্যার ধূসরতায় আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্ষণে ক্ষণে বাতাস নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তরু পল্লব মর্ম্মরিত করিয়া চলিয়া গেল।

ললিত মহামায়ার পায়ের ধুলা লইয়া বাড়ীর বাহির চলিয়া গেল। মহামায়া তখন কিয়ৎক্ষণ প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া থাকিয়া আবার তাহার ক্ষুদ্র সংসারে হাসিয়া কাঁদিয়া বকিয়া আপনাকে আবিষ্ট করিল।

৫

সুন্দরী শ্মশানবাসিনীর দেহের লাবণ্য যৌবনের মধুর স্পর্শে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহামায়ার স্নেহদৃষ্টি তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিপীড়িত হইয়া যায়, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে—হতভাগিনীকে কেন বুকে স্থান দিয়েছিলাম? বাঁচাইয়া কি কোনও উপকার করিয়াছি? যদি স্থান না দিতাম, তবে ত সেই মুহূর্ত্তেই উহার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হইত। এখন সেই মৃত্যু যে পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ঘটিবে।—চিন্তার আঘাতে মাহামায়ার কোমল নারীহৃদয় আহত হইয়া উঠিল। যতই সে মনকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে যে, মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গলের কিছুই নাই—কিন্তু কিছুতেই সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। মহামায়া ভাবিল, যদি উহার কোনও সদুপায় না করিতে পারি ভগবান, জানিনা কোন মহাপাপের ফলে জীবন্ত পোড়ানর পাপ আমার উপর চাপিয়া রহিল। মহামায়ার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসে।

"মা, আমার চুলগুলো বেঁধে দাও না।" বলিয়া শ্মশানবাসিনী মহামায়ার আঁচল চাপিয়া ধরিল।

মহামায়ার মনটা সেদিন বড় খারাপ ছিল। তাহার হাত হইতে আঁচল ছাড়াইয়া লইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "পোড়ামুখী, তুই চুল বেঁধে কি করবি? তোর চুল বেঁধে কায নেই।"

শ্মশানবাসিনী ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, "তবে আমার এ চুল রেখে কায কি মা? কেটে ফেলাই ভাল।"

মহামায়া তেমনি কণ্ঠে বলিল, "পোড়ার মুখী সে জন্যে আবার আমাকে বল্‌তে এসেছিস্ কেন? তোর কি হাত দুখানা অবশ হয়েছে? যা এক্ষুণি কেটে ফেলে দে।"

ক্ষোভে দুঃখে শ্মশানবাসিনীর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে নীরবে নত দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। অতীতের দিকে যত দূর দৃষ্টি যায়, ততদূর চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার ব্যতীত সেখানে কিছুই নাই। মহামায়াও নিজের ঐরূপ আকস্মিক রূঢ়তায় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া, আকুল আবেগে শ্মশানবাসিনীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, স্নেহ-ভাণ্ডারে যত রস আছে সমস্তটুকু দিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করে। অশ্রুজল আর বাধা মানিল না, দুই চোখের কোণ বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

শ্মশানবাসিনী চোখের জল মুছিয়া বলিল, "আর আমি কিছুই চাইনে মা, কেবল তোমার কোলে একটু

স্থান পেলেই সংসারের সমস্ত যন্ত্রণা সমস্ত অভাব আমার দুর হয়ে যাবে। আর তা যদি না দেবে ত কেন আমার এ অপবিত্র শরীর শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনে তোমার পুণ্যময় শরীর অপবিত্র করেছিলে? আমার এই অপবিত্র শরীরের আর মুক্তি কোথায় মা?"

চোখের জল আঁচলে চাপিয়া মহামায়ার দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। শ্মশানবাসিনী অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া বসিয়া রহিল।

৫

"শ্মশানী।"

শ্মশানবাসিনী চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথাই তাহার মুখে বাহির হইল না। লজ্জায় যেন তাহার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

"এস আমরা দুজনে পুণ্যবতী কাকীমাকে প্রণাম করে' তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে সংসারে প্রবেশ করি।" বলিতে বলিতে ললিত তাহার দক্ষিণ হস্ত নিজের হস্তের মধ্যে লইল। সেই মুহূর্ত্তে এক ঝলক উষ্ণ রক্তোচ্ছ্বাস শ্মশানবাসিনীর চোখ মুখ রাঙা করিয়া দিল। তাহার চোখে আকাশের রং বদলাইয়া গেল। বাতাসের স্পর্শ আর এক রকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল। এমনি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অন্তর বাহির ভরিয়া গেল যে, তাহার যত অভাব যত দৈন্ত সব যেন তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল।

ললিত শ্মশানবাসিনীর হাত ঈষৎ টানিয়া আবার বলিল, "চল শ্মশানী, আর দেরী করো না।"

উভয়ে গিয়া মহামায়ার পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

শ্মশানবাসিনী লজ্জিত মুগ্ধ মুখে কহিল, "আজ আমার শরীরের মুক্তি হল মা।"

মহামায়া ক্ষণকাল বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক।

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"
—ঋণ করেও ঘি খাওয়াই চাই,
চার্ব্বাকের ঐ চর্ব্বিতত্ত্ব
বলে গেছে ঠিক কথাটাই।
এ ঋণ কভু শুধ্‌তে না হয়,
ঘৃতে যে হয় বল উপচয়,—
তাই—ঘৃত ভোজীর চাইতে টাকা
পাওনাদারের সাধ্য কি ভাই?
ঋণ কেন কই,—ঘৃত ননী
চুরি করাও চল্‌তে পারে;
সাক্ষী ইহার মানতে পারি
বৃন্দাবনের পুরাণকারে।

না হরিলে মাখন সরে
হতেন জোয়ান কেমন করে?
আর—কংস সনে যুঝতেন এত
কেমন করে কানাই বলাই?
পিপে পিপে ঘিয়ে শুধু
জ্বল্‌ল দেশে যজ্ঞানল।
না পুড়িয়ে পেটে খেলে
গায়ে কিছু বাড়ত বল।
হীন হতো না দেশের দশা,
হতোনাক মারতে মশা,
কৌন্দিলে আজ গোবধ নিয়ে
হতনাক করতে লড়াই॥

শ্রীকালিদাস রায়।

ভৌতিক ঘটনা

(সম্পূর্ণ সত্য)

ভৌতিক ঘটনা বিষয়ে বাল্যকাল হইতে লোকমুখে অনেক গল্প শুনিয়া আসিতেছি এবং অনেক পুস্তকেও উহার বিবরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কখনও আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। কখনও মনে ভাবিয়াছি উহা দৃষ্টিবিভ্রম, কখনও মনে করিয়াছি উহা মানসিক বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার অনুকূলে কেহ কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে সর্ব্বদাই তাহার প্রতিকূলে তর্কজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তখন বুঝিতে পারি নাই যে দর্প-হারী মধুসূদন একদিন আমার সে দর্প চূর্ণ করিবেন এবং বাধ্য হইয়া আমাকে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই এখন বলি।

সে বৎসর ফাল্গুনমাস হইতে মুক্তাগাছা ও তন্নিকট-বর্ত্তী স্থানে কলেরা পীড়া প্রথমতঃ সামান্ত ভাবে আরম্ভ হইয়া, চৈত্র মাসের প্রথম ভাগেই মহামারীর আকার ধারণ করে। প্রতিদিন প্রায় ৩০।৪০ জন করিয়া লোক মারা যাইতেছিল। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের মনে এতই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া পড়িল যে, সন্ধ্যার পরে কেহ একাকী ঘরের বাহির হইয়া কোন স্থানে যাতায়াতে সাহসী হইত না। মুক্তাগাছায় প্রতি সপ্তাতে—বুধ ও রবিবারে, দুইটী বড় হাট বসিয়া থাকে। দূর দূরান্তরের পল্লীগ্রাম হইতে বহুলোক উহাতে নানাবিধ জিনিষ ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্ত উপস্থিত হইত। কলেরা-পীড়া ঐ প্রকার বিস্তৃতি লাভ করায় হাটে জনসমাগম ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তাগাছা টাউনের বা উহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমূহে যে সকল হিন্দুশ্রেণীর লোক মারা যায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্ত তাহাদের শব-দেহ মুক্তাগাছা হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে "আয়মান নদী-তীরস্থ শ্মশান" ভূমিতে নীত হইয়া থাকে। স্মরণাতীত কাল হইতে ঐ স্থান শবদাহের জন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে কোন জঙ্গলাদি নাই বটে, কিন্তু আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন ঐ শ্মশানঘাটের উপর এবং উহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল নানাবিধ জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। মুক্তাগাছার সুযোগ্য জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ঐ জঙ্গলে কোন এক সময়ে নাকি ব্যাঘ্র শীকারও করিয়াছিলেন ইহা লোকমুখে শুনিয়াছিলাম।

মুক্তাগাছার অন্যতম ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিকুমার সেন গুপ্ত মহাশয় ঐ শ্মশানে শবদাহকারীদিগের বিশ্রামার্থ যে একটি টীনের ঘর প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, তৎ-কালে উহার অস্তিত্বও ছিল না। তখন ঝড় বৃষ্টিতে তাহাদিগকে সময় সময় কষ্টভোগ করিতে হইত। পূর্ব্ব কথিত কলেরার প্রদুর্ভাব সময়ে বহু শব সৎকারার্থ ঐ স্থানে নীত হইতেছিল। তজ্জন্ত চিতায়, মৃন্ময় কলসীতে, দগ্ধাবশিষ্ট বংশখণ্ড ও কাষ্ঠে এবং শবদেহ সঙ্গীয় কাপড়, বালিশ, বিছানা, চাটাই ইত্যাদিতে শ্মশানভূমির অনেকটা স্থান যুড়িয়া থাকায় তদ্দর্শনে দর্শনকারীর মনে যেন কেমন একটা উদাস ভাবের সৃষ্টি হইয়া মানবজীবনের নশ্বরতা বুঝাইয়া দিতেছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমার পূজনীয় পিতৃদেব, মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের এষ্টেটে সদর-জমা বিভাগের প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন এবং আমি তখন তথাকথিত দ্বিতীয় মুন্সীর পদে কায করিতাম। উল্লিখিত রাজা বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে একখানা টম্‌টম্ গাড়ী ও একটি ভাল ঘোড়া দিয়াছিলেন। ঐ ঘোড়ার বিশেষ গুণ এই ছিল যে গাড়ীতে ও

জীন সোয়ারিতে সমানভাবে চলিত। গাড়ী-ঘোড়া আমাদের বাড়ীতে থাকিত। মুক্তাগাছা হইতে বাড়ী মাত্র চারি মাইল ব্যবধান। প্রতি সোমবার আমাদের সদর কাছারি বন্ধ থাকিত। কাযেই কোন প্রতিবন্ধক না পড়িলে রবিবার কাছারির পর সন্ধ্যাবেলায় পিতা মহাশয়ের সহিত বাড়ী আসিতাম। আমাদের সহিসের সহিত কথা ছিল, যেদিন পিতৃদেব বাড়ী যাইবেন সেদিন সে "টম্‌টম্" লইয়া সে মুক্তাগাছা আসিবে। অন্যথায় জীন চড়াইয়া সুধু ঘোড়াটি আনিয়া আমাদের সরকারী অস্তাবলে বাঁধিয়া রাখিয়া সে বাড়ী চলিয়া যাইবে; আমার প্রতীক্ষায় তাহাকে তথায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। কাছারি অন্তে যথা সময়ে আমি আস্তাবল হইতে ঘোড়া লইয়া বাড়ীতে রওনা হইব।"—সহিসকে কি ভাবে কোন্‌দিন মুক্তাগাছা আসিতে হইবে সে সংবাদ পূর্ব্বেই তাহাকে জানাইতাম।

মুক্তাগাছা হইতে যে পাকা সড়কে আমাদিগকে বাড়ী যাতায়াত করিতে হইত, তাহা উল্লিখিত শ্মশান ঘাটের প্রায় সংলগ্ন। সড়ক হইতে উহা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

চৈত্র মাস প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু কলেরার তখনও সম্পূর্ণ বিরাম হয় নাই। প্রত্যহ ২।৪ জন করিয়া মারা যাইতেছিল। সে দিন রবিবার। পিতৃদেব সেদিন বাড়ী যাইতে পারিবেন না; বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল। সুতরাং পূর্ব্বাদিষ্ট মত সহিস সরকারী আস্তাবলে ঘোড়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কাছারি অন্তে আমি বাসায় আসিয়া, প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় আমার সহ-কর্ম্মী গিরিশবাবু (ইনি তৎকালে হেড্ মুন্সীর পদে ছিলেন) আমাদের বাসায় আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে আজ রাত্রে তাঁহাদের একটা ফিষ্ট (ভোজ) আছে, উহা না খাইয়া আমাকে কিছুতেই আসিতে দিবেন না। আমার নানাবিধ অসুবিধার কথা তাঁহাকে জানাইয়া উহা হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি নাছোড়বন্দ! কাযেই বাধ্য হইয়া আমাকে ঐ ভোজের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায় খাওয়া শেষ হইয়া গেল। আমি তাড়াতড়ি আস্তাবলে আসিয়া তথাকার জনৈক সহিসকে ডাকিয়া আমার ঘোড়া বাহির করাইয়া উহাতে চড়িয়া বসিলাম এবং খুব আস্তে আস্তে উহাকে চালাইতে লাগিলাম। পুর্ণিমার রাত্রি। আকাশ মণ্ডল বেশ পরিষ্কার থাকায় পরিস্ফুট জোৎস্নার আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কাযেই ঘোড়ায় আসিবার পক্ষে আমার কোনই অসুবিধার কারণ ছিল না। মুক্তাগাছা হইতে প্রায় আধ মাইল পরিমাণ দূরে আসিলে পর রাজবাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল শুনিতে পাইলাম। তখন বিমল জ্যোৎস্নাধারায় চারিদিক আলোকিত, ঠিক যেন দিন বলিয়া প্রতীতি হইতেছিল। জীবজগৎ গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন থাকায় চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নিথর, নিশ্চল। পথিপার্শ্ব হইতে মাঝে মাঝে ঝিল্লিনিনাদ শ্রবণ পথে প্রবেশ করিয়া প্রাণে যেন কেমন একটা অবসাদের ভাব আনিতেছিল।

আমার ঘোড়া মন্থর গমনে চলিয়া যখন পূর্ব্বকথিত শ্মশান ঘাটের ঠিক সমসূত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই মুহূর্ত্তে শ্মশান ভূমির মধ্য হইতে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা ভীষণ হ্রেষারব উত্থিত হইল। ঐ শব্দে আমি চমকিত হইয়া ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, বিশাল বপু এক অশ্ব তথা হইতে পূর্ণবেগে আমার দিকে দিকে অগ্রসর হইতেছে। চক্ষু পালটিতেই উহা আমার ঘোড়া হইতে মাত্র ৪।৫ হাত ব্যবধানে আসিয়া পহুঁছিল এবং নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইল। দেখিলাম অশ্বটা সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ, পরিপুষ্ট দেহ, উচ্চতায় পাঁচ হাতের ন্যূন হইবে বলিয়া বোধ হইল না। উহার চক্ষুর্দ্বয় অগ্নি গোলকের সদৃশ। তাহা হইতে অতি প্রখর রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল। অশ্বটা কিয়ৎক্ষণ ঐভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, পরে উহার গ্রীবাদেশ

সমুন্নত করতঃ বিকটরূপে মুখব্যাদান করিল। তখন উহার মুখগহ্বর হইতে সহস্র সহস্র অনলশিখা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভীতি-জনক অব্যক্ত শব্দ উদ্গত হইতে লাগিল।

এই আকস্মিক ব্যাপারে আমার ঘোড়া চকিত, ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইল এবং উহার পাছে পাছে ঐ ভয়াবহ অশ্বও সমগতিতে ছুটিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনুমান মাত্র ৩।৪ হাত হইবে। তখন আমার মানসিক অবস্থা যে কিপ্রকার হইয়াছিল তাহা বোধহয় কাহাকেও আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এ অবস্থায় যদি হঠাৎ ভূপতিত হই, তবে আমার দুর্দ্দশার একশেষ হইবে ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক রেকাবীতে খুব ভর রাখিয়া অতি সাবধানে লাগাম ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। ধাবমান অবস্থাতেও ঐ ভীষণদর্শন অশ্ব মাঝে মাঝে হ্রেষারব করিতেছিল। যখনই ঐ শব্দ শুনিয়াছি, তখনই পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি উহার মুখ হইতে পূর্ব্বানুরূপ অনলশিখা বিকীর্ণ হইতেছে। এইরূপে ঐ ভয়াবহ অদৃষ্টচর অশ্ব;শ্মশানভূমি হইতে প্রায় দেড় মাইল পর্য্যন্ত আমার ঘোড়ার অনুগামী হইয়া পরে হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। যেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। উহার এই প্রকার অন্তর্দ্ধানে আমার ঘোড়া থামিয়া গিয়া বেদম হাঁপাইতে লাগিল। উহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম ঘামে শরীর ভিজিয়া গিয়াছে, বোধ হইল যেন এইমাত্র জল হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ এভাবে কাটিলে পর ঘোড়াটা যখন কথঞ্চিৎ সুস্থির হইল, তখন উহাকে আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া কতকটা অগ্রসর হইবার পর স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কিছু দূরে যেন ২।৩ জন লোক কথাবার্ত্তা বলিতেছে। আমি উহাদের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "ওখানে কাহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছ? শীঘ্র এদিকে আইস। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

আমার ডাকে খুব তাড়াতাড়ি দুইজন লোক আমার দিকে আসিতে লাগিল। নিকটস্থ হইলে পর আমি উহাদের মধ্যে একজনকে চিনিলাম। উহার নাম কানাইরাম দাস। আমি যে পাকা সড়কে ঘোড়া সহ দাড়াইয়াছিলাম, সেই সড়কের ঠিক উত্তর দিকে একটা পুষ্করিণী আছে, ঐ পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে উহার বাড়ী এবং পূর্ব্বপাড়ে একটা বটগাছের নীচে উহার একখানা দোকানঘর ছিল তাহা জানিতাম। এস্থানটার নাম "ঘোষবাড়ী", ইহা মুক্তাগাছার প্রায় আড়াইমাইল পূর্ব্বদিকে। কানাই বলিল, "গরমের জন্য ঘুম না আসায় দোকানঘরের বাহিরে বসিয়া আমরা কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম এমন সময় হঠাৎ আপনার ডাক শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছি।"

অতঃপর সে আমাকে এতরাত্রে আসার কারণ এবং কি বিপদ ঘটিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করায় আমি তাহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। সে এবং তাহার সঙ্গী লোকটী আমার কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক রহিল। পরে কানাই বলিল, "বাবু! আপনি কেবল পিতৃপিতামহের পুণ্য ফলে এবং ঘোড়ার উপর থাকায় আজ রক্ষা পাইয়াছেন। নতুবা আজ আপনার দুর্দ্দশার একশেষ হইত। চাই কি প্রাণগতিক অমঙ্গলও ঘটিতে পারিত। আমরা জানি ঐ স্থানটা বড় ভয়ানক। ওখানে ভয় পাইয়া বহুলোক মারা গিয়াছে। যা'ক, আপনি এখানে একটু বিশ্রাম করুন। আমরা আপনার ঘোড়াটাকে "টহলান" দিয়া ঠাণ্ডা করি, পরে আপনাকে বাড়ী পহুঁছাইয়া দিয়া আসিব। আজ কোন মতেই আপনাকে একাকী যাইতে দিব না।"

কানাইর কথামত তাহার দোকান ঘরের সম্মুখে বসিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিলাম। পরে তাহাদের মধ্যে একজনে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়া হাঁটাইয়া আমার অগ্রে অগ্রে চলিল এবং অপরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে হাঁটিয়া উহাদের সহিত রাত্রি দুইটার সময় বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমাকে পহুঁছাইয়া উহারা ফিরিয়া গেলে পর আমি ঘোড়াসহ প্রথমেই সহিসের ঘরের দিকে গেলাম। বহু ডাকা-ডাকির পর তাহার ঘুম ভাঙ্গিলে সে উঠিয়া ঘোড়া

লইয়া গেল। অতঃপর বাড়ীর মধ্যে যাইয়া মাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্য সকলকে ডাকিয়া উঠাইলাম এবং তাঁহারা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বেই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে জানাইয়া আমি শয়ন করিতে গেলাম। শয়নের পর ঐ ঘটনার কথা পুনঃ পুনঃ আমার মানস-পটে উদিত হওয়ায় বাকি রাত্রিটুকু সম্পূর্ণ বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়া গেল।

যে ভয়াবহ ঘটনার কথা বলিলাম ইহা স্বপ্ন নহে—কাল্পনিক নহে—পরন্তু প্রত্যক্ষ সত্য। ভূতযোনি সম্বন্ধে ইতঃ পূর্ব্বে আমার যে ভুল ধারণা ছিল তাহা আর নাই। এই ঘটনায় আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহলোকে ও ইহলোকের অন্তরালে এমন অনেক বিষয়ের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, যাহার কার্য্য কারণাদি নির্ণয়ে মানবের জ্ঞান ত দূরের কথা, দর্শন-বিজ্ঞানও পরাস্ত, অসমর্থ।

শ্রীহেমচন্দ্র অগ্রয়।

মানস মিলন

তোমার সুরভী শ্বাস আসিছে ভাসিয়া
আজি এ কুসুম-গন্ধ-মন্দির বাতাসে,
তোমার বক্ষের দোলে ওঠে তরঙ্গিয়া
জ্যোছনার পারাবার অনন্ত আকাশে ;
মনে হয় পাই বুকে পরশ তোমার,
সুখের আবেশে আসে মুদিয়া নয়ন,
জোছনার আবরণে যেন দুজনার
প্রথম বাসর রাতি, প্রথম চুম্বন !

দূরে আছ তবু যেন কত কাছে, তাই
বিরহ যে মনে হয় ছলনা কেবল,
শয়নে স্বপনে ফিরি রয়েছ সদাই
দিবানিশি প্রাণ তাই আবেশ-বিহ্বল।
তোমার মাধুরী দিয়া বিরচি স্বপন,
তোমায় আমায় তাই নিয়ত মিলন।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

প্রায়শ্চিত্ত

(গল্প)

"জ্বালা—জ্বালা—বড় জ্বালা—চারিদিকে আগুন জ্বলে গেল—পুড়ে গেল ! ওগো বাঁচাও—বাঁচাও—এ তুষানল থেকে আমায় বাঁচাও !!"

শোভাননী মেঝের উপর গড়াইয়া গড়াইয়া বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল। বাহিরে আকাশ হইতে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইয়া সারা পৃথিবীটা পুড়িয়া কালি হইয়া যাইতেছিল। চারিদিকে খাঁ-খাঁ করিতেছিল কোন খানে জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র ছিল না। বাহিরেও যেমন পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া তপ্ত বালুর ঢেউ খেলিতেছিল, শোভাননীর বুকের ভিতরেও তেমনি অনন্ত আগুনের দমক ছুটিতেছিল। তাহার সেই ছোট্ট সাজান ঘরখানির জানালা, দরজা, খাট, চৌক, শয্যা—ভিতরের যাহাকিছু ছিল সব যেন অনলশিখার মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল—ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত

যেন তাতিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছিল। বোধ হইতেছিল যেন মুহূর্ত্তমধ্যে শোভাননীর চিহ্নমাত্র রহিবেনা—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

কিন্তু এ কি, এত আগুনের ভিতর জলিয়া জলিয়াও ত সে পুড়িল না। সহস্র অনলজিহ্বা তাহার সমস্ত দেহকে লেহন করিল মাত্র। কিন্তু কৈ শোভাননী ত পুড়িল না। তখন সে বুঝিল এ সহজ আগুন নহে। এ আগুনের তাত আছে, দাহিকাশক্তি নাই। এ আগুন জালায়, ভস্মীভূত করেনা। তাই শোভাননী বুক চিরিয়া চীৎকার করিতেছিল,: "ওগো বাঁচাও—ওগো বাঁচাও এ তুষানল হ'তে আমায় রক্ষা কর। আমায় রক্ষা কর।"

২

হীরামণির বয়স চল্লিশের কিঞ্চিৎ অধিক। তাহার অন্য পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে না, সাহসও হয় না; কারণ সমাজ, সাহিত্য যেখানে সুরুচির গণ্ডিরেখা টানিয়াছে ইহাদের স্থান তাহার—বাহিরে। কিন্তু না দিয়া উপায় নাই বলিয়া দিতে হইল। পুরুষের অকীর্ত্তি ও পাপাচার যাহারা নিজেদের কলঙ্ক দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে, মনুষ্যত্বের অবমাননা, অভিশাপ যাহারা আবহমানকাল হইতে বক্ষে বহন করিয়া আসিয়াছে, যাহাদের নাম করিলে বিশ্বমাতা লজ্জায় মুখ ঢাকেন, হীরমণি তাহাদেরই একজন—বারবনিতা। বারবনিতা বলিলে যাহা বুঝায় হীরার জীবন সেই রূপেই কাটিয়াছে। সুখ দুঃখ, লজ্জা ঘৃণা, তোষামোদ উপেক্ষা—জগতের কাছে বারবনিতার যাহা প্রাপ্য, হীরা তাহার ষোল আনাই পাইয়াছে। বেশীর ভাগ যাহা পাইয়াছে তাহাতে তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে কি আরও বিকৃত হইয়াছে তাহা কে বলিবে?

হীরামণির বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি, তখন তাহার বালিকা-জীবনের যত পাপ, যত কলঙ্ক মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার অঙ্গে দেখা দিল। মাতৃত্বের পবিত্র স্পর্শেও সে কালিমা মুছিল না। যত দিন যাইতে লাগিল, কন্যা শোভাননী মাতার পুঞ্জীভূত পাপ ও ধিক্কার বুকে করিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পরিত্যক্ত আবর্জ্জনাস্তূপের ভিতর ফুটিলেও বিধাতা যেমন গোলাপকে রূপরস-গন্ধ-সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত করেন না, তেমনি তাহার কন্যা নারীজীবনের সুষমা-সৌরভ-রূপ-লাবণ্য কোনটী হইতে বঞ্চিত হইল না। যৌবনের প্রথম আবীর স্পর্শে হৃদয়মন যখন তার রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল, বাহিরেও তাহার লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়া তাহার জন্মার্জ্জিত কালিমাকে যেন ধুইয়া দিতে চাহিতেছিল। কিন্তু পুরুষের পাপ গ্লানি আবরণের জন্য সমাজ যে কলঙ্কের ছাপ তাহার কপালে দিয়াছে তাহা ত মুছিবার নহে! হীরা তাহার আহার বিহারে, সাজ-সজ্জায়, লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে কন্যাকে কেবল জানাইয়া দিতে থাকিল,—এ রূপ এ যৌবন এ সৌন্দর্য্য তাহার কেবল পুরুষের বিলাস-বাসনায় ঢালিয়া দিবার জন্য—পণ্যদ্রব্যের মত কেবল কলঙ্কমূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য। কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা যে তাহা চাহেনা নারীজীবনের কৌস্তভরত্ন এমন ঘৃণ্য, এমন জঘন্য ভাবে বিলাইয়া দিতে তাহার চিত্ত যে বিদ্রোহী হইয়া উঠে! কিন্তু উপায় কি? মা—যিনি সকল শুচিতা পবিত্রতার মূর্ত্তি—যাঁর বুকের উপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়াইয়া আছে—সেই মা যখন তাহাকে পণ্যের সামগ্রী করিতে চাহিতেছে, তখন আর তাহার বলিবার কি আছে? তাই মায়ের ইচ্ছায় শোভাননী আজ পুরুষের পশুবৃত্তির কাছে তাহার সর্ব্বস্ব বলি দিল। সেও বারবনিতা সাজিল। বিশ্বমানব লজ্জায় মুখ ঢাকিল। প্রাণহীন স্থবির সমাজ সেদিকে চাহিল কি না জানিনা।

৩

শোভাননী এখন বারবনিতা। আর সে হীরামণির কন্যামাত্র নয়। এখন সে মর্ম্মে-মর্ম্মে, বুঝিতেছে তাহার জীবন কি, তাহার জীবনে সমাজের প্রয়োজন কি, মনুষ্যত্বের যে নিদারুণ অভিশাপ, সমাজের যে কুৎসিত ক্ষত এতদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাহার কাছে

ঢাকা ছিল, আজ সে তা'র স্বরূপমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তার পর যখন সে তাহার আপন মায়ের কথা মনে করিল, তখন ঘৃণা ও লজ্জায় তাহার নিজের মাংস নিজেই খাইতে ইচ্ছা হ'ল। তাহার ভিতরে যেন একটা সর্ব্বগ্রাসী বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল—"এই মা, আর এই কন্যা! পৃথিবী এখনও এদের বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে? এখনও রসাতলে যাচ্চে না! আর ঈশ্বর, ধন্য তোমার সৃষ্টি! এই বীভৎস দৃশ্য তোমার চোখের সম্মুখে তুমি বেশ দেখচ! তোমার সৃষ্টি পুড়ে যাচ্ছে না!" ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পা টলিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না—মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। শুইয়া পড়িয়া, স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল - সে গড়াইয়া গড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

৪

তখন বৈশাখ মাস। দুপুর বেলা, হীরামণি তাহার ঘরের ভিতর একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল। হঠাৎ মেয়ের চীৎকার শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দ্রুতপদে তাহার ঘরে গিয়া ডাকিল, "শোভা—শোভা, কি হয়েছে তোর?"

হীরামণির ডাক যেন বজ্রপাতের মত তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহার মগজ চিরিয়া বাহির হইয়া গেল। সে গুলিবিদ্ধ বাঘিনীর মত একলম্ফে উঠিয়া সজোরে কবাট খুলিয়া মায়ের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে চাহিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন আগুনের ফিন্‌কি ছুটিতেছিল। অস্বাভাবিক রুক্ষকণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কে তুমি—তুমি এখানে কেন?"

হীরামণির মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তাহার সমস্ত শরীর যেন সেই অগ্নিদৃষ্টিতে ঝলসাইয়া গেল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। মন্ত্রচালিতবৎ সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

শোভাননী আবার সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া উন্মাদের মত ঘরের ভিতর ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—ধন্য সে বিধাতা, যার সৃষ্টি এই সুন্দর নরক—যার বিধানে এই নরকে মা ও কন্যার সৃজন! আর শত ধন্যবাদ সেই সমাজকে যে রক্ষা করে যে বাঁচাইয়া রাখে এই নরককে!"

তাহার পর দুইদিন আর শোভাননীর ঘরের দরজা খুলিল না। কোন সাড়াও তার আর পাওয়া গেল না।

৫

সন্ধ্যা। বৈশাখী সূর্য্যের তীব্র রৌদ্রতাপে সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পৃথিবী যেন সেদিন একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছিল। গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত যেন নড়িতে ক্লান্তি বোধ করিতেছিল। শোভাননী তাহার ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া ভাবিতেছিল—সত্যই ত, হতভাগিনী মা আমার, কেন তাকে তিরস্কার করিলাম? তার কি দোষ? সমাজের কুৎসিৎ ক্ষত ঢাকিবার জন্য, পুরুষের পৈশাচিক কীর্ত্তি ঢাকিবার জন্য, যে লজ্জা ও পাপের বোঝা সমাজ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই ত সে আমাকে পাইয়াছে। এতে আর তার দোষ কি দিব?

ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে অস্ফুট স্বরে ডাকিল—মা।

বুভুক্ষু শিশুর মত ছুটিয়া গিয়া হীরামণির উত্তর দিল—"কি মা?"

শোভাননী উঠিয়া তাহার নিকট যাইতেই হীরামণি বিপুল আবেগে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। শোভাননীর অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার ফাটিয়া গেল। সে সবলে মাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কেবল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের বুক ফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস ছাপিয়া গেল। সেই বাঁধভাঙ্গা চোখের জলে পায়ের তলার মাটি ভিজিয়া ফুলিয়া উঠিল।

কতক্ষণ এমনি ভাবে কাটিয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া শোভাননী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এ সংসারের শুধু এই ধিক্কার আর গ্লানি ছাড়া কি আর কিছুতে আমাদের অধিকার নেই?"

শোভাননীর বুকের ভিতর যে প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছিল তাহার তাপে আজ যেন হীরামণির ভিতরেও প্রায়শ্চিত্তের আগুন জ্বলিল। সে অপরাধীর মত উত্তর দিল, "কি আর বল্‌ব মা? সবই ত চোখের সামনে দেখলি।"

মায়ের এই অনুতাপ দগ্ধ অসহায় উত্তরে শোভাননীর বুকের ভিতর আবার তোলপাড় করিয়া উঠিল। সে কোনরূপে আপনাকে সংযত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা, তুমি ত এ সব জানতে; তবু বুকের রক্ত ঢেলে কেন আমায় মানুষ করেছিলে? যে বিধাতার বীভৎস সৃষ্টি এ মানুষ, সেই পাথরের পায়ে কেন আমায় ছুড়ে ফেলে দিলে না?

হীরামণির বুকের ভিতর যেন চড় চড় করিয়া উঠিল, সে মেয়েকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "পারি নি মা। ঐ মুখ, ঐ চোখ দেখে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলে গিয়েছিলাম—তাই পারিনি। কি করব মা, সংসার যাকে পায়ে ঠেলে দিয়েচে, সমাজ যাকে আব র্জ্জনা বলে দূরে ছুড়ে ফেলছে—ঈশ্বর যাকে নারীর সকল সম্পদ, সকল সুখ সাধ হতে বঞ্চিত ক'রে মুখ ফিরিয়েছেন, সেই অভিশপ্ত বুভুক্ষু হৃদয়ে একবার অমৃতের আস্বাদ পেয়ে আর যে তা ভুলতে পারি নি মা!" বলিতে বলিতে হীরামণির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে আর কথা বলিতে পারিল না।

শোভাননী একদৃষ্টে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল—যেন তাহার মায়ের মুখে কি এক অপূর্ব্ব সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ, দুই নয়ন বহিয়া মন্দাকিনীর ধারার মত মাতৃস্নেহরাশি গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। তাহার আলুলায়িত কেশদাম যেন সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া শোভাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষে টানিয়া লইবার জন্য উড়িয়া পড়িয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিতেছে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। আকাশ বাতাসে দূরাগত বীণার ঝঙ্কারে সে যেন কেবলি শুনিতেছিল মা—মা—মা।

৬

পরদিন প্রভাতে শোভাননীকে যখন দেখা গেল, তখন আর তাহাকে চিনিবার যো ছিল না। বৈশাখের প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপট খাইয়া কলাগাছগুলি যেমন হতশ্রী হইয়া যায়, শোভাননীর দশাও সেদিন ঠিক সেইরূপই হইয়াছিল। তার উস্কোখুস্কো চুল, কোটরগত চক্ষু অপরাধীর মত শুষ্ক মুখ দেখিলে মনে হয় যেন কাল-বৈশাখীর যত ঝাপট, যত গর্জ্জন এই অসহায়া বেচারী মেয়েটার উপর দিয়াই গিয়াছে। শোভাননী নিবিষ্ট মনে ভাবিতেছিল পূর্ব্বরাত্রে সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা কি সত্যই স্বপ্ন, না সত্যেরই স্বপ্নরূপ? যাহাই হউক—সত্যই হউক আর স্বপ্নই হউক—তাহা তাহার মথিত ক্ষুব্ধ মনকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছে, তাহার দিশাহারা হৃদয়ে যেন কিনারার একটা ক্ষীণ আলো আনিয়া দিয়াছে। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে সে বুঝিতে পারিল, এ নরক হইতে মুক্তি পাইবার দুইটি উপায় আছে—এক সেই কুৎসিৎ স্মৃতির আধার এই দেহটাকে পোড়াইয়া শোধন করিয়া দেওয়া; আর এক, এই নরক ছাড়িয়া পলাইয়া সংসার জীবনের পুণ্যপ্রেমের অমৃতধারায় সারা-জীবনের পাপরাশি ধুইয়া ফেলা। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? কে এই নারীকে স্থান দিবে? কে এই পাপিনীকে কোল দিয়া, ধুইয়া মুছাইয়া আবার মানুষ করিয়া লইবে?

সমাজ? কি সাহসে এমন দুরাশা সে করিবে? মানুষের যাহা অধিকার, সে অধিকার কি তাহার আছে? সে যে পতিতা, সে যে বারবনিতা। সমাজেরই বীভৎস, প্রয়োজনের জন্য তাহার সৃষ্টি হইলেও, সে ত তাহাকে আর গ্রহণ করিতে পারে না। তথাপি শোভাননী

আশা ছাড়িল না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, দেখি যদি স্থান পাই, যদি তুষানলে দগ্ধ হইয়াও আবার মানুষ হইবার সুযোগ পাই।

৭

সেই দিন সন্ধ্যায় গ্রামের মসজিদে যখন উপাসকদের লইয়া মৌলবী গোলাম রহমান বিশ্বপিতার জয়গান করিতেছিলেন, শোভাননী ঝড়ের মত দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের তলায় আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল —ওগো তোমরা আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর। আমার এখনও বেঁচে সাধ মেটেনি—এমন সুন্দর পৃথিবী এখনও আমার দেখে আশা মেটেনি। এই স্বর্গে আমার একটু স্থান দাও, আমায় বাঁচাও!"

যাহারা মসজিদে উপাসনা করিতে আসিয়াছিল, তাহার এই বুকফাটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহারা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কি হইয়াছে, কোথা হইতে সে আসিয়াছে, আর কেনই বা সে মসজিদে আসিয়াছে তাহার কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিল না। মৌলবী গোলাম রহমান বড় কোমল হৃদয় লোক। তিনি তাঁহার স্বভাব-কোমল মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মা তোমার?"

এমন অপ্রত্যাশিত স্নেহময় সম্বোধনে শোভাননীর হৃদয়াবেগ যেন সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল। সে মৌলবীর পা দুইখানি বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা তোমরা আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর—না হয় লাথি মেরে আমায় মেরে ফেল।"

একটা দরদ, একটা বাৎসল্যে মৌলবী সাহেবের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি সস্নেহে তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইলেন। তারপর জিজ্ঞাস করিলেন, "মা, বল আমরা তোমার কি করতে পারি!"

শোভাননী নিতান্ত অপরাধীর মত জড় সড় হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "বাবা, তোমরা আমাকে ছুঁয়োনা—তোমরা সরে যাও। আমি পাপিষ্ঠা—আমি পতিতা—আমি নরকের কীট। আমাকে ছুলে তোমরা পাপে পুড়ে মরব।"

মৌলবী এইবার যেন কতকটা তাহার মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পূর্ব্ববৎ শান্ত ধীর স্বরে বলিলেন, "তুমি যেই হও মা, এ ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির; এখানে কোনও ভয় নেই তোমার। তোমার যত কালো, যত ময়লা এর পবিত্র স্পর্শে সব সোনা হয়ে যাবে।"

শোভাননী এই অপ্রত্যাশিত আশার কথা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগে আত্মহারা হইয়া গেল। তাহার হাত পা সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। সে অনেক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল না। তার পর অশ্রুভরা আঁখি দুইটি তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে মৌলবী সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু বাবা, আমার পাপের কথা শুনলে স্বয়ং খোদাও যে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আমি ত মানুষ না বাবা, আমি যে নরকের কীট, পতিতা বারবনিতা।"

মৌলবী পূর্ব্বেই এইরূপ একটা কিছু অনুমান করিয়াছিলেন, কাযেই শোভাননীর কথায় তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তিনি তেমনি শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তা'হও তুমি বারবনিতা—হও তুমি পতিতা। তুমি যখন পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের ছায়াতলে এসে দাঁড়িয়েছ, তখন তোমার আর কোন ভয় নেই। কিন্তু মা, আমি এখনও বুঝতে পারিনি তুমি কি আশা নিয়ে এখানে এই ইস্লাম ধর্ম্মের মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছ।"

এই বার শোভাননী তাহার আশাহত হৃদয়ে এক বল পাইল। সে বলিল, "বাবা, আমি আর কিছু চাইনে। শুধু আমায় একটু স্থান দাও—আমাকে বাঁচাও। দিনরাত তুষানলের মত আমার জীবন জলে গেল।"

মৌলবী বলিলেন, "কিন্তু মা, তা'হলে তোমায় যে প্রায়শ্চিত্ত করে এই পবিত্র ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে।"

শোভাননী অস্বাভাবিক আগ্রহের সহিত বলিল, "বলুন, কি প্রায়শ্চিত্ত আমার করতে হবে, আমি সব করতে প্রস্তুত আছি। দিন রাত যে তুষানলে জলে মরছি, এর চাইতেও ভীষণতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে আরও কি আছে? যদি থাকে, বলুন আপনারা, আমি এখনি প্রস্তুত।"

মৌলবী বলিলেন, "না মা, সে সব তোমার কিছুই করতে হবে না। শুধু তোমায় পাপপথে অর্জ্জিত যা' কিছু আছে, সব তোমাকে ত্যাগ করতে হবে—তোমার বাড়ী ঘর,—পোষাক পরিচ্ছদ, এমন কি পরিধেয় বস্ত্রখান পর্য্যন্ত তোমায় ত্যাগ করতে হবে—যাতে তোমার পূর্ব্ব জীবন ধারার চিহ্নমাত্র আর না থাকে। যে শরীর নিয়ে খোদার কাছ থেকে এসেছিলে, আবার শুদ্ধ সেই শরীর নিয়ে খোদার পথে অগ্রসর হতে হবে।"

শোভাননী কহিল, "আমার ত সে সব কিছুই নেই বাবা—সে পাপিষ্ঠার যা' কিছু ছিল, সব ত সেইখানেই ফেলে এসেছি। যদি ইচ্ছা করেন, এই মুহূর্ত্তে সে সমুদয় আপনারা ভস্মীভুত করে দিয়ে আসতে পারেন। শুধু আমায় আর সে নরকে যেতে আদেশ করবেন না। বরং দিন রাত এমনি করে জলে জলে তিলে তিলে মরবো তথাপি সে নরকের দিকে আর তাকাতে পারবো না।"

মৌলবী বলিলেন, "না মা, সেখানে আর তোমায় যেতে হবে না, এখন তোমাকে শুধু এই পরিধেয় বস্ত্র খানি আর মাথার চুলগুলি পরিত্যাগ করতে হবে।"

শোভাননী কাতর কণ্ঠে সকলের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবা, আপনারা দয়া করিয়া আপনাদের এই পাপিষ্ঠা কন্যাকে লজ্জা নিবারণের মত একটুকরা ছেঁড়া কাপড় ভিক্ষা দিন, আমি নরকের এ শেষ চিহ্ন টুকু পুড়িয়ে ফেলে রক্ষা পাই।"

মৌলবী বলিলেন, "সে জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই মা। সে ব্যবস্থা আমরাই করব।"

তার পর শোভাননীকে সেই খানে রাখিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন। শোভাননী মসজিদের দুয়ারে আসিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল—গুন গুন করিয়া বলিতে লাগিল, "দয়ার অবতার, পাপীর দেবতা, আমাকে দয়াকরে এ তুষানল হতে বাঁচাও।"

পর দিন সকালে যখন সকলে আবার মসজিদে মিলিত হইলেন, তখন স্থির হইল, দুই দিন পরে শোভাননী পবিত্র ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিতা হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার।

বিমাতা

(গল্প)

বিপত্নীক দীননাথ যখন বিনা আড়ম্বরে রোগী দেখিবার ছল করিয়া পঞ্চদশ বর্ষীয়া সুশীলাকে বিবাহ করিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার পুত্র বিমলের বয়স ছয়বৎসর। মাতৃ-বিয়োগের পর হইতে বিমল দীননাথের দূর সম্পর্কীয়া এক প্রতিবেশী ভগিনীর নিকট পালিত হইতেছিল। তাহার নাম মানদা। মানদা সময়ে সময়ে দীননাথকে জ্বালাতন করিতে ছাড়িত না—কবে তিনি বিমলের জন্য আর একটী মা আনিবেন। দীননাথ হাঁ না কিছুই বলিতেন না। পত্নী বিয়োগের পর যখন দুই বৎসর কাটিয়া গেল তখন সকলেই এমন কি মানদাও মনে করিল যে দীননাথ আর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিবেন না। তাহার এই ব্যবহারে একদল লোক তাঁহার খুব প্রশংসা

করিতে লাগিল; আর একদল, যাহাদের অনেকেই কন্যাদায়গ্রস্ত, তাঁহার এই অসাময়িক বৈরাগ্যভাবে বড়ই দুঃখিত হইল। এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে সংসারী হইবার জন্য উপদেশ দিতে ও উৎসাহিত করিতে লাগিল; কিন্তু দীননাথের বেশী কথা না বলাই স্বভাব তাই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা যত্ন খরপ্রবাহ মুখে ক্ষুদ্র তৃণ খণ্ডের মত ভাসিয়া গেল।

তারপর দরিদ্রকন্যা সুশীলা যখন দীননাথের ন্যায় সুশিক্ষিত ধনবান যুবকের অঙ্কশোভিনী হইল, তখন অনেক কন্যার পিতা ক্ষুণ্ণ হইলেন, তাঁহাদের অনুতাপের আর অবধি রহিল না। কেবল দীনেশ রায়ের বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হইল। তিনি রাগে ফণাবিস্তারী বিষধর সর্পের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার ন্যায় ধনী সমাজ-পতির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, শেষে কিনা দীননাথ গরীব নগণ্য শশধর দাসের কন্যাকে বিবাহ করিল? ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে? তিনি রাগে দুঃখে, অভিমানে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলেন যে, তিনি যদি এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ না লইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি এক বাপের বেটাই নন।

বাবা নূতন মা আনিয়াছেন শুনিয়া বিমলের শিশু হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বাবা তাহাকে কত ভাল-বাসেন, তাই তাহার মায়ের জন্য কান্না দেখিয়া আবার একটি মা আনিয়াছেন একথা সে পিসীমা মানদাকে ও নিজের সঙ্গী সাথীদিগকে বলিয়া আর শেষ করিতে পারিল না। তাহার শিশু হৃদয়ে ভবিষ্যতের কতই চিত্তহারিণী চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। কাছে যাইলে মা কতই আদর করিবেন; আদর করিয়া কত কথাই বলিবেন; তাহাকে সোহাগভরে চুম্বন করিবেন; সে মায়ের কোলে উঠিয়া, এতদিন কোলে না ওঠার শোধ তুলিয়া লইবে। এইরূপ কত শত চিন্তা যে বিমলের মনে আসিতে ও যাইতে লাগিল তাহার কোন সীমা নাই। দীননাথের দারওয়ান রঘুনাথ আসিয়া বাবুর বিবাহের সংবাদ দিয়া গিয়াছিল। সংবাদ পাইবামাত্র সে ছুটিয়া গিয়া মানদাকে বলিল, "পিসীমা, বাবা যে আমার জন্যে নতুন মা এনেছেন, আমাকে শিগ্গি করে পাঠিয়ে দাও আমি গিয়ে মার কোলে চড়বো!"

মানদা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, নেবে। তোর মা যেন তোর জন্যে কোল পেতে বসে আছে। সৎমা, তার জন্যে আবার এত লাফালাফি!"

অভিমানে মুখখানি গম্ভীর করিয়া বিমল বলিল, "না করবেন না, তুমি যেন সব জান। এই আমি চল্লাম রাখালদা'কে বল্‌তে, আমায় বাড়ী নিয়ে যাবে।"—বলিয়া বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রাখাল এই বাড়ীর চাকর। সে তাহার নিত্য অভ্যাস অনুযায়ী গরুর জন্য খড় কাটিতেছিল। এমন সময় বিমল যাইয়া তাহার গলাটি সাদরে জড়াইয়া ধরিয়া অনুচ্চ স্বরে কহিল, "রাখালদা, আমার যে নতুন মা এসেছেন, তাকি তুমি জান না? আমাকে বাড়ী রেখে আস্‌তে হবে। আমি খেয়ে ঠিক হয়ে নিচ্ছি, তুমিও কায সেরে নাও।"—এই বলিয়া রাখালের মতামত জানিবার অপেক্ষা চেষ্টা না করিয়াই পুনরায় মানদার নিকট আসিল; বলিল, "পিসীমা আমায় খেতে দাও; রাখালদা'কে বলে এলাম সে আমাকে নিয়ে যাবে।"

মানদা বালকের এই অকপট চপলতা ও মাতৃবিয়োগ বিধুর হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া সজল নয়নে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুখ দুঃখ মিশ্রিত অশ্রু মুক্তামালার ন্যায় তাহার গণ্ড সিক্ত করিল।

২

বিমলকে খাবার দিয়া মানদা কহিল, "হাঁরে বিমল, তোর সৎমা যদি তোকে আদর না করে তাহলে তুই কি করবি?"

বিমল আপন মনে মাথা নিচু করিয়া তাড়াতাড়ি খাইতেছিল। পিসীমার প্রশ্ন শুনিয়া কহিল, "কেন, বাবাকে তা'হলে সব কথা বলে দেবো।"

মানদা সস্মিতাননে কহিল, "বাবাও যদি তোর কথা না শোনেন, তা'হলে?"

বিমল পুনরায় মাথা উঁচু করিয়া স্নিগ্ধ হাসির একটা তড়িৎ প্রবাহ তুলিয়া কহিল, "এই যা পিসীমা যেন ক্ষেপে গেছেন। তিনি যে আমার বাবা; বাবা কি কখনও আদর না করেন? কই পিসেমশায় তো রতনকে বকেন না, তাকে কত আদর করেন।"

মানদা আর কোন কথা বলিল না। বলিবার কিই বা ছিল? অত বড় কথাটার উপর কি আর কোন জবাব দেওয়া যায়? রতনের বাবা রতনকে কত আদর করেন; তাহার বাবাই বা তাহাকে করিবেন না কেন? বালকের সরল প্রাণের এই স্নেহমাখা কথা শুনিয়া মানদা তাহার কান্তিময় বদনের প্রতি একদৃষ্টে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। আহা মরি মরি! কি স্বর্গীয় উপাদানে সরল বালকের হৃদয় গঠিত! তাহাতে কুটিলতা অথবা কপটতার লেশমাত্র নাই; এ রাজ্যে অবিশ্বাসের প্রবেশাধিকার নাই; তাহাতে আছে কেবল অকপট প্রেমের একটি অফুরন্ত স্বর্গীয় প্রতিভা, যাহা একবার নয়ন পথে পতিত হইলে মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়, শোক, তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা দৈববলে যেন কোথায় মিলাইয়া যায়; হৃদয়ে ভাবানন্দের খর প্রস্রবণ উঠিয়া তাহা শীতল করিয়া দেয়। মানদা অনিমেষ-লোচনে তাই বিভোর হইয়া দেখিতেছিল।

এমন সময় রতন আসিয়া কহিল, "মা, বিমুকে খেতে দিয়েছ, আমাকেও দাও। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

"তুই এতক্ষণ ছিলি কোথা? বস্, দিচ্ছি।"

রতনকে আসিতে দেখিয়া বিমল উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "ওরে রতন, আমার যে নতুন মা এসেছেন। আমরা তাই যাব। তুইও যাস যদি, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে; রাখালদা' এল বলে।" বলিয়া রতনের হাত ধরিয়া নিজের থালার নিকট বসাইল। রতন বিনা আপত্তিতে ভোজন আরম্ভ করিয়া দিল।

মানদার স্বামী নরেন্দ্রনাথ অদূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। বালক-হৃদয়ের অকপট প্রেম বিনিময় দেখিয়া তাহার বিশাল হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া কহিল, "দেখ মানু, বিমল আর রতনকে দেখে সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যেন তারা দুই সহোদর। সহোদর ভাইদের মধ্যেও এত স্নেহ, এত মায়া আছে কি না সন্দেহ।"

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই বালকদ্বয়ের প্রীতি ও স্নেহের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তাহাদের প্রীতিময় দাম্পত্য জীবনের একটি অভিনব মুকুল আপন পুণ্যবলে অপর একটীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের গৃহে দেব-ক্রীড়ার উপবন সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! হায়, যাহারা মিলিত হইয়া সে সংসারে সুখের প্রমোদ-উদ্যান রচনা করিয়া মাত্র তাহাদের খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময় কালের অনন্ত লীলার গুণে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মানদা কহিল, "তুমিও যাও; মুখহাত ধুয়ে জলযোগটা সেরে নাও। আজ এখনি রাধানগর যাব মনে করছি। দীনুদা বিয়ে করে এনেছেন তা শুনেছ ত?"

নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "সে বিবাহের ঘটক তো আমি।"

মানদা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কি রকম? কৈ একথা তো আমাকে আগে বল নি।"

"বল্লে পাছে গরীবের ঘরে বিয়ে করছেন বলে বাধা দাও এই জন্যে। শশধর দাদাকে চেনো তো, তাঁরই মেয়ে। দেখতেও যেমন সুন্দর, গুণেও তেমনি; যেন লক্ষ্মী। দীনুর আগাগোড়া গরীবের ঘরে বয়স্থা মেয়ে বিয়ে করবার ইচ্ছা ছিল; সেই জন্যে আমি শেষে বেচারাকে উদ্ধার করে দিলাম।"

"বেশ বেশ খুব বাহাদুর। এখন যান তো বলি ও ঘটক মশায় আর দেরী করবেন না। বেলা গেল; আজ না যেতে পারলে বিমু আমাকে ছিঁড়ে খাবে।"

"এই যাই"—বলিয়া নরেন্দ্রনাথ ভোজনরত বালক-দ্বয়ের প্রতি আর একটী প্রীতিপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া চলিয়া গেল।

৩

সেদিন কোন কারণে রাধানগর যাওয়া আর মানদার হইল না। রাত্রে বিমল ত ঘুমাইল না; কথার ফোয়ারায় মানদারও চক্ষু হইতে সুপ্তির অঞ্জন বৃষ্টির জলের মত ধুইয়া দিল। নানা প্রকার কল্পনা জল্পনার পর বিমল শেষে কহিল, "পিসীমা, আমাকে তুমি নিয়ে গেলে না, নতুন মা কাল নিশ্চয় খুব রাগ করবেন। তখন কিন্তু আমি তোমার উপর দোষ চাপাব, একথা যেন মনে থাকে।"

নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া মানদা ক্রমশই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে একটু বেশী রকম বিরক্ত হইয়া কহিল,"বেশ বেশ তাই কোরো, এখন তো ঘুমোও, একরত্তি ছেলে তার আবার কথার বাহার দেখ।" —বকুনি খাইয়া বিমল চুপ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল

তার পর দিন সকালে সকলে গোযানে রাধানগর যাত্রা করিল। গাড়ী থামিতে না থামিতে বিমল বাড়ী ঢুকিয়া ব্যস্তবাগীশের মত ডাকিল "বাবা!" দীননাথ তখন ভিতরের বারান্দায় দন্তধাবন করিতেছিলেন। পুত্রের গলার স্বর শুনিয়া তাঁহার পিতৃহৃদয় অপত্যস্নেহে ভরিয়া উঠিল; আনন্দের সহিত কহিলেন, "কিরে বিমু এলি নাকি? তোর পিসীমারা কৈ?"

বিমল নাচিতে নাচিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, "ঐ যে তাঁরা পিছনে আসছেন। বাবা, মা কৈ? আমি যে অনেকদিন মার কোলে উঠি-নি।"

দীননাথ সহাস্যে বদনে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সুশীলাকে দেখাইয়া দিলেন। সুশীলা তখন সংসারের কায কর্ম্ম শেষ করিয়া শয়ন কক্ষের রোয়াকে বসিয়া ছিল। বিমল যেন কতদিনের পরিচিত, দৌড়াইয়া গিয়া তাহার ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় দ্বারা সুশীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল মা। বালকের এই মধুর সম্ভাষণ সুশীলার কর্ণে যেন দেবসঙ্গীতবৎ মনে হইল। তাহার হৃদয়-সরসী মাতৃস্নেহের পূত সলিলে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; তাহার আকাঙ্ক্ষিত অপত্যস্নেহ আশীর্ব্বাদী বারির মত বিমলের মস্তকে পতিত হইয়া তাহার সরল হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিয়া দিল। উভয়ে স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া পরস্পরকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

দীননাথ এই মধুর ভাব বিনিময় স্বচক্ষে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি সহর্ষ সতৃষ্ণ নয়নে মাতাপুত্রের পবিত্র মিলন দেখিয় মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। নয়নদ্বয় হইতে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার হৃদয় মধুময় করিয়া দিল। সুশীলার অন্তঃকরণ যে এত উচ্চ ও তাহার হৃদয়ের গভীর কন্দরে এরূপ শীতল স্নিগ্ধ স্নেহের উৎস এতদিন অধারা ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তিনি আজ বেশ ভাল রূপেই জানিবার অবকাশ পাইলেন। আপন স্বামী পুত্রকে ত সবাই স্নেহাদর দেখাইতে পারে। কিন্তু সপত্নী-পুত্রের জন্য যাহার হৃদয়ে অকপট অফুরন্ত স্নেহরাশি সঞ্চিত থাকে, সে রমণী কখনও পৃথিবীর নহে, তাহার হৃদয় দেবীর মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ।

প্রথম মিলনাবেগের উচ্ছ্বাস কিছু প্রশমিত হইলে সুশীলা "বিমু, গোপাল আমার!" বলিয়া বিমলের কুসুমাধরে অজস্র চুম্বন ঢালিয়া দিল। বিমল বহুদিন হইতে এমন আদর পায় নাই; তাই সে এই আদরে যেন একেবারে গলিয়া গেল। খানিকপরে সে মাথা উঠাইয়া মায়ের মুখে মুখ দিয়া কহিল, "মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?"

সুশীলা আবার তাহার অধরে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া উত্তর করিল, "রাগ করবো কেন চাঁদ? আমাদের যে তুমি সাত রাজার ধন এক মাণিক, তোমার উপর কি রাগ করতে পারি? তুমি যে আমাদের চক্ষের মণি।"

বিমল অতশত কিছু বুঝিল না। তবে এইটা বুঝিল যে, মা তার উপর রাগ করেন নাই; সে যে মিছামিছি মার উপর সন্দেহ করিয়াছে এই ভাবিয়া লজ্জায় মার কোলে মুখ লুকাইল। কিছুক্ষণ পরে আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "মা, পিসীমা বলেছেন, তুই গেলে তোর মা তোকে কোলে নেবেন না।"

"কেন নেবো না চাঁদ? তোমার মত সোণার চাঁদ

বুকভরা ধনকে কোলে না করে কি থাকতে পারি ?"

ইতিমধ্যে মানদা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা কেহ টের পায় নাই। মানদার সম্বোধনে উভয়ে একরকম অপ্রতিভ হইয়া গেল। মানদা সস্মিতাননে কহিল, "বলি, মা-বেটায় চুপি চুপি পরামর্শটা কি হচ্ছে শুনি।"

বিমল লজ্জা ও ভয়ে মুখ লুকাইল। সপ্রতিভ সুশীলা দাঁড়াইয়া অবনত বদনে কহিল, "তুমি যে কখন এসেছ তা আমি জানতে পারি নি দিদি।"

মানদা হাস্য করিয়া কহিল, "তাতে কি হয়েছে বউ ? আমি ঘরের লোক বইতো নই।"

নম্রমুখী সুশীলা ধীরকণ্ঠে কহিল, "কতভাগ্যে তুমি এসেছ, তোমার আদর অভ্যর্থনা করা যে কর্ত্তব্য আমার।"

মানদা কহিল, "সে জন্যে তোমাকে আকুল হতে হবে না। তোমার মুখের মিষ্টি কথাই আমার কাছে শত অভ্যর্থনার চেয়ে অনেক বেশী।" বলিয়া আবেগ-ভরে সুশীলার অবনত চিবুকটী ধরিয়া তাহার মুখখানি উত্তোলন করিয়া স্নেহভরে একটি চুম্বন করিল।

লজ্জায় সুশীলার গণ্ড দুটী জবাফুলের লাল হইয়া উঠিল। নিকটে রতন তাহার উজ্জ্বল চক্ষুদুইটী দিয়া সুশীলাকে দেখিতেছিল। সুশীলা তাহাকে কোলে উঠাইয়া তাহাকে চুম্বনদানে মায়ের চুম্বনের প্রতিশোধ দিল। বিমল তখন ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে রতনের প্রতি চাহিয়া কহিল, "দেখলি রতন, আমার মা কেমন; আমায়ও অনেকক্ষণ কোলে করেছিলেন।" ইচ্ছা, রতন যেন না ভাবে যে বিমলকে বাদ দিয়া তার মা তাহাকে কোলে করিয়াছেন। রতন সঙ্কোচে নীরবে সুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

৪

পরদিন রামনগর ফিরিয়া যাইবার সময় মানদা বিমলকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে বিমু, এখনও খেলা করছিস্; অমরা যে বাড়ী যাচ্ছি, তুইও যাবি নে ?"

ক্রীড়ারত বিমল বলিল, "না; আমি যাব না; তোমরা যাও; আমি মার কাছে থাকবো। রতন, তুইও থাকবি ভাই ?" রতন বিমলের পার্শ্বে খেলা করিতেছিল, সে মাথা নাড়িয়া আপন সম্মতি জানাইল। কিন্তু রতনের থাকা হইল না; কাঁদাকাটি করিবে বলিয়া মানদা তাহাকে রাখিয়া যাইতে চাহিল না।

তাহাদের যাইবার পর সুশীলা দীননাথের নিকট আসিয়া বসিলেন। তাহার মুখখানি আতপ-তপ্ত বসন্ত কুসুমের মত শুকাইয়া গিয়াছে। দীননাথ তাহার শুষ্ক, মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "মানু চলে যাওয়ায় মনে বড় কষ্ট হচ্ছে,না ? তার কি করবে, পর তারা,পরের বাড়ীতে থাকা কি তাদের পোষায় ?" সুশীলা একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "না তার জন্যে নয়। তবে রতনকে যদি রেখে যেতেন, তাহ'লে বেশ ভাল হতো। বিমু আর রতন যখন একসঙ্গে খেলা করে তখন দেখতে বেশ লাগে।"

"তার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে ? রতনকে না রেখে যাওয়ার কারণটা আমি জানি। মানু চিরকালই অভিমানিনী; কিন্তু তার অভিমান পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না। কার উপরি সেটা সাজে আর কার উপরি না সাজে এ জ্ঞানটা তার মোটেই নেই।"

"হয় তো আমারই অজান্তে কোন ত্রুটি হয়ে থাকবে, নইলে আর কার উপরি তাঁর অভিমান হবে ?"

"না না, তা নয়। তুমি কারণটা ঠিক অনুমান করতে পার নি। তোমার উপর রাগ করতে পারে এমন লোক ত দেখি না। মানুর মন অতি সরল, কিন্তু ঐ দোষটা চন্দ্রের কলঙ্কের মত। কথাটা কি জান ? অভিমানটা হচ্ছে তার বিমুর উপর।"

"কেন ? ঐ দুধের ছেলে, তার উপর রাগের কারণ কি থাকতে পারে ?"

"আগেই তো তোমাকে বলেছি, মানুর অভিমানটা পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না। যাবার সময় মানু জিজ্ঞেস

কয়ে, 'বিমল চল্ যাবি নে? আমরা যে যাচ্ছি'? তার উত্তরে বিমু কি বলেছিল জান? বিমু বল্লে, 'না, এবার হতে আমি মার কাছে থাক্‌বো।' এইটাই যে তার অভিমানের প্রকৃত কারণ তা আমি ঠিক অনুমান করেছি।"

"তা যাব না বলাতে তারই বা দোষ কি? আর ঠাকুরঝির বা অভিমান হবার কারণটা কি তা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

"সে এই দু'বৎসর ধরে তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, এখন কি না সে সব মায়া কাটিয়ে সহজে একজন অপরিচিতার এত বাধ্য হয়ে পড়লো, এই আর কি!"

প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃত পড়িলে যেমন ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি এই কথাগুলি সুশীলার অভিমান-ভরা হৃদয়ে ক্রোধের সৃষ্টি করিল। সে একটু রাগতঃ স্বরে কহিল, "সেই জন্যেই তো বিমাতা একটা মহা আতঙ্কের বিষয় হয়ে পড়েছে; বিমাতার কলঙ্কে সংসার ভরপুর। এতে কিন্তু বিমাতার দোষ তত নয়, যত পরিবারের অন্যান্য লোকদের; তারা ছেলেদের নিজ নিজ বশে রাখ্‌বার জন্যে, নানা কথায়, ব্যবহারে বিমাতা যে একটা মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা তা বেশ করে বুঝিয়ে দেয়। বালকের সরল প্রাণ; তার সেটা ধ্রুব সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু বিমাতাদের দোষ যে কতটুকু, তা কেউ দেখেও দেখে না।"

সুশীলার অভিমানক্ষুব্ধ-চিত্ত-নিসৃত বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া দীননাথ মনে মনে কহিলেন,—সরল-প্রাণা সুশীলা, তুমি একটি অমূল্য রত্ন; তাই তোমার ধারণা এইরূপ। কিন্তু তুমি যাহা বলিতেছ, প্রকৃত তা নয়। তোমার হৃদয় নির্ম্মল, অকপট, তাই তুমি তোমার হৃদয়ের অনুপাতে পরের হৃদয় সমালোচনা করিতেছ। তোমার আদর্শে যদি সকল বিমাতা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের কলঙ্ক তিমির কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

৫

দীনেশ রায় এতদিন দীনাথের উপর নিজ অপমানের প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত সুযোগ পান নাই। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি দিনের পর দিন নানা প্রকার মতলব আঁটিতেছিলেন; সংসারের সমস্ত কার্য্য এক প্রতিশোধ-রূপ সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুযোগ উপস্থিত হইতে যতই দেরী হইতে লাগিল ততই অপমানের তীব্র-শিখা তাঁহার নিকট আরও মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিতে লাগিল; বহুদিন পরে তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

সুশীলার পিতা শশধর দাস একটু নীচ বংশের কন্যা বিবাহ করায় কিছুদিন সমাজ হইতে পতিত ছিলেন। সমাজ ও জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সমন্বিত শশধর দাস ধৈর্য্যহীন হইলেন না। তিনি অম্লান বদনে, প্রশান্ত চিত্তে সমাজের সকল প্রকার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। কাল বিবর্ত্তনের সহিত মনুষ্য জীবনের যে কত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে শশধর দাসের সহিত পান-ভোজনাদিতে, এমন কি কথা পর্য্যন্ত বলিতে লোকে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিত, সেই শশধর দাস পুনরায় সমাজের গ্রহণীয় হইলেন। তিনি জানিতেন তিনি গরীব; সুতরাং গরীবের মতই থাকিতেন। গরীবেরা যে সমাজের ক্রীড়নক, ইচ্ছা করিলেই সে দূরে ফেলিয়া দিতে পারে, আবার পরমুহূর্ত্তেই আদর করিয়া কোলেও লইতে পারে, ইহা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছিল। সেইজন্য তিনি সদাসর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন; কে জানে কখনও যদি সমাজের নির্ম্মম বজ্র বেচারা গরীবের উপর পতিত হয়!

এখন দীনেশ রায় 'খুঁটিয়া বরণ' তুলিবার যোগাড় করিলেন। তিনি বহু অতীত বিস্মৃত ঘটনাগুলি পুনরায় মূর্ত্তিমান্ করিয়া দাঁড় করাইতে চাহিলেন। তিনি স্বয়ং সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদিগের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া, এরূপ নীচ-কর্ম্মী লোকদিগকে সমাজে প্রশ্রয় দিলে সমাজ যে শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং

তাঁহাদের মত ভারবর্ম্মী ব্যক্তিদের অবস্থা যে অতি সঙ্কটাপন্ন একথা তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। শশধর, দীননাথকে যে সহসা আক্রমণ করিয়া অভিভূত করতঃ তাহাদের শেষ কাজের প্রতিফল বুঝাইয়া দিবেন তাহা তিনি বেশ বুঝাইয়া বলিলেন; এরূপভাবে কাযে হাত না দিলে তাহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া যইতে পারে, এবং তিনি যে একাই সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন তাহাও বলিতে ভুলিলেন না। দীনেশ রায় ধনশালী ও প্রভাববান্ লোক; অতএব ইচ্ছা সত্বেও কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না।

দীননাথ বৎসর বৎসর মাতাপিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি করাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। সে বার পিতার শ্রাদ্ধ বাসরের পূর্ব্বদিন ভৃত্য রঘুনাথকে জনকয়েক রাঁধুনী-বামুন ও কয়েকজন চাকর ঠিক করিবার জন্য বলিলেন। মধ্যাহ্নে ভোজনাদি সমাপন করিয়া দীননাথ খচর-পত্রের তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন; আর সুশীলা নিদ্রিত বিমলের পার্শ্বে শয়ন করিয়া আপন মনে বিমলের কুঞ্চিত কেশগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। এমন সময় রঘুনাথ বিষণ্ণবদনে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া দীননাথ কহিলেন, "কি হলো রঘুনাথ? বলি, তোকে অমনতর দেখাচ্ছে কেন?"

প্রভুভক্ত রঘুনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিল, "বাবু, রাধানগরে আজ এ নতুন শুনলাম। চাকর বামুন ঠিক করতে গিয়ে যা শুনলাম, তাতে আমি একেবারে হতভম্ব! তারা বল্লে কি, আপনি নীচঘরে বিয়ে করেছেন, কাযেই আপনি সমাজে পতিত; আপনার বাড়ীর ছায়াও কেউ মাড়াবে না। বাবু, এখন উপায়?"

দীননাথ এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুশীলার তখনকার অবস্থা পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। এমন মর্ম্মান্তিক সংবাদে পিতার উপযুক্তা পুত্রীর যে ভাব হইয়া থাকে তাহারও তাহাই হইল। সে নীরবে স্বামী কি উত্তর দেন তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই ঘোর ষড়যন্ত্র যে কে পাতিয়াছে দীননাথ তাহা বুঝিলেন; তাচ্ছিল্যের সহিত একটী নীরব হাস্য করিয়া বলিলেন, "কুছ পরোয়া নেই রঘু। সব মানুষকেই সময়ে আমার বাড়ী আস্‌তে হবে। লিখে দিচ্ছি এই পত্রখানা নিয়ে তুই জমিদার ললিত বাবুর নিকট যা; তিনি কি জবাব দেন তাহা জেনে আয়। আর ঐ পথে মানুষদেরও সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।" বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া রঘুনাথের হাতে প্রদান করিলেন। রঘুনাথ পত্র লইয়া জমিদার ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল।

৬

জমিদার ললিতমোহন সিংহ দীননাথের সতীর্থ। তিনি দীননাথের সহিত আশৈশব বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া আসিতেছিলেন। এবং ডাক্তারি পাশও তাহারই সহিত করিয়াছিলেন। ললিতমোহনের অগাধ সম্পত্তি, সুতরাং ডাক্তারি পাশ তিনি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য গরীব, দুঃখী ও আতুরকে বিনা পয়সায় ঔষধ বিতরণ করা আর তাঁহার সতীর্থ দীননাথের পশার করিয়া দেওয়া। চিরকাল একত্রে বাস জনিত উভয়ের মনের গতি একই পথাভিমুখী হইয়াছিল তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। উভয়েই বর্ত্তমান সমাজকে নবজীবন দান করার পক্ষপাতী। উভয়েরই নিকট সমাজ একটা জীর্ণ, পচাধসা পদার্থের মত অসার অব্যবহার্য্য বলিয়া মনে হইত; সুতরাং তাহাকে সংস্কার না করিলে অচিরেই যে ধ্বংস হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক সমাজ যে অত্যাচার ও অনাচারের একটা জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, তাহার শত শত প্রমাণ তাঁহাদের সরল প্রাণে যে কতই আঘাত করিত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। এই অধঃপতিত সমাজের সংস্কারে তাঁহারা বদ্ধপরিকর।

রঘুনাথ জমিদার বাবুর হস্তে দীননাথের পত্রখানি প্রদান করিয়া নিজের কাণে যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহাও সবিস্তারে নিবেদন করিল। সকল কথা শুনিয়া

ও দীননাথের প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া ললিতমোহন একটী মাত্র অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন, পরে একখানি পত্র সহ তাহাকে বিদায় করিলেন।

পরদিন পঞ্চগ্রামী নিমন্ত্রণ হইল। যাঁহারা সুশিক্ষিত এবং নব গঠিত সমাজের পক্ষপাতী, তাঁহারা সকলেই আসিলেন। জমিদারী বাবুর গ্রামবাসী সকলেই আসিলেন; রাধানগরের অধিকাংশ ও রামনগরের কেহ কেহ আসিলেন না। আগত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সমাদরে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় রসে পরিতৃপ্ত করা হইল। জমিদার ললিতমোহন বাবু স্বয়ং সকল কাযের পরিদর্শন করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরম আহ্লাদের সহিত একে একে প্রস্থান করিলে পর দীননাথ হাসিয়া বলিলেন —"দেখ ললিত, তুমি অতবড় জমিদারের ছেলে হয়ে আমার মত গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছ, এটা তোমার উচ্চ শিক্ষা ও সরলতার পরিচায়ক।"

শ্রীনলিনীরঞ্জন রায়।

প্রেম ও প্রহার

(গল্প)

পদ্মাতীরবর্ত্তী কোনও এক অখ্যাতনামা পল্লীগ্রামে, একটি খড়ে ছাওয়া মৃৎকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া, একদিন বেলা ৮টার সময় স্বামিস্ত্রীতে নিম্নলিখিত প্রকার দাম্পত্যালাপ হইতেছিল।

ভজহরি গোপ মুখ হইতে হুঁকা নামাইয়া, চোখ ঘুরাইয়া উচ্চস্বরে বলিল, "খপর্দ্দার মাগী মুখ সামলে কথা কোস্, নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।"

মোক্ষদাসুন্দরী, স্বর আর এক পর্দ্দা তুলিয়া উত্তর দিল, "ঈস্! রাগ দেখ পুরুষের! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন! জুতো পাবি কোথা তাই শুনি? বাপের জন্মে জুতো কখনও পায়ে দিয়েছিস্ রে মিন্‌সে?"

দন্ত খিচাইয়া ভজহরি চীৎকার করিয়া উঠিল, "চোপ রও হারামজাদী শূয়রকে বাচ্চি! তুই আমার বাপ তুলি এত বড় আস্পদ্দা তোর?"

মোক্ষদা একটু দূরে সরিয়া বসিয়া বলিল, "তুলেছি, তুলেছি। ঝাঁটা তুলিনি এই তোর ভাগ্যি।"

"তোল না ঝাঁটা, তোর ক'গাছা ঝাঁটা আছে আমি দেখি একবার। ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটীকে বিয়ে করে এনে রাজার হালে রেখেছি, তুই আমায় ঝাঁটা দেখাবি বৈকি! নৈলে আর কলিকাল কেন বলেছে হায় রে!"

মোক্ষদা হাত উল্টাইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "মরি মা পশারি ছিঁড়ে! কি আমার রাজার হালে রেখেছেন গো! আমি লোকের বাড়ী ধান ভেনে, বাসন মেজে, উঠোন ঝাঁট দিয়ে যাই দুটো আনি, তাই গুবুর গুবুর চলে; নইলে ঐ বাকর কি দিয়ে ভরাতিস্ বল্ দেখি? খেটে খেটে গতর আমার জল হয়ে গেল; উনি আমায় রাজার হালে রেখেছেন। যে পুরুষ পয়সা রোজগার করতে জানে না, তার অত তেজ কেন?"

ভজহরি বলিল, "নাঃ—আমি কি আর পয়সা রোজগার করতে জানি? যত জানিস তুই! আমি গেল বছর শ্যামপুরে বাবুদের বাড়ী চাকরি করতে যাইনি? আমার খোরাক পোষাক তিন টাকা মাইনে হয় নি? তখন কেঁদে কেটে অনর্থ করেছিল কেন? 'ওগো আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না; তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ী এস, যা জুটবে দুইজনে দুমুঠো খাব।' কে বলেছিল রে হারামজাদি? আর তাও বলি—বাড়ীতে বসেই কি আমি থাকি? তুই খাটিস আর আমি খাটিনে? তুই দুটো ক্ষুদকুঁড়ো যা হয় নিয়ে আসিস বটে, কিন্তু আমি

মাছ ধরে না আনলে খেতিস্ কি দিয়ে বল দেখি? এদিকে মাছ না হলে নোনা যে একবারে খাবি খাস; একটি গেরাস ভাত মুখে ওঠে না। মনে করি খোঁটা দেবোনা, তা, তোর স্বভাবের গুণে দিতে হয়।"—বলিয়া ভজহরি ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া আবার তামাক টানিতে লাগিল।

মোক্ষদা দেওয়ালের কাছে সরিয়া বসিয়া, পা দুইটা ছড়াইয়া দিয়া নিজ হাঁটু দুইটিতে সকরুণ ভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে বলিল, "ন্যাকা মিন্‌সের ন্যাকামি দেখে আর বাঁচিনে! ভারি খোঁটার কায করেছেন কিনা! মাছ ধরে আনেন তবেই ত সংসারের সকল দুঃখুই ঘুচে গেল। কাল থেকে আমার শরীলটে খারাপ, গায়ে গতরে ব্যথায় মরে যাচ্ছি;—বল্লাম মুখুয্যেদের বাসন ক'খানা মেজে দিয়ে আয় ত! তাতে অমনি বাবুর অপমান হল! 'অ্যাঁ, আমি পুরুষ মানুষ হয়ে বাসন মাজবো?' আমি বল্লাম, যে পয়সা রোজগার করতে পারে না সে আবার পুরুষ মানুষ কিসের? এইত বলেছি। এতেই অমনি জুতিয়ে আমার মুখ ছিঁড়ে দিতে এলেন। এমন নোকের হাতেও আমি পড়েছিলাম, মাগোঃ—উঠ্‌তে বসতে আমায় নাতি ঝাঁটা মারে!"—বলিয়া মোক্ষদা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ভজহরি তামাক খাইতে খাইতে, স্ত্রীর পানে আড় চোখে আড় চোখে চাহিতে লাগিল। স্ত্রীর আঁখিজলে তাহার পৌরুষগর্ব্ব টলমল করিতে লাগিল, বুঝি বা ভাসিয়াই যায়। কান্না থামে না দেখিয়া বলিল, "বলি অত কান্না হচ্চে কিসের জন্তে? তোকে মারিও নি, কিছুই না, দুটো মুখের কথা বলেছি বৈত নয়! যাচ্ছি না হয়, বাসনগুলো মেজে দিয়ে আসছি। আর কাঁদতে হবে না, ওঠ্।"

হুকা দ্বারের কোণে ঠেকাইয়া রাখিয়া, ভজহরি কাছে গিয়া স্ত্রীর মুখ হইতে তাহার হস্ত ও অঞ্চল অপসারিত করিয়া লইয়া নিজ কোঁচার খুঁটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল। মিষ্ট কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া, মুখুয্যে বাড়ী যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল।

মোক্ষদা তখন বলিল, "থাক্, তোমার আর যেতে হবে না, আমি গিয়ে বাসন ক'খানা মেজে দিয়ে আসছি। যতক্ষণ শরীলে শক্তি আছে ততক্ষণ করি, তার পর যা হয় হবে।"

ভজহরি বলিল, "তোর গায়ে গতরে ব্যথা, নাই বা গেলি তুই, আমিই যাচ্ছি। তুই এই রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে একটু শুয়ে থাক্। বাসন মেজে দিয়ে, গিন্নীমার কাছ থেকে আমি বরঞ্চ একটু তার্পিণ তেল চেয়ে আনবো, তোকে বেশ করে মালিস করে দেবো, ব্যথাটা অনেক কমবে তা হলে।"

স্বামী স্ত্রীতে এইরূপ কলহ নিত্যই চলিত। মাঝে মাঝে কিলটা চড়টা চাপড়টাও যে না চলিত এমন নয়। তবে শাস্ত্র ত মিথ্যা হইবার নহে—দম্পতীর কলহ অবশেষে লঘু ক্রিয়াতেই পরিণত হইত বটে।

২

উপরে বর্ণিত ঘটনার দিন পনেরো পরে, একদিন উভয়ের কলহ একটু সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইল না।

মোক্ষদা দুঃখধান্দা করিয়া দুই চারি পয়সা যাহা আনিত, তাহা হইতেই বাঁচাইয়া কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিত। সেই সঞ্চিত অর্থ কোথায় লুকানো থাকিত, তাহা ভজহরির অজ্ঞাত ছিল না। একদিন স্ত্রীর অনুপস্থিতি কালে, সে সেই গোপনীয় স্থান হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া, ছিপে লাগাইবার জন্য একটি পিতলের হুইল কিনিবার জন্ত দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী সহরে চলিয়া গেল।

হুইল কিনিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া, পুকুর ঘাটে গিয়া হাত পা ধুইয়া আসিয়া, এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভজহরি পথশ্রম অপনোদন করিতেছিল, এমন

সময় মোক্ষদা দত্তদের গোহালে সাঁজাল দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। টাকা চুরি গিয়াছে ইহা সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, এবং সন্দেহ ঠিক লোককেই করিয়াছিল। ফিরিয়া কুলুঙ্গির উপরে সেই নূতন চক্‌চকে হুইলটি দেখিবামাত্র মোক্ষদার মুখ, আগ্নেয় গিরির স্থায় বচনাগ্নি উদ্‌গিরণ আরম্ভ করিল। অপর পক্ষও নীরব রহিল না। অবশেষে রাগের বশে ভজহরি তাহার হুঁকা হইতে জ্বলন্ত কলিকা খুলিয়া লইয়া মোক্ষদার মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। আগুন মোক্ষদার মুখ দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বস্ত্র ও গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল। আগুন ঝাড়িয়া ফেলিয়া, মোক্ষদা উন্মাদিনীর স্থায় ছুটিয়া আসিয়া, ভজহরির হাত হইতে তাহার হুঁকাটা কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা সজোরে তাহার মস্তকে প্রহার করিল। হুঁকার খোলটা চুরমার হইয়া গেল; কাঠ মোক্ষদার হাতেই রহিল। বাপ্ বলিয়া ভজহরি মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তখন সেই কাঠ দিয়া মোক্ষদা তাঁহার পিঠে পটাপট ঘা কতক বসাইয়া দিয়া, একটু সরিয়া, চালের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল। এইবার ভজহরি কি ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে, এবং ঐ আক্রমণ কি উপায়ে সে ব্যর্থ করিতে পারিবে ইহাই অবধারণ জন্ত সে সতর্ক হইয়া রহিল।

ভজহরি কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিল না। উভয় হস্তে মাথাটি চাপিয়া ধরিয়া উহু উহু করিতে করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে দাওয়া হইতে উঠানে নামিল; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়া শালী হারামজাদি; তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস, আমি থানায় চল্লাম নালিস করতে। তিনটি বচ্ছর তোকে যদি আমি জেল না খাটাই ত আমি গয়লার ছেলেই নই।"—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ভজহরি চলিয়া গেলে, মোক্ষদা কিছুক্ষণ পূর্ব্ববৎ ভাবে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল। ক্রমে তাহার শ্বাসযন্ত্র সুস্থ হইলে, ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যিই মিন্সের মাথা ফেটেছে না কি? হুঁকোর খোলের ঘায় কখনও মাথা ফাটে?—ধেৎ! ও সব মিন্‌সের ঢঙ—ঢঙ! কিন্তু গেল কোথা? সত্যিই কি থানায় গেল না কি? হুঃ—থানায় আর যেতে হয় না। থানা প্রায় এখানে? ছকোশ দূর। এই রাত্তিরে সে আবার থানায় যাবে, তুমিও যেমন! দেখ না, এখনই ফিরে আসবে বোধ হয়।"

মনকে এই প্রকারে প্রবোধ দিয়া মোক্ষদা গৃহকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। কায করে, আর বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া দেখে স্বামী ফিরিল কি না। কায শেষ হইয়া গেল, জ্যোৎস্নাভরা উঠানের পানে চাহিয়া মোক্ষদা চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়া রহিল। রাত্রি এক প্রহর হইল, দেড় প্রহর হইল, কৈ, স্বামী ত ফেরে না!

তখন মোক্ষদা স্থির করিল, নিশ্চয়ই মিন্সে থানায় গিয়াছে! মনে একটু রাগ হইল, ভয়ও হইল। 'সেপাই' আসিয়া সত্যই কি তবে তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে? মোক্ষদা উঠিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ক্রমে তাহার ঘুম পাইতে লাগিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও বোধ হইল। একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীর জন্ত ভাত চাপা দিয়া রাখিয়া নিজে আহার করে। আবার ভাবিল, না থাক্, যদি আমার ধরাইয়া দিবার জন্ত সিপাই সঙ্গে করিয়াই আনে, আসিয়া দেখুক, যে স্ত্রীর সহিত সে এমন ব্যবহার করিল, সে কিরূপ পতিব্রতা, স্বামীর খাওয়া হয় নাই বলিয়া নিজে উপবাসী আছে। তাই সে না খাইয়া, রোয়াকে আঁচল বিছাইয়া শুইল এবং ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

মোক্ষদার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন গভীর রাত্রি, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, শেয়াল ডাকিতেছে। তাহার বিশ্বাস, শেয়ালেরা প্রহরে প্রহরে একবার করিয়া ডাকে—রাত্রি কি এখন দ্বিতীয় প্রহর, না তৃতীয়? ক্ষুধার যেরূপ প্রাবল্য, তৃতীয় প্রহর হওয়ারই সম্ভাবনা। থানার লোকে সম্ভবতঃ স্বামীকে বলিয়াছে, এত রাত্রে গিয়া আর কি হইবে, তুই এইখানে শুইয়া এখন ঘুমা, কাল সকালে তখন

তোর বউকে ধরিতে যাইব। কাল বেলা একপ্রহর আন্দাজ সে সিপাহী লইয়া নিশ্চয়ই আসিবে। মোক্ষদা উঠিয়া, মুখে হাতে জল দিয়া, স্বামীর জন্য ভাত তরকারি ঢাকা দিয়া রাখিয়া, অবশিষ্টাংশ নিজে লইয়া আহারে বসিল। মাছের চচ্চড়ি খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল, "আমি মাছ খেতে ভালবাসি বলেই—বড় বড় মাছ ধরে আমায় খাওয়াবে বলেই,সে হুইল কিনে এনেছিল গো! তার জন্যে তাকে অমন করে' 'লাঞ্ছনা' করা আমার ভাল হয় নি।"—তাহার পর মনে হইল, 'আমি ত খাচ্চি, থানায় তাকে ওরা খেতে টেতে দিয়েছে কিনা কে জানে! হয় ত না খেয়েই সেখানে পড়ে আছে।'—এই কথা মনে হওয়ায় মোক্ষদার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

যাহাহউক, আহার সমাপ্ত করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, রোয়াকে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ঢুলিতে লাগিল; তাহার পর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

প্রাতে উঠিয়া, নিজ কুটীরের 'বাসিপাট' সারিয়া, মোক্ষদা পরগৃহে তাহার নির্দ্দিষ্ট কাম কর্ম্মগুলি করিবার জন্য বাহির হইল। সে সব সারিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় দেড়প্রহর বেলা হইল। আসিবার সময় তাহার মনটা কেমন ভয় ভয় করিতেছিল, খুব সম্ভব বাড়ী গিয়া দেখিবে যে সিপাহী সহ স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাই, বাড়ীতে সহসা প্রবেশ না করিয়া, দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া দেখিল,—কৈ, উঠানে বা রোয়াকে কেহই ত নাই!

মনিব বাড়ী হইতে মোক্ষদা দুইটি বেগুন আনিয়াছিল; ঘর খুলিয়া সে দুটি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। অন্য দিন এই সময় সে উনান ধরাইয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। আজ আর রাঁধিবার জন্য তাহার কোনও ব্যস্ততা দেখা গেল না। "আমি ওঁর জন্যে রেঁধে বেড়ে রাখি, আর উনি সেপাই এনে আমায় ধরিয়ে দিবে, আরাম করে ভাত খেতে বসুন। হ্যাঃ—রাঁধবে না আর কিছু! অত সুখে আর কায নেই!" সুতরাং মোক্ষদা উনান ধরাইল না।

বেলা ক্রমে দুই প্রহর হইল, আড়াই প্রহর হইল; না স্বামী না সেপাই, কৈ, কেহই ত আসে না! এখন মোক্ষদার মনে হইল, তবে কি সে থানায় যায় নাই? থানায় যদি না গেল, তবে গেল কোথায়? বিবাগী হইয়া কোনও দিকে চলিয়া গেল নাকি? যদি আর ফিরিয়া না আসে?

এই সব ভাবনা চিন্তায়, দিবা অবসান হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষদা কিছুই খায় নাই। স্বামীর জন্য গত রাত্রে যে ভাত ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল; তাহাই বাহির করিয়া খাইতে বসিল। ভাবিল, স্বামী যদি আসে, তাহাকে চারিটী গরম ভাত রাঁধিয়া দিবে।

ভাত রাঁধিতে হইল না। স্বামী ফিরিল না। কাঁদিয়া কাটিয়া মোক্ষদা শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মোক্ষদা ভাবিল, 'নাঃ; এ কোন কাযের কথা নয়। থানায় গিয়ে খবর নিতে হচ্ছে, সেখানে সে আমার নামে নালিস করতে গিয়েছিল কিনা।' তখনই ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া, কিছু পয়সা আঁচলে বাঁধিয়া থানা অভিমুখে যাত্রা করিল।

থানায় গিয়া শুনিল, কোনও গ্রামের কোনও গোয়ালা সে পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রীর নামে নালিস করিতে আসে নাই। মোক্ষদা কাতর স্বরে বলিল, "তবে দারোগা বাবু, আমার স্বামী গেল কোথায়?" কবে এবং কি অবস্থায় তাহার স্বামী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, সমস্ত মোক্ষদার মুখে শুনিয়া দারোগা বাবু হুকুম দিলেন, "ওরে, সেই কাপড়ের পুঁটুলিটা মালখানা থেকে বের কর ত!"

পুঁটুলি খোলা হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ধুতি এ গামছা তুই চিনিস?"

মোক্ষদা সভয়ে হইয়া বলিল, "এ ত তারই ধুতি তারই গামছা। তবে সে কোথায় গেল দারোগা মশাই?"

দারোগা জানাইলেন গতকল্য প্রাতে একজন মাঝি আসিয়া এই ধুতি গামছা দিয়া গিয়াছে, এবং এজাহার

করিয়াছে যে, রায়গঞ্জের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে রান্নার যোগাড় করিতেছিল। রাত্রি যখন আন্দাজ এক প্রহর, তখন সে দেখিতে পাইল কালো মত লম্বা মত একটা লোক, তীরে আসিয়া এই ধুতি গামছা ছাড়িয়া রাখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকটা হয়ত আত্মহত্যা করিবার জন্তই ওরূপ করিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া, মাঝি নৌকা খুলিয়া জলে জলে তাহার অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে দেখিল না। তখন সেই ধুতি গামছা সে নৌকায় তুলিয়া রাখিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া মোক্ষদা মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানে পড়িয়া গেল।

দারোগা বাবু অনেক যত্নে ও চেষ্টায় তাহার চৈতন্ত সম্পাদন করাইয়া, "মৃতকের" নাম ধাম বয়স পেশা আত্মহত্যা করিবার কারণ প্রভৃতি জানিয়া লইয়া, তাহা ডায়েরিভুক্ত করিয়া, মোক্ষদাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

৪

কোনও মতে স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি সারিয়া মোক্ষদা সেই ভগ্নকুটীরেই বাস করিতে লাগিল। কোনও কায কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পেট বড় শত্রু—আবার দুঃখ ধান্দা করিতে মোক্ষদাকে বাহির হইতে হইল। মাথায় গায়ে সে আর তেল মাখে না, রুক্ষ স্নান করে, দিনান্তে একমুঠা চাউল সিদ্ধ করিয়া খায়, খাইয়া নিজ কুটীরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া শুইয়া কেবল কাঁদে। এখন কাঁদিয়াই তাহার সুখ।

কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকে তাহার এ সুখেও বাদ সাধিল। মোক্ষদার বয়স এখনও ত্রিশ বৎসরের মিয়েই। একাকিনী বাস করে। অনেক রাত্রে বদলোকে আসিয়া তাহার দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত এবং স্তুতি মিনতি আরম্ভ করিল। নিতান্ত অতিষ্ঠ হইলে মোক্ষদা ঝাঁটা হস্তে বাহির হইত। তথাপি শান্তি নাই—ক্রমে সে উদ্বাস্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় একদিন ও পাড়ার কামারদের বিধবা বউ নিস্তারিণী, কলিকাতা হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। সে কলিকাতায় কোন্ বাবুদের বাড়ী ঝিগিরি চাকরি করে, বোন্‌পোর বিবাহ উপলক্ষে একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। তাহার কাছে কলিকাতার সব খবর শুনিয়া, মোক্ষদার মনে হইল, বদলোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের এখন একমাত্র উপায়, কলিকাতায় চলিয়া যাওয়া। নিস্তারিণী তাহাকে ভরসা দিল, একটি ভাল গৃহস্থ দেখিয়া, সেখানে মোক্ষদাকে নিযুক্ত করিয়া দিবে; কোনও কষ্ট হইবে না—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

মোক্ষদা বলিল, "কিন্তু দিদি, যে ভয়ে গাঁ ছাড়লাম, সেখানেও যদি সেই ভয় থাকে? কলকাতার লোকেরাই কি আর ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির?"

নিস্তারিণী বলিল, "সব রকম লোকই আছে। তা, তোকে এমন ভদ্র গেরস্তের বাড়ী দেখে রাখিয়ে দেবো, যেখানে সে সব আপদ বালাই থাকবে না।"

মাসান্তে, দুই একখানা তৈজস পত্র এবং সামান্ত গৃহোপকরণ যাহা ছিল বিক্রয় করিয়া, ঘরে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, নিস্তারিণীর সহিত মোক্ষদা কলিকাতায় চলিয়া গেল।

৫

নিস্তারিণী যে বাড়ীতে চাকরি করিত, সে বাড়ীতে অপর ঝি প্রয়োজন না থাকায়, মোক্ষদার জন্ত সে একজন ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের সন্ধানে রহিল। কয়েক দিন অন্বেষণের পর ঐরূপ একটি গৃহস্থের সন্ধান পাইল। শ্যামবাজারে রামদয়াল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে একজন ঝির প্রয়োজন। মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের একজন প্রবীণ উকিল; তাঁহার পুত্রগণ সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র বলিয়া পাড়ায় খ্যাতি আছে। নিস্তারিণী সেই বাড়ীতে মোক্ষদাকে লইয়া গেল।

রামদয়াল বাবুর গৃহিণী, মোক্ষদাকে অল্পবয়স্কা এবং সুশ্রী দেখিয়া, প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে যখন তাহার বৈধব্যের ইতিহাস, এবং গ্রামত্যাগের প্রকৃত কারণটা শুনিলেন, তখন সম্মত হইলেন। বাড়ীতে আরও দুইজন ঝি ছিল, তন্মধ্যে একটিকে বড় বধূমাতার শিশুসন্তান গুলির লালন পালনের ভার দিয়া, মোক্ষদাকে তাহার স্থানে মায় খোরপোষ ৪৲ বেতনে নিযুক্ত করিলেন।

রামদয়াল বাবুর গৃহিণী বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষিণী, এবং দয়ামায়া প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর অধিকারিণী। তাঁহার সংসারে আশ্রয় পাইয়া, কোনও বিষয়ে মোক্ষদার কোনও অসুবিধা রহিল না। নিজ গ্রামে থাকিতে অন্নবস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাহাকে যে পরিমাণ কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত, তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প পরিশ্রমেই তাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইতে লাগিল; এবং মাসে মাসে তাহার বেতনের চারিটি টাকা গৃহিণী ঠাকুরাণীর নিকট জমা হইতে লাগিল।

গৃহিণী দেখিলেন, মোক্ষদা খুব পরিশ্রম করিতে পারে, মুখটি বুজিয়া আপন কায কর্ম্মগুলি করিয়া যায়, গোয়ালার মেয়ে হইলেও, ভদ্র ঘরের বিধবাদের মতই নিষ্ঠার সহিত বৈধব্য-আচার পালন করিয়া থাকে; তবে দোষের মধ্যে রাগটা একটু বেশী। অপর দুইজন ঝির সহিত মাঝে মাঝে সে কোন্দল করে; গৃহিণী তখন মধ্যস্থ হইয়া, কাহাকেও বা মৃদু তিরস্কার করিয়া, কাহাকেও মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া, মিটমাট করিয়া দেন।

এইরূপ মোক্ষদা তিন বৎসর এই বাড়ীতে চাকরি করিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত, কিছুদিনের ছুট লইয়া দিনকয়েকের জন্য নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায়; তাহার ঘর দুয়ারের এখন কি অবস্থা তাহা দেখিয়া আসে; কিন্তু আবার মনে হইত, আর সে শ্মশানে ফিরিয়া গিয়া লাভ কি?

৬

শ্রাবণ মাসে জ্বরে পড়িয়া মিত্র গৃহিণী কিছু দিন খুব ভুগিলেন, তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গেল; দাঁড়াইলে, মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়েন। তাই পূজার ছুটির সময় রামদয়াল বাবু সপরিবারে মধুপুরে গিয়া গৃহিণীকে দুই মাস বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এক এটর্ণি বন্ধু কালীপদ বাবুও সপরিবারে মধুপুর যাইতেছিলেন,—সেখানে তাঁহার নিজ দুইখানি বাড়ী আছে, বাড়ী দুইখানি পাশাপাশি, তাহারই একখানি রামদয়াল বাবু ভাড়া লইলেন।

রামদয়াল বাবুর মধ্যম পুত্র চারুভূষণ বাবু গ্রিণ্‌লে ফিণ্ডর কোম্পানীর বাড়ী কেশিয়ারি কর্ম্ম করেন; তাঁহার ছুটি অতি অল্প দিন মাত্র, তাই তিনি সপরিবারে বাড়ীতেই থাকিবেন, অপর সকলে মধুপুরে যাইবেন স্থির হইল। ঝিয়েদের মধ্যে মোক্ষদা ও বিমলা মধুপুরে যাইবে; কামিনী কলিকাতায় থাকিবে।

গাড়ী রিজার্ভ করা হইল। যথা দিনে রামদয়াল বাবু সপরিবারে যাত্রা করিয়া, মধুপুরে পৌঁছিলেন।

এটর্ণি বাবুরা তখনও পৌছেন নাই। বাড়ীতে পূজা, পূজা সারিয়া তবে তাঁহারা বাহির হইবেন।

কয়েক দিন মধুপুরে মোক্ষদার বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। গৃহিণী যখন বিকালে পুত্রকন্যাগণ সব বেড়াইতে বাহির হইতেন, মোক্ষদাও তাঁহার সহিত যাইত। তিন বৎসর কাল কলিকাতায় গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। খোলা মাঠে বেড়াইতে পাইয়া মোক্ষদা বড় আরাম পাইল।

পূজার পর এটর্ণি বাবুরা সদলবলে আসিয়া পৌছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় গৃহিণীর সহিত বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া মোক্ষদা দেখিল, বৈঠকখানা ঘরে তার মনিব এবং পাশের বাড়ীর এটর্ণি বাবু বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। রামদয়াল বাবু বলিলেন, "আপনি তামাকখোর মানুষ; আমাদের ত ও পাট নেই;—আপনাকে একটা সিগারেট দিতে বল্‌বো কি?"—তিনি জানিতেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাংশু সিগারেট ব্যবহার করিয়া থাকে।

এটর্ণি বাবু বলিলেন, "দরকার কি? আমার গুড়গুড়িটা আনিয়ে নিচ্চি।"—বসিয়া তিনি বাহিরের

বারান্দার প্রান্তে গিয়া হাঁকিলেন, "ভজা—ও ভজা।"

পাশের ঘরে মোক্ষদা বসিয়া পাণ সাজিতেছিল, "ভজা" নামটা শুনিবামাত্র সে কাণ খাড়া করিল। তার পর, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, আবার নিজ কার্য্যে মন দিল।

দুইতিন বার ডাকাডাকির পর, ও বাড়ী হইতে সমুচ্চ স্বরে উত্তর আসিল—"আজ্ঞে।"

ও কি? কার কণ্ঠস্বর? মোক্ষদার মাথার ভিতর বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এটর্ণি বাবু হাঁকিলেন, "আমার গুড়গুড়িটে নিয়ে আয় ত ভজা!"

উত্তর আসিল, "আজ্ঞে যাই।"

মোক্ষদার আর পাণসাজা হইল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। চূণের আঙুল বস্ত্র প্রান্তে মুছিয়া, কম্পিত পদে, দুরু দুরু বক্ষে সে বাহির হইয়া এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, যেখান হইতে বৈঠকখানা ঘরের মধ্য ভাগটি স্পষ্ট রূপে দেখা যায়।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কুণ্ডলীকৃত নলসহ এক প্রকাণ্ড ফরসী হস্তে এটর্ণি বাবুর ভৃত্য প্রবেশ করিল।

তাহার মুখের পানে এক নজর মাত্র চাহিয়া দেখিয়াই, মোক্ষদার হস্তপদ একবারে অবশ হইয়া আসিল। পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সে দুই হাতে সম্মুখের দেওয়ালটায় ভর দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। সে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না; ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

ভৃত্যকে দেখিয়া, বৈঠক খানা ঘরে এটর্ণি বাবু বলিলেন, "কলকে কৈ রে? তামাক সেজে আনিস নি?"

ভজা বলিল, "আজ্ঞে, তা তো আপনি বলেন নি!"

এটর্ণি বাবু উকীল বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেটা গরুদার বুদ্ধি দেখলেন মশাই!" ভৃত্যকে বলিলেন, "যা তামাক সেজে নিয়ে আয়। আর, খানিকটে তামাক, গোটাকতক টিকে, দেশলাইয়ের বাক্স, এই সবও নিয়ে আয়। এবার বুঝলি ত?"

"আজ্ঞে" বলিয়া—ভজহরি প্রস্থান করিল।

রামদয়াল বাবু বলিলেন, "আপনি এ রত্নটিকে পেলেন কোথা?"

এটর্ণি বাবু বলিলেন, "সে মশায়, এক মস্ত ইতিহাস,—উপন্যাস বল্লেও চলে।"

"কি রকম?"

এটর্ণি বাবু বলিতে লাগিলেন, "বছর চারেক আগে, দিন কতক আমার ষ্টীমারে বেড়াবার সখ হয়েছিল না? তিন মাসের জন্যে একটা ষ্টীম লঞ্চ ভাড়া করে, পদ্মানদীর উপর আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন সন্ধ্যার পর, ঘাট থেকে কিছুদূরে নোঙর ফেলে ডেকে বসে আমি তামাক খাচ্ছি। চাঁদ উঠেছে,, জলের শোভা দেখছি; এমন সময় দেখলাম খানিক দূরে একটা মানুষ, একবার জল থেকে মাথা তুলছে, আবার ডুবছে। ষ্টীমারের দুজন খালাসিকে তখন বল্লাম—ওরে একটা মানুষ বোধ হয় ডুবে যাচ্ছে, দেখ দেখি যদি তোরা ওকে বাঁচাতে পারিস। তারা তখনি, দড়ি বাঁধা দুটো লাইফ বেল্ট নিয়ে লাফিয়ে পড়লো। কাছাকাছি গিয়ে সেই বেল্ট দুটো ছুঁড়ে লোকটার কাছে ফেলে দিলে। একটা বেল্ট সে ধরে ফেল্লে। তার পর খালাসীরা, নানা রকম কৌশল করে তাকে ষ্টীমারে এনে তুল্লে। রাম রাম—একেবারে উলঙ্গ ল্যাংটা, মশাই! খালাসীরা তাহাকে একটা লুঙ্গি পরিয়ে দিলে। বেটা অনেক জল খেয়েছিল, আমার সঙ্গে ডাক্তার বাবু ছিলেন, তিনি ওকে বমি টমি করালেন, ব্রাণ্ডি খাওয়ালেন, ক্রমে বেটা সুস্থ হয়ে উঠলো। তিনিই হন ঐ ভজহরি।"

রামদয়াল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে ডুবেছিল, তা কিছু বল্লে?"

"বল্লে, বৈকি। বল্লে আমার ইস্তিরী' মারা গিয়েছে, সেই 'শোগে' আমি আত্মহত্যা করছিলাম। কাপড় কি হল জিজ্ঞাসা করায় বল্লে, 'কাপড় গামছা ডাঙ্গায় রেখে আমি জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। ভাবলাম, আমি ত মরছিই, ধুতিখানা গামছাটা এখানেই ফেলে

রাখি, কোনও গরীবে কুড়িয়ে পরে পোরে বাঁচবে।"

রামদয়াল বাবু বলিলেন, "অদ্ভুত!"

এটর্ণি বাবু বলিলেন, "অদ্ভুত বৈকি! আমি ভাবলাম, একাধারে এত পত্নীপ্রেম, আর এত বিশ্বপ্রেম ত দেখা যায় না! একে হাতছাড়া করা হবে না। চাকর স্বরূপ ষ্টীমারেই ওকে রাখলাম। মাস খানেক পরে কলকাতায় ফিরে এলাম। তার পর, ওর আমি বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, বলেছি টাকা দিচ্ছি, দেশে গিয়ে আবার বিয়ে থাওয়া করে' আয়। তা বেটা কিছুতেই রাজি হয়না। বলে' যার মুখে আগুন দিয়েছি, তাকে যে ভুলতে পারিনি হুজুর! বিয়ে আর আমি করবো না!"

রামদয়াল বাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য মানুষ ত!"

"আশ্চর্য্য বৈ কি!"

মোক্ষদা পূর্ব্ব স্থানেই ছিল, কিন্তু এ সকল কথা বার্ত্তার একটী বর্ণও সে শুনিতে পায় নাই। মৃত স্বামীকে জীবিত মূর্ত্তিতে দেখিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

৭

মোক্ষদার সহিত ভজহরির গোপনে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে—কিন্তু কোনও পক্ষের মনিব পরিবারকে এপর্য্যন্ত কিছুই জানানো হয় নাই। মোক্ষদার ভারি লজ্জা করে—ছিঃ এতদিন বিধবার মত থাকিয়া কেমন করিয়া বলিবে ও বাড়ীর ঐ ভজা আমার স্বামী! লোকে যদি অবিশ্বাস করে, তখন সাক্ষী প্রমাণ কোথায় পাইবে? ভজাও তাহার মনিবকে বলিতে সাহস করে না—তিনি শুনিলেও হয়ত বিশ্বাসই করিবেন না; হয় ত ভাবিবেন, ও বাড়ীর ঐ সুশ্রী ঝিটার উপর তাহার লোভ পড়াতে তাহাকে রাজি করিয়া এই মিথ্যা দাবী উপস্থিত করিয়াছে। এবং জুতিয়ে হাড় ভাঙ্গিয়া দিবেন।

এখন আর মোক্ষদা গৃহিণীর সহিত বিকালে বেড়াইতে যায় না; উভয় বাটীর লোকে বেড়াইতে বাহির হইলে সে স্বামীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করে; এবং মাঝে মাঝে সে সুযোগ পাইয়াও থাকে। উভয় বাটীর বাগানের সীমানার পশ্চাদ্‌ভাগে একটা মস্ত কামিনী ফুলের ঝাড় আছে, তাহার আড়ালে বসিয়া উভয়ে প্রায়ই কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্ত্তা কহে।

প্রথম দিন মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হাঁারে, তুই এমন কায কেন করতে গিয়েছিলি বল দেখি?"

ভজা বলিয়াছিল, "থানায় যাচ্ছি বলে' তোকে শাসিয়ে সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম;—বুঝলি মুখী, খানিক দূরে গিয়ে ভাবলাম, আপন ইস্তিরীকে জেলে দেওয়াটা ত ভাল হবে না, লোকে শুনলে বলবে কি? গায়ে থুতু দেবে যে! তার চেয়ে তোকে বরং অন্য রকমে জব্দ করাই ভাল। মাছ খেতে তুই ভালবাসিস, মাছ না পেলে ধড়ফড়িয়ে মরিস, তাই ভাবলাম, "দাঁড়া তোকে জব্দ করছি। তোকে বিধবা করে তোর মাছ খাওয়া বন্ধ করছি শালী!—এই ভেবেই ধুতি গামছা ডাঙ্গায় ছেড়ে রেখে, পদ্মায় গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম।"

"ধুতি গামছা ডাঙ্গায় ছেড়ে রেখে গিয়েছিলি কেন?"

"গাঁয়েরই ঘাট ত! সেই ধুতি গামছা ওখানে দেখে, কেউ না কেউ চিনতে পারবে—আমার লাস যদি ভেসে নাও ওঠে, তা হলেও বোঝা যাবে যে জলে ডুবে আমি আত্মহত্যে করেছি। তবে ত তোর মাছ খাওয়া বন্ধ হবে!"

মোক্ষদা বলিল, "তোর কি বুদ্ধি রে! আচ্ছা, যখন দেখলি যে বেঁচে আছিস্; তখন বাড়ী এলিনে কেন?"

"চাকরি করছিলাম যে! ভেবেছিলাম, মাস কতক চাকরি করে' কিছু টাকা জমিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবো আমি 'ওজগার' করতে পারি কি না। দেশে গিয়ে শুনলাম, তুইও কলকাতায় এসেছিস চাকরি করতে। সেই অবধি কত জায়গায় যে তোকে খুঁজেছি তার ঠিক নেই। কারু বাড়ীর ঝিকে পথে ঘাটে দেখলেই অমনি তার পিছু নিয়েছি। জিজ্ঞাসা করেছি হ্যাগা, রায়গঞ্জের মোক্ষদা গয়লানী কোথায় ঝি গিরি চাকরি করে জান কি? কেউ বলতে পারে নি।"

পরদিন বিকালে যখন কামিনী ঝাড়ের আড়ালে

উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন ভজহরি কলাপাতায় জড়ানো একখণ্ড ভাজা মাছ বাহির করিল দেখিয়া মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, "মাছ আনলি কোথেকে?"

ভজহরি বলিল, "আজ চার বচ্ছর তুই মাছ খেতে পাসনি—আহা তোর কত কষ্ট হয়েছে! তাই তোর জন্যে এনেছি।"

"কোথা পেলি?"

"বামুন ঠাকুর আজ ভাতের সঙ্গে আমায় যে মাছ দিয়েছিল, সে মাছ আমি খাইনি, তোর জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নে, খা।"—অল্প দূরেই একটা খাল ছিল। মোক্ষদা চারি বৎসর পরে স্বামীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, সেই খালের জলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া, আবার গল্প করিতে বসিল।

প্রায় প্রতিদিনই উভয়ের এইরূপ সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ২৪ মিনিটের অধিক উভয়ে একত্র থাকিত না। ক্রমে সাহস বাড়িয়া গেল, অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পরও বসিয়া থাকিত।

উভয়ের বিরহাবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা পরস্পরের নিকট তাহারা করিয়াছে। ক্রমে তাহাদের পরামর্শ হইয়াছে যে, এখন বিদেশে বিদায় চাহিলে তাহা মঞ্জুর হইবে না, মাসখানেক পরে কলিকাতায় ফিরিয়া, উভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যাইবে, এবং উভয়ের সঞ্চিত অর্থে গুটিকয়েক গাভী কিনিয়া বাড়ীতে বসিয়া জাতি ব্যবসায় আরম্ভ করিবে।

প্রথম সাক্ষাতের দিন দশবারো পরে, একদিন যথা-নিয়মে যথাস্থানে দুইজনে মিলিত হইল। কলিকাতা হইতে ভজার মনিবের ইলিশ মাছ আসিয়াছিল। বামুন ঠাকুরের খোসামোদ করিয়া বেশ বড় একখানা পেটীর মাছ সেদিন সে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই মাছ বাহির করিয়া বলিল, "খাসা মাছরে! যখন ভাজছিল, গন্ধে বাড়ী মাত করে দিয়েছিল। কত বড় পেটি খানা তোর জন্যে এনেছি ছাখ্ দ্যাখ্। আজ আমার সাধ হয়েছে আমি হাতে করে তোকে খাইয়ে দেবো। কাছে সরে আয়, হাঁ কর্।"

মোক্ষদা হাসিয়া স্বামীর কাছটি ঘেঁসিয়া বসিল। ভজা আদর করিয়া বাম হস্তে স্ত্রীর গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে মাছ খাওয়াইতে লাগিল।

কিন্তু এ দাম্পত্য লীলায় সহসা বাধা পড়িল। পৃষ্ঠদেশে কাহার প্রচণ্ড পদাঘাতে, ভজহরি হুমড়ি খাইয়া বিপুলবেগে মোক্ষদার গায়ের উপর পড়িয়া, উভয়েই ধরাশায়ী হইল। চমক ভাঙ্গিলে, উভয়ে চোখ চাহিয়া দেখিল, এটর্ণি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্র বাবু বীরবিক্রমে রক্তনেত্রে চাহিয়া আছেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র মোক্ষদা এঁটো মুখে ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অবিলম্বে সেখান হইতে পলায়ন করিল। ভজহরিও কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। বীরেন্দ্র বাবু ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন, "তবে রে হারামজাদা! ভারি যে সাধুগিরি ফলাতিস্!" বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, স্কন্ধদেশে দমাদম ঘুসি প্রহার করিতে লাগিলেন।

ভজহরি হস্ত দ্বারা সে প্রহার রোধ করিতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "হুজুর, মারেন কেন? ও যে আমার ইস্তিরী—আপন বিয়ে করা ইস্তিরী হুজুর।"

বাবু বলিতে লাগিলেন, "তোর বিয়ে করা ইস্তিরী বৈকি! সে ত কবে মরে গেছে! ও ছুঁড়ীকে আমি কি চিনিনে মনে করেছিস শুয়ার? ও তো উকীল বাবুর ঝি—বিধবা মানুষ! আর বদমাইসির জায়গা পেলিনে পাজি নচ্ছার গাধা! ক'দিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছে। সন্ধ্যেটি হলেই তুইও দেখি এ দিকে আসিস্, আর ও বাড়ী ঐ ঝি হারামজাদীও এই দিকে আসে। তাই আজ আমি তক্কে তক্কে থেকে আজ এসে ধরেছি। চল্ হতভাগা বাবার কাছে, সব কথা গিয়ে তাঁকে বলি, তিনি তোর কি শাস্তি করেন দেখ্।"—বলিয়া বীরেন্দ্র হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতে, কোমরটি দুই হাতে ধরিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উভয় বাটীর লোকেরা বৈকালিক ভ্রমণ হইতে ফিরিবামাত্র, কথাটা তাঁহাদের নিকট প্রচারিত হইয়া

পড়িল। ভজহরি যে মোক্ষদাকে স্ত্রী বলিয়া দাবী করিয়েছে, তাহাও তাঁহারা শুনিলেন। মিত্র গৃহিণী ও বড়বধূর নিকট মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই খুলিয়া বলিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন; কিন্তু উভয় বাটীর পুরুষেরা উহা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না।

তখন রামদয়াল বাবুর বৈঠক খানায় ভজহরির বিচারের জন্ত ফুলবেঞ্চ বসিল। এটর্ণি বাবু বলিলেন, "এর মীমাংসা ত সহজেই হতে পারে! দুজনাকে তুমি আলাদা আলাদা জেরা কর না সুধাংশু। ওদের কথা যদি মিথ্যে হয় জেরায় কতক্ষণ টিকবে?"

সুধাংশু বাবু তাহাই করিলেন। মোক্ষদাকে অন্তঃপুরে নিজ স্ত্রীর জিম্মায় বসাইয়া রাখিয়া, ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পদাঘাত জনিত কোমরে ব্যথায় কাৎরাইতে কাৎরাতে সে আসিয়া মেঝের বসিল। সুধাংশু বাবু তাহাকে পুঙ্খাপুঙ্খরূপে জেরা করিলেন যথা—তোদের বাড়ীতে কখানা ঘর, কোন মুখো ঘর, কোন ঘরে কি কি থাকত, যে পুকুরে তোরা জল সরতিস, সে পুকুর বাড়ীর কোন দিকে, তার কটা ঘাট, সে পুকুরে যেতে হলে কোনও গাছের তলা দিয়ে হেতে হয় কি না, সেগুলো কিকি গাছ, যাদের বাড়ীতে মোক্ষদা কাযকর্ম্ম করত, তাদের নাম কি?—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভজহরির উত্তর গুলি সুধাংশু বাবু লিখিয়া লইলেন।

তার পর মোক্ষদার ডাক পড়িল। তাহাকেও অবিকল ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হইল। উভয়ের উত্তরে বিশেষ কোনও পার্থক্য পাওয়া গেল না। ভজহরি স্ত্রীর উপর তখন সত্ত্ব সাব্যস্তরে ডিক্রী পাইল।

যতদিন মধুপুরে থাকা হইবে, ততদিন এই দম্পতীর বাসের জন্ত মিত্র গৃহিণী তাঁহার বাসার আস্তাবলের পার্শ্বস্থ কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই পরামর্শে, শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে মোক্ষদা একটা বাটীতে কর্পূর মিশানো খানিকটা তার্পিণ তৈল লইয়া গিয়া, স্বামীর পৃষ্ঠে ও কোমরে মালিস করিয়া দিল।

একমাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া, উভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়া, সঞ্চিত অর্থ লইয়া দেশে চলিয়া গেল। তথায় কুটীর খানির জীর্ণসংস্কার করিয়া, একটি গোহাল ঘর তুলিয়া, গাভী কিনিয়া, আতি ব্যবসা সুরু করিয়া দিল। দুধে যে কি পরিমাণ জল মিশানো যাইতে পারে, সে বিষয়ে উভয়ের কলিকাতায় অভিজ্ঞতা খুব কাযে লাগিয়া গেল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দিনে ও রাতে

আমি—দিনের মরু পার হয়ে' যাই কিসের আশে আশে?
রাতে—চিকুর ছায়ায় জুড়াতে কায় বাহুলতার পাশে,
ধূলায় মলায় ক্লিন্ন স্বেদে
সারাদিনের দৈন্য খেদে
ধৌত করে' ফেল্‌ব বলে' তোমার প্রেমোল্লাসে।
সারা—দিনের প্রহর জুড়ায় আমার রাতের মধুযামে
প্রিয়ে—শ্রান্ত শিরে তোমার প্রেমের শান্তিধারা নামে!
বঞ্চনা ভুল দিবসভরা
লাঞ্ছনা-লাজ তপ্ত ত্বরা,
সবই উড়ে পলায় দূরে তোমার মলয় শ্বাসে।

যদি—রাতের যতন নূতন বলে প্রাণটা না দেয় ভরে,
খর—দিনের তাড়ন, আলোর পীড়ন, স'য় সে কেমন করে?
নিশার প্রবোধ পুরস্কারে
শ্রমোৎসাহ ঊষায় বাড়ে।
রাতের চুমা শ্রান্ত প্রাণের সকল গ্লানি নাশে।
যত—অরসিকের মেলায় দিনে এ কাণ ঝালাপালা
রাতে—তোমার বাণীর সুধায় জুড়ায় কাণের ক্ষুধাজ্বালা
ঐ অধরের জ্যোৎস্না আশায়
রৌদ্র সহি রুদ্র তৃষায়,
দিনের দাহন সহি, প্রেমে গাহন অভিলাষে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

২য় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

মানসী সৃষ্টি

ইহা আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেশের মুক্তিকামী তত্ত্বদর্শিগণ এই বিশ্বসংসারকে জীবের বন্ধ-কারণ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন। এবং জীবের বন্ধন-স্বরূপ এই বিশ্ব-সংসারের প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্ম তাঁহারা প্রথমে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোথা হইতে এবং কেমন করিয়া এই ব্যক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল। অদ্য আমরা সেই সৃষ্টি-তত্ত্বেরই যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তাহাতে পূর্ব্ব-কথিত বিষয় সকলের সাধারণ ভাবে কচিৎ পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে,—সুধীগণ পুনরুক্তি দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

১। ব্যক্তের অব্যক্ত কারণ।

আমরা দেখিয়াছি কার্য্য-কারণ-বিধানকে প্রাচীনগণ জগতের এক অব্যভিচারী, সনাতন, মৌলিক (Fundamental) বিধান বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, এবং Hume-এর ন্যায় তাহাকে মনের কল্পনামাত্র,—"Determination of the mind"—বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। সেই জন্য, তাঁহাদের মতে, সেই অমোঘ ও অনতিক্রম্য কার্য্য-কারণ বিধানকে অতিক্রম করিয়া, এ জগতে কোন কিছুই উৎপন্ন হইতে সমর্থ হয় নাই। এবং সেই জন্যই, তাঁহাদের অবধারিত সিদ্ধান্ত এই হইয়াছিল যে, এ জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি তাহার অবশ্যই কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণ আছে, এবং সেই কারণ হইতেই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে।

যাঁহারা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে বিচার করা প্রয়োজন হইয়াছিল কার্য্য ও কারণের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কি। সেই বিচারের মর্ম্মানুসারে, আমরা দেখিয়াছি যে বর্ত্তমান যুগের অভিব্যক্তিবাদীর (evolutionist) ন্যায়, সেই অতীত যুগের পণ্ডিতগণও বলিয়াছিলেন;—কার্য্য হইতেছে সত্তার বিভাগ (differentiation) ও ব্যক্তভাব এবং কারণ হইতেছে তাহারই অবিভক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা। অর্থাৎ, কারণ হইতেছে সত্তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও অনাগত সম্ভাবনা, কার্য্য হইতেছে তাহারই মূর্ত্তিমান

রূপ ও প্রত্যুপাস্থিত আকার। এই কার্য্য-কারণ-বাদেরই পারিভাষিক নাম হইতেছে—সৎ-কার্য্যবাদ; কারণ, এই "বাদ" অনুসারে উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যের এক শক্তিমৎ ও সম্ভাবনাময় প্রাক্-অস্তিত্ব ও "সৎ"-ভাব স্বীকৃত হইতেছে।

ব্যষ্টিগত ও বিশেষ বিশেষ জগৎ-কার্য্য পর্য্যালোচনার দ্বারা তাঁহারা এইরূপে যে কার্য্য-কারণ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সমষ্টিগত বিশ্বরূপে তাহাই প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছিলেন,—এই ব্যক্ত বিশ্বরূপ অবশ্যই কোন অব্যক্ত কারণ হইতে সম্ভূত হইয়াছে। এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে, সেই অব্যক্ত বিশ্ব-কারণের মধ্যে বিশ্ব-ভেদ সকল এক অবিভক্ত একাকারে (in an undifferentiated uniformity), অবস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই কারণলীন অব্যক্ত বিশ্বের মধ্যে কোন কিছুরই "ন্যূনাধিক পরিমাণ" ছিল না, এবং কেহই তাহাকে "ইহা ও উহা" রূপে অবধারণা করিতে সমর্থ ছিল না। তাহা ছিল এই বিশ্বরূপের এক অজ্ঞেয় ও অপ্রতর্ক্য অবস্থা,—তাহা ছিল অক্ষুব্ধ সাম্যের একাকার প্রলয়ার্ণব।

যেদিন সৃষ্টির প্রথম ডঙ্কা বাজিয়াছিল,—শুনা যায়,—সেই দিন সেই অক্ষুব্ধ কারণার্ণবের মধ্যে এক "ক্ষোভ" উৎপন্ন হওয়ায়, এ জগতের যুগান্তব্যাপী যোগ-নিদ্রার অবসান হইয়াছিল। জগদুপাদান সকলের সেই "ক্ষোভকে" দর্শন শাস্ত্র এক "সংহত (ordered) বিমর্দ্দ-ক্রিয়া (mutual struggle)" নাম দিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন সেই "বিমর্দ্দ-ক্রিয়ার" ফলে, একাকার বিশ্ব-উপাদান সকল ন্যূনাধিক পরিমাণ লাভ করায়, তাহারা প্রথমে ইহা-ও-উহা রূপে অধ্যবসায়াত্মক বা অবধারণ-যোগ্য হইয়াছিল। ইহাই সৃষ্টির আদ্য কার্য্য ও প্রথম পরিণাম। এবং সৃষ্টির এই আদ্য কার্য্যই শাস্ত্রে মহৎ, বুদ্ধি, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষঃ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ।
মহানিতি যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজঃ॥

—অর্থাৎ এই ভগবান হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধি নামেও স্মৃত হয়েন। যোগবিদ্‌গণের মধ্যে ইঁহার নাম মহৎ। বিরিঞ্চি ও অজ ও ইঁহার অন্য নাম।

কিন্তু ভগবান হিরণ্যগর্ভের ইহা শুধুই পৌরাণিক জন্মকথা নহে। সৃষ্টি তাহার কল্পান্ত পুরাণ প্রথম উৎপত্তির কাহিনী আজও বিস্মৃত হয় নাই। প্রলয়ার্ণবের কলকল্লোল আজিও তাহার শিরায় শিরায় স্পন্দিত হইতেছে। কারণ, এ বিশ্বরঙ্গে যেখানেই আমরা কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাইতেছি সেইখানেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি, অবিভক্ত হইতে বিভক্তের উৎপত্তি, নিষ্পরিমাণ হইতে পরিমাণ বিশিষ্টের উৎপত্তি দেখিতে পাইতেছি। জগতের সর্ব্ব বিভাগেই একাকার হইতে বহু আকারের জন্মকথা শুনা যাইতেছে। জগতের অখিল কার্য্যকারণের ছন্দে বন্ধে সৃষ্টির সেই প্রথম জন্ম-সঙ্গীতেরই মূর্চ্ছনা হইতেছে এবং প্রত্যেক কার্য্য-কারণ সূত্রেই অক্ষুব্ধ সাম্যের একাকার বিক্ষুব্ধ বৈষম্যের বহু রূপ সকল আকারিত ও মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে। ইহাই জগতের অনাদি ও অনন্ত কার্য্যকারণ প্রবাহের সনাতন স্বরূপ ও লক্ষণ।

মহৎ ও জগৎ।

অতঃপর দেখা যাউক, যে অব্যক্ত জগৎকারণ হইতে কার্য্যকারণ-ক্রমে প্রথমে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ছিল কোন্ জাতীয় জিনিস্? অর্থাৎ যে সমতা প্রাপ্ত বিশ্বকারণ হইতে ইহা-ও-উহা রূপে অধ্যবসায়যোগ্য বিশ্ব-ভেদ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ছিল কোন জিনিসের ভেদ ও অবতারণা? সাংখ্যজ্ঞানী এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—মহৎ নামে সৃষ্টির যে প্রথম কার্য্য—"তন্মনঃ"—তাহা মন। এবং প্রায় সকল শাস্ত্রই এই সাংখ্যবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া সমস্বরে গাহিয়াছেনঃ—

মনঃসৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।—

মনই সৃষ্টির অভিসন্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নিজ সত্তা হইতে এই সৃষ্টিকে উৎপন্ন করিয়াছে। অর্থাৎ মনই হইতেছে সৃষ্টির আদিম উৎপাদন, এবং প্রলয়ে

তাহা ছিল অব্যক্ত মন, সৃষ্টিতে তাহা হইল ব্যক্ত মন।

কিন্তু সেই যে বিরাট্ মন, যাহা হইতে এই বিশাল সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্ধান আমরা কোথায় পাইব, এবং কেই বা তাহা বলিয়া দিবে? সুখের বিষয় এই যে, সেই বিরাট্ মনের অনুসন্ধানে আমাদিগকে কোনই সুদূর পথ অতিবাহন করিতে হয় না। অথবা তাহার তথ্য অবগত হইবার জন্য আমাদিগকে কোনই দৈবজ্ঞের আশ্রমে শরণাপন্ন হইতে হয় না। সেই বিরাট্ মনের অনুসন্ধানে, শাস্ত্রকার কোনই উদ্দাম কল্পনার অকূল পাথারে আমাদিগকে ভাসাইয়া দেন নাই। কারণ তিনি বিরাট্ মহৎকে "বুদ্ধি" নামেও অভিহিত করিয়া আমাদিগকে এই স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সেই বিরাট্ মনের এক এক টুকরা 'বিশ্বস্ত' নমুনা আমাদের আসন্নতম নৈকট্যে, প্রত্যেকের ঘটেই বিরাজ করিতেছে। এবং বিশ্ব-চিত্তের অখিল রহস্যের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সুরক্ষিত হইয়াছে। এবং সেই চিত্তের রহস্যবিৎ দৈবজ্ঞ যদি কেহ থাকে তবে সে আমরাই। কারণ আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে (Introspection) চিত্তক্ষেত্রে সমাহিত করিলেই আমরা আমাদের মনের সমস্ত রহস্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এবং সেই রহস্য শুধুই ব্যষ্টিগত চিত্তের রহস্য নহে, সেই রহস্যের মধ্যেই অপার ও অপ্রমেয় বিশ্বচিত্তের অখিল রহস্যের বর্ণমালাও সুরক্ষিত হইয়াছে। যিনি বিশ্বরহস্য পাঠ করিতে জানেন, তিনি সেই বর্ণমালার সংযোজনার দ্বারাই বিশ্ব রহস্য পাঠ করিয়া থাকেন। সকল দেশের ও সকল কালের উন্নত দর্শন বিদ্যার ইহাই গোড়ার কথা।

তাহার পর আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন আচার্য্য বলিয়াছেন, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যেমন কার্য্যকারণক্রমে ব্যক্ত মন বা "বুদ্ধি" উৎপন্ন হইয়াছিল, তেমনি বুদ্ধিও ক্রমশঃ পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া এই জগদাকারে পরিণত হইয়াছিল। জগৎকারণকে এইরূপে মানসাত্মক (or mind-substance) বলিয়া বিবেচনা করার পক্ষে আমাদের দেশে কোন্ যুক্তি বিহিত হইয়াছিল ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখার ন্যায় কৌতূহলের বিষয় অল্পই আছে।

কিন্তু সেই পরীক্ষা প্রসঙ্গে প্রথমে দেখিতে হইবে, মন বলিতে আমরা কোন্ জিনিস এবং কত দূর পর্য্যন্ত বুঝিয়াছিলাম—এবং মন হইতে অতিরিক্ত বলিয়াই বা কোন্ জিনিসকে বুঝিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছি আমাদের দর্শনের মতে মন হইতেছে এক অচেতন জিনিস। কিন্তু চেতন অচেতন শব্দের মানে লইয়া আমরা বড়ই গোল করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, আমরা ইংরাজি Animate ও Inanimate শব্দকে চেতন ও অচেতন শব্দে অন্যায় পূর্ব্বক তর্জ্জমা করিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চেতন শব্দে কোনই জীবিত বা মৃত পদার্থ বুঝায় না,—চেতন ও চৈতন্য বলিতে জ্ঞাতা (knower) ও জ্ঞান (knowledge) মাত্র বুঝাইয়া থাকে। এবং যাহা জ্ঞাতা বা জ্ঞান নহে তাহাই অচেতন। অতএব "মন হইতেছে অচেতন পদার্থ" বলিতে, ইহাই বুঝায় যে মন জ্ঞাতা নহে। এবং অচেতন মন বলিলে ইহা কখনই বুঝায় না যে, মন হইতেছে, এক জীবনহীন পদার্থ।

মন কেন যে জ্ঞাতা হইতে পারে না, তাহার ভারতবর্ষীয় যুক্তি আমরা অন্যত্র সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এবং সেই যুক্তি যে পাশ্চাত্য খণ্ডে একান্তই অবিদিত যুক্তি ইহা বলিতে পারি না; উদাহরণ স্বরূপ—আমরা দেখিতে পাই, পাশ্চাত্য দর্শনবিদ্যার অন্যতম মহারথী মহামনা Arthur Schopenhauer বলিয়াছেন,—"The subject knows all and is known to none. There can be no such thing as 'the knowing of a knowing'—for to that end the knower must separate himself from knowing—and yet know the knowing;—which is impossible." শোপেনহরের এই যুক্তি হইতেছে অবিকল ভারতবর্ষীয় উপনিষদের যুক্তি—"বিজ্ঞাতারমরে! কেন বিজানীয়াৎ"—অরে!

বিজ্ঞাতাকে আবার কে জানিবে?—কারণ যাহাকে বিজ্ঞাতা (subj ct) জানিবেন সে আর বিজ্ঞাতা থাকিবে না, সে বিজ্ঞাত (object) হইবে। শুধু সোপেনহর নহে, ক্যাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণও কদা চৎ বিজ্ঞের মনের অতিরিক্ত এক বিজ্ঞাতা চৈতন্তের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে স্বীকার করায়, পাশ্চাত্য দর্শনের বিশেষ কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। তাঁহাদের বিচারতন্ত্রের অন্ধি সন্ধিতে এক অতিমানস চৈতন্ত পুরুষ কাচৎ কখনও দৃষ্ট হইলেও,—তিনি তখনই আবার নিঃশব্দে ও অলক্ষিতে মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের তত্ত্ব-চিন্তার স্থির দৃষ্টি সেই মনের অতিরিক্ত চিন্ময় পুরুষের প্রতিই চির-সংযত থাকিয়া গিয়াছে। চৈতন্য হইতে পৃথক্ করিয়া, এক অচেতন মনের মনস্তত্ত্বই আমরা চির দিন পাঠ করিয়াছিলাম। ব্যবহারতঃ (empirically আমরাও মনকে চেতনা-বৎ অনুভব করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মনের সেই চৈতন্ত ভাবকে আমরা কখনই মনের নিজস্ব ভাব বলিয়া অঙ্গীকার করি নাই। আমরা বরাবরই তাহাকে মানসিক চন্দ্রালোক,—চৈতন্ত সূর্য্য হইতে ধার করা আলো মাত্র বা চিদাভাস, বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম। মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের এই মৌলিক প্রভেদ বশতঃই বোধ করি, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এই অসদৃশ পন্থাভেদ দাঁড়াইয়াছে,—এবং সেই পন্থাভেদ কোন সঙ্গমেরই চতুষ্পথে গিয়া অভেদ হইতে চাহিতেছে না। কিন্তু সে অবান্তর প্রসঙ্গের কথা এখন থাকুক্। এখন দেখা যাউক, যে মনকে এইরূপে আমরা স্বরূপতঃ অচেতন বলিয়া অবগত হইয়াছিলাম, সেই মন হইতে কিরূপে, কার্য্য কারণক্রমে এই জগতের উৎপত্তি সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

আমরা দেখিতে পাই সকল দেশের দর্শন-বিদ্যার সিংহদ্বারে একজন দ্বারী পাহারায় বসিয়া আছে—এবং সে প্রত্যেক আগন্তুক যাত্রীকে একটি মাত্র প্রশ্ন করিতেছে,—এবং তাহার উত্তর শুনিয়া প্রত্যেকের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রশ্ন হইতেছে—'এ জগৎ আছে কিংবা নাই?' কোন যাত্রীরই এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া অগ্রসর হইবার পথ নাই।

ইহার একটা মাঝামাঝি উত্তর, যথা,- "হাঁ, জগৎ আছে বটে, তবে তাহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বথাই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত জগৎ।"—এবংবিধ উত্তরও কাচৎ প্রচলিত হইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই উত্তর ন্যায়ানুগত উত্তর নহে। কারণ, জগৎকে তুমি আছে- মাত্র বলিয়াও যদি অনুমান করিয়া থাক, তবে সেই আছে-মাত্র রূপে অনুমিত জগৎও তোমার জ্ঞানের বিষয়ভূত জগৎ হইয়াছে, এবং তোমার পক্ষে সেই অনুমিত জগৎও এক প্রকার জ্ঞেয় জগৎ হইয়াছে, এবং তাহা সর্ব্বথাই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত জগৎ হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ পাঠকের মনে পড়িবে যে, বর্ত্তমান যুগের দর্শন সম্রাট Hegel অবিকল এই যুক্তি অবলম্বনেই Kantএর অজ্ঞেয় জগৎ-বাদ নিরস্ত করিয়াছিলেন। এবং কুশাগ্র-বুদ্ধি নৈয়ায়িক অনুশাসিত এ দেশে, তর্কের শাণিত তীক্ষ্ণধারের সমক্ষে, অস্তি নাস্তির মধ্য-পথবর্ত্তী যে কোন অজ্ঞেয়-জগৎ-বাদ ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে নাই,—ইহা না বলিলেও চলিবে।

অতএব, নাস্তি-পক্ষে বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং প্রাচীনতর যুগের বিজ্ঞান বাদ (Idealism) সাফ্ উত্তর দিয়াছিলেন—জগৎ নাই। অস্তিপক্ষে ষড়দর্শনের বাহিনী সজ্জিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, শঙ্করের মায়াবাদের মধ্যেও জগৎ রূপে অজ্ঞেয় বলিয়া কোনই হতাশের আক্ষেপ নাই। এবং সাংখ্যের ন্যায় বেদান্তবাদেরও তূনীর হইতে নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শরজালে, নাস্তি-বাদ, তথা বিজ্ঞান বাদ,—সর্ব্বথাই আতঙ্ক হইয়াছিল।

এখন যদি মানিয়া লওয়া যায় সে জগৎ অস্তি, তবে সেই সঙ্গে ইহাও মানিবার অবশ্য প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেই জগৎ আমাদের মনোরূপে ও জ্ঞেয়-রূপেই অস্তি। কারণ মন ভিন্ন অন্য কিছুকেই আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানি না, এবং যাহা কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব তাহা জ্ঞেয়াকারে ও মনোরূপেই জানা সম্ভব।

হইতে পারে, জগৎ আপাতত যে রূপে প্রতীত হইতেছে সে রূপও জগতের সত্যরূপ নহে, কিন্তু তা বলিয়া ইহা বলা যায় না যে জগতের সত্যরূপ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা সর্ব্বদাই মনের দ্বারা অজ্ঞেয় ও অনবধার্য্য রূপ। মরীচিকাকে আপাততঃ আমাদের জল বলিয়া ভ্রম হইতে পারে. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মরীচিকা যে কোন্ জিনিস্, তাহা সেই কাণ্ডভ্রান্ত মন ব্যতিরেকে অন্ত কেহই অবধারণ করিতে সমর্থ নহে। অতএব জগৎ সম্বন্ধে যে বাধকহীন জ্ঞান তাহাই সত্যজগতের জ্ঞান। এবং মনের মারফতে এবং মনের আকারে ভিন্ন, অন্য কোন মারফতে ও অন্ত কোন আকারে সেই জ্ঞান প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অতএব যাঁহারা বলেন জগৎরূপ অস্তি, সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলেন যে, সেই রূপ মনের আকারে ও জ্ঞেয়রূপেই অস্তি।

এখন ধরুন দুইটী জিনিস আছে—মন ও বাহ্য-জগৎ। তাহার মধ্যে একটি জিনিস (অর্থাৎ বাহ্যজগৎ) অন্তটির (অর্থাৎ মনের) আকারে জ্ঞেয়। এখন যে জিনিসটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞেয় হইয়াছে তাহার সহিত পরোক্ষ-অবস্থিত জিনিসের যদি সমান ধর্ম্মতা না থাকে, তবে একটির মারফতে অন্তটিকে সত্য ভাবে জানা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইহার একটি সামান্ত উদাহরণ দিই। মনে করুন, পটের উপর চিত্রিত একখানি ছবি দেখিতেছি, এবং সেই ছবি দেখিয়া মনে হইতেছে ইহা একজন মানুষের ছবি। অর্থাৎ ছবির মারফতে সেই মানুষটির আকার অবয়ব প্রভৃতির সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইতেছে। এখন ঐ ছবির ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষটির আকারাদি ধর্ম্মের যদি অভ্যন্তরীন্ "সাধর্ম্ম্য" না থাকে, তবে ছবি দৃষ্টে কখনই সেই মনুষ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। তেমনি বহিঃস্থ বিশ্বরূপের সঙ্গে অন্তরস্থ বিশ্ব চিত্রের যদি কোন আভ্যন্তরীন্ সাধর্ম্ম্য ও সাদৃশ্য না থাকে, তবে অন্তরস্থ বিশ্বচিত্রের মধ্য দিয়া এই বহিঃস্থ বিশ্বরূপকে জানা একান্তই অসম্ভব হয়। পাতঞ্জল দর্শন এই কথাই অয়স্কান্ত মণির (Load stone) উপমা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ব্যাসদেব বলিতেছেন—"বাহ্য বিষয় হইতেছে অয়স্কান্ত মণিবৎ। ঐ মণি লৌহের সহিত সম্বন্ধ মাত্র প্রাপ্ত হইলেই (অর্থাৎ কোনরূপে লৌহের সহিত সংযুক্ত বা মিশ্রিত না হইলেও) লৌহকে নিজের চুম্বক ধর্ম্মে অভিরঞ্জিত করে। সেইরূপ বিষয় সকলও চিত্তের সহিত সম্বন্ধ মাত্র প্রাপ্ত হইলেই মনকেও বিষয় ধর্ম্মে অভিরঞ্জিত করে।" (৪।১৭)—এ উপমা বৈজ্ঞানিক কিংবা অবৈজ্ঞানিক উপমা সে বিচারের কোনই অবকাশ নাই। কারণ, বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রতিপাদন করা উপমার উদ্দেশ্য নহে,—তাহার এক মাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে উপমেয় অর্থকে পরিস্ফুট করা। এবং সে উদ্দেশ্য এই উপমার দ্বারা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইতেছে। এই উপমার সাহায্যে দু'টি বিষয় আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারি। বাহ্য-বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্তি বশতঃ মন যে বিষয়-ধর্ম্মে উপরঞ্জিত হয়—সে উপরঞ্জনা, জবা সমক্ষে স্ফটিকের রক্ত উপরঞ্জনার ন্যায়, কোনই অস্থায়ী বাহ্য উপরঞ্জনা নহে,—সে উপরঞ্জনা মনের এক অভ্যন্তরীণ ও নিজস্ব উপরঞ্জনা, এবং সেই উপরঞ্জনার দ্বারা মন নিজেও বিষয় ধর্ম্মে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ বিষয়-উপরঞ্জিত চিত্তের "ধর্ম্ম", ও বাহ্য বিষয়ের "ধর্ম্ম" এক ও অভিন্ন।

এখন যদি আমরা দেখিতে পাই এক জাতীয় পদার্থের সহিত অন্ত জাতীয় পদার্থের ধর্ম্মগত কোন সাদৃশ্য আছে, তবে আমরা সেই দুই জাতীয় পদার্থকে অত্যন্ত বিভিন্ন ও অসম্বদ্ধ পদার্থ বলিতে পারি না। এবং সেই দুই জাতীয় পদার্থের মধ্যে কার্য্য-কারণতা সহজেই অনুমিত হয়। কেন না কার্য্য-কারণের প্রতীতি, বিভিন্ন প্রতীতি হইলেও, তাহা কখনই অত্যন্ত-বিভিন্ন ও একান্ত-অসদৃশ প্রতীতি নহে। এবং সেই জন্তই—"কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ"—কার্য্য হইতেও কারণের অনুমান করা যাইতে পারে,—কেন না কারণ-সত্তা কার্য্যের সহিত সহ-অবস্থিত।

পাশ্চাত্য দর্শনবিৎ পাঠক, কার্য্যের সহিত সহ-অবস্থিত কারণকে অনায়াসেই Spinozaর Immanent

Causeএর সহিত তুলনা করিতে পারিবেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে সহ-অবস্থিত কারণকে বুঝিবার জন্ম সেই সনাতন ঘট কলসা দর দৃষ্টান্তই পুঁজি। অতএব প্রথমে দেখিতে হইবে আমরা ঘট হইতে কলসকে যে অন্ত বলিয়া বিবেচনা করি তাহার কারণ কি?—তাহার কারণ এই যে, ঘটের যাহা আকার পরিমাণ প্রভৃতি "গুণ", তাহাই কংসের আকারাদি বিষয়ক "গুণ" নহে। এবং সেই সকল গুণের পার্থক্য বশতঃ ঘট হইতে কলসকে আমরা বিভাগ (Differentiate) করিতে পারি। নৈয়ায়িক এই সকল গুণকে ঘটাদির বিভাজক গুণ বলিয়াছেন। এই সকল বিভাজক গুণকে আমরা যদি একে একে বাদ দিই,—তবে ঘট ও কলসের কোন্ গুণ অবশিষ্ট থাকে?—তাহা অবশ্যই অবিভক্ত মৃত্তিকা গুণ। এখন এমন যদি মনে করা যায় যে, চৈত্র নামে একটি লোক আছে, যে ঘট কলস দেখিয়াছে কিন্তু কখনও মাটী দেখে নাই, তবে সেই চৈত্র যদি মনোনিবেশ সহকারে দিন কতকের জন্ম তর্করত্ন মহাশয়ের টোলে পাঠ লয়, তবে পূর্ব্বোক্ত বিচার অবলম্বনে সে অনায়াসেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবে, ঘট-কারণ মৃত্তিকা নামে প্রসিদ্ধ সে পদার্থ, তাহা হইতেছে—"ইত্থম্।" ইহাই "কার্য্যাৎ কারণানুমানং" সূত্রের তাৎপর্য্য।

এই তাৎ-পর্য্যকে এই বিশ্ব-কার্য্যে প্রয়োগ করিলে, আমরা বিশ্ব-কারণ মনে উপনীত হইতে পারি কিনা দেখা যাউক। যাহাকে আমরা জগৎ-কার্য্য বা বিশ্ব-রূপ বলিয়া প্রতিক্ষণ অনুভব করিতেছি; তাহা হইতেছে রূপ রসাদির অনন্ত বৈচিত্র্য। এবং সেই বৈচিত্র্য-গুণ-বিশিষ্ট রূপ রসাদিই জাগতিক পদার্থ নিচয়কে, পরস্পর হইতে পরস্পরকে বিভক্ত করিতেছে। কিন্তু পদার্থ সকলের এই সকল বিভাজক গুণের সহিত একটি সাধারণ গুণ সর্ব্বদাই অনুবৃত্ত হইতেছে, যে গুণকে কেবল মাত্র বহির্দৃষ্টিতে আমরা কখনই ধরিতে পারি না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমরা অন্তর্দৃষ্টিকে নিজের মধ্যে ঘুরাইয়া ধরি, সেই মুহূর্ত্তেই তাহা আর ছাপা থাকে না। পদার্থ নিচয়ের সে কোন্ গুণ?—সে গুণ হইতেছে, অখিল বিশ্বরূপের "মনো-যোগ্যতা" বা "মানসিকতা" (The mental aspect of the universe), তাহা জগৎ-রূপের সহিত মনোরূপে তুল্য-মূল্যতা (equal valuation)—তাহা এই স্থূল সংঘাত-কঠিন বিশ্বরূপের, মনের মধ্যে সমাধান ও বিলয় যোগ্যতা (Reducible nature) অতএব, মনোগুণই হইতেছে বিশ্ব-কার্য্যের সহ-অবস্থিত কারণ গুণ, তাহাই হইতেছে এই বহিঃসৃষ্টির *Natura Naturans*।

অন্ত দিক্ হইতে দেখিলেও আমাদের মানস জগতের সহিত বাহ্য জগতের সমান ধর্ম্মতা বহুল ও ভূয়িষ্ঠ ভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের এক মৌলিক (Fundamental) সাদৃশ্য আমাদের সকলেরই এক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ অনুভবের বিষয়। এই দুই জগতের পৃথক্ পরিধির মধ্যে অবস্থিত, দুই জাতীয় জ্ঞের বিষয়কে আমরা যে পরস্পরের ভাষায় তর্জ্জমা করিতে পারি, তাহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে অবশ্যই কোনও আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে। নতুবা, মনের অবস্থা বিশেষকে ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া এমন কথাও বলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না যে—আমার মন আনন্দে "উৎফুল্ল" হইয়াছে কিংবা অমুকের মন এখন "ভার" হইয়াছে। এমন মনোভাব খুব অল্পই আছে যাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে বহির্জ্জগতের তুলনায় প্রয়োজন হয় না। দুঃখে আমরা "বিদ্ধ" হই, মনস্তাপে আমরা "দগ্ধ" হই, ক্রোধে আমরা "অগ্নি শর্ম্মা" হইয়া উঠি। এমন কি, মনকে মাপবার কোন পরিমাণ-দণ্ড অদ্যাবধি আবিষ্কৃত না হইলেও, আমরা অনায়াসেই বলিয়া বসি যে অমুকের মন অতি "সংকীর্ণ" কিন্তু অমুকের মন অতি "প্রশস্ত" ও "বিস্তীর্ণ।" মনোধর্ম্মের সহিত বাহ্য ধর্ম্মের এই যে সর্ব্বলোক-সিদ্ধ সাদৃশ্য-অনুভব, ইহা কোনই অসম্বদ্ধ ও অহেতুক অনুভব নহে।

তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যোগাচার্য্যগণ মনঃসত্তার সহিত জগৎ-সত্তার এই আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যকে, "কথঞ্চিৎ-

ক্রমে সম্ভব এক কষ্টকল্পিত উপমা জ্ঞান" বলিয়া কখনই বিবেচনা করেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, উভয় জগৎ সম্বন্ধে যে এই সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, তাহার কারণ হইতেছে এই যে, উভয় জগতের কার্য্য প্রণালীও হইতেছে একই প্রকার কার্য্য প্রণালী। এক স্থানে পাতঞ্জল-ভাষ্যকার বলিয়াছেন বাহ্য উত্তাপ সম্বন্ধে যেমন একটি পদার্থ তাপক ও অন্যটি তাহার তাপ্য হইয়া থাকে অন্তস্তাপ উৎপত্তি সম্বন্ধেও সেই বিধান। "অত্র তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যম্"—এখানে চিত্ত ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত তাপক রজোগুণের সত্ত্বগুণই তপ্য হইয়াছে।"

৩। সাংখ্য ও বেদান্তের দিগ্‌ভেদ।

এই হইল বহির্জ্জগৎ ও মনোজগতের কার্য্যকারণ সূচক সাধর্ম্ম্য ও স্বালক্ষণ্য। এবং এই সাধর্ম্ম্য ও স্বালক্ষণ্য প্রণিধান পূর্ব্বকই প্রাচীন আচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—"মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে"—মন হইতেই পরিণাম-ক্রমে এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তবাদ এই কার্য্য কারণের ক্রম কিঞ্চিৎ বিপর্য্যয় ক্রমে অবধারণ করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে। কারণ, শ্রুতিপ্রমাণতঃ বেদান্তবাদ বলিয়াছেন :—

আকাশাদিগতাঃ পঞ্চ সাত্ত্বিকাংশাঃ পরস্পরম্।
মিলিত্বৈবান্তঃকরণমভবৎ সর্ব্বকারণম্॥

অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া, (সমস্ত বিষয়-জ্ঞানের) কারণ স্বরূপ এই অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপে বেদান্ত-বাদ অনুসারে পাঞ্চভৌতিক জগৎ ও মানব কার্য্য-কারণ নিরূপণে যে বিভিন্ন ক্রম দর্শিত হইয়াছে, তাহা, আমাদের বিবেচনায় কার্য্য কারণের বিপর্য্যয় সূচনা করিতেছে না,—তাহাতে দ্রষ্টার পর্য্যবেক্ষণের দিগ্‌ভেদ মাত্র সূচিত হইয়াছে। কেন, তাহা বলিতেছি।

সাংখ্যবাদ বলিয়াছেন মন হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। বেদান্ত-বাদ বলিতেছেন জগৎ হইতেই মনের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ উভয় বাদেই স্বীকৃত হইতেছে যে, মনঃশক্তি ও জগৎ-শক্তি সমন্বয় বিশিষ্ট শক্তি বটে, যাহার জন্য, একটি হইতে অন্যটির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু একজন বলিতেছেন কার্য্য কারণের পূর্ব্বাপর ক্রমে, জগৎ আগে; মন পিছে এবং অন্য জন বলিতেছেন মন আগে, জগৎ পিছে। কিন্তু জগৎ-পরিণামে, যাহা আগে তাহা অবশ্যই কখন না কখন পিছে পড়ে, এবং যাহা পিছে তাহা আগে হইয়া যায়। এবং তাহা নিম্ন-লিখিত প্রকারে হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িক বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন,—বীজ আগে না অঙ্কুর আগে। প্রথম পক্ষ বলিলেন, বীজই আগে, কারণ বীজ হইতেই অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া থাকে। উত্তর পক্ষ বলিলেন, না, অঙ্কুরই আগে, কারণ বীজ কখনই আকাশ হইতে পড়ে না, তাহা অঙ্কুর ও বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। দুই পক্ষের তুমুল তর্ক বাঁধিয়া গেল,—এবং অবশেষে মীমাংসা এই দাঁড়াইল বীজ আগে, না অঙ্কুর আগে, ইহা ব্যবহারিক (empirical) বিচারে বলা অসাধ্য। ইহারই নাম—"অনাদি বীজাঙ্কুর ন্যায়"।

এখানে সাংখ্য ও বেদান্তবাদের মধ্যেও অমরা সেই বীজাঙ্কুর ন্যায়ের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। কারণ মনঃশক্তি ও জগৎশক্তি যখন উভয় মতেই সমন্বিত শক্তি, তখন কার্য্যকারণ প্রবাহে মনঃশক্তি যদি বীজ হয় তবে জগৎ শক্তি তাহার অঙ্কুর। এবং অঙ্কুর স্বরূপ এই বাহ্য জগৎ হইতেই বীজস্বরূপ মনেরও পুনরুৎপত্তি হওয়া অসিদ্ধ নহে। কারণ এ জগতের আয় ব্যয়ের খতিয়ানে একটি কপর্দ্দকেরও 'তঞ্চকতা' হবার উপায় নাই। এখানে যাহা একত্র ব্যয়ের হিসাবে লেখা যাইতেছে, ঠিক সেইটিই অন্যত্র আয়ের হিসাবে জমা হইতেছে। ইহাই জগতের প্রতিদিনের ভাঙ্গাগড়ার সনাতন রীতি,—ইহাই দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয়ের চিরন্তন প্রথা। এবং এই প্রথা অনুসারেই, যে পুরাণ-কর্ত্তা বলিয়াছেন মন হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি, তিনিই আবার বলিয়াছেন মনের মধ্যেই সৃষ্টির নিবৃত্তি। যে বিশ্ব মন আদিম সৃষ্টিতে এই চরাচরকে প্রসব করিয়াছিল, অন্তিম প্রলয়ে সেই মনের মধ্যেই এই বিশ্ব বিলীন হইবে, বিরাট মন এই বিপুল

সৃষ্টিকে গ্রাস করিবে। অতএব এই চলমান সৃষ্টি, প্রতিপদক্ষেপে,—শুধু তাহার আদিম জন্মকাহিনী নহে, তাহার অন্তিম মৃত্যু সংবাদও রটনা করিতে করিতে, অনন্ত কাল পথে অগ্রসর হইতেছে।

জগৎ-প্রবাহের এই যে অনুলোম ও বিলোম গতি, ইহাকে আদি বিদ্বান্, "সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চারঃ" মন্ত্রের দ্বারা অভিহিত করিয়াছিলেন। এবং এই সঞ্চার ও প্রতিসঞ্চার গতিতে পরিস্পন্দিত জগৎ-প্রবাহে, যদি কোন মন্ত্রার্থ দ্রষ্টা দেখিয়া থাকেন যে, মন হইতেই এ জগতের সঞ্চার হইতেছে, তবে তাঁহার দেখাও যেমন সার্থক দেখা, আবার যিনি দেখিয়াছেন প্রতিসঞ্চার ক্রমে জগৎ হইতেই মনের উপচয় হইতেছে, তাঁহার দেখাও তেমনি সার্থক দেখা। ফলে,—এই দুই দেখা, দুই বিভিন্ন দ্রষ্টার অবলোকনের দিগ্‌ভেদ্ মাত্র,—এবং তাহা কার্য্য কারণের বিপর্য্যস্ত অবধারণা নহে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

মিলন পথে

(উপন্যাস)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খাওয়াদাওয়ার পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া অশোক কি কাযে বাহির হইয়াছিল। বাড়ী ফিরিতে তাহার অপরাহ্ণ হইল। কাপড় ছাড়িয়া বসিতে যাইয়া দেখিল, তাহার বৈকালিক জলখাবার যথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, সে খাবার গুলির সদ্ব্যবহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "বঙ্কু মাধবী কখন এসে খাবার ঠিক করে রেখে গেল? কখন এসেছিল রে?"

"তিনি তো যাননি এখনো; ছাদে বা বাগানে আছেন বোধ হয়।"

সহসা একটা অস্পষ্ট কোমল মধুর ধ্বনি অশোকের কাণে আসিয়া পৌঁছিল। বুঝিল, বাগানে বসিয়া মাধবী সেতার বাজাইতেছে। সে ভাল করিয়া শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া রহিল, কিন্তু দূরত্ব ধ্বনিটাকে অস্পষ্ট করিয়াই রাখিতেছিল। সে খাওয়া শেষ করিয়া মৃদু পদক্ষেপে বাগানের দিকে চলিল।

অন্দরের শেষ প্রান্তে প্রাচীর ঘেরা স্বচ্ছজলপূর্ণ একটা বড় পুষ্করিণী। সেই পুষ্করিণীর চারিদিক ঘিরিয়া ফুলের বাগান। লতায় পাতায় ফুলে মুকুলে বাগানখানি পরিপূর্ণ। পুকুরের বাঁধা ঘাটের সর্ব্বোচ্চ সোপানে বসিয়া মাধবী সেতার বাজাইতেছে। বর্ষণক্লান্ত মেঘাচ্ছন্ন দিনান্তের শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য্যে একতিল প্রখরতা একতিল চপলতা নাই। নিবিড় কালো ও ধূসর মেঘে সব আকাশ ঢাকা। মেঘাবৃত সূর্য্যের একটা অনুজ্জ্বল অলৌকিক সৌন্দর্য্যে পৃথিবী যেন স্নাত হইয়া উঠিয়াছে। পুকুরের জলে বর্ষাধৌত গাঢ় সবুজবর্ণের লতাপাতার এবং মেঘভরা আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়া বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। আসন্ন গম্ভীর মৌন সন্ধ্যার অন্তর্বেদনা বুঝি ঐ মাধবীর সেতারের একটী করুণ রাগিণীর ঝঙ্কারে গলিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং এই স্তব্ধ উদ্যানে অমৃতবৃষ্টি করিতেছিল। বেদনা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। শোভা ব্যথার অনুগামিনী। বেদনা-স্পর্শশূন্য হইয়া সৌন্দর্য্য আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই। তাই এই করুণ রাগিণীটা আজ এত সুন্দর, গম্ভীর বিষণ্ণ। আকাশের মেঘের মত তাহার কালো চোখদুটি মাঝে মাঝে ভিজিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু বর্ষণ করিতেছিল না।

অনাদৃত চুলগুলি কখন যে খুলিয়া পড়িয়া পিঠের উপর লুটাইয়াছিল, মাধবী বুঝি তাহা জানিতেও পারে নাই। তাহার শিথিল অঞ্চল ও কেশ বাতাসের স্পর্শে শিহরিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তাহার সুগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষীণ দেহটি তাহার ম্লান গম্ভীর মুখখানি এই স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যে এই ছায়াময় আলোকে সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছিল।

দুই তিন বৎসর আগে মাধবীর অনেক গান বাজনাই তো অশোক শুনিয়াছে। এক আধ দিন প্রশংসাও করিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব অনুভব করিতে সে চেষ্টা করে নাই। তাহা তো এমন করিয়া একটা অব্যক্ত আনন্দে একটা গূঢ় বেদনায়, একটা অপূর্ব্ব ভাবে তাহার চিত্ত ভরিয়া দেয় নাই। এই অমৃত বিধাতা কি শুধু একটি দিনের জন্যই তাহাকে পরিবেষণ করিলেন?

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় শ্রান্ত হইয়াই, মাধবী বাজনা বন্ধ করিল। অশোকের অজ্ঞাতে যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "বাঃ, কি সুন্দর!" চমকিত মাধবী ফিরিয়া বলিল, "তুমি কখন এলে?"

অশোকের লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া বলিল, "আমি অনেকক্ষণ এসেছি।"

তারপর দুজনেই স্তব্ধ হইয়া গেল। কিছু সময় পরে অশোক বলিল, "সন্ধ্যা হয়ে এল, চল বাড়ী যাই।"

মাধবী নিঃশব্দে অশোকের অনুসরণ করিল। অশোকও কথা কহিল না। তাহার হৃদয় কেন যেন আজ বর্ষা-প্রকৃতির মতই পূর্ণ। শব্দে যদি কিছু কূল ছাপিয়া বাহির হইয়া যায়, তাহার এমন একটা ভয় হইতেছিল। এক সময়ে গতি স্থির করিয়া মাধবী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শোন, আমি একটা ভারি অন্যায় কায করে ফেলেছি।"

অশোক স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

মাধবী গলা পরিষ্কার করিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "সেদিন আখড়ায় বৃন্দাবন বাবুকে গান শুনিয়ে একটা আংটি বকসিস্ নিয়ে এসেছি।"

"আমি তা জানি।"

"তুমি জান? কৈ আমায় ত একবারও জিজ্ঞাসা করনি, একবারও রাগ করনি!"

"মাধু, আমি জানতাম যে তুমি নিজেই একদিন একথা আমায় বলবে। আর রাগ, তার কি দরকার আছে? তুমি ত এখন বড় হয়েছ।"

"বড় হলে কি মানুষ শাসনের বাইরে যায়? আমি অন্যায় করলে তুমি কি এখন আর আমায় শাসন করতে পার না?"

"কেন পারব না মাধু? কিন্তু কাযটা যখন অন্যায় বলে জেনেছ, তখন বাধ্য হয়েই করেছ। বাধ্য হয়ে অন্যায় কায করার দুঃখ ত আর কম নয়। ব্যথার উপর অনর্থক ব্যথা দেওয়ায় কোন লাভ নেই। আর, তোমার সঙ্গে কি আজ আমার নতুন পরিচয়?"

মাধবীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তারপর তাহা গড়াইয়া পড়িয়া গাল দুটি ভিজাইয়া দিল। অশোক মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া দেখিয়া, সস্নেহে মাধবীর চোখ দুটি মুছাইয়া দিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। কিছুকাল পরে সুপ্তোত্থিতের মত মাথা তুলিয়া মাধবী বলিল, "এখন বাড়ী যাই।"

অশোক মাধবীর হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল, "চল, আমি তোমাকে রেখে আসি, নইলে মাসী বকবে হয়তো; সন্ধ্যা হয়ে এসেছে যে।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া মাধবী বলিল, "বকবে কেন? আমি তো কিছু অন্যায় করিনি।" অশোক আর কিছু বলিল না, মাধবী চলিয়া গেল।

পরদিন অশোক ভোরে উঠিয়া মুখ ধুইয়া বসিতেই বঙ্কু আসিয়া জানাইল, আজ কুড়ি পঁচিশ টাকার দরকার। বিগত সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য মহিমার স্মৃতি এখনও তাহার চিত্ত ভরিয়া জাগিতেছিল। সেই একান্ত নিবিড়

অনুভূতিকে এতটুকু ক্ষুন্ন করিতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। তাই সে বন্ধুর কথার কোন জবাব না দিয়া চাবিটা ফেলিয়া দিল। বন্ধু নত হইয়া চলিয়া গেল এবং দশ বারো মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাক্সে মোটে দশটাকার এক খানা নোট পেয়েছি।"

টাকাকড়ির কথা অশোকের এখন ভাল লাগিতেছিল না। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "কাল সকালে দশ টাকার তিনখানা নোট রেখেছি। ভাল ক'রে খুঁজে দেখগে।" বন্ধু জানাইল. সে ভাল করিয়াই খুঁজিয়া দেখিয়াছে, পায় নাই। অশোকের রাগ হইল। পিতার আমলের ভৃত্যের প্রতি যখন তখন রাগ করাও চলে না। অগত্যা সে নিজেই টাকা খুঁজিতে গেল। অনেকক্ষণ খুঁজিয়াও টাকা মিলিল না। অশোক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "টাকাগুলো কি হলো তবে?"

মৃদুস্বরে বন্ধু বলিল, "হয়তো মাধবী দিদি—"

"নিয়ে গেছেন। হতভাগা, সে কথা এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন? ঐ দশটাকাতেই আজ চালিয়ে নে, আর টাকা কাল পাবি।"

অশোক বন্ধুকে বিদায় দিয়া বারান্দায় রেলিং ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তখন মাধবী বসন্ত বায়ুর মত লঘুপদে সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে গাহিতেছিল,—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু,
পেখনু পিয়মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু,
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু –"

বাধা দিয়া অশোক বলিল, "সকাল বেলাই বিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কেন?"

প্রভাত-আলোর মত ঘরময় হাসি ছড়াইয়া দিয়া মাধবী বলিল, "কাল চুরি ক'রে বাজনা শুনেছিলে, তাই আজ প্রকাশ্যে কিছু দান ক'রে গেলাম। এতে করে চুরির ইচ্ছাটা কমতেও পারে।"

"ইস্! চুরি ক'রে শুনতে যাব কেন? তুই তো আমাকে শোনাবার জন্যেই বাজাচ্ছিলি।"

"তা বৈ কি। এমন সমজদার জগতে আর তো মিলবে না।"

অমৃতলাল বহু চেষ্টা করিয়াও ছেলেকে গান বাজনা শিখাইতে পারেন নাই। অশোক হাসি চাপিয়া বলিল, "বড় অহঙ্কারী হয়েছিস। তোকে শাসন না করলে আর চলবে না দেখছি।"

"আচ্ছা, শাসন পরে করবে, এখন আমার কায আছে।" বলিয়াই মাধবী দ্রুতপদে অশোকের শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়া গেল। ময়লা বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড়গুলি হাতে লইয়া সে ফিরিয়া আসিলে সহসা অশোকের মনে পড়ায় বলিয়া ফেলিল, "তুই আজকাল এত বাজে খরচ কেন করিস্ মাধু?"

মাধবী যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "বাজে খরচ করলাম কখন আবার? বিপিন খুড়োর চালে খড় নেই, ঘরে চা'ল নেই, পরণে কাপড় নেই। ছেলে মেয়ে দু'টা অসুখে পড়ে, একটু ওষুধ পথ্যি পাচ্ছে না— এতে কুড়ি টাকা কি বেশী হলো, না বাজে খরচ হলো?"

অশোক বলিল, "যে পরিবার পালনে অক্ষম, সে সংসার সৃষ্টি ক'রে দুঃখ ডেকে আনে কেন?"

মাধবী উত্তর করিল, "হিন্দুশাস্ত্রে বলে, কর্ম্মফলই নাকি আমাদের সুখ দুঃখ দাতা। তবে সবাই সব রকম দুঃখ দুর্দ্দশাই ডেকে আনছে চিরকাল ধ'রে।"

"না হয় তোর কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু যাতে দুঃখ হয়, এমন কায অনেকখানি বাদ দিয়ে চলাও তো একেবারে অসম্ভব নয়।"

"সম্ভবও সব সময় হয় না। তোমার নিজের জীবন পর্য্যবেক্ষণ করলেও এই সত্যটা তোমার কাছেও স্পষ্ট হ'য়ে যাবে। আর দুঃখই যদি না থাকবে, তবে মনুষ্যের স্নেহ, প্রেম, করুণা কি ক'রে সার্থক হবে

উঠবে বল? নাঃ, আর আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারিনে, আমার ঢের কায রয়েছে।"

মাধবী ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে কাচা ওয়াড় ও চাদর লইয়া আসিয়া শুকাইতে দিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিল। অশোক ডাকিয়া বলিল, "মাধবী, শোন্।"

মাধবী ফিরিয়া আসিলে বলিল, "ও গুলো তুই কাচতে গেলি কেন? ধোবার কি হয়েছে?"

মাধবী বলিল, "বলে গিয়েছিলাম না ধোবাকে দিতে? তা দেয়নি।"

"যারা ভুলে গেছে ধোবাকে দিতে, তারাই কাচতে পারে, তুই কেন? দু'জন চাকর তো রয়েছে।"

"তোমার চাকররা তেমন কিনা? না বল্লে সাত জন্মেও কাচবে না। কায কি এত বলাবলিতে? নিজেই কেচে যাই। দু'বাড়ীর খাটুনি খাটতে খাটতে আমার হাতে দাগ ধরে গেল। একটা বিয়ে করে ফেলনা, আমি একটু জিরুই।"

অশোক হাসিয়া বলিল, "তুই পাত্রী ঠিক করে দিস্।"

"আচ্ছা, তাই দেবো" বলিয়া মাধবীও হাসিয়া চলিয়া গেল।

তারপর সে বন্ধুকে ডাকিয়া সেদিনকার রন্ধন সম্বন্ধে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া, স্নান করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। নিজের সম্বন্ধে শিশুর মত অক্ষম অসহায় অশোকের সব কাযের প্রতি মাধবীকে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইত। নিজের হাতে রান্না করিতে পারিত না বলিয়া অশোকের জন্য তাহার ভয় ও ভাবনার অন্ত ছিল না। বিধুঠাকুরাণীর রান্না কিছুতেই মাধবীর মনঃপূত হইত না।

অশোকের পাচিকা ব্রাহ্মণী বিধুমুখীর অশেষ গুণ। রান্নার পরিমাণ মত তৈল, ঘি, মশলা প্রভৃতি তাহার হস্তস্পৃষ্ট হইলেই কেমন যেন কমিয়া যাইত। (রান্না সুস্বাদু না হওয়ায় সুতরাং তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না।) এ সম্বন্ধে অমনোযোগী মনিবটির কাছে নালিশ করিয়াও বন্ধু এ পর্য্যন্ত কোন ফল পায় নাই। তাই সে পরম নিষ্ঠাবান হিন্দুর মত অদৃষ্টের ঘাড়ে সব দোষের বোঝা চাপাইয়া ইদানীং নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বাক হইয়া আছে।

এখানে বিধুর পাচিকাবৃত্তির ইতিহাস এই। একদিন নিঃসন্তান বিধবা আসিয়া অশোককে ধরিয়া বসিয়াছিল, "বাবা আর তো আমি দশ-দোরে ঘুরতে পারি নে; আমায় একটু আশ্রয় দাও।" বলিয়া সে অশোকের পরলোকগত পিতামাতার আশ্রিত-পালন-গুণ কীর্ত্তন করিয়া চোখে আঁচল চাপা দিতেই অশোক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "বেশ ত আপনি এখানেই থাকুন।"

বিধুঠাকুরাণী থাকিয়া গেলেন বটে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নয়। দুই বেলা পাক করিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতেন। খাওয়ার খরচের জন্য প্রকাশ্যে দশ টাকা মাসে পাইতেন, আর অপ্রকাশ্যে অশোকের ভাঁড়ার হইতে যে কত পাইতেন, অশোক তাহার হিসাব রাখিতে পারিত না। অশোকের নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধু এই ব্যাপারটা মাধবীর অগোচর রাখিতে পারিত না। মাঝে মাঝে মাধবী রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিত। স্ত্রীলোকের চুরি! অশোক লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিত; বহু অনুনয়ে মাধবীকে থামাইয়া রাখিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বর্ষা তাহার অজস্র ধারায় পৃথিবীকে ধুইয়া মুছিয়া নির্ম্মল ও তাজা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল হাসি মুখটি লইয়া শরৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্ষার সঞ্চিত জলধারার সরস মাঠগুলি স্নিগ্ধ শ্যামলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মেঘ আপনাকে প্রায় নিঃশেষে দান করিয়া আকাশ স্বচ্ছ গাঢ় নীলিমায় পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে। দিকে দিকে উজ্জ্বলতা, দিকে দিকে নূতন জীবনের স্পন্দন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাসমণি হরিনামের ঝুলিটি হাতে লইয়া এখনও তুলসীমঞ্চের কাছে আসন

পাতিয়া বসিয়া আছে। মায়ের আহারের অপেক্ষায় মাধবীও উঠানে বসিয়া আছে। উঠানময় জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি, ফুলে ফুলে ভরা শেফালিকা গাছটিও আপাদ মস্তক জ্যোৎস্না মণ্ডিত। তাহারই তলায় মাধবী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আজ অশোকের মন তেমন প্রফুল্ল দেখা যায় নাই। সে ভাল করিয়া কথাও কহে নাই। এমন ত প্রায় ঘটে না। আজ কেন এমন হইল? মাধবীর চিত্ত অভিমানে ভরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কি জন্য অভিমান? অশোক সর্ব্বদাই তাহাকে আদরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে এমন কি কথা? কোন্ অধিকারে সে ইহা দাবী করিতে পারে? অশোকের সহিত তাহার কি সম্পর্ক? সে যে মাধবীর সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করে, ইহাই তো তাহার দয়া। দয়া? হোক্, মাধবী বরং অশোকের তাচ্ছিল্যই গ্রহণ করিবে, তথাপি তাহার দয়া সে সহতে পারিবে না। আজ তাহার হৃদয়ই বা কেন এমন দীন প্রসাদ-ভিক্ষু হইয়া উঠিল? ছি ছি! একি তাহার হীনতা?

প্রকৃতি তাঁহার রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ লইয়া নিয়তই জীবের সেবা করিয়া যাইতেছেন। বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই, একবিন্দু প্রতিদান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও নাই। এই যে আলোকের প্লাবনে উঠান ভরিয়া গিয়াছে, ফুলের বর্ণে, গন্ধে অন্তর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতিদানে মানুষের দেওয়ার মত কি সম্বল আছে? দুর ছাই! এ সব ভাবনা আজ মাধবীকে পাইয়া বসিল কেন? এতক্ষণ এই জ্যোৎস্নায় বসিয়া কিছু সলিতা পাকাইলে বা সুপারী কুচাইলেও লাভ হইত। শুধু শুধু জ্যোৎস্নাভোগের কবিত্ব তো তাহার মত গরীবের মেয়ের সাজে না। মাধবী উঠিয়া ঘরে গেল কিন্তু সলিতা বা সুপারীতে তাহার আগ্রহ দেখা গেল না। উমার মত সেও অশোকের কাছে কতগুলি বাঙ্গলা বই উপহার পাইয়াছিল। বই গুলি সযত্নে একটা কাঠের বাক্সে রক্ষিত ছিল। সে বাক্স খুলিয়া একখানা বই বাহির করিয়া লইয়া সেই শিউলি তলাটিতে আসিয়া বসিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। এক সময়ে ঠাকুর্দ্দা আসিয়া যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তাহা সে টের পাইল না। ঠাকুর্দ্দা দেখিলেন কথা না বলিলে শীঘ্র সাড়া পাওয়া যাইবে না। তিনি বলিলেন, "দিদি, এত মন দিয়ে কি পড়ছ?"

মাধবী ত্রস্তে উঠিয়া বইখানা মুড়িয়া বলিল, "কে, ঠাকুর্দ্দা? বোস, বোস।"

ঠাকুর্দ্দা হাস্য মুখে সেইখানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বই পড়ছিলে দিদি?"

"বলছি" বলিয়া মাধবী তাড়াতাড়ি যাইয়া একখানা আসন আনিয়া ঠাকুর্দ্দার কাছে পাতিয়া দিয়া বলিল, "একখানা কবিতার বই।"

আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুর্দ্দা হাসি মুখেই বলিলেন, "তা যেন হ'লো। কিন্তু আমার যেটি শালা হবে, সে যদি আদপে অক্ষরই না চেনে, তখন আমার দিদিটির অবস্থা কি দাঁড়াবে?"

"যদি তাই-ই হয়, তবে তাকে তুমি শিখিয়ে দেবে।" —বলিয়া মাধবী হাসিল।

"সে আর হয় না।"

"ভবিষ্যতের ভাবনা এখন থাক্। তুমি রাত্রে যে বড় এলে, কোন কায আছে নাকি ঠাকুর্দ্দা?"

"কায? না, তেমন কিছু নেই। চাঁদের আলো আর শিউলির গন্ধ তোমার কাছে আমাকে ডেকে এনেছে।"

"পঞ্চাশ বছর বয়সেও তোমার বেশ রসবোধ আছে দেখ্‌ছি।"

"বয়সে রস পাকে, তা জানিসনে দিদি?"

"তোমার মত বয়স তো আমার হয় নি। হ'লে হয় তো জানব। ঠানদিদির সঙ্গে তোমার কি রকম রসালাপ চলতো?"

"তার বয়স ছিল ন বছর, আমার ছিল বারো। আমার অবাধ্য হ'লেই তার পিঠে দুম্ দুম্ করে কিল বসিয়ে দিতাম। রুদ্র আর করুণ রসের লীলাই আমাদের ভিতর চলতো।"

"তুমি আর বিয়ে করলে না কেন?"

"কবে আর করবো দিদি? সে ত মরে গেল দশ বছর বয়সেই। তারপর কুড়ি বছর বয়সেই আর এক জনের সঙ্গে মালা বদল করে ফেল্‌লাম। এই ত্রিশ বছরে সে আর কারু পানেই আমায় চাইতে দিলে না।"

"সত্যি ঠাকুর্দ্দা, সে এত সুন্দর? তাকে ভালবাসলে আর কাউকে ভালবাসা যায় না?"

"হাঁ দিদি, খুব সুন্দর! তার রূপের তুলনা নেই, ক্ষয় নেই। কাউকে কেন ভালবাসা যাবে না? তাকে ভালবাসলেই সবাইকে ভালবাসা হয়। রাধে মাধব, রাধে মাধব।"

বলিতে বলিতে ঠাকুর্দ্দা এমনি ভাবে আকাশের পানে চাহিলেন, সেই নীল আকাশের গায়েই যেন তাঁহার প্রিয়তমের অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানা আঁকা রহিয়াছে। গঙ্গাযমুনার মত তাঁহার সাদা কালো চুলগুলির উপর জ্যোৎস্না হাসিতেছিল, এবং দাড়িশূন্য সদাপ্রফুল্ল সরস মুখখানা জ্যোৎস্নার মত শুভ্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। মাধবী শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-নত চিত্তে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। এই বৃদ্ধের সামীপ্য সকল সময়েই তাহাকে উৎফুল্ল ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তোলে। ইঁহার বিরাগ ত কাহারও উপর সে দেখে নাই, মাধবীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ যেন একটু বেশী বলিয়াই তাহার মনে হয়। কিছুকাল পরে ঠাকুর্দ্দা চক্ষু নামাইয়া বলিলেন, "দিদি, তুমি ত অনেক দিন আখড়ার ঠাকুর দর্শন করতে যাও নি।"

"আখড়ার সেই মন্দির ছাড়া আর কি কোথাও ঠাকুর নেই নাকি?"

"দিদি আমার ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছেন দেখছি!" বলিয়া ঠাকুর্দ্দা শিশুর মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মাধবী রাগ করিয়া বলিল, "তুমি হাসছ কেন? তোমার কৃষ্ণদাস ও হরিপ্রিয়ার মন্দিরে ঠাকুর থাকেন না বলেই আমার মনে হয়।"

ঠাকুর্দ্দা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন দিদি?"

মাধবী অধিকতর রাগিয়া বলিল, "কেন, তুমি তা জান না?"

"তুমি মনে মনে ভাবছ, টাকা আর সেবা দাসীর উপরই মোহান্তের যত ভালবাসা, ঠাকুর সেবা শুধু ভণ্ডামী। আর হরিপ্রিয়া—"

"না, না, হরিপ্রিয়ার কথা আর তোমাকে বলতে হবে না।"

মাধবীর লজ্জিত ব্যস্ত ভাবটায় ঠাকুর্দ্দা সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আর হরিপ্রিয়া দু' তিন জনের সেবা ক'রে এসে মোহান্তের সেবার ভার নিয়েছে। তাতেই বা কি? তিনি যে পতিত পাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর। যারা ভক্তিধনে কাঙ্গাল, যারা পতিত, তাদের কাছেই ঠাকুরকে জাগ্রত থাকতে হয়। তাদের জন্যে তিনি হাত বাড়িয়ে আছেন, তাঁর আলিঙ্গনে তাদের একদিন ধরা দিতেই হবে যে। কারো তো দূরে থাকবার উপায় নেই মাধু। অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, সে তো বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নয় দিদি। প্রেমের ঠাকুরকে শুধু প্রেমেই পাওয়া যায় আর কিছুতে নয়।"

মাধবী জানিত, এই কথাগুলি ঠাকুর্দ্দার মুখে সত্য ও শোভন বটে। তাই সে তর্ক করিতে চেষ্টা করিল না। শুধু ঠাকুর্দ্দার উপলব্ধির কথা ভাবিতে লাগিল। এই ঠাকুর্দ্দাকে সে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছে। বাহিরের প্রসন্নতা এবং অন্তরের পরিপূর্ণতা ছাড়া তাঁহাতে আর তো কিছুই দেখে নাই। তাঁহার পৈতৃক জমি জমা কিছু ছিল। তাহা জ্ঞাতিদিগকে বিলাইয়া দিয়া আখড়ার মন্দিরের পশ্চাতে এক কুটীর বাঁধিয়া সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তাহাতেই বাস করিতেছেন। গ্রামের সকলের অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত তাঁহার গতি অবারিত। মাঝে মাঝে তিনি ভিক্ষায় বাহির হইতেন বটে, কিন্তু ভিক্ষা বড় বেশী হইত না; শিশু দলে বেষ্টিত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া খঞ্জনি বাজাইয়া "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥" গাহিতেই তাঁহাকে বেশী দেখা যাইত। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া শিশুরা উল্লসিত হইত, যুবকেরা হাসিত এবং গৃহিণীরা সাগ্রহে ভিক্ষা লইয়া আসিতেন। সে দিন মাধবী আখড়ায় বেড়াইতে গিয়া দেখিয়াছিল,

কুটীরের চালের ছিদ্র হইতে শত ধারে জল পড়িয়া কুটীর মধ্যে প্লাবনের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই মধ্যে বসিয়া ঠাকুর্দ্দা শিখা মণ্ডিত মাথাটি দুলাইয়া দুলাইয়া নির্ব্বিকার ভাবে 'হরে কৃষ্ণ' গাহিতেছেন, আর তাঁহার কপোল বহিয়া বর্ষাধারার মত ধারা নামিতেছে। মাধবী রহস্য করিয়া বলিয়াছিল, "ঠাকুর্দ্দা, কাঁদছ কেন? ঠানদিদির বিরহে নাকি?"

ঠাকুর্দ্দা স্মিত মুখে বলিয়াছিলেন, "হাঁ দিদি, বিরহই বটে।"

মাধবীর রহস্যভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিল, "ঠাকুর্দ্দা, চালটা সারিয়ে নাও না কেন? যদি অনুমতি দাও, তবে—"

"তুমি সারিয়ে দিতে পার। কিন্তু তাতে কায কি মাধবি! এই আমার যোগ্য, আমি যে ভিক্ষুক, দিদি।"

ঠাকুর্দ্দার অনিচ্ছা বুঝিয়া মাধবী আর কথা বলে নাই। আজ সে কথা মাধবীর মনে পড়িল।

ঠাকুর্দ্দা কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন তাঁহার আর বলা হইল না। তুলসীমঞ্জরী ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুর্দ্দার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল। আর্ত্ত চীৎকারে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর্দ্দা, শীগ্‌গির চল। ওর যেন কি হয়েছে। বোধ হয় আর বাঁচবে না। ওগো আমার কি হবে?"

ঠাকুর্দ্দা ধীরভাবে তুলসীকে উঠাইয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, "ছি, দিদি ব্যস্ত হয়ো না। ঠাকুরকে ডাক, তিনি ভাল করে দেবেন। কিছু ভয় নেই, চল আমি যাচ্ছি।"

তুলসীর চীৎকার শুনিয়া গোবিন্দদাস বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং রাসমণি মালা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে নিতাইয়ের?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "পরশু জ্বর হয়েছিল, আজ তা বেশ বেড়েছে। হয়তো জ্বরের ঘোরে দু'একটা ভুল বকছে, তাই তুলসী অমন ব্যস্ত হয়ে গেছে।"

তার পর রাসমণিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মা আমার সঙ্গে চল। তুলসী অস্থির ওর দ্বারা তো রোগীর সেবা হবে না। আমাকে ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে হয় তো।"

রাসমণি সঙ্কোচজড়িত মৃদু কণ্ঠে বলিল, "যেতেই তো হয়, কিন্তু আমার যে শরীর, তাতে রাত জাগা—"

"আচ্ছা তবে থাক।" বলিয়া ঠাকুর্দ্দা দাঁড়াইলেন।

মায়ের আচরণের লজ্জা মাধবীকে বিদ্ধ করিল। সে পিতার পানে চাহিল। গোবিন্দ দাস সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। সে গমনোন্মুখ ঠাকুর্দ্দাকে বলিল, "তুমি মাধুকে নিয়ে যাও। ডাক্তার ডেকে এনে, ওকে রেখে যেও।"

মাধবীকে লইয়া ঠাকুর্দ্দা যাইয়া দেখিলেন, নিতাইয়ের জ্বর বাড়িয়া গিয়াছে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে ভুলও বকিতেছে। অন্য কোনও উপসর্গ নাই। আশঙ্কারও কোন কারণ নাই। কিন্তু যখনই নিতাই ভুল বকিতেছিল, তখনই মঞ্জরী হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু দু'টি স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, চুল গুলি রুক্ষ, বিশৃঙ্খল। মেয়েটি এতক্ষণ কাঁদিয়া একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার মাথার নীচে কোন উপাধান নাই। মাধবী তাড়াতাড়ি বিছানা করিয়া মেয়েটিকে সযত্নে শোয়াইয়া রাখিয়া, জল ও ন্যাকড়া লইয়া নিতায়ের বিছানার ধারে গিয়া বসিল। গরীবের পল্লী, এখানে 'আইস ব্যাগ' বা বরফ মিলে না। সে নিতাইয়ের মাথা জল দিয়াই ধোওয়াইয়া দিতে লাগিল। ঠাকুর্দ্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারক ডাক্তারকে ডেকে আনব মঞ্জরী দিদি?"

"এখনই ডেকে আন, নইলে"—তুলসীর কথাটা আর শেষ হইতে পাইল না, কান্নায় আটকাইয়া গেল।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "ডাক্তার ডাকলেই তো টাকা লাগবে, আছে তো টাকা?"

"আছে আর কৈ?" বলিয়া তুলসী কাণ হইতে সোণার ফুল দু'খানা খুলিয়া ঠাকুর্দ্দার হাতে দিয়া

বলিল, "বাঁধা রেখে বা বিক্রি করে টাকা আনবে। যাও, শীগগির যাও।"

সোণার ফুলের আর্থিক মূল্য ছয় সাত টাকার বেশী নয়, কিন্তু নিতাই ও তুলসী মঞ্জরীর কাছে ইহা বহুমূল্যই বটে। অনেক মান অভিমান ঝগড়া ঝাটি কান্না কাটির পরে ফুল দু'খানা কেনা হইয়াছিল। আজ নাকি মঞ্জরীর প্রাণের দায়; তাই সে অবাধেই ঠাকুর্দ্দার হাতে ফুল তুলিয়া দিতে পারিল! কাযটা নিতায়ের অগোচরে ঘটিলে, নহিলে সে বোধ হয় প্রবল আপত্তিই করিত।

ঠাকুর্দ্দা ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেলেন। মাধবী রোগীর সেবায় মনোনিবেশ করিল। ক্রন্দনে এবং অস্থিরতায় তুলসী মাঝে মাঝে মাধবীর কাযের বিঘ্ন ঘটাইতেছিল, আবার মাধবীর দৃঢ় কণ্ঠের মৃদু ধমকেই যথাসাধ্য স্থির হইয়া বসিতেছিল।

ঘণ্টা দুই পরে ঠাকুর্দ্দা গ্রাম্য ডাক্তার তারকবাবুকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার আসিয়া রোগীর বগলে থার্ম্মোমিটার এবং বুকে ষ্টেথিসকোপ লাগাইয়া, দর্শনীর দু'টাকা পকেটে পুরিয়া, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তুলসী কখনও ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলিত না, কিন্তু আজ তাহার সে নিয়ম ঠিক রহিল না। রুদ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু, ভাল হবে তো?"

ডাক্তার বাবু এরূপ প্রশ্নে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার ডাক্তারী চালে গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ভাল হবে বৈকি; তবে ঔষধ পথ্য ও সেবার ভাল বন্দোবস্ত চাই।"

বলিয়াই ডাক্তার বাবু বাহির হইয়া গেলেন; ঔষধের জন্ত ঠাকুর্দ্দা তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

ঔষধ লইয়া ঠাকুর্দ্দা যখন ফিরিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। মাধবী রোগীকে একবার ঔষধ খাওয়াইয়া এবং ঔষধ কি ভাবে কতক্ষণ পরে পরে খাওয়াইতে হইবে তাহা তুলসীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তুলসী কৃতজ্ঞ কাতর কণ্ঠে বলিল, "চল্লি তো ভাই! তুই এতক্ষণ ছিলি, ভয় ছিল না। কাল ভোরেই আসবি?"

মাধবী বলিল, "নিশ্চয় আসবো। কোন ভয় নেই, ঠাকুর্দ্দা আমাকে পৌঁছে রেখে, এসে এখানে থাকবেন।"

ঠাকুর্দ্দা মাধবীকে রাখিয়া আসিয়া তুলসীকে আর একদফা অভয় দিয়া, তাহার মেয়ের পরিত্যক্ত ছেঁড়া মাদুরটি লইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন। খানিক পরে বলিলেন, "তুলসী দো টা বন্ধ ক'রে দাও। নিতুর গায়ে ঠাণ্ডা লাগে।" উপদেশ মত তুলসী দরজা বন্ধ করিল।

শেষ রাত্রে নিতাই ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল, তুলসী স্থির নেত্রে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। নিতাইকে চোখ মেলতে দেখিয়া সে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন একটু ভাল বোধ করছ?"

নিতাই তখন ভাল বোধ করিতেছিল, কারণ জ্বর বিরাম হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "হাঁ, তুই সারা রাত জেগেই আছিস নাকি?"

"তুমি যা করছিলে! ঘুম কি আসে?"

"তবে এখন একটু ঘুমিয়ে নে না।"

"ভোর হয়ে এল আর ঘুমুবো কি?" বলিয়াই তুলসী স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিয়া, চোখের জলে বুক ভাসাইয়া বলিল. "আমি আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না, তুমি শীগ্‌গির ভাল হয়ে ওঠ।"

নিতাই পরম স্নেহে স্ত্রীর মস্তকে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল, "তুই আমার সঙ্গে ঝগড়া করিস ব'লেই কি আমার অসুখ করেছে পাগলি? অমনিই অসুখ করেছে। ভয় কি, ভাল তো হয়ে গেছি।"

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

নাম কিনিবার উপায়

নামের কাঙাল তুই মতিলাল, কিনিবারে চাস্ নাম ?
শোন্ তবে দিই ছুটো উপদেশ, শোন্ তবে বলি থাম।
আজকাল বেশী হয়নাক নাম বেশী লেখাপড়া শিখে,
পড়াশুনা করে পাবিনাক সিকি, যা পাবি এখন লিখে।
একদিন ছিল বি-এ পাশ হলে সকলে দেখ্‌তে যেত,
এম-এ পাশ হলে সে ত দিগ্‌গজ ! বাহবা খাতির পেত।
এম-এ, বি-এ আজ পথে গড়াগড়ি শত শত গাঁয়ে গাঁয়ে
পি, আর, এস, ই বছরে আটটা—ঘুরিছে পেটের দায়ে।

আর একটাতে নাম হত বটে ছু'চার বছর আগে
ক' বছর হতে দেশের লোকের তাতে না চমক লাগে।
আমি কি ভাবছি বুঝতে পারলি ? বুঝলি না ? আরে রাম!
রাজনীতি নিয়ে চর্চ্চা করিলে টিটি পড়ে যেত নাম।
গরম গরম বক্তৃতা—কেন ? চেঁচাতে পারলে জোর,
ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্‌ডির সহ নাম হয়ে যেত তোর।
ঘোড়া খুলে গাড়ী টানত ছেলেরা, বয়ে নিয়ে যেত কাঁধে,
দলে দলে তোরে দেখতে জুটত ঝরোখায়, গাছে, ছাদে।
থাক্—সে পথ ত বন্ধ এখন—জেলে গেল দলে দলে,
নাই বাহাদুরী আজকে তাতেও সেদিন গিয়াছে চলে।
বদলিয়ে গেছে দেশের হাওয়াটা, স্বাতাগিরি বড় ঠেলা
ঘানী টেনে এলো লক্ষপতিরা, তাই বলে ছেলেখেলা।

তাই বলি শোন, নাম চাস যদি, নভেল লিখতে ধর,
সোণাগাছি আর রামবাগানের ঠেসে বর্ণনা কর।
কুল ললনার অবৈধ প্রেম বিষয় বস্তু হবে,
কামকেলি সব নিখুঁত হুবহু তাতে বর্ণিত রবে।
মদনানন্দ মোদকের কায় বই পড়ে হওয়া চাই,
সব থেকে বড় এই হল "আর্ট" এর বাড়া কিছু নাই।
তুলোর গদিতে বাঁধা হবে বই, সোনালী আখরে ছাপা,
বাছা মতিলাল, নামটি তোমার রহিবে না ধামা চাপা।

ট্রামে ট্রেণে ছাদে দোকানে আপিসে ঘুরিবে তোমার নাম,
"ইস্কুল-বয়" জপিতে থাকিবে তব নাম অবিরাম।
তোর বইগুলি গৌরবে রবে সাধারণ পাঠাগারে
ছোক্‌রারা সব কিনিবে ও বই বিবাহের উপহারে।

আর যদি নাহি থাকে বাছা তোর নভেল লেখার ঝোঁক
রাতারাতি যদি নামের সঙ্গে হতে চাস্ বড় লোক।
তবে ছোট বড় নাটক নাটিকা লিখতে ধরনা কেন ?
ট্র্যাজেডি ফ্যাজেডি ও রকম কিছু ভুলে লিখিসনা যেন।
লিখবি এমন থাক্‌বে যাহাতে প্রণয়ের ঠেলাঠেলি,
হাসি মস্‌করা ঠাট্টা তামাসা কামলীলা রসকেলি,
হরদম শুধু নাচগান লাফে কর্দ্দম হবে ষ্টেজে,
গোটা থিয়েটার কাঁপিয়া উঠিবে বীর বক্তার তেজে।
প্রতি অঙ্কের গোড়াতেই সীন জোর করি দিবি গাদি,
বনবালাগণ মেথরাণীগণ সহচরীগণ আদি।
সব নাটকেই থাক্‌বে চাকর বাঙাল কিম্বা উড়ে
মেদিনীপুরের একটা ঝি এনে তার সাথে দিবি জুড়ে।
মাঝাদোলা ছাঁদে গান লিখে দিবি টপ্পা জংলী সুর,
মাঝে মাঝে তাতে ঢেলে দেওয়া চাই ইতর ভাষার গুড়।
তোর গান ছাড়া কোন গান আর শুনিতে চাবে না দেশে
বিবাহ সভায় হাটে মজলিসে স্কুল কলেজের মেসে।
কলিকাতা তোর নামাবলী গায়ে রাঙা হবে তোর নামে।
হ্যাণ্ডবিলে আর প্লাকার্ড বোর্ডে গ্যাসপোষ্টের থামে।

কবিতা লিখে ত হবেনাক নাম, ও পথে যেওনা চাঁদ,
সহজে ও পথে হবেনাক কিছু, ও পথে বিরাট বাঁধ।
তবে যদি আর কিছু না পারিস, লেখ তবে কবিতাই
নেই মামা চেয়ে কাণা মামা ভাল একটা ত কিছু চাই।
টাকাকড়ি আছে, গাড়ীজুড়ী আছে, বল্‌ছি সকলি ভেবে—
প্রকাশ জন্য নাইক ভাবনা—মোটা মাসিকেই নেবে।

এমন কবিতা লিখবি যাহার অর্থ হবে না কিছু,
অর্থ হলেই মারা গিয়েছিস্, পড়বি সবার পিছু।
নাচুনে ছন্দে লিখবি শুধুই, দিবি খুব ঝঙ্কার,
পড়তে গেলেই দুলে যাবে মাঝা নড়তে থাকবে ঘাড়।

যা মনে আস্‌বে দিয়ে দিবি শুধু অনুপ্রাসের তাক
অর্থ ত তো তোর রয়েছে ব্যাঙ্কে, কবিতায় নেই থাক।
মিলটিল যেন নিখুঁত করিস, মিলে নাহি থাকে ত্রুটি,
যত দিবি মিল তত খুলে খিল নাম যাবে দেশ ছুটি,
সাহিত্য-মহারথীদের দলে Daisএ বসতে পাবি,
গরীব কবিরা বেঞ্চিতে বসে' চেয়ে চেয়ে খাবে খাবি।
বাড়ীতেই প্রেস বসায়ে লইবি, কতই বা তার দাম ?
মাসে মাসে বই বাহির করিবি, জাহির করিবি নাম।
প্রতি পৃষ্ঠাতে আটসারি দিবি, 'পাইকা' টাইপে ছেপে
একখানা খাতা উঠ্‌বে দেখ্‌বি দশখানা বইয়ে ফেঁপে।
কবিতার বই বিকাবে না বটে, দুচোখো বিলিয়ে দিবি,
সমালোচানাটা—তোজ্‌টোজ দিয়ে দিব্যি বাগিয়ে নিবি।

মিলটিল যদি না দিতে পারিস্, তবে শোন উপদেশ,
ছোটবেলা হ'তে ড্রইং করার ছিল তোর অভ্যেস।
প্রথম প্রথম সুরু করে দিবি ফোটো তুলে কোন মতে,
লিখে দিবি তায় "অমুকের তোলা আলোক-চিত্র হতে।"
মডেল হবার নারীর অভাব হবেনাক তোর জানি,
ফটো রঙাইয়া মৌলিক বলি চালাবি দুচার-খানি।
মুখ আঁকা যদি নাহি আসে, তবে মুখটা ঘুরায়ে দিবি,
গুরুনিতম্ব, উরু, পয়োধর, আঁক্‌বি গলিত নীবি,
সব মুখগুলো একই প্রকারের হয়ে যায় যদি, তবে
পিছুটা দেখাবি, পাশ্‌টা দেখাবি, মাথা হেঁট করে রবে।
ত্রস্তা, ব্যস্তা, স্রস্ত বসনা, দিগ্‌বসনা বা নারী,
নিদাঘ-বিলাস, ঘুমন্তরূপ, সিক্ত মিহিন শাড়ী,
প্রসাধন, স্নান, নিভৃতবিরাম, চকিতা, মুকুর পাশে,
জলকেলি, আর বদনবিনোদ, বায়ুলাঞ্ছিত বাসে,
ইত্যাদি সব পরিকল্পনে ফুটাইবি আদিরস,
ধাঁ ধাঁ করে তবে দিগ্‌দিগন্তে ছুটে যাবে তোর যশ।

ছবির নীচেতে দু'চার লাইন কবিতাও দিবি তুলে,
কবির সঙ্গে ছবির মিলন হয়ত হবে না মূলে—
তাতে ক্ষতি নাই, তুলে দিবি কোনও বৈষ্ণব কবি হতে
রাধা মনে করে সরল ভক্ত ভাসিবে অশ্রুস্রোতে।
গোপন নহেক উচ্চশিল্প, প্রকাশই চরম তার—
কাপড়ে ঢাকিলে কোথা কৃতিত্ব ? শিল্পী নির্ব্বিকার।
নাম হবে তোর "ভিজেকাপড়ের শিল্পের সম্রাট্"
"চারু পয়োধর গুরুনিতম্ব অঙ্কনে বড়লাট।"

লেখাজোখা আঁকা ইহার মধ্যে কোন'টা না হয় ঠিক,
বার কর তবে কাগজ একটা মাসিক কি দৈনিক।
নিজে র'বি বসে সাক্ষীগোপাল, অপরের লেখা নিয়ে
চালাবি দিব্যি পঁচিশটাকার সাব এডিটার দিয়ে।
মাসিক হইলে কামোদ্দীপক ছবি ও গল্প দিবি ;
বিনা পয়সায় আর যাহা পাস্ অল্পস্বল্প নিবি।
দৈনিক হলে, ভরে দিবি পাতা কার্টুনে ল্যাম্পুনে
দুচোখে সবারে গালাগালি দিয়ে দিবি খুব তুলোধুনে।
বড়লোক কেউ রেহাই না পায়, আপন বেহাইও নয়—
গৃহকলঙ্ক গুপ্তছিদ্র ক'রে দিবি দেশময়।
বড়লাট হতে আসামের কুলী কেউ এড়াবে না হাত
ও কথা সবাই জানিবে যে তোর নেইক পক্ষপাত।
হলে সিডিসান, লাইবেল কিছু—একজনে দিবি ঠেলে,
প্রিণ্টার, সাবএডিটারদের একজন যাবে জেলে।
রাজনীতি নিয়ে লিখিতে লাগিবি কোন'দলে নাহি ভিড়ে
সবারেই গালি পাড়িতে থাকিবি নিজে বসে র'বি তীরে।
বেশ্যাপাড়ায় দুই চারিজন রাখিবি রিপোর্টার,
প্রতিদিনই দিবে স্ত্রীলোকঘটিত মামলার সমাচার।
নারীদের নিয়ে লড়িবি খুবই, পুরুষেরে দিবি গালি,
নারীদের লেখা পেলেই ছাপ্‌বি নামটুকু দেখে খালি।
নারীনিগ্রহ, নারীবিদ্রোহ, নারীদের অধিকার
এই নিয়ে খুব লিখ্‌বি, শুনিবি নারীদের আবদার।
প্রবীণেরে খুব গালি দিবি আর নারীদের গাবি জয়,
লক্ষ্মীছাড়ার প্রতিনিধি তুই জানাইবি দেশময়।

এইরূপে যদি চলিস্ ত নাম দেশময় যাবে রটে',
টাকা লাগে কিছু এই পথটিতে, বিদ্যে লাগে না মোটে।
টাকাও তোমার একগুণ দিলে দশগুণ ফিরে পাবে,
ফাউ পাবে তায় দেশযোড়া নাম, দেশে ঢিঢি পড়ে যাবে।
ভবী ভুলেনাক—একথা মিথ্যে ; ভুলিবেই এতে ভবী,
পাকা উপদেশ দিল তোরে আজ 'রসরঞ্জন' কবি।

"রসরঞ্জন।"

বিদ্যাপতির কাব্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিদ্যাপতির রাধার সহিত যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল তখন তিনি সরলা বালিকা, সমাগত-যৌবনের স্পর্শে স্ফুটনোন্মুখী। সখিগণ তাঁহাকে মান করিতে শিখাইল। কহিল—

হমর বচন সুন সাজনি
মান করবি আদর জানি।

—সখি, যদি বুঝিস্ যে আদর পাইবি, তবে মান করিস্। আদর রাখিয়া মান করিস্, কাঁদন মাখিয়া বচন কহিস্। কৃপণের কাছে বারবার ধন চাহিলেও সে যেমন দানের আশ্বাস দেয় না, মাধব যদি তোকে বারবার সম্ভাষণ করে, তুই তেমনি কথা কহিবি না।

সত সম্ভাসনে বচন ন পরগাসব
জেহন কৃপন আসোয়াসে।

তুই তখন—

লহু লহু হসি হসি মুখ মোড়বি
দশন দেখাওব হাসে।

যখন রাধামাধবের মিলন হইল, তখন সখীরা দেখিল সকল শিক্ষা বৃথা হইয়াছে—শ্রীরাধিকা "ধনহি সুলভ ভএ জাই"—মুহূর্ত্তে সুলভ হইয়া পড়িতেছেন।

এ সখি মান করিবা না জানে
কতখন সিখাউবি আনে॥

এ দেখিতেছি মান করিতে জানে না—ইহাকে আর কত শিখাইব ? বিদ্যাপতির রাধার ইহাই বিশেষত্ব। তিনি কোপ করিয়া মাধবের মুখের দিকে চাহেন। সে কপট কোপ মুহূর্ত্তে হাস্যে পরিণত হয়। প্রেম যেখানে পরিপূর্ণ সেখানে কি ছল থাকে ? তাই তিনি কহিতেছেন—সখি, তাহাকে দেখিলেই হৃদয়ে যে উল্লাস হয় তাহা ত গোপন করিতে পারি না—

গোপহি ন পারিয় হৃদয় উলাস।
মুনলাহু বদন বেকত হো হাস॥

আমার মুদিত বদনেও যে হাসি আপনি আসে—কিরূপে কপট কোপ প্রকাশ করিব ? সখি, আমি যে মান করিতে পারি না। "করিয় মান জৌ আইতি হোয়"—আমার মন যদি আমার আয়ত্ত হইত তবে ত মান করিতে পারিতাম। মন ত আমার নয়—তাহার। যখন প্রিয়ার কাছে যাই, মনে করিয়া যাই যে আজ নিশ্চয় মান করিয়া রহিব। কিন্তু তাহা ত পারি না সখি—তাহার স্পর্শ মাত্রেই আমি যে জ্ঞান হারাই—

তসু কর পরসে ন রহএ গেয়ান।
কোনে পরি পিয়া সঞো করব সখি মান।

সখি, সে প্রিয়ার উপর কেমন করিয়া মান করিব—"তারে মান ত সাজে না সখি, প্রাণ যারে চায়।"

জীবন উপেক্ষা করিয়াও সঙ্কেত স্থানে আসিয়া

মাধবের দেখা মিলিল না—বাসক সজ্জায় সজ্জিতা রাধার কুসুম রচনা বৃথা হইয়া গেল—দূতী মুখে বারংবার নিবেদন জানাইয়াও তিনি মাধবকে পাইলেন না। শুনিলেন মাধব অন্য গোপী নারীর সঙ্গে আনন্দে মগ্ন। তখন মনে বড় দুঃখ হইল। "আশা ভঙ্গ দুখ মরণ সমান॥" সেই দুঃখ শেলের ন্যায় প্রেমকে আঘাত করিল। সেই আঘাতে রাধার হৃদয়ে মান উপস্থিত হইল। সেই অশুভক্ষণে যখন মাধবের সহিত মিলন হইল তখন তিনি কহিলেন—

ততহি জাহ হরি ন করহ লাথ।
রজনি গমওলহ জহ্নিকে সাথ॥

যেখানে রজনী কাটাইয়াছ, হরি, সেইখানে যাও—আর এখানে আসিয়াছ কেন?

কবি চণ্ডীদাস ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কহিয়াছেন—

ছুঁইওনা ছুঁইওনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখ খানি দেখ॥

নয়ানের কাজর　　বয়ানে লেগেছে
কালর উপর কাল।
প্রভাতে উঠিয়া　　ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল॥

যাও যাও মাধব তোমায় প্রণাম—চতুরে চতুরে চাতুরী চলে না। সকল গোকুলে দেখিতেছি সেই নারীই ধন্য। ঐ যে তাহার চরণের অলক্তক রাগ তোমার হৃদয়ে শোভা পাইতেছে। আর কেন? সেইখানেই যাও:—মাধব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন; তাহা ভিন্ন আর উপায় কি?

বড় অপরাধ উতর নহি সম্ভব
বিদ্যাপতি কবি ভানে।

মাধব, বুঝিলাম যতক্ষণ চক্ষের সম্মুখে থাকি, ততক্ষণই তোমার দৃঢ় অনুরাগ, কিন্তু—

নয়ন ওত ভেলে সবে কিছু আনে।
কপট হে মাধব কতিখন বানে॥

বুঝিলাম বুঝিলাম—তোমার হৃদয় কপট প্রেম কেবল তোমার মুখে। রাং কি সোণা কষিলেই তাহা ধরা পড়ে, সুপুরুষের প্রেম প্রকৃতিতেই জানা যায়, অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না—কমলের পরাগকে আর চিনাইয়া দিতে হয় না—

পরিমলে জানিঅ কমল পরাগ।
নয়নে নিবেদিঅ নব অনুরাগ॥

হৃদয়ে অনুরাগ থাকিলে নয়ন তাহা নিবেদন করে। দেখিতেছি, তুমি ত মধু নও বঁধু। কিন্তু তুমি অতি গুণাকর, দেখিতে অমূল্য। চিন্তামণি! তুমি সুন্দর—অতি সুন্দর! তোমার কথাও মধুমাখা বটে, কিন্তু সে যেন মধু মাখা কঠিন নীরস প্রস্তর—দয়া মমতা-হীন।

জেহন মধুক মাখল পাথর
তেহন তোহর বোল॥

এক দিন ছিল, যখন হৃদয়ের সহিত হৃদয় স্পর্শ হইতেছে না বলিয়া গলার হার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে। ভাবিতে ঐ হারের ব্যবধানটুকুও অসহ্য—হিয়ার সহিত হিয়া মিলিয়া এক হইল না কেন? আমি তাহাতেই ভুলিলাম। তোমায় মহাতরু জ্ঞান করিলাম।

কএল মহাতরু তর বিসরাম।

ভাবিলাম ইহাতেই বুঝি ঝটিকা হইতে রক্ষা পাইব। কিন্তু হতভাগিনী আমি, তাই সেই মহাতরুর শাখাই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আমার কপাল ভাঙ্গিল—

সেষ ডার টুটি পরল কপার।

তোমার আর দোষ কি? "সময়ক দোসে আগি বম পানি।" অভিমানিনী রাধার কথাগুলি দেখাইয়া দেয় যে কত গভীর প্রেমের কুসুমকোমল আবরণে আচ্ছন্ন থাকায় এ মান বিদ্যাপতির রাধারই উপযুক্ত

হইয়াছে। ইহাতে সে তীব্রতা নাই যাহা হৃদয়কে দগ্ধ করে—ইহাতে সে বিষ নাই যাহা প্রেমকে ধ্বংস করে—ইহাতে আছে গভীর মর্ম্মবেদনা। সরল প্রাণের কাতর নিবেদন, উপেক্ষিতার তপ্তশ্বাস—আর আছে জীবন্ত অনুরাগ। জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ, রাধার মান ভঞ্জন করিবার জন্য যেরূপ বলিয়া ছিলেন—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।

যেমন তিনি কহিয়াছিলেন—

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর নয়ন শর ঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্।

বিদ্যাপতিতেও তাহাই আছে, কারণ জয়দেবের প্রভাব তাঁহার উপর যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে কথা আছে তাহা জয়দেবে নাই। জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ রাধার চরণপদ্ম ধারণ করিয়া কহিয়াছেন—

স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্॥

উহাই মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শেষ কথা কিন্তু বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণের প্রথম উপচার—

বিনয়ে কে নহি হে, জগতে জয় মানে।

মানিনি, আমি বিনয় করিতেছি—সংসারে বিনয়ে কে না জয় মানে? মান ত্যাগ কর। দয়াই সকল সম্পত্তির সার। আমার প্রতি দয়া কর—বিভব দয়া থিক সারা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উপাচার—

নাগরি সেহ জগত গুন আগরি
জে খেম পতি অপরাধে।

সেই নাগরীই গুণে জগতের শ্রেষ্ঠ, যে পতির অপরাধ ক্ষমা করিতে জানে। এইখানেই বিদ্যাপতির বিদ্যাপতিত্ব—তাহা জয়দেবের প্রভাবকে হীনপ্রভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও প্রথমে মান ভাঙ্গিতে পারিলেন না। দূতী তাঁহাকে অনেক কঠিন কথা শুনাইল। কহিল—এখন কাঁদিলে কি ফল হইবে? তুমি—

হাথক লছমী চরণ পর ডারসি

—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছ, কেমন করিয়া আমি আবার তাহাকে আনি? তুমি ঠিক কৃপণ পুরুষের মত। তোমার ঘরে এত অপরিমিত ধন তাহা উপভোগ না করিয়া তুমি পরের ধনের আশায় ঘুরিয়া বেড়াও। ধিক্ তোমাকে। জগৎ তোমাকে উপহাস করিবে।

কৃপিন পুরুষকে কেও নহি নিক কহ
জগ ভরি কর উপহাসে।
নিজধন অছইত নহি উপভোগব
কেবল পরহিক আসে॥

ইহারই প্রতিধ্বনি চণ্ডীদাসে পাই—

অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত॥

মাধব যখন অকৃতকার্য্য হইলেন তখন দূতী তাঁহার সহায় হইয়া বারবার শ্রীমতীকে বুঝাইতে লাগিল "যাচিত তেজি ন হোয় উচিত"। যে প্রার্থী হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছে তাহাকে ত্যাগ করিও না। সখি, তাহাকে বঞ্চিত করিও না। আজ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত পিপাসিত, তুমি তাহাকে বারিদান কর। দেখ, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে বটে, তাই কি চন্দ্রও কখনও মলিন হয়? বরং রাহুকে জয় করিয়া পূর্ণ সৌন্দর্য্যেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া তুমি চন্দ্রের মত আপন গৌরবে বিকশিত হও—দশদিক হাসুক।

রাহু পিয়াসল চান্দ গরাসএ
নহো খীন মলান।

সংসারে সখি, জীবন স্থির নয়। সকলই যায়। কিসের তবে গর্ব্ব? কীর্ত্তিই শুধু অমর হইয়া রহে। শুভক্ষণে সে কীর্ত্তি অর্জ্জন কর, নতুবা অবসর গেলে ত আর ফিরিবে না।

ন থির জীবন ন থির জউবন
ন থির এহে সংসার।
গেল অবসর পুনু ন পাইঅ
কিরিতি অমর সার॥

শ্রীরাধা কহিলেন—সখি তোমার কথা অমৃততুল্য। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ সখি, যে সাধুর পক্ষে চুরি সাজে? ভাল যাহা তাহা মন্দ হয় এ কোথায় দেখিয়াছ?

কতএ দেখল ভল মন্দ হোঅ
সাধু ন ফাবএ চোরী।

দূতী যখন বারবার মান ত্যাগ করিবার জন্য অনু· করিতে লাগিল, রাধিকা তখন তাহার উপরই রুষ্টা হইলেন। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। রুষ্টা হইয়া কহিলেন—

দুরজনি দূতী তহ ই ভেল।
অপদহি গিরিসম গৌরব গেল।

খল দূতীর কথায় ভুলিয়াই ত আমার এই দশা ঘটিল। আমার গিরিসম গৌরব অস্থানে চূর্ণ হইয়া গেল। সখী তুমি যত কেন অমৃততুল্য দুগ্ধ সিঞ্চন কর না, করলা যে তিক্ত সে তিক্তই থাকে। তুমি কি মনে করিয়াছ মাধব কোন দিন আমার হইবে?

দুধে পটাইঅ সীচীঅ নীত।
সহজ ন তেজ করইলা তীত॥

সখি যাচিয়া প্রেম ভিক্ষা করিলে শুধু মানই যায়, প্রেম হয় না। প্রার্থনা করিয়া পাইলে কেহ কি অমরত্ব লাভ করে? "পর অনুরোধে কতএ রহ মান।"

আমি আতপে তাপিত হইয়া শীতল জানিয়া মলয় গিরির ছায়ায় আসিয়া বসিলাম, আমার এমনই কর্ম্মদোষ যে সেখানেও দাবানলে দগ্ধ হইলাম।

আতপে তাপিত শীতল জানি কহু
সেওল মলয় গিরি ছাহে।
ঐসন করম মোর সেহও দুর গেল
কএল দাবানলে দাহে॥

কত দুঃখে সমুদ্রতীরে আসিলাম—তৃষিতকণ্ঠ শীতল করিব—হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইব। হায় সখি সে জলও লবণে পূর্ণ হইল!

কতে দুখে আজ সমুদ্র তির পাওল
সগরেও জলে ভেল ছারে।

জানিতাম সুজনের কথা অনড়—তাহা পাষাণের রেখা। সুজনের স্নেহ যায় না। হাতে কখনো পাষাণের রেখা মুছেনা।

সুজন বচন টুট ন নেহা
হাথে ন মেট পখানক রেহা॥

কিন্তু আমার অদৃষ্টে সবই বিপরীত হইল—হাত দিয়া মাজিতেই পাষাণের দাগও মুছিয়া গেল—অচল গিরি চলিল—এমন যে প্রেম তাহাও শেষে ভাঙ্গিয়া গেল!

শ্রীকৃষ্ণও বারবার মিনতি করিতে ছাড়িলেন না। কহিলেন—হে সুন্দরি, জাননা কি আশা-ভঙ্গের দুঃখ মরণের সমান? হায় হায়, একি দুর্দ্দৈব। তুমি আমার সহিত একশয্যায় বসিয়াও আজ প্রবাসী হইলে—কথাটী পর্য্যন্ত কহিতেছ না! একটীবার ফিরিয়া দেখিতেছ না? আজ যে নিকটও আমার দূর হইয়া গেল!

একহু সেজ ভেলাহু পরবাসী।

তবুও দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিল না। আঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রতিঘাত—বিরহ বিধুর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েও তখন অভিমান আসিল, কিন্তু ব্যথা ত গেল না। অপসৃত কৃষ্ণমেঘ যেমন পূর্ণচন্দ্রকে আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল, আরও মধুর করিয়া দেখায়, মানে তেমনি প্রেমকে বাড়াইল। তিনি ভাবিলেন, আজ আমার

সাধের সরোবর শুষ্ক হইয়া প্রফুল্ল-কমল মলিন হইল—আজ আমার উজ্জ্বল প্রেমনগর আঁধার হইয়া গেল।

নগর উজলি ভেল পাঁতর রে।

এইরূপে কিছুদিন কাটিল। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বুঝিলেন যে উভয়ের হৃদয়েই দারুণ অনুরাগ বর্ত্তমান আছে, মানে তাহা কিছুমাত্রও খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু অভিমান জনিত অদর্শনের পর, কে এখন প্রথম কথা কহিবে—প্রথমে সাক্ষাৎ করিবে—মনের অনুরাগ কে এখন প্রথমে মুখের বাহির করিবে? প্রাণ যায় যাউক, প্রেমাস্পদের উপর মান করিয়া ত শেষে তাহার নিকট খর্ব্ব হওয়া চলে না? বাঞ্ছিতের কাছে উপযাচক হইলে যে আদরের হানি হয়—দারুন প্রথম নিবেদন রে।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, আমার ত অপরাধ নাই। বিনা কারণে রাধা মান করিয়াছেন, পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার দোষ দেখিতেছেন। তবে কেন আমি অপরাধীর মত প্রথমে প্রেম নিবেদন করিব, বিনয় দেখাইব? রাধা মনে করিলেন, আমি উপেক্ষিতাও হইলাম, আবার সাধিয়া প্রেম জানাইব?

প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয় কলহে দূতীই কাণ্ডারী। সে কলহে প্রাণ প্রাণকেই নিকটে টানিয়া আনে—অর্দ্ধ পথে মিলনের অপেক্ষা করে মাত্র। দূতী চতুরা হইলে মিলন ঘটাইতে কতক্ষণ লাগে? দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া রাধার বিরহব্যথা জানাইতে লাগিল, রাধার নিকটে যাই কৃষ্ণের দুঃখের কথা নিবেদন করিল। কহিল

শুন শুন গুণমতি রাই।
তো বিনু আকুল কহ্নাই॥

জগতের যিনি জীবন, আজ তোমার জন্ত তাঁহার প্রাণ জ্বলিতেছে। আমার সুন্দর মাধব আজ তোমার বিরহ বেদনায় পাগল

খনে অচেতন, খনে সচেতন
খনে নাম ধরু তোর।

সে শ্রীহরি এখন তোরই চরণে শরণ লইয়াছেন—তবুও তোর মান ভাঙ্গেনা? অবহুঁ ন মিটে মান? সখি, পুরুষের বিরহ অত্যন্ত দুঃসহ, অত্যন্ত দারুণ—সে ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। এবার তাহার প্রাণ রাখ।

রামা হে তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ বিরহ দুঃসহ দারুন
ই বেরি রাখ পরান।

সখি, আমি সার কথা কহিতেছি শুন—এ জগতে কলহ কারিণী নারীর গৌরব কোথায়? নারী ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বংসহা। হৃদয়ের ব্যথা যে নারী যত গোপন করিতে পারে ততই তাহার গৌরব—

জে জত জৈসন হৃদয় ধর গোএ।
তকর তৈসন তত গৌরব হোএ॥

ধৈর্য্য সাধনা কর সখি, ধৈর্য্য সাধনা কর—কারণ তাহাতেই সার্থকতা

গৌরব এ সখি ধৈরজ সাধ।

যদি এমন করিয়া প্রেম ভাঙ্গিস্, তবে সে মুক্ত বেণী কি আর যুক্ত হইবে? সে যে বিনি সূতায় বাঁধাবাঁধি, বাতাসেরও ভর সহে না, একবার ভাঙ্গিলে সে স্ফটিক বলয় কি আর জোড়া লাগিবে? ফুটল ফটিক বলঅ কে জোল?

দূতীর বাক্যে রাধার দুঃখ আরও উথলিয়া উঠিল। নারী সব সহিতে পারে, প্রেমে উপেক্ষা সহিতে পারে না। তিনি কহিলেন—সই, সে বলিয়াছিল আমি কাঞ্চনেরও অধিক, এখন দেখিতেছি সে আমাকে কাচ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট দেখে

কঞ্চন চাহি অধিক কএ কএলহ
কাচহু তহ ভেল ঘাটী।

সখি, এমন যে হইবে আগে কি তাহা জানিতাম? তাহার রূপ দেখিয়া সবই ভুলিয়াছিলাম। রূপ বহ্নি,—সকল ভুলিয়া পতঙ্গের মত তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া-

ছিলাম। সখি, আবার ? কোন্ মুগ্ধা দ্বিতীয় বার অগ্নিকে আলিঙ্গন করে ?

কওোন মুগুধি আলিঙ্গতি আগী।

ভাবিলাম এক, হইল অন্ত—ভাবিলাম হার, পাইলাম সর্প ; সুমিষ্ট ফলের আশায় বৃক্ষতলে আসিলাম—ফল ত দূরের কথা, এখন ছায়া পাই কিনা তাহাতেও সন্দেহ।

ফল কারণে তরু অবলম্বল
ছাহরি ভেল সন্দেহে।

আমি চন্দন মনে করিয়া আলিঙ্গন করিলাম দেখি শিমুল বৃক্ষ। তাহার কঠিন কণ্টক আমার বক্ষস্থলকে কত না বিদ্ধ করিতেছে।

চন্দন ভরমে, সিমর আলিঙ্গল
সালি রহিল হিয় কাঁটে।

আর আমায় বলিওনা সখি। কী ফল অছয় ভেটব কান। আর কানাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফল কি ? একদিন ছিল যখন সে আমাকে সযত্ন চয়িত মালতীর মালা মনে করিয়া কণ্ঠে স্থান দিয়াছিল—আজ যে আমি তার কাছে বাসি ফুল—বাসি ফুলে কি কেহ হার গাঁথে ? বাসি কুসুম কিএ গাঁথয় মাল ? সখি, আজ সেই দিনের কথা মনে পড়ে ; সেই প্রথম আদরের কথা, মেঘ দর্শনে তৃষিতা চাতকিনীর আনন্দের কথা ? তখন আমি অন্ধ হইয়াছিলাম, সে নব অনুরাগ আমাকে বিচারশূন্য করিয়াছিল, সে প্রথম আদরের পুলকে আমি চেতনা হারাইয়াছিলাম—ন শুনল দাহিন বামে। তাহার মুখে সেই প্রথম প্রেমের কথা, সে যেন নবমল্লিকার স্নিগ্ধ পরাগ আমি মত্ত হইয়া সে মধুপান করিয়াছিলাম

হাএ হাএ বিহি মোর এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥

আমি লাভের লোভে বাণিজ্য করিলাম, হায় হায় শেষে মূলধন পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল! কেমন করিয়া সহিব সখি ? আর আমাকে প্রবোধ দিওনা। যে হার গলায় পরিয়াছিলাম তাহা ত ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ছিন্ন হার জোড়া চলে বটে, মুক্তবেণী আবার যুক্ত হয় বটে—কিন্তু গ্রন্থি থাকিয়া যায়। আমার সকলই আলোক ছিল, এখন তাহার পার্শ্বে আঁধারের লাঞ্ছনা আসিয়া লাগিয়াছে। জান না কি, আলোকে ও আঁধারে বিরোধ বড় দারুণ।

তোড়ি জোড়িঅ যাঁহা গেঁঠে পএ পড় তাঁহা
তেজ তম পরম বিরোধ।

সজনী অপদ ন মোহি পরবোধ—আবার কালার সঙ্গে পিরীতি করিব এমন অনুচিত প্রস্তাবে আর আমাকে প্রবোধ দিও না।

বলনা কি বুদ্ধি,   করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি,   পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল।
(চণ্ডীদাস)

সখি! কেহ যেন যুবতী হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ না করে। যদি ভাগ্যদোষে যুবতী হয়, তবে "জনু হো রসমন্তি" যেন সে রসবতী না হয়। রস যদি সে বুঝে তবে যেন কখনো কুলবতী হয় না। রসবতী কুলবতীর বড় জ্বালা—তাহার

একদিন কান্হু আওব দিস
সুবিতত বংস বিশালা

এই দুই পথের কোন্ পথে যাইবে তাহা স্থির করিতেই জীবন শেষ হয়—নয়নের জল শুকায় না। কাঁদিয়াই কি মনের জ্বালা জুড়ায় ? সে যে

চোর রমনি জনি মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছুপাই।

সখি!

কুলবতী হৈয়া,   কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীত করে।

তুষের অনল, যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
(চণ্ডীদাস)

যাহার জন্ম
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।

* * *

ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন, আপন কৈলুঁ পর
(চণ্ডীদাস)

সে এখন নিকটে থাকিয়াও একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না এ দুঃখ রাখিব কোথায়? প্রিয় যদি দূরদেশে থাকিত, তাহা হইলে ত মনকে বুঝাইতে পারিতাম যে দেশ বৈরী হইয়াছে, মিলন ঘটিতে দিতেছে না। আশা থাকিত, সে ঘরে ফিরিলেই আবার তাহাকে বক্ষে পাইব। তখন পথিক জন দেখিলে তাহাকে ডাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিতাম, বিদেশে পিয়া আমার কুশলে আছে ত?

সে ভল যে বন্ধু বসএ বিদেশে।
পুছিঅ পথুক জন তাক উদেসে॥
পিয়া নিকটহি বস পুছিও ন পুছই।
এহন বিরহ দুখ কে দহ সহই॥

* *

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমরা বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমরা আঙ্গিনা দিয়া॥
(চণ্ডীদাস)

আর আমার কাছে সে শঠ লম্পট নিষ্ঠুরের নাম করিও না। আমার সৌভাগ্য যে অল্পেই তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি;

ভল ভল হম অলপে চিহ্নল
বৈসন কুটিল কান।

সে বিষপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ। শুধু উপরে একটু মধু। কাঠ কঠিন হৃদয় তাহার দানে পর্য্যন্ত এতটুকু দয়া নাই। মধুসম বচন তাহার, বজ্রের মত মানস। আগে যদি জানিতাম তাহা হইলে কি আমার সর্ব্বস্ব সেই খলের হাতে সমর্পণ করি? হায় হায়! আমার এই অতিগুরু কুলের গর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

আপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল
গরুঅ গরব দুর গেল।

আমার পথে যে একটী আচ্ছাদিত গুপ্ত কূপ ছিল, তাহা দেখিতে পাই নাই। কানুর রূপ দেখিয়াই সকল ভুলিলাম। এক ভাবিলাম, আর ঘটিল।

পহিলহি ন বুঝল এত সব বোল।
রূপ নিহারি পড়ি গেল ভোল॥

রূপ মোহে মত্ত হইয়া সেই রূপ সাগরে ঝাঁপ দিতে ধাইলাম। গুরু লঘু কিছু শুনিলাম না, ভাল মন্দ বিচার করিলাম না। শেষে গুপ্তকূপে পতিত হইয়া এখন প্রাণ যায়!

ঝাপল কূপ দেখহি ন পারল
আরতি চলহহু ধাই।
তখনুক লঘুগুরু কিছু নহি গুনলেঁ
আবে পচতাবকে জাই॥

আমি নিজের মাথা নিজে মুড়াইয়াছি, কাহার এখন দোষ দিব?

অপন মুড় অপনে হাম চাঁছল
দোখ দেব গএ কাহি॥

সখি, তাহার কথা আর বলিওনা।
এ সখি এ সখি যব রহু জীব।
হরি দিগে চাহি পানি নহি পীব॥

* *

হরি পরসঙ্গ ন কর মঝু আগে।
হম নহি নাররি ভয়া মাধব লাগে॥

* *

কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ।
যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটী শুনয়ে যদি,
দুটী হাত দিয়া থাকি কাণে ॥
(চণ্ডীদাস)

কিন্তু "পেমক গতি দুরবার।" মূঢ় পতঙ্গ যেমন অগ্নির উত্তাপ অনুভব করিয়াও আবার সেই অনলেই ঝাঁপাইয়া পড়ে, মোহমুগ্ধ মানবও সেইরূপ যাতনা পাইয়াও আবার সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়—

অনুভবহি পুন অনুভবএ অচেতন
পড়এ হুতাস পতঙ্গ ॥

সখিগণ কহিতে লাগিল—"মানিনি আব উচিত নহি মান।" হে ধনি! পতি তোর অনুরাগাতিশয্যে প্রতিগ্রহ মাগিতেছে

"কর ধনি সরবস দান"—

তোমার সর্ব্বস্ব এখনই তাহাকে দান কর, বিলম্ব করিও না। সখি! তুমি এখন পিপাসা-কাতর পথিক। ভাবিও না যে শীতল পরিপূর্ণ কূপ তোমার নিকটে আসিয়া সে নিদারুণ পিপাসা দূর করিয়া দিবে—"কূপ ন আবএ এ পথিকক পাস"—যদি তৃপ্ত হইতে চাও তবে তুমিই সেই কূপের নিকট চল। মান, বিষতরুর মত, অঙ্কুরেই তাহার বিনাশ সাধন করিতে হয়।

অহিকহু বিষতরু পল্লব মেলব
আঁকুর ভোঁগি হলিআ ॥

'জেহন তোহর মন তহিকো তইসন'—সখি, একথা মিথ্যা ভাবিও না। তাহার প্রাণও তোমার জন্য এমনি করিতেছে। যদি বিশ্বাস না হয় তবে নিজের মনের দিকে চাহিয়া দেখ, কারণ মনের সাক্ষী মন। "মনকাঁ মনথিক সাখী।" সুতরাং—

শুন শুন গুণমতি মিলহ মধুর পতি
অথির যৌবন ধন জানিয়ে।

সখি, জানিও সংসারে সকলেই নিজের গুণকে অপরের গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবে। নিজের কাচকেও বলে সোণা! তুমি মনে করিতেছ, আমি শ্রীকৃষ্ণকে যেমন ভালবাসি, তিনি আমায় তেমন বাসেন না? এমন কথা ভাবিও না। পরের গুণে যে প্রেম করে, তাহার মত গৌরববতী পৃথিবীতে আর কে? মনে রাখিও সখি, হারাণো নিধি ফিরিয়া পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা

"গেল পাইঅ জোঁ হো বড় ভাগ।"

শ্রীমতীর মন তখনো সংশয় দোলায় দুলিতেছিল—প্রাণ রাখি, কি মান রাখি। কখনো মনে হইতেছিল, প্রাণ ও মান এতদুভয়ের মধ্যে, যে মান দিয়া প্রাণ রাখে তাহার মরণই ভাল।

প্রাণ মান বেরি জদি প্রাণ জে রাখীঅ
তা তেঁ মরণ ভলা।

কবি কহিলেন—হে যুবতী শ্রেষ্ঠ!

পেমক কারণ জিউ উপেখিয়
জগজন কে নহি জান।

পৃথিবীতে কে না জানে যে প্রেমের কারণে প্রাণ পর্য্যন্তও উপেক্ষা করিতে হয়—মান ত অতি তুচ্ছ!

মানের মাতঙ্গকে ভাসাইয়া মন্দাকিনী যখন প্রবল বেগে ধাইল, তখন তাহার গতিরোধ করিতে পারে কাহার সাধ্য? তখন শ্রীমতীর সঙ্কল্প হইল—প্রেমের জন্য পরাভব মানিব

পিরিতি লাগি পরাভব সহব
ইথি অনুমতি মোরি।

* * *

তখন মন কহিতেছে—

কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।

তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে,
কালা হৈল জপমালা ॥
বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে ॥ (চণ্ডীদাস)

* *

ধরব জোগিয়াক ভেস রে।
করব মঞে পহুক উদেস রে ॥

* *

ঘরে মোর সাধ নাই, কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥
(চণ্ডীদাস)

রাধার দূতী তখন তাঁহার নিবেদন বহিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। শ্রীমতী বুঝিলেন, যেখানে প্রেম সেইখানেই কলহের দৌরাত্ম্য। গুণবান্ যে, সে সেই কলহকে আশ্রয় করিয়া প্রেমের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া দেয় না।

জতহি পেমরস ততহি দুরন্ত।
পুন কর পলটি পিরিতি গুণমন্ত ॥

হায় ছিঁড়লে কেহ ত তাহাকে পরিহার করে না; আবার গাঁথিয়া লয়—বিযুক্ত মালিকা আবার যুক্ত হয়—

সবতহু সুনিঅ অইসন বেবহার।
পুনু টুটএ পুনু গাঁথএ হার ॥
এ কহ এ কহু তোঁহহি সমান।
বিসরিঅ কোপ করিঅ সমধান ॥

লোকে যদি বিষবৃক্ষও রোপণ করে তবুও তাহাকে ছেদন করে না। তুমি আপন হাতে যে প্রেমের অঙ্কুরকে দিনে দিনে বারি বর্ষণে মহাতরু করিয়াছ, তাহাকে কাটিও না, কাটিও না।

পেমক আঁকুর তোহেঁ জল দেল।
দিনে দিনে বাঢ়ি মহাতরু ভেল ॥

তুঅ গুণে ন গুণল সউতিনি আছ।
রোপি ন কটিঅ বিষহুক গাছ ॥

চন্দ্রাবলী আমার সপত্নী হইয়াছে, তা হউক। তোমার গুণে আমি তাহাকে মানিয়া লইয়াছি। আমার উপর আর বিরূপ থাকিও না।

কত ন নাগর গুণক আগর
সবে ন গুণক গেহ।
তোহ সন জগ দোসর নহি
তেঁ হমে লাওল নেহ।

গুণে শ্রেষ্ঠ কতই নাগর আছে—কিন্তু গুণের ধাম কেহ নহে। তোমার ন্যায় গুণনিধান জগতে আর দ্বিতীয় দেখি না বলিয়াই তোমাকে প্রাণ সঁপিয়াছি।

পএর পড়ি বিনিবঞো সাজনা রে
জতি অনুচিত পড়ু মোর।
জনু বিঘটাবহ নেহরা রে
জীবন যৌবন থোর ॥

হে বন্ধু পায়ে পড়ি, মিনতি করি, যতই কেন অপরাধ না করিয়া থাকি, মার্জ্জনা কর। প্রেমে ব্যাঘাত ঘটাইও না। এ জীবন এ যৌবন ত চিরদিন থাকিবে না—তাহাদিগকেই ধূপ দীপ নৈবেদ্য করিয়া যে আমি তোমার আরতি করিতেছি।

সখি! সকল কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে বলিস। বলিস্—

কত গুরু গঞ্জন দুরজন বোল।
মনে কিছু ন গুণল ও রসে ভোল ॥
কুলজা রীতি ছোড়লু জনু লাগি।
সে অব বিসরল হমর অভাগি ॥

সখি, 'মধুর বচনে কহি কানুকে বুঝাই'। কর্ম্মের দোষে আমার কনকও কাচ হইয়াছে। সে যেন দুর্জ্জনের কথা শুনিয়া আমায় ত্যাগ না করে। সে দোষ গুণ বিচার করিয়া দেখুক। প্রদীপ জ্বালিলে কি ঘরে আর অন্ধকার রহে?

তর্তাহ দুর জা জতহি বিচার।
দীপ দেলে ঘর ন রহ আঁধার॥
হমরি বিনতি সখি কহবি মুরারি।
সুপহু রোস কর দেস বিচারি॥

বেদনায় যখন বক্ষ ফাটিতেছে—নিরাশায় অন্ধকার যখন শ্রীরাধার দশদিক ব্যাপ্ত করিয়াছে, যখন কুসুম শয়ন কণ্টক শয্যা, চন্দ্রে অনল, চন্দনে বিষ, তখনো বিদ্যাপতির রাধা মানকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তখনো প্রাণ অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। নয়ন জলে ভাসিয়া দূতীর নিকটে অনেক দুঃখের কথা কহিয়াছেন—অনেক বেদনা জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু দূতী যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতেছে, তখন তাহাকে বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

সাজনি গএ বুঝাবহ কাহু
উচিত বোলইতে জে হোঅ সেহে
দৈন ভাখহ জনু।"

সখি, গিয়া কানুকে সকল কথা বুঝাও। উচিত কথা বলিলে যাহা ঘটে ঘটুক। তাহার কাছে যেন দৈন্য দেখাইও না। কারণ প্রাণ ও মান এ দুইয়ের মধ্যে যে প্রাণ রাখিয়া মান দেয়, তার মরণই ভাল। মানান্তে প্রথম সম্মিলনেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছেন, মাধব! তোমার জন্য, কুলকামিনী হইয়াও আমি কুলটা হইয়াছিলাম, "আগু পাছু" কিছুই গুণি নাই। দেখিও যেন এ প্রেম কখনো পুরাতন না হয়। তোমার প্রেমই আমার সকল মান, সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ। নব অনুরাগ শেষ পর্য্যন্ত রাখিও, দেখিও যেন আমার মান নষ্ট না হয়।

কুল কামিনি ভএ কুলটা ভেলিহু
কিছু নহি গুনলে আগু।
সবে পরিহরি তুঅ অধিনী ভেলিহু
আবে আইতি লাগু॥
মাধব জনু হোঅ পেম পুরাণে।
নব অনুরাগ ওল ধরি রাখব
জে ন বিঘট মোর মানে॥

অভিমানিনী বিরহ-বিধুরা বেদনা-কাতরা রাধার চরিত্রের এই দৃঢ়তা বিদ্যাপতির বিচার বুদ্ধি ও কাব্য-কলা জ্ঞানের অন্যতম সুন্দর নিদর্শন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

পূর্ব্বস্মৃতি

(২

এই সে আমার অনেক দিনের হারিয়ে ফেলা গ্রাম,
অশ্রুসায়র উথলে আজ স্মরণে যার নাম।
এই গ্রামেরি কোন্ সে খানে,
ফাগুন মাসে আম বাগানে
শিশুরা সব জুটত এসে নয়ন অভিরাম।
মধুর স্মৃতি জড়িয়ে বুকে এই সে প্রাচীন গ্রাম।

কোন দিকে সে নাইক মনে, কোন্ বা যুগের মঠ,
মাথায় যাহার জট পাকিয়ে ছিল অশথ বট।
নয়ক দূরে, গ্রামের কোলে,
মন্দ হাওয়ার ছন্দে দোলে
গৌরী যে যায় দিবস রাতি বেয়ে তারি তট
পথটি গেছে আরেক গ্রামে সেথায় ছিল মঠ।

(৩)

সে মঠ হতে নয়ক দূরে, রবিবারের হাটে
দেশ বিদেশের নৌকা কত ভিড়ত এসে ঘাটে।
ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা বেলা
নিত্য হত বাচের খেলা,
বৃদ্ধ যুবার কি সে রঙ্গ হাটের নবীন নাটে
কতই সোণার স্বপন ঘিরে ছিল যে সেই হাটে!

(৪)

আরো যে গো কতই ছিল বল্‌তে ব্যথা পাই,
স্মৃতিটী যার মনটী হতে আজও মুছে নাই।
শান্তি ঘেরা কুটীর তল
শান্ত ছেলেমেয়ের দল
উপোস দুখে মলিন মুখ পাঁচটী গেল ভাই;
দুখিনী মার অমূল্য ধন বল্‌তে ব্যথা পাই।

(৫)

নদীর কূলে শিমুল মূলে ছিল কুমোর বুড়ী—
চূণের মত চুলটী, বয়স বছর চারি কুড়ি।
পাড়ার যত ছেলের দলে
ডাকত তারে ডাইনী বলে,
শীতের দিনে গ্রামের পথে কাপড় দিয়ে মুড়ি
ঠক্ ঠকিয়ে লাঠি যখন চল্‌ত গুড়ি গুড়ি।

(৬)

মুখুয্যেদের গিন্নী ছিলেন পাড়ার ঠান্‌দিদি—
কোন্ তিথিতে কি খেতে নেই তাঁর কাছে সে বিধি।
সন্ধ্যা হলে শিশুর দলে
স্বপ্নপুরীর গল্প বলে'
মাতিয়ে দিতেন—তারাই যে তাঁর সাতটী রাজার নিধি
কোথায় আজি সেই দয়ালু পাড়ার ঠানদিদি?

(৭)

সাঁঝের আগে বটের ছায়ায় ঘাটটী যেত ছেয়ে,
সেই ঘাটেতে গা ধুইত একটি লাজুক মেয়ে!
হিরণ জিনি দেহের বরণ
হরিণ জিনি চপল নয়ন
চল্‌তে হঠাৎ ভুলেই, চলে যেতাম সেপথ বেয়ে।
নিত্য এমন গা ধুইত সে ঘাটে সেই মেয়ে।

(৮)

লুকিয়ে থেকে দেখতে তাকে কতই হত সাধ;
ললাট লিখন মন্দ বলে পড়ল তাহে বাদ।
এমনি সে এক দিনের শেষে
ঘোমটা পরে বধুর বেশে
চলে' গেল কোন সে দেশে না জানি সংবাদ।
লুকিয়ে থেকে দেখার তারে ঘুচল চিরসাধ।

(৯)

সকল কথাই জাগছে মনে কিছুই ভুলি নাই—
ভুলব সেদিন, চিতার বুকে যেদিন হব ছাই।
লক্ষ মধুর স্বপ্ন ঘেরা
সেই স্মৃতিটী সবার সেরা—
সে যে আমার সোণার কাঠি, পরশে তার পাই
সদ্য জাগা রাজকন্যারে যখন খুসী চাই।

(১০)

তার ছবিটি চিত্তে লয়ে ফিরছি দিশাহীন;
এম্‌নি করে দিনের পরে কেটেই যাবে দিন।
কোন খেয়ালে পথটী ভুলে
হঠাৎ এলাম নদীর কূলে,
সেই পুরাণো গ্রামের কোলে কিছুরি নাই চিন্
আমারি কি অশ্রু ভারে আঁখির দিঠি ক্ষীণ?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার

ভিখারীর হীরা

(গল্প)

বর্দ্ধমান হইতে বিপিন দত্ত ও গোবর্দ্ধন কলিকাতায় এগ্‌জিবিসন দেখিবার জন্ত যইতেছিল। বিপিন দত্ত বর্দ্ধমানের কোনও বড় উকীলের মুহুরী, খুব চটপটে চতুর; সব সময়ে নানারূপ দাঁও খুজিয়া বেড়ায়। সে পূর্ব্বে নানা কাযে অনেকবার কলিকাতায় আসিয়াছে। গোবর্দ্ধন বেচারা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, অত্যন্ত গোবেচারা ও নিরীহ; এই প্রথম কলিকাতায় যাইতেছে। তাহার কিছু জমি ছিল, সেখানে চাষবাস হইত। কলিকাতায় যাওয়ার উদ্দেশ্য এগ্‌জিবিসন দেখা ও কয়েকটী ফসলের বীজ সংগ্রহ করা। ট্রেণে আসিতে আসিতে বিপিন দত্ত কলিকাতা সম্বন্ধে তাহার কাছে নানারূপ গল্প করিতে লাগিল। গোবর্দ্ধন আশ্চর্য্য হইয়া হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে এমন বোকার মত প্রশ্ন করিতে লাগিল যে বিপিন দত্ত ভাবিল, এই গরুর মত মূর্খ লোকটাকে লইয়া কলিকাতায় তাহাকে অনেক ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে।

হাওড়া ষ্টেশনে ঘটনাক্রমে একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে গোবর্দ্ধনের দেখা হইয়া গেল। সে গোবর্দ্ধনকে নিজের বাসায় থাকিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিল। গোবর্দ্ধনও কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল ও বিপিন দত্তর নিকট বিদায় লইয়া তাহার সহিত চলিয়া গেল।

বিপিন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই মূর্খের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহার মনে বেশ আনন্দ হইল। সে তখন এক পরিচিত বোর্ডিংয়ে আসিয়া আশ্রয় লইল।

২

এগ্‌জিবিসন কাল আরম্ভ হইবে। আজ কোনও কায নাই। বিপিন দত্ত একটা ছড়ি লইয়া সন্ধ্যায় সময় বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

একটা শীর্ণ ভিক্ষুক বেথুন কলেজের প্রাচীরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল, "বাবু, দয়া করে আমায় একটা পয়সা দিন।"

বিপিন তাহাতে মনোযোগ না দিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

"বাবু, আমার ব্যারাম, ভিক্ষে করতে পারি না, দাঁড়াতেও কষ্ট হয়। দয়া করে কিছু দিন।"

বিপিন ফিরিয়া দাঁড়াইল। দয়ার চাইতে তাহার মনে কৌতূহলটাই বেশী হইল। কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি কোনও কাযকর্ম্ম করে পয়সা রোজগার না করে' ভিক্ষে কর কেন?"

কপালে করাঘাত করিয়া ভিক্ষুক বলিল, "আ ভগবান! কাযকর্ম্ম—সে চেষ্টা কি করিনি বাবু? কিন্তু দেয় কে?"

বিপিনের সময় কাটিতেছিল না, ভাবিল এই ভিক্ষুকটাকে লইয়া খানিকটা সময় তবু কাটিবে। বলিল, "তোমার হাতে পয়সা দোব না; কোনও হোটেলে গিয়ে তোমায় খাওয়াতে পারি।"

ভিক্ষুক তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। নিকটবর্ত্তী একটা সস্তা হোটেলে গিয়া বিপিন ভিক্ষুককে আহার করাইল ও নিজে এক পেয়ালা চা খাইল। পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দোকানদারকে পয়সা দিল।

খাওয়া শেষ করিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া ভিক্ষুক বলিল, "বাবু, আপনার দয়াতে অনেকদিন পরে আজ পেট ভরে খেতে পেলাম। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনি যখন হোটেলওয়ালাকে পয়সা দিলেন তখনই দেখ্‌লাম আপনার ব্যাগে অনেকগুলা নোট আছে।

আপনাকে আমি একটা লাভের উপায় বলে দিতে পারি।"

বিপিন সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে ভিক্ষুকের দিকে চাহিল। সে কোমরে জড়ান কাপড়ের খুঁট হইতে একটা জিনিষ বাহির করিয়া বলিল, "এটা কি বলুন দেখি ?"

বিপিন বলিল, "এক টুকরো ঘষা কাঁচের মত দেখাচ্ছে।"

চারিদিকে একবার চাহিয়া ভিক্ষুক আস্তে আস্তে বলিল, "যে রকমই দেখাক্, এটা কাঁচ নয়—আসল হীরে।"

বিপিন দত্ত অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

ভিক্ষুক ধীর ভাবে বলিল, "আমি একটা ভিখারী; এক বেলা দুমুটো খেতে পাই না। আমার কাছে এত বড় হীরে দেখ্‌লে আপনার অবিশ্বাস হবারই কথা। কিন্তু এটা আমি কি করে পেয়েছি তা আপনি শুনলে বোধ বোধ হয় বিশ্বাস করবেন।" এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "তিন মাস আগে আমি ভিক্ষে কর্‌তাম না। মুটেগিরি করে পয়সা রোজগার কর্‌তাম। তারপর ব্যারামে পড়ে এই অবস্থা হয়েছে—এখন ভিক্ষে করা ছাড়া আর উপায় নেই। তখন একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে আস্‌ছি, এমন সময় দেখ্‌লাম একটা বুড়ো—বোধ হয় জাহাজের খালাসী—রাস্তার ধারে পড়ে গোঁ গোঁ করছে। আমার দেখে দয়া হলো। তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা কর্‌তে লাগ্‌লাম। জ্ঞান হলে বুড়ো আমায় ডেকে বল্লে, আমায় হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিও না। কাযেই তাকে আমার ঘরেই রাখ্‌তে হল। একজন ডাক্তারকে ডেকেও দেখালাম। কিন্তু বুড়ো বাঁচলো না; সাত আটদিন পরেই মরে গেল। মরবার আগে বুড়ো আমার হাতদুটো ধরে, এই হীরেটা আমার হাতে দিয়ে বল্লে, 'মরবার সময়ে তুমি আমার ছেলের মত কায করেছ। আমার কাছে যা আছে তাই তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। এটা আসল হীরে; কোন জহুরীর দোকানে বিক্রী করো। চার পাঁচশো টাকা পাবে। এ চোরাই মাল নয়।' এর বেশী আর কিছু সে বলতে পারে নি।"

"দেখি" বলিয়া বিপিন জিনিষটা নিজের হাতে লইল। ভিক্ষুক বলিল, "আজ তিন মাস ধরে এটা নিয়ে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

বিপিন বলিল, "এটা কোন জহুরীর দোকানে গিয়ে বিক্রী কর না কেন? করলে ত তোমায় ভিক্ষে করে খেতে হয় না।"

ভিখারী একটু তিক্তভাবে বলিল, "তা কি আমি ভাবিনি বাবু? আমার মতন একটা ভিখারী কোনও দোকানে এত বড় হীরে বিক্রী করতে গেলে, তারা তখ্‌খুনি আমায় পুলিসে ধরিয়ে দেবে। এ হীরে আমি কি করে পেয়েছি, পুলিস কি তা বিশ্বাস করবে? লাভের মধ্যে আমি জেলে যাব।"

বিপিন শুধু একটা "হুঁ" বলিয়া চুপ করিল।

ভিখারী বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে যা বল্‌ছিলাম বাবু তা এই;—হীরেটা যদি আপনি আমার কাছ থেকে কিনে নেন, তা'হলে আপনারও লাভ, আমারও লাভ। আপনি বড়লোক, এটা কোনও দোকানে বিক্রী করতে আপনার কষ্ট হবে না। পাঁচ ছ'শ টাকা দাম; তা আপনি যদি আমায় পঞ্চাশটা টাকা দেন, তা'হলে এটা আমি ছেড়ে দিতে পারি।"

বিপিন হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আসল কথা, এটা যে সত্যিই হীরে,—কাঁচ নয়, তার প্রমাণ কি?"

উত্তরে ভিক্ষুক জিনিষটা লইয়া পাশের জানলার সার্সির কাঁচে একটা আঁচড় কাটিল। দাগটা গভীর-ভাবে কাঁচের উপর বসিয়া গেল।

"এটা যে হীরে, তার প্রমাণ দেখলেন ত? আর কোনও জিনিষ কি কাঁচে এ রকম দাগ কাটতে পারে?"

বিপিন চুপ করিয়া গেল। ভাবিল, "সত্যই ত!" খানিক পরে বলিল, "আচ্ছা, এ হীরেটা তুমি আমাকে

দাও। আমি কোন জহুরীকে দেখিয়ে এর সত্যি দাম কত তা কাল জেনে নোব।”

ভিক্ষুক বলিল, “আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এটা খুব সোজা কথা যে, কাল যদি জহুরী বলে, এটার দাম পাঁচ শ টাকা, তা’হলে তার বদলে আমি মাত্র পঞ্চাশটা টাকা নোব কেন? আজ নগদ পঞ্চাশটা টাকা পেলে আমি চলে যাই। কাল্‌কে এই হীরে নিয়ে এমন একটা কিছু হতে পারে, যাতে আমি ফ্যাসাদে পড়্‌তে পারি। আমি তাতে রাজি নই। আপনি ভেবে দেখুন।”

বিপিনের স্বভাবই ছিল দাঁও খুঁজিয়া বেড়ান; সময়ে সময়ে অনেক লাভও করিয়াছে। হীরাটা খুব সম্ভব চোরাই মাল, তবুও এত সস্তায় যখন এত দামী জিনিষটা পাওয়া যাইতেছে, তখন কিনিবার জন্য তাহার অত্যন্ত লোভ হইল। সে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ভিক্ষুকটাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার উত্তরে সন্দেহজনক কিছুই পাইল না। একটু দাম কশাকশি করিয়া জিনিষটা সে চল্লিশ টাকায় কিনিয়া লইল।

“বাবু! এটা কেন্‌বার জন্তে আপনি কখনও পস্তাবেন না। এ চল্লিশ টাকায় আমার অনেক কায হবে, আপনারও যথেষ্ট লাভ হয়েছে।” এই বলিয়া ভিক্ষুক চলিয়া গেল। বিপিনও আনন্দিত মনে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

৩

সেই বোর্ডিংয়ে এক ভদ্রলোক থাকিতেন, তিনি বড়বাজারের বিখ্যাত জহুরী চুনিলাল পান্নালাল কোম্পানীর বাড়ীর হেড কেরাণী। বিপিন সন্ধ্যার পর তাঁহার সহিত গিয়া আলাপ করিল। কথায় কথায় বলিল, “মশাই! আজ একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে। একটা ভিখারীকে দোকানে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়েছিলাম। তার কাছে একটা হীরে ছিল; সে খুব সস্তায় সেটা আমার কাছে বিক্রী করতে চাইলে।” এই বলিয়া সে ভিক্ষুকের গল্পটা আদ্যোপান্ত বলিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, “আপনি সেটা লোভে পড়ে কেনেন নি ত? এটা একটা পুরোণো জোচ্চুরী; অনেকে এতে ঠকেছে।”

“জোচ্চুরী!” স্তম্ভিতভাবে এই কথা বলিয়া বিপিন দত্ত হীরকটা বাহির করিয়া বলিল, “দেখুন দিকি,—এটা আসল হীরে কি না।”

“এঃ! আপনি তাহলে কিনেছেন দেখছি।” এই বলিয়া তিনি খানিকক্ষণ জিনিষটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন “এটা হীরে নয়,—কাঁচ।”

“কাঁচ! বলেন কি?” সেটা তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিপিন দত্ত উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে খুব জোরে একটা আঁচড় কাটিল; কাঁচের উপর একটুও দাগ পড়িল না।

“একি? কিন্তু সে লোকটা যখন কাঁচে আঁচড় কেটেছিল তখন ত দাগ হয়েছিল। এখন দাগ পড়ছে না কেন?”

বাবুটি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, “কারণ, এটা হীরে নয় কাঁচ। ব্যাপারটা খুব সোজা। এই রকম জোচ্চোরদের কাছে একটা সত্যিকারের ছোট হীরে থাকে। সেটা আঙুলের মধ্যে লুকিয়ে তাই দিয়ে কাঁচে দাগ কাটে। মশাই! আজ পনর বছর জহুরীর দোকানে চাকরি করে এ রকম জোচ্চুরী অনেক চোখে দেখলুম।” এই বলিয়া তিনি গোঁফে একটা তা দিয়া পুনরায় বলিলেন—“এ সম্বন্ধে আমি আপনাকে দুচারটে মজার গল্প বলছি শুনুন—”

কিন্তু বিপিন দত্ত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

৪

নিজের ঘরে আসিয়া অনুশোচনায় সে দগ্ধ হইতে লাগিল। ভাবিল, “এখনি পুলিশে গিয়া খবর দিই।” খানিকক্ষণ পরে মাথা একটু ঠাণ্ডা হইলে ভাবিল, তাহাতে লাভ কি? চোর ধরা পড়িবে না; ধরা পড়িলেও টাকা নিশ্চয়ই ফেরত পাওয়া যাইবে না। লাভের মধ্যে লোক জানাজানি হইয়া যাইবে; সকলে

তাহাকেই বেকুব ঠাওরাইবে। তাহার মত একটা ধড়িবাজ চালাক চতুর লোককে একটা পথের ভিখারী ঠকাইয়া চল্লিশটা টাকা লইয়া গেল, এই কথাটা মনে হইলেই তাহার জলে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা করিল। গোবর্দ্ধনের মত বেকুব লোক যদি এইভাবে ঠকিত, তাহা হইলে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। গোবর্দ্ধনের কথাটা মনে আসিতেই তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা মতলব আসিল।

ভাবিল আমি যে ভাবে ঠকিয়াছি, গোবর্দ্ধনকেও ত সেইভাবে ঠকাইয়া এই কাঁচখানা হীরা বলিয়া গছাইয়া দিতে পারা যায়। টাকাটাও লাভ হইবে, লোক জানাজানিও হইবে না।—বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি জাগিয়া সে মনে মনে নানারূপ মতলব ঠাওরাইতে লাগিল।

৫

প্রভাতে উঠিয়াই সে বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উদ্দেশ্য, সুবিধামত একটা ভিখারী সংগ্রহ করা। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরীর পর সে দেখিল, একটা কদাকার ভিক্ষুক অদ্ভুতভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

বিপিন ভাবিল, "এই লোকটাই ঠিক।" সে পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া আঙ্গুলে ধরিয়া বলিল, "কেমন,—দুটো টাকা নিবি?"

ভিখারী বলিল, "বাবু! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?"

তাহার হাতে টাকা দুইটা দিয়া বলিল, "না, আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে একটু ঠাট্টা করবো। সে জন্যে তোকে একটি কায করতে হবে। কায শেষ হলে আরও পাঁচটা টাকা পাবি। কেমন—রাজী আছিস্?"

"বলুন।"

"এখানে নয়,—আমার সঙ্গে আয়।" বলিয়া বিপিন তাহাকে একটা নিভৃত স্থানে লইয়া গেল।

৬

বাসায় ফিরিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া দুপুরবেলা বিপিন দত্ত এগ্‌জিবিসনে গেল ও চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিকাল বেলা গোবর্দ্ধনের সঙ্গে তাহার দেখা হইল।

"কি হে—তুমি ছিলে কোথায়? চল এক সঙ্গে বেড়ান যাক। আমি তোমাকে ঘুরিয়ে সমস্ত দেখিয়ে দিচ্ছি।"

কৃতজ্ঞভাবে গোবর্দ্ধন বলিল, "আঃ ভাই! বাঁচলাম, তুমি এসেছ। আমাকে দেখিয়ে দেবার তবু একজন লোক পেলাম। আজ বেড়াতে বেড়াতে তিনবার আমি এর মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলুম।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, এগ্‌জিবিসনের একপ্রান্তভাগে আজকেও তাহারা বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিল, একটা কদাকার ভিক্ষুক দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে নিজের অসুখের কথা বলিয়া করুণ স্বরে তাহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিল।

বিপিনের আজ হঠাৎ অত্যন্ত দয়া হইল। তাহার অনুরোধে তাহারা দুইজনে ভিক্ষুকটাকে এগ্‌জিবিসনের ভিতরের একটা ময়রার দোকানে লইয়া গিয়া লুচি সন্দেশ প্রভৃতি আহার করাইল।

আহার করিয়া লোকটা একটা হীরকের বিষয় গল্প করিতে লাগিল। কি করিয়া একজন জাহাজের খালাসী মরিবার পূর্ব্বে সেখানা তাহাকে তাহার সেবাশুশ্রূষার প্রতিদান স্বরূপ দিয়া গিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভিক্ষুক হীরকটা বাহির করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ এ হীরেখানা পঞ্চাশ টাকায় আমার কাছ থেকে কিনে নিতে পারেন। এর আসল দাম পাঁচ শো টাকারও বেশী। আমি আপনাদের এত সস্তায় দিচ্ছি, তার কারণ আমি নিজে এটা বিক্রী করতে গেলে লোক সন্দেহ করবে। আপনারা অনায়াসে বিক্রী করতে পারেন। এতে আমার দুপয়সা লাভ হয়; আপনাদেরও বিক্রী করলে যথেষ্ট লাভ হবে।"

এবার কিন্তু বিপিন হীরাটা আসল কি নকল, সেটা যাচাই করিবার জন্য কাঁচে আচড় কাটিল না।

গোবর্দ্ধন বলিল, "বিপিন বাবু, এটা আসল হীরে বটে ত?"

বিপিন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পরীক্ষা করার ভাণ করিয়া বলিল, "আসল বলেই ত বোধ হচ্ছে। কিনে ত ফেলা যাক, তারপর যা আছে অদৃষ্টে।" বলিয়া পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দেখিল, মোটে চারটি টাকা আছে। তাহাতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল ও টাকার অভাবে এরূপ সুবিধাটা হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল।

কিন্তু মূর্খ গোবর্দ্ধনকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য এতটা আয়োজন করিবার দরকার ছিল না। ভিক্ষুকের গল্পে সে এতই বিশ্বাস করিয়াছিল যে তৎক্ষণাৎ টাকা বাহির করিয়া সে হীরাটী কিনিয়া লইল। এমন কি পঞ্চাশ টাকা হইতে দামটা কামাইবারও একটু চেষ্টা করিল না।

ভিখারী টাকাটা গণিয়া লইয়া, তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে বিপিন বলিল, "দেখ গোবর্দ্ধন! আমার সন্দেহ হচ্ছে, পরে এ হীরেটা নিয়ে একটা গোলমাল হতে পারে। লোকটার বাসা কোথায় সেটা জেনে আসা দরকার। আমি তার পিছু পিছু গিয়ে বাড়ীটা দেখে আসি, তুমি একটু বেড়াও।" এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধন বেড়াইতে লাগিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল; বিপিন আর আসে না! তখন কি মনে করিয়া সেও বাহির হইয়া গেল।

কথা ছিল, বাহিরে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভিখারীটা বিপিনের অপেক্ষায় থাকিবে; বিপিন আসলে তাহাকে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়া বাকি পাঁচ টাকা সে লইবে। কিন্তু বিপিন বাহিরে আসিয়া তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইল না। রাস্তার দুই দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও নাই। পাগলের মত ছুটিয়া খানিকটা আগাইয়া একটা গলির মধ্যে চাহিয়া দেখিল, সেখানেও নাই। উন্মত্তের মত এদিক ওদিক খানিকটা ছুটাছুটি করিল, দেখিতে পাইল না।

প্রায় ঘণ্টা দুই খোঁজাখুঁজি করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া বিপিন নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিল। রাগের চোটে তাহার নিজের হাত পা গুলো কামড়াইতে ইচ্ছা করিতেছিল।

৭

পরদিন গোবর্দ্ধন এগ্‌জিবিশনে বিপিনকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ওহে! ভিখারিটা আমাদের ভয়ানক ঠকিয়েছে! হীরেটার দাম পাঁচ ছ শো টাকা নয়। আমি একটা জহুরীর দোকানে গিয়েছিলুম; এখন সেখান থেকেই আস্‌ছি।"

বিপিনের তবু একটু আনন্দ হইল। নিজের টাকাটা সে ফেরৎ পায় নাই বটে; তবু আর একজন যে সেই ভাবেই ঠকিয়াছে, তাহাতে তার মনে অনেকটা তৃপ্তি আসিল।

গোবর্দ্ধন বলিয়া যাইতে লাগিল, "লোকটা মহা জোচ্চোর হে! একজন জহুরী হীরেটা দেখে বল্লে, 'এটা ভাল হীরে নয়। এর দাম পাঁচ শ টাকা হতেই পারে না।' তবে সে আমাকে এক শ টাকা দিতে রাজি হল। ঘরপোড়া বাঁশ যা আদায় হয়, তাই ভেবে আমি এক শ টাকাতেই হীরেটা বিক্রী করে এসেছি। ভেবেছিলাম অন্ততঃ ৪।৫শ টাকা লাভ হবে; মোটে পঞ্চাশটা টাকা লাভ হয়েছে।" বলিয়া গোবর্দ্ধন মুখখানি মলিন করিয়া রহিল।

"এঁ্যা!"—বিপিনের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে গোবর্দ্ধনের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

"হ্যাঁ, মোটে পঞ্চাশ টাকা! যাক্, সে আর ভেবে কি হবে! যা কপালে ছিল তা পেয়েছি। এস এখন এগ্‌জিবিশন দেখা যাক্।"—বলিয়া সে বিপিনের হাত ধরিয়া টানিল।

সেদিন এগজিবিশন শেষে শ্রান্তদেহে বিপিন

নিজের ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল ও ভাবিতে লাগিল, ছুইটা অত্যন্ত সোজা কথা শিখিতে তাহার বিয়াল্লিশ টাকারও অধিক খরচ হইয়া গেল।

১ নং শিক্ষা—হীরা দিয়া কাঁচ কাটিতে গেলে হীরার মধ্যেও একটা ধারাল কোণ বাছিয়া লইতে হয়।

২য় নং শিক্ষা—না জানিয়া শুনিয়া হঠাৎ একটা অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। *

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র লাহা।

* আখ্যান ভাগ Luck Williams লিখিত একটি ইংরাজী গল্প হইতে গৃহীত।

তীর্থ-যাত্রীর পত্র

প্রিয় * * *,

আমার এ বৎসরের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি। এবার কিন্তু লিখিবার বিশেষ কিছু নাই। এবারকার দৃষ্ট স্থানগুলি অনেকেই পূর্ব্বে দেখিয়াছেন—তুমি নিজেও কিছু কিছু দেখিয়াছ। অনেক তীর্থযাত্রী এবং পর্য্যটক এই সমস্ত স্থানের দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এবারকার লেখা "চর্ব্বিত চর্ব্বণ, পিষ্ট পেষণ" দোষ-দুষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। তথাপি প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ ভ্রমণ কাহিনী তোমাকে লিখিতেছি।

বর্ত্তমান বর্ষের (বাং ১৩৩০) বৈশাখ মাসে (ইং ১৯২৩ এপ্রিল) উত্তরাখণ্ড (যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী কেদারনাথ এবং বদরীনাথ) দর্শন করিয়া, যদি সম্ভব হয় আদি বদরী (তিব্বতে থোলিংমঠ), মানস সরোবর এবং কৈলাস ভ্রমণ করিয়া আসিব সংকল্প করিয়া, রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করি।

উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাবে প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় এবং মে মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্তও যমুনোত্তরী গঙ্গোত্তরীর পথ তুষারাচ্ছন্ন থাকে সংবাদ পাওয়ায়, বিদায় গ্রহণের পরেও কিছুদিন কর্ম্মস্থানেই রহিলাম। মে মাসের শেষ ভাগে কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া হাওড়া আসি।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসর স্বাধীন ভাবে বাহির হইতে পারি নাই। ভৃত্য, একটী আত্মীয় যুবক, কনিষ্ঠা কন্যা, ব্রাহ্মণী এবং মাতাঠাকুরাণী সঙ্গে ছিলেন। যদিও "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য (নহিলে খরচ বাড়ে)" যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু স চেষ্টা ফলদায়িকা হয় নাই। ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে আনাতেই কনিষ্ঠা কন্যাটীকে আনিতে হইল, শেষে "ঢেঁকি উপলক্ষ্যে পার্ব্বণ", ভৃত্য এবং আত্মীয়টীকেও সঙ্গে আনিতে হইল। আমার একার পক্ষে এবয়সে নিজের এবং অন্যান্যের "হিফাজাত" করা কঠিন কার্য্য।

২০শে মে (১৯২৩) তারিখে ৺কাশীধাম উদ্দেশে হাওড়া ত্যাগ করিলাম।

২১শে মে তারিখে অবধারিত সময়ের চারি ঘণ্টা পরে রেলগাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিল। বারাণসীগামী গাড়ীর অপেক্ষায় আমাদিগকে আরও চারি ঘণ্টা মোগলসরাই ষ্টেসনে থাকিতে হইল। অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় বারাণসী পৌঁছিলাম এবং পুঃস্থানীয় একটী যুবকের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

কাশীতে এখন অত্যন্ত গরম। একজন ব-ি-র্ণ দ্বিপ্রহরে উত্তাপের মাত্রা ১২০ ডিগ্রী। -ানি যন্ত্রে উত্তাপের মাত্রা যাহাই হউক না কে- -মাদের শরীরের

পক্ষে উত্তাপ অসহনীয়। অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়া বেলা সাড়ে আট্‌টা মধ্যেই বাসায় ফিরিতে হইত এবং অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইত।

কাশী ক্ষেত্রে ত্রিরাত্রি বাস না করিয়া মাতা ঠাকুরাণী অন্যত্র যাইবেন না। বাধ্য হইয়া কিছু সময় আমাদিগকে (২২ শে হইতে ২৪ শে মে পর্য্যন্ত) কাশী বাস করিতে হইয়াছিল। যাহা একান্ত কর্ত্তব্য মাত্র সেই সমস্ত তীর্থ-কৃত্য সম্পন্ন করা হইল এবং অপর দ্রষ্টব্য বিগ্রহ ও স্থানের মধ্যে কোন কোন বিগ্রহ এবং স্থান দর্শন এবং দুই এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

২৪শে মে পূর্ব্বাহ্নে নয় ঘটিকার সময় আমরা বারাণসী ত্যাগ করিলাম। আমরা যে গাড়ীতে আরোহী হইলাম সেইটী দেরাদুন গামী গাড়ী—লাক্‌সারে গাড়ী বদল করিতে হয়না। এবৎসর কেদার বদরী যাত্রী লোক বিস্তর। অন্যান্য স্থানের যাত্রীও আছে, গাড়ীতে খুব ভিড়। গাড়ীতে একজন বাঙ্গালী বাবু এবং দুইজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহারাও হরিদ্বার যাত্রী। আমরা গাড়ীতে উঠিলে পর তাঁহারা নিজেদের অসুবিধা করিয়াও স্ত্রীলোকদের বসিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। আমরা বাঙ্গালী পুরুষ কয়জন এক যায়গায়ই বসিলাম। পরস্পর পরিচিত হইয়া গল্পে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গল্পের প্রধান বিষয়ই ছিল তোমাদের—নব্যশিক্ষিতদের কুৎসা কীর্ত্তন। একজন সন্ন্যাসী বলিলেন, এখনকার নব্য সম্প্রদায় তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কেবল "শিশ্নোদরপরায়ণ"ই হইয়া থাকেন; ঋষি সেবিত ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম এখন প্রায় লুপ্ত। অপর জন বলিলেন, এখন "উচ্চশিক্ষা" লাভ ত হয়ই না, কোনও প্রকার শিক্ষা লাভ হয় কিনা সন্দেহ; ভারতীয় সাহিত্য দর্শনের কথা দূরে যাক, যে ইংরেজী বিদ্যা এখন শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষিত নামধারীর মধ্যে কয়জনে সেই ইংরেজীই —রূপে লিখিতে ও বলিতে পারেন? তিনি একজন এম্-এ পা[illegible]যুবককে 'আইস্‌ল্যাণ্ড অব্ জ্যাপান" বলিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। বাঙ্গালী বাবুটী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, তিনি জানেন একজন এম্-এ পাশ হেড্‌মাষ্টার "সোপেনহার" এর নাম জানেন না।

এই সমস্ত আলোচনায় অনেকদিনের পুরাতন একটী ঘটনা আমার মনে পড়িল। তখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ জন্য আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল। স্বদেশ সেবকগণ স্বদেশের মঙ্গল কামনায় এবং ইংরেজ জাতির উচ্ছেদ না হউক (কারণ তাহা অসম্ভব) অন্ততঃ তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য আজ পূর্ব্ববঙ্গের কোনও গ্রামে কোন ধনী বাঙ্গালীর বাড়ীতে ডাকাইতি, কাল কোনও বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী হত্যা, পরশু কোনও গ্রামে কতক-গুলি বাঙ্গালীকে প্রহার করিতেছিল। গবর্ণমেণ্টও আজ এবাড়ী খানাতল্লাস, কাল কতকগুলি বালক ও যুবককে ধর্ পাকড়, পরশু কোনও গ্রামে গ্রামবাসীদের উপর অতিরিক্ত করস্থাপন করিয়া "পিটুনি পুলিশ" সংস্থাপন করিতে-ছিলেন। ফলতঃ কি স্বদেশসেবক কি গবর্ণমেণ্ট, উভয়েরই কার্য্যজনিত নিগ্রহ এবং দুর্ভোগ বাঙ্গালী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুদিগকেই সহ্য করিতে হইয়াছিল, ইংরেজ জাতির বিশেষ কোন অনিষ্টের সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে চাঁদপুর হইতে রেলপথে অন্যত্র যাইতেছিলাম। সরকারী কায, সুতরাং সরকারী পয়সায় (আন্দোলনকারীদের মতে "অনশন-ক্লিষ্ট ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের শোণিত বিন্দুসম অর্থে") ভ্রমণ। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা গাড়ীতে ছিলাম। সেই গাড়ীতে একজন পাটের আফিশের "বড়বাবু" ছিলেন। শুধু নামেই বড়বাবু ছিলেন না, পোষাকে পরিচ্ছদেও তিনি বড় বাবু ছিলেন। পরিধানে অতি যত্নে চুনট করা মিহি দেশী কাপড়, পায় রেশ্‌মী মোজা, অতি মসৃণ চর্ম্মের বিলাতী জুতা, গায়ে গরদের কোট, তাহাতে সোনার ঘড়ী চেইন্, গরদের চাদর, হাতে "পার্টিজ কেন্" এর সুন্দর ছড়ী। বড় বাবুর গাড়ীতে উঠিবার অল্প পরেই অপর একজন ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি আমাকে চিনিতেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমি

তাঁহাকে চিনিতাম। তিনি কোনও জেলা কোর্টের উকীল—এম্-এ, বি-এল্। ভদ্রলোকটী একটু "স্বদেশী ছিট্" গ্রস্ত। পরিধানে জোলার তৈয়ারী অতিমোটা কর্কশ কাপড়, গায়ে ময়নামতির ছিটের পাঞ্জাবী, পায়ে কোনও গ্রাম্য চর্ম্মকার নির্ম্মিত জুতা, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে বাঁশের মোটা লাঠি। আগন্তুক দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর আরোহী কিনা, বড় বাবুর যেন সে বিষয়ে একটু সন্দেহ হইয়াছিল। পরে তাঁহার পরিচয়ে জানিতে পারিলেন তিনি একজন এম্-এ বি-এল্। কথা প্রসঙ্গে বড় বাবু একটু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিলেন, "মশায়, মাফ্ করবেন, আজ কাল এম্-এ বি-এল্ বল্‌তে গেলে পথে ঘাটে পাওয়া যায়।" উকীল বাবু শ্লেষটুকু সহ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "প্রায় তাই।" পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বল্‌তে পারেন, বৎসরে কতগুলি ছেলে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেয় ও উত্তীর্ণ হয়?"

বড় বাবু। প্রায় পনর হাজার পরীক্ষা দেয় এবং স্যর আশুতোষের কৃপায় দশ হাজার উত্তীর্ণ হয়।

উকীল বাবু। এফ্ এ?

বড় বাবু। তাও ধরুণ প্রায় সাত হাজার পরীক্ষা-দেয় এবং চার হাজার পাশ করে।

উকীল বাবু। বি-এ?

বড় বাবু। সেও প্রায় দু হাজার পরীক্ষা দেয় সাত্ আট্ শ পাশ করে।

উকীল বাবু। এম্ এ?

বড় বাবু। তিন, চার শ পরীক্ষা দেয়, একশ, দেড়শ পাশ করে।

উকীল বাবু। এম্ এ, বি, এল্?

বড় বাবু। পঞ্চাশ ষাট্‌জন পরীক্ষা দেয়, বিশ পঁচিশ জন পাশ করে।

উকীল বাবু। দশ হাজার এণ্ট্রান্স পাশ ছেলের মধ্যে অবশেষে বিশ কি পঁচিশ জন মাত্র এম্-এ বি-এল্ হয়। সেই এম্-এ, বি-এল্‌ই যখন পথে ঘাটে পাওয়া যায়, তখন আপনার পাটের আফিশে বিষ্টে—তার যে পথে ঘাটেও স্থান নেই, পায়ে মাড়ানো পঁচা আমের মত চ্যাপ্টা হ'য়ে নর্দ্দমায় সেঁদিয়ে গেছে!"

আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা কিংবা আমার পুরাতন স্মৃতি উভয়ের প্রতি সমান ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া দেরাদুনগামী বাষ্পীয় শকট প্রতাপগড় ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। এলাহাবাদ হইতে আগত গাড়ী আমাদের গাড়ীর প্রতীক্ষায় ছিল। আমাদের গাড়ী আসিয়া পৌছিলে এলাহাবাদের গাড়ীকে আমাদের গাড়ীর সঙ্গে জুড়িয়া দিল। গাড়ীর দৈর্ঘ্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইল।

প্রতাপগড়ের পর আমরা লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে আসিলাম। বঙ্গদেশে যেরূপ শান্তিপুরের কথা শুদ্ধ ও মিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ, সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে লক্ষ্ণৌর উর্দ্দূও সেইরূপ বিশুদ্ধ, এবং অধিবাসিদের উচ্চারণ অতি মিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশের কোন মুসলমান জমীদার অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়া "মোটেই জল নাই" ইহার উর্দ্দূ প্রতিবাক্যে "পানি কুছ নেহি হ্যায় বিল্‌কুল" শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া একটা তামাসার কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে হরিদ্বারের পাণ্ডাদের প্রতিনিধিবর্গের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। পাণ্ডার নাম ও ঠিকানা এবং তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলে কি কি সুবিধা হইবে ইত্যাদি সংবাদ সম্বলিত মুদ্রিত কাগজ এই প্রতিনিধিবর্গ বিতরণ করিতে লাগিল। যাহাদের মুদ্রিত কাগজ নাই তাহারা তাহাদের পাণ্ডাদের নাম লিখিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং অন্যান্য সুবিধার কথা বলিল। লক্ষ্ণৌর কয়েকটি ষ্টেশন পরেই একটি ছোট ষ্টেশনে নামিয়া নৈমিষ্যারণ্য যাইতে হয়। সেই ষ্টেশনে নামিয়া নৈমিষ্যা-রণ্য দর্শন করিয়া পরে হরিদ্বার যাইবার জন্য নৈমিষ্যারণ্যের পাণ্ডাগণ অনুরোধ করিল। যে কয়েক মিনিট লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে গাড়ী ছিল পাণ্ডাদের সহিত কথার উত্তরে প্রত্যু-ত্তরে এবং "খরমুজা" ক্রয় করিবার গণ্ডগোলেই কাটিয়া গেল, বিশুদ্ধ উর্দ্দূ শুনিবার কোন সুযোগ পাইলাম না।

লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনের পর সাজাহানপুর। বঙ্গ ভজের

প্রতিবাদকল্পে যখন বিলাতী পণ্য "বয়কট" করা হইয়াছিল তখন এখান হইতে "সাজাহানপুরী রম" নামে এক প্রকার সুরা পূর্ব্ববঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইত। যাঁহারা পূর্ব্বে হুইস্কী ব্রাণ্ডি পান করিতেন তাঁহারা এই "সাজাহানপুরী রম" দ্বারা কথঞ্চিৎ তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন।

ইহার পরের ষ্টেশন বেরেলী। রাত্রি প্রায় দশটায় আমরা বেরেলী পৌছিলাম। এখানে গাড়ী পঁচিশ মিনিট থাকে। মাতাঠাকুরাণী গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন এবং "গোঁসাই"এর নাম গ্রহণ করিয়া, খরমুজা ও অন্যান্য ফলে রাত্রির জলযোগ শেষ করিলেন। আমাদের বীরাচারীদের কোন অসুবিধা নাই। ষ্টেশনের ভেণ্ডারের নিকট হইতে ক্রীত হালুয়া পুরী দ্বারা চলন্ত গাড়ীতেই উদর পূর্ত্তি করিলাম- খরমুজা ত আছেই।

এই ষ্টেসন হইতে পায়ে রূপার মোটা বাঁকমল হাতে রূপার অলঙ্কার, ঘাগড়ী পরা ওড়না গায়ে একদল হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক গাড়ীতে উঠিল। প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটী মোট। আমরা গাড়ীর যে প্রান্তে ছিলাম ইহারা তাহার অপর প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং গাড়ী ছাড়িয়া দিলে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সঙ্গীতটী সম্পূর্ণ না বুঝিয়াও এইটুকু বুঝিতে পারিলাম, শ্রীকৃষ্ণ কোনও কার্য্য করিয়া অপ্রতিভ হওয়াতে রাধিকার সখিগণ "ছাৎ তোরে কান্হাইয়া" বলিয়া টিটকারী দিতেছেন।

২৫শে জুন—প্রত্যুষে হরিদ্বার ষ্টেসনে পৌছিলাম। ফরিদপুর কালেক্টরীর সুপারইণ্টেডেণ্ট আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃকল্প বাবু বরদাচরণ সেন পূর্ব্বেই হরিদ্বারে আসিয়াছিলেন। কাশী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তার করিয়াছিলাম, তিনি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আমরা বিনায়ক মিশ্রের ধর্ম্মশালা উদ্দেশে রওনা হইলাম। হরিদ্বার ষ্টেশনে মালপত্র বহন জন্য ঠেলাগাড়ী (wheel barrow) ভাড়া পাওয়া যায়। ঠেলাগাড়ীতে মালপত্র দিয়া আমরা সকলে পদব্রজেই ধর্ম্মশালায় আসিলাম। অদ্য হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইল।

লক্ষ্নৌ সিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ শ্রীশচন্দ্র সেন সপরিবারে এই ধর্ম্মশালায় ছিলেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠের নিকট আমাদের প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই দূর দেশে আসিয়াও যে স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালা কথা বলিবার সঙ্গিনী পাইলেন ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

মাল পত্র ও পরিজনবর্গকে ধর্ম্মশালায় রাখিয়া বরদা বাবু ও আমি সন্ন্যাসী ভোলা গিরির আশ্রমে গেলাম। সন্ন্যাসী বলতেই নগ্ন বা অর্দ্ধ নগ্ন, "ছিন্নটা কম্বল লোটা সম্বল, তরুতলে বাস" "অন্নভিক্ষা, তনু রক্ষা" এক শ্রেণীর লোকের চিত্র আমাদের মনে জাগে, গিরি মহারাজ এই শ্রেণীর সন্ন্যাসী নহেন। তাঁহার গায়ে গেরুয়া রঙে রঞ্জিত "পার্শী" কোট (অলখাল্লা নহে) তাঁহার সোনার ঘড়ি চেইন্ দুই হাতের অনেক গুলি অঙ্গুলে সোনার আংটী, চোখে সোনার ফ্রেমে নীল বর্ণের চশ্মা, পায়ে অতি মসৃণ কোমল বিলাতী পাম্সু। ইনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া হরিদ্বারে দুইটী ধর্ম্মশালা এবং নিজের ও শিষ্যদের অবস্থান জন্য একটী অতি সুন্দর আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। শুনিলাম গিরি মহারাজের বহু লক্ষ মুদ্রা এখনও ব্যাঙ্কে জমা আছে।

আমরা যখন আশ্রমে পৌছিলাম তখন গিরি মহারাজ একখনা বেতের ইজ চেয়ারে জাপানী কুশনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। বরদা বাবু গিরি মহারাজের পূর্ব্ব পরিচিত। তিনি আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

অল্প কিছু আলাপের পর গিরি মহারাজের আদেশে তাঁহার এক শিষ্য "সদাচার ও স্তোত্রমালা" নামে বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা আনিয়া দিল। আমি নগদ মূল্য এক আনা দিয়া উহা গ্রহণ করিলাম।

গিরি মহারাজের স্নানের সময় উপস্থিত হওয়ায় তিনি ব্রহ্মকুণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একজন চেলা তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিল। একজন পূজোপকরণ অপর একজন বস্ত্রাদি লইয়া এবং অনেকে শূন্য হস্তে

গিরি মহারাজের অনুসরণ করিল। বরদা বাবু ও আমি অনুসরণকারীদের দলভুক্ত হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিলাম। গিরি মহারাজ সশিষ্যে ব্রহ্মকুণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন আমরা দুই জন বাসায় ফিরিলাম।

অপরাহ্নে কনখলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম দেখিতে গেলাম। কনখল্ স্থানটী হরিদ্বার অপেক্ষা অধিকতর নির্জ্জন। গঙ্গাতীর ধরিয়া গ্রাম্য পথে আমরা বাঁধ পর্য্যন্ত আসিলাম. সেখান হইতে প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া চলিলাম।

কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান ব্যক্তির নিকট হইতে কনখল মিশনের প্রধান ব্যক্তির নামে বরদা বাবু একখানা পরিচয় পত্র আনিয়াছিলেন।

এখানেও দেখিলাম সন্ন্যাসীজী ইজি চেয়ারে উপবিষ্ট এবং বৈকালিক জলযোগে নিযুক্ত। জলযোগ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করিলাম। একজন চেলা আসিয়া "ডিস্" লইয়া গেল। আমার যতদুর স্মরণ হয় সন্ন্যাসীজী তখন সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিলেন। বরদা বাবু চিঠি খানা সন্ন্যাসীজীর ইজি চেয়ারের হাতার উপর রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসীজী চিঠি খানা পাঠ করিলেন এবং একটী যুবক (বালক বলিলেও চলে) সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। এই বালক সন্ন্যাসী আমাদিগকে হাঁসপাতাল প্রভৃতি দেখাইল। সন্ন্যাসীটী বালক, অসন্ন্যাসী দিগকে—অন্ততঃ যখন তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ প্রাপ্তির আশা নাই,—নিজেদের অপেক্ষা যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতে হইবে এশিক্ষা তাহার এখনও হয় নাই। সে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং বিদায় কালে বলিল, আমাদের কোন প্রয়োজন যদি তাহার দ্বারা সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাকে জানাইলে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

অদ্যকার দর্শন অধ্যায় এইখানেই সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যার পর উভয়ে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

২৬ শে হইতে ৩১ শে পর্য্যন্ত হরিদ্বারে ছিলাম। স্থানটী কাশী অপেক্ষা অপেক্ষা অনেক শীতল। এখনও প্রাতঃকালে একটু শীত বোধ হয় এবং গায়ে গরম কাপড় দিতে হয়। কিন্তু সকাল ১০টা হইতে বৈকাল ৬টা ৩০মিঃ পর্য্যন্ত এখানেও বাহির হওয়া যায় না। এখানকার দিনগুলি যেন অত্যন্ত লম্বা। ভোর ৫-৩০মিঃ হইতে অপরাহ্ন ৭-৩০মিঃ পর্য্যন্ত দিবাভাগ। এখানকার সহরটী ছোট হইলেও বেশ সুদৃশ্য। হরিদ্বারে মিউনিসিপালিটী. ডাক ও তার ঘর, থানা, রেল, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী আছে, কনখলে রামকৃষ্ণ মিশনের হাঁসপাতাল ভিন্ন হরিদ্বারে দুইটী হাঁসপাতাল আছে। এখানকার গঙ্গাও সর্ব্বদাই "বীচিভিরান্দোলিতা" এবং মনোহারিণী। গঙ্গাতটও অতি সুন্দর, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পোস্তা বাঁধান, পারে একটী পোস্তা বাঁধান কৃত্রিম দ্বীপ। পোস্তা হইতে দ্বীপে যাইবার একটী সুন্দর সেতু। সেতুর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গঙ্গাজল সংলগ্ন একগাছি লোহার শিকল। স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইবার ভয়ে অনেকেই এই শিকল ধরিয়া স্নান করিয়া থাকে।

হরিদ্বারে ছয়দিন অবস্থিতির মধ্যে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন এবং তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করিয়া লইলাম। ভীমগোড়া, বিল্বকেশ্বর, সূর্য্যকুণ্ড, মনসা পাহাড় এবং কনখলে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগের স্থান প্রভৃতি দর্শনযোগ্য এবং তীর্থস্থান। প্রায়ই প্রত্যহই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান এবং "হরিকি পাইরী" দর্শন করিতাম। এখানেও স্নানের কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা যখনই ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়াছি দলে দলে স্ত্রী পুরুষকে স্নান করিতে দেখিয়াছি। আমি নিজেও কোন কোন দিন চারিবার পাঁচবার স্নান করিয়াছি, কোন অসুখ করে নাই। গঙ্গাস্নান যেন এখানকার আমোদ।

"হরিকি পাইরী"র নিকট সাহারণপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম স্বাক্ষরিত দুই খানা বিজ্ঞাপন। একখানার মর্ম্ম. "কেহ বিষ্ণু পাদপদ্মের ফটোগ্রাফ নিতে পারিবে না।" অপর খানা, "কেহ জুতা পায়ে মন্দিরে

প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

খৃষ্টিয়ানদের (পুরুষের) টুপি মাথায় দিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ ধর্ম্মরীতি বিরুদ্ধ; হিন্দুদের, সম্ভবতঃ মুসলমানদেরও, জুতা পায় দিয়া দেবমন্দিরে কি প্রার্থনামন্দিরে প্রবেশ ধর্ম্মরীতি-বিরুদ্ধ। কোনও গির্জ্জার সম্মুখে "টুপি মাথায় দিয়া প্রবেশ নিষেধ" বিজ্ঞাপন দেখি নাই। অনেক দেবমন্দির এবং মসজিদের সম্মুখে "জুতা পায় দিয়া প্রবেশ নিষেধ" লেখা দেখিয়াছি।

আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল, হরিদ্বারে বুঝি কেবল সন্ন্যাসীদেরই খেলা। এখানে আসিয়া দেখিলাম তাহা নহে। হ্যাটকোট হইতে আরম্ভ করিয়া লেংটী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর পোষাকই এখানে দেখা যায়। অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ অত্যন্ত আনন্দদায়ক। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলের লোকই স্ত্রী পুরুষ তখন এখানে দেখা যায়। কাহারও জাতীয় পোষাক, কাহারও বিজাতীয় পোষাক, কাহারও বা খিচুড়ী পোষাক—যেমন ধুতির উপর নেকটাই অথবা শার্টের উপর সোলাহ্যাট। কোনও গাউন পরা স্ত্রীলোক দেখি নাই। ধনবান ব্যক্তিদের বালক বালিকাদিগকে অতি সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া বায়ু সেবনার্থে এখানে লইয়া আইসে। মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে এই পথ খুব পরিষ্কার রাখা হয়। পোস্তা এবং কৃত্রিম দ্বীপের উপর কোথাও বক্তৃতা, কোথাও শাস্ত্রব্যাখ্যা, কোথাও সঙ্গীত, কোথাও গল্প চলিতে থাকে।

একজন বাঙ্গালী সাধু দেখিলাম, বাহুতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির উল্কি, গায়ে আলখাল্লা তাহাতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ছাপ দেওয়া এবং গৌরনিতাই গৌরনিতাই লেখা, পায়ে মোজা জুতা এবং নূপুর, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ সংযুক্ত চূড়া এবং হাতে বাঁশী।

সাধুকে দেখিলেই বালক বালিকার দল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া "রাধে রাধে" বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। তিনিও দুই বাহু তুলিয়া তাহাদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিয়া থাকেন। সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত মোমের পুতুলের মত শিশুর দল যখন সাধুকে ঘেরিয়া "রাধে রাধে" বলিয়া নাচিতে থাকে, তখন সে দৃশ্যটী বড়ই মধুর বলিয়া মনে হয় এবং যথার্থই মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। সাধুজীর বক্তৃতা করা রোগও আছে। কি গৈরা বৈরাগীর দল, (গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়) কি আর্য্য সমাজ, কি কন্যা মহাবিদ্যালয়, কি গোরক্ষণী সভা যে কোন সম্প্রদায় কি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেই তিনি ইংরেজী হিন্দি অথবা মিশ্র ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

এক অপরাহ্ণে সাধুজী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেম ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন এবং "গোরা জাতের বিচার মানে নারে" আদর্শে জাতি ভেদের বিরুদ্ধেও কিছু বলিতেছিলেন। একজন হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী বক্তৃতার কিয়দংশ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোম তো মচ্ছী খাতা হ্যায়।" সারগর্ভ প্রতিবাদ! অকাট্য যুক্তি!

মিঃ বৈরাগীচরণ নামে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, হ্যাটকোট ধারী, উড়িষ্যার স্থায়ী প্রবাসী বাঙ্গালী একজন সবডেপুটী কলেক্টর কোন সেশনের মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্য যে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহার যুক্তি স্বরূপ প্রতিপক্ষের উকীল জজ এবং জুরীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিজ্ঞ আদালত, সাক্ষীর সাক্ষ্য কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারেনা। ইনি নামে বৈরাগী, কাযে ঘোর বিষয়ী, জাতিতে বাঙ্গালী. পোষাকে ফিরিঙ্গি. ইঁহার ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম অর্থাৎ সাহেব লোকদের ধর্ম্ম, ইঁহার মাতৃ ভাষা ওড়িয়া অর্থাৎ সাহেব লোকের বেয়ারা খানসামাদের ভাষা।" সন্ন্যাসীজীর গম্ভীর ভাবে উক্ত "তোমতো মচ্ছী খাতা হ্যায়" যুক্তি শুনিয়া উকীল বাবুর এই রহস্যজনক যুক্তিটী আমার মনে পড়িল।

একদিন অপরাহ্ণে হরিদ্বারের পর পারস্থিত কেনাল ব্রীজ দেখিয়া আসিলাম। একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তিনি অতিশয় সৌজন্য সহকারে সমস্ত দেখাইলেন এবং ব্যাখ্যা করিলেন।

অপর একদিন (৩০শে মে) বরদা বাবুর সঙ্গে

কাংড়ী গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম এইটী আর্য্যসমাজীদের প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দিন কনখল রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বরদা বাবু আর বড় সাধু দর্শনে যাইতেন না—অন্ততঃ আমরা একত্র হইয়া যাই নাই।

কাংড়ী স্থানটী বিজনৌর জেলার মধ্যে, হরিদ্বার হইতে (আমার অনুমান) দশ মাইল। দূরত্ব বিষয়ে আমাদের দুইজনের কাহারও কোন জ্ঞান না থাকাতে আমরা মধ্যাহ্নেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিব এই বিশ্বাসে অতি প্রত্যুষে রওয়ানা হইলাম। প্রায় নয়টায় আমরা কাংড়ী পৌঁছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়টী লোকালয় হইতে অনেক দূরে এবং অতি সুন্দর স্থানে স্থাপিত। কত বিস্তৃত স্থান লইয়া যে প্রতিষ্ঠিত তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। কাংড়ীর এই বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনরূপ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে না।

বেদ বিভাগ, আয়ুর্ব্বেদ বিভাগ এবং সাধারণ বিভাগ এই বিভাগ ত্রয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিভক্ত। যাহারা ভবিষ্যতে আর্য্যসমাজের প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবে তাহারা বেদ বিভাগে, যাহারা চিকিৎসক হইবে তাহারা আয়ুর্ব্বেদ বিভাগে এবং অন্য বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে তাহারা সাধারণ বিভাগে অধ্যয়ন করে। আয়ুর্ব্বেদ বিভাগে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুমোদিত অস্থিবিদ্যা এবং কিছু কিছু এলোপ্যাথিক ঔষধের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের ধনী ব্যক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন। দানের মাত্রা এবং দাতৃগণের নাম প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। অনেক প্রদেশের অনেক লোকের নাম দেখিলাম, কোনও বাঙ্গালীর নাম দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা। বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের অন্যান্য সকল ভাষার পুস্তকই বিশ্ব বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে আছে। এই সকল পুস্তক দান প্রাপ্ত।

বিশ্ব বিদ্যালয়ে একজন মাত্র বাঙ্গালী অধ্যাপক এবং স্কুল বিভাগে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত আছেন। আমরা যে দিন বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনে গিয়াছিলাম, পণ্ডিতজী সে দিন অনুপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইলাম। ইঁহার নাম বাবু বিধুভূষণ দত্ত, বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। ইংরেজী ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস শাস্ত্রের ইনি অধ্যাপক।

বিশ্ব বিদ্যালয়ে কোনও বাঙ্গালী ছাত্র নাই। স্কুলে তিনটী বাঙ্গালী ছাত্র আছে, বিধুবাবু ছাত্র তিনটীকে আনাইলেন। তাহাদের সহিত আলাপে বুঝিলাম তাহারা বাঙ্গালা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বালকটীর বয়স অনুমানে দ্বাদশ বৎসর হইবে।

আট বৎসরের অধিক বয়সের ছাত্র এখানকার স্কুলে গ্রহণ করা হয় না। ছাত্র স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে অধ্যয়ন শেষ না করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। ইহা সাধারণ বিধি।

সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য পর্য্যন্ত এখানে পড়ান হয়। তাহার পর ছাত্রগণ ইন্দ্রপ্রস্থ অথবা বৃন্দাবন গুরু কুলে স্কুলের পাঠ শেষ করে। উপযুক্ত ছাত্রগণ পুনরায় এখানে আসিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে।

লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, ঔষধাগার প্রভৃতি দর্শন এবং কোন কোন অধ্যাপক এবং ছাত্রদের সঙ্গে আলাপে প্রায় ১১ টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন গুরুকুল ত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে আসিতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইবে অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগকে ইহা বলিলেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

বিধুবাবুও তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিলেন। আমরা সাধারণ ভোজনাগারে আহার করিলাম। ভোজনাস্থানে ব্রহ্মচারী (ছাত্র) দের জন্য একখানা ভিন্নঘর। অপর সাধারণ কর্ম্মচারী, অতিথি প্রভৃতিদের জন্য অন্যস্থান। আমাদের ন্যায় আরও কয়েক জন অতিথি সেদিন ছিলেন; ভোজন স্থানে উপস্থিত হইয়া মনে হইল এযেন এক "মহোৎসব"। গ্রামদেশে মহোৎসব উপলক্ষ্যে ডিঙ্গি নৌকার মধ্যে ডাইল রাখে

কারণ বৃহৎ পাত্রের অভাব। এখানে ডাইল তরকারী রাখিবার পিত্তল পাত্র দেখিয়া মনে হইল যদি কোন বালক ব্রহ্মচারী দৈবাৎ কোন ডাইলের পাত্র মধ্যে নিপতিত হয় তবে সে "নিমজ্জিত" হইয়া মারা পড়িবে।

ভোজনান্তে বিধুবাবুর কক্ষের নিকটবর্ত্তী কক্ষে আমরা বিশ্রাম করিলাম। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় গুরুকুল ত্যাগ করিলাম। ত্যাগের পূর্ব্বে অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি পুনরায় অন্তদিন গুরুকুলে আসিতে অনুরোধ করিলেন, (তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই)।

৩১শে মে বৈকালে হরিদ্বার "ঋষিকুল" প্রতিষ্ঠান দেখিতে গিয়াছিলাম। ঋষিকুলে সায়াহ্ন যজ্ঞদর্শন এবং বেদধ্বনি শ্রবণ করিলাম। এই প্রতিষ্ঠানটী আদর্শ হইতে এখনও অনেক পশ্চাতে। ইহাকে গুরুকুলের ন্তায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যে পরিমাণ অর্থ এবং স্বার্থ-ত্যাগী কর্ম্মীপুরুষের প্রয়োজন তাহা সংগৃহীত হইতে আরও কত সময় লাগিবে কে জানে? ঋষিকুল প্রতিষ্ঠানটী "সনাতন" ধর্ম্মাবলম্বীদের। আর্য্যসমাজী বলিলে যেমন স্বামী দয়ানন্দের শিষ্য উপশিষ্য বুঝায়, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বলিলে তদ্রূপ এক শ্রেণীর লোক অথবা একটী সম্প্রদায় বুঝায় না। যাঁহারা যজ্ঞ বা বেদপাঠের কিছুমাত্র আবশ্যকতা স্বীকার করেন না তাঁহারাও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী—যেহেতু তাঁহারা অন্ত কোন ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর একটী সংজ্ঞার অভাবই ঋষিকুলের উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হয়।

ঋষিকুল হইতে ধর্ম্মশালার পথে আরও কয়েকটী প্রতিষ্ঠান ও দেবমন্দির আছে। সময়াভাবে সমস্ত দেখিতে পারি নাই। হরিদ্বারের অপর পারে চণ্ডী পাহাড় একটী স্থান, সে পাহাড়েও যাইতে পারি নাই। ঋষিকুল হইতে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং আগামী কল্য হৃষীকেশ যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

হরিদ্বার ত্যাগের পূর্ব্বে পাণ্ডা এবং ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক। এখানে পাণ্ডার বিশেষ উপদ্রব নাই বলিলেও চলে। আমাদের পাণ্ডা তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে আমাদের তত্ত্বাবধান জন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই লোকটী প্রত্যহ সকাল এবং বৈকালে আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং সঙ্গে যাইয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া আনিত।

হরিদ্বারে ও কনখলে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা। ধর্ম্মশালাগুলি প্রায়ই মাড়োয়ারী এবং পাঞ্জাবীদের অর্থে নির্ম্মিত। একজন বাঙ্গালীর একটী ধর্ম্মশালা আছে শুনিলাম কিন্তু তাহা হরিদ্বারের কোন অংশে জানিতে পারিলাম না। আমরা যে ধর্ম্মশালায় ছিলাম উহা একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের। তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ী। এ সমস্ত ধর্ম্মশালা না থাকিলে এ ক্ষুদ্র স্থানে এত অধিক যাত্রীর কি উপায় হইত তাহা বলা যায় না।

যদিও ধর্ম্মশালাগুলি কেবল "ধর্ম্মার্থ হি বনাই গৈ হৈ" তথাপি অনেকে নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্ত আসিয়াও এই সমস্ত ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। থাকিবার অন্ত স্থান নাই। পাণ্ডার বাড়ীতে ভাড়া দিয়া থাকা যায় বটে, কিন্তু সে সমস্ত বাড়ীর স্বাস্থ্য আদর্শ বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পক্ষে অনুকূল নহে। এই সমস্ত ধর্ম্মশালায় "যো যাত্রী হৈ রহেঙ্গে উন্‌সে কিসি প্রকার কর ইয়া কিরায়া নাহি লিয়া যয়গা" তিনি ধর্ম্মকামী কি স্বাস্থ্যকামী যাহাই হউন না কেন। ধর্ম্মশালায় স্থান থাকিলে কোন যাত্রীকে দিতে কর্ম্মচারী অস্বীকার করিবে না ইহাই বিধি। যাত্রী প্রথমতঃ সাত দিন, কর্ম্মচারী অনুমতি দিলে তাহার পর আরও সাত দিন ধর্ম্মশালায় থাকিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশালায় এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। কন্‌খলে বাবু সুরয মলের ধর্ম্মশালায় আমরা এক মাস থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম, কিন্তু যাওয়া হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মশালাতেই যাত্রীদের পাকের "বর্ত্তন বগৈর হৈ মাঙ্গনেপর" যাত্রীদিগকে দেওয়া হয়। এসব বাসনে বাঙ্গালী যাত্রীদের বিশেষ কোন সুবিধা হয় না।

"ধর্ম্মশালাকে কর্ম্মচারী লোগ্‌ যাত্রীকো নম্রতাকে সাথ্‌ বর্ত্তাব করেঙ্গে ঔর সাধ্যানুসার উন্‌কে আরামকে লিয়ে চেষ্টিত রহেঙ্গে" বিধিটী যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পালিত হয়

তাহা মনে হয় না। ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠাতা যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মশালা স্থাপন এবং বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মচারীদের মধ্যে সে ভাবের অনুপ্রেরণা নাই, সুতরাং বিধি অমান্য হওয়া স্বাভাবিক। কেবল ধর্ম্মশালা সম্বন্ধে নহে, সাধারণের উপকারার্থে স্থাপিত সকল প্রতিষ্ঠানেই ইহা হইয়া থাকে।

"যো স্থান খাস্‌কর মলমূত্র ত্যাগকে লিয়ে বনেহৈ উস্‌কে সিওয়া দুসরে স্থান্‌মে কোই মলমূত্র ত্যাগ নহি কর সকেঙ্গে।" "থুক্‌না বা মলমূত্র কর্‌না ধর্ম্মশালামে অঙ্গনমে বর্ত্তন মাজনা মিট্টিসে হাত্‌ধোনা" যদিও নিষিদ্ধ কিন্তু হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীগণ এই বিধিটী মোটেই পালন করে না। যত্র তত্র নিষ্ঠীবন ত্যাগ, মূত্রত্যাগ (রাত্রে) মলত্যাগ করিয়া ইহারা ধর্ম্মশালা অত্যন্ত অপরিষ্কার রাখে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মেথর অনেকবার ধর্ম্মশালা পরিষ্কার করে, কিন্তু পরিষ্কৃত রাখিতে পারে না। রাজনৈতিক কারণ যাহাই থাকুক, স্বাস্থ্যনৈতিক কারণেও কেনিয়া প্রবাসী ইংরাজেরা ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে এক বস্তিতে থাকিতে আপত্তি করিতে পারে।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

পরের ছেলে

(গল্প)

রয়াল টাইগারের মত আকৃতি-বিশিষ্ট, ন্যাজ কাণ কাটা কালু ও ভুলু নামক দুইটি বিপুলকায় সারমেয় সন্তান লইয়া মধু যখন তাহার বড়লোক মাসতুতো বোন নলিনীর অন্তঃপুরে পা দিল, ঝি বামুনের চারি পাঁচ যোড়া চোখের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে নলিনীকে যে একটু বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।

লজ্জার কারণ এইরূপ। নলিনী নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে। স্বামীর অসীম ঐশ্বর্য্যের গুরুভারে তাহার দারিদ্র্য কলঙ্ক অনেকদিন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ উল্কাপাতের ন্যায় এই গ্রাম্যজীবনটী নলিনীর ভ্রাতৃরূপে দেখা দিয়া তাহার লুপ্তব্যথা পুনরায় সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল।

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া মধু এতদিন বৃদ্ধা মাতামহীর কাছেই বড় হইতেছিল। কয়দিন হইল তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। বৃদ্ধা মৃত্যুকালে নলিনীর হাতে ধরিয়া নিরাশ্রয় ভাইটীকে আশ্রয় দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, সকালে মধু আজ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনবরত হাঁটিয়া মধুর পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত মেটে রাস্তায় সাদা ধুলার একটা পুরু পর্দ্দা জমিয়া গিয়াছিল। ক্ষার মাটী দিয়া পরিষ্কার করা পরিধানের ধুতিখানার অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত তাহার জের চলিয়াছিল। ক্ষুধায় এবং পিপাসায় তাহার মুখে চটকা ধরিতেছিল।

বাড়ী প্রবেশ করিয়াই মধু রোয়াকে উঠিবার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। সে তখন একটু বসিতে পাইলে বাঁচে।

বাড়ীভরা অপরিচিত লোকের মুখের দিকে চাহিয়া মধুর কান্না আসিতে লাগিল। কাহারও কাছে একটু জল চাহিতে তাহার সাহস হইল না। দিদিমার কাছে

মধু অবাধে দিদির সহিত কথা কহিতে পারিত, কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে যেন লজ্জা করিতে লাগিল।

অল্প কথায় আলাপ সারিয়া নলিনী ঝিয়ের উপর মধুর স্নান আহারের ভার দিয়া উপরে চলিয়া গেল।

যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত মধু গামছাখানি হাতে লইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াই "মাগো" বলিয়া পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল। তাহার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত জমিয়া যেন একখানা হইয়া গিয়াছিল। পায়ের বৃহৎ ফাট দিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বাহির হইতেছিল।

ঝি বলিয়া উঠিল, "আ, আমার কপাল, একখানা গরুর গাড়ীও কি জোটে নি? ছেলে মানুষ কি এত পথ হাঁটতে পারে গা? দেশের লোক কি সব মরে ছিল?"

যে প্রতিবেশী স্ত্রীলোকটী সঙ্গে আসিয়াছিল, ঝির এই কথায় সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "দেশের লোক মরবে কেন গা? তোমরাও ত ছেলের দিদি ছিলে—গাড়ী ত গাড়ী, একটা লোকও ত জুঠে ওঠে নি।"

উভয় পক্ষের যুদ্ধ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীর অন্যান্য ঝিও তাহাতে যোগ দিল। মধু মাঝখানে পড়িয়া সকলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল।

হঠাৎ পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। ঘর হইতে একটা স্বর শোনা গেল, "কি রে এলো, কি হয়েছে?"

সাড়া পাইবামাত্র ঝিদের মুখের কথা মুখেই মিলাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি সকলে আপন আপন কাযে চলিয়া গেল। কেবল এলোকেশী মধুর গামছাখানি উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হইতে যিনি বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি এই বাড়ীরই বিধবা বড় বধূ; নাম রাজলক্ষ্মী। মধু এ বৎসর ঘোষালদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা দেখিয়াছিল। সিংহের উপর যে দেবীটী বসিয়া ছিলেন তাঁহারই মুখের মত এই রমণীর মুখখানি প্রসন্নগাম্ভীর্য্যে ভরা।

রমণী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত চেঁচামেচি কচ্ছিস কেন এলো?"

এলোকেশী নিতান্ত শান্তভাবে বলিল, "ছোট মায়ের ভাই এসেছে, তাকে খাবার জন্যে ডাকতে এসেছি।"

"ছোট বৌর ভাই? কে, মধু? ছোট বৌ কৈ?"

"এঁকে খেতে দিয়ে যেতে বলে তিনি ওপরের ঘরে গিয়েছেন।"

ভাদ্রমাসের মেঘের মত একটা কালো ছায়া রাজলক্ষ্মীর মুখের উপর ভাসিয়া উঠিয়া তখনই সরিয়া গেল। ধীরে ধীরে মধুর নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "উঠে এস মধু, ওখানে বসে কেন?"

প্রতিবেশী স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিল, "আর কি মা ওর উঠবার শক্তি আছে? ছেলেমানুষ—সমস্ত দিন হেঁটে হেঁটে পা দিয়ে রক্ত ঝুজিয়ে পড়ছে।"

রাজলক্ষ্মী মধুর পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটার কথা সত্য। তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি বুঝি মধুর সঙ্গে এসেছ?"

"হাঁ মা।"

"উঠানে দাঁড়িয়ে কেন মা, উঠে এস।" বলিয়া নিজে নামিয়া আসিয়া মধুর হাত ধরিয়া তাহাকে জোর করিয়া উঠাইয়া রোয়াকের উপর বসাইলেন। এলোকেশী কতকটা তেল ও জল গরম করিয়া আনিলে মধুকে স্নান করাইতে লাগিলেন। এলোকেশী প্রতিবেশী স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া স্নানাহারের জন্য লইয়া গেল।

স্নান শেষ হইলে রাজলক্ষ্মী মধুকে বুকের উপর সাপটিয়া ধরিয়া রান্নাঘরে লইয়া গিয়া একথালা ভাত লইয়া খাওয়াইতে বসিলেন।

সমস্ত দিন রৌদ্রে পুড়িয়া দীর্ঘপথ হাঁটিয়া আসায় মধুর শরীরটা ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। স্নানের পর পেটে ভাত পড়িবামাত্র অবসাদে তাহার দুই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত মধু একটিও কথা কহিতে পারে নাই। চারিদিকে নিষ্ঠুর ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে তদধিক

নিষ্ঠুর হৃদয় লইয়া লোকগুলা কেন যে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যে দিকে চাহে কেবল ঘরের পর ঘর, উপরে নীচে, সর্ব্বত্রই সেই এক ব্যবচ্ছেদহীন ইঁটের গাঁথনি। স্নেহ নাই, মমতা নাই, শান্তি নাই; কেবল কায, কেবল কায। মধু আপনাকে জেলের আসামীর মত বোধ করিতেছিল। ইচ্ছা করিলে এ গণ্ডীর বাহির হইবার তাহার উপায় নাই।

আহারের পর রান্না ঘরের বাহিরে আসিয়া মধু দেখিল কালু ও ভুলু থাবা পাতিয়া নিয়মিত ভাবে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

মধু করুণ নয়নে রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কুকুর দুটী তোমার মধু?" মধু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। অনতিবিলম্বে রাজলক্ষ্মীর আদেশ মত তাহাদের আহারের জন্য দৈনিক বরাদ্দের অপেক্ষা অনেক বেশী ভাত আসিয়া উপস্থিত হইল। কালু ও ভুলু নিত্য যেমন মধুর আগে পাছে ছুটিয়া সোৎসাহে আহার করে, আজ আহার্য্যের পরিমাণ অনেক অধিক হইলেও, অনিচ্ছায় যাইয়া দুই একবার মাত্র ছুঁইয়াই ফিরিয়া আসিয়া আপনার স্থানে বসিল।

রাজলক্ষ্মী মধুকে আপনার বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, পাশে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধু, তুমি হেঁটে এলে কেন? একখানা গাড়ী করলে ত এত কষ্ট পেতে না।"

মধু অতি অস্পষ্টস্বরে উত্তর দিল, "আমার যে কেউ নেই।"

রাজলক্ষ্মী মধুর অলক্ষ্যে মাথাটী ফিরাইয়া লইয়া, চোখে অঞ্চল দিলেন। করুণস্বরে বলিলেন, "আমি যে তোমার বড় দিদি, মধু।"

মধুর আপনার দিদির সঙ্গে সেই যা প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এতক্ষণের মধ্যে আর তাঁহার কোন সংবাদই পায় নাই। এই বড় দিদির সঞ্জীবন স্পর্শে কঠোর মরুভূমির মধ্যে সে এখন একটা সরস ওয়েসিসের আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। অকূল তরঙ্গ মধ্যে সে যে সামান্য তৃণ খণ্ডের আশ্রয় লাভ করিল, ইহারই উপর তাহার সমস্ত আশা ভরসা একেবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল। নব-জীবনের দুই একটা কথা ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতে নিদ্রা আসিয়া তাহার সমস্ত ভয় ভাবনা মুছিয়া দিয়া গেল।

২

সন্ধ্যার পর ঘুম ভাঙ্গিলে মধু চাহিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই। একখানা জমাট অন্ধকার ঘর জুড়িয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। সে আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া নীচের তলায় আসিতেই তাহার সঙ্গের সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মধু বলিল, "চল্ আমরা বাড়ী যাই।"

"কেন বাবু?"

"এখানে থাকা হবে না।"

"তুমি আর যেতে পারবে কেন?"

"না পারি, পথের দোকান খানায় একদিন থেকে যাব।"

"আচ্ছা তাই যেও"—বলিয়া স্ত্রীলোকটী তাহাকে এড়াইয়া চলিয়া গেল।

মধুর মত দুরন্ত ছেলে গ্রামে আর ছিল না। তাহার উপদ্রবে পাড়ার লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বাধীন প্রকৃতির চঞ্চল বালকের এই আড়ষ্টভাব দেখিয়া তাহার মনেও ক্ষণকালের জন্য একটু মায়ার সঞ্চার হইল।

এত বড় বাড়ীর মধ্যে মধু কোন্ খান হইতে কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে আলাপ জমাইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে অন্দরের বাহির হইয়া পুকুরের ধারে দাঁড়াইল। কোন্ দিক দিয়া পথে বাহির হইতে হইবে ভাবিতে লাগিল। উদার মুক্ত আকাশের তল না হইলে তাহার নিশ্বাস বাধিয়া যাইতেছিল। আজ সকাল হইতে একবারও তাহার তামাক খাওয়া হয় নাই। একটা সিগারেটও সহজে

মিলিবার উপায় নাই। তাহার সঙ্গে যে দুই চারিটা পয়সা ছিল তাহাই দিয়া সে এখন কিছু সিগারেট কিনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দোকান কোথায়?

এমন সময় তাহারই মত বয়সের একটী বালিকা পিতলের কলসী লইয়া জল লইতে পুকুর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধু অনুমানে তাহার পরিচয় পাইয়াছিল, সে এলোকেশীর কন্যা ক্ষান্ত।

ক্ষান্ত বলিয়া উঠিল, "মধুদা, তুমি এখানে একলা দাঁড়িয়ে যে?"

মধু কি উত্তর দিবে ভাবিতে লাগিল।

ক্ষান্তর এত শীঘ্র মধুর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। সে রোজ সকালে মায়ের সঙ্গে জমীদার বাড়ী আসে এবং রাত্রিতে ফিরিয়া যায়। তাহার জন্মাবধি সে ইহাই করিয়া আসিতেছে। মায়ের ছোট ছোট কাযে সাহায্য করা ব্যতীত এই সংসারে তাহার আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নাই। বাড়ীতে ছোট ছেলের মধ্যে নলিনীর পুত্র অতুল। ঝির মেয়ের সঙ্গে মিশিবার ক্ষমতা তাহার কোন মতেই নাই। আজ হঠাৎ তাহারই মত অবস্থাপন্ন একটী নবাগত জীবকে পাইয়া, কতক্ষণে তাহাকে আপনার করিয়া লইবে তাহারই চেষ্টায় সে এতক্ষণ ঘুরিতেছিল। মধুকে নির্জ্জনে পাইয়া, ক্ষান্তর মুখে হাসি উথলিয়া উঠিল।

মধুর কোন উত্তর না পাইয়া ক্ষান্ত আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথাও যাবে মধুদা?"

মধু সাহস পাইয়া বলিল, "এখানে দোকান কোথায় রে?"

"ঐ যে নরেন মুদীর দোকান, বাইরে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি জল কলসীটা মাকে দিয়ে এসে তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

ক্ষান্ত পিতলের কলসীতে জল ভরিয়া লইয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, "এস মধু দা।"

মধু ক্ষান্তর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। বাটীর বাহিরে আসিয়া মধু হাঁফ ছাড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, এ তাহাদেরই মত গ্রাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের চালগুলা এক একটা ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে। মস্ত এঁদো পুকুরের ধারে একটা জীর্ণ অশ্বত্থ গাছ সহস্র শাখাবাহু বিস্তার করিয়া অতীতের সাক্ষী স্বরূপ হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই পাশ দিয়া রাজ্যের ধুলা গায়ে মাখিয়া গ্রাম্য পথখানি পড়িয়া আছে। একটা রাখাল বালক সমস্ত দিনের পর ছুটি পাইয়া দীর্ঘসুরে যাত্রার গান ধরিয়া বাড়ী যাইতেছে।

ক্ষান্ত বলিল, "এই যে দোকান, মধু দা কি নেবে?"

মধু দোকানে যাইয়া চারি পয়সার সিগেরেট কিনিয়া চুপ চুপি ক্ষান্তর কাছে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে সিগারেট খেলে কেউ কিছু বলবে না ত?"

অতুলের বইএর মধ্যে একদিন একটুকরা সিগারেট পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া নলিনী তাহার যেবিধমত শাসন করিয়াছিল ক্ষান্তর তাহাই মনে পড়িয়া গেল। ভাবিয়া দেখিল এত প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়াটা তাহার পক্ষেও নিতান্ত সহজ ব্যাপার না হইতে পারে। চুপি চুপি বলিল, "আমাদের বাড়ী চল না কেন মধুদা।"

"তোদের বাড়ী কোথায়?"

"ঐ যে আমাদের ঘর দেখা যাচ্ছে।" মধু ক্ষান্তর সহিত তাহাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। একখানি মেটে ঘর ক্ষান্তর মায়ের বাড়ী। উঠান হইতে দেওয়াল পর্য্যন্ত নিকানো। উঠানের এক পাশে একটু শাকের জমী। পুঁইলতা ও লাউগাছে চালখানি ঢাকা।

ক্ষান্তর বাড়ী পৌঁছিয়াই মধু দেখিল বাহিরে দুই চারিটা হুঁকা সাজান। নিকটেই তামাক ও সাজিবার সরঞ্জাম প্রস্তুত। ক্ষুধাহত কুকুরের মত মধু সেই হুঁকার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তামাক সংগ্রহ করিয়া চকমকি ঠুকিতে বসিয়া গেল। পুরুষ হীন এই বাড়ীতে এত হুঁকার বাড়াবাড়ী কেন, মধু তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না।

ক্ষান্ত না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল মধুদা, তুমি তামাক খাও ?"

মধু বলিল, "চুপ কর্, দিদিকে যেন একথা বলিস্‌নে। আমি রোজ এই খানে এসে তামাক খেয়ে যাব। তোর মা বুঝি তামাক খায় ?"

ক্ষান্ত চুপ করিয়া রহিল।

মধু আবার বলিল, "চুপ ক'রে রইলি যে ? আমাদের গাঁয়ের বিন্দি পিসীও তামাক খায়।"

সে ক্ষান্তকে বুঝাইতে চাহিল যে স্ত্রীলোকের পক্ষে তামাক খাওয়াটা যদিও সদাচারের লক্ষণ নয়, তথাপি অপরে যখন সে কায করিয়া থাকে, তখন ক্ষান্তর মায়ের এই ব্যাপারটা গর্হিত হইলেও অতি সহজেই ক্ষমা করিতে পারা যায়।

ক্ষান্ত জানিত তাহার মা তামাক ব্যবহার করে না, কিন্তু মায়ের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে আদৌ কোন চেষ্টা করিল না। তামাক খাওয়ার অপেক্ষা আরও গুরুতর লজ্জাকর ব্যাপার যে এই হুঁকাগুলির সহিত জড়িত ছিল তাহা প্রকাশ করিতে ক্ষান্তর মত নিরীহ শিশুর প্রাণেও সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল।

অধিক বিলম্ব হইলে বড় দিদির কৈফিয়তে পড়িতে হইবে জানিয়া মধু তাড়াতাড়ি তামাক খাওয়া শেষ করিয়া ক্ষান্তর সহিত ফিরিয়া চলিল।

৩

প্রত্যুষে উঠিয়া মধু সমস্ত বাড়ী খানা একবার ঘুড়িয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেই অপরিচিত বৃহৎ বাড়ী খানার কোথায় কি আছে মধু একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিল। বাড়ীর চাকর, বামুন, পাইক পেয়াদা সকলের সঙ্গেই মুহূর্ত্ত মধ্যে আলাপ জমাইয়া লইয়া, কালু ও ভুলুকে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। দুইটী অজ্ঞাত কুলশীল সমর্থ কুটুম্বকে দেখিয়া গ্রামের ছোট বড় যাবতীয় কুকুর-নন্দনগুলি সঙ্গত মত দূরে থাকিয়া শ্রবণবিদারী তীক্ষ্ণ চীৎকারে সমস্ত গ্রাম খানি মুখর করিয়া তুলিল। মধ্যে মধ্যে মধুর ইঙ্গিতে কালু ও ভুলু তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া তাহাদিগকে গ্রামপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে লাগিল। পথের ধূলায় প্রভাতের আকাশ মলিন হইয়া উঠিল। গ্রামের অনেক ছেলে মধুর এই আনন্দে যোগ দিবার জন্য ছুটিয়া আসিল।

হঠাৎ উপরের দিকে চোখ পড়ায় মধু দেখিতে পাইল, রাজলক্ষ্মী উপরের ঘর হইতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন। তাহার সমস্ত উৎসাহ এককালে নিবিয়া গেল, গ্রামের ছেলেদের বিদায় দিয়া মধু সশিষ্য বাড়ী প্রবেশ করিল। অন্দরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই অতুলের সহিত মধুর সাক্ষাৎ হইল। অতুল মধুর অপেক্ষা বয়সে ছোট। একখানি ধোলাই করা কোঁচান শান্তিপুরে ধুতির উপর একটা মিহি পাঞ্জাবী পরিয়া এবং এক যোড়া নূতন ইংলিশ বার্ণিশ চটিজুতা পায়ে দিয়া অতুল মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়িতে যাইতেছিল। লম্বা পাঞ্জাবীর ভিতর হইতে গোলাপী গঞ্জি ফ্রকের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। মধু মাতামহীর বাড়ীতে থাকিতে অতুল দুই একবার মায়ের সঙ্গে তথায় গিয়াছিল। তখনই উভয়ের মধ্যে আলাপ হইয়া গিয়াছিল।

মধু একমুখ হাসিয়া বলিল, "কিরে অতুল, কোথায় চলেছিস্ ?"

"মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়তে যাচ্ছি; তুমি কাল কোথায় ছিলে ?"

"বড় দিদির কাছে"—বলিয়া খপ্ করিয়া অতুলের বই ক'খানা কাড়িয়া লইয়া ছবি খুঁজিতে লাগিল। অতুল একটু বিরক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা অসভ্য ত! এখুনি কাপড় চোপড় সব ময়লা ক'রে ফেলেছিলে।"

মধু বিস্ফারিত নয়নে অতুলের দিকে চাহিয়া, বই ক'খানা ছুঁড়িয়া তাহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া রাগে অপমানে ফুলিতে ফুলিতে অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যে বলিয়া উঠিল—"বাঃ ভারি সাহেবের বাচ্চা রে!"

অতুলের প্রত্যুত্তর শুনিবার আগেই মধু চলিয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র মনটা বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহাদের গ্রামের অতি বড় দুর্দ্দান্ত ছেলেও অবাধ্য হইবার সাহস করিতে পারিত না। ছেলেদের সর্দ্দার রূপেই সে এতদিন হুকুম চালাইয়া আসিয়াছে। ক্ষীণ-প্রাণ এতটুকু অতুল যে তাহাকে ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল ইহা একেবারেই তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

অন্দরে প্রবেশ করিতেই মধু তাহার বড় দিদির সামনেই পড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মী স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধু সকালে আমাকে না বলে কোথা গিয়া-গিয়েছিলে?"

অতুলের ঘৃণায় মধুর চিরস্বাধীন অন্তঃকরণে যে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বড়দিদির স্নেহবারি নিক্ষেপে তাহা দুই একবার ফোঁস ফোঁস করিয়া নিভিয়া গেল। চোখ দুইটা জলে টন টন করিয়া উঠিল; রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

অতুল ও মধুর মধ্যে সে ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী তাহা সমস্তই দেখিয়াছিলেন। সৌভাগ্যগর্ব্ব নিতান্ত কচি শিশুর প্রাণেও কিরূপ বিষ সঞ্চার করিতে পারে ভাবিয়া তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। অতুল এই বয়সে তাহার শিক্ষার দোষে জ্যেষ্ঠের অকৃত্রিম স্নেহবন্ধনকে তুচ্ছভাবে পদদলিত করিয়া আপনার হৃদয় খানাকে কেমন করিয়া পাষাণ করিয়া তুলিতেছিল, রাজলক্ষ্মীর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। নিজের সন্তান হইলে রাজলক্ষ্মী আজ তাহাকে কোন মতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না। দুই একবার কর্ত্তব্য বোধে অতুলকে দুই চারিটী অযাচিত উপদেশ দিতে গিয়া তাহার মায়ের কাছে রাজলক্ষ্মী কিরূপ অপদস্থ হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া তিনি এক মাত্র বংশধরের ঔদ্ধত্যকে সহ্য করিয়া লইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মধু ছোট ভাইয়ের অবজ্ঞায় কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহার মনে একটা দারুণ লজ্জা ও ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হইল।

মধুকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ছি, মধু, তুমি দুঃখ ক'রনা, তোমাকে বই কিনে দিচ্ছি, পড়বে?"

মধুর মাতামহী অনেক বার তাহার কাছে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই তাহাকে সম্মত করাইতে পারেন নাই। দিন কতকের জন্য সে বটকৃষ্ণ মজুমদারের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা লেখাপড়া শিখিবার জন্য নয়; তাহার সঙ্গীদের অনুরোধে গুরুমহাশয়কে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে।

রাজলক্ষ্মীর প্রস্তাবেই মধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। রাজলক্ষ্মী নিজের পেটরা হইতে একখানা ধুতি ও একটা জামা আনিয়া মধুর গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন।

নূতন জামা কাপড় পরিয়া মধু একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। জোরে হাঁটিতে গেলেই কোঁচাটা বার বার পায়ে জড়াইয়া যায়; বসিয়া উঠিতে গেলেই তাহাতে পায়ের চাপ পড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম করে। যোগ-নিষ্ঠ সন্ন্যাসীর মত মাথাটা সর্ব্বদা খাড়া করিয়া না রাখিলে জামার গলার শক্ত কলারটা ভাঙ্গিয়া বিশ্রী হইয়া যায়। হাত নাড়িতে হিসাবের ভুল হইলেই হাতের কফে তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। সরল স্বাধীন গ্রাম্য নগ্নতাকে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য বোধের বিধিবদ্ধ নিয়মের আবদার গুলাকে অনাবশ্যক প্রশ্রয় দিবার সার্থকতা কি এবং সজীব অঙ্গ গুলির প্রকৃতিদত্ত সঞ্চালন ক্ষমতাকে জড় কোমল বস্ত্র খণ্ডের বত্রিশ বন্ধনের নিকট অবনতি স্বীকার করাইয়া মানুষ গৌরব বোধ করে কেন মধু তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে বাহিরে আসিতেই নলিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মধুর বেশ দেখিয়া নলিনী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। মৃদু হাসি ঠোঁট চাপিয়া বলিল "কিরে মধু, বেশ বাবু হয়েছিস যে দেখছি।"

মধু লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার বড় দিদি কি বিদ্রূপ করিবার জন্য এইরূপে তাহাকে সাজাইয়া দিয়াছেন? সে ত একবারের জন্যও জামা কাপড় চাহে নাই। তাহার সেই খাট বহরের মলিন বস্ত্রখানা কোমরে জড়াইয়া সে যে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে পারিত। সোনার

শৃঙ্খলে বাঁধিয়া বনের হাতীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি ছিল? মাথা নামাইয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "বড় দিদি পরিয়ে দিয়েছেন।"

"বড় দিদি! তবে আর ভাবনা কি? খুব বড় পায়া পেয়েছিস্ দেখছি। তাই বলি কাল থেকে আর মধুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা কেন?"

বড় দিদির আশ্রয় গ্রহণটা যে মধুর পক্ষে খুব দোষের হইয়াছে সে এতক্ষণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে ত বড় দিদিকে চিনিত না; তিনিই ত আদর করিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। শান্ত স্বরে উত্তর দিল, "আমি এগুলো ত পরিতে চাই নি।"

"বেশ করেছিস্; এক কায কর দেখি, কতকগুলো কাঁচা তেঁতুল পেড়ে নিয়ে আস্তে পারিস্?"

মধু সোৎসাহে বলিল, "হ্যাঁ, বাইরের গাছে মেলা তেঁতুল ধরে আছে. আমি এক্ষুণি নিয়ে আস্‌ছি!"

বড় দিদির দেওয়া জামা কাপড় গুলি খুলিয়া ফেলিয়া আপনার ময়লা কাপড় খানা পরিয়া মধু দে ছুট্।

ঘণ্টা খানেক পরে রাজলক্ষ্মী যখন অতুল ও তার ছোট বোনটীকে জল খাওয়াইতে বসিয়াছিলেন, মধু এক আঁচল তেঁতুল লইয়া চীৎকার করিয়া বাড়ী প্রবেশ করিল, "ছোট দি, কত তেঁতুল এনেছি দেখ।"

সম্মুখে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়; হঠাৎ বড় দিদির সম্মুখে পড়িয়া মধু তেমনি একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। আঁচলের তেঁতুল গুলা মাটীতে পড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোকে তেঁতুল আন্‌তে বল্লে মধু?"

মধুর কথা বাহির হইল না। বড় দিদির আশ্রয় লইয়া সে ছোট দিদির কাছে যে অপরাধ করিয়াছে, আজ প্রচুর তেঁতুল পাড়িয়া দিয়া তাহার ক্ষালন করিয়া ফেলিবে এই তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা হইয়া দাঁড়াইল অন্য প্রকার।

রাজলক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন গাছে উঠিয়া তেঁতুল পাড়িবার মত অসম সাহসিক কাযে মধুকে কে নিয়োজিত করিয়াছিল। গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ছোট বৌ, তোমার কি একটু আক্কেল নেই? মধুকে বলছ তেঁতুল পাড়তে, ওকি তোমার বাড়ীর একটা চাকর?"

নলিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া অম্লান বদনে বলিয়া উঠিল, "তোমার দিব্যি দিদি, মধুকে আমি তেঁতুল পাড়তে বলিনি। ওকে আমি মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়তে যেতে বলেছিলাম—নারে মধু?"

মধু ছোট দিদির সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্ম তিনি যে চট করিয়া তাহাকেই সাক্ষী মানিয়া ফেলিলেন ইহা দেখিয়া সে মনে মনে ছোট দিদির উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

"মিছে কথা ব'লনা ছোট বৌ" বলিয়া রাজলক্ষ্মী উঠিয়া হাত ধুইয়া, নলিনীকে ছেলেদিগকে খাওয়াইবার ভাত দিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে মধুর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

অন্য কেহ হইলে নলিনী তাহাকে বেশ দশ কথা না শুনাইয়া ছাড়িত না। সে কাহারও কথা সহ্য করিয়া থাকিবার লোক নহে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী বড় ঘরের মেয়ে। বিপুল ধন সম্পত্তি লইয়া শ্বশুর ঘর করিতে আসিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিলে বাপের ও স্বামীর ঘরের সম্পত্তি লইয়া যখন ইচ্ছা সরিয়া পড়িতে পারেন—রাজলক্ষ্মী কখনও কথায় বা ব্যবহারে তাহার আভাষ মাত্র না দিলেও—নলিনী ও তাহার স্বামী মহিমকে এই ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত। সুতরাং তাঁহার কথার উপর কথা কহিবার সাধ্য সংসারে কাহারও ছিল না।

৪

এইরূপে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে মধুর মন শক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। ন্যায় সঙ্গত সূক্ষ্ম বিচার করিবার ক্ষমতা তাহার আপনা হইতে যোগাইতে লাগিল। একান্ত নিরাশ্রয় হইয়া সে যে আশ্রয় অবলম্বন করিতে

আসিয়াছিল, অনেকদিন পুর্ব্বেই তাহার আশা ছাড়িয়া তাহাকে স্থানান্তর অন্বেষণ করিতে হইত, যদি না এই বড় দিদি তাহার আপনার জন হইয়া দাঁড়াইতেন। মধু অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিয়া লইল বড়দিদি শুধু আশ্রয় নন, এত বড় সংসারটা অবলম্বন করিয়া ছোট বড় যে যেখানে আছে সকলের উপরেই তাঁহার প্রভুত কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান। তাঁহার কথাই বেদবাক্য। ভয়ে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় তাঁহার কথায় মাথা হেলাইবার সাধ্য কাহারও নাই!

এতদিন মধু ছোটদিদির মনরক্ষার জন্য তাঁহার ছোট মেয়েটীর বাহনের কায হইতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী বাজার হইতে সস্তাদরে উল কাঁটা কিনিয়া আনা পর্য্যন্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি কার্য্যগুলি বড়দিদির অগোচরে করিয়া যাইত। কিন্তু ফরমাইসের সংখ্যা যখন সীমা ছাড়াইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যখন সেগুলি সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হওয়া কঠিন হইয়া পড়িল তখন মধু একদিন ছোটদিদির অনুকম্পার ভিখারী হইয়া তাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইল।

"সস্তা বাজারের উপলক্ষ করিয়া মধু এতদিন তাঁহার অনেক পয়সা অবৈধভাবে হস্তগত করিয়াছে এবং তাঁহারই অন্নে পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই অবজ্ঞা করিয়া হীনজনোচিত অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান মধুর মত লোকের পক্ষেই সম্ভব"—এইরূপ বাছা বাছা তীক্ষ্ণ বাণগুলি যখন বিনিময়ে মধুর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহার কঠিন প্রাণ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অতুল মহিম প্রভৃতি ছোদদির সম্পর্কীয় সকলের উপরেই তাহার মন ঘৃণায় বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সে কখনও আর ছোটদিদির ছায়া মাড়াইবে না।

ছোট দিদির হাত হইতে মুক্তি পাইয়া তাহার আর এক বিপদ হইল। দিনের অধিকাংশ সময়ই সে বাজার হাট এবং নলিনীর ছেটে মেয়েটিকে লইয়া এক প্রকারে কাটাইয়া দিত। কিন্তু এখন হাতে আদৌ কোন কায না থাকায় তাহার পক্ষে দীর্ঘ দিনগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর কান্তকে একাকী পাইয়া মধু বলিল, "আমি কাল চলে যাব।" কান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চলে যাবে মধু দা?"

"বাড়ী।"

"কেন?"

"এখানে মন টিকছে না।"

কেন যে মধুর প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে সমস্ত দিন এই বাড়ীতে বাস করিয়া কান্ত তাহা বেশ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। এই নিরবলম্বন প্রাণী দুইটীর মধ্যে উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া কেমন একটু আনন্দ বোধ করিতেছিল। মধুর এইরূপ উক্তি শুনিয়া কান্তর শিশু হৃদয়ের কোন নিভৃত অংশে গুরুতররূপে আঘাত লাগিল। তাহার চোখ দিয়া বড় বড় দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মধু কান্তর ডান হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুই কাঁদচিস্ কান্ত?"

"তুমি কেন চলে যাবে?"

"আচ্ছা যাব না, যা।"

"আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।"

"আমি কি মিছে কথা বলি।"

দুজনে আস্তে আস্তে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পুকুরের ধারের বৃহৎ অশ্বত্থ গাছের যে শিকড়টা বর্ষার জলে ধুইয়া উচু হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই উপর বসিয়া পড়িল।

কান্ত বলিল, "মধুদা, তুমি এক ডুবে এই পুকুরটা পার হয়ে যেতে পার?"

মধু সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "ওঃ এমন তিনটে পুকুরের সমান, জলধর দীঘিটা আমি এক ডুবে পার হয়েছি।"

"সত্যি?"

মধু প্রবীণের মত মাথা হেলাইয়া জানাইল, সত্য। গ্রামের রাখাল বাগ্দীর মত জোয়ান তিন ডুবেও যাহা পারে নাই, মধুর মত ছেলেমানুষ তাহা এত সহজে করিতে পারে তাহা মনে করিয়া কান্তর মনটা আনন্দে গর্ব্বে মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

মধু বলিল, "কান্ত, কাল থেকে আমাকে ইস্কুলে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"বড় দিদি যে বলেছেন।"

"তা ইস্কুলে যেও, সবাই যায়।"

"আমি যে ততক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারব না।"

"ইস্কুল গেলেই অভ্যাস হয়ে যাবে।"

অতুল বৈকালে বাড়ীর একটা বৃদ্ধ চাকরের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার সময় সে এইখানে আসিয়া পড়িল। ক্ষান্ত ও মধুকে এক সঙ্গে থাকিতে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে যাহাতে ক্ষান্তর সহিত মিশিতে না পারে তাহার জন্ত তাহার মা সময়ে অসময়ে কত প্রকারে শাসন করিয়াছেন। মধু সে কথা সমস্তই জানে, অথচ কোন্ সাহসে সে এরূপ প্রকাশ্য স্থানে ক্ষান্তর সঙ্গে বসিয়া থাকিতে পারে অতুল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মাকে বলিয়া দিয়া মধুকে বিধিমত ভর্ৎসনা করাইবার নিষ্ঠুর আনন্দে তাহার মন পুলকিত হইয়া উঠিল। বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাঃ মধুদা, বেশ!"

মধু কপালটা কুঞ্চিত করিয়া বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

"বাড়ী এস একবার, মাকে বলে মজা দেখাচ্ছি।"

মধু মুখখানা আরও বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "যা যা বলগে যা, তোর মা ভারি জজ হয়েছে কি না, ছুঁচো!"

অতুল আশা করিয়াছিল মধুকে একটু খোসামোদ করাইয়া ছাড়িবে। কিন্তু তাহার মায়ের নামে ভয় পাওয়া দূরে থাক, মধু যে তাঁহাকে এতদূর অবজ্ঞা দেখাইতে পারে তাহাই দেখিয়া অতুল একেবারে অবাক হইয়া গেল।

এত বড় সংসারের সে একমাত্র বংশধর। বড় লোকের বংশধরের চাল চলন ভাবভঙ্গী যেমনটুকু হইয়া থাকে, অতুলের তাহার কোন অভাব ছিল না। সাজ পোষাক অতিরিক্ত রকমেরই ছিল। গ্রাম্য স্কুল আট বেহারার পাল্কী হইতে অতুল যখন নামিত, এবং চাপকান পাগড়ী পড়া চাপরাশী যখন তাহার পিছনে পিছনে বইগুলি ক্লাশে পৌঁছাইয়া দিত, তখন স্কুলের ছেলেরা হইতে শিক্ষকগুলিও অতুলের সাধা' গম্ভীর পদক্ষেপ দেখিয়া বিস্ময় না মানিয়া থাকিতে পারিত না। সহপাঠী বালকদের কাছে সে এতদিন পদোচিত মর্য্যাদাই পাইয়া আসিয়াছে। লাটু ঘুড়ির আশায় কত বালক দিন রাত্রি তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিত। বই পেন্সিলের লোভে পাড়ার ছেলেরা নিত্যই তাহার মুখ চাহিয়া থাকিত। তাহার উপর কেহ যে জোরে কথা কহিতে পারে অতুল তাহা আজ প্রথম দেখিল। একদিন গ্রামের একটা দুষ্ট ছেলে নাকি খেলা করিতে করিতে অতুলকে কি একটা কর্কশ কথা বলিয়াছিল, অতুলের মায়ের অনুরোধে মহিম সেই বালকের পিতার দশ টাকা জরিবানা করিয়া তবে তাহাকে গ্রামে বাস করিতে দিয়াছিলেন। মধুর এত বড় স্পর্দ্ধা অতুলের মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল। হয়ত মধুর সামান্য অবনতি স্বীকারে অতুলের এত বড় অভিমান কাটিয়া যাইতে পারিত, মধুও নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। কিন্তু তাহার মন আগে হইতেই অতুলের উপর বিরূপ হইয়া ছিল, তাহার উপর কনিষ্ঠের এতদূর দাম্ভিকতা প্রকাশ মধুর অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই সে অতুলের মুখের উপর জবাবটা দিয়া ফেলিয়াছিল।

অতুল যখন মুখখানা কালো করিয়া ফিরিয়া চলিল তখন ক্ষান্তর মনে বেশ একটু ভয়ের সঞ্চার হইল।

সে জানিত মধু সহজে দমিবার পাত্র নহে। অতুল এই ব্যাপার লইয়া গোলযোগ বাধাইলে মধুও তাহার প্রতিশোধ না লইয়া সহজে ছাড়িবে না। হয়ত এই উপলক্ষে মধুর এখানে বাসও উঠিতে পারে। অতুল চলিয়া গেলে সে মধুকে বলিল, "মধুদা, খোকা বাবুকে ডাকব ?"

মধু জোরে উত্তর করিল, "নাঃ।"

৫

রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মধু

কোন নূতন ব্যাপারের সন্ধান পাইল না। রাজলক্ষ্মীও আহার করাইবার সময় কোন কথা বলিলেন না। মধু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে গেল। সকালে উঠিতেই মহিমের নিকট তাহার ডাক পড়িল। এবাড়ী আসিবার পর মহিমের সহিত মধুর অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কেবল মাত্র সংক্ষিপ্ত আলাপ ছাড়া অন্য কথার বিনিময় উভয়ের মধ্যে হইবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। আজ হঠাৎ মহিমের তলব পড়ায় মধুর সন্দেহ হইল, অতুলের ব্যাপারটা বোধ হয় ভিতরে ভিতরে মহিমের নিকট পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। মধু নিজের অপরাধটা একবার বড় করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এমন ব্যাপার তাহার মধ্যে কিছু পাইল না যাহাতে সে মাথা তুলিয়া মহিমের নিকট উপস্থিত হইতে না পারে।

একটু বেলা হইলে মধু মহিমের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। মহিম জনকত বন্ধুবান্ধব লইয়া চা খাইতেছিলেন। মধু উপস্থিত হইবা মাত্র বন্ধুগণের মধ্যে একটু চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইতে লাগিল। সকলেই মধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেখিয়াই মধু বুঝিতে পারিল যে ইতিপূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সে স্থির হইয়া বলিল, "জামাই বাবু, আমায় ডেকেছেন?"

মহিম চায়ের বাটী হইতে মুখ তুলিয়া মধুর দিকে একবার চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ডাকিলেন, "ফ্যালা।"

মহিমের খাস চাকর ফ্যালারাম হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইল।

"টুপীটা নিয়ে আয়।"

মধু ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল অতুল পাশের বারান্দায় মাষ্টার মহাশয়ের নিকট একখানা চেয়ারে বসিয়া বই খুলিয়া মুখ ঢাকিয়া হাসিতেছে। কৌতুক দেখিবার আশায় তাহার চোখ দুটী অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ ফ্যালারাম পশ্চাৎ দিক হইতে একটা কাবুলী-ওয়ালার মত কাগজের টুপী আনিয়া মধুর মাথায় বসাইয়া দিল। মহিম ও বন্ধুগণ হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। একজন বন্ধু বলিল, "ঠাট্টাটা কুটুম্বের মতই হ'ল।"

এক মুহূর্ত্তে মধু আপনার মূর্ত্তিখানা কল্পনা করিয়া লইল। অতুলের সম্মুখে তাহার এই অপমানে লজ্জায় তাহার মাথা ঝুলিয়া পড়িল। টুপীটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমি আপনার কি করেছি, মহিম বাবু?"

মহিম গর্জ্জন করিয়া ফ্যালাকে বলিলেন, "ধর্‌ত শূয়োরটার কাণে, সাতবার ঘোড়্‌দৌড় করা।"

তাড়া পাইলে কেউটে সাপ যেমন ফণা বিস্তার করিয়া মাথা তুলিয়া উঠে, মধু কট্ মট্ চোখে তেমনি ফ্যালারামের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ফের হারামজাদা, এক পা নড়েছ কি তোমার জান নিয়ে ছেড়েছি।"

ফ্যালারাম মহিমের খাস চাকর। মনিবের সমস্ত গুহ্য কর্ম্মের সে একমাত্র সহায়; সুতরাং সেই বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। চাকর ঝির বাহাল বরতরফের মালিকই সে। মনিবের সঙ্গে তাহার প্রায় ইয়ার্কির সম্বন্ধ। তাহাকে 'হারামজাদা' বলিয়া কেহ নির্ব্বিঘ্নে এবাড়ীতে বাস করিতে পারে ইহা ফ্যালারাম কখন ভাবিতেই পারে নাই। তাহার প্রচ্ছন্ন সম্মানে এইরূপে আঘাত লাগায় সে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মধুকে নখে করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও তাহার রাগের শান্তি হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু মধুর নিকট অগ্রসর হইতেও তাহার সাহস হইল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জিতে লাগিল।

মহিমের বন্ধুগণ ইতিমধ্যে চা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া মধুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ বীভৎস রসিকতা আরম্ভ করিল। একজন ছিন্ন টুপীটা কুড়াইয়া আনিয়া মধুর মাথায় চাপাইয়া দিয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "নাচরে আমার সাধের ভালুক—"

উত্তেজিত মধু লোকটার গালে ঠাস্ করিয়া একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া, ছুটিয়া বৈঠকখানার বাহিরে দাঁড়াইল। মহিম ঘরের মধ্য হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন—"পাকড়াও পাকড়াও।"

মধু ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে বিজয়ী বীরের ন্যায় সদর্প পদক্ষেপে চলিয়া গেল!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

বৈদেশিকী

চীনের ভবিষ্যৎ

"The Problem of China" by Bertrand Russell, Author of "Introduction to Mathematical Philosophy," "Roads to Freedom," "Principles of Social Reconstruction" &c. PP. 260. 7s. 6d.

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বার্ট্রাণ্ড রাসেল কিছুকাল চীন-দেশের রাজধানী পিকিং নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার ধারণা এই যে, মানবজাতির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ চল্লিশ কোটী লোকের যে দেশে বাস, এখন অক্ষম ও দরিদ্র হইলেও, সেই চীনের হস্তে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ন্যস্ত রহিয়াছে। বোমা, বিষাক্ত গ্যাস, টর্পিডো ইত্যাদির প্রভাবে, বর্ত্তমান সমর-বিলাসী সভ্য জাতিরা এক শতাব্দীর মধ্যে ভবলীলা সমাপ্ত করিলে চীনাম্যান তাহাদের স্থান অধিকার করিবে। ("The civilized nations of the world, with their poison gas, their bombs, submarines and negro armies, will probably destroy each other within the next hundred years, leaving the stage to those, whose pacifism has kept them alive, though poor and powerless.")। অনেক বৎসর ধরিয়া য়ুরোপ যে নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছে, তৎপুণ্যফলে ঐ মহাদেশ ছিন্নমস্তা দেবীর পীঠস্থানে পূর্ণ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থকার বলেন যে, উদ্ধত প্রতীচ্য যদি প্রাচ্য প্রজ্ঞার নিকট মস্তক অবনত না করে, তাহা হইলে তাহার সমূলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

মিসর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন চীন সাম্রাজ্য দেখিয়াছে, কিন্তু প্রায় তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া উহা মরিয়াও মরে নাই। চৌ (Chou) বংশ খৃষ্টপূর্ব্ব ১১২২ হইতে ২৪৯ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। Shih Huang Ti নামক সম্রাট্ খৃষ্টপূর্ব্ব ২২১ হইতে ২১০ অব্দ পর্য্যন্ত মধ্য ও পূর্ব্ব এসিয়ায় অপ্রতিহত প্রভাব প্রদর্শন করেন। হান (Han) বংশের রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২০৬ হইতে ২২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ে ভারতবর্ষ ও রোম সাম্রাজ্যের সহিত চীন দেশীয় পণ্ডিত ও পরিব্রাজক-গণের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনদেশের সাহিত্য জীবনে অমৃতধারা সেচন করিয়াছে। ট্যাং (Tang) বংশের রাজত্বকাল ৬১৮ হইতে ৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সাং (Sung) গোষ্ঠীর রাজত্বকাল ৯৬০ হইতে ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইহার পর মিং (Ming) দিগের প্রভাব ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তৎপরে মাঞ্চু (Manchu) দিগের উত্থান ও পতন ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তদবধি গণতন্ত্র শাসন প্রণালী চলিতেছে।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড-রাজ তৃতীয় জর্জ্জ সুপণ্ডিত চীন সম্রাট Chien Lung এর নিকট লর্ড ম্যাকার্টনীকে (Macartney) দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। চীন-

সম্রাট যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার আরম্ভ এইরূপ :— "হে রাজন্, আপনি অনেক সমুদ্রের পরপারে বাস করেন, তথাপি আমাদের সভ্যতার সুফল ভোগেচ্ছায় প্রলুব্ধ হইয়া, কয়েকজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা নম্রভাবে আপনার আবেদন মৎসমীপে আনয়ন করিয়াছেন। আমার প্রতি আপনার ভক্তি দর্শনার্থ, আপনার দেশের কতকগুলি দ্রব্য নৈবেদ্যস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আপনার আবেদন-পত্র পাঠ করিয়াছি। ("You, O King, live beyond the confines of many seas, nevertheless impelled by your earnest desire to partake of the benefits of our civilization, you have despatched a mission, respectfully bearing your memorial. To show your devotion, you have also sent offerings of your country's produce. I have read your memorial.")। উক্ত ইংরাজ রাজদূতকে কথিত চীন সম্রাট আজ্ঞা দেন কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হুকুম পালন করিবে, যেন গাফিলি না হয়। ("Tremblingly obey and show no negligence.")।

ইংরাজ গভর্মেণ্ট প্রেরিত অহিফেন গ্রহণে চীন গভর্মেণ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও চীনে যুদ্ধ বাধে। ইহার ফলে ইংরাজেরা হংকং ও আর পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬০ সালের মধ্যে চীনের সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যে যুদ্ধ হয়, তাহার ফলে আর সাতটী বন্দরে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রকট হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশীয় লোকের হস্তে একজন ব্রিটিস রাজ-কর্ম্মচারী নিহত হইলে, আরও পাঁচটী বন্দরে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইহার কিছু পরে ফরাসীরা আনাম দেশ এবং ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশ অধিকার করে। ঐ দুই দেশ ইতঃপূর্ব্বে চীনের অধীনে করদ রাজ্য ছিল। ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে জাপান চীনের নিকট হইতে কোরিয়া দেশ কাড়িয়া লয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্যানটাং (Shantung) প্রদেশে দুই জন জার্ম্মান পাদরি নিহত হইলে, জার্ম্মানরা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পীত সাগরের তীরস্থ কিয়াও-চাউ (Kiaochow) বন্দর অধিকার করে। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানির চীন দেশীয় অধিকারগুলি জাপানের করতলগত হয়। উক্ত জার্ম্মান পাদরিদ্বয়ের হত্যা উপলক্ষে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে খুব কম লোককেই খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের অপমৃত্যুর ফলে পৃথিবীর লোক খৃষ্টান জাতিদের নৈতিক আদর্শ বুঝিতে পারিল। ('If they had lived they would probably have made very few converts, whereas by dying they afforded the world an object-lesson in Christian ethics.") য়ুরোপীয় জাতিদের অনবরত ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার ফলে, চীনাম্যান ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল। তাহার ফল ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহ। বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণের খরচা বাবদ রুসিয়ানরা পোর্ট আর্থার এবং ইংরাজরা Wei-hai-wei দখল করিল।

চীনদেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষিজীবী। তথায় চাল, গম ও চা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। লৌহ ও কয়লার খনি শত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে। দক্ষিণ চীনে বৃষ্টিপাত অপর্য্যাপ্ত, উত্তর চীনে ইহার বিপরীত। এই দুই ভাগের মধ্য দিয়া Yangtze-kiang নদী প্রবাহিত। পিকিং হইতে হ্যাঙ্কাউ (Hankow) পর্য্যন্ত রেলওয়ে আছে। এই নগর পিকিং ও ক্যাণ্টনের মধ্যবর্ত্তী। হ্যাঙ্কাউ হইতে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার কথাবার্ত্তা হইতেছে।

চীনদেশের সর্ব্বপ্রধান শত্রু জাপান। পাশ্চাত্য কূট রাজনীতি ও রণ কৌশলে সুপণ্ডিত জাপান এখন গুরু-মারা বিদ্যা ফলাইবার জন্য ব্যস্ত। গাছেরও খাইব তলারও কুড়াইব এই চেষ্টায় জাপান দু-নৌকায় পা দিয়াছে। য়ুরোপের নরমেধ-বিদ্যা-বিশারদ জাতিরা যে এসিয়ার দুর্ব্বল অধিবাসীদের নাকে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইবে

ইহা জাপানের ক্ষমতার অপমানসূচক। আবার ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন প্রভৃতি যে সকল জাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র নরহত্যায় অপটু দুর্ব্বল জাতিদের শোষণ করিতেছে, তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া না থাকিলেও এই বসুন্ধরার ঐশ্বর্য্য পূর্ণমাত্রায় ভোগ করা যায় না। ("On the one hand they wish to pose as the champions of Asia against the oppression of the white man; on the other hand, they wish to be admitted to equality by the white Powers and to join in the feast obtained by exploiting the nations that are inefficient in homicide.")।

চীনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু য়ুনাইটেড ষ্টেট্স। পৃথিবীর পরাক্রান্ত জাতিদের মধ্য মার্কিনই সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি-প্রয়াসী। শিল্প, বাণিজ্য, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম, পালোয়ানি, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও ভণ্ডামি এই ছয়টী জিনিস মার্কিন ও বিলাতী শিক্ষাদীক্ষার প্রধান উপকরণ। ("American public opinion believes in commerce and industry, Protestant morality, athletics, hygiene and hypocrisy, which may be taken as the main ingredients of American and English Kultur.")।

গ্রন্থকারের মতে মহাযুদ্ধের ফলে রুসিয়া কাবু হইয়াছে বটে, কিন্তু মরে নাই। রুসিয়া যদি চীনের সহিত জোট পাকাইয়া এসিয়ার নেতৃত্ব লাভ করে, তাহার ফল অশুভ নহে। ইংরাজ, মার্কিণ বা জাপানীদের মতন সর্ব্বগ্রাসী হইবার ক্ষমতা রুসিয়ার নাই। রুসিয়ানদের চালচলন কতকটা এসিয়াবাসীদের ন্যায় বলিয়া দুইদলের বন্ধুত্ব সহজসাধ্য; রুসিয়া ও চীন আসপাশের কয়েকটী দেশের সহিত মিলিত হইয়া যদি একটী এসিয়ান সঙ্ঘ স্থাপন করে, তাহা য়ুরোপীয়ান সঙ্ঘের সহিত সহজে টক্কর দিতে সাহস করিবে না, অথচ তাহা এমন পরাক্রান্ত হইবে যে, য়ুরোপীয়ান সঙ্ঘ তাহাকে সহজে খোঁচাইতে চাহিবে না। উক্ত সঙ্ঘ কথিত কারণে মানব-জাতির পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইতে পারে। ("The hegemony of Russia in Asia would not, to my mind, be in any way regrettable. Russia would probably not be strong enough to tyrannize as much as the English, the Americans, or the Japanese would do. Moreover, the Russians are sufficientty Asiatic in outlook and character to be able to enter with relations of equality and mutual understanding with Asiatics. * * And an Asiatic block, if it could be formed, would be strong for defence and weak for attack, which would make for peace.")

গ্রন্থকার বলেন যে চীনদেশের কবিতায় ভাবের আতিশয্য একেবারে নাই। সংযম চীনাম্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সকল প্রকার কলাবিদ্যায় তাহারা এই গুণকে উচ্চতম আসন দিয়াছে। চীনাম্যানের প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গীত অতিশয় মিষ্ট, কিন্তু তাহা এত মৃদু যে শুনিতে গেলে কাণ পাতিয়া থাকিতে হয়।

ইংরাজের পক্ষে নিজেকে চীনাম্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা মস্ত ভুল। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও সাধারণ চীনাম্যান সাধারণ ইংরাজের অপেক্ষা অধিক সুখশান্তি ভোগ করে, কেন না ঐ জাতির শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ মহত্তর। ("The average Chinaman, even if he is miserably poor, is happier than the average Englishman, and is happier because the nation is built upon a more humane and civilized outlook than our own."). চীনাম্যানের সহিষ্ণুতার সীমা নাই। তাহারা জানে যে কি মন্ত্রের উপাসক হইয়া জাপানীরা তাহাদের গলায় ছুরি দিতে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারা ভ্রমক্রমেও ঐ মন্ত্রের সাধক হয় না। পাশ্চাত্য দোষগুলি অনুকরণ করিয়া, প্রাচ্য গুণ-সমূহে জলাঞ্জলি দিয়া, সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী হইতে তাহারা একান্ত অনিচ্ছুক। ("They will not consent to adopt our vices in order to acquire military strength.")

শ্রীগৌরহরি সেন।

পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারী

অতি অভাগ্য ভারতে আমরা, পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারী,
মোদের গভীর বেদনা-কাহিনী, কহনে শুকায় সিন্ধুবারি।
শতেক বরষ জন-সেবা করি, সহিয়া নীরবে অনেক ক্লেশ,
এখনো মোদের তেমনি দৈন্য, সেই দুর্দ্দশা অপরিশেষ।

বিপুল বিশ্বমাঝারে নিত্য, আদান প্রদান আলাপ যত,
আমরা যতনে মাথায় করিয়া বারতা তাহার বহনে রত।
সকাল সন্ধ্যা দুপুর নিশীথ, মোদের কাযের বিরতি নাই,
গ্রীষ্মের দাহে, বর্ষার জলে, অনাবৃত শীতে নাহি কামাই।

হের হরকরা অর্দ্ধনগ্ন অর্দ্ধভুক্ত রুগ্নকায়
ছোটে ঝম্ ঝম গ্রাম হতে গ্রাম অবিরাম নিতি ডাক মাথায়
কভু পথে, কভু অপথে, একাকী, গিরি-সঙ্কটে ভীষণ বনে
কখনো বাত্যা বন্যায় ভাসি, আঁকড়িয়' ডাক জীবন-পণে!

এই সে পিয়ন পাণ্ডুর মুখ, জীর্ণ বসন শীর্ণকায়
প্রিয়ের পত্র দ্বারে এনে দেয়, প্রেরিত অর্থ সে পঁহুছায়।
শত উৎসব-সমারোহ দিনে অথবা দারুণ শোকের মাঝে,
পিয়নের তরে চঞ্চল লোক তার আসা পথ চাহিয়া আছে!

গরীব বেচারা হাজার হাজার টাকা লয়ে রোজ
করিছে কায,
এক পয়সারো নাহি ভুল চুক্, ডাকঘর ছাড়া
কোথায় আজ?
সারা বছরেতে নাহি ছুটি তার কখনো একটি দিনের তরে,
বেতন যা পায় দুটি বেলা তায় পায় না সে খেতে
পেটটি ভরে।

হের দেখ অই, ডাকবিভাগের কেরাণীবৃন্দ আপিস ভরি,
আবাল বৃদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত গুরু দায়িত্ব মাথায় করি।
কেহ পাশ করা, কেহ হাতে গড়া, কার্য্যে কিন্তু সমান দড়,
এরাই শোণিত সলিল করিয়া পোষ্টাপিসেরে করেছে বড়।

কার্য্য হইতে আইন অনেক, আইন হইতে কার্য্য ঢের,
তবু পাণ হতে চুণ খসিলেই ধ্রুব সে কষ্ট অদৃষ্টের!

বেতন অল্প, শাসন কঠোর, খাটুনি অশেষ, বিপুল ক্লেশ,
তবুও পঁচিশ বছরে মাত্র একশো কুড়িটি টাকায় শেষ।

অন্য সকলে পায় নানা ছুটি, কার্য্যকালের সময় বাঁধা,
রাজা ও রাখাল সবার সঙ্গে নহে তাহাদের কর্ম্ম সাধা;
অধিক বেতনে অল্প খাটিয়া নানা অধিকার তাহারা পায়,
উল্টা বিচার রাজ সরকার আমাদেরি তরে করেছ হায়।

কাক না ডাকিতে আলো না ফুটিতে
তাড়াতাড়ি এসে আপিসে জুটি,
সন্ধ্যার পর শ্রান্ত কাতর, আবাসেতে ফিরি পাইয়া ছুটি;
যতদিন যায়, স্বাস্থ্য হারায়, অকাল জরায় চাপিয়া ধরে,
অর্থ অভাবে পুত্র মূর্খ, অন্ন-অভাবে সকলে মরে।

সুতকলত্র পিতা মাতা ভাই কাহারো সঙ্গে আলাপ নাই
তাদের আপদে বিপদে মরণে দেখিতে শুনিতে
ছুটি না পাই;
নিজে মরি মোরা নিত্য নিত্য বিদেশে বিভুঁয়ে স্বজন হারা,
শেষ দশাতেও কাযের শিকলি হয়না মোদের কণ্ঠছাড়া।

পোষ্টাপিসের বিপুল সৌধ—আমরা ভিত্তি-স্তম্ভ সব,
মোদের কর্ম্মনিষ্ঠার ফল পোষ্টাপিসের এ গৌরব;
আমরা চালাই এ বিপুল রথ, সব ভার বহি চক্র রূপে,
না করিয়া দাবী নিজ অধিকার কেন তবে মোরা
রহিব চুপে?

কার্য্যে আমরা চিরসক্ষম, বিদ্যায় কম নহিতো মোরা,
শ্রম সততায় বিখ্যাত মোরা, বিনয়ের
খ্যাতি ভারতজোড়া;
খাটিব আমরা বাঁচিব আমরা মানুষের মত কাটাব কাল,
ভদ্র আমরা নহিত ইতর, কেন বা রহিব চির কাঙাল?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

* গয়ায় "প্রাদেশিক পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারী সম্মিলনে" গীত।

শিশুর প্রশ্ন

"আয়রে কানাই, চল্ গোঠে যাই
লইয়ে মোহন বেণু।"

আমার পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক নাতি নিমাই এক ভিখারীর মুখে এই গানটি শুনিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল—"দাদু, কানাই কে?"

আমি বলিলাম—"কানাই, নন্দঘোষের ছেলে।"

নি।—নন্দঘোষ কে?

আ।—বৃন্দাবনে এক গোয়ালার রাজা ছিলেন তাঁর নাম নন্দঘোষ।

নি।—কানাইকে কে ডাকছে?

আ।—তার খেলার সাথীরা সব—বলাই, সুবল, শ্রীদাম, সুদাম এই সকল ছেলেরা।

নি।—তারা কোথায় যাবে?

আ।—তারা গরু চরাতে যাবে।

নি।—কোথায়?

আ।—গোঠে—মাঠে, যেখানে গরু চরে।

নি।—মাঠে গরু চরায় কেন?

আ।—গরু যে ঘাস খায়; সেই জন্তে রাখালেরা গরু মাঠে নিয়ে যায়।

নি।—গরু ত বিচুলিও খায়। বাড়ীতে বিচুলি দেয় না কেন?

আ। ঘাস খেলে গরুর দুধ ভাল হয়, সেই জন্তে গরু মাঠে নিয়ে যায়।

নি।—ঘাস কেটে আনে না কেন?

আ।—কে কাটবে?

নি।—কেন ঐ সব ছেলেরা? তুমি বল্লে নন্দঘোষ একজন রাজা ছিলেন, তাঁর ত কত চাকর ছিল, তারাই ত ঘাস কাটতে পারে? রাজার ছেলে বুঝি গরু চরাতে মাঠে যায়!

এবার আমি নিমাইয়ের কাছে হার মানিলাম। আমি তাহার জেরার উত্তর দিতে পারিলাম না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সে "দাদু বল্‌তে পারলে না!" বলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। কিন্তু আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

আমার মনে হইল—"তাই ত, কথাটা ঠিক।" কানাই বলাই প্রভৃতি রাখালেরা যদি গোঠে মাঠে গরু চরাইতে না যাইত, তাহাদের গরুরা যদি কাটা ঘাস অথবা বিচুলি খাইত, তবে কি হইত আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

আমি মনশ্চক্ষে দেখিলাম, নন্দের দুলাল যশোদার অঞ্চলের নিধি গোপাল আর গরু লইয়া গোঠে যায় না। ভোর হইতে না হইতেই শ্রীদাম সুদামাদি রাখালগণ আর তাহাকে ডাকিতে আসে না; মা যশোদা আর তাড়াতাড়ি গোপালের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে পীতধড়া পরাইয়া, তাহার কপালে তিলক কাটিয়া, এক হাতে বাঁশী আর হাতে পাচন দিয়া রাখালদের সঙ্গে তাহাকে পাঠান না। তাঁহার প্রাণের গোপালকে গোঠে পাঠাইতে গিয়া তাঁহার প্রাণ সেই ক্ষণিক পুত্র বিরহেই আর কাঁদিয়া উঠে না। তিনি শ্রীদাম সুদাম দিগকে গোপালের জন্য বারংবার সাবধান করিয়া দেন না। গোপাল অন্য রাখালদের সঙ্গে শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি গরু দিগকে গোঠে লইয়া যাইতে যাইতে পথে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করে না। সেই গরুদিগকে গোঠে ছাড়িয়া দিয়া তাহারা আর খেলা করে না। রাখালেরা আর কাহারও কাঁধে চড়ে না, কাহাকেও কাঁধে চড়ায় না। গাছে চড়িয়া ফল পাড়িয়া খায় না; ও একজনের খাওয়া ফল আদর করিয়া আর একজনের মুখে ধরিয়া দেয় না। তাহারা ময়ুরের পালক কুড়াইয়া আর মাথায় পরে না। তাহারা আর নাচিয়া নাচিয়া বাঁশী বাজাইয়া গান করে

না। তাহাদের সেই বেণু রবে ময়ূর ময়ূরী আর তালে তালে নাচে না—যমুনা আর উজান বহে না—গোপবালাগণ যমুনা পুলিনে কাঁখের কলসী ফেলিয়া আর ছুটিয়া আসে না—রাখালগণ আর সেই বালিকাগণের হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করে না—তাহাদের সেই নৃত্য দেখিবার জন্য নীলাকাশের গ্রহমণ্ডলী আর নিশ্চল, নিস্পন্দ, নিথর হইয়া দাঁড়ায় না!

আমি এইরূপ দিবাস্বপ্নে মগ্ন হইয়া পড়িলাম। তখন নিমাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। সে বলিতেছে—"দাদু—দাদু—তুমি কি ভাবছ? স্নান করতে যাবে না?"

"এই যাই" বলিয়া মনে মনে ভাবিলাম ভাইরে, তুই কি এক অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া সব গোলমাল করিয়া দিয়াছিস! তোর এই প্রশ্নের ফল যে কত দূর সাংঘাতিক তাহা ভাবিয়া দেখিবার বুদ্ধি ও বয়স তোর এখনও হয় নাই। নন্দমহারাজ চাকর দিয়া গরুর ঘাস কাটাইয়া আনিলে বৃন্দাবন লীলাই যে মাটি হইয়া যাইত। তাহা হইলে বৃন্দাবনের সখ্য বাৎসল্য মধুর রস ফুটিয়া উঠিত না—ভাগবতের দশম স্কন্ধ রচিত হইত না—জয়দেবের মৃদঙ্গ বাজিত না—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বঙ্গের কলকোকিল কণ্ঠের ঝঙ্কার কেহ শুনিতে পাইত না। অতএব হে ব্রজরাজসুত নন্দদুলাল, তুমি যুগে যুগে রাখাল বেশে শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া মাঠে গরু চরাও, আর পারো যদি, তবে আমার এই নিমাইকে তোমার খেলার সাথী করিয়া লও।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বাল্যবিবাহ

বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে, ভালই—গভীর চিন্তার সহিত ইহার ভাল মন্দ দুইটা দিকই দেখিয়া অভিজ্ঞ নরনারীগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত পরিষ্কার করিয়া মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করিলে জনসাধারণ এ সম্বন্ধ ভাবিবার সুযোগ পাইয়া উপকৃত হইবে বলিয়াই মনে করি। সাহিত্যের প্রভাব লোকমত গঠনের পক্ষে যথেষ্টই ফলদায়ক—সুতরাং নিছক তর্ক ও যুক্তির দিকে ঝোঁক না দিয়া সত্য নির্দ্ধারণে মন দেওয়াই উপস্থিত নূতন যুগে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

নানা কারণে আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। সহরের অধিবাসীরা হয়তো বলিবেন, বাল্য বিবাহ তো উঠিয়াই গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা গ্রামের দিকেই বাস করেন এবং শুধু ভদ্রজাতি নয়, অন্যান্য সমস্ত অধিবাসীদিগের সমাজেও দৃষ্টি সঞ্চালন করিবার সুযোগ পান, তাঁহারা জানেন বাল্য বিবাহের প্রভাব এখনও দেশমধ্যে যথেষ্ট আধিপত্য করিতেছে।

যাহা হউক, নিম্ন জাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন ভদ্র জাতির কথাই বলা যাক্। বাল্য বিবাহ বলিতে যদি আট হইতে তেরো বৎসর পর্য্যন্ত ধরা হয়, তাহা হইলে ঐ বিবাহের ফলে ভাল কিছু থাকিলেও, মন্দের ভাগই খুব বেশী। এক তো শারীর বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে অকাল মাতৃত্বকে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই সমর্থন করিবেন না। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবী আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে অকালমৃত্যু ও বাল্য বিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালী জাতির অকালমৃত্যু অর্থাৎ গড়ে ২৩ বৎসর পরমায়ুর অজুহাতে নারীদিগের ১৭।১৮ বৎসরের মধ্যে তিন চারিটি সন্তানের মাতা হইবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; কেন না, পুরুষের ২৩.২৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইলে ইহার পূর্ব্বে সে যদি অন্ততঃ

দুই তিনটি সন্তানের জন্ম না দিয়া যায়, তাহা হইলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু বিশেষজ্ঞ এবং শরীর তত্ত্ববিদ্‌গণ যদি নারী ও পুরুষ উভয়েরই শারীরিক উন্নতি এবং সন্তান উৎপাদন এবং গর্ভধারণের উপযোগী শক্তির বিষয়ে আলোচনা করেন, তবে কখনই বারো বা তেরো বৎসরের বালিকাকে মাতা হইবার জন্ম এবং উনিশ কুড়ি বৎসরের তরুণ যুবাকে পিতা হইবার জন্য সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন না। গড়ে যদি মানুষের ২৩ বৎসরই পরমায়ু ধরা যায়, তাহা হইলে নারীর ঐ বয়সে তিন চারিটি সন্তান হওয়া সম্ভব হইলেও পুরুষের ঐ বয়সে তিন চারিটি সন্তান এক স্ত্রীতে উৎপাদন করিতে হইলে তাহাকে আঠারো বৎসর বয়সেই পিতা হইতে আরম্ভ করিতে হয়। ঐ সমস্ত অপরিপকশক্তি জনক জননীর সন্তানগণ কতদূর সুস্থ ও সবল হইয়া জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবে, তাহা সমাজ সংরক্ষকগণ ভাল করিয়াই ভাবিয়া দেখিবেন। সমাজ এ ভাবে দুর্ব্বল ও পঙ্গু জনসমষ্টির আধার হওয়া অপেক্ষা, যদি অল্পসংখ্যক সবল বলিষ্ঠ সুস্থ সন্তানগুলির আধার হয়, কেহ তাহার নিন্দা করিবেন কি? যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধিই অনিবার্য্য রূপে আবশ্যক হইয়া উঠে, তাহা হইলে সবল সুস্থ পুরুষ উপযুক্ত বয়সে একাধিক পত্নী গ্রহণে সন্তান উৎপাদন করিলেও মন্দ, কিন্তু অপরিণত বয়সে সন্তানের পিতা হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহাশয়া বাল্য বিবাহের পর তরুণ তরুণীদিগের কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা বলিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক গৃহে এ প্রথা প্রচলিত আছে—অবশ্য তাহারা অ-বাঙ্গালী। বিবাহের পর বালিকা স্বামিগৃহে নীত হয় না, ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই বধূর দ্বিরাগমন হইয়া থাকে—সে ব্যবস্থা ভালোই—কিন্তু লেখিকা বধূকে শ্বশুর গৃহে থাকিয়াই শিক্ষা লাভের কথা বলিতেছেন। কোন কোন পরিবারে তাহা সম্ভব হইলেও, যখন লেখিকা ২৩ বৎসর গড়ে পরমায়ু ধরিয়া ঐ বয়সে দুই তিনটি সন্তানে উৎপাদনের যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তখন তরুণ তরুণীদিগের ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার যুক্তির সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় কি প্রকারে?

বাল্য বিবাহের—ঠিক বাল্য বিবাহের নয়—তেরো চোদ্দ বৎসরের জননীর সন্তান অনেক স্থলে সুস্থ ও সবল হইলেও, যদি সমষ্টি ধরিয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, অল্পবয়স্কা মাতার সন্তান অধিকাংশ স্থলেই রুগ্ন হয়। চোখের উপর নিত্য কতই তেরো বৎসরের জননীর প্রসব হইবার সময় জীবন সংশয় ঘটনা দেখিয়া কষ্ট পাইতেছি এবং হতভাগিনীদিগের দেহে যৌবনের লাবণ্য ভালরূপে বিকসিত হইবার পূর্ব্বে তাহার যাহা কিছু শ্রী ও সৌন্দর্য্য ছিল ঝরিয়া গিয়া বাঙ্গালী সমাজে "কুড়ি পেরুলেই বুড়ি"—নারী সম্বন্ধে এই চির প্রচলিত প্রবাদকে অক্ষরে অক্ষরে সার্থক করিতেছে।

কেহ যেন মনে না করেন আমি পাশ্চাত্য আদর্শের দিকে দৃষ্টি করিয়াই বাল্য বিবাহকে ঠেকাইতে চাই। কি পুরুষ, কি নারী, প্রৌঢ় বয়সের বিবাহকে কখনই আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি না। পুরুষের পক্ষে শোভনীয় হইলেও নারীর পক্ষে উহা আদৌ শোভনীয় নয়। তবে যে নারী উচ্চ শিক্ষা লইয়া উচ্চ আদর্শের অনুসরণে জীবন যাপন করিবার জন্য কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বিনী হইতে চান, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে আমি কেন, কোনও সদ্দর্শী ব্যক্তিই চাহিবেন না। সাধারণতঃ নারীদিগের ষোল হইতে কুড়ি বাইশ বৎসরের মধ্যেই বিবাহ হওয়া প্রশস্ত—এবং এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের নানারূপ বিদ্যা অর্থাৎ সাহিত্য, গণিত ইতিহাস হইতে সঙ্গীত, চিত্র, নানারূপ প্রয়োজনীয় সেলাই, ইত্যাদি সমস্তই শিক্ষা দেওয়া অভিভাবকদিগের কর্ত্তব্য। এইবার কথা হইতে পারে, গৃহস্থালীর কায কর্ম্মের বিষয়। আমার তো মনে হয়, এমন কোনও পরিবারই নাই যাঁহারা বালিকাদিগকে অল্প বয়স হইতেই রান্না, ভাই বোনদিগের সেবা, অতিথি অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা, গুরুজনদিগের সম্বর্দ্ধনা, রোগীর সেবা, গৃহস্থ গৃহের সাধারণ কায কর্ম্ম, দাস দাসীদিগের সহিত

প্রীতি ব্যবহার, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম—এ সব শিক্ষা না দিয়া থাকেন। যদি কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহা যথেষ্ট নিন্দনীয়। কি ধনী, কি দরিদ্র গৃহস্থ, সকল গৃহের বালক বালিকাগণের এই সব বিষয় ভাল রকমই শিক্ষা করা উচিত। বিদ্যা বুদ্ধি সকলেরই খুব উত্তম না হইতে পারে, কিন্তু সমাজানুমোদিত মানব হৃদয়ের এই সব শ্রেষ্ঠ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এবং এ সব শিক্ষার ভিত্তি আমাদের নিজেরই গৃহে—আমার চোখের উপর তো অনেক সুশিক্ষিতা নারীর যৌবন বিবাহ দেখিয়াছি, তাঁহারা শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় স্বজন লইয়া সন্তান সন্ততির জননী হইয়া বেশ ভালরকমই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তবে কোনও নারীর জীবনে যে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই তাহা নয়। কিন্তু সে সমষ্টির কথা নয়। তবে একথা আবার বলিতেছি, বালক বালিকাদিগের শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠানই আমাদের নিজ নিজ পরিবার—সুতরাং পারিবারিক শিক্ষাই নির্দ্দোষ হওয়া উচিত।

পশ্চিমের দিকে দৃষ্টি দিয়া তুলনা করিতে হইলে ভাল মন্দ দুইটাই ধরিতে হয়। তাহাদের মন্দ টুকুই শুধু দেখিলে চলিবে কেন? ভালও তো যথেষ্ট আছে। আজিকার দিনে স্বর্গীয় মহাত্মা বিবেকানন্দের প্রভাব নব্য বঙ্গের উপর অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ও গভীর সহানুভূতির সহিত সকলদেশ পর্য্যটনের ফলে আমেরিকার নারীগণের অনেক ভাল গুণও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন এবং অকপটে লিখিয়াছেন। "এদেশের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই, সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়ের মত মেয়ে বড়ই কম। পঁচিশ বৎসর ত্রিশ বৎসরের কমে কারও বিবাহ হয় না, তবু তারা পবিত্র,, তারা আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন হয়েও কত ভালো কায করে। রোজগার, দোকান, কলেজে প্রফোসারী, সব কায করে, অথচ কি পবিত্র। যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত গরীবের উপকার করে। আর আমরা? আমার মেয়ে এগারো বৎসরেই বে না হলে খ রাপ হয়ে যাবে!" (বিবেকানন্দের পত্রাবলী।)

তেজস্বী বিবেকানন্দের ন্যায় ভারত প্রেমিক লোক এদেশে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজে যেমন নির্ভীক সত্যপ্রিয় ধার্ম্মিক মহানুভব ছিলেন, তাঁহার চক্ষে তেমনি ইউরোপ ভ্রমণ কালে অনেক সুশিক্ষিতা বিদুষী ললনার সহিত সাক্ষাৎও হইয়াছিল। তাহা বলিয়া যে ঐ দেশে নীচমনা রূপযৌবন মদমত্তা বিলাসিনী বা হাবভাবময়ী নারীর অসদ্ভাব আছে তাহা ত বলিতেছি না! মোট কথা আমাদের দেশে অন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিবার আবশ্যকতাই বা কি? ভারতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া কি আমাদের দেশে, কি সমাজ জীবনে, কি গার্হস্থ্য জীবনে সংস্কার হওয়া সম্ভব নয়? সম্ভব বৈকি, এবং ঐ সম্ভবকে কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের নিজেদের দোষ ত্রুটিগুলি ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করা উচিত এবং মতের গোঁড়ামী পরিহার করা সর্ব্বতোভাবেই প্রয়োজনীয়।

মানুষ যন্ত্র নয়—প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মার অস্তিত্ব আছে, এবং সেই আত্মার কল্যাণের দিকে দৃষ্টি করিয়া তার সমুদয় শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন। তবে শিক্ষার যদি কেহ অপব্যবহার করে সে কথা স্বতন্ত্র।

কি নারী কি পুরুষ, সংযম শিক্ষা উভয়েরই আবশ্যক। সমাজহিতৈষী কোন মহানুভবই তাহা অস্বীকার করিবেন না। তবে আজিকার নূতন আলোক প্রাপ্ত ভারতকে তাহা যদি মনোবিজ্ঞান সম্মতরূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, তাহাই শুভ হইবে বলিয়াই মনে করি।

আর দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিতে চাই। শ্রদ্ধেয় লেখিকা বলিতেছেন, এ দেশে যখন এগার বারো বৎসর বয়সেই নারীত্ব দেখা দেয়, তখন তাহাকে বিবাহের অনুকূল বয়স বলিব না কেন? কিন্তু ইহাও খুব ঠিক কথা যে একমাত্র ভদ্র বাঙ্গালী গৃহেই বালিকাদের ঐ সুকুমার অবস্থায় নারীত্বের বিকাশ হয়। কিন্তু স্থানে স্থানে ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত বালিকাদিগকে বিবাহ চিন্তার অবকাশ ঐ বয়সে একেবারেই

না দিয়া, পাঠচর্চ্চায় নিরত রাখা যায়, তাহাদিগের চৌদ্দ পনেরো বৎসরের পূর্ব্বে নারীত্বের বিকাশ হয় না ইহা পরীক্ষিত সত্য। কিন্তু অতি শৈশব হইতেই রাত্রিদিন বিবাহের কথা ও আলোচনাতেই বয়োবৃদ্ধি হয়, তাহারা শীঘ্রই যৌবন প্রাপ্ত হয়। জানি না ইহার মধ্যে বিজ্ঞান-সম্মত কোন কারণ আছে কি না।

তথাকথিত নিম্নজাতিদের মধ্যেও পনেরো ষোল বৎসরের পূর্ব্বে যৌবনোদ্গম হয় না এবং তাহারা বারো বৎসরেও সন্তানের জননী হয় না। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ভদ্রজাতি অপেক্ষা তাহারা সবল সুস্থ ও কার্য্যক্ষম। এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন এই যে যৌবন বিবাহে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রণয় হওয়া অসম্ভব—এবং যদিই ইহার বহু প্রচলন ঘটে এবং নারী শিক্ষিতা হইয়া ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করে তাহা হইলে আমেরিকার ন্যায় এদেশেও বিবাহচ্ছেদ পালার অভিনয় সুরু হইয়া সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু পশ্চিমের দিকে না চাহিয়া ঘরের দিকে চাহিয়াই এ বিষয়ে অল্প কিছু আলোচনা করিতে চাই। প্রণয় জিনিষটা উপেক্ষা করা চলে না ; যে জিনিষকে আশ্রয় করিয়া যুগ যুগান্তর হইতে কত কাব্য কত কবিতা কত উপন্যাস দেশ বিদেশে রচিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং সৃষ্টি স্থিতির যাহা হইতেই উদ্ভব, তাহা অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু সমাজতত্ত্ববিৎ উহার নির্ম্মলতাকে এই জন্য শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান যে, ইহার মূলে সমাজের স্থিতি ও গতি।

বাল্য বিবাহের ফলেই দুটি হৃদয় সম্মিলিত হইয়া যে যৌবনে প্রণয়-রূপ মধুময় ফল প্রসব করিবে, সব ক্ষেত্রেই তো এমন সম্ভব নয়। অবশ্য বিবাহে দুটি দেহের সহিত দুটি মানবাত্মার যুক্ত হওয়া সর্ব্ব সমাজেই বাঞ্ছনীয় হইলেও, তাহা হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কোন্ স্বামী স্ত্রী আর দাম্পত্য ধর্ম্ম পালনে বিরত আছেন? যৌবন বিবাহের ফলেও সব সময় যে স্বামী স্ত্রীর প্রণয় খুব গভীর হইবে—এমন না হইলেও, সকল ক্ষেত্রেই যে মনের মিলন অসম্ভব একথা বুঝিবার কারণ কি?

স্বামী স্ত্রীর যথার্থ মনোমিলন—(অর্থাৎ চিন্তার কার্য্যে ও ধারণায়) যে শত করা একজনেরও ঘটে; ব্যবহারিক জগতে তাহা তো দেখা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রতি পদেই অশান্তির সৃষ্টি করিতে হইবে? পুরাতত্ত্ববিৎ ইচ্ছা করিলে প্রাচীন সমাজের উদাহরণ দেখাইতে পারেন। অবশ্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক এদেশ লাঞ্ছিত ও অধিকৃত হইবার পূর্ব্বেকার কথা—সে যুগে যে যৌবন বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। হয় তো পরবর্ত্তী যুগে নানা কারণে সে প্রথা রহিত হইয়াছিল। কালের ইতিহাস পাঠ করিলে কি রাজনীতি ক্ষেত্রে ও সমাজ ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক বিধি প্রণালীতে নানারূপ সাময়িক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সুতরাং আমাদের সমাজের রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষকে একটা শক্ত বাঁধনের মধ্যে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা অসম্ভব নয়। স্বর্গীয় শ্রদ্ধাস্পদ বিবেকানন্দ ভারতের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াই ভারতবর্ষের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কঠোর বিধি নিষেধের প্রতি তীব্র কটূক্তি করিয়া গিয়াছেন। লেখিকা যে একস্থানে লিখিতেছেন—বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আজকাল এদেশের লোক যে সব যুক্তি দেখান সে সকল তাঁরা বিন্দু মাত্র চিন্তা না করিয়াই বলিয়া থাকেন, বিদেশীয়েরই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেন, যথার্থ সমাজ-হিতৈষণার দেশ-হিতৈষণার সহিত উহা কিছু মাত্র ভাবিয়া চিন্তিয়া বলেন না। —স্বামীজীর পক্ষেও কি সেই কথা প্রযোজ্য?

এইখানে একটি মাত্র কথা বলিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিব—অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা মনে রাখিয়া কায করিলে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্থান বিশেষে বাল্য বিবাহ আবশ্যক হয় এবং স্থান বিশেষে যৌবন বিবাহও আদৌ ক্ষতিকর হয় না। সকল স্থানেই সমান ব্যবস্থা খাটে না, তবে ষোল সতেরো বয়সের নীচে গর্ভ ধারণ জননীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

শ্রীসরসীবালা বসু।

সিদ্ধি

(বৌদ্ধ আখ্যায়িকা)

সূর্য্যাস্তের গোলাপাভ রশ্মি সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ক্রমশঃ বিলীন হইতেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রাম্য বাসভবনগুলি দিবসের কোলাহলমুক্ত হইয়া নীরবতার আশ্রয় লইতেছিল।

একটী উন্মুক্ত স্থানে কয়েক জন স্ত্রী ও পুরুষ, দুইজন তীর্থযাত্রী আগন্তুককে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যাত্রীদ্বয় ভিক্ষু, হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত বেশ পরিহিত। বেষ্টনকারী স্ত্রী পুরুষগণ একাগ্রচিত্তে ভিক্ষুদ্বয়ের বচন-সুধা পান করিতেছিল। বারিবাহক স্কন্ধস্থ কলস ভূতলে স্থাপন করিয়া স্বীয় দৈনিক কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছে, বণিক বিপণি ত্যাগ করিয়া ক্ষণকালেরর নিমিত্ত পারলৌকিক মঙ্গলাভিলাষী।

কিয়ৎ পশ্চাতে দুইটী শিশু দাঁড়াইয়া—একটী বালক, অপরটী বালিকা। তাহারা নির্নিমেষ নয়নে আগন্তুক-দুইজনের প্রতি চাহিয়া তাঁহাদের মুখনিঃসৃত অমৃতের ধারা পান করিতেছিল। ভিক্ষুদ্বয় তথাগতের মহিমা কীর্ত্তন ও তাঁহার স্তুতি গান করিতেছিলেন। ক্রমে সমাগত নরনারীবর্গ একে একে স্থান ত্যাগ করিলে, জনৈক গ্রামবাসী রাত্রিবাসের নিমিত্ত ভিক্ষুদ্বয়কে গৃহে লইয়া গেল।

গৃহে প্রবেশ কালে, অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু অনুভব করিলেন, কে যেন পশ্চাত হইতে তাঁহার পরিচ্ছদ আকর্ষণ করিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন একটী বালক। বালকের চক্ষুর্দ্বয় প্রদীপ্ত, বদনমণ্ডল উজ্জ্বল। তাহার নাম সুমন।

বালক কহিল—"ভিক্ষু, যে নিগ্রোধ অরণ্যে তথাগত বাস করিতেছেন, সেই অরণ্যে কতদিনে পৌছিতে পারা যায়?"

ভিক্ষু উত্তর করিলেন,"পদব্রজে গমন করিলে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌছিতে সাত দিন লাগিবে। কিন্তু বৎস, তুমি শিশু। তোমাকে অন্ধকারময় ভীষণ অরণ্য সমূহ অতিক্রম করিতে হইবে, কালান্তক সদৃশ বিষধর ও মনুষ্য খাদক ব্যাঘ্র সমূহের সম্মুখীন হইতে হইবে। তুমি পিতা মাতার সন্নিধানে থাকিয়াই বুদ্ধের শরণ লইয়া ধর্ম্ম পালন করিতে পার।"

সুমন পুনরুত্তরে কহিলেন—"না ভিক্ষু, আমি তথাগতের দর্শনপ্রার্থী, আমি বুদ্ধদর্শনাভিলাষী।" বালকের চক্ষু হইতে অপরূপ দীপ্তি নির্গত হইতেছিল।

ভিক্ষুদ্বয় গৃহ প্রবেশ করিলেন। সুমনও স্বীয় ভগিনী প্রকৃতির সহিত আসিয়া মিলিত হইল।

প্রকৃতি গম্ভীর ভাবে কহিল, "ভ্রাতঃ, আমি বুঝিয়াছি। আমিও তোমার সঙ্গ লইব।"

সুমন ও প্রকৃতির পিতা ধনবান বণিক। মাসাধিক কাল বালক বালিকার কাতর মিনতি তিনি উপেক্ষা করিলেন। পরিশেষে তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যের নিকট তিনি পরাজয় স্বীকার করিলেন। একদিন অতি প্রত্যূষে ভ্রাতা ভগিনী পরস্পর পরস্পরের কর-সম্বদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিল। পিতার প্রচ্ছন্ন শোকাগ্নি পুনঃ প্রজ্জলিত হইবার আশঙ্কায় শিশুদ্বয় তাঁহাকে সুপ্ত অবস্থায় রাখিয়াই যাত্রা করিল।

গ্রামে ভিক্ষুদ্বয়ের আগমনের পর হইতেই বালক বালিকার মনোভাবের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মনুষ্য জীবনকে তাহারা যে ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, এখন আর তাহারা সেরূপ পারিল না। তাহারা নূতন দৃষ্টিতে জীবনের নবরূপ দর্শন করিল। এখন হইতে তাহাদের একমাত্র কামনা, একমাত্র চিন্তা—তথাগতের চরণ সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার শরণ লওয়া। এই আশাই তাহাদের কথোপকথনের একমাত্র

বিষয় হইয়াছিল। রাত্রিকালে তাহারা স্বপ্নে তথাগতের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার পূজা করিত।

২

যাত্রার প্রথম দুই একদিন অতি আনন্দে অতিবাহিত হইল। শিশুদ্বয়ের উপভোগের জন্য প্রকৃতি দেবী স্বীয় অনন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার অকাতরে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পথিপার্শ্বস্থ মহীরুহ সমূহ অবনত মস্তকে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিল; অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃক্ষ নিচয় সুস্বাদ ফল অর্পণ করিয়া তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিল; সুদৃশ্য বুলবুল শাখা হইতে শাখান্তরে উড্ডীয়মান হইয়া মনোহর সঙ্গীতে তাহাদের মনোরঞ্জন করিল; মৃগ শিশু নির্ভয়ে আসিয়া তাহাদের অঙ্গ আঘাণ করিল।

সুমন ও প্রকৃতি উন্নত মস্তকে পদব্রজে চলিতেছেন—হৃদয়ে অদম্য আশা, চক্ষুতে অপূর্ব্ব দীপ্তি। উভয়ের মস্তক বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র দুই খণ্ড স্বর্ণাভ মেঘাবরণ, তন্মধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন মূর্ত্তি অস্পষ্ট রূপে ভাসমান!

বিশ্রাম কালে শিশুদ্বয় বনজাত ফলমূল দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখে দিবারাত্র তথাগতের নাম কীর্ত্তন। রাত্রিকালে সুমন সর্প ও বন্য পশুগণকে দূরে রাখিবার জন্য বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিত। কিন্তু তাহাদের মস্তকোপরি ভাসমান দিব্য মূর্ত্তি, দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছিল।

৩

চতুর্থ দিনে ভ্রমণক্লান্তি তাহাদিগকে অবসন্ন করিল। সুমন নিরুৎসাহ হইলেন না; কিন্তু বালিকা প্রকৃতি হৃদয়ে বলের অভাব অনুভব করিল। সুমন তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উৎসাহিত করিলেন, কিন্তু সব বৃথা হইল—বালিকা সাহস ফিরিয়া পাইল না।

সুমন কহিলেন—"তথাগত আমাদিগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার নিকটে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, দেখিতেছ না? প্রকৃতি, আমি যে তাঁহাকে দেখিতেছি।" সুমনের দৃষ্টি প্রেমময়।

ভয়কম্পিত স্বরে প্রকৃতি উত্তর করিলেন, "ভ্রাতঃ আমি তাঁহাকে দেখিতেছি না। সে মূর্ত্তি আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি আর তাহা অনুভব করিতেছি না। আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সে মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আর আমি কিছুই দেখিতেছি না। সুমন, আমি ভীত হইয়াছি?"

সুমন কাতর হইয়া কহিলেন—"বিশ্বাস স্থাপন কর। মূর্ত্তি অবিলম্বে ফিরিবে।"

প্রকৃতির সাহস তাহাকে এক কালীন ত্যাগ করিয়াছিল, সে হতাশ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কহিল—"আমি আর সে মূর্ত্তি দেখিতেছি না।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তকোপরি ভাসমান মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

৪

পঞ্চম দিনে শিশুদ্বয়কে যে পথ অতিক্রম করিতে হইল তাহা অধিকতর দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। চলিতে চলিতে অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা উঠিল। বিদ্যুতের পর বিদ্যুৎ অবিশ্রান্ত ভাবে ঝলসাইতে লাগিল। কর্ণ-বধিরকারী বজ্রের নির্ঘোষ আকাশ পরিপূরিত করিল। প্রাণীসমূহ ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সুমন ও প্রকৃতি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া কোনরূপে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রকৃতি ভ্রাতাকে কহিলেন—"সুমন, আমি পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তিনি যেন একাকী—ক্রন্দনরত হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। পিতাকে ত্যাগ করিয়া আসার কর্ম্মফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।"

সুমন উত্তর করিলেন—"আমরা তথাগতের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া ত্বরায় পিতার নিকট ফিরিব। পিতার নিকট জগতের কোন বস্তুই ঐ আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বিবেচিত হইবে না।"

প্রকৃতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি স্বর্ণাভ মেঘাবরণ এবং তন্মধ্যস্থ অপরূপ মূর্ত্তি ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইতে লাগিল।

৪

ভ্রাতা ও ভগিনী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যাস্ত হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া অরণ্যের ভীষণতা আরও বর্দ্ধিত করিল। মধ্যে মধ্যে বন্য পশুর গর্জ্জন শ্রুত হইতেছিল। প্রকৃতি কম্পিত হইলেন।

সুমন আর অগ্রসর না হইয়া প্রকৃতিকে কহিলেন, "ভগিনি, রাত্রি হইয়াছে, তুমিও ক্লান্তা, এস এই বৃক্ষমূলে শৈবাল শয্যার উপর আমরা নিদ্রা যাই।"

প্রকৃতি শৈবালের উপর শয়ন করিলেন।

ক্ষণেক পরে, অশ্রুপূরিত নয়নে প্রকৃতি সুমনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ভ্রাতঃ, আমি আর পারিতেছিনা। চল, আমরা স্বগ্রামে ফিরিয়া যাই। পিতার নিকট ফিরিয়া যাই। আমি ক্লান্ত, আমি ভীত। আমি দেবমূর্ত্তি হারাইয়াছি।"

সুমন সোদ্বেগে কহিলেন, "ভগিনি, পাঁচদিন অতীত হইয়াছে। আমরা গন্তব্য-স্থানের অতি নিকটে। আর একবার মাত্র প্রয়াস করিলেই আমরা বাঞ্ছিত স্থানে উপস্থিত হইব। তথাগতের এত নিকটে আসিয়া তুমি ফিরতে চাও?"

"আমার আর চলিবার শক্তি নাই। আমি ক্লান্ত ভীত অবসন্ন।"

সুমন বিষণ্ণ হইলেন। তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিলেন। প্রকৃতির দোষ কি? দোষ তাঁহার নিজের, কেন তিনি কুসুম-সুকোমল বালিকা প্রকৃতিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন? প্রকৃতি করুণার পাত্রী।

সুমন কহিলেন, "ভগিনি, আমরা নিদ্রিত হই; হয়ত তথাগত স্বপ্নে দেখা দিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য পথে চালিত করিবেন।"

ভ্রাতা ও ভগিনী শৈবালোপরি শয়ান। চন্দ্রালোকের একটী ম্লান রশ্মি বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া তাহাদের ললাটোপরি পতিত হইয়া শিশুদ্বয়ের সুন্দর স্বর্গীয় মুখমণ্ডল চুম্বন করিতেছিল। প্রকৃতির সুনিদ্রা হইল না। তাহার মস্তকোপরি দিব্যমূর্ত্তি একেবারে অদৃশ্য, কিন্তু উহা তখনও সুমনের শিরোপরি জ্বলিতেছিল।

প্রত্যূষে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সুমন কহিলেন, "আমি তথাগতের দর্শনলাভ করিয়াছি। তিনি আদেশ করিয়াছেন, 'প্রকৃতিকে গ্রামে ফিরাইয়া লইয়া যাও। হে সুমন, সন্ন্যাস আমার প্রদর্শিত মার্গ, ঐ মার্গ অবলম্বন করিলে তুমি সুনিশ্চিত পদদ্বয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে আমার নিকট উপনীত হইতে সমর্থ হইবে।"

প্রকৃতি সানন্দে উত্তর করিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি পুণ্যবান। কর্ম্ম কর্ত্তৃক তুমি পুরস্কৃত হইবে।"

প্রয়াস সহকারে হাস্য করতঃ সুমন কহিলেন, "আমি পুরস্কৃত হইবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছি না।"

কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

সুমন ফলাহরণের নিমিত্ত কিয়ৎক্ষণের জন্য অল্প দূরে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তিনি রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। দ্রুতপদে ভগিনীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, প্রকৃতি শৈবালোপরি উপবিষ্টা হইয়া ক্রন্দনরতা।

সরোদনে প্রকৃতি কহিল, "সুমন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে আমি সর্পদষ্ট হইয়াছি।"

সুমন যাতনা-বিবর্ণ। ভগিনীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন এবং তদনন্তর সর্পদষ্ট ক্ষুদ্র পদ খানি হস্তে ধারণ করিয়া ক্ষতস্থান চুষিয়া লইলেন। কিন্তু বিষের ক্রিয়া ইতঃপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার কোন উপায়ই ছিল না। সঅশ্রু নয়নে সুমন কহিলেন, "প্রকৃতি, ভগিনি, কথা কও, আমার সহিত কথা কও। নিদ্রিত হইও না।"

কিন্তু প্রকৃতির অন্তিম কাল উপস্থিত। তাহার চক্ষে সমস্ত অন্ধকার - তাহার স্বর এত ক্ষীণ যে সুমন অতি

কষ্টে তাঁহার উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিলেন।

"সুমন, প্রিয় ভ্রাতঃ, বিদায়। যমরাজ আমার আহ্বান করিতেছেন। সমস্ত অন্ধকার। আমি বিশ্বাস হারাইয়া কর্ম্ম কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতেছি। দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত। ভ্রাতঃ, তথাগত আমায় ক্ষমা করিবেন কি ?"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুমন কহিলেন, "প্রকৃতি, নিশ্চিন্ত হও, তিনি নিশ্চয় তোমায় ক্ষমা করিবেন। তুমি আমার সহিত এই কথাগুলি আবৃত্তি কর—'আমি বুদ্ধের শরণ লইলাম, আমি ধর্ম্মের শরণ লইলাম এবং আমি সঙ্ঘের শরণ লইলাম।'"

প্রকৃতি পবিত্র বাক্যগুলি আবৃত্তি করিলেন। পরমুহূর্ত্তেই বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় প্রকৃতির সুন্দর মস্তক লুণ্ঠিত হইল। প্রকৃতির প্রাণবিয়োগ হইল।

প্রকৃতির প্রাণহীন-দেহ শৈবালোপরি সযত্নে রক্ষা করিয়া, তাহার সুন্দর অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষু দুইটি সুমন মুদ্রিত করিয়া দিলেন। কিন্তু, ও কি ? পুনরায় সেই স্বর্ণাভ মেঘাবরণ, এবার উহা প্রকৃতির সমস্ত দেহকে বেষ্টন করিয়া—এবং উহার মধ্যে সেই অপরূপ শ্রীসম্পন্ন মূর্ত্তি পুনরায় অস্পষ্টরূপে ভাসমান।

সমস্ত দিন ও রাত্রি সুমন চির নিদ্রায় নিদ্রিতা ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া অতিবাহিত করিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতেছিল।

প্রাতে তথাগতের উদ্দেশে প্রার্থনা করণান্তর তিনি হৃদয়ে বল অনুভব করিলেন। কিন্তু যখন পুনরায় যাত্রা করিবার সময় আসিল, তখন তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং এক এক করিয়া তিন বার মৃতদেহের সান্নিধ্যে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শৈবাল শয্যোপরি শায়িতা প্রকৃতিকে কি সুন্দরই দেখাইতেছিল। তাহার বদনমণ্ডল পূর্ণ শান্তির প্রতিমূর্ত্তি, অধরে নির্ম্মল হাস্য ক্রীড়া করিতেছে ? এই স্বর্গের ছবিকে তিনি কি করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন ? এই কুসুম-কোমল দেহকে কি করিয়া তিনি অরক্ষিত অবস্থায় একাকী এই ভীষণ অরণ্যে রাখিয়া যাইবেন ?

সুমন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার সম্মুখস্থ বনস্থলী দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একটী প্রকাণ্ডদেহ ব্যাঘ্র সেই স্থানে আবির্ভূত হইল। সুমন ভয়ে নিশ্চল হইয়া রহিলেন, তিনি নিজ হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করিতেছিলেন। ব্যাঘ্র ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃতদেহের দিকে ধীর পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইল। বহুক্ষণ শবদেহের ঘ্রাণ লইয়া পরিশেষে ব্যাঘ্র তাহার পদতলে পতিত হইল। তদনন্তর ব্যাঘ্র সুমনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার দৃষ্টি অর্থ-ব্যঞ্জক, যেন সুমনকে বলিল, "বালক, তুমি যাও, দেবী মূর্ত্তি আমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে।"

সুমন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভরে কহিলেন, "ব্যাঘ্র আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এক্ষণে আমি শান্তমনে চলিয়া যাইতে পারি। প্রিয় প্রকৃতি শক্তিশালী বন্ধু কর্ত্তৃক রক্ষিতা।"

সুমন চলিয়া গেলেন।

৫

নিগ্রোধ অরণ্যে উপনীত হইবার অবশিষ্ট পথ অবিলম্বেই অতিক্রান্ত হইল। ভ্রমণকালে সুমনের বেদনাবিদ্ধ হৃদয় ক্রমশঃ শান্ত হইতেছিল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সূক্ষ্মতর হইতেছিল। ইহার ফলে তিনি অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্র বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখিলেন। অতীত ও বর্ত্তমান তাঁহার নিকট এক প্রতীয়মান হইল। তিনি বিশ্বপ্রেমে নিমজ্জিত হইয়া রহিলেন।

সপ্তম দিনের প্রত্যূষে তিনি যে স্থানে উপনীত হইলেন, তথা হইতে নিগ্রোধ অরণ্য অল্প দূরেই দৃষ্ট হইতেছিল। সুমন অরণ্যের প্রান্তদেশে শিবির সন্নিবিষ্ট দেখিলেন। তাঁহার গতি দ্রুততর হইল।

যখন তিনি শিবির সন্নিধানে উপনীত হইলেন, তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। ভৃত্যবর্গ বহুমূল্য সাজে সজ্জিত অশ্বগণের সেবায় নিযুক্ত ছিল। হস্তিগণের পৃষ্ঠ হইতে হাওদা সমূহ তখনও উন্মোচিত হয় নাই। একস্থানে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিয়া কতকগুলি সৈনিক পুরুষ বাক্যালাপে রত; অল্প দূরেই মহার্ঘ

পরিচ্ছেদে ভূষিত জনৈক ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়া বীণা বাদন করিতেছিল।

সুমন এই ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, ঐ যে অরণ্য দেখা যাইতেছে, উহাই কি নিগ্রোধ অরণ্য?"

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিলেন—"হাঁ।"

"এখানে কি আছে?"

"এই স্থানে গৌতম মুনি বাস করেন। আমার প্রভুও তাঁহার সহিত আছেন। আমার প্রভু প্রভূত ধনশালী পরাক্রান্ত নৃপতি। তিনি বহুদূর হইতে মুনিকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন।"

সুমন অপরিচিত ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিয়া দ্রুতপদে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। কি শান্তির রাজ্য! বিশ্বনিয়ন্তার উপাসনার কি রমণীয় মন্দির! লোকালয়ের বিপুল ভজনাগার সমূহ ইহার তুলনায় কত তুচ্ছ। ইহার জন্য সুমন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এই মহাতীর্থে উপনীত হইবার পাথেয় স্বরূপ প্রাণপ্রিয়া ভগিনী প্রকৃতি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পবিত্রতায় স্বর্গও এই মহাতীর্থের নিকট ম্লান।

অবিলম্বেই সুমন বাঞ্ছিতের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার সম্মুখে। মহামুনি ভিক্ষুগণ পরিবেষ্টিত, নিকটেই অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত এক ব্যক্তি সোৎসুকে ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন। কিন্তু সুমন এ সমুদয় লক্ষ্য করিলেন না। তিনি ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ণিমেষ নয়নে তথাগতের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি আনন্দে আত্মহারা! ভগবান সুমনের প্রতি চাহিলেন। পরে সন্নিহিত নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"রাজপুত্র, এই বালককে দেখিতেছ? অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ও বলশালী ব্যক্তিরা যেখানে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, এই বালক সেখানে জয়ী হইয়াছে। ইহার মানসিক বল অতুলনীয়। বালক সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প সে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণের অধিকারী হইয়াছে। এস বৎস, তুমি আমাতে আশ্রয় লাভ কর।"

সুমন সাষ্টাঙ্গে বুদ্ধকে প্রণিপাত করিলেন এবং বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—ত্রিরত্নের শরণ লইয়া ধন্য হইলেন।

শ্রীকিরণকুমার রায়।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত মথুরা

চীনদেশীয় লোকেরা কোন্ সময় হইতে ভারতে যাতায়াত আরম্ভ করেন সেটা ঠিক জানা যায় না। তবে কনিষ্কের সময় হইতে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বহুল ভাবে চীনদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, সে কথাটা তাঁহাদের গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায়। চীনেরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর, তদ্দেশবাসী অনেকেই তীর্থ দর্শন করিবার অভিলাষে ও ভারতীয় আদি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র গুলির সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে ভারত-পর্য্যটনে আসিতেন। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলবস্তু, বুদ্ধত্ব লাভের স্থান উরুবিল্ব, ধর্ম্ম প্রচারের প্রথম স্থান ঋষিপতন, বৈশালী, শ্রাবস্তী ও রাজগৃহ প্রভৃতি প্রচার স্থান এবং পরিনির্ব্বাণ স্থান কুশীনগর, তাঁহাদের তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত ছিল।

গান্ধারের পূর্ব্ব সীমায় চীনভুক্তি নামে একটী স্থানে তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল, সেটী কোন্ স্থান, আজিও তাহার সনাক্ত হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে যখন হিউএন্থসাং ভারত পর্য্যটনে আইসেন, তখন তিনি চীন ভুক্তির একটী মঠে অতিথি রূপে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কনিষ্কের রাজত্ব সময়ে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ পাদে, কয়েক জন চীনদেশীয় রাজকুমারকে এখানে নজরবন্দী রূপে আটক রাখা হইয়াছিল।

শিশুক্রোড়ে নারীমূর্ত্তি (কুশন যুগ)

সেই মঠে কুবের ও জম্ভলা নামে দুইটী মূর্ত্তির পদতলে ভূগর্ভ মধ্যে চীনদেশীয় রাজকুমারেরা প্রচুর স্বর্ণ ও মণি মাণিক্যাদি প্রোথিত করিয়া রাখিয়া যান। মঠাধ্যক্ষ বৌদ্ধ স্থবিরেরা ইউএস্থসাংকে বলিলেন যে, চীন জাতি প্রতিষ্ঠিত এই মঠের সংস্কার জন্ত রাজকুমারেরা ধন রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা জানিতে পারিয়া একজন বিধর্ম্মী রাজা আসিয়া সেই ধন রত্ন অপহরণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি দৈব বিভীষিকা দেখিয়া নিরস্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। হিউ্এন্থসাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন।তিনি অতি পবিত্র হৃদয়ে

ও নিষ্ঠা সহকারে বুদ্ধদেবের চরণ-বন্দনা করিয়া সেই ধনরাশি বাহির করিয়া এবং সেই ভগ্নপ্রায় মঠের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

অদ্যাবধি অন্যূন পঞ্চাশ জন চৈনিক পরিব্রাজকের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ ভারতীয় নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এদেশেই দেহত্যাগ করেন। খৃষ্টীয় ৫৩৯ খৃষ্টাব্দে চীন্ সম্রাট 'উটিবা' গুপ্তবংশীয় সম্রাট জীবিত গুপ্তের নিকট মহাযান সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ গুলির সহিত একজন বৌদ্ধধর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। গুপ্তরাজ চীনদেশীয় দূতের সহিত পরমার্থ নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতকে চীন্‌দেশে গ্রন্থসহ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরমার্থ সেস্থানে যাইয়া বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির বিশদ অনুবাদ ও জটিল সমস্যাগুলির মীমাংসা করেন। ৭০ বৎসর বয়সে চীনের 'ক্যাণ্টন' নগরে পরমার্থের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

বোধিধর্ম্ম নামক একজন দাক্ষিণাত্যের রাজকুমার ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রথমে ক্যাণ্টনে, পরে লোয়াং নগরে যাইয়া বাস করেন। চীন্ দেশীয় অনেক শিল্পীর মুখে, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের কথা আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক জন ভারত সন্তান চীন্ দেশে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে।

যে সকল চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসিয়া ভারতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ফাহিয়ান্ ও হিউএন্থসাংয়ের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

ফাহিয়ান।

ফাহিয়ান্ খৃষ্টীয় ৩৯৯—৪১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতে ছিলেন। তখন গুপ্ত সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের রাজত্ব কাল। ইনি খোটানের পথ দিয়া ভারতে আসিয়া সমুদ্র পথে দেশে ফিরিয়া যান। তিনি মথুরার বিষয়ে যে বিবরণ দিয়াছেন, আমরা বিল সাহেবের (J. Beal) লিখিত গ্রন্থ হইতে নিম্নে তাহার অনুবাদ
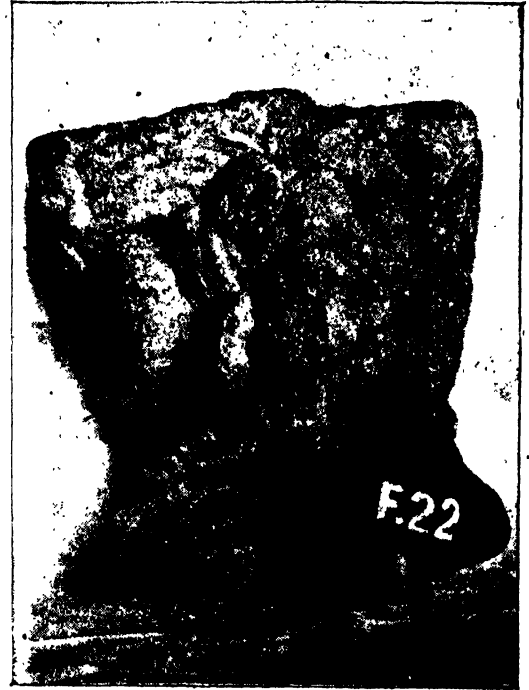
বেণুবাদিনী নারীমূর্ত্তি
(কুশান যুগ)

দিতেছি। ফাহিয়ান্ ও তাঁহার সঙ্গীরা পাঞ্জাব দেখিয়া; পুনা (যমুনার) গতি ধরিয়া মোথেলো (মথুরা) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। ফাহিয়ান এখানে যমুনার উভয় তীরে বিংশতিটি বৌদ্ধ সংঘারাম দেখিতে পান। তথায় প্রায় তিন সহস্র শ্রমণ ও বৌদ্ধ যতি বাস করিত। উত্তর ভারতের প্রায় সকল দেশের রাজাই তখন বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। যখন কোন রাজা, আমাত্য, বা রাজ পরিবারের লোকেরা অর্হৎ বা বৌদ্ধ স্থবিরের নিকট উপহারাদি লইয়া যাইতেন, তখন তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহারা নিজ মস্তকের উষ্ণীষ উন্মোচন করিতেন, এবং স্বজনগণ সহ, স্বহস্তে শ্রমণগণকে ভোজ্য বস্তু পরিবেষণ করিতেন। অর্হৎ ও শ্রমণগণের ভোজন শেষ হইলে, রাজারা পর্য্যন্ত বৌদ্ধ সভাপতির সম্মুখে নিম্ন ভূমিতে

কুবেরের অনুচর বা দ্বারপাল
(কুশান যুগ)

উপবেশন করিতেন। তাঁহারা কখনও স্থবির, অর্হৎ বা যতিগণের সহিত একত্র উচ্চাসনে বসিতেন না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে এসময় পর্যন্ত এইরূপ ভাবে যতিগণকে সম্মান দেখাইবার ব্যবস্থা ছিল। মথুরার দক্ষিণ দিকের প্রদেশ গুলিকে মধ্যদেশ বলিত। মধ্যদেশের জল বায়ুতে শীত গ্রীষ্মের প্রখরতা ছিল না, তথায় অধিক তুষারপাত হইত না। কখন কখন অর্হৎ এবং স্থবিরেরা রাজপ্রাসাদে যাইয়াও ভিক্ষা আনয়ন করিতেন। কোনও উৎসব কালে অর্হৎ ও স্থবিরেরা উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া উপদেশ দান করিতেন। জনসাধারণ তাঁহাদের সম্মুখে নিম্নে বিস্তৃত আসনে বসিয়া উৎসব দর্শন ও উপদেশ গ্রহণ করিত।

মথুরার অধিবাসীরা সর্ব্বাংশে সমৃদ্ধিশীল ও সুখী ছিল। প্রজারা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে রাজকর দিত। তাহাদিগের আবাস গৃহের জন্য কোনরূপ কর দিতে হইত না। কেহ আইন ভঙ্গ করিত না, সুতরাং শাসনকর্ত্তৃগণের সম্মুখে যাইতেও হইত না। যাহারা রাজ সরকারের ভূমি চাষ করিত, তাহারা স্বাধীনভাবে লাভের অংশ হইতে রাজকর দিত। তাহারা যথা তথা বিচরণ করিতে পারিত, কেহ তাহাদিগকে বাধা দিত না।

সাধারণ অপরাধে রাজারা কাহাকেও কায়িক বা প্রাণদণ্ড দিতেন না। তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে কেবল অর্থদণ্ড করিতেন। যদি কেহ রাজ-বিদ্রোহের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তাহার দক্ষিণ হস্তটী মাত্র কাটিয়া দেওয়া হইত। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা ভূসম্পত্তি হইতে নির্দ্দিষ্ট কর বা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। এখানকার লোকেরা জীবহত্যা বা মাদক সেবন করিত না। চণ্ডাল ভিন্ন অপর কেহই পেঁয়াজ বা লশুন খইত না। চণ্ডালেরা সহরের বাহিরে স্বতন্ত্র পল্লীতে থাকিত। যখন কোনও চণ্ডাল হাট বাজার করিতে নগরে যাইত, তখন একখানি কাষ্ঠ খণ্ড লইয়া শব্দ করিয়া পথিক ও অধিবাসিগণকে সতর্ক করিয়া দিত। লোকেরা সেই শব্দে সাবধান হইত। নাগরিক লোকেরা কুক্কুট বা শূকর পুষিত না ও হত্যা করিত না। অথবা জীবিত জন্তুর ব্যবসা করিত না। বাজারের কাছে শৌণ্ডিকালয় থাকিতে পাইত না। তাহারা কড়ি লইয়া ক্রয় বিক্রয় করিত। চণ্ডালেরাই কেবল পশু হত্যা ও মাংস বিক্রয় করিত। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর হইতেই দেশীয় রাজারা ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সেবার জন্য বিহার, গৃহ, উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্র সকল দান করিতেন এবং কেহ কেহ ভূমি কর্ষণের জন্য কৃষাণ ও বলদ পর্য্যন্ত যোগাইতেন, এই সকল ভূমির দানপত্র তাম্রফলকে লিখিত হইত। এক রাজার সময় হইতে অপর রাজার সময় পর্য্যন্ত সেই সকল দান পত্র চিরদিন সমভাবে বলবৎ থাকিত। কেহই তাহাদিগকে ঐ সকল ভূসম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সাহসী হইত না। বৌদ্ধ পুরোহিতেরাই কেবল তাহার উপসত্ত্ব ভোগের অধিকারী হইতেন।

সকল গৃহস্থ-পুরোহিতেরাই গৃহ সজ্জা, আচ্ছাদন,

লগুড় হস্তে কোনও দেবতা (কুশান যুগ)

ভোজ্য, পানীয় এবং পরিচ্ছদাদি অবাধে প্রাপ্ত হইতেন। শ্রমণ ও যতিরা কেবল মাত্র ধ্যান, মন্ত্র পাঠ ও ধর্ম্ম-কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতেন। অপর স্থান হইতে যদি কোনও বিদেশী শ্রমণ বা যতি আসিত, তাহা হইলে সংঘারামের প্রধান পুরোহিত স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহার বসন ও ভিক্ষা পাত্র নিজে লইয়া তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিহারে আনিতেন। তাঁহার পাদ প্রক্ষালনের জল, দেহ মর্দ্দনের তৈল ও বৈকালিক ভোজ্যাদি দিয়া, কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর তাঁহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হইত। এবং তাঁহার বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে তাঁহার সম্ভ্রমোচিত শয়নগৃহ, খট্টাঙ্গ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইত।

নারীমূর্ত্তি (কুশান যুগ)

এই মথুরায় বুদ্ধদেবের শিষ্য সারী পুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন ও আনন্দের নামে তিনটী পৃথক পৃথক স্তূপ ছিল। অভিধর্ম্ম, বিনয় পীঠক ও সূত্র পীঠক প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘারামও ছিল। বৎসরের দ্বিতীয় মাসে (বর্ষার এক মাস পরে) মথুরার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে প্রধান প্রধান ধার্ম্মিক পরিবারের লোকেরা আসিয়া এখানে ধর্ম্মোৎসব বা মেলার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা শ্রমণ ও ভিক্ষুগণের জন্য অশন বসনাদি লইয়া আসিতেন। মেলার সময়ে পুরোহিতেরা (স্থবির ও ভিক্ষুরা যাইয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। সাধারণ মেলার অবসানে সারীপুত্রের স্তূপে মহোৎসব হইত। তখন সে স্থানটীকে পুষ্পমাল্য পতাকাদিতে শোভিত করিয়া ধূপ, ধুনা ও চন্দন প্রভৃতির সৌরভে সুবাসিত করা হইত। দীপমালা জ্বালিয়া সমস্ত রজনী এ স্থানটিকে আলোকিত রাখা হইত সারী পুত্র, মহা কাশ্যপ ও মৌদ্‌গল্যায়ন—ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দই বুদ্ধদেবকে অনুনয় করিয়া নারীজাতিকে শিষ্য করিবার আদেশ লাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আনন্দ-স্তূপে

দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা, বামহস্তে পাণপত্র লইয়া কোন বৌদ্ধ দেবতা।

কেবল ভিক্ষুণীরা থাকিতেন। নবীন শ্রমণেরা প্রধানতঃ বুদ্ধতনয় রাহুলের পূজা করিতেন। অভিধর্ম্ম ও বিনয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ বিহারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সকল অর্হৎ বা বৌদ্ধ যতিকে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে হইত।

পূর্ব্বোক্তরূপ উপহার আদান প্রদানের ও উপদেশ দিবার পৃথক পৃথক দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা প্রজ্ঞা পারমিতা, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের উপাসনা করিত। দেশের সম্ভ্রান্ত জমিদার ও সম্পন্ন গৃহস্থ—এমন কি ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত অর্হৎ ভিক্ষু স্থবির প্রভৃতি বৌদ্ধ যতিগণকে, তুলা রেশম বা পশম নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ও নানাবিধ উপকরণ সকল উপঢৌকন দিতেন। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের কাল হইতে এইরূপ উপঢৌকন দিয়া সৌজন্য প্রদর্শন করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। ফাহিয়ান্ মথুরায় প্রায় একমাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

ফাহিয়ান্ মথুরায় কোনও ব্রাহ্মণ্য দেবতার কথা বলেন নাই। কিন্তু যখন এখানে ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল জানিতেছি, তখন অবশ্যই তাঁহাদের কোন না কোন শিব অথবা সূর্য্য দেবতা ছিলেন বলিয়া অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না। তবে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সর্ব্বাধিক প্রধান্য ছিল বলিয়া এবং রাজারা ইহার সপক্ষতা করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণ্য দেবতাগুলির প্রভাব ততটা হয়ত ছিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোন্ শিকার কোথায় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ ভল্লুককে, নানা স্থানে নানা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আমাদের এদেশে ইহাকে ভালুক এবং পশ্চিম ও অন্যান্য প্রদেশে, কোথাও 'ভাল' কোথাও বা ভালু' বলে।

ভালুক সাধারণতঃ পাহাড়ীয়া স্থানই ভালবাসে। ইহাদিগকে বাঙ্গলার কোন কোনও স্থানে, এবং আসাম, উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুরের পর্ব্বত সমাকুল স্থানে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার ভালুক, সচরাচর একটু ছোট আকারের এবং নাগপুর ও অন্যান্য কোন কোনও প্রদেশের ভালুক অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয়। কোন কোনও প্রদেশে, ইহাদের এত প্রাচুর্য্য যে, প্রায় যেখানে সেখানেই দেখা যায়।

দিনের বেলায়, ইহারা পাহাড়ের গহ্বরে, বা গভীর জঙ্গলে, প্রায়ই ঘুমাইয়া কাটায়। দিনে চলা ফেরা করা ইহাদের স্বভাব নয়; তবে সময় সময় আকস্মিক কারণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, দিনেও চলা ফেরা করিতে বাধ্য হয়।

দিন রাত্রির মধ্যে, বহুবার ইহারা এক এক স্থানে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কোঁ কোঁ করিতে থাকে, তাই ইহাদের জ্বর হয় বলিয়া, সাধারণ লোকের ধারণা। আমাদের দেশে যে সব ম্যালেরিয়া জ্বর খুব কম্প দিয়া হইয়া অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, উহাদের

ঐ জ্বরের সহিত লোকে উপমা দিয়া ভাল্‌কা জ্বর বলে। এখানকার সাধারণ লোকের অন্ধ বিশ্বাস আছে যে, ঐসব জ্বরো রোগীর গলায় ভালুকের লোমের মাদুলি পরাইয়া দিলে জ্বর আরাম হয়। আমার বাড়ীতে কতগুলি 'মাউণ্ট' করা ভালুকের মাথা দেওয়ালে লাগানো আছে। এই সব অন্ধবিশ্বাসী লোকের দৌরাত্ম্যে, উহাদের একটীরও ঘাড়ের লোম নাই।

পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল ভালুক মাংসাশী জন্তু নয়, সাধারণতঃ ইহারা কন্দ ও ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। কিন্তু আমাদের আসামে শিকারে যাওয়ার পর হইতে, সে ধারণা দূর হইয়াছে।

আমরা ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, ভালুক মৃত দেহ স্পর্শ করে না। কোন কোন পুস্তকেও ইহার উল্লেখ আছে। তাহা সম্পূর্ণ ভুল। সুবিধা পাইলে ইহারা মরা জানোয়ার ও পচা মাংসও খাইয়া থাকে। আমরা আসামে শিকার করিবার সময়, আমাদের গো গাড়ীর একটী বলদ মৃতপ্রায় হওয়ায়, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া গাড়োয়ানগণ চলিয়া আসে। এজন্য অবশ্য আমরা, উহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে গাড়ী ও গরুটীকে আনিতে লোক যাইয়া দেখে, বলদটী মরিয়া গিয়াছে এবং দুইটী ভালুক উহাকে খাইতেছে। পরে আমরা শিকার করিতে যাইয়া, ভালুক পাই নাই।

ইহারা যে মাংস খায়, তাহা "নর নাসিকা লোলুপস্য জীর্ণ ঋক্ষস্য মুখে পতিষ্যসি" (শকুন্তলা) এবং "ভল্লুকা মনুষ্যানাং নাসকাং গৃহ্লন্তি" (দশকুমার চরিত) এই সকল বাক্যেও প্রতিপন্ন হয়।

উই ঢিপি খুঁড়িয়া উহা খাইতে ভালুক বড়ই মজ্‌বুত। মধু পান করিতেও অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া ইহারা বৃক্ষস্থ মৌচাকে মুখ প্রবেশ করাইয়া, মধুপান করিয়া থাকে; তখন মৌমাছি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও নিবৃত্ত হয় না। মৌমাছির আক্রমণের সময়, ইহারা লম্বা লম্বা লোম গুলি ফুলাইয়া আত্মরক্ষা করে। ভালুক এমন কৌশলী যে, অনেক সময় মধুপান করিবার মতলব হইলেই, মক্ষিকাদংশন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, কাদায় গড়াগড়ি দিয়া তাহা শুকাইয়া, দেহটি যেন বর্ম্মাবৃত করিয়া লয়।

বসন্ত ঋতুতে মহুয়া, গজহর, ডুমুর ও বটফল প্রভৃতি ইহাদের প্রধান খাদ্য। শীতকালে জঙ্গলী কুল ও আমলকী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে।

ছোটনাগপুর প্রভৃতি পাহাড়ীয়া দেশে বিস্তর মহুয়া-বৃক্ষ দেখা যায়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে সেগুলি পুষ্পিত হইলে, ভালুকরা বৃক্ষের নীচে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক স্থলে গ্রামের ভিতরও চলিয়া আসিয়া, সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রিশেষে আপন আপন বাসস্থান পাহাড়ে চলিয়া যায়।

হাজারিবাগ ও ছোটনাগপুরের অন্যান্য কতক স্থানে, বিস্তর ভালুক দেখা যায়। সাধারণতঃ পাহাড় বা জঙ্গল তাড়াইয়া শিকারীকে মাচায় বা কোনও নিরাপদ স্থানে থাকিয়া, শিকার করিতে হয়। যাহারা, লোক দিয়া "ড্রাইভ্‌" করাইয়া শিকার করিতে ইচ্ছা করে না, তাহারা, জ্যোৎস্নারাত্রে, মহুয়া বা অন্য বৃক্ষের তলে যে সব স্থানে ভালুকেরা প্রায়ই আহার অন্বেষণে আইসে, সেই সব বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক বৃক্ষ মাচা করিয়া, অথবা নিকটেই কোনও স্থানে গর্ত্ত করিয়া, তাহা হইতে শিকার করে। অন্ধকার রাত্রে এই উপায়ে শিকার করা চলে না। আমি নিজে, যে প্রণালীতে বিভিন্নস্থানে ভালুক শিকার করিয়াছি, তাহা পরে বর্ণনা করিব।

ভালুকীরা, তাহাদের ছোট ছোট শাবকদের পিঠে করিয়া লইয়া চলে। অন্য জানোয়ারের মত শিশু-শাবকগুলি, বেশ একটু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ের সহিত হাঁটিয়া হাঁটিয়া চলে না।

ভল্লুকচরিত্রের একটী অত্যাশ্চর্য্য গল্প নিম্নে লিখিতেছি। ঘটনাটীর একাংশ আমি প্রত্যক্ষও করিয়াছি। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে, বোধ হয় ইংরেজী ১৮৯২ সনে আমি কলিকাতায় থাকা কালীন, আমার পিতৃবন্ধু···মিত্রজা মহাশয়, একদিন আসিয়া আমাকে

ভালুকী ও তাহার শাবক

জানাইলেন যে, সার্কুলার রোডের এক অনাথ আশ্রমে একটি ভালুকে পোষা মানুষ আছে; ইচ্ছা করিলে আপনি দেখিয়া আসিতে পারেন। এই আজগুবি গল্প শুনিয়া, তৎ পরদিন আমরা সেখানে যাইয়া, সত্যই একটী কোঠার মধ্যে একখানা তক্তার উপর, একটী ৮.৯ বৎসরের মেয়েকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পাই। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া উহাকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি জানালা খুলিয়া, 'গরাদের' ফাঁক দিয়া উহাকে ডাকিবামাত্র, মেয়েটী ২।১ বার তাকাইয়া, ঠিক চতুষ্পদ জন্তুর মত লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া, গরাদে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া, শিক চাপিয়া ধরিল। আমরা বাজার হইতে কিছু 'জিলিপী' আনাইয়া ঠোঙ্গাসমেত উহার হাতে দিলে, বেশ হাত পাতিয়া নিয়া খানিক হাসিয়া, বানর যেমন কোনও জিনিষ একহাতে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া লাফাইতে লাফাইতে যায়, সেইরূপ লাফাইতে লাফাইতে গিয়া তক্তায় বসিয়া ঠোঙ্গার জিনিষগুলি খাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মলমূত্রও ত্যাগ করিল।

এই মেয়েটীর চেহারা অত্যন্ত কদাকার, দাঁতগুলিও অত্যন্ত বিশ্রী ও অসমান, মুখখানা চ্যাপ্টা। অধিকাংশ সময়ই হাত ও পায়ে ভর দিয়া চলাফেরা করার দরুন, হাত পায়ের তলা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে যেন কিছু লম্বা ও কর্কশ হইয়া গিয়াছিল। নখগুলিও লম্বা ছিল। তখন পর্য্যন্তও কথা বলিতে পারিত না; অস্বাভাবিক রকমের ২।১টী চীৎকার করিত মাত্র। এইতো গেল ইহার মোটামুটী চেহারা ও অবস্থা। ইহাকে পাওয়ার গল্পটী যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা আরও বিস্ময়কর।

আমাদের দেশের ৬৭ মাস পূর্ব্বে, দার্জ্জিলিং এর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে, এক ব্যক্তি একটী ভালুক-শিকার করার সময় দেখিতে পান যে, বন্য জন্তুর শাবক যেমন মাতার পাছে পাছে যায়, একটীও সেইরূপ ভালুকীর পাছে পাছে যাইতেছে। তখন ইহা যে কি জানোয়ার, তিনি তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। কিন্তু ভালুকটীকে গুলি করিয়া মারার সময়, উহার চীৎকারে সঙ্গে সঙ্গে এইটীও যাইয়া, আহত ভালুকীকে জড়াইয়া ধরে। ইহার পর নিকটে গিয়া মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়া, তিনি উহাকে লইয়া আইসেন। ইহাও প্রকাশ পায় যে বহুদিন পূর্ব্বে একটী ভুটীয়া স্ত্রীলোক, এক শিশু সন্তান সহ কাঠ কাটিতে গিয়া বনে ভালুক কর্ত্তৃক নিহত হয়। তদবধি তাহার সেই সন্তানটিকেও আর পাওয়া যায় নাই। ইহাতেই লোকে অনুমান করে যে, এই সেই অপহৃত শিশু; বহুদিন ভল্লুক কর্ত্তৃক লালিত পালিত হওয়াতে বন্য ভাবাপন্ন হইয়াছিল। এই ঘটনা অবগত হইয়া, অনাথ আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ মেয়েটীকে আনিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন।

ঈশ্বর জানেন গল্পটী সত্য কি রচিত। কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মেয়েটীর অবস্থাদৃষ্টে ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। আমি আসিবার সময় অনাথ আশ্রমে ২৫৲টী টাকাও দিয়া আসিয়াছিলাম।

কখনো কখনো ভালুক ও বাঘ, শৃগাল কুকুরের মত ক্ষিপ্ত (Rabid) হয়। তখন উহারা জঙ্গল হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গিয়া, নামমাত্র জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া, বিনা কারণে বহু লোককে জখম করে। সেই সময় ইহারা ভয়ানক হইয়া উঠে। নিম্নে একটী ক্ষ্যাপা ভালুক এবং ক্ষ্যাপা বাঘের গল্প লিখিতেছি।

ঘটনাটী প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩০৪ কি ১৩০৫ সনে, আমাদের বাটী মুক্তাগাছার মাইল খানেক দূরে তারাটি গ্রামে, এক ভালুক আসিয়া অনেক লোককে জখম করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ সংবাদ মিথ্যা বলিয়াই মনে করি; কারণ ঐ স্থানে বা উহার ২।৪ মাইলের মধ্যেও ভালুক থাকিবার মত কোন জঙ্গল আছে বলিয়া আমাদের জানা ছিল না। মুক্তাগাছার ৮।৯ মাইল দূরে, মধুপুরের জঙ্গলে সময় সময় ভালুক দেখা যায়। তথা হইতে হয়তো কোন রকমে চলিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া, আমার জ্যাঠতুতো ভ্রাতা স্বর্গীয় মহেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও জ্ঞাতি দাদা প্রবীণ শিকারী শ্রীযুক্ত বরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়দিগকে, দুইটী হাতী সহ পাঠাই। সেদিন বিশেষ কোনও কার্য্যে আমাকে ময়মনসিংহ টাউনে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া—বিশেষতঃ সত্যকথা বলিতে কি, আমি এই সংবাদে বড় বেশী আস্থাস্থাপন করিতে পারি নাই বলিয়াও,—নিজে যাই নাই। শিকারান্তে বরদা বাবুর মুখে যে গল্প ও তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়াছিলাম, তাঁহার ভাষাতেই অবিকল লিখিতেছি :—

"তুমি হাতী পাঠাইয়া দিলে, আমি 'ফতেমা'তে ও মহেশ 'বাগট পিয়ারী'তে চড়িয়া, ১৫ • মিনিট মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলাম। তারাটির বিলের নিকটে গিয়া দেখি, ২।৩ শত লোক মাঠে একত্র হইয়া জটলা করিতেছে। সেখানে কোনও জঙ্গল নাই দেখিলাম; তখন মাঠের কোন ফসল ছিল না। লোকগুলির নিকটে গিয়া ভালুকের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা শতাধিক গজ দূরবর্ত্তী একটা ঝোপ দেখাইয়া দিল। ঝোপটী আর কিছুই নহে, ক্ষেতের আইলের উপর কতকগুলি লতাগুল্ম বেষ্টিত একটী শেওড়া গাছ। ঝোপটীর ব্যাস ৫।৬ গজের অধিক নহে। এই অবিশ্বাস্য কথায়, বৃথা পরিশ্রম করিয়া আসিলাম, মনে করিয়া, অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, পরে ঝোপের দুই পার্শ্বে আমাদের দুইটী হাতী লইয়া গেলাম। ঝোপের ভিতর একটু গাঢ় জঙ্গল থাকাতে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। মহেশ ঝোপের অপর পার হইতে খানিক উঁকি-ঝুঁকি দিয়া, আমাকে কিছুই না বলিয়া, দম্ করিয়া এক আওয়াজ করিয়া দেয়। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই ভালুক বিকট চিৎকার করিয়া (ভালুকের এই জাতীয় চীৎকারকে আমাদের দেশে ঠাঁটা বলে) আমাকে চার্জ্জ করিয়া

বাহির হয়। বোধ হয় আমার মুখ উহার দিকেই ছিল। বলা বাহুল্য আমাদের উভয় হাতীই ভাগড়া ছিল; ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই দুই হাতী দুইদিকে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। আমার অসতর্ক অবস্থায় হাতী দৌড় দেওয়ায় পড়িতে পড়িতে কোন রকমে বাঁচিয়া যাই। পরে স্থির হইয়া বসিয়া পিছন ফিরিয়া দেখি যে, ভালুক আমার হাতীর পাছে দৌড়িয়া আসিতেছে; হাতী এক একবার পেছন ফিরিয়া ভালুক দেখে, আর ক্রমাগত দৌড়ায়। তখন ভালুক হাতীর অনেক পেছনে পড়িয়া যায় আবার একটু পরেই ভালুক খুব জোরে দৌড়াইয়া হাতীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়ে। এইভাবে মাইল দেড়েক আন্দাজ হাতী ও ভালুকের দৌড় চলিবার পর, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বাঁশ বাগানে হাতী ঢুকিয়া পড়ায় হাতীর উপরে বসিয়া থাকা, আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। বাঁশ গলায় বাঁধিয়া হাতী হইতে পড়িয়া যাইবার সময় সৌভাগ্যক্রমে একেবারে না পড়িয়া হাতীর গদির রশি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম। গদির দড়ি বাম হাতে ধরাতে, হাতী হইতে পড়িয়া যাই নাই। সৌভাগ্য যে, ডান হাতে তখনও বন্দুক ধরাই ছিল। ঝুলিয়া পড়াতে আমার পা মাটী হইতে হাত খানিকমাত্র উপরে ছিল। হাতী ও ভালুক কিন্তু তখনও সমভাবেই দৌড়াইতেছিল। এই অবস্থায় নীচের দিকে তাকাইয়া দেখি, ভালুক এক একবার আমার পা কামড়াইয়া ধরিবার জন্য দৌড়াইতে দৌড়াইতে মুখ উচু করিয়া লাফ দিবার চেষ্টা করিতেছে, আমিও তখন পা একটু উঁচু করি।

"এই অবস্থা বোধ হয় বড় জোর মিনিট দুইয়ের বেশী স্থায়ী ছিল না একটু পরেই আমার বাম হাত অবশ হইয়া গেল; কাযেই আমি পড়িয়া গেলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি পড়িয়াও দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। ভালুক কিন্তু আর হাতীর পাছে পাছে না গিয়া, মুহূর্ত্ত-মধ্যে আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াই, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া দুইপায়ে দাঁড়াইল। ভালুকটা উঁচুতে প্রায় আমার সমানই হইয়াছিল। নিমেষের মধ্যে এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে আমি আর গুলি করিবার অবকাশ পাইলাম না; কাযেই নিরুপায় হইয়া বন্দুকটী দুই হাতে আড় করিয়া ঠেলিয়া ধরিলাম। তখন ভালুকও বন্দুকের নলের উপর দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আমার হাত কামড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় ভালুকটা ক্রমাগত এত জোরে ফোঁৎ ফোঁৎ করিতেছিল যে, উহার মুখের থুথু লালা প্রভৃতি আমার চোখে মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। সেই সময় "কর্ত্তাকে খাইল কর্ত্তাকে খাইল" বলিয়া কতকগুলি লোকের কোলাহল আমার কাণে আসিল। আমি প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলিতে লাগিলাম। এইরূপ খানিকক্ষণ ঠেলাঠেলির পর আমার ডানহাতে উহার মুখ ঠেকিল। ভালুক যে আমার হাত কামড়াইয়া ধরিয়াছে, তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। নিরুপায় হইয়া শেষ চেষ্টা করিবার জন্য বন্দুকের নল দিয়া যথাশক্তি উহাকে ধাক্কা দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার এই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। ধাক্কা খাইয়া ভালুকটা পড়িয়া গিয়া, কি জানি কেন আর আমার দিকে না ফিরিয়া গুড় গুড় করিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমিও পুনরাক্রমণের ভয়ে Twelve bore rifle দিয়া গুলি করিলাম। আমার গুলির খুব ভাল effect হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গেই ভালুকটা পড়িয়া গিয়া গড়াইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় গুলি করিয়া দৌড় দিলাম। হঠাৎ কোটের আস্তিনের দিকে নজর পড়ায় দেখিলাম, উহা রক্তে ভিজিয়া লাল হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া রক্ত ধুইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া লইলাম।

"আহত ভালুকটীকে একটু পরেই মারিয়া আনিল। আমি পড়িয়া যাইবার পর, আমার শিকারী হাতী ক্রমাগত দৌড়াইয়া ৩।৪ মাইল দূরে খাগডহরা গ্রামে গিয়া থামিয়াছিল।"

দাদা মহাশয়ের হাতে ৪টী দাঁতই বিঁধিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাহসী শিকারী বলিয়াই সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। "নার্ভাস্" লোক হইলে কি বিপদই যে হইত, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অনেক

দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ডাক্তারের অধীন থাকিতে হইয়াছিল।

এইরূপ দশ এগার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মাধববাড়ী গ্রামে একটী ছোট লেপার্ড আসিয়া বিনা কারণে ক্রমাগত অনেক লোক জখম করিতেছিল। আমাদের মুক্তাগাছায় উমাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক এক ডাক্তার ভদ্রলোককে দুইটী হাতী সহ পাঠান হয়। বাঘটি ১৭।১৮ জন লোক জখম করিয়াছিল! উমাচরণ বাবু যাইবার সময় রাস্তায়ও সংবাদ পাইলেন যে, তখনই একজন বৈরাগীকে জখম করিয়াছে। পঁহুছিয়া জানিতে পারিলেন, ঐ বৈরাগী, লোকজনের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও জঙ্গলের নিকট দিয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিল। বাঘটি প্রভুকে দেখিবামাত্র হঠাৎ আলিঙ্গন করায় প্রভুও তাঁহাকে মালা ও ঝুঁড়োজালী সমেত হরিনামে দীক্ষিত করিয়া, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ২।৪টি হাঁচড় কামড় পাইয়া কোনরূপে পৈতৃক প্রাণটি লইয়া পলায়ন করেন। বাঘটি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার অল্প পরেই ডাক্তারবাবু উহাকে বিষ্ণুলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিনা কারণে এই সব লোক ঘাল করাতেই মনে হয় ইহারাও শৃগাল কুকুরের মত ক্ষিপ্ত হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই যে সমস্ত লোক জখম হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককেই মুক্তাগাছা আনাইয়া, উপযুক্তরূপে লোহা দাগ দিয়া, কাহারও কাহারও হাতে Pot. Permanganas দ্বারা ধৌত করান হইয়াছিল। কিন্তু এই সব লোকের মধ্যে কেহ পরে হাইড্রোফোবিয়া (জলাতঙ্ক) হইয়া মারা গিয়াছে কি না জানা যায় নাই।

অনেক সময় বাঘিনীর বাচ্চা সঙ্গে থাকিলে বা উহারা গরম হইলে বিনা কারণে লোক জখম করে। কিন্তু জঙ্গল ছাড়িয়া গ্রামে ঢুকিয়া বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহাকে পায় তাহাকেই কামড়ান ক্ষিপ্ত না হইলে সম্ভবপর নহে।

বন্য জন্তুদের মধ্যে অনেক সময় চর্ম্মরোগ হইতেও দেখা যায়। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একবার এক ঢেঁকীশালে শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর একটি লেপার্ড মারিয়াছিলেন। উহাকে লেপার্ড বলিয়া চেনা খুব কঠিন হইয়াছিল। উহার সর্ব্বাঙ্গে খোস হইয়া একটি লোমও ছিল না। চুলকানির যন্ত্রণায় ঢেঁকীঘরে আশ্রয় লইয়া অনাহারে কঙ্কালসার হইয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া ছিল। বাঘটি মারার পর কেহ উহাকে ঘৃণায় স্পর্শও করে নাই। আমরা পরে মুচি পাঠাইয়া উহার নখগুলি কাটাইয়া আনাইয়াছিলাম। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, এই জাতীয় ব্যারাম বুঝি কেবল কুকুরেরই হয়; কিন্তু বাঘটির এই অবস্থা দেখিয়া আমার সে ভুল ধারণা দূর হইয়া ছল।

একবার আমরা 'খণে' শিকার করিবার সময় একটি সাদা বাঘ মারিয়াছিলাম। ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া শিকারভূমি অভিমুখে অনেকদূর অগ্রসর হইলে, দূর হইতে সাদা একটা কি যাইতেছে দেখিয়া কেহ কুকুর কেহ বা বাঘ ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল। সেখানে জঙ্গল বেশী ছিল না বলিয়া দূর হইতে দেখিবার অসুবিধা হইতেছিল না। হাতী দৌড়াইয়া নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল বাঘই বটে, কিন্তু প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে। বাঘটি মারিবার পর, উহার সাদা চামড়ার উপর কালো গুলগুলি, বেশ মনোরম দেখাইতেছিল। আমাদের মধ্যে কোন শিকারী ইহাকে Snow-leopard বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন; কিন্তু পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে ব্যাঘ্রাদি পশুরও albino হয়। শ্বেতি (Leucoderma) রোগগ্রস্ত লোক যেমন সাদা হইয়া যায়, ইহারাও সেইরূপ হইয়া থাকে।

আর একবার একটি Tigressকে মনুবাবু মারিয়াছিলেন। তাহার রংও খুব light ছিল, তবে পূর্ব্বোক্ত লেপার্ডের মত অত সাদা হয় নাই। ইহাকেও আমরা প্রথম অবস্থায় অ্যালবিনো বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। অ্যালবিনো হইলে ইহাদের বলবীর্য্যের লাঘব হইতে দেখা যায় না।

ভালুক একদিকে যেমন হিংস্র, তেমন ইহাদিগকে শিশু কাল হইতে পোষ মানাইলে চমৎকার পোষ মানে; ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। বাজিকরগণ কলকেতে

তামাক বা গাঁজা সাজিয়া হাতে করিয়া ভালুকের মুখের কাছে ধরিলে, ভালুক উহা সোঁ সোঁ করিয়া টানিয়া ভস্ম করিয়া ফেলে, সে দৃশ্য অতি চমৎকার। কিন্তু গঞ্জিকা সেবনের পর ইহাদের নেশা হয় কিনা বুঝা যায় না।

ভালুকের স্বভাবই এই, ইহারা চার্জ্জ করিবার সময় দৌড়াইয়া, সম্মুখের দুই পা দিয়া ধরিবার চেষ্টা করে।

বাঘ ও ভালুক উভয়কে এক শ্রেণীর বন্দুক দ্বারা শিকার করা চলে। দুই একজন শিকারীর নিকট শুনিয়াছি, ইহারা এক গুলিতে মরিতে চায় না। কিন্তু আমি যত গুলি মারিয়াছি তাহার সবই প্রায় 12 Nitro Paradoxএর এক গুলিতেই শেষ করিয়াছি। কদাচিৎ ২,৩ গুলিও ব্যবহার করিতে হইয়াছে। দূরে হইলে কোন কোনটা 500 Express Rifle দিয়াও মারিয়াছি।

হায়না, উল্ফ (wolf) বন্যকুকুর (wild dog) বাঙ্গলায় দেখা যায়না। ইহাদের যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, ছোট নাগপুর এবং উড়িষ্যা প্রদেশে বিস্তর দেখা যায়। আমি কিছুদিন চুনার ও হাজারীবাগে থাকার সময়, বহু হায়না ও wolf শিকার করিয়াছি। ঐসব স্থানে wolfকে 'লাকৃড়া' বা 'নেকড় বাঘ' ও হায়নাকে 'হুড়াড়' বলে। নেকড়া গুলি আকারে শৃগালের মত ও হায়না তদপেক্ষা কিছু বড় হয়। এই সব স্থানের হায়না গুলি দেখিতে বাঘের মত ডোরা বিশিষ্ট; ইহাদিগকে Striped হায়না বলে। অন্য আর এক প্রকারের হায়না পশুশালায় দেখিয়াছি; তাহা এই সব স্থানে কখনও দেখি নাই।

ইহাদিগকে একটা বা কদাচিৎ দুইটাও একত্রে দেখিয়াছি। নেকড়া গুলি কোন কোন সময় ৫,৭,১০টা কি আরও বেশী একত্র দলবদ্ধ হইয়া চলে; তখন ইহারা আরও অধিক হিংস্র হইয়া উঠে। আমার চোখে এরূপ কখনও পড়ে নাই। ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহারা ২।৪ শতও এক এক দলে থাকে। সাধারণতঃ আমি যখন ইহাদিগকে একক অবস্থায় দেখিয়াছি, তখন আমার নিকট ভীতু বলিয়াই মনে হইয়াছে।

ইহারা সচরাচর রাত্রে চলা ফেরা করে এবং গ্রামের ভিতর আসিয়া ছোট ছোট কুকুর ও ছাগল ধরিয়া লয়। হাজারিবাগ টাউনের উপরও, রাত্রে আমাদের বাসার নিকট অনেক সময় আসিত। পচা মাংসই ইহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। হাজারিবাগে আমি ২ ৩ রাত্রে কশাই খানার ভিতর থাকিয়া, যখন উহারা রক্ত খাইতে আসিত, তখন শিকার করিয়াছি।

নেকৃড়া গুলি, অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে পিলে ধরিয়া লইয়াছে বলিয়া হাজারিবাগ থানাতেও কয়েকটা রিপোর্ট হইতে শুনিয়াছি। ইহারা নরখাদক হয় বলিয়া, ছোটনাগপুর অঞ্চলে ইহাদিগকে শিকারের জন্য, গভর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। তবে সাধারণ পুরস্কার অতি সামান্য।

ইহাদিগকে নিকটে পাওয়া গেলে ছররা দ্বারাও মারা চলে।

বন্য কুকুর আমি কখনও শিকার করি নাই। শুনিয়াছি ইহারা দলবদ্ধ হইয়া চলে এবং সেই সময় অত্যন্ত হিংস্র হয়। এইরূপ অবস্থায় যখন কোন পাহাড়ে ইহাদের আবির্ভাব হয় তখন তথাকার মৃগ, মহিষ, শশক প্রভৃতি ছোট বড় হিংস্র অহিংস নির্ব্বিশেষে প্রায় সমস্ত জন্তুই, পাহাড় ছাড়িয়া পলায়ন করে। আমি যখন উড়িষ্যার সম্বলপুর অঞ্চলে শিকার করিয়াছি, তখন একবার তত্রত্য এক গ্রাম্য শিকারী, একটী বন্য কুকুর মারিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছিল।

হাজারিবাগের নিকটে 'কেনেরি' নামে একটী পাহাড় আছে। অনেক ইংরেজ উহাকে জিব্রাল্টার হিল‌ও বলিয়া থাকেন। ঐ পাহাড়ে অনেক 'হায়না' থাকে। আমি ছাগল বাঁধিয়া নিকটে বসিয়া থাকিয়া, দুইবার দুইটীকে মারিয়াছিলাম।

অনেক স্থলে আমরা বড় বড় পাহাড় beat করিয়া শিকার করিবার সময়, জঙ্গল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু বড় শিকারের প্রত্যাশায় ইহাদিগকে আমরা মারিতাম না।

শূকর।

আমাদের ময়মনসিংহ জেলায় ও সিলেট অঞ্চলে সাধারণ লোকে 'শূকর'কে 'শিকার' বলে। ইহারা অনেক সময় জঙ্গলের ভিতর খড় ও পাতা দিয়া 'কুঁড়ে' প্রস্তুত করিয়া, সপরিবারে বাস করে। ইহার ভিতর শূকরীগণ একবারে ২৫।৩০টী বাচ্চা পর্য্যন্ত প্রসব করে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি কালো, এবং কতকগুলি পিঠে ডোরাবিশিষ্ট হয়। বড় হইলে ডোরা গুলি মিলাইয়া যায়; নচেৎ বনে অনেক ডোরা বিশিষ্ট শূকর দেখা যাইত। পোষা শূকরের 'বাচ্চার' পিঠে প্রায়ই ঐরূপ ডোরা দেখা যায় না। বন্য ও গৃহ পালিত শূকরের এই পার্থক্য, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ গণের ভাববার বিষয়। বন্য শূকরের উৎপাতে, জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী স্থানে কৃষিকার্য একেবারে অসাধ্য। ইহারা ধানের ছড়া কামড়াইয়া ধরিয়া, সমস্ত ধানগুলি ছাড়াইয়া লয়।

হাওদায় শূকর শিকারে বিশেষ কোন আমোদ নাই। তবে প্রতিবারই শিকারে বাহির হইয়া, বহু শূকর মারিয়াছি; তাহা কতকটা খেয়ালের বশেও বটে, কতক বা বৎসরান্তে শিকারে বাহির হইয়া, হাত একটু সেট্‌ করিবার জন্যও বটে। কখনো কখনো আবার স্থানীয় হাজং, গারো ও নমঃশূদ্রদের অনুরোধেও মারিতে হইয়াছে। যাহারা শূকর শিকার করিতে ইচ্ছুক, হাঁটিয়া শিকার বা ঘোড়ায় চড়িয়া pig sticking করাই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত। Pig sticking করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি আনন্দদায়ক ও বীরত্বব্যঞ্জক। ইহাতে অনেক সময় শিকারীও ঘোড়া সমেত আক্রান্ত হইয়া বিপদগ্রস্ত হয়। যাহাদের pig sticking এর সুবিধা নাই, তাহাদের পক্ষে হাঁটিয়া শূকর মারাও কম আমোদজনক নহে। অনেক সময় সাবধান হইয়া ইহাদের মারিতে না পারিলে, আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের দেশে, নমঃশূদ্র ও মুচিরা আর এক রকম শূকর শিকার করে; তাহা খুব সাহসের কায। জঙ্গলের এক বা দুই দিক জাল দিয়া ঘিরিয়া, তাহার নিকট ইহারা বড় বড় বল্লম লইয়া, বসিয়া থাকে। এই বল্লমকে দেশভেদে 'চাঙ্গ' 'চেঙর' কাতরা জাঠি কালা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহারা শূকর দেখিলেই রাগাইবার জন্য, হাত তালি দিয়া উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহাদের দেখিয়াই, শূকর যখন "চার্জ্জ" করিয়া আসিতে থাকে, অমনিই উহারা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বল্লমের ডাঁট বগলে চাপিয়া ধরিয়া, শূকরের গায়ে ঠেকাইয়া দেয়। শূকর গুলি আপনাদের জোরেই বিঁধিয়া যায়। যদি ইহারা বল্লম দেখিয়াই, অথবা উহাতে একটু বিঁধিলেই, ঘুরিয়া গিয়া আক্রমণ করে তবেই বিপদ। কিন্তু উহাদের জাতির স্বভাব তাহা নয়। যে দিকে গোঁ ধরিবে, প্রাণান্তেও তাহা ফিরিবে না। এই জন্যই প্রচলিত কথায় "শূয়রে গোঁ" বলিয়া থাকে।

অনেক সময় শূকর বলশালী ও শিকারী দুর্ব্বল হইলে, ইহারা বিদ্ধ হইয়াও শিকারীকে উল্টাইয়া ফেলে। কেন কোন সময় বল্লমের ডাঁটও ভাঙ্গিয়া যায়, তখন অন্যে আসিয়া সহায়তা করে। এই অবস্থায়, শূকর নিজে বিদ্ধ হইয়াও, সময় সময় শিকারীকে জখম করিয়াছে, এরূপও ঘটিয়াছে।

হাজারিবাগে ভালুক শিকারে গিয়া পাহাড় beat করিতে করিতে আমি এক শূকর মারিয়াছিলাম। অত-বড় শূকর আমি খুব কম দেখিয়াছি। শূকর যে অত বড় হইতে পারে তাহা আমার ধারণাই ছিল না। দেখিতে ঠিক মহিষের বাচ্চার মত উঁচু ছিল; ১২ জন লোক উহাকে বহন করিয়া আনিয়াছিল। তখনই আমার সঙ্গের সাঁওতাল beater গণ, উহার মাংস কাটিয়া ভাগ করিয়া লয়। এত প্রচুর মাংস হইয়াছিল যে, প্রায় দুই শত কুলির প্রত্যেকেই যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছিল।

পাইথন সর্প।

Python নামক এক প্রকার সাপ আমাদের অঞ্চলে, সুন্দর বনে ও আসাম প্রভৃতি বহু স্থানে দেখা

যায়। আমাদের দেশে ইহাদিগকে 'চক্র বোড়া' কোন কোন স্থানে বা 'খেড়মুর' সাপ বলে। ইহারা উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের boa constrictor জাতীয় সাপের পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাদের শরীরে বড় বড় কালো ও পীতাভ চক্র থাকে; কিন্তু ইহারা ফণা (hood) ধারী নহে। ইহারা সাধারণতঃ ১৫২০ ফিট লম্বা হয়। কিন্তু শোনা যায় কোন কোনটা নাকি ২৫।৩০ ফিট লম্বাও হইয়া থাকে। ইহারা শিকার ধরিয়া ২।৩টা পেঁচ দিয়া, ক্রমে চাপিয়া চাপিয়া মারে বলিয়াই constrictor পদবী পাইয়াছে। ছাগল, হরিণ প্রভৃতি ধরিয়া, পেষণ করিয়া গিলিয়া ফেলাই ইহাদের স্বভাব। আমরা অনেক সময় শিকারে যাইয়া ইহাদিগকে কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সাপুড়িয়াগণ, অনেক সময় এই জাতীয় সাপ বাক্সে ভরিয়া আনিয়া দেখাইয়া থাকে।

আমাদের শিকার পার্টিতে, আমার হাতীর দারোগা আশ্রফ আলীর, অন্ত শিকারে দক্ষতা যেমনই থাকুক, সর্প কুলের ধ্বংস সাধনে অত্যন্ত উৎসাহ দেখা যাইত।

আমরা নেপাল টেরাইতে শীকার করিবার সময়, একদিন একটী প্রকাণ্ড অজগরকে লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। উহার মুখ ও লেজের দিকটা স্বভাবিক রকমে বড়ই ছিল; কিন্তু মাঝের কতকটা স্থান ভয়ানক মোটা দেখা গেল; যেন কিছু খাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। ইহাকে মারিয়া, ক্যাম্প আনিয়া পেট চিরিলে দেখা গেল যে, আস্ত একটা 'হগ্‌ডিয়ার' গিলিয়া ফেলিয়াছে। ২।১ দিন পূর্ব্বেই বোধ হয় উহাকে খাইয়াছিল, কারণ তখনও উহা হজম হয় নাই; মাত্র কতকটা বিকৃত হইয়াছিল। হরিণটীর ছোট ছোট দুইটী শিংও ছিল। শিং শুদ্ধ এই আস্ত জানোয়ারকে গেলা, এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হইল।

আর একবার আমাদের বাড়ীর অদূরে, 'মুক্তাটী' গ্রামে অনেকদিন পূর্ব্বে এই জাতীয় আর একটী সাপ মারিয়াছিলাম।

১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে, সবে মাত্র দেশের সব ওলট্ পালট্ করিয়া আমাদের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আমাদিগকে পথে বসাইয়াছে। সেই সময় একদিন দুপুর বেলা, আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা ৺মহেশ বাবু আসিয়া বলেন যে "মুক্তাটিতে একটা সর্পে, একটা ছাগল ধরিয়াছে, চল মারিয়া আসি।" তখনই তাঁহার সঙ্গে গোটা কতক ছররা ও বন্দুক লইয়া গিয়া দেখি 'আমিয়ান' নদীর ধারে এক ঝোপের নিকট বহু লোক জড় হইয়াছে দূর হইতে এক একবার খুব জোরে ছাগলের ডাকও শুনিতে পাইলাম। নিকটে গিয়া দেখি সাপে ছাগলটীর একটী পা ধরিয়া, উরুদেশ অবধি গিলিয়াছে। ছাগলটা এক একবার সম্মুখের দুই পায়ে জোর করিয়া, প্রাণপণ চেষ্টায় ২।৪ পা অগ্রসর হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাপের গলাও লম্বা হইয়া যায়। হয় ছাগলের জোরেই হয় কি সাপটা ইচ্ছা করিয়াই ঢিল দেয়, বলিতে পারি না। আবার একটু পরেই সাপের আকর্ষণে, ছাগলটা পিছাইতে থাকে। এই অবস্থা দেখিয়া তখন আমার ছিপে মাছ ধরার কথা মনে হইয়াছিল। আমরা না গেলে, হয়ত ২।৪ ঘণ্টায় ছাগলটাকে গিলিয়া ফেলিত। যাহা হউক, সাপটীকে মারিবার পরই, ছাগলটী মুক্ত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলৎশক্তি হীন হইয়া পড়িয়া ছিল। যদিও উহার পা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, তথাপি উহার হাঁড় ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু পায়ের স্থানে স্থানে স্থানে দাঁতের আঁচড় দেখিয়াছিলাম।

ইহাদিগকে প্রায়শঃই একটা করিয়া, কোন কোন স্থানে দুইটাকে মিলিতাবস্থাতেও দেখিয়াছি। কিন্তু শ্রীহট্টের তরফিয়া নামক স্থানে, এক নদীর ধারে নলবনের মধ্যে, এই জাতীয় সাপের এক বৃহৎ পরিবার দেখিয়াছিলাম; নানা আকারের ২০।২৫ টা একত্র কুণ্ডলী পাকাইয়া ছিল। আমাদের ক্যাম্প ডাক্তার উমাচরণ বাবুকে বন্দুক দিয়া মারিতে দেওয়া হয়। তিনি ঐ সর্প স্তুপের উপর ৭।৮টা গুলি করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার উত্তর তিনিই দিবেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।
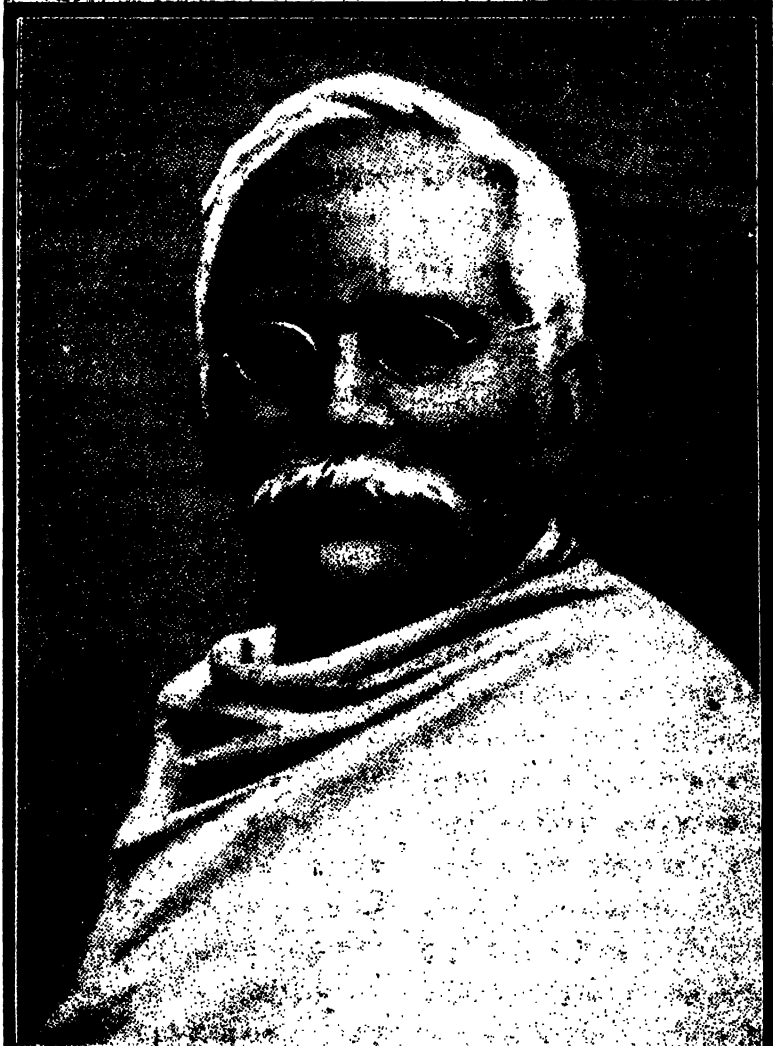
পরলোকগত ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত।

("বঙ্গবাণী"র সৌজন্যে)

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

বরিশালের অশ্বিনীবাবু আর ইহলোকে নাই! বাঙ্গালী যে কি রত্ন হারাইয়াছে, বঙ্গজননী যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা বুঝাইবার জন্ত ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই।

অশ্বিনী বাবু কে? তিনি কি ছিলেন? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বাঙ্গালায় একজন যথার্থ ও অনন্যসাধারণ লোকনায়ক ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র প্রকৃত লোক-নায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়—তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত। এরূপ মনে করিবার কারণ কি তাহাতে বিপিনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন; সুবক্তা, কিন্তু দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নহেন। সুললিত বাক্য যোজনা করিয়া তিনি বহু লোককে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের বন্যা ছুটাইয়া তাহাদিগকে আত্ম-হারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন না। তিনি সাহিত্যিক, তাঁর 'ভক্তিযোগ' বাংলাভাষায় একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু যে সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁর নাই। তিনি দরিদ্র নহেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তির দ্বারা তাঁর সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হয়; কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি-এল পাশ করিয়া কিছু দিন ওকালতি করিয়াছিলেন; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণী-দলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না, কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমত চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়াও লোকে সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে অশ্বিনীকুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্ম্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্বলাভ করা যায়। অশ্বিনী-কুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন: ইচ্ছা করিলে অশ্বিনীকুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁর বিদ্যার ও চরিত্রের গুণে রাজকার্য্যে তিনি যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়েও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম্ম ও কৃতিত্ববলে, সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্বলাভ হয়, অশ্বিনীকুমার তার কিছুরই দাবী করিতে পারেন না। তথাপি তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোকনায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মি-গণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না। * * * বহুবৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয় মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহচর বা কমিশনরের বিশ্বস্ত বন্ধু, নহেন; তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দ্দিনের সহায় এবং দুঃখে কষ্টে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানে। অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিত্বের মোহিনী শক্তি বলেও নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায় ভাবে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এদেশে অধুনা একমাত্র অশ্বিনীকুমারে এই লোকনেতৃত্বের কতকটা আভাস পাই।"

যে সাধু চরিত্র, যে আন্তরিক স্বদেশপ্রেম, এবং সর্ব্বোপরি যে গভীর ভগবৎপ্রেম আমাদের দেশে আদর্শ বলিয়া অনুসৃত হওয়া উচিত, তাহা অশ্বিনীকুমারের সরল অথচ গৌরবময় জীবনের প্রতি কার্য্যে পরিদৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা সেই

গৌরবোজ্জ্বল জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালি মহকুমার লাউকাঠী গ্রামে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী অশ্বিনীকুমার জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত বিচারবিভাগে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; ছোট আদালতের অন্যতম বিচারক হইয়াছিলেন। ব্রজমোহন অশ্বিনীকুমারের জন্মকাল হইতেই তাঁহাকে মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; সকলকে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সমভাবে দেখিতে শিখাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প শুনা যায়। একবার কোনও ভদ্রলোক ব্রজমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, ব্রজমোহন অশ্বিনীকুমারকে তাঁহার জন্য তামাকু সাজিয়া আনিয়া দিতে বলেন। ইহাতে সেই ভদ্রলোকটি অবাক হইয়া গেলেন এবং ব্রজমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্রের দ্বারা এরূপ নীচ ভৃত্যের কায করাইতেছেন কেন? ব্রজমোহন উত্তর দিলেন, "আমি চাই যে আমার ছেলে এখন হইতে বুঝে যে, তাহাতে ও ভৃত্যে কোনও প্রভেদ নাই। ভৃত্য নীচ বংশে জন্মিয়াছে আর সে উচ্চ বংশে জন্মিয়াছে, এরূপ অভিমান যেন কখনও তাহার মনে না আইসে।" এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়াই অশ্বিনীকুমার মানুষ হইয়াছিলেন এবং অসংখ্য বালককে এইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে আজীবন প্রয়াস পাইয়াছেন।

অশ্বিনীকুমার কৃষ্ণনগর কলেজ ও কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা, পরীক্ষা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষা এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম-এ পরীক্ষার পর বি-এ পরীক্ষা দিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। অশ্বিনীকুমারের বয়স যখন তের বৎসর তখনই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিয়ম ছিল যে, ষোল বৎসর পূর্ণ না হইলে কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বয়স বাড়াইয়া দেয়। এবং এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর অশ্বিনীকুমার উক্ত নিয়মের বিষয় অবগত হন। অসাধু উপায়লব্ধ এই সুবিধা ভোগ করা সত্যপ্রিয় অশ্বিনীকুমারের নিকট অন্যায় বলিয়া মনে হইল। তিনি সেই জন্য কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিয়া যথানিয়মে বি-এ পরীক্ষা দিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু বি-এ পরীক্ষা প্রদানে বিলম্বের জন্য তাৎকালীন নিয়মানুসারে তাঁহার নাম অনার্স-ইন আর্টস বা সম্মানের সহিত এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের তালিকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রাবস্থাতেই—অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে—অশ্বিনীকুমার তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল যশোহরে "সাধারণ ধর্ম্মসভা" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। বাল্যকাল হইতে অশ্বিনীকুমার ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং প্রথম যৌবনে কেশবচন্দ্র সেন ও রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অত্যন্ত উদার মত পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত ধর্ম্মসভায় খৃষ্টান হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকগণ একসঙ্গে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন তাঁহার এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। একজন অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের মনে যে এরূপ উদার কল্পনার উদয় হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার কিছুদিন শ্রীরামপুরের চাতরা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি বরিশালে ওকালতী আরম্ভ করেন। শুনা যায় তিনি একবার কলিকাতাকে তাঁহার কর্ম্মস্থল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ঋষক রাজনারায়ণ বসুর উপদেশে তিনি বরিশালেই জীবনের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করেন।

ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীক্ষবুদ্ধি, কর্ম্মনিপুণতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার গুণে তিনি যথোচিত প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত

ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মাদ্রাজ কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন, "যদি অশ্বিনীকুমার এই ব্যবসায় পরিত্যাগ না করিতেন তাহা হইলে তিনি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।" কিন্তু অন্যত্র অশ্বিনীকুমারের ডাক পড়িয়াছিল। তাঁহার বিরাট হৃদয় স্বজাতির ও স্বদেশের উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। তাঁহার মহৎ প্রাণ তিনি উচ্চতর ক্ষেত্রে উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার মনের তাৎকালীন ভাব বোধ হয় তাঁহারই রচিত একটি সঙ্গীতের প্রারম্ভে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে:—

আমি প্রাণ বিলাব, প্রাণ বিলাব,
প্রাণ বিলাব জগন্ময়।
উচু-নীচু মানব না ত সবাই যেন লুঠে লয়॥
তিল তিল নেবে সবে; আমার জীবন ধন্য হবে,
আমার ত আর নাহি রবে,
সবাইর মাঝে হব লয়॥

অশ্বিনীকুমার আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপকের পবিত্র ব্রত—নবীন জাতি সংগঠনের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য—গ্রহণ করিলেন। পিতা ব্রজমোহন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বরিশালে পুত্রের সহিত বাস করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের উচ্চ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি উচ্চ বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন। অশ্বিনীকুমার উহার শিক্ষক, উহার অধ্যক্ষ, উহার প্রাণস্বরূপ হইলেন। এই বিদ্যালয়ের নাম হইল "ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসন।" পরে অশ্বিনীকুমারের ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় এই বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে উহাতে এফ-এ এবং পরবৎসর হইতে বি-এ ও বি-এল শ্রেণী খোলা হয়। অশ্বিনীকুমার এই কলেজের গৃহনির্ম্মাণ ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহার্থ ৩৫ হাজার টাকার অধিক ব্যয় করেন।

অশ্বিনীকুমার এই বিদ্যালয়ে বিনা পারিশ্রমিকে দীর্ঘকাল কেবল যে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন তাহাই নহে, তিনি ছাত্রগণের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষের জন্য সমধিক যত্ন লইয়াছিলেন। কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন—

অধ্যয়ন অধ্যাপনা নহেরে দুষ্কর
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।

অশ্বিনীকুমার ছাত্রগণকে কেবল পুঁথিগত উপদেশ শিক্ষা দেন নাই; তাঁহার নিজের আদর্শ চরিত্র, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতা দ্বারা নবীন ছাত্রগণকে উচ্চ নৈতিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রগণের মনুষ্যত্ব উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে Little Brotherhood of the Poor বা দরিদ্রবান্ধব সমিতি নামক একটি সমিতি স্থাপিত করেন। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত। পীড়িতের সেবা, আর্ত্তের ত্রাণ এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচনই এই সমিতির উদ্দেশ্য। অশ্বিনীকুমারের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার ফলে কলেরা বা অন্য মহামারীর প্রকোপের সময় ছাত্রগণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পীড়িতের সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। পতিতারাও তাহাদের সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন, "এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া স্বহস্তে নীচজাতীয় রোগীর বিছানাদি মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়াছে; এমন কি সময়ে সময়ে লোকাভাব ঘটিলে অস্পৃশ্য চণ্ডালাদিরও মৃতদেহ আপন স্কন্ধে বহিয়া সৎকার করিয়া আসিয়াছে।" অশ্বিনীকুমারের এই বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া মাদ্রাজ ও বোম্বাই নগরেও কোন কোন বিদ্যালয়ে এইরূপ দরিদ্র বান্ধব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ছাত্রগণের নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষার জন্য উক্ত বিদ্যালয়ে ষ্টুডেন্টস্ ফ্রেণ্ডলি ইউনিয়ন নামক একটী সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তিন বৎসর হইল অশ্বিনীকুমার এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে উহাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। গত জুন মাসে কলিকাতা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বিদ্যালয়কে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের তিনটী বিভাগ—সাধারণ শিক্ষা, শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা ও চিকিৎসা শিক্ষা দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে।

হ্যর এণ্ড্ ফ্রেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ অশ্বিনীকুমারের এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার বহুদিন ধরিয়া বরিশাল মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও বরিশাল জিলা বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বহু সরকারী অনুসন্ধানসমিতিতে সদস্য নিযুক্ত হইয়া দেশের উপকার সাধন করিয়াছিলেন। বীটসন বেল প্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাঁহার নিকট হইতে শাসনকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছিলেন। বহুকাল ধরিয়া উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সহযোগিতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সুরাপান নিবারণের জন্য অশ্বিনীকুমার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ভারতবন্ধু কেইন (W. S. Caine) তাঁহাকে পরমবন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে "আবকারি" পত্রে অশ্বিনীকুমারের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, সুরাপান নিবারণ কার্য্যে যাঁহারা প্রথমাবধি তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনিই অগ্রগণ্য।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বরিশাল জনসভার সম্পাদকরূপে অশ্বিনীকুমার যে কার্য্য করেন তাহা নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসার যোগ্য। আট বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে পঁহুছিবামাত্র রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি সোৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। বরিশালে ১৫৫টি বিভিন্ন সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়া ক্রমান্বয়ে সাতমাস ছাত্রগণের সাহায্যে সপ্তাহে ছয় হাজার টাকা বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল পরিচালক ছিলেন না—দুর্ভিক্ষকেন্দ্র গুলিতে কর্ম্মী পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না, পরন্তু স্বয়ং দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া সেবা ও সাহায্য বিতরণ দ্বারা সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা "বরিশালের স্কুল মাষ্টারের" এই কার্য্যকে বাঙ্গালার ইতিহাসে অতুলনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসের একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। তিনি অনেকগুলি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশাল প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯১৩ সালে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সেও তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া বঙ্গবাসী তাঁহার প্রতি বাঙ্গালার সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শিত করিয়াছিল।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমারের নৈতিক অকুতোভয়তা ও চরিত্রের বলে স্বদেশী আন্দোলন পূর্ব্ববঙ্গে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁহার "কংগ্রেস" নামক বহুতথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন,—

"অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে দেশের লোক এমন ভাবে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিল—এমন ভাবে স্বাবলম্বী হইল যে, গবর্ণমেণ্ট বলিলেন, সরকারের শক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে। বাজারে বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণ, বিদেশী চুড়ী আর বিক্রয় হয় না দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বুলার নূতন বাজার বসাইলেন। সে বাজারে নহবৎখানা নির্ম্মিত হইল, কিন্তু নহবৎ বাজাইবার বাজন্দার পাওয়া গেল না; একজন মাত্র দোকানী (হৃদয়) পুরাতন কাপড়ের একখানা দোকান খুলিয়া বাজারে বসিয়া বুলারকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাইতে লাগিল :'এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই।' শুনিয়াছি, কোন লোক এক বোতল বিলাতী মদ লইয়া বারাঙ্গনা-গৃহে গমন করিলে বারাঙ্গনারা সেই মদের বোতল সহ তাহাকে ধরিয়া অশ্বিনীবাবুর কাছে হাজির করিয়াছিল। জিলার কর্ত্তারা প্রমাদ গণিয়া অশ্বিনীবাবুকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। বড়লাট লর্ড মিণ্টো গোখলে মহাশয়কে অশ্বিনীবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার বিষয় জানিয়া বলিলেন, এমন লোককে নির্ব্বাসিত করা সঙ্গত নহে, তুষ্ট করাই কর্ত্তব্য। অশ্বিনীবাবু সে যাত্রায় নিস্তার পাইলেন বটে, কিন্তু শেষে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অশ্বিনীকুমার ও আর ৮জন বাঙ্গালীকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল।"

বরিশাল কনফারেন্স কিরূপে ভাঙ্গিয়া যায় ও কিরূপে অশ্বিনীকুমার গবর্ণমেণ্টের রোষভাজন হন সে সকল অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা এস্থলে না করাই শ্রেয়। অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট স্যর ব্যামফাইল্ড ফুলার তাঁহাকে স্বদেশী আন্দোলন পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে অশ্বিনীকুমারকে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পত্রখানি এইস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

Government House
Shillong, 14-8-1906

Dear Sir,

Before leaving India I must write to beg of you, for your countrymen's sake, to take the opportunity, that my resignation affords, of abandoning a position of hostility to the British Government which must be fraught with evil consequences. It has been a matter of deep regret to me that you should have taken so prominent a stand in opposing a Govern ment which only needs the co-operation of the leaders of the people to benefit the country very greatly ; and I have been hoping all along that you would reconsider your position. For you are, I am aware, not one of those who render to their country lip service only. To the cause of education you have devoted practical and successful effort, remembering that philanthropy is shown by deeds. I beg that you will reflect upon the situation and upon the harm, which the agitation is causing to the youth of your people, and emphasise the self denial you you have practised in the past an act of renunciation, which however distasteful, will be for the lasting benefit of those whose interests you haue at heart.

Yours truly,
(Sd) Bampfylde Fuller.

অশ্বিনীকুমার এই পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে নহেন, তবে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত কোন কোন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি অল্পকাল পরেই নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অশ্বিনীকুমার কয়েকটি উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য। ব্যাঙের সুরে তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব—

আগ্নময়ী মাগো আজি
মাগো, মাগো, মাগো আজি, ডাকি সকলে মা।
জগৎ জোড়া ওই যে আগুন,
এক ফিন্‌কি দে তার মা,—মা, মা, মা।
নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে আগুনের মেলা,
খেলিস নিশিদিন আগুনের খেলা,
একটু কি তার পাবনা মোরা,
তুই মা দিবি না? মা, মা, মা,।
ওই আগুনের একটু পেলে,
এই মড়া প্রাণ উঠবে জ্বলে,
পুড়ে হব সোণা—মা, মা, মা।

দীপ্ত রুদ্র (বা) দাবানলে পুড়ে আবর্জ্জনা। ইত্যাদি।

অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ের উদারতা ও আন্তরিকতার জন্যই তাঁহাকে জনসাধারণ দেবতার আসনে বসাইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তদ্বিরচিত 'চরিতকথা' নামক গ্রন্থে একটি ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য—

"স্বদেশী আন্দোলনের যখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে একটা অতি বিস্তৃত ও স্বল্প বিত্তর সঙ্গতিসম্পন্ন

নমঃশূদ্র সমাজ আছে। * * * নমঃশূদ্রেরা কোনও বিষয়েই দেশের অপরাপর শূদ্রগণ অপেক্ষা হীন নহে অথচ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা স্বচ্ছন্দে অপর শূদ্রদের জল গ্রহণ করেন; নমঃশূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। * * * বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান স্বদেশ সেবক নমঃশূদ্রকে একদিন কেহ বলেন, 'বাবুরা ত বন্দেমাতরম্ বলিয়া ভাই ভাই এবঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাদের ভাই; কথাটী মন্দ নয়!' ও একথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খটকা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনীবাবু সেই অঞ্চলেই উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্ত এই নমঃশূদ্র স্বদেশ সেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপর বসিয়া ছিলেন। শয্যার নিকটেই একটা ফরাস পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তারপর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন, 'বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যথন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিলাছি 'বন্দেমাতরম্' সত্য এবং আমরা আপনাদেরই ভাই।" বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন "ঘটনাটী অতিক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে, কি সহজ কি সামান্ত ও স্বাভাবিক উপায়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার এই অনন্তপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারা যায়।"

ইহাতে যেন কেহ না মনে করেন যে অশ্বিনীকুমার হিন্দু সমাজের বিধি নিষেধের পক্ষপাতী ছিলেন না। বিপিনচন্দ্র লিখিয়াছেন, "সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমার হিন্দু সমাজের সমস্ত বিধি নিষেধের পরিপোষক; কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি সকল সংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া উঠেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও বক্তৃতা দেন নাই, কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্য এবং মানবের কল্যাণের জন্ম অনেক স্থানেই তিনি জাতিভেদ প্রথার গ্রন্থি শিথিল করিয়াছেন।" দেশের কাযের জন্ম জাতিভেদ ভুলিতে হইবে, হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য দূরীভূত করিতে হইবে —ইহাই ছিল অশ্বিনীকুমারের অভিপ্রায়; তাঁহার সম্পূর্ণ উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশ সঙ্গীতেও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে;

মান অপমান ছাড়ি, আয়রে সবে কায করি,
যে কায যে করতে পারি, তবে ত মঙ্গল॥
আমি উচ্চ জাতির ছেলে, এই অভিমানে ভুলে,
নিতান্ত যে অকর্ম্মা হলে, গেলে রসাতল॥
ঐ যে চাষা চাষ করে, কে বলিবে ছোট তারে,
সেও যেমন তুমিও তেমন, সমান যে সকল॥
কেবা ছোট কেবা বড়, যে যেই কার্য্যেতে দড়,
সে সেই কার্য্য কর, পাইবে সুফল॥ ইত্যাদি

পুনশ্চ,—

আয়রে আয় ভারতবাসী আয় সবে মিলে,
প্রণমি ভারত-মাতার চরণ-কমলে।
আয়রে মুসলমান ভাই আজি জাতিভেদ নাই,
এ কাযেতে ভাই ভাই আমরা সকলে।
ভারতের কাযে আজি, আয়রে সকলে সাজি,
ঘরে ঘরে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে।
আগে তোরা পর ছিলি, এখন তোরা আপন হলি
হইরে তবে গলাগলি, ভাই ভাই বলে।
ভারতের যেমন মোরা, ওরে ভাই তেমনি তোরা,
ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গেছে চলে।
আয়রে ভাই সবে মিলে, মাখি ভারতের ধূলি,
এমন আর পবিত্র ধূলি, নাহি ভূমণ্ডলে,
এ ধূলি মস্তকে লয়ে, ভাবেতে প্রমত্ত হ'য়ে,
হিন্দু যবন কায করিব জাতি-ভেদ ভুলে। ইত্যাদি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌবনে অশ্বিনীকুমার কেশবচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্রাহ্ম নেতাদের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি উদার হিন্দুধর্ম্মেই আস্থাবান ছিলেন। "ভক্তিযোগ" নামক বিখ্যাত পুস্তকে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি কি, ভক্তির অধিকারী কে, কাম-ক্রোধাদি রিপু দমনের উপায়, প্রবৃত্তি দমনের উপায়, হিন্দুর ভক্তিসাধন, ক্রম, লক্ষণ প্রভৃতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মূলতঃ সকল ধর্ম্মই এক এবং ভক্তিই ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় ইহা প্রতিপাদন-কার্য্যই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে সত্য সত্যই একটি অপূর্ব্ব জিনিষ। শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন এম-এ এই পুস্তক খানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া রেভারেণ্ড ষ্টপফোর্ডব্রুক, প্রফেসর ডাউডেন, এবং বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াচের প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ উহার উচ্চ প্রসংসা করিয়াছেন। ষ্টোপফোর্ড ব্রুক লিখিয়াছিলেন, "এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার পর আমার মনে হইল যেন আমি কর্ম্মকোলাহল পূর্ণ প্রতীচ্য জগৎ হইতে অন্য এক জগতে নীত হইয়াছি।" অধ্যাপক ডাউডেন লিখিয়াছিলেন, "আমি ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি, এবং প্রাচ্য প্রতীচ্য অধ্যাত্মিক পন্থার ঐক্য দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।" স্যর নারায়ণ চন্দাভারকর মার্টিনোর Endeavour after a Christian Life এবং জেরেমি টেলরের Holy Living এবং অন্যান্য জগৎ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমূলক গ্রন্থের সহিত উহার তুলনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছে এবং ইংরাজী ব্যতীত উহা মারাঠী ও তামিল ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। তামিল সংস্করণটি দক্ষিণ ভারতের অনেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ভক্তিযোগ ব্যতীত অশ্বিনীকুমার 'প্রেম', 'ভারত-গীতি' 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১৩২৩-৪ সালের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে তাঁহার 'কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধীয় যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পাঠকগণকে নূতন করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। সেই অনন্যসাধারণ কর্ম্ম-যোগীর প্রতিভা-প্রদীপ, মানসী ও মর্ম্মবাণীর গৌরব কতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছিল এবং পাঠকগণের কিরূপ জ্ঞান ও আনন্দ বর্দ্ধনের কারণ হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

অশ্বিনীকুমার সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দি, মারাঠি, পাঞ্জাবী ভাষা জানিতেন। তিনি শিখদিগের 'গ্রন্থসাহেব' এবং তুলসীদাসের রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের মূল পাঠ করিতে আনন্দ বোধ করিতেন।

অশ্বিনীকুমার নীরব সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি বরিশালে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং আজীবন উহার সভাপতি ছিলেন। গ্রামে গ্রামে বক্তা পাঠাইয়া কৃষকদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচার করা এবং বালকগণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অশ্বিনীকুমার তিন শত টাকা [illegible]র্ষিক আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

এক বৎসর হইল অশ্বিনীকুমার বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কঠিন হৃদ্‌রোগে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। পর বৎসর পুনরায় অসুস্থ হওয়ায় তিনি পুনর্ব্বার কলিকাতায় নীত হন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেই অবধি তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, মন চক্ষু ও জিহ্বা বিকল হইয়া পড়ে। তিনি ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। গত কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু সঙ্কটকাল কাটাইয়া উঠেন। গত ২১শে কার্ত্তিক [৭ই নভেম্বর ১৯২৩] অকস্মাৎ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং ঐ দিবসেই ভবানীপুর চক্র-বেড়িয়া রোডস্থ আবাস ভবনে বেলা ৩ ঘটিকার সময় অশ্বিনীকুমার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন।

বরিশালবাসীর অভিপ্রায়ানুসারে শবদেহ তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র বরিশালে লইয়া যাইবার কল্পনা হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে শবাধার না পাওয়ায় সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয় এবং কেওড়াতলায় শ্মশানঘাটেই তাঁহার অন্তিমকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার ভস্মাবশেষ মহাসমারোহে বরিশালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের কোনও সন্তান নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও ভ্রাতা ৺কামিনীকুমারের দুই পুত্র এবং অসংখ্য আত্মীয় বন্ধু তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত জাতীয় ও ধর্ম্ম সঙ্গীত গাহিতে শবানুগমন করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমারের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাঁহার সকলই ফুরাইল? আমরা বলি না, না, না,। তাঁহার দেশবাসী হিন্দুমুসলমানগণ সকলের জন্য তাঁহার জীবনের সেবাব্রত ও ত্যাগের পবিত্র আদর্শ রহিল। সেই মধুর চরিত্রের, সেই অকপট স্বদেশ প্রেমের, সেই অটল ভগবদ্‌ভক্তির উজ্জ্বল স্মৃতি রহিল। আর রহিল, মহাজাতি সংগঠনী তাঁহার সেই প্রতিভা-প্রেরিত উদ্দীপনাময় বাণী—

এক সাথে হিন্দু-মুসলমান,
ছাড়িয়া হিংসা দ্বেষ, ধরিয়া নবীন বেশ
(হও) নবীন ভারতে আগুয়ান॥
দিব্যধাম হতে তোদের জগতে
আসিয়াছে অপূর্ব্ব আহ্বান।
সে ধ্বনি শুনি কাঁপিছে অবনী,
দেশে দেশে উঠিয়াছে তান।
এখনো বধির হয়ে স্বার্থের পুটুলি লয়ে
এখনো কি রহিবি শয়ান?

অশ্বিনীকুমারের গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ! অশ্বিনীকুমারের জীবন সঙ্গীতের ঝঙ্কার এখনও নীরব হয় নাই। সেই অনুপম সঙ্গীতের সুর কি কাহারও হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিবে না?

স্বদেশের হিত লাগি প্রাণ ঢেলে দাও রে।
ও ভাই আর্য্য নামে, কি সম্ভবে, জীবনে দেখাও রে।
নরনারী মিলি সবে ভারতবর্ষে আজি,
দেশের কাযের জন্যে রে ভাই স্বার্থ ভুলে যা রে॥

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কুঞ্জ-মিলন

(চিত্রকর—শ্রীঅনিলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৩০ | ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের উত্তর ভারতের ধর্ম্মস্থাপক

ঐতিহাসিক কালে যে সকল ধর্ম্মস্থাপক বা শিক্ষক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই আপনাকে কোনও ধর্ম্মমতের আদিস্থাপক বা আবিষ্কর্ত্তা বলেন নাই, বা আপনার প্রচারিত ধর্ম্মমতকে নূতন মত বলেন নাই। সকলেই বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতই আদিকালের সনাতন মত; মধ্যে গ্লানি হইয়া সম্পূর্ণ বা আংশিক ধর্ম্মলোপ হইয়াছিল, তিনি আবার উদ্ধার করিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে ২৪জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ঐ শ্রেণীর পঞ্চবিংশতিতম ও শেষ বুদ্ধ; তাঁহার পর আর কেহ বুদ্ধ হইবে না। জৈনদের বর্দ্ধমান বা মহাবীর স্বামী তীর্থঙ্কর শ্রেণীর চতুর্ব্বিংশতিতম ও শেষ তীর্থঙ্কর; এযুগে আর কেহ তীর্থঙ্কর হইবে না। তাঁহার পূর্ব্বেকার তীর্থঙ্করদের নাম ধাম ইত্যাদি জৈনগ্রন্থে পাওয়া যায়। এমন কি ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্করকে ঐতিহাসিক যুগের লোকই বলিতে হয়। বর্দ্ধমানের জন্মের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে যে এই ২৩তম তীর্থঙ্কর স্থাপিত মত প্রচলিত ছিল তাহারও নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তের ধর্ম্মস্থাপকেরাও ঐরূপ বলিয়াছেন। আরবদেশের পয়গম্বর মহম্মদ যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন তাহার বক্তা স্বয়ং অল্লাহ্ তালা (জগদীশ্বর)। তিনি বলেন যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম বা ইসলামের আরম্ভ প্রথম সৃজিত মনুষ্য (আদম) হইতে; মধ্যে আদম প্রচারিত একেশ্বরবাদ কলুষিত হইয়া মূর্ত্তিপূজায় পরিণত হইয়াছিল মহম্মদ পুনরুদ্ধার করিলেন। তিনিও আপনাকে খাতিম উল মুরসলেন (প্রেরিত পুরুষ মধ্যে শেষ ব্যক্তি) বলিয়াছেন; তাঁহার পর আর পয়গম্বর জন্মিবে না। যীশু ইহুদায় পয়গম্বর শ্রেণীর অন্যতম, তবে তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার পর অন্য লোক আসিবে।

যাহা হউক খৃষ্টের জন্মের ৫।৬ শতক পূর্ব্বে উত্তর

ভারতের সাধারণ দেশবাসীর মনে একটা জিজ্ঞাসার ভাব উদিত হইয়াছিল। সকলেই প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্ম মতে আস্থাহীন হইয়া সত্য ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল। সকলেই আশা করিয়াছিল যে শীঘ্রই কোন ধর্ম্মস্থাপক বা জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইবে, কিন্তু কোথায় কোন বংশে হইবে কেহই বলিতে পারে পারিত না। মহাত্মা যীশু ও মহম্মদের জন্ম সময়েও এইরূপ একটা "আস্‌ছেন আস্‌ছেন" ভাব সাধারণকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল।

যে কারণেই হউক দেশের সাধারণ লোক ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। দেশময় যজ্ঞ কর্ম্মের নামে অসংখ্য পশু বধ করা হইত। সামান্য সামান্য কারণে যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হইত। যজ্ঞকারীর ধন মান ও যশের অনুপাতে বলির পশুসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত। এতগুলি প্রাণী বধ করিয়া যজ্ঞকারীর ধর্ম্ম ও মোক্ষলাভ সম্ভব কি না এ প্রশ্ন শিক্ষিত অশিক্ষিত ছোট বড় সকলের মনেই উদিত হইত। যে কেহ ধর্ম্ম উপদেশ দিতে আরম্ভ করিত, তাহাকেই লোকে প্রথমে উদ্ধারকর্ত্তা ভাবিত, তাহার উপদেশ শুনিতে যাইত, পরে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিত। এ সময়ে ধর্ম্ম প্রচারকের অভাব ছিল না খৃষ্টপূর্ব্বে ৫.৬ শতাব্দীতে ১ পূর্ণ কাশ্যপ, ২ গোশালা, ৩ সঞ্জয়, ৪ অজিত কেশ কম্বল ৫ কাকুদ কাত্যায়ন, ৬ নির্গ্রন্থ জ্ঞাত্রিপুত্র বা বর্দ্ধমান বা মহাবীর স্বামী ও ৭ গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধ—এই সাতজন প্রাচীন ধর্ম্মস্থাপকের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধমান স্বামীর মতাবলম্বী জৈন ও গৌতম সিদ্ধার্থের মতাবলম্বী বৌদ্ধ এখনও আছেন। অন্য শিক্ষকদের মতাবলম্বীরা লোপ পাইয়াছে।

দেশে বেদমতাবলম্বী ছাড়া (আরও ২।৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে স্থাপিত) পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ যথেষ্ট ছিলেন। পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী সন্ন্যাসীদের নিগন্থ (বা নির্গ্রন্থ, গ্রন্থিহীন,বন্ধন হীন) বলিত ও গৃহস্থদের শ্রাবক বলিত। জৈনরা বলেন নির্গ্রন্থ সম্প্রদায় আদিকালে (কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে) ঋষভদেব স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা এমন বলেন যে এই সম্প্রদায় হয় পার্শ্বনাথ স্বামী (খৃঃ পূঃ ৮৭৮—৭৭৮) স্থাপন করিয়া ছিলেন, কিংব তাঁহার কিছু পূর্ব্বে অন্য কোনও মহাপুরুষ স্থাপন করিয়া থাকিবেন। আমার বিশ্বাস যে যখন ব্রাহ্মণেরা সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপন করিলেন ও তাহাতে অব্রাহ্মণদের গ্রহণ করিলেন না, এমন কি বিশ্বামিত্রের মত লোককেও ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম বলিয়া রাজর্ষি পদবী দিলেন কিন্তু ব্রহ্মর্ষি পদবী দিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখনই বা অল্পকাল পরে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের উপেক্ষা করিয়া আপনাদের জন্য স্বতন্ত্র এক আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহার নাম "নির্গ্রন্থ" আশ্রম রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরাই গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের গ্রন্থে নিজেদের যতটা সম্মাননীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়েরা সেরূপ সম্মান করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীরামচন্দ্র ও পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে ক্ষত্রিয় ছিলেন, এখন ব্রাহ্মণেরাও সেই ক্ষত্রিয় অবতারের মূর্ত্তি পূজা করিতে দ্বিধা করেন না।

যাহা হউক খৃঃ জন্মের ৫.৬ শতক পূর্ব্বে পবিত্র উত্তর ভারত ভূমির কোশল দেশে প্রায় সমসাময়িক দুইজন প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বর্দ্ধমান ও সিদ্ধার্থ। উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। উভয়ে ৩০ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। উভয়েই রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদ এবং স্বাস্থ্য ও যৌবনরূপ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান ছিলেন। উভয়ে এই সকল আকাঙ্ক্ষিত কাম্যবস্তু অপবিত্র বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়া একমাত্র কৌপীন সম্বল করিয়া অনন্ত পথের পথিক হইয়াছিলেন। উভয়ে যে ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও জীবিত আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশুদ্ধভাবে এখন তাহার জন্মস্থানে নাই বটে; কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সিকিসংখ্যক মানব এখনও গৌতম সিদ্ধার্থকে পথপ্রদর্শক ত্রাতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ভারতের আধুনিক হিন্দুরা তাঁহার অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের স্থাপিত ধর্ম্ম ভারতের বাহিরে

কখনও যায় নাই বটে (না যাইবার উপযুক্ত নানা কারণও আছে) তথাপি ভারতের ধনবান ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার মতাবলম্বীর সংখ্যা অল্প নহে। যদিও আধুনিক জৈনদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসায়ী, তথাপি সকলে বৈশ্য নহে। রাজপুতানায় অনেক ক্ষত্রিয় রাজপুত জৈন অর্থাৎ অহিংসা ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ ব্যবসায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ এখন "ওস্‌ওয়াল" নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা বাধ্য হইয়া কুসীদজীবি ও ব্যবসায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতাবাসী জৈনদের মধ্যে ওসওয়াল রাজপুত অনেক আছেন। বঙ্গবাসীরা তাঁহাদের ও মরুদেশ বাসী বৈষ্ণব বণিকদের মধ্যে কোনও প্রভেদ না করিয়া সকলকেই এক মাড়ওয়ারি সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

উভয় ধর্ম্মস্থাপকই (বর্দ্ধমান ও সিদ্ধার্থ) জিন, অর্হৎ, বীর, মহাবীর, সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, তথাগত, সিদ্ধ, বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, পরিনিবৃত্ত, মুক্ত, মারজয়ী ইত্যাদি কয়েকটি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের সম্প্রদায়ের লোকেরা জিন মহাবীর ইত্যাদি ২।৩টি শব্দের বিশেষ পক্ষপাতী; এমন কি তাঁহার মতাবলম্বীদের অদ্যাবধি "জৈনী" বলে। অন্য দিকে সিদ্ধার্থের মতাবলম্বীরা সুগত, তথাগত, বুদ্ধ ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহারা বৌদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই দুই সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ প্রভেদ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জৈনরা তীর্থঙ্কর শব্দ অতি উচ্চ অথবা সর্ব্বোচ্চ অর্থে অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্তা অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা এই শব্দ সম্মাননীয় অর্থে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে তীর্থঙ্কর অনেকটা বিধর্ম্মীদের নেতা মাত্র।

সিদ্ধার্থের উক্তি ছাড়া তাঁহার সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব বুদ্ধদের অস্তিত্বের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্দ্ধমানের শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় গুরুর নাম নানা পুরাণ ও রামায়ণে পাওয়া যায়। অন্য গুরুদের নাম ধাম বংশ পরিচয়, কে কি কার্য্য করিয়াছিলেন সংক্ষেপে জানা আছে এবং ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী ঐতিহাসিক কালের লোক ছিলেন। তাঁহার জন্ম ও মোক্ষস্থান জানা আছে, মোক্ষস্থান তাঁহার নামেই পার্শ্বনাথ পর্ব্বত বা 'পরেশনাথ হিল' নামে প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমানের পিতা মাতা ও বহু সংখ্যক আত্মীয় কুটুম্ব পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী শ্রাবক ছিলেন। পার্শ্বনাথ স্বামীর স্থাপিত নানা বিধি বর্দ্ধমানের সময়ে ও তাঁহার সংস্কার করিবার পরেও স্বতন্ত্রভাবে প্রচলিত ও সম্মানিত ছিল। কালে উভয়ে এক হইয়া গিয়াছে। এই দুই মতাবলম্বী আচার্য্যদের বিচারের গল্প জৈনদের উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে আছে।

বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বর্দ্ধমান স্বামী জৈন মত ও ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা ছিলেন না। পার্শ্বনাথ স্বামীর স্থাপিত ধর্ম্ম অথবা তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও মহাপুরুষের স্থাপিত ধর্ম্ম কাল প্রভাবে কতক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, কতক নানা প্রকার কদাচার ধর্ম্মের গণ্ডীতে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছিল। বর্দ্ধমান স্বামী সেইগুলি আবার পরিষ্কার করিয়া দুই একটি নূতন নিয়ম বাড়াইয়া দিয়াছিলেন মাত্র। সেই জন্য পূর্ব্ব গুরুদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও জৈন সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মাননীয় ও বর্ণনোপযোগী ব্যক্তি বর্দ্ধমান স্বামীকেই বলিতে হয়। জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বর্দ্ধমান স্বামীর জীবনচরিতের আলোচনা করিতে হয়।

বর্দ্ধমান স্বামী সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এক অদ্ভুত মত স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন বর্দ্ধমান বা মহাবীর নামক কোনও ব্যক্তির কোনওকালে অস্তিত্ব ছিল না; জৈনরা বর্দ্ধমান স্বামীর জীবনচরিত বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, যথা আচারাঙ্গ সূত্রের দ্বিতীয় স্কন্ধের "ভাবনা" শীর্ষক পঞ্চদশ অধ্যায় অথবা কল্পসূত্রের প্রথম পাঁচ অধ্যায় ইত্যাদি সকলই তাঁহাদের মতে কল্পিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর গুজরাটের রাজা কুমার পালের গুরু ও সভাপণ্ডিত বেদব্যাস-সদৃশ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ঋষিকল্প সংহিতা রচক হেমচন্দ্র আচার্য্য

আপন গ্রন্থে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সাধ্যমত বিচার করিয়া বিচারফলই লিখিয়াছেন। যেখানে অনুমাত্র সন্দেহ হইয়াছে, হয় তাহা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, নয় সন্দেহের কারণ উল্লেখ করিয়া সন্দেহাত্মক বিষয়ের অধীনে লিখিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এহেন হেমাচার্য্যের উক্তিতেও বিশ্বাস করিতেন না। অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন জর্ম্মান পণ্ডিত জ্যাকোবি (Jacobi) হেমাচার্য্যের উক্তি ও জৈন ইতিহাসের কথাগুলি বিশ্বসনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এখন তাঁহারা জৈন ইতিহাস বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহাদের অনেক ভারতবাসী শিষ্যেরা আপনাদের মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন জৈন ধর্ম্ম কোনও প্রাচীন ধর্ম্ম নহে—বুদ্ধদেব স্থাপিত ধর্ম্ম খৃষ্ট জন্মের কাছাকাছি কোনও সময়ে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া এই রূপ ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অনেক সিদ্ধান্ত একই প্রকার, কিন্তু কোন কোন স্থানে মারাত্মক প্রভেদ আছে। তাঁহারা বলিতেন ঐগুলিই সংস্কার কালের প্রভেদ বা সংস্কার।

যাহা হউক এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে বর্দ্ধমান স্বামীর আবির্ভাব ও তিরোভাবের যে সময় জৈনরা বলিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার মত কোনও কারণ নাই। বর্দ্ধমান স্বামী ও বুদ্ধদেবের যে সময়গুলি এখন স্বীকৃত সেগুলি এইরূপ।

	বুদ্ধদেব	বর্দ্ধমানস্বামী
জন্ম	খৃঃ পূঃ ৫৫৭	৫৯৯ (চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী)
দীক্ষা	„ ৫২৭-২৮	৫৭০ (অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দশমী)
জ্ঞানলাভ	„ ৫২১	৫৫৭ (বৈশাখ শুক্লা দশমী)
মোক্ষ	„ ৪৭৭	৫২৭ (কার্ত্তিক অমাবস্যা)

ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে বর্দ্ধমান স্বামীর মোক্ষ বৎসরে [২।৪ মাস পূর্ব্বে বা পরে] গৌতম সিদ্ধার্থ গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন মাত্র। তাহার ছয় বৎসর পরে তিনি "কেবল" জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর ধর্ম্মশিক্ষা দান ও প্রচার করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় যদি কোনও সিদ্ধান্ত উভয়ের ধর্ম্মে একই রূপ থাকে তবে জৈনরা বৌদ্ধদের অনুকরণ করিতে পারে না। হয় উভয়ে কোনও পূর্ব্ব গুরুর মত গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা উভয়ে "কেবল" জ্ঞান দ্বারা অপরের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই স্বয়ং সত্যলাভ করিয়াছিলেন। অথবা যদি কেহ কাহারও অনুকরণ করিয়া থাকেন তবে বৌদ্ধরা জৈনদের অনুকরণ করিয়া থাকিবেন।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

মিলন-পথে

(উপন্যাস)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অশোকের বাড়ীর পাশে তাহার জ্ঞাতি কাকা মহেন্দ্র লালের বাড়ী। মহেন্দ্র বড় একটা অশোকের বাড়ী আসেন না। কখন কখন তাঁহার গৃহিণী বলেন, "মাঝে মাঝে অশোকের খবর পাতি নিতে হয় ত, ওর বাপ মা নেই। আহা বাছা কি করেই একলাটি বাড়ীতে থাকে?"

মহেন্দ্রলাল বলেন, "আমি তার বাড়ী যাব কেন? সে কি আমার বাড়ীতে এসে থাকে?"

গৃহিণী গালে হাত দিয়া বলেন, "ওমা আসে না?

আমার কাছে প্রায়ই ত আসে। কাবের ঝঞ্ঝাটে আমি আমি যেতে পারিনে, তোমার ত একআধ বার যাওয়া উচিত।"

কিন্তু গৃহিণীর এই অনুরোধ বা ঔচিত্য বোধ কদাচিৎ ফলপ্রসূ হয়। আজ নাকি মহেন্দ্রলালের তীব্র ঔচিত্য বোধটা হঠাৎ সচেতন হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, তাই তিনি বৈকালিক জলযোগটা শেষ করিয়াই অশোকের গৃহপানে চলিলেন। যখন তাঁহার অতি স্থূল সচল দেহখানি অশোকের পাঠকক্ষ দ্বারে আসিয়া অচল হইল, তখন অশোক একখানা আরাম চৌকিতে শুইয়া বোধ হয় একটা হাসির কথাই বলিতেছিল, আর মাধবী অদূরে দাঁড়াইয়া বাতাসে আন্দোলিত কুসুমিত লতাটির মত হাসির আবেগে দুলিতেছিল।

মহেন্দ্রলালের রুষ্ট বক্র দৃষ্টিতে মাধবী লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া অন্য দ্বার দিয়া ছুটিয়া পলাইল এবং অশোক উঠিয়া "আসুন কাকা, আসুন" বলিয়া একখানা চেয়ার আনাইয়া দিল। কাকার অপ্রত্যাশিত অতর্কিত আগমনে সে যে খুব পুলকিত হইয়া উঠিল, এমন বোধ হইল না; বরং তাহার চোখে বিস্ময়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রলাল কোন মতে উদ্দীপ্ত ক্রোধ ও বিরক্তি দমন করিয়া আসন গ্রহণ করিয়া নিজের বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার নীরব অবস্থা অশোকের দুঃসহ ও অস্বস্তিকর বোধ হইল, তাই স্বয়ং আলাপ আরম্ভ করিল, "পরশু আমি কাকীমার কাছে গিয়েছিলাম, আপনাকে ত দেখতে পেলাম না। বাড়ীতে ছিলেন না বুঝি?"

মহেন্দ্রলাল মস্তকের হাতখানা নামাইয়া উদরে স্থাপন করিয়া গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে বলিয়া ফেলিলেন, "না।"

"আপনার সেই ব্যথাটা নেই তো?"

"না।"

এ রকম করিয়া আলাপ জমিতে পারে না। নিরুপায় হইয়া অশোক চুপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু কাকার শুভাগমনের উদ্দেশ্যটা জানিবার জন্য ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। খানিক পরে পিপাসা বোধ হওয়ায় মহেন্দ্রলাল জল চাহিলে অশোকের ইঙ্গিতে বন্ধু এক গ্লাস সুপের সরবৎ আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। সরবতের সুস্বাদ তাঁহার গাম্ভীর্য্যকে খানিকটা হালকা করিয়া দিয়া গেল। ইহা যে মাধবীর হাতের গুণ তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি শূন্য গ্লাসটা বন্ধুর হাতে ফিরাইয়া দিয়া, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক, এই যে গেল, ও গোবিন্দ বোষ্টমের মেয়ে না?"

অনাবশ্যক প্রশ্ন। মহেন্দ্রলাল অশোকের অপেক্ষা মাধবীকে কম চিনিতেন না। তবু অশোক বলিল, "হাঁ, ও মাধবী।"

"হুঁ। ওর একবার বিয়ে হয়েছিল না?"

"আট বছর বয়সে পুতুল খেলার মতন। ছমাস পরেই বিধবা হলো।"

"ওদের আবার বিধবা কি? বিশবারও সাঙা চলতে পারে। তা, অমন যুবতী মেয়ে গোবিন্দ ঘরে রেখেছে কেন? সাঙা দেবে, না অন্য কোন মতলব আছে?"

এই কদর্য্য অনাবৃত প্রশ্নে অশোক আগুন হইয়া উঠিল। সে যথাসাধ্য আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "গোবিন্দ মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।"

মহেন্দ্রলাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওদের আবার বিয়ে!"

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "গুরুজন স্বর্গে গেছেন বলতে নেই, কিন্তু বাবা, না বলেও থাকতে পারছিনে। মেজদা কি অন্যায়ই করে গেছেন। একটা ছোট লোকের মেয়েকে বাড়ীতে রেখে গান বাজনা লেখাপড়া শিখিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছিলেন। যাকে ছুঁলে স্নান করা উচিত, তাকে নিয়ে এত! গাঁয়ে যখন এসব কথার আলোচনা হয় তখন লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়। মেয়েটার কি স্পর্দ্ধা দেখ! রায় বংশের ছেলের সঙ্গে সামনে হেসে হেসে কথা কয়! মেজদার অপরাধের ফল।"

অশোক তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "ওকি বলছেন কাকা?

বাকে কেউ কখনো অপরাধ করতে দেখে নি। গোবিন্দ এক সময়ে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে বাবার জীবন রক্ষা করেছিল, তাই বাবা তার মেয়ের জন্তে অতখানি করেছেন। তা ছাড়া মাধবীকে তিনি খুব ভালও বাসতেন।"

কাকা গম্ভীর বিরক্তভাবে বলিলেন, "দশ বিশ-টাকা পেলেই গোবিন্দ খুসী হ'য়ে যেত, কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তার মেয়েকে মেম বানাবার কোন দরকার ছিল না।"

শিক্ষালাভের অধিকার যে ব্রাহ্মণ কন্তা ও বৈষ্ণব কন্তার সমান এবং নিরক্ষর দরিদ্র গোবিন্দ দাস যে টাকা লইয়া উপকার বিক্রয় করিত না, ইহা কাকার কাছে বলা নিষ্ফল জানিয়া অশোক চুপ করিয়া রহিল। কথা বলিতে বলিতে মহেন্দ্রলাল কিছু চঞ্চল ও উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। আবার অচল গাম্ভীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "শোন, অশোক, শীগ্‌গিরই তোমাকে বিয়ে করতে হবে, তোমার কাকীমার ইচ্ছা, আমারও বটে। আর একটা কথা, মাধবীকে যখন তখন বাড়ীতে আসতে দিও না। অবশ্য তার মত লোকের সুনাম দুর্ণামের কোন মূল্য নেই, কিন্তু তোমার আছে। তোমার দুর্ণামে আমার দুর্ণাম, তাই বলতে এসেছি। আমি এখন উঠি, কায আছে। আমার কথা মনে থাকে যেন।"

মহেন্দ্রলাল তাঁহার বিপুল দেহভার লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

মহেন্দ্রলালের যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার কথা আজ আর অশোকের মনে পড়িল না। তিনি কেমধ্য বয়সেও পুত্রবতী সাধ্বী পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া একটি সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিবার জন্ম পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অশোকের পিতা অমৃতলালের চেষ্টাতেই সে বিবাহ ঘটিতে পায় নাই, তাহাও সে ভুলিয়া গেল।

কি আশ্চর্য্য! সে যুবক, আর মাধবী যুবতী! সেই উচ্চ হাসি, চপল গতি, সেই তুচ্ছ কথায় মান অভিমান, অবাধ অসঙ্কোচ ব্যবহার, তাহা কি যুবতীর? যৌবন তাহার লাবণ্য লইয়া হয়তো মাধবীর আপাদ মস্তক মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার মন স্পর্শ করিতে পারে নাই। সমাজ তো মনস্তত্ত্বালোচনায় তাহার বহু মূল্য সময় নষ্ট করিবে না। কিন্তু সে-ই বা কেন অবিচারে সমাজের হুকুম মানিতে যাইবে? এত কি দায় তাহার? কে তাহাকে জননীর স্নেহে, ভগিনীর আদরে, বন্ধুর সমবেদনায়, শাসকের শাসনে এমন ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে? সমাজ শুধু হুকুম জারির করিয়াই কর্ত্তব্যের শেষ করিবে; তাহার ব্যক্তিগত অভাব, অভিযোগ, সুখ দুঃখের হিসাব সে রাখিবে না। এমন সমাজের জন্ত কেন সে অতখানি ত্যাগ করিতে যাইবে?

মাধবীকে ঘৃণা করার, তুচ্ছ করার, উপহাস করার অধিকার তো সমাজের ষোল আনাই আছে। হাজার চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। জলে ধোওয়া ফুলের মত যাহার মন তাহার উপর এতটুকু আঘাতও অসহ্য। হয়তো এখনি অশোক ও মাধবীর যুক্তনাম মানুষের মুখে মুখে অতিশয় কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছ। পুকুর ঘাটের মেয়ে মহলে এবং চণ্ডী মণ্ডপের পুরুষ সভায় রোজই হয়তো ইহা আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। ছি ছি! অশোক লজ্জায় ঘৃণায় রোষে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। সে তো নিজের সুখ সুবিধার জন্ত মাধবীকে ঘৃণিতা করিয়া রাখিতে পারে না!

রাত্রে অশোক খাইতে বসিয়াই উঠিয়া গেল দেখিয়া বন্ধু মনে মনে বিধুঠাকুরাণীর মুণ্ডপাত করিয়া সঙ্কল্প করিল, মাধবী দিদিকে বলিয়া বিধুমুখীকে দূর করিতে হইবে, নহিলে বাবুর শরীর টিকিবে না। সে এক বাটী দুধ আনিয়া অশোকের হাতে দিল, অশোক "খাব না" বলিয়া বাটীটা ফিরাইয়া দিল। বন্ধু দুধের প্রতি তাহার অনাসক্তির কারণ বুঝিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

অশোক শয়ন কক্ষে যাইয়া দেখিল, সুন্দর ভাবে পাতা সাদা ধবধবে বিছানাখানি এবং ডিবার তৈয়ারী পাণের খিলিগুলি মাধবীর সযত্ন কর্ম্মপটুতার চিহ্ন লইয়া গৃহকর্ত্তার প্রতীক্ষা করিতেছে। বালিসের ঐ সুন্দর

বাগানগুলির জন্ম মাধবী কত মধ্যাহ্ন-অবসরই না জানি নষ্ট করিয়াছে। অশোক চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বারান্দায় আসিয়া পাইচারি করিতে লাগিল। বারান্দার এক পাশে বঙ্কু শয়ন করিত। এই ভাবে অশোককে পাইচারি করিতে দেখিয়া বঙ্কু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার অসুখ করেছে?" অশোক বলিল, "না। ঘরে বড় গরম, তাই বেড়াচ্ছি। তুমি উঠে বসলে কেন? শোও।" বঙ্কু প্রভুর আদেশ পালন করিল।

অশোক আবার কিছুকাল ঘুরিয়া বঙ্কুর বিছানার পাশে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্কু জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবু?"

"মুখুজ্যে মশাইকে একবার ডেকে আনতে পার?"

"পারব না কেন? যাচ্ছি।"—বলিয়া বঙ্কু চিন্তিত মনে উঠিয়া গেল। মনিবের ভাব দেখিয়া বঙ্কুর একটু ভয় করিতেছিল। অনতিবিলম্বে অশোকের গোমস্তা রামহরি মুখোপাধ্যায় আসিয়া অশোকের কাছে দাঁড়াইলেন। অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এতক্ষণ জেগে ছিলেন?"

রামহরি বলিলেন, "হাঁ, হিসাবটা ঠিক করে রাখতে হলো।"

"আমি কাল একবার চাঁদপুরে যেতে চাই। অনেক দিন উমাকে দেখিনি।"

"নবীন দত্তর সঙ্গে বিবাদী জমিটার নিষ্পত্তির কথা ছিল।"

"আমি না থাকলে কি চলবে না?"

"জমি আপনার, কি করে চলবে? তা ছাড়া মহেন্দ্র বাবু আপনাকে ঠকাতে পারলে কোন মতেই ছাড়বেন না। কাযেই আপনাকে থাকতে হচ্ছে।"

"আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।"

রামহরি চলিয়া গেলেন, বঙ্কু শয়ন করিল। কিন্তু গরম কমিল না, অশোক আবার নিঃশব্দে পাইচারিই করিতে লাগিল।

কখন যে ঘরের ক্লকে এগারোটা, বারোটা ও একটা বাজিয়া গেল, তাহা সে টেরও পাইল না। তারপর ঠন্ ঠন্ করিয়া দুইটা বাজিয়া উঠিল। এইবার সে চমকিত ও বিস্মিত হইয়া শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া আলো নিবাইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

অশোক প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া জানিল, তখনও মাধবী আসে নাই। সে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ফেলিল। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাধবীর দেখা নাই। এত দেরী কেন? অসুখ করে নাই তো? সে অন্য দিনের মত বলিতে পারিল না, "বঙ্কু, দেখে এস তো, মাধুরা সবাই কেমন আছে?" অথবা নিজেও যাইতে পারিল না। মাধবীর না আসার জন্য কিছু উৎকণ্ঠা, কিছু আরাম, এক সঙ্গে তাহার মন জুড়িয়া বসিল।

বাগানের পুকুরে সেদিন তিন চারিটা পদ্ম ফুটিয়াছিল। ভোরের সোণালি আলো মাথা ফুটন্ত পদ্ম দেখিয়া অশোক মুহূর্ত্তের জন্য অতীত বর্ত্তমান ভুলিয়া গেল। এখনি মাধবী আসিয়া ফুটন্ত পদ্ম দেখিয়া কতখানি খুসী হইবে এবং তুলিয়া দিবার জন্য অশোককে কেমন অধীর আগ্রহে অনুরোধ করিবে এবং অশোক না তুলিয়া দিবার ছল করিয়া কতখানি সময় কৌতুক করিবে, এমনি একটা কল্পনা তাহার মনের উপর খেলিয়া গেল। শিশির-ভেজা ঘাসের উপর শিশির ভেজা শুভ্র শেফালিকা গুলি অলস ভাবে পড়িয়া ছিল। অশোক অন্যমনা ভাবে তাহা কুড়াইয়া জড় করিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে মাধবী আসিয়া বলিল, "বেশ লোক যা হোক্! আমি তোমাকে কত খুঁজেছি। আমাদের বাড়ীর একটা পেঁপে এনেছি, ভারি মিষ্টি, খাবে চল।" কিন্তু পুকুরের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই হাত তালি দিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "কি মজা! দেখ দেখ, চারটে পদ্ম ফুটেছে! তুলে আন অশোক দা।" বলিয়াই খপ করিয়া অশোকের একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল।

অশোক নীরবে ফুলগুলি তুলিয়া আনিয়া মাধবীর হাতে দিল, অন্যদিনের মত তাহার খোঁপায় একটা পরাইয়া দিল না। মাধবী আশ্চর্য্য হইয়া অশোককে

মুখের পানে চাহিয়া ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে ?"

অশোক হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি হবে ? চল ঘরে যাই।"

অশোকের এই নূতন গোপন করার চেষ্টায় মাধবী ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়া বোধ করি অভিমানে চুপ করিয়া রহিল।

অশোক ঘরে আসিয়া মাধবীর আনীত পেঁপের দুইএক টুকরা মুখে দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিল। তার পর টেবিলের ফুলদানীটার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "মাধু, বোস, একটা কথা আছে।"

এই সম্পূর্ণ নূতন ব্যবহারে এবং গম্ভীর কণ্ঠে ভীত হইয়া মাধবী অভিভূতের মত বসিয়া পড়িল। ঘরটা একেবারে শব্দশূন্য। অজ্ঞাত শঙ্কায় মাধবীর বুক কাঁপিতে লাগিল এবং আঘাত করিবার নিষ্ঠুরতায় অশোকের হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত জোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এমন করিয়া কয়েক মিনিট গেল। তার পর অশোক কক্ষতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, "শোন মাধবি, আমরা এখন আর ছেলে মানুষ নই। ভেবে দেখলাম, এমন অবাধ মেলামেশাটা আর ঠিক হচ্চে না। সমাজে সুনামের মূল্য অনেক। ওটা না থাকলে সামাজিক জীব বাঁচতে পারে না।"

সহসা অশোক চোখ তুলিয়া চাহিয়াই থামিয়া গেল, বক্তব্য শেষ করিতে পারিল না। প্রচণ্ড রোষে মাধবীর মুখ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, আরক্ত ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে, বিস্ফারিত নয়নে বিদ্যুৎ ঝলসিতেছে। সে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "তোমরা ভদ্রলোক, তাই তোমাদের সুনামের সম্মানের মূল্য আছে। আমাদের তা নেই, যেহেতু আমরা ছোটলোক। এই যদি ভেবে থাক, তবে বড় ভুল করেছ। চরিত্রের যাচাই করলে বুঝতে পারবে, তোমাদের চেয়ে আমরা একটুও হীন নই। তুমি ভদ্রলোক বলে' অবাধে আমার মুখের উপর এমন কথা বলতে পারলে, আমরা হলে লজ্জায় মরে যেতাম। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত এমন অকৃতজ্ঞ জাত আর নেই। সত্যি তোমরা কৃপার পাত্র।" বলিয়াই মাধবী উন্মাদ ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

তিন চারিদিনের মধ্যে অশোক নবীন দত্তের প্রায় সকল প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিল, রামহরির কোন পরামর্শ গ্রহণ করিল না। পুরাতন গোমস্তা ইহাতে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার তো প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। বিবাদ মীমাংসা করিয়াই অশোক উমাকে দেখিবার জন্য রওনা হইয়া গেল।

মহেন্দ্রলাল রাত্রিতে আহার করিতে বসিয়া পত্নীকে বলিলেন, "অশোক আজ চলে গেল।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গেল ? কোথায় গেল সে ?"

মহেন্দ্রলাল ঘৃণায় বোধ হয় সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া বলিল, "বোষ্টমীর বিরহ সইতে না পেরে চলে গেল গো। আমি সেদিন তাকে বলেছিলাম, অশোক এমন ঢলাঢলি করলে তোমায় একঘরে করব। তাই মেয়েটাকে কদিন বাড়ী আসতে দেয়নি, নিজেও তার বাড়ী যায়নি। সমাজকে কে না ভয় করে ?"—বলিয়া গর্ব্বিতভাবে গৃহিণীর পানে চাহিলেন, কেন না তিনি গ্রামের সমাজপতি। এক ঘরে করার কথাটা তিনি বাড়াইয়াই বলিলেন, এই রকম বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল। কথাটা অশোককে তাঁহার বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও সহজে বলিতে পারেন নাই। কারণ গ্রামে যাহাদের লইয়া সমাজ, তাহাদের অধিকাংশই অশোকের নিকট ঋণী। এই ঋণটা বিনাসুদেই বরাবর চলিত। গ্রাম্য মাইনর স্কুলটাও অশোকের মাসিক চাঁদা না পাইলে এতদিনে অচল হইয়া পড়িত। সেই স্কুলের সেক্রেটারী আবার তিনিই। তা ছাড়া তাঁহার পঞ্চম কন্যার বিবাহের সময়ে (রামহরির কারসাজিতে) দস্তুর মত লেখা পড়া করিয়াই তিনি অশোকের নিকট দু'হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। দলিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইতে এখনও ছয় মাস বাকি। এই দুই বছরে অশোক সুদ না চাহিলেও

আর ছয় মাস না গেলে তিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক হইতে পারিতেছেন না।

গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা বাছা গেল কেন? গাঁয়ের লোকের দুঃখ অমন তো আর কেউ বুঝবে না। ওকে সবাই কত ভালবাসে।"

কর্ত্তা গর্জ্জিয়া বলিলেন, "অমন বঁয়াটে লক্ষীছাড়াকে লোকের ভালবাসতে বড় গরজ!"

গৃহিণী আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। স্বামীর নিষ্ঠুরতায় অশোককে গৃহছাড়া হইতে হইল, এই ভাবিয়া তিনি বিরলে চক্ষু মুছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার তিন মাস পরে ঠাকুর্দ্দা একদিন মাধবীকে আথড়ার মন্দিরে আসিয়া প্রণাম করিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই দেখ দিদি, আমার গোপী-বল্লভের আহ্বানে তোমাকে এখানে আসতে হলো।"

মাধবীও প্রণত মাথাটি তুলিয়া হাসিয়া জবাব দিল, "তা হলো বটে। কিন্তু এই পাষাণের ভিতর তো প্রাণের সাড়া পাচ্ছিনে ঠাকুর্দ্দা!"

ঠাকুর্দ্দা এ কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "কাঙ্গালের কুঁড়েয় একবার পায়ের ধুলো দাও না দিদি।"

মাধবী তৎক্ষণাৎ ঠাকুর্দ্দার অনুসরণ করিয়া তাঁহার কুটীরে যাইয়া ঢুকিল। কুশাসনখানা পাড়িয়া ঠাকুর্দ্দার জন্য পাতিয়া দিয়া সে নিজে মাটীতে বসিয়া পড়িল। এ যেন তাহারই গৃহ। ঠাকুর্দ্দা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দিদি, মাটিতে কেন? আরও ত একখানা কুশাসন রয়েছে।"

মাধবী বলিল, "থাক, এই ভাল। এখন তুমি আমার কথার জবাব দাও।"

"জবাব আর কি দেব? প্রাণ কোথায় হারিয়ে ফেলেছ, নইলে প্রাণের সাড়া পাবে না কেন? আত্মস্থ না হলে কি ঠাকুরের প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়?"

মাধবী তো আত্মস্থই আছে। একজন অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন সুনাম-ভিক্ষুর জন্য তাহার চিত্ত বিচলিত হইবে? ধিক তাহাকে! যে আশৈশব বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখিল না, যে সাধ্বী নারীর সুনামের অপেক্ষা নিজের সুনামের মূল্যটাই বেশী করিয়া বুঝিল, সে কাপুরুষ নহে তো কি? মাধবী ধন চাহে নাই, যশ চাহে নাই, কোন রকম প্রতিদান চাহে নাই, শুধু দানের তৃপ্তি ও আনন্দ চাহিয়াছে। তাহা হইতেও তাহাকে যে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাকে যে মাধবী কোন্ আখ্যায় অভিহিত করিবে, তাহা এই দীর্ঘ তিন মাস ভাবিয়াও সে স্থির করিতে পারে নাই। তাহার জন্য মাধবী আত্মস্থ হইতে পারে না! ইহার মত আশ্চর্য্য অসম্ভব কথা আর কি হইতে পারে?

ঠাকুর্দ্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, কি ভাবছ?"

মাধবী বলিল, "প্রাণটা খুঁজে দেখলাম।"

"সন্ধান মিলেছে?"

"সন্ধান মিলবে না কেন? হারাই নি তো।"

"বেশ তো, তবে একদিন সাড়া পাবেই। কিন্তু দিদি, এই বয়সে পাষাণের ভিতর সাড়া না খুঁজে, মানুষের ভিতরই খোঁজ না কেন?"

"তেমন মানুষ পাই কোথা?"

"কেন, কেশব। সে তো প্রার্থনীয় বর। তোমার জন্যে সে খুবই ব্যস্ত। আমায় কত সাধাসাধি করছে।"

"তা হোক্, আমি তাকে চাইনে।"

"তা চাবে কেন? অমৃতবাবু তোমার মাথাটি খেয়ে দিয়েছেন।"

কথাটা শুনিয়া মাধবীর মুখে বেদনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দেখিয়া ঠাকুর্দ্দা অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "আমি কি তোমাকে ব্যথা দিলাম দিদি?"

মাধবী সহাস্যে বলিল, "না ঠাকুর্দ্দা।" বলিয়া সে কুটীরের এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর্দ্দা, তোমার আজ খাওয়া হয়নি?"

"কি করে জানলে তুমি?"

"উনুনে আগুন জ্বালাবার চিহ্ন দেখছিনে।" বলিয়া মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘর খুঁজিয়া পাতিয়া সে একটা চাউলের হাঁড়ি এবং কিছু আলু কাঁচকলা বাহির করিল। তার পর ক্ষিপ্রতার সহিত তরকারী কুটিয়া চাউল ধুইয়া রান্না চড়াইয়া দিল, ঠাকুর্দ্দার আপত্তি শুনিল না। কাযেই ঠাকুর্দ্দা চুপ করিয়া বসিয়া কর্ম্মনিরতা মাধবীর আরক্ত চরণের দ্রুত গতি, সুগঠিত হস্তের ক্ষিপ্রতা এবং সুন্দর মুখে ও আয়ত নেত্রে মাতৃত্বের স্নিগ্ধ বিকাশ দেখিতে লাগিলেন। আপনার প্রতি দৃষ্টিহারা একজন মানুষের সেবার আয়োজনের মধ্যে মাধবীর একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও কে যেন তাহার অদূর অতীতের স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া তাহাকে কত কি দৃশ্যপট দেখাইতে লাগিল।

মাধবী রান্না শেষ করিয়া ঠাকুর্দ্দাকে ভাত বাড়িয়া দিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল, "না খেয়েদেয়ে কেন জপ তপ কর? সময় মত খাওয়া শেষ করে ওসব করতে পার না?"

ঠাকুর্দ্দা আহার করিতে করিতে প্রসন্নমুখে বলিলেন, "তা হলে তো অন্নপূর্ণার প্রসাদ আজ অদৃষ্টে জুটত না দিদি। কে বলে, তুমি ঠাকুরের সাড়া পাও নি? তা না পেলে কেউ কি ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালের মুখ দেখে এমন অন্নপূর্ণা হতে পারে?"

মাধবী শাসনের সুরে বলিল, "বক্তৃতা করে না, এখন খেয়ে নাও। সন্ধ্যা হয়ে এল যে!" বলিয়াই মাধবী নিজের একটা ক্ষত স্থানে যেন আঘাত করিয়া বসিল। একটা গভীর শ্বাস তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঠাকুর্দ্দার আহার শেষ হইলে মাধবী তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাত্র ধুইয়া আনিয়া বলিল, "আমাকে এখন বাড়ী রেখে এস।"

"চল, দিদি, চল"—বলিয়া ঠাকুর্দ্দা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন।

পৌষের অপরাহ্ণ। মাঠের মাঝখান দিয়া রাস্তা। মুক্ত বাতাসে একটু শীত শীত করিতেছিল। মাধবী তাহার পরণের মোটা কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া পথ চলিতে লাগিল। সরু রাস্তাটির দুই ধারে পাকা ধান ভরা ক্ষেত। লক্ষ্মী যেন বাঙ্গলার এই মাঠগুলিতে কিছু সময়ের জন্য তাঁহার স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছেন। চাষীরা ধান কাটিতে কাটিতে কেহ বা গল্প গুজবে, কেহ বা মোটাসুরে গ্রাম্য কবি-রচিত গান গাহিয়া পরিশ্রম হালকা করিয়া তুলিতেছিল। কি আনন্দ ইহাদের! কত অল্পে ইহাদের তৃপ্তি! এত দিনের পরিশ্রমের ফলে মা লক্ষ্মীর করুণা আজ ধানের রূপ ধরিয়া ইহাদের হাতে ধরা দিয়াছে। সুকর্ম্ম যখন সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া কর্ম্মীকে জয়মাল্য অর্পণ করে, তখন তাহার আনন্দের পরিমাণ মাধবী কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল।

নির্ব্বাক ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে মাধবীও এতক্ষণ নিঃশব্দেই পথ চলিতেছিল। প্রথম সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, বলিল, "ঠাকুর্দ্দা তুমি ত অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র পড়েছ, এখনো কত পড়ছ। বল তো বিয়ে করাটা কি খুবই দরকার?"

প্রশ্ন শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা মাঠের প্রান্ত সীমার গাছগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, তার পর মাধবীর পানে চোখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কারু কারু পক্ষে বটে।"

আবার দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

এবার ঠাকুর্দ্দাই প্রথমে কথা কহিলেন, "কেন, আজ এ কথা কেন দিদি?"

মাধবী অসঙ্কোচে বলিল, "তুমি আজ আমার বিয়ের কথা বল্লে কি না, তাই। আচ্ছা, সব মেয়েমানুষেরই কি বিয়ে করা উচিত?"

ঠাকুর্দ্দা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "যে বিবাহে অনিচ্ছুক, যে আত্মরক্ষায় সমর্থ, তার নয়; এই তো আমার মত। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র এ মতের সমর্থন করবেন না বোধ হয়।"

"কেন? মেয়েদের বিয়ে সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র কি বলে?"

"হিন্দুশাস্ত্রের মতে, যৌবন সঞ্চারের আগেই মেয়েদের বিয়ে করতে হবে। মেয়েরা সব সময়েই পুরুষের পালনীয়া

ও রক্ষণীয়া। প্রাচীন হিন্দুরা মেয়েদের অবিবাহিত জীবন পছন্দ করতেন ব'লে তো মনে হয় না।"

"মেয়েদেরও শক্তি আছে, এ কথা বোধ হয় তোমার শাস্ত্রকারেরা মানতেন না?"

"বলকি দিদি, খুবই মানতেন। পুরাণে ইতিহাসে তুমি তার হাজার হাজার প্রমাণ পাবে। দ্রৌপদীর মত সত্য মত ব্যক্ত করবার অমন অদম্য সাহস, লোভ জয় করবার অমন অপূর্ব্ব মনোবল, আজ কালকার ক'জন মেয়ের আছে? গান্ধারীর মত কে অমন নির্ভীক ভাবে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করতে পারে? সেই প্রাচীন হিন্দুরই সৃষ্ট নারী বিধাতার বিধানকে পণ্ড করবারও স্পর্দ্ধা রাখে। আরো কত আছে। তুমিও তো কত জান দিদি।"

"আমি এ কালের কথা বলছি। বিয়ের কি উপকারিতা নেই?"

"নিশ্চয়ই আছে। বিবাহিত জীবন মানুষকে এক দিকে যেমন কোমল, মধুর, স্নেহপ্রবণ ক'রে গড়ে তোলে; তেমন আবার অন্যদিকে ত্যাগে দৃঢ়চিত্ত, কর্ম্মে অনলস, সংযমে ধীর ক'রে রাখে। পতি বা পত্নীর জন্য সর্ব্বস্ব পণ, সন্তানের জন্য পিতা মাতার নিঃশেষে আত্মদান, এও তো বিবাহেরই অমৃতময় ফল। দশরথ, শান্তনু ও বৃষপর্ব্বা যদি বিবাহ না করতেন, তবে আমরা রামচন্দ্র, ভীষ্মদেব ও শর্ম্মিষ্ঠাকে কোথায় পেতাম? মাধু, তোমার প্রাণ আছে, শক্তি আছে। বিয়ে কর, প্রাণ আরও বড় হবে, শক্তি আরও বেড়ে যাবে।"

মাধবী ম্লান হাস্যে বলিল, "ছোটও তো হয়ে যেতে পারে। বিয়ে ক'রে কত মানুষ মা বাপের সঙ্গে, ভাই বোনের সঙ্গে ভিতরে বাইরে পৃথক হয়ে যায়।"

ঠাকুর্দ্দা মুহূর্ত্তকাল মাধবীর মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বিয়ে ক'রে তুমি কখনো ছোট হয়ে যেতে পার না।"

মৃদু হাসিয়া মাধবী রহস্যের সুরে বলিল, "জহুরী রতন চিনেছে বটে।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দুইজনের গতিই শিথিল হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর একান্ত নিকটে আসিয়া মাধবী দেখিল, সন্ধ্যার তরল অন্ধকার পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। ওমা, এত দেরী হইয়া গিয়াছে! মায়ের রসনার ঝাঁজ অনুমান করিয়া সে সেইখান হইতেই ঠাকুর্দ্দাকে বিদায় দিল। তারপর খানিক ইতস্ততঃ করিয়া সভয়ে বাড়ী ঢুকিল।

বৈকালের কিছু কিছু কায অসমাপ্ত ফেলিয়াই সে কেমন উন্মনা ভাবেই আখড়ায় চলিয়া গিয়াছিল। যাইবার সময়ে মা'র অনুমতি লইয়াই গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবার কথা বলিয়া গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে, কিছু বা অসতর্কতা বশতঃ তাহার বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কাযেই ঘরের বাকি কাযগুলা বাধ্য হইয়া রাসমণিকেই করিতে হইয়াছিল। অনভ্যস্ত কাযের মধ্যে যাইয়া রাসমণি হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার যে শরীর খারাপ! এত বড় মেয়ে ঘরে থাকিতে কেনই বা রোগা মাকে খাটিতে হইবে? মায়ের জন্য মেয়ের একবিন্দু দরদ নাই? মেয়ের কি সাহস দেখ! এই সোমত্ত বয়স, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান! একটু ভয়ও কি করে না? বড়লোকের সঙ্গে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মেয়েকে মেম সাহেব বানাইবার এই ফল! মেয়ে কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কে জানে? কেউ যদি তাহার নামে মিথ্যা করিয়াও কিছু বলিয়া উঠে? ঘৃণায়, লজ্জায় রাসমণিকে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে হইবে যে!

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া রাসমণি মেয়েকে আখড়া হইতে লইয়া আসিবার জন্য কয়েকবার কঠোর স্বরে গোবিন্দ দাসকে হুকুম করিল। ঠাকুর্দ্দা যেখানে আছেন, সেখানে ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না জানিয়া গোবিন্দ দাস হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া নিজের কায করিয়া যাইতে লাগিল। স্বামীর বিদ্রোহ ভাব স্ত্রীকে অধিকতর উগ্র করিয়া তুলিল। স্বামীর উপর অনেকখানি মনের ঝাল মিটাইয়াও যখন সে তার মৌন ব্রত ভঙ্গ করিতে পারিল না, তখন ক্লান্ত হইয়া চুপ করিল।

এতক্ষণ বারুদ সঞ্চিত হইতেছিল, মাধবীর আগমনের

সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া রাসমণি কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এলে কেন বাড়ীতে? রাতটা আখড়ায় কাটিয়ে এলেই পারতে! বলি, তোর মত বেহায়া পৃথিবীতে ক'জন আছে লো? তোর একটু ভয় নেই, ডর নেই, লজ্জা নেই, সরম নেই, আমার তরে একটু দরদ পর্য্যন্ত নেই। তোর জন্যে—"

গোবিন্দ ধমকাইয়া উঠিল, "বড় বাড়ালে তুমি। থাম এখন।"

গোবিন্দদাসের এই অস্বাভাবিক রুক্ষতা ও উত্তেজনায় মাধবী ও রাসমণি উভয়েই চমকাইয়া উঠিল। রাসমণির এই উত্তাপ, এই তিরস্কার মাধবীর সহিয়া গিয়াছিল। মায়ের হাজার তিরস্কারও তাহাকে বিচলিত বা মুখর করিয়া তুলিতে পারিত না। বেশী রকম গোলমালের ভয়ে গোবিন্দ দাসও স্ত্রীকে কিছু বলিত না, নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু আজ নাকি তাহার ভারি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাই আর মৌন থাকিতে পারিল না।

স্বামীর একান্ত অপ্রত্যাশিত অতর্কিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠ প্রথমে রাসমণিকে খানিকটা অপ্রতিভ অবাক করিয়া রাখিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই সে সম্বিত পাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমার মেয়েকে আমি শাসন করব, তাতে অন্যে কথা বলবার কে? আমি যা খুসী, তাই করব, কেউ যেন কথা বলিতে না আসে। আমি কাউকে গ্রাহ্যি করব না, তা ব'লে রাখলাম। কালই কেশবকে খবর দেব, এই মাসের মধ্যেই কণ্ঠি বদলের সব যোগাড় যন্তর ক'রে ফেলব। দেখি, কে আমায় রাখতে পারে? কত বড় লোক, তার ওজন পান না! কোন বরই পছন্দ হবে না! ওঁর মেয়েকে যেন একটা হাকিম এসে বিয়ে করবে। মেয়ে অত বড় ক'রে রাখা কেন? একটু মান ইজ্জতের ভয় নেই! আমি মাঘ মাসে মেয়ের বিয়ে দেবই দেব, কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, তা ব'লে রাখছি।"

গোবিন্দ দাস নিজের আকস্মিক উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হইতেছিল। ত্রুটি শোধরাইবার জন্য হাসিয়া মোলায়েম সুরে বলিল, "আচ্ছা গো আচ্ছা, তাই হবে। এখন তোমার মুখখানা একটু জিরুতে দাও না কেন?"

"জিরুতে দেব! তোমার ঘরে এসে আমার সুখ আছে না সোয়াস্তি আছে? চিরকালটা জ্ব'লে জ্বলে মলাম। আমার যেমন পোড়া কপাল!"

"আমাকে যা খুসী ব'লো, কিন্তু মাধুকে কেন? অমন মেয়ে ক'জনের আছে? কে অমন বাপ মায়ের সেবা করে? কে অমন দরদ বোঝে? ওকে কেউ কিছু বললে আমি মোটেই সইতে পারি নে, তা জান না?"

"আহা, দরদ দেখে ম'রে যাই! ও যেন আমার কেউ নয়, তোমারি সব!"

রাসমণি আরও খানিক গজ গজ করিয়া চিরচরিত প্রথামত শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে মাধবী গরম ভাত বাড়িয়া আনিয়া ডাকিল—"মা, খেতে এস। রান্নাঘরের দাওয়ায় বাবার ঠাঁই করেছি, তুমি ঘরে এসে বোস। বাবার খাওয়া পর্যন্ত ব'সে থাকলে যে তোমার অনেক দেরী হয়ে যাবে। এম্‌নিই তো দেরী হ'য়ে গেছে আজ। এস মা।"

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

পরের ছেলে

(গল্প)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

কথাটা রাজলক্ষ্মীর কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি অনুসন্ধান করিয়া ইহার আগাগোড়া জানিয়া লইলেন। এলোকেশীকে দিয়া দেওয়ানজিকে বলিয়া পাঠাইলেন এই মুহূর্ত্তেই যেন ফ্যালারামের সমস্ত মাহিনা চুকাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়।

ফ্যালারাম আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, "আমার দোষ কি বড় মা?"

"চুপ কর, তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। আজ সন্ধ্যার পর আর যেন তোমাকে বাড়ীতে না দেখ্‌তে পাই।"

মহিম আহার করিতে আসিলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর পো, একটা নিরাশ্রয় কুটুম্বের ছেলের অপমান করে তোমার কি গৌরব বাড়ল?"

মহিম নিজ দোষ স্খালনের জন্য বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না বড় বৌ, ওটা কতদূর বজ্জাত—"

রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "মধুর সম্বন্ধে তোমার চেয়ে বোধ হয় আমার জ্ঞান বেশী আছে। শুধু একটা কথা জান্‌তে চাই, আজ অতুল ঐরকম দোষ করলে চাকর দিয়ে কাণ মলিয়ে কি তাকে শাসন করতে?"

অতুলের কথায় ঘরের ভিতর হইতে নলিনীর চাপাস্বর আসিল, "সব কথাতেই দিদি, অতুলের তুলনা দিতে ছাড় না। একেই ত সে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "সেটা বেশ জানি ছোট বৌ, অতুলের সঙ্গে মধুর তুলনা হতেই পারে না। সে যে গরীবের ছেলে।"

"এতে আর গরীব বড়লোক কি আছে? দোষ করেছে, শাসন করতে গিয়েছে।"

"নিজের হাতে কি বল ছিল না।"

"একটা খোঁচা ছাড়া ত দিদি কথা বল্‌বে না। না হয় ফ্যালা কাণটা মলেই দিলে।"

"বটেই ত, সে যে ভিখারীর কাণ বোন্!"

"তা, সে যেমন অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছে—"

"তার কাণমলাও তেমনি হবে, না? মধুও ত তোমার মায়ের বোনের পেটেই জন্মেছিল।"

রাজলক্ষ্মীর কথাটার ভিতর যে গুপ্ত শ্লেষটুকু ছিল, নলিনীর অন্তরে তাহা লঙ্কার ঝালের মত তীব্রজ্বালা উৎপাদন করিয়া ফেলিল।

মহিম বুঝিল নলিনীর পক্ষ হইতে ইহার যে উত্তর আসিতে পারে তাহা নিতান্ত শান্ত হইলেও ভদ্রতার সীমা রক্ষিত হইতে পারে না। নিজে ঘাট স্বীকার করিয়া উভয়কে থামাইয়া দিল।

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "আমি ঝগড়া করতে আসিনি, বোন্; একবার তোমাদিকে জানাতে এসেছি যে তোমাদের কোন ভরসা না পেলেও মধুর দাঁড়াবার স্থান আছে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই রাজলক্ষ্মী দ্রুত চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরেই দেখা গেল স্কুলের নূতন হেড্ মাষ্টার মুরলীধর বাঁড়ুয্যে মধুর গৃহ-শিক্ষকরূপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রথম হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ করিলেন।

পাঠ্যপুস্তকের সারি সারি কালো কালো অক্ষরগুলার মধ্যে শুধু ভাষা গঠনের উপদেশ লাভ করিয়া মধুর অতৃপ্ত মনের তৃষ্ণা মিটিত না। ছাপার অক্ষরের কঠিন দাগগুলার মধ্যে কোন্‌খানে গ্রন্থকারের প্রাণের কথাটী লুকাইয়া আছে, তাহারই অনুসন্ধান করিবার জন্ত সে পাগলের মত শিক্ষক মহাশয়কে অনর্গল প্রশ্ন করিয়া যাইত।

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সে যাহা পাইত তাহা একান্ত তাহার নিজের কথা। মধু পড়িতে পড়িতে দেখিতে পাইত দেশ বিদেশের কত অনাথ কত দরিদ্র বালক, সংসারের পিচ্ছিল পথটাকে হেলায় ত্যাগ করিয়া শত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও মাথাটা জাগাইয়া রাখিয়া কেমন করিয়া আপনাকে সফল তুলিয়াছে। ধনের অভিমান এই সকল বীরের পায়ের কাছে প্রতিমুহূর্ত্ত কেমন করিয়া লাঞ্ছিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহাকে সে জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল, সেই শিক্ষক মহাশয় অন্তরালে থাকিয়া একটীর পর একটী করিয়া এই বীর চরিত্র তাঁহার এই অনুগত শিষ্যের সম্মুখে ধরিয়া যাইতেছিলেন, আর মধু তাহা অনুধাবন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছিল। মধু যখনই তাহার দারিদ্র্যনিপীড়িত শিক্ষকটীর মুখের দিকে চাহিত তখনই দেখিতে পাইত একটা কঠোর সংযমের ভাস্বর দীপ্তিতে তাঁহার অম্লান বদনখানি সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। তাহার বুভুক্ষু রিক্ত অন্তঃকরণ প্রীতির আতিশয্যে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিত।

মধু যেমন একেবারে নূতন, তাহার আগ্রহও তেমনি প্রখর। দুই চারি মাসের মধ্যেই মধুর উন্নতি দেখিয়া শিক্ষক মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইল, এতদিন শিক্ষা বিভাগে থাকিয়াও তিনি এমন আর একটীর সন্ধান পান নাই।

মধু বড়দিদিকে বলিয়াছিল, জামা জুতা পরা তাহার আদৌ অভ্যাস নাই, ওগুলায় বড় অসুবিধা হয়।

মধুর অসুবিধা কোনখানে রাজলক্ষ্মীর তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। তিনি একদিনের জন্তও তাহাকে জামা জুতা পরিতে অনুরোধ করেন নাই। মোটা ভাতে পেট পুরিয়া মধু একখানা ময়লা চাদর মাত্র সম্বল করিয়া খোলা গায়ে এক মাইল দূরে স্কুলে প্রতিদিন যাতায়াত করিত। জলখাবার জন্ত রাজলক্ষ্মী তাহাকে যে পয়সাগুলি দিতেন, পথের ধারের অনাথ ও পঙ্গু ভিক্ষুক রামভজনকে দিতেই তাহার অধিকাংশ ব্যয় হইয়া যাইত। সে বুঝিয়াছিল দুইবেলা ভাতই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, জলখাবারের উচ্চ প্রয়াসে তাহার অধিকার নাই। পয়সা না লইলে পাছে বড়দিদির প্রাণে আঘাত লাগে, তাই সে পয়সা লইতে অস্বীকার করিত না।

সমস্ত দিনের পর ম্লানমুখে মধু যখন বাড়ী ফিরিত, রাজলক্ষ্মীর স্নেহহস্তের কোমলস্পর্শে তাহার সমস্ত গ্লানি ও ক্ষুধতৃষ্ণার শান্তি হইয়া যাইত। বড়দিদি ও কান্ত ছাড়া বাড়ীর আর কাহারও সঙ্গে মিশিতে সে সাহস করিত না। ভয় হইত পাছে অসাবধানে সে এমন একটা কিছু করিয়া ফেলে যাহাতে তাহার বড়দিদির প্রাণে বিষম আঘাত লাগিতে পারে।

রাজলক্ষ্মীর সম্মান রাখিবার জন্ত সে আপনাকে এতটুকু করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার কালু ও ভুলু উৎসাহের অভাবে ক্রমেই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছিল।

৭

বৈকালে অতুল স্কুল হইতে আসিয়া ডাকিল, "মা!"

রাজলক্ষ্মী নীচেই ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রে অতুল?"

অতুল পূর্ণ উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "আজ মধু দাকে স্নান করিয়ে তবে ঘরে নিও বড় মা।"

"কেন রে, মধু কি করেছে?"

"রামভজনাকে কোলে করে নিয়ে তার বাড়ী পৌঁছে দিতে গিয়েছে। ছ্যাঃ—"

"সে নিজে বাড়ী যেতে পারে নি বুঝি?"

"তার ঘা গুলো যে রকম বেড়েছে, সমস্ত ফেটে রক্ত

বেরুচ্ছে। সে গুলো কি হাত দিয়ে ছুঁতে পারা যায়? মধুদার একটুও ঘেন্না নাই, বড় মা!"

রাজলক্ষ্মীর চক্ষু দুইটী ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধু কখন ফিরবে রে অতুল?"

"ভজনাকে রেঁধে খাইয়ে তবে আসবে।"

নলিনী উপরের বারান্দা হইতে সমস্ত শুনিতেছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ত ছুঁসনি রে, অতুল?"

"হ্যাঁ, আমি ক্ষেপেছি কি না!"

নলিনী বলিল, "দিদি, মধুকে মানা কর, সে এমনি ক'রে সব মজাবে দেখছি।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "কোন ভয় নেই, ছোট বৌ; ভজনকে রক্ষা করবার জন্যে যিনি মধুকে তার কাছে পাঠিয়েছেন, তিনিই সব রক্ষা করবেন।"

অতুল বলিল, "আমি মধুদাকে এত মানা করলাম, তা আমার কথা গ্রাহ্যই করলে না, বড় মা।"

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিলেন, "তার যে বড় জায়গা থেকে ডাক পড়েছে রে।"

নলিনী বলিয়া উঠিল, "দিদির সব অনাছিষ্টি কাণ্ড; ছোটলোক গুলোকে ছোঁয়ায় তার কি দরকার ছিল?"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "কি দরকার ছিল জানিনে, ছোট বৌ। তবে অতুল এ ক্ষেত্রে খুব বুদ্ধির পরিচয় দিলেও তাকে বিশেষ প্রশংসা করতে পারলাম না।"

নলিনী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "অতুলের কপালের কি গেরো পড়েছে যে, সে যত ছোটলোকের মড়া ছুঁতে যাবে?"

"আবশ্যক নেই"—বলিয়া রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর মধু যখন বাড়ী ফিরিল তাহার মুখ দেখিয়া রাজলক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন মধু প্রাণপণ শক্তিতে সমস্ত ঘটনাটা চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে সময়ে মধুকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। মধু ভাবিতেছিল আজ স্কুল হইতে ফিরিবার বিলম্ব হওয়ার কি কৈফিয়ৎ সে বড়দিদির নিকট উপস্থিত করিবে। বড়দিদির কাছে একটা মিথ্যা প্রচার করিয়া আপনার হীনতা প্রকাশ করিতে মধুর মন স্বতঃই বিমুখ হইয়া পড়িতেছিল।

রাজলক্ষ্মী নিয়মিত ভাবে তাহাকে আহারাদি করাইয়াও যখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, তখন মধুর প্রাণটা অনেকটা হাল্কা বোধ হইতে লাগিল।

রাত্রে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে পড়িতে যাইবার জন্য মধু বই লইতে যখন রাজলক্ষ্মীর গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল, রাজলক্ষ্মী তাহারই অপেক্ষায় গৃহকোণে নীরবে বসিয়া আছেন। মধুকে পাইয়াই রাজলক্ষ্মী তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, "ভজন কেমন আছে মধু?"

মধু দুই চোখ মেলিয়া বড়দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল তাহার বড় দিদি কি দেবতা?

রাজলক্ষ্মীর কাছে মধু কিছুই গোপন রাখিতে পারিল না। ভজনের কথা বলিতে বলিতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে অজ্ঞাতসারে মধু কখন বলিয়া ফেলিয়াছিল যে সে ভজনকে সময় সময় পয়সা দিত।

রাজলক্ষ্মী মধুর ভিজা চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভয় কি মধু, আমি এইবার থেকে তোমাকে বেশী করে পয়সা দোব। জলখাবারের পয়সা থেকে ভজনকে কিছু দিতে হবে না।"

"তার আর দরকার হবে না, বড়দিদি, সে বোধ হয় শীগ্‌গির মরে যাবে।"

মধু এমন করুণস্বরে কথাটা বলিল যে, সে যেন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

৮

সেবার স্কুলের ক্লাস প্রমোশন লইয়া একটা গোলযোগ বাধিয়া গেল। মধু নিজের ক্লাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান

অধিকার করায় হেডমাষ্টার মহাশয় তাহাকে ডবল প্রমোশন দিয়া অতুলের ক্লাসে উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু অতুলের ফল ভাল না হওয়ায় সে নিজের ক্লাসেই থাকিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া নলিনীর নিকট অতুল সবিস্তারে হেডমাষ্টারের পক্ষপাতিতার বিষয় কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অতুল প্রমোশন না পাওয়ায় নলিনীর যত দুঃখ না হইল, অতুলেরই প্রসাদপুষ্ট একটা অসভ্য ছেলের সম্মুখে তাহার অতুলের এই পরাজয়ের বিষয় স্মরণ করিয়া হেডমাষ্টারের উপর তাহার মনে একটা অমানুষিক প্রতিহিংসার সঞ্চার হইতে লাগিল। শিক্ষক হইয়া যে এতবড় অন্যায় করিতে পারে, তাহাকে হেডমাষ্টারের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত রাখা কখনই নিরাপদ নহে।

মধু সেদিন সকাল সকাল স্কুলের ছুটী পাইয়া কুল পাড়িবার জন্য ক্ষান্তকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিল। ডবল প্রমোশন পাইয়া তাহার মনটি আজ আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু সব চেয়ে তার বড় আনন্দ এই যে সে তাহার বড়দিদির মুখ রাখিতে পারিয়াছে। নিজের মুখে কথাটা প্রকাশ করা অপেক্ষা বড়দিদি মাষ্টার মহাশয়ের মুখেই কথাটা শুনিতে পান, এই অভিপ্রায়ে মধু ইচ্ছা করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল।

মাষ্টার মহাশয়ের আসিবার পূর্ব্বেই অতুলের মুখে কথাটা বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রাজলক্ষ্মী আপনার মনটা প্রাণপণে সংযত করিয়া অতুলকে বলিলেন, "তা অতুল দুঃখ করিসনে, ভাল করে পড়, তুইও আসছে বার ডবল প্রমোশন পাবি।"

কথাটায় নলিনীর হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এমন আশ্বাস সবাই দিতে পারে।"

নলিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া রাজলক্ষ্মী হতভম্ব হইয়া গেলেন। এই কথায় এইরূপ উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। বলিলেন, "থাম, ছোট বৌ, ছেলের পৃষ্ঠপোষক হয়ে তার হিত করা হচ্ছে না। অতুল যাতে ভাল করে পড়ে তার ব্যবস্থা কর। মাষ্টার মশায় ত অতুলের শত্রু নন।"

"হাঁ গো হাঁ, আমি সব বুঝি! অতুলের হিংসেতেই বাড়ীর সব লোক মরে গেল।"

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিলেন, "ছি ছোট বৌ, ছেলেদের পড়াশুনোর আমরা কতটুকু খবর রাখি? না জেনে শুনে অত উতলা হচ্ছ কেন?"

"তোমার আর বলবার ভাবনা কি? মধু যদি আজ উঠতে না পারত, তা হলে বুঝতে কি না দেখতাম।"

রাজলক্ষ্মী এক নিমেষে নলিনীর বেদনার কারণ বুঝিয়া লইলেন। একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "মধুও কি তোমার পর ছোট বৌ?"

"না গো না, সবাই আমার আপনার।"

"তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ ভালর জন্যেই মাষ্টার মশায় তাকে উঠতে দেন নি, এ সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না?"

"সব বুঝতে পারি। এত দিন ত অতুল বেশ পড়ে আসছিল, আজই আর সে পারে না।"

রাত্রে মাষ্টার মহাশয় মধুকে পড়াইতে আসিলে রাজলক্ষ্মী এলোকে দিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কবাটের অন্তরালে থাকিয়া এলোকেশীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলেন, "অতুল কি ফল ভাল করতে পারে নি?"

"একেবারে না।"

"কেন এমন হল?"

"মন দিয়ে না পড়লে কি হবে মা? বই খুলে দেখলাম প্রতিবৎসরই সে এমনি ফেল করে এসেছে, কিন্তু প্রমোশন পেতে তার বাধা হয় নি; এমনই করেই তার মাথাটা খাওয়া গিয়েছে। এ বৎসরটা ঐ ক্লাসেই থাক; ওর দিকে একটু নজর দিতে হচ্ছে।"

"অতুলকে কি কোন রকমে উঠিয়ে দিতে পারা যায় না?"

"তা হলে ক্লাসের সব ছেলেকেই উঠিয়ে দিতে হয়। অতুল সবারই নীচে।"

ইতিমধ্যে মহিম আসিয়া যোগ দিলেন। বলিলেন, "তা যাই হোক মাষ্টার মশায়, অতুলকে উঠিয়ে দিতেই হবে।"

হেডমাষ্টার বলিলেন "কি বলেন মহিমবাবু! অপর ছেলেরা কি দোষ করেছে?"

"সে বিবেচনা করবার আপনার দরকার নেই।"

হেডমাষ্টারের দৃপ্ত মুখখানা সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। মহিমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা হলে স্কুলে আমার ত কোন দরকার ছিল না; আপনার অন্যায় আবদার শুনতে পারি না। ইচ্ছা হয় আপনি আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন।"

এতদিন তাহার মনের ইচ্ছামাত্র জানিয়া যাহা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া গিয়াছে, আজ তাহা এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে পারে, মহিম বুঝিতে পারেন নাই। কোন কথা না বলিয়াই মাথা নামাইয়া মহিম বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পরদিনই হেডমাষ্টারের পদত্যাগ পত্র মহিমের হস্তগত হইল। পত্রখানা হাতে করিয়া মহিম বরাবর রাজলক্ষ্মীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি বড় বৌ, আমি মাষ্টার মশায়কে কি বলেছি?"

রাজলক্ষ্মী এই ভয়েই বিমর্ষ হইয়াছিলেন। ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন, "আমি কি বলব ঠাকুরপো।"

নলিনী সব শুনিয়া নাক সিটকাইয়া বলিল, "দেশে যেন আর মাষ্টার পাওয়া যায় না!"

মহিম বলিলেন, "না ছোট বৌ, সবাই গোমস্তা পাইক নয়। কাযটা ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে।"

নলিনী বলিয়া উঠিল, "এতেই যদি তাঁর অপমান হয়ে থাকে, তবে মানুষকে ত আর কোন কথাই বলা চলে না দেখছি!"

মহিম কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী গিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সমস্ত ভুলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সে যাত্রা হেডমাষ্টার টিকিয়া গেলেন।

৯

মহিমের বাড়ীর অনতিদূরেই একটা প্রকাণ্ড বেল গাছ ছিল। গ্রামের লোক তাহার নীচে ষষ্ঠীপূজা করিত।

মধুর সহপাঠী পোদ্দারদের বড় ছেলেটী কয়দিন হইতে ভয়ানক জ্বরে ভুগিতেছিল। মধু সকালেই তাহার তত্ত্ব লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, দেখিতে পাইল কান্ত ষষ্ঠীতলায় দাঁড়াইয়া দুই হাতে চোখ মুছিতেছে। মধু জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে কান্ত?"

মধুকে দেখিয়া কান্তর শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কয়েকবার কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু রোদনাবেগে তাহা বাহির হইল না। বহু কষ্টে বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে মধুকে জানাইল যে বাবু ভুলুকে গুলি করিয়াছেন।

মধু কপালের উপর দুই চোখ তুলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "গুলি করেছে? ভুলো ম'রে গিয়েছে?"

কান্ত অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া দেখাইয়া দিল, ষষ্ঠীতলার অদূরে একটা ঝোপের কাছে ভুলু হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। রক্তে অনেকদূর পর্য্যন্ত মাটী ভিজিয়া গিয়াছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটী যেন কাহার প্রতীক্ষায় এখনও চাহিয়া আছে। পার্শ্বে বসিয়া কালু মনোযোগ সহকারে তাহার পানে চাহিয়া একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে একরূপ অস্বাভাবিক স্বরে চীৎকার করিতেছে।

মধু কান্তর ন্যায় কাঁদিল না। এক ফোঁটা জলও তাহার চোখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত শরীরখানা কাঠের মত শক্ত হইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে গিয়া ভুলুর কর্দ্দমলিপ্ত মাথটা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া ধারকণ্ঠে বলিল, "কান্ত একটু জল নিয়ে আয় ত।"

কান্ত কাপড় ভিজাইয়া জল আনিয়া ভুলুর মুখে দিল। ভুলু দুই একবার হাঁ করিয়া ক্রমেই অসাড়

হইয়া পড়িল। গুলি তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

মধুর একে একে মনে পড়িতে লাগিল, কেমন করিয়া মাতৃহীন তাহাদের দুই ভাইকে শৃগালের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের নামকরণের সময় সে কি মহোৎসব! তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন সে জ্বর বিকারে সংসার হইতে ছুটী লইবার উপক্রম করিয়াছিল, কেমন করিয়া উভয়ে তাহার শয্যাপার্শ্বে অনিমেষ নয়নে জাগিয়া বসিয়া থাকিত। সে জানে তাহাদের প্রাণে তখন কি ভাবের উদয় হইয়াছিল। এই ভুলুই নানারূপ উপদ্রবে তাহার গমনে বাধা জন্মাইয়া একদিন বিষধর সর্পের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইয়াছিল। নানারূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ে মধুর মনে যে সকল কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, জীবন সঙ্গির মরণাহত মাথাটী বুকে করিয়া আজ তাহার সেই কথাগুলি একটীর পর একটি মানস নয়নে প্রতিভাত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া মধু জড়ের মত হইয়া গিয়াছিল। কথাটি পর্য্যন্ত কহিবার তাহার সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু সময় পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা যখন তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হইল, তখন চোখের জল আর কোন রকমে বাধা মানিল না। হৃদয় গলাইয়া উত্তপ্ত জলের স্রোত হু হু করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

মাতামহীর বাড়ী হইলে মধু আজ চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। গ্রামখানাকে তুলিয়া নদীর জলে উপাড়িয়া ফেলিয়াও তাহার শান্তি হইত না। এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের ফল ঘাতককে তাহার হাতে হাতে দিয়া তবে সে ক্ষান্ত হইত। আজ তাহার বেদনা বুঝিবার লোক যে কেহই জীবিত নাই।

শোকের বেগ একটু কমিয়া আসিলে মধু জিজ্ঞাসা করিল, "কান্ত, তোদের বাড়ীতে কোদাল আছে?"

কান্ত অবিলম্বেই কোদাল আনিয়া উপস্থিত করিল। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ছায়াময় একটা বাঁশবনের পাশে মধু অতি কষ্টে ভুলুর সমাধির জন্য একটা গর্ত্ত খুড়িল। কান্তর সাহায্যে তাহাকে উঠাইয়া আনিয়া গর্ত্তে শোয়াইয়া দিল এবং মাটী দিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গখানি বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিয়া, মধু একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এইখানে চুপ করে শুয়ে থাক্ ভুলু—আর কখনও পরের বাড়ী যাসনে।"

কোদালখানি কান্তকে ফিরাইয়া দিয়া মধু জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল রে কান্ত?"

কান্ত বলিল, "ছোট মা বাবুকে বল্লেন ভুলু খোকা বাবুকে কামড়াতে গিয়েছিল, আর বাবু অমনি বন্দুক এনে—"

"সে ত কামড়াতে জানত না?"

"কামড়াতে যাবে কেন? আমি নিজে দেখেছি সে খোকাবাবুর সঙ্গে খেলা করবার জন্যে ছুটোছুটি করছিল।"

মধু কালুর গলা ধরিয়া চুপ করিয়া বেলগাছের ছায়ায় বসিল। বাড়ী প্রবেশ করিতে আর তাহার মন সরিতেছিল না। কান্ত কোদাল রাখিবার জন্য বাড়ী চলিয়া গেল।

বেলা হইলে অতুল গামছা ঘাড়ে করিয়া স্নান করিতে যাইবার সময় মধুকে এই অবস্থায় দেখিল। দেখিয়া তাহার ভারি হাসি পাইল। কালুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কেমন জব্দ—তোমারও একদিন অমনি সাজা হবে।"

মধু অন্যমনস্ক হইয়াছিল, অতুলের আগমন বুঝিতে পারে নাই। তাহার স্বর শুনিয়া মধুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

অতুলকে দেখিয়া মধুর সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম করিতে লাগিল। যত অনর্থের মূলই সেই অতুল। তাহার সকল শোক দুঃখ একেবারে লোপ পাইয়া গেল। একটা অমানুষিক বিদ্বেষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সে উন্মত্তের ন্যায় অতুলের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার কাপড় ছিঁড়িয়া কিল চড় লাথি মারিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। অতুল যদি কোন প্রকারে পলাইতে না পারিত তাহা

হইলে মধু বোধ হয় তাহাকে ভুলুর সঙ্গী না করিয়া ছাড়িত না। প্রতিশোধের দারুণ আকাঙ্ক্ষায় মধুর দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিতেছিল।

অতুল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। মুখের শিকার পলাইয়া গেলে ব্যাঘ্র যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, মধু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইরূপে অতুলের দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিল।

সেদিন মধুর স্কুল বলিয়া মনে পড়িল না। অতুলের প্রহারের সংবাদ পাইয়া বাড়ীতে যে বীভৎস দৃশ্য উপস্থিত হইবে, সে তাহার কল্পনা করিবার অবসরও পাইল না। অস্নাত অভুক্ত বন্ধু কালুকে লইয়া অশ্বত্থ গাছের আড়াল দিয়া গ্রাম্য দেবালয়ের পশ্চাৎ দিয়া গ্রামের লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

১০

নলিনী অতুলের তদবস্থায় হাত ধরিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া বলিল, "তার চেয়ে বল না কেন দিদি আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই।" রাজলক্ষ্মী বিষম লজ্জিত হইয়া একেবারে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। এতদিন যে মধু বাড়ীতে অশান্তির সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল তাহাতে বাড়ীর কাহারও উপর কোন অত্যাচার সে করে নাই। কিন্তু আজ অতুলের প্রতি এইরূপ বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে রাজলক্ষ্মী মধুর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মধুকে সম্মুখে পাইলে তিনি নিজের হাতেই অতুলের সম্মুখেই তাহাকে এই কাযের যথোচিত সাজা দিয়া তবে ছাড়িতেন। কিসের জন্য অতুল মার খাইল রাজলক্ষ্মী তাহা অনুসন্ধান করিলেন না। সে যে নিতান্ত হীনের ন্যায় এই কাযটা করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতেই তিনি মনে মনে মধুকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিলেন না। একটা অহেতুকী আশঙ্কাও যে তাঁহার মনে না জাগিতেছিল তাহা নহে। কোন প্রকারেই যখন এই অন্যায়কে মানিয়া লইতে পারা যায় না তখন মহিমের কি প্রচণ্ড শাস্তিই মধুর উপর ঝুলিতেছে তাহা মনে পড়ায় তাঁহার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। নলিনীর কথার উত্তরে বলিলেন, "সে কি ছোট বৌ, আমি আজই মধুকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

ছোট বৌ অভিমানে রাজলক্ষ্মীকে কোন কথা না বলিয়া, অতুলের পিঠে এক প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল, "তোর সে বড় লোকের ছেলের সঙ্গে মেশবার দরকার কি ছিল রে?"

অতুল চাৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল। অতুলের প্রহারে রাজলক্ষ্মী একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "আমার উপর বৃথা অভিমান করে তুমি ছেলেটাকে মারছ, ছোট বৌ; আমি কি অতুলকে মারবার জন্যে মধুকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম?"

"সবাই সাধু, কেউ কিছু জানেন না, বাড়ীর মধ্যে দোষী কেবল আমি আর আমার ছেলে।"

রাজলক্ষ্মীর বড় দুঃখেও হাসি পাইল। বলিলেন, "আমি জানি মধুকে নিয়ে একটা গোলযোগ ঘটবেই। সে যদি বাড়ীতে একটা চাকরি নিয়ে আসত তা হলে কারও বোধ হয় কিছু বলবার থাকত না; কিন্তু সে যখন অতুলের সমান হতেই চলেছে, অনেক ব্যাপারে তাকে যখন ডিঙ্গিয়ে চলেছে, তখন সে যে অনেকের বিষ নয়নে পড়বে তার আর সন্দেহ কি। আমারই গোড়ায় ভুল হয়েছিল ছোট বৌ।"

নলিনী আর কোন কথা না বলিয়া দুম দুম করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী ভাবিয়া রাখিলেন আজ মধু ফিরিলে তাহার সহিত আর কথা কহিবেন না, তাহাকে খাওয়াইয়া দিবেন না, পড়িতেও বলিবেন না। সে তাহার কে, এই শান্ত পরিবারটীর মধ্যে কোথা হইতে আসিয়া সে একটা বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। পরের ছেলেকে আপন করিবার চেষ্টার মত ভুল বুঝি বিশ্বে আর নাই। কিন্তু সূর্য্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িল অথচ মধুর কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া

গেল না, তখন রাজলক্ষ্মীর মন ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে করিয়াছিলেন মধু না খাইয়াই হয় ত স্কুলে গিয়াছে। মধুর স্কুল হইতে নিত্য ফিরিবার সময়ও যখন চলিয়া গেল তখন তাঁহার মন আর স্থির থাকিতে চাহিল না। চুপি চুপি কান্তকে ডাকিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কান্ত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অদ্যকার সকালের সমস্ত সংবাদ রাজলক্ষ্মীর গোচর করিল। কান্ত আরও বলিল যে, সে সমস্তদিন গ্রামে মধুর খোঁজ করিয়াও তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

কান্তর কথায় রাজলক্ষ্মীর মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গেল, মনে দারুণ অনুশোচনার সঞ্চার হইল। রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন মধু আর এ বাড়ীতে আসিবে না, সে জন্মের মত বিদায় লইয়াছে। ভুলুর মৃত্যুতে তাহার একখানি পাঁজর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তবু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "মধু কি একেবারে তাহার বড়দিদিকে ভুলিতে পারিবে?"

রাজলক্ষ্মীর যতই মনে পড়িতে লাগিল মধু প্রাণের ব্যাকুলতায় অনাহারে অনিদ্রায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহই তাহাকে সময়ে খাইতে বলে নাই, অন্ধকার রাত্রিতে একাকী সে একমাত্র কালুকে লইয়া গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িবে, ততই তাঁহার মন অস্থিরতায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি রাজলক্ষ্মী ঘর বাহির করিয়া কাটাইয়া দিলেন। একটুকুও ঘুমাইতে পারিলেন না। যখনই একটু তন্দ্রা আসে মধুময় স্বপ্নে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। সকালে কান্ত দেখিল একরাত্রির মধ্যে তাহার বড় মায়ের মুখ মরা মানুষের মুখের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ্যে মধুর অনুসন্ধানে লোক পাঠাইতে রাজলক্ষ্মীর সাহস হইল না। প্রাণের যন্ত্রণা প্রাণে চাপিয়া দিনের পর দিন মধুর প্রত্যাগমনের আশা করিয়া রহিলেন।

একদিন দুইদিন, তিনদিন করিয়া এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, কিন্তু মধু ফিরিল না। সে প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না রাজলক্ষ্মীর এখন সেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল।

ভগবান্, ভগবান্, এমন সংবাদ পাইবার আগে রাজলক্ষ্মীকে যেন তোমার পায়ে স্থান দিও!

রবিবারের দিন সকালে হেডমাষ্টার মহাশয় রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় লইতে আসিয়া জানাইলেন, তিনি আজই রায়গঞ্জ চলিয়া যাইতেছেন।

রাজলক্ষ্মী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করাইলেন, "কেন?"

"রায়গঞ্জে নূতন চাকরি পাওয়া যাচ্ছে।"

"এখানকার কায?"

"এখানকার কায ত আমার ফুরিয়েছে।"

"আপনার—অপরাধ?"

"মহিম বাবুর অনুরোধে, স্কুল থেকে মধুর নাম কেটে দিতে পারিনি।"

"তাঁর আদেশমত কায করেন নি কেন?"

"বুড়ো বয়সে সেটা আর পারলাম না মা, অপরাধ না জেনে এত বড় দণ্ডটা দিতে ফাঁসীর হুকুম লেখার চেয়েও হাতটা বেশী কাঁপে।"

"মধু ত আর ফিরবে না।"

"না ফিরলেও, কর্ত্তৃপক্ষের রোষ থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে বলে বোধ হয় না। এই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট খানা রেখে দিন, যদি মধু কখনও ফেরে তাকে আমার কাছে পাঠাতে লজ্জাবোধ করবেন না।" এই বলিয়া মাষ্টার মহাশয় সার্টিফিকেট খানা মাটীতে রাখিয়া দিলেন। রাজলক্ষ্মী সেখানি উঠাইয়া লইয়া কপাটের অন্তরাল হইতে "একটু দাঁড়ান মাষ্টার মশায়" বলিয়া আপনার গৃহ হইতে দুইশত টাকার নোট আনিয়া মাষ্টার মহাশয়ের পায়ের কাছে রাখিয়া, ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া একটা প্রণাম করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মধুর তরফ থেকে তার বড়দিদির এই যৎসামান্য গুরুদক্ষিণা, কিছু মনে করবেন না।"

১১

খোঁচাটা শরীরের যে কোনও স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিলেও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মনোযোগ সেই দিকেই থাকে; যখন সেটা উঠিয়া যায় শরীরের কোথাও কিছু ঘটিয়াছিল তাহা কোন অঙ্গেরই মনে থাকে না। মধুকে উপস্থিত না পাইয়া বাড়ীর গোলমাল অল্প দিনেই থামিয়া গেল। মধুর বর্ত্তমানে পরিবারের মধ্যে যে জোড়গুলার বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার ক্রমশঃ শক্ত হইয়া আসিল। কেবল মধু যে দুইটী প্রাণীর প্রাণের এক অংশ জুড়িয়া বসিয়াছিল, কেবল তাহাদেরই অভাব পূরণ হইয়া উঠিল না। একটা অজ্ঞাতকুলশীল মা বাপহারা পথের বালক আসিয়া কেমন করিয়া যে তাহাদের প্রাণের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী ও কান্ত তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

রাজলক্ষ্মীর হৃদয় ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল; ভাবিলেন, মধু যদি তাঁহার নিজের ছেলে হইত, সে কি এই সামান্য দোষে এতদিন ধরিয়া তাহার খোজ না লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিত? অশান্ত দুর্দ্দান্ত ছেলের কি মায়ের বুকে স্থান নাই? সে যে এতদিন তাহার বড় দিদির উপর একান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়াছিল, আপনার ভালমন্দ বুঝিবার তাহার প্রয়োজন হয় নাই। স্থির করিলেন কাল সকালে উঠিয়াই তিনি মধুর অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইবেন। পড়ুক সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তপ্তরোষ তাঁহার মাথার উপর, ডুবাইয়া দিক তাঁহার দগ্ধ দেহ খানা, আত্মীয় স্বজনের তীক্ষ্ণ নিন্দাগ্লানিতে তিনি মধুকে বুকে করিয়া এত বড় পৃথিবীর একান্ত একটু স্থান খুঁজিয়া লইবেন। লোক স্থির করিবার জন্য নীচে নামিতেই, রাজলক্ষ্মী শুনিতে পাইলেন, বাহিরের জানালার নিকট কি যেন একটা খস্ খস্ করিতেছে। রাজলক্ষ্মী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" একটা কালো ছায়া যেন সেখান হইতে দৌড়িয়া সরিয়া গেল।

যদি সেই হয়! রাজলক্ষ্মীর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। শব্দ মাত্র না করিয়া তিনি সেই ছায়ার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু কোথায় কে? অন্ধকারের ভিতর একখানা কাপড় বাতাসে দুলিতেছে।

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন হইতে মধুর অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। গ্রামে গ্রামে লোক ছুটিল, রাজলক্ষ্মী অজস্র অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্তই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের মত নিষ্ফল হইতে লাগিল। একস্থান হইতে সংবাদ লইয়া লোক ফিরিবার পর রাজলক্ষ্মী আশা করেন, অন্য লোকেরা তাহার সংবাদ আনিতেছে। রেল ষ্টেসন হইতে লোক ফিরিলে মনে করেন বুঝি মধু তাহার মাতামহীর বাড়ীই গিয়াছে; কিন্তু সেখান হইতেও লোক আসিয়া যখন মধুর কোন সংবাদ দিতে পারিল না, তখন রাজলক্ষ্মী হতাশ হইয়া পড়িলেন। নলিনীর চাপা হাসি, মহিমের অনাবশ্যক প্রশ্ন, রাজলক্ষ্মীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাঁহার মাথার মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সম্মুখে নূতন লোক পাইলেই তাহাকে মধুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলেন, আবার আপনা হইতেই লজ্জিত হইয়া চলিয়া যান।

মধু এতদিন মহিমের সংসারে নিশ্চিন্ত ভাবেই বাস করিতেছিল। তাহার নিজের ও বড়দিদির নিতান্ত সতর্কতা সত্বেও কোথা হইতে কি একটা ঘটিয়া যাইত যাহার কল্পনা পর্যান্ত উভয়ে কখনও করিয়া উঠিতে পারিত না। মহিমের বিরাট সংসারে কত-লোক আসে যায়, কেহ তাহার খোজ পর্য্যন্ত পায় না, কিন্তু যেদিন হইতে মধুর মত একটি ক্ষীণপ্রাণ শিশু একান্ত অনাহূত ভাবে এই সংসারে আসিয়া দাঁড়াইল, ছোট বড় সকলের দৃষ্টিই সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

রাজলক্ষ্মী জানিতেন নলিনীর অধিকার হইতে মধুকে কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার উচিত বিচার করা হয় নাই। নলিনীর আচরণের সঙ্গতি অসঙ্গতি

বিবেচনা না করিয়াই তিনি যদি মধুকে সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন, হয়ত মধুকে লইয়া এতটা ব্যাপার নাও ঘটিতে পারিত এবং মধুও হয়ত সন্তুষ্ট চিত্তে এই বাড়ীতেই রহিয়া যাইত। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কোন হাত ছিল না। নিঃসন্তান নারীর স্নেহের তরঙ্গ কেন যে অকারণে একটা অপরিচিত শিশুর উপরেও জোরে আসিয়া আঘাত করে, অন্তর্যামী ভিন্ন কে তাহা নির্ণয় করিবে?

১২

মধু যত দিন ছিল, অতুলের সঙ্গে সকল কাযেই কোন না কোন একটা অসামঞ্জস্য ঘটিয়াই থাকিত। তবুও অতুলের তাহাতেই তৃপ্তি ছিল। মা বাপের কাছে মধুর বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা অনেক নালিস করিয়া সে যে একটু আনন্দ উপভোগ করিত, সেইটুকুই সে প্রচুর লাভ বলিয়া গণ্য করিয়া লইত। সে জানিত না তাহার এই ক্ষণিক আনন্দের ভিতর এতটা নিষ্ঠুরতা লুকাইয়া আছে। তাহার অপেক্ষা মধুর অধিকার যে এবাড়ীতে কোন অংশে কম থাকিতে পারে এ ধারণা অতুলের কোন দিনের জন্যই হয় নাই। সে জানিত তাহার অভাব অভিযোগের স্থান যেমন তাহার মা, মধুরও অভাব অভিযোগের স্থান তাহার বড় মা। শিক্ষা ও সঙ্গগুণে তাহার বাল্য হৃদয় যেমন গড়িয়া উঠিতেছিল, আনন্দ উপভোগের উপকরণও সে তেমনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। ধনী পিতার একমাত্র বংশধর হইয়া জন্মিয়া অতুল স্নেহের অতিরিক্ত টানে এবং সতর্ক দৃষ্টির সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে মানুষ হইয়া তাহার বৰ্দ্ধিষ্ণু আত্মাটাকে ক্রমশঃ মাটীর দিকেই ঠেলিয়া লইয়া চলিতেছিল। আহার বিহারের বাধ্যতামূলক সংযমের নামে অসংযমের মধ্যে থাকিয়া তাহার ভিতরের শূন্যতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে-ছিল, এই রিক্ত সতৃষ্ণ অন্তরের সম্মুখে মধু যে দিন আপনার রৌদ্রদগ্ধ উদার স্বাধীন দেহ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল অতুলের মনেও একটা উৎকট আনন্দের সঞ্চার হয় নাই তাহা বলা যায় না; কিন্তু একটা নূতন জীবের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে বালকের প্রাণে যে সরলতাটুকু থাকার আবশ্যক, অতুলের তাহার একেবারে অভাব ছিল।

মধু গাছে চড়িয়া কালোজাম পেয়ারা প্রভৃতি পেট পুরিয়া খাইয়া আসিত। কান্তকেও তাহার ভাগ দিত। অতুল নির্নিমেষ লোচনে তাহাদের সেই অপার আনন্দোৎসব বসিয়া বসিয়া দেখিত। মধুর সৌভাগ্যের ঈর্ষ্যায় তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইত। মধুদাদার জন্য সে যে ভালবাসাটুকু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল তখনকার মত তাহা চাপা পড়িয়া যাইত। ভবিষ্যতে মধু যাহাতে এতটুকু আনন্দলাভ করিতে না পারে, সেই জন্য মা কিংবা বড়মায়ের নিকট মধুর অপরিমিত অভক্ষ্য ভক্ষণের বিষয়টা গোচর করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইত। আহরিত ফলের দুই চারিটা ঘুস দিয়া মধুকে সময়ে সময়ে অতুলের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইত।

মধু হঠাৎ চলিয়া যাইবার পর তাহার যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—সেদিন যদি মধুদাদার মার খাইয়া সে চুপ করিয়া থাকিত! সে বুঝিতে চাহিল না তাহার দোষ কোন খানে। সেই না হয় কাঁদিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু মধুদাদাকে ত কেউ তাড়াইয়া দেয় নাই। কুকুরটা তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়াছিল বলিয়া ভয়ে সে মাকে জানাইয়াছিল। সে ত গুলি করিতে বলে নাই; আর, একটা কুকুরের জন্যই বা এত কেন বাপু? সরকারদের ছানাটা লইয়া আসিলেই ত চলিত।

১৩

মধুর অন্তর্দ্ধানের পর আজকাল করিয়া পাঁচটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মহিমবাবু হৃদরোগে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। কান্ত শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছিল,

দুই বৎসরের মধ্যেই সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া রিক্ত প্রকোষ্ঠ এবং পূর্ণ যৌবন লইয়া মায়ের বুকে ফিরিয়া আসিয়াছে। পথের ধুলায় এবং পানাপুকুরের স্নিগ্ধ গন্ধে গ্রামের গোপ-কন্যাদের প্রাণ এখনও ভরিয়া উঠিতেছে।

রাজলক্ষ্মী সংসারে উদাসীন হইয়া এক প্রকারে জীবনটা কাটাইয়া দিতেছিলেন। মহিমের মৃত্যুর পর ছোট ছেলেটার ঘাড়ে যখন সক্ষম ও অক্ষম ব্যাক্তিগুলার ভার নির্ব্বিচারে আসিয়া পড়িল, তখন স্বামী শ্বশুরের ভিটাখানা যাহাতে বজায় থাকে রাজলক্ষ্মীকে তাহাই আবার নূতন করিয়া দেখিতে হইল। এ সকল কাযে নলিনীর কোনই ক্ষমতা ছিল না। সে একেবারে দিদির পায়ে আপনার ছেলে মেয়ে দুটীকে রাখিয়া কাঁদিয়া পড়িল। অতুলকে রাজলক্ষ্মী একে একে সকল কাযে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। অনাবশ্যক কঠিন বন্ধনের মধ্যে মানুষ হইয়া অতুলকে যখন একেবারে অকূল সংসার সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইল, তখন সে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। রাজলক্ষ্মী তাহাকে কূলে না তুলিলে বোধ হয় তাহাকে ভাসিয়া যাইতে হইত।

আপনার সংসার কতকটা বুঝিয়া লইতে পারিলে রাজলক্ষ্মী একদিন অতুলকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, এইবার আমাকে ছুটি দে, শেষকালে গোবিন্দজীর চরণে মাথাটা রেখে যাতে মরতে পারি তাই কর।"

অতুল বলিল, "তবে আমিও যাই চল।"

"বাধা দিসনে অতুল, ঠাকুরের মুখ দেখেও যদি সে হতভাগার মুখখানা একদিনের জন্যেও ভুলতে পারি।"

"আবার ফিরে আসবে, বল।"

"আসবো।"

বৃন্দাবন যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্ব অনেকে আসিয়া সঙ্গী হইতে লাগিল।

যাত্রার দুই চারিদিন পূর্ব্বে রাজলক্ষ্মী একদিন অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুর ইচ্ছায় যদি আর নাই ফিরতে পারি, আমার সম্পত্তিটার একটা ব্যবস্থা করে গেলে হত না ?"

অতুল অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর কথাটা যদি সত্যই হয়! মনে মনে গোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া জানাইল, "ঠাকুর তুমি ত সব বুঝতে পারছ, আমার বড় মাকে ফিরিয়ে দিও।" প্রকাশ্যে বলিল, "বড় মা, তোমার ইচ্ছায় ত আমি কখনও বাধা দিই নি।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "তবে এক কায কর্ অতুল। মধুর মত যাদের খোঁজ পাবি তারা যাতে সংসারে ভেসে না বেড়ায় তারই একটা ব্যবস্থা কর্।"

পরদিনই দলীল প্রস্তুত হইল, রাজলক্ষ্মী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিলেন।

অতুল স্থির করিয়া রাখিয়াছিল রাজলক্ষ্মীই অনাথ আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। প্রতিষ্ঠার উৎসব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রা স্থগিত রহিল।

আয়োজন শেষ করিতে আরও এক মাস চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মীর আদেশ অনুসারে ইহাতে কোনও আড়ম্বর হইতে পারিল না।

শুভদিনে প্রাতঃস্নান করিয়া, কোষের বসন পরিয়া শিশির ধৌত অম্লান কুসুমের ন্যায় মহিমময়ী মূর্ত্তিতে রাজলক্ষ্মী গোপনে আপনার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন।

সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষ্মী রায়গঞ্জ হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলেন। তাহাতে মুরলীধর রায় জানাইয়াছেন যে মধু শঙ্কটাপন্ন পীড়িত, তাহার বড় দিদিকে একবার দেখিতে চায়।

রাজলক্ষ্মী কোনরূপ বিচলিত হইলেন না। স্থিরভাবে টেলিগ্রামখানা অতুলের হাতে দিয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

অতুল অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে বড় মা ?"

রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "তবুও যদি একবার শেষের দেখাটা পাওয়া যায়।"

"সেই ভাল, আমি তোমাকে নিয়ে যাই।"

নলিনী বলিল, "অতুল যাবে দিদি, কি জানি কি ব্যারাম।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "কায নেই অতুল, কান্তকে আমার সঙ্গে দে, আমি বেশ যেতে পারব।"

"সে হয় না বড়মা, আমাকে যেতেই হবে।"

কাহারও কথা না শুনিয়া দশমিনিটের মধ্যে সাজিয়া আসিয়া অতুল ডাকিল—"বড় মা!"

একখানা সাদা চাদরে অঙ্গ মুড়িয়া, কান্তকে লইয়া রাজলক্ষ্মী গাড়ীতে উঠিলেন।

পরদিন প্রভাতে রায়গঞ্জে মুরলীধর বাবুর দরজায় গিয়া অতুল হাঁকিল—"মাষ্টার মশায়।"

মষ্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "একটু আস্তে।"

সমস্ত রাত্রি রাজলক্ষ্মী একটি কথাও কহেন নাই। তিনি যে কেমন করিয়া এতখানি পথ আসিয়া পড়িয়াছেন তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। মাষ্টার মহাশয়ের সাড়া পাইয়া রাজলক্ষ্মী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "মাষ্টার মাশয় সে বেঁচে আছে ত?"

মাষ্টার মহাশয় ভারি গলায় উত্তর দিলেন, "এখনও আছে, সমস্ত রাত্রি অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। ভিতরে আসুন।"

অতুল মাষ্টার মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া রাজলক্ষ্মী ও কান্তর সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেল।

তিন দিন তিন রাত্রি সকলে মিলিয়া যমের সঙ্গে অশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া এ যাত্রা মধুকে তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন।

মধুর বাঁচিবার সম্পূর্ণ আশা হইলে একদিন রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে না বলে কোথায় চলে গিয়েছিলে, মধু?"

মধু লজ্জিত হইয়া বলিল, "ওদিন আমার ভুলুর জন্যে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছিলাম। একজন হিন্দুস্থানী সাধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনিই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। এক বৎসর তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরেছি। যেদিন বসন্ত হয়ে কালুও মারা গেল, সেই দিন কাউকে কিছু না বলে সাধুর কাছ থেকেও পালিয়েছিলাম। একখানা বাঙ্গলা খবরের কাগজে দেখেছিলাম, রায়গঞ্জ স্কুলের শিক্ষক মুরলীবাবুর খুব প্রশংসা করে কে একজন একটা প্রবন্ধ লিখেছে। তাঁর নামটা চোখে পড়বামাত্র মনে হল তাঁর কাছেই ফিরে যাই। পথে আসতে আসতে প্রবল জ্বর হল, হাঁসপাতালে আশ্রয় নিয়ে মাষ্টার মশায়কে সংবাদ দিতে বল্লাম, তার পর কি হয়েছিল জানিনে।"

দারুণ অভিমানে রাজলক্ষ্মী বলিয়া ফেলিলেন "আজন্ম স্নেহের কাঙ্গাল তুমি, স্নেহের মর্য্যাদা বুঝবে কি করে নিষ্ঠুর।"

মধু বুঝিল তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সে বড় দিদির মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না। ক্ষীণ দুর্ব্বল মাথাটা বালিশের নীচে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কান্ত অনুযোগ করিয়া বলিল, "যা হোক মধুদা, তুমি এমন—"

অতুল ইতিমধ্যে আপনার মাথাটা গলাইয়া মধুর পায়ের কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে মাপ কর মধুদা, আমি চিনতে পারিনি, তুমি কত বড়।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘর নীরব হইয়া রহিল।

মাষ্টার মহাশয় অতুলকে কোলে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অতুল মাষ্টার মহাশয়ের কোলে বসিয়াই বলিল, "চল মধুদা; আবার আমরা দু'ভাই মিলে বিলাসপুরে ফিরে গিয়ে, তাকে সোণার গাঁ করে তুলি।"

(সম্পূর্ণ)

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

বিদ্যাপতির কাব্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিদ্যাপতির দূতীর চিত্র অতি মধুর। সে রাধিকাকেও যেমন করিয়া বুঝাইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি করিয়া বুঝাইতে লাগিল। দূতী মধুরভাষিণী, চতুরা, প্রেমের জীবন কাহিনী তাহার নখ দর্পণে। সে অঘটন ঘটাইল। উভয়েরই দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিয়া গেল। কৃষ্ণগত-হৃদয়া শ্রীরাধা তখন মিলন সুখের পরিপূর্ণতায় আকুল হইয়া কহিলেন—ধিক্ সেই নারীকে যে প্রিয়তমের উপর কোপ করে; কারণ কুলকামিনীরা কোপেই পুরুষের প্রেমকে হারায়।

ধিক্ ত্রিয় কর জে প্রিয় পর কোপ।
কুল কামিনিজন প্রেমক লোপ।

* * *

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধু হারায়েছিলাম।
শ্যামসুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥
সই! জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাঞা॥
(চণ্ডীদাস)

মিলনের সে বিচিত্রতা কি অপূর্ব্ব! দুইজনের কাহারও মুখেই কথা নাই—ভাষা মূক হইয়াছে—সমস্ত দেহ আসিয়া নয়নদ্বয়ে স্থান লইয়াছে। দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া ত আশা মিটে না—

দুহু মুখ হেরইতে দুহু ভেল ধন্দ।

দুইটি চিত্রপুত্তলিকা যেন এ উহার মুখপানে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল। নয়নে পলক নাই, দেহে স্পন্দন নাই। বিশ্ব সেই অনন্ত প্রেমসাগরে ডুবিয়া গেল। প্রেমের আকুলতায় শ্রীরাধার নয়ন পল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল।

তৈখন ছল ছল লোচন জোর।

পরে সখীদিগকে কহিলেন, সখি, কানুর সে প্রেমের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিস? আমাদের দেহ দুটা ভিন্ন বটে, কিন্তু বিধাতা দুই দেহে একটী মাত্রই প্রাণ দিয়াছেন।

একহি পরাণ বিহি গঢ়ল ভিন দেহা

মিলনের মধু যখন চিত্তকে উন্মত্ত করে তখন কথা যোগায় না—তখন

কহিল জে কহিনি পুছই কত বেরি

একই কথা বার বার কতবার জিজ্ঞাসা করে। সখি রে! এক মুখে সে পিয়ার পীরিতি আমি কত বলিব? বলিয়া বলিয়া বলিয়া ত তাহার শেষ হয় না—"লাখ বয়ান বিহি ন দেল হামার।" পোড়ারবিধি পিয়ার প্রেম দিয়াছে—কিন্তু "লাখ বয়ান" ত আমাকে দেয় নাই! আমি এক মুখে বলিয়া কত বুঝাইব? সে যখন মধুর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, সখি, "আনন্দ জলে পরিপূরল নয়ান!" আমি নয়নের জলে ভাসিতে লাগিলাম। সখি, সে আমার স্বপ্ন না সত্য?

সখিহে, কি কহব কিছু নহি থরে।
সপন কি পরতেক কহয় ন পারিয়
কিয় নিয়র কিয় দূরে॥

সখি কি আর কহিব আমি? মুখে বাক্য সরে না। সত্যই কি তাহাকে পাইয়াছিলাম, না স্বপ্ন দেখিলাম মাত্র? মনে হইল যেন সে আমার একটী জাগ্রত স্বপ্ন, তাহার পরশে আমার অঙ্গ শীতল হইল বটে, কিন্তু মনে হইতে লাগিল বুঝি বড় দূরে আছি। সখি রে, আমি কি সত্যই তাহার নিকটে ছিলাম? না তাহা হইতে

দূরে থাকিয়া সে অঙ্গের পরশ সুখ অনুভব করিতে-ছিলাম?

মানের পর বিদ্যাপতি মিলন লীলায় যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে গভীর প্রেমের অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে মিলনে—

দুহু দুহু গুণ গায়
একই মুরলী রন্ধে্ দুহু সে্ বজায়॥

কিন্তু তখনো সে প্রেম ভোগাকাঙ্ক্ষাকে দূরে পরিহার করিয়া অনলদগ্ধ কাঞ্চন হয় নাই। প্রথমে রূপের মোহ, তার পর অনুরাগের সঞ্চার। সেই অনুরাগ হইতে যে প্রেমের জন্ম, তাহা ভোগকে বেষ্টন করিয়া তরুর আলিঙ্গনে লতার মত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা মানবের অঙ্কিত মানব মানবীর প্রেমকাহিনী—উহা স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়াছে বটে, কিন্তু মহাকবির নিপুণতা সে চিত্রকে স্বভাবাতিরিক্ত করিয়া পরম রমণীয়তা দান করিয়াছে। প্রেম, ভোগের অনলে দগ্ধ হইয়া ক্রমে যেরূপ নির্ম্মল হইয়া উঠিতেছে, এই বিলাস লীলার ভিতরে তাহার সন্ধান সহজলভ্য। সে প্রেম আর তখন সঙ্কীর্ণশরীরা শৈলবিহারিণী নৃত্যশীলা প্রবাহিনী নহে, তাহা তখন দিগন্ত বিস্তৃত তরঙ্গহীন অতল মহা সাগর—শান্ত দীপ্ত গম্ভীর মধুর বিরাট—সীমা সেখানে অসীমে মিলাইতেছে—অসীম সেখানে সীমার মধ্যে ধরা দিতে চাহিতেছে।

ক্রমে বসন্ত আসিল, কুসুম ফুলে আগুন ছুটিল, অভিনব কোমল সুন্দর পত্রাবলী দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন সমস্ত বন রাত্রিবসন পরিধান করিয়াছে। বৃন্দাবনে বসন্ত ব্যক্ত হইয়া পড়িল। "ভুখল ভ্রমরা" তখন ফুল্ল মল্লিকায় আনন্দে মকরন্দ পান করিতে লাগিল।

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥

সেই সরস বসন্তে "নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল।" তখন বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল বাজিয়া উঠিল।

ডগ মগ ডম্ফ ডিমিকি ডিমি মাদল।
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।

চারিদিকে এত আনন্দ এত প্রেম মিলনের মধুর বন্ধনে নয়নে নয়ন, হৃদয়ে হৃদয় এক হইয়া আছে, জোয়ারের জল যেমন তীরকে ছাড়িতে চাহে না, বার বার তাহারই বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ব্যাকুল আগ্রহে আলিঙ্গন দান করে, "ধনি জুয়ার পঙ্ক পঙ্ক সে খেল পাড়" সেইরূপ আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াও ত সুখ অপূর্ণ থাকে—মনে হয় বুঝি হারাইলাম, আর বুঝি ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, সে যেন একটা গুপ্ত কণ্টকের তীক্ষ্ণ আঘাত-থাকিয়া থাকিয়া বুকের ভিতর খচ্ খচ্ করে! প্রেম যত গাঢ়, শঙ্কা তত অধিক; কণ্টক তত তীক্ষ্ণ—ব্যথা তত দারুণ।

অনেক সাধের পিরীতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমনি সে মনে লয়॥ (চণ্ডীদাস)

মিলনের পর সহসা একদিন সেই বিচ্ছেদের কাল আসিয়া সত্য সত্যই উপস্থিত হইল। কালো না থাকিলে কি আলো সাজে? শ্রীরাধিকা আকুলকণ্ঠে কাঁদিয়া কহিলেন—

হরি কি মথুরা পুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল।
* *
কৈসে হম যাওব যামুন তীর।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ কুটীর॥

আজ মনে পড়ে সই, সেই প্রথম অনুরাগের কথা। তখন মনে হইত আমাদের একটি প্রাণ না হইয়া দুইটী প্রাণ হইল কেন? প্রাণ হইতে প্রাণের অন্তর তখন সহিত না—

পহিলি নিপিরীত পরাণ আঁতর
তখনে অইসন রীতি।

আজ আর সে আমাকে দেখিয়াও দেখে না—"ভেলি নিম জনি তীতি।"—আমি আজ তাহার কাছে নিমের

ন্যায় তিক্ত। যে পিয়া আমাকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া হৃদয়ের ব্যবধানও দিত না, হায় হায়, আজ সে কোন্ দিকে চলিয়া গেল ?

কোর সুতল পিআ আন্তরো ন দেঅ হিয়া
কে জান কওোন দিগ গেল ॥

আমি আর কেমন করিয়া প্রাণ রাখিব ? আমি কাঙ্গালিনী, অনেক যত্নে রত্ন পাইয়াছিলাম—সে নিধি আমার অঞ্চল হইতে কেমন করিয়া খসিয়া পড়িল ? সখি, পাইলাম যদি, তবে আবার হারাইলাম কেন ?

নিধনে পাওল ধন অনেক যতনে।
আঁচল সওো খসি পলল রতনে।

সখি বল্ বল্ কোথায় আমার সে মাধব, কোথায় আমার সে পরাণ প্রিয় ?

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে
হমারি পিয়া কোন দেশ রে।

সে যদি দূর দেশে রহিল,তবে কাহার জন্য এই বেশ ? সে যদি দেখিল না তবে কাহার জন্য এই ভূষা, এই গজমতি হার, এই শৃঙ্গার ? আমার হাতের শঙ্খ চূর্ণ করিয়া দে, আমার নীল বসন দূর কর, এই সীঁথার সিন্দুর মুছিয়া নে, এই কণ্ঠের হার ছিঁড়িয়া ফেল ! দে সখি সব যমুনায় বিসর্জ্জন দে—"পিয়া বিনু সবহি নৈরাশ রে।"

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যামুন সলিলে সব ডার রে।

কান্ত যাহার দিগন্তরে, সে যাহাকে স্মরণ করে না, তাহার রূপেই বা কি গুণেই বা কি ?

কন্ত দিগন্তর জাহি ন সুমর
কী তসু রূপ কি গুণে।

যে প্রেম শুধু আত্মদানে, এত দিনে তাহা বিরহের অনলে পুড়িয়া পবিত্র হোম শিখার ন্যায় উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ভোগের শ্মশানে তখন ধ্বনিয়া উঠিল শ্রীরাধিকার অতি করুণ অতি মর্ম্মভেদী বাষ্পাকুল কণ্ঠ—

হৃদয় সরিস জন ন দেখিয় জতিখন
ততিখন সগর অধার।

আমার প্রাণোপম প্রিয়, সেই হৃদয়ের ধন যতক্ষণ না দেখিল, ততক্ষণ এ শোভা ত সখি শোভা নয়—এ বেশ ত সখি বেশ নয়। কাঙ্গালের রত্ন হারাইয়াছে সখি, আজ তাহার জগৎ শূন্য। সে শূন্য জগতে আবার চাঁদের আলো কেন ? তাহার কুঞ্জকাননে আবার বসন্ত সমাগম কেন ? সে বসন্ত সমাগমে আবার ফুল ফুটে কেন ? কোকিল গায় কেন ? "সবহি নৈরাশ রে সবহি নৈরাশ।"

যেদিন আসিবে বলিয়া সে শপথ করিয়া গেল, সে 'অবধি'র কাল ত ফুরাইয়াছে। আমার মাধব ত আসিল না ! এতদিনও কোন মতে তাহার জন্য দেহ রাখিয়াছিলাম, আর ত তাহা থাকে না সখি ! সে বলিয়া গেল কাল আসিবে। দেখ, কক্ষ প্রাচীরের দিকে চাহিয়া দেখ, দিনের পর দিন কাল কাল করিয়া লিখিতে লিখিতে লিখিতে ভিত ভরিয়া গেল, কিন্তু সে কাল ত সখি আর আসিল না। সখি আজ এই প্রভাতে তুই বল্ বল্, সে কালি আবার কবে হইবে ?

কালিক অবধি কইএ পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি ভেল ॥
ভেল প্রভাত কহত সবহি।
কহ কহ সজনি কালি কবহি ॥

সখি রে, আমার নয়নের নিদ্রা গিয়াছে, বয়ানের হাসি গিয়াছে। আমার সকল সুখ পিয়ার সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে। বল সখি !

কৈসন রঞ্জব ইহ দিন রজনী।

পথ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নয়ন দুইটী অন্ধ হইল, দিন লিখিয়া লিখিয়া নখর খোয়াইলাম, সে পাষাণ হৃদয় তবুও আসিল না ! কিন্তু সে যে সখি আমার পরম প্রিয়।

সখি মোর পিয়া
অবহুঁ ন আওল কুলিশ হিয়া ॥

নখর খোয়াওলুঁ দিবস লিখি লিখি।
নয়ন অন্ধাওলুঁ পিয়া পথ দেখি॥

সখি রে! সে পিয়া বিহনে আমার পাঁজর যে 'ঝাঁঝর' হইয়া গেল! তবুও নিদারুণ বিধি আমাকে মরণ দেয় না—"অব নহি নিকসয় কঠিন পরাণ।" ক্ষণে ক্ষণে দিবস গেল, মাসে মাসে বর্ষ সমাপ্ত হইল, "আব জীবন কোন্ আশে"—এখন আর কোন্ আশায় জীবন রাখিব? যে আশা তরুকে ঘিরিয়া কোনরূপে জীবন রাখিয়াছিলাম সেও ত আর থাকে না!

আসা নিয়র করি জিউ কত রাখব
অবহি সে করত পয়ান।

আমার প্রেম গেল, কানু গেল—সবই গেল, কিন্তু স্মৃতি ত লুপ্ত হইল না। হায় রে, সে সুখের কথা যদি ভুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে ত হৃদয় এমন করিয়া দগ্ধ হইত না! আজ "গরম গরল বিষ সুমরি সিনেহ"—প্রেমের স্মৃতি আজ আমার বিষতুল্য বোধ হইতেছে, গৃহ আর ভাল লাগে না। আমার নয়নে নিদ্রা নাই। যদি নিদ্রা থাকিত তাহা হইলে স্বপ্নেও ত একবার সেই শ্রীমুখপঙ্কজ দেখিতে পাইতাম। হায় হায়—

সে মোর বহি বিঘটাওল
নিন্দও হেরাএল রে।

মনে করি হরি যেখানে সেইখানে উড়িয়া যাই—সেই প্রেম-পরশমণিকে আনিয়া বক্ষে রাখি।

মন করি তাঁহা উড়ি জাইঅ
জাঁহা হরি পাইঅ রে।
পেম পরশমণি জানি
আনি উর লাইঅ রে।

আমার মোহন এখন মধুপুরে কুব্জার প্রেমের অধীন। তা হউক। "হমহুঁ জায়ব তনি পাশ।" আমি ত আর কিছু চাহি না, শুধু একটীবার দেখা। "হে সখি! দরশন দেখু এ হবেরি" একবার দেখা দিয়া সে আবার মথুরায় যাইয়া থাকুক, চরজীবী হউক "যুগ যুগ জীবথু" তাহা হই লই আমি সুখী হইব। তাহার ত কোন দোষ দেখি না সখি! আমারই দুর্ভাগ্য, তাই আমার এমন দশা ঘটিয়াছে—"যখন কপাল বাম সব বিপরীত।" নহিলে—

সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥

পাছে তাহার হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের ব্যবধান হয়, সেই জন্য একদিন আমি বক্ষে বসন বা চন্দন দিই নাই, কণ্ঠে হার পরি নাই। হায় রে! "সে অব নদী গিরি আঁতর ভেলা"—তাহাতে আমাতে এখন গিরি ও নদীর দুস্তর অন্তর। তবুও আমার এ কঠিন হিয়া বিদীর্ণ হইতেছে না—

হৃদয় বড় দারুণ রে পিয়া বিনু
বিহরি ন যায়।

বিদ্যাপতির কাব্যের প্রধান অংশ অভিমানিনী রাধা ও বিরহিণী রাধা। অভিমানিনী রাধার মুখের ভাষা তীব্র, স্থানে স্থানে জ্বালাময়ী, স্থানে স্থানে শেলের ন্যায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তাহাতে বর্ত্তমান আছে। সে ভাষা যেন উষ্ণ প্রস্রবণ—স্পর্শ মাত্রই দহন করে। কিন্তু বিরহিণী রাধার মূর্ত্তি অন্যরূপ—তাহা অপরূপ! তাঁহার ভাষা যেন ভৈরবীর করুণ মূর্চ্ছনা, তাহা আমাদের মর্ম্মকে ছিন্ন করিয়া সেই শোণিতে নিজেও সিক্ত হয়। এখানে তীব্র তিরস্কার নাই, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ নাই, ঈষৎ অভিমান যে না আছে তাহা নহে। ইহা দীপ দহন করে না কিন্তু পাষাণকে দ্রব করে।

অভিমানকালে চন্দ্রাবলী। সেখানে তাহার প্রতি রোষ আছে, ঈর্ষা আছে, সে জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও বিরাগের অভাব নাই। বিরহে কুব্জা। কিন্তু তাহার প্রতি বিদ্বেষ নাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরাগ নাই। এখানে শ্রীমতী কষিত কাঞ্চনের ন্যায় শ্রীশালিনী। শ্রীমতী প্রেমের যোগিনী—সর্ব্বস্ব দান করিয়াও রাজরাণী—তিনি মূর্ত্তিমতী প্রেম। কিন্তু অভিমানকালে তাঁহাকে অনু-

রাগ কাতরা সাধারণ নারী ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। সে অনুরাগ তাঁহাকে উজ্জ্বল বর্ণ ও মধুর গন্ধ দিয়াছে বটে, কিন্তু চন্দনের ন্যায় সুরভিত করে নাই। দেখিলে মনে হয়, মণি তখনও পঙ্কের লেপে মলিন। সেখানে তিনি জলধারা—তাহার স্থানে স্থানে শৈবাল সমাচ্ছন্ন, মন্দ বেগ, পূর্ণচন্দ্র-করেও অনুজ্জ্বল। আর এখানে তিনি বিশ্বনাথের জটা হইতে নিঃসৃতা ভাগীরথী—তরল তরঙ্গা, পুণ্যতোয়া, অমিতবেগশালিনী প্রবাহিনী, যাহা স্পর্শ করিতেছেন তাহাই অমরত্ব লাভ করিতেছে। সেখানে আকাঙ্ক্ষা প্রবল, এখানে দুঃখ প্রবল। অভিমানিনী রাধিকার অন্তরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একজন কহিতেছে—আমি এখানে আছি; আর বিরহিণী রাধার অন্তরে সেই আমির স্থান বাঞ্ছিতের প্রেম আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

সেখানে—

আর না হেরিব ও কালামুখ
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা মনের মানুষ
যেখানে মন যে টানে।
(চণ্ডীদাস)

আর এখানে—

বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিয়া প্রেমে ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিচয়ে হইলাম দাসী। (চণ্ডীদাস)

সেখানে কামনা—

মিলি সানি নাগর রসধার।
পর বস জনু হোঅ হমর পিয়ার।

যদি আবার আমার নারীজন্ম হয় তবে যেন রসাধার নাগর স্বামী পাই। সে স্বামী যেন পরনারীর বশ না হয়।

আর এখানে প্রার্থনা—

সুরসরি তীরে সরীর তেজব
সাধব মনক সিধি।
দুলহ পহু মোর সুলহ হোয়ব
অনুকূল হোয়ব বিধি॥

সখি, গঙ্গাতীরে এ দেহ ত্যাগ করিয়া মনের কামনা সাধিব। এ জন্মে ত তাহাকে পাইলাম না, সে প্রিয় দুর্লভ হইল। গঙ্গাতীরে তনু ত্যাগের পুণ্যফলে বিধি নিশ্চয়ই অনুকূল হইবেন। তাহা হইলে পরজন্মে আমার এই দুর্লভ প্রভুকে পাইব। সখি তাই—

গরল ভখি মোঞে মরব
রচি দেহ মোর চীতা।

অভিমানিনী রাধা কহিতেছেন—

এহন ঔখধ কঁহা নাহি পাইয়
জনি যৌবন জরি যাব।

সখি, এমন ঔষধ কি নাই যাহাতে যৌবন জলিয়া যায়? এ জ্বালা ত আর সহিতে পারি না।

কিন্তু বিরহিণী রাধা বলিতেছেন—

রয়ন গেলে দীপে নিবোধিঅ
ভোজন দিবস অন্ত
জউবন গেলে জুবতি পিরিতি
কী ফল পাওত কান্ত।
ধন অছইতে জে নহি ভোগএ
তা মনে হো পচতাব।
জউবন জীবন বড় নিরাপন
গেলে পলটী ন আব।

রজনী অবসান হইলে প্রদীপ জ্বালিয়া ফল কি সখি? দিবসান্তে ভোজনেই বা কি ফল? যুবতীর যৌবন যদি চলিয়া যায় তবে কি দিয়া সে কান্তের পূজা করিবে? যৌবন ত আপন নয়, অত্যন্ত পর, একবার গেলে আর ফিরিবে না। তখন কান্ত আসিলে আমি কি দিয়া তাঁহার পূজার উপচার সাজাইব?

অভিমানিনী রাধা বলিতেছেন—

জে বর নারি সত্র করি লেল
সে পদ সেবউ আনন্দে।

তকর লাগি জাগি দিন রোঅউ
পীবই সে মকরন্দে ॥

আমি তাহাকে আর চাহি না সখি! সে যে বর নারীকে সার করিয়াছে, আনন্দে তাহারই চরণ সেবা করুক—তাহারই জন্য দিবানিশি রোদন করুক। সেই মধুপানে সে মত্ত রহুক। আমি তাহাকে আর চাহি না।

কিন্তু বিরহিণী রাধার মূর্ত্তি অন্যরূপ। তাহাতে ভোগের তীব্রতা নাই। সেখানে তিনি কহিতেছেন—

সহসে রমনি রমনি খেপথু
মোর হু তহি কি আস ॥

সহস্র রমণীর সহিত সে বিহার করুক সখি! কিন্তু আমার যে সে ভিন্ন আর কেহ নাই—সেই যে আমার সকল আশার সার—সেই যে আমার সর্ব্বস্ব।

জাতি কুল দিয়া, আপনি নিছিয়া
শরণ যে লইয়াছি।
যে কর সে কর, তোমার বড়াই
এ দেহ তোরে সঁপিয়াছি ॥
অনেক আছয়ে আন জনার
আমার কেবল তুমি।
ও ছুটী চরণ, শীতল দেখিয়া
শরণ লয়েছি আমি ॥
(চণ্ডীদাস)

অভিমানিনী রাধা ভাবিতেছেন—

দুর জনি দুতী তহই ভেল।
অপদহি গিরিসম গৌরব গেল ॥

খল দূতীর কথায় বিশ্বাস করিয়াই আমার এ দশা ঘটিল। আমার পর্ব্বত তুল্য গৌরব অস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িল!

বিরহিণী রাধা কহিতেছেন—পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গণলা।" আমিত ক্ষুদ্র তুচ্ছ ধূলিকণা মাত্র। আমার আবার গৌরব কোথায়? অনন্ত গৌরবের আধার আমার প্রিয়তমের গৌরবেই আমি গরবিণী।

সখি—

বড় দুখ রহল মরমে
পিয় বিসরল জঞো কি অরু জীবনে।

সেই পরাণ প্রিয়ই যদি আমাকে বিস্মৃত হইল, তবে আর এজীবনে কায কি? সে নাই, এখন আমার আর কোন গর্ব্বও নাই। এখন আমাকে কে কি না কহিতেছে?

"সো পিয়া বিনা মোহে কে কি ন কহলা।"

প্রভু মথুরা যাইবার কালে শপথ করিয়া গেলেন—"আমি মাধব মাসের মাধব তিথিতেই ফিরিয়া আসিব।" বৈশাখের সে শুক্লা একাদশীত কবে আসিয়া কবে চলিয়া গিয়াছে! সে 'অবধি'র কাল ত বহুদিন গত—তিনি আসিলেন কৈ?

সখিরে মথুরামণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি করি পুন না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া।
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়ালুঁ নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ। (চণ্ডীদাস)

মাধব মাস গেল, মাধবী তিথি গেল, কৈ সখি আমার মাধব কৈ?

এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবনক আশা ॥
বরস বরস করি সময় গমাওল
খোয়লুঁ তনুক আশে।
হিমকর কিরণ নলিনি যদি জারব
কি করব মাধবী মাসে ॥

তোমরা কে কহিলে সখি, মাধব আবার আসিবেন? এই বিরহ পয়োধি যে কোনও দিন পার হইতে পারিব "মঝু মনে নহি পতিয়াই"—আমার ত আর তাহা বিশ্বাস হয় না। তপন তাপে অঙ্কুর জর্জ্জরিত হইয়া যদি শুকা-

ইয়াই যায় তখন মেঘ বাদল আসিলেই বা কি, না আসিলেই বা কি?

অবধি বহত হেয়ব নহি জীবন
পলটি ন হোএত সমাজ।

অবধি বহিয়া গেল আর কি আমার প্রাণ থাকে? আর কি তাহার সহিত মিলন ঘটিবে? "প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল" আমার প্রেমের অঙ্কুর জন্মিতেই যে শুকাইয়া গেল, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিলাম কৈ? "ন ভেল যুগল পলাশ"—এক বৃন্তে সংলগ্ন পলাশ কুসুমের দুইটি কোমল পাপড়ী যে সখি মিলিতে না মিলিতেই ঝরিয়া পড়িল। তাহারা ত সই হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া একটি যুগল হইতে পারিল না। আমার সে তৃষিত "প্রেম, প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈসে যামিনী" আমি যে যামিনীর সে প্রতিপদের শশীকে একবার ভালো করিয়া দেখিতেও পাইলাম না। হায় হায়, নয়ন মেলিয়া চাহিতে না চাহিতেই সে প্রতিপদের শশী অস্ত গেল। আমার ত চোখের দেখাও ঘটিল না। চাঁদ উঠিল কি না তাহাও ত বুঝিতে পারিলাম না। "সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা" সুখের কণিকামাত্র পাইয়াছি কি না বুঝিতে না বুঝিতেই আমার সে প্রেমচন্দ্র অস্তমিত হইল—দেখ নিরাশার নিবিড় ঘন অন্ধকারে হৃদয়াকাশ পরিব্যাপ্ত।

শিব শিব জিবও ন জাএ
আসেঁ অরু এলরে।

শিব শিব, এখনও পাপ প্রাণ যায় না, এখনও তাহার আশাকেই জড়াইয়া আছে। হরি যদি আসেন তাহা হইলে কি করিব জান? "আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে, দিবস গেলে করব নিবেদন।" সখিরে, "আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।"

জখনে আওব হরি রহব চরণ ধরি
চান্দে পূজব অরবিন্দা।

আমি তাহার চরণলগ্ন হইব সখি! "রহব চরণ ধরি।" এই করপদ্মরূপ অরবিন্দ দিয়া সেই চরণচন্দ্রের পূজা করিব। আর কি করিব জান?

ধূপ দীপ নৈবেদ করব দিয়া আগে।
লোচন নিরে করব অভিষেকে॥

দুই চক্ষের জলে সেই চরণ ধোয়াইয়া অভিষেক করিব। এই আমার অঙ্গসৌরভ-রূপ ধূপ, এই আমার রূপের দীপ, এই আমার যৌবনের নৈবেদ্য তাঁহার পূজার জন্য সাজাইব।

বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥

আমার সেই দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য দেহকে বেদী করিয়া, এই ঘন কেশরাশির দ্বারা তাহাকে মার্জ্জিত করিব। এ রূপ এ যৌবন যে তাঁহারই পূজার অর্ঘ্য। এ ত সখি, আমার নয়—আমার নয়—আমি যে দেবতার ভোগ সাজাইয়া রাখিয়াছি—আমার সর্ব্বস্ব দিয়া ধূপ নৈবেদ্য রচনা করিয়াছি। কিন্তু সই, সে উপচার ত আর থাকবে না—"জউবন জীবন বড় নিরাপন" আপনার নয় আপনার নয়—গেলে "পলটি ন আব।" কাঙ্গালিনী হইলে কি দিয়া সেই দেবতার পূজা করিব! অসময়ে বারি বর্ষণ করিলে কি ফল হইবে সখি? শীত অন্ত হইলে বসন জড়াইয়া কি লাভ?

আমার মাথার কেশ　　　সুচারু অঙ্গের বেশ
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন　　　পরশ রতন ধন
কাচের সমান ভেল। (চণ্ডীদাস)
জোয়ারের পানি　　　নবীন যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে　　　বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥　(চণ্ডীদাস)

যতদিন যাইতে লাগিল, বিরহ কাতরা শ্রীরাধিকা ততই জীবনকে সমিধ করিয়া স্মৃতিকে অরণী করিয়া প্রেমের হোম করিতে লাগিলেন।

জিব কর সমিধ সমর কর আগী।
করতি হোম বধ হোএবহ ভাগী।

ক্রমে ক্রমে তিনি দিবসে চাঁদের রেখার ন্যায় মলিনা হইলেন—চন্দন, মৃগমদ, কুঙ্কুম যাহা কিছু ধারণ করিতেন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, "জনি জলহীন মীন!" হৃদয়ের হার ভার হইল, নয়নের অশ্রু নিরোধ মানিল না, নির্ঝরের ন্যায় ঝরিতে লাগিল সে যেন "ঘন সাওন মালা।" রজনীর পর সুদীর্ঘ রজনী তিনি কাঁদিয়া কাটাইতে লাগিলেন। স্বপ্নে প্রিয় মিলনের সুখও তাঁহার ঘটিল না।

সখি অন্তর বিরহানল রে
নিত বাঢ়ল জায়।

সে আগুন নিত্যই বাড়িতে লাগিল—হরি বিনা, লক্ষ উপচারেও প্রাণের সে ব্যথা মিটিল না।

বিনু হরি লাখ উপচারহু রে,
হিয় দুখ নই মেটায়।

বিরহখিন্ন দেহ দিন দিন বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মনে হইল যেন রাহুর ভয়ে শশী ভূমে পতিত হইয়াছে। দূতী যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিল—

দেখলি সে ধনি হে
বাসি নিমালিনি মালা॥

হে মাধব, তাহাকে দেখিয়া আসিলাম। এখন সে যেন বাসি নির্ম্মাল্য মালা শীর্ণা শুষ্কা অনাদৃতা দলিতা। একদিন যে মালা তোমারই পূজায় তোমারই কণ্ঠে শোভা পাইয়াছিল, হে মাধব! আজ তাহা বাসি নির্ম্মাল্য রূপে পরিত্যক্তা! ফুল বাসি হইয়াছে বটে, শুকাইয়া বর্ণ হারাইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনো—"রহল আজ বাস" তাহার সৌরভ যায় নাই। এদিকে শ্রীরাধিকা অনুক্ষণ হা হরি হা হরি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শিরে করাঘাত করিয়া কহিলেন—হায়, হায় আমার "সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল। জলদ নিহারী চাতকী মরি গেল"—মেঘ চাহিয়া ফটিকজল ফটিকজল করিতে করিতেই আজ চাতকী শুষ্ককণ্ঠে প্রাণে মরিল। হে বিধি, দয়া করিয়া এই কর যেন জগতে কেহ বিরহের জ্বালা ভোগ করে না—

কেও জনু অনুভব জগজন
বিরহ পরাভব রে।

"মনকর গরল গরাসিয়"—ভাবি বিষ খাইয়া প্রাণে মরি; কিন্তু পারি না; আত্মবধ যে পাপ—"পাপ আত্ম-বধ রে।" কিন্তু এ জীবনও ত আর বহিতে পারি না। আমি কি বাঁচিয়া আছি? মিথ্যা কথা। যাহার কানু নাই সে কি বাঁচিয়া থাকে? মরণই এখন আমার একমাত্র কামনার সামগ্রী। আমার যে এত দুঃখ, কে তাহা বিশ্বাস করে? হৃদয় চিরিয়া ত সকলকে দেখাইতে পারি না। আমি যখন কাঁদি, জড় প্রকৃতি তখন হাসে। সেই চন্দ্র দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া জ্বলিয়া উঠে; সেই কোকিল কুঞ্জভবনে গায়; সেই পাপিয়া "পিয়া পিয়া" বলিয়া ডাকে। সেই যমুনা লীলাময়ী কলনাদিনী—পরিগত-পরিসরা। আমার হৃদয় যে দগ্ধ হইতেছে! তাই বটে—

মরমক বেদন মরমহি জান।
আনক দুখ আন নহি জান॥

* *

এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥

(চণ্ডীদাস)

পরের ব্যথা কি পরে বুঝে? "কাহুক বিপদ কাহুক সম্পদ নানা গতি সংসার লো।" তবে সেই কেবল এ যাতনা বুঝিবে, যাহার প্রাণ বিরহে আমারই মত কাতর হইয়াছে। হে বিরহী! তুমিই আমার দুঃখের বন্ধু—তোমার নয়ন জলের সহিত আমার নয়ন জল মিশিয়া যাউক। তোমারও যেমন আমারও তেমনি—

জীবন লাগ মরণ সন
মরণ সোহাবন রে।
মোর দুখ কে পতিআএত,
সুনহ বিরহি জন রে॥

শ্রীরাধিকা সখীর কর ধরিয়া দ্বারে মুখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পথ চাহিয়া রহেন—মথুরা হইতে কৃষ্ণ যে কবে আসিবেন কেহ তাহা বলে না। হায় হায়, কাহাকে দিয়া সংবাদ পাঠাইব—কে যাইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে "কঠিন হৃদয় পিঅ তোরা।"

সখি! বসন্ত গিয়াছে, বর্ষা আসিল, "সবতহ সময় জলদ বড় ঘোর।" "বরখা বরিঅ বসন্তহু চাহি।" বর্ষা যে বসন্ত অপেক্ষাও দুঃসহ সখি!

সখি হে হমর দুখক নহি ওর রে
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর রে।
সখি, খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব
কর কঙ্কণ ঝমকাই।
জখনে জলদে ধবলা গিরি বরিসব
তখনুক কওন উপাই॥

হায় হায়—

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গরুয় দুখভার।

এই নিদারুণ বিরহ কালেও হৃদয়ের মধ্যে মধ্যে এক একবার অভিমান দেখা দিতে লাগিল। শ্রীরাধিকা ভাবিলেন, এত কাঁদি এত ডাকি তবুও আসিল না। শপথ করিয়াও কথা রাখিল না। কর ধরিয়া আমার শিরে তাহার কর রাখিয়া সে শপথ করিয়াছিল, মাধব মাসের শুক্লা একাদশীতে ফিরিয়া আসিবে, কত মাধব মাস বহিয়া গেল, সে আসিল কৈ? আমি কি তবে সন্ধ্যার আকাশের একেশ্বরী তারা যে আমাকে দেখিতে নাই? আমি কি ভাদ্র চতুর্থীর নষ্টচন্দ্র যে বঁধু আমার মুখ দেখিবে না?

কী হাম সাঁঝক একসরি তারা
ভাদর চৌথিক চন্দা।
ঐ সন কএ পিয়া এ মোর মুখ মানল
মো পতি জীবন মন্দা॥

কিন্তু এ অভিমান কতক্ষণের জন্য? বিরহে প্রেম বাড়ে, অভিমানে উহা খর্ব্ব হয়। অভিমান বাঞ্ছিতেরও ঊর্দ্ধে নিজের আসন স্থাপিত করিতে চায়; বিরহ নিজেকে রিক্ত করিয়া বাঞ্ছিতের চরণলগ্ন হইবার প্রয়াসী। অভিমান অগ্নিশিখা, বিরহ বর্ষার বারিধারা, অভিমান সুখময় সাগরকে মরুভূমি করে, বিরহ মরুভূমে প্রস্রবণ বহায়। বিরহিণী রাধার অভিমান মুহূর্ত্তে লয়-প্রাপ্ত হইল। তিনি সখীর কর ধরিয়া কহিলেন—

সাজনি সাজনি সাজনি সাজনি
সুনহি সাজনি মোরী।
বাল্লভ সোঁ মঝু দীঠি মিলাবহি
হোই হোঁ দাসী তোরী॥

সজনি সজনি! শুন আমার সজনি! যদি কোন মতে আমার প্রাণ বল্লভের নয়নের সহিত আমার নয়নের মিলন ঘটাইতে পারিস, তবে তোর দাসী হইব।

দূতী মথুরায় যাইয়া সংবাদ দিল—

মাধব কত পরবোধব রাধা
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা।

মাধব! রাধা ত আর বাঁচিবে না! হা হরি হা হরি করিতে করিতেই বুঝি এতক্ষণ তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
সুন্দরি ভেলি মধাই
ও নিজভাব সোভাবহি বিসরল
অপন গুণ লুবধাই॥

বিদ্যাপতির এই কবিতা পাঠে মনে পড়ে জয়দেবের—

মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিব ভাবনশীলা॥

হে মাধব! অনুদিন তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে সুন্দরী রাধাও মাধব হইয়াছেন। তিনি নিজেকেই মাধব মনে করিয়া নিজের প্রতিই অনুরক্ত হইয়াছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন যে তিনি বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই; ভুলিয়া গিয়াছেন যে তিনি তোমার বাসিফুলের মালা, ভুলিয়া গিয়াছেন যে তোমাতে এবং তাঁহাতে নদী

গিরি কানন প্রান্তরের ব্যবধান। তিনি এখন অন্তরে বাহিরে মাধব।

ইহাই প্রেমিকের জীবনান্ত সাধনার মুক্তি, ইহাই প্রেমের পরম পরিতৃপ্তি, ইহাই বিরহের অন্ত, দুঃখের শেষ, কামনার শ্মশান। ইহাই জীবনের স্বার্থকতা ও পূর্ণতা। ইহাই স্বর্গ—ইহাই স্বর্গের বৈকুণ্ঠ—ধরণীর শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীবৃন্দাবনের রাসে ম্মাদ। বলিতে গর্ব্ব অনুভব হয় যে প্রেমের এই পরম পরিণতির মাহাত্ম্য বঙ্গকবি জয়দেব কর্ত্তৃকই এদেশে প্রথমে কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

দুঃখের যখন অন্ত হইল, নয়নে তখন নিদ্রা আসিয়াছে। তখন চক্ষু মুদিলেই মাধব, চক্ষু চাহিলেও মাধব। তখন

সুতলি ছলহুঁ হম ঘরবা রে
গরবা মোতি হার।
রাতি জখনি ভিনসরবা রে
পিয় আএল হমার॥

সখী, তাহারই জন্য বেশভুষা করিয়া গলায় মতির হার পরিয়া আমি মন্দিরে নিদ্রিতা ছিলাম। রাত্রি যখন প্রভাত হয়, তখন স্বপ্নে আমার পিয়াকে পাইয়াছি। পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কান্ অভাগিনী আমার এমন বৈরী হইল, কে আমার সে সাধের ঘুম ভাঙ্গাইল? গুণময় গোবিন্দকে যে ভাল করিয়া দেখা ঘটিল না সখি!

কেহনি অভাগলি বৈরনি রে
ভাগলি মোর নিন্দ।
ভল কএ নহি দেখি পাওল রে
গুণময় গোবিন্দ।

ভক্তের ভগবান, প্রেমিকার দয়িত, সাধনার ধন—আর কি না আসিয়া থাকিতে পারেন? ভগীরথের গঙ্গা—গঙ্গার ধারা আর কি না আসিয়া থাকিতে পারেন? হৃদয়ে বসন্ত সমাগমে কোকিল কি নীরব থাকে? চাঁদ কি মেঘে লুকায়? কুসুম পরাগ কি সৌরভ দেয় না?

বৃন্দাবনে আবার পিক গাহিল, চন্দ্র হাসিল, ভ্রমর গুঞ্জরিল। যমুনা আবার বাঁশীর তানে উজান বহিল।

সখি! "কুদিবস রহএ দিবস দুই চারি।" দেখ দেখ "আজু কে গো মুরলী বাজায়।"

এ সখি এ সখি ফললি সুবেলা।
নিমর আএল পিআ লোচন মেলা॥

হে সখি! হে সখি! আজ সুসময় আসিয়াছে। প্রিয়তমের সহিত নয়নে নয়নে মিলনের সময় নিকট হইয়াছে। যে চাঁদকে কেহ দেখিতে পায় না, সেই অলক্ষিত চন্দ্রকে আজ আমি দেখিব "আজ দেখব পিয় অলখক চান।" বায়স ভবিষ্যৎ বলিতে জানে। ঐ দেখ সখি, আমারই অঙ্গনের চন্দন-তরুশিরে বসিয়া ঐ শুন "কুরুরএ কাক রে।"

ঐ শুন সখি বায়সের মৃদুধ্বনি। রে বায়স! আজ যদি আমার প্রিয়তম আসেন তবে সোণা দিয়া তোর চঞ্চু বাঁধাইয়া দিব।

সোণে চঞ্চু বাঁধএ দেব মোঞে বাঅস
জঞো পিআ আওত আজ রে।

সুদিনের আগমনবার্ত্তা চিত্তের হর্ষ প্রকাশ করিয়া দেয়। সুমতি সাঙ্গাতিনি এস, ত্বরা কর, "বাট নিহারয় আউ।" আমার হৃদয়চাঁদ আজ আসিতেছেন—চল, পথে তাঁহার প্রতীক্ষা করি। শুনিলাম তিনি এ পাড়ায় অপরের গৃহে আসিয়াছেন। যদি এখন তিনি নিকটেই না আসেন, বৃন্দাবনে ত আসিয়াছেন। তাহাতেই আমি সুখী, আমার বিরহব্যথা আজ লক্ষ ক্রোশ দূরে গিয়াছে।

পিয় মোর আএল আন পরোস।
বিরহ ব্যথা জনি গেল লখ কোস॥

ইহার পরই তৃষিত মেঘের সহিত তৃষিত মেঘের নিবিড় মিলন। সে আনন্দের বর্ণন কে করিতে পারে?

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।

সখি আজিকার পূর্ণানন্দে মনে হইতেছে মাধবের সহিত তিলেকও বিচ্ছেদ হয় নাই, তিনি আমার মন্দিরে চিরদিনই বিরাজ করিতেছেন।

ভাবোন্মাদের এমন চিত্র দুর্লভ বলিয়াই ইহা মহাপ্রভুর চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। কীর্ত্তনে এই পদ শুনিতে শুনিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। ইহাই কবি বিদ্যাপতির বিজয়মাল্য।

মর্ম্মচ্ছেদী বিরহের পর যখন রাধা আনন্দ মিলনের মধুরাস্বাদ পাইলেন, তখন প্রকৃতিও সেই মিলনের অনুকূল হইলেন। চিত্তের হর্ষে বিশ্ব হর্ষপূর্ণ হইয়া উঠিল, হৃদয়ের মধু সকলকেই মুহূর্ত্তে মধুময় করিয়া দিল।

জীবন যৌবন সফল করি মানল
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥

গৃহ তখন গৃহ হইল, দেহ তখন দেহ বলিয়া জ্ঞান হইল, বিশ্ব তখন দ্বন্দ্বহীন কলহ-হীন কণ্টকবিহীন প্রেমসমুদ্ররূপে প্রতিভাত হইল। আর তখন কোকিলে ভয় কি? এক কেন, লক্ষ আসিয়া ডাকুক; আর তখন চন্দ্রকরে জ্বালা কৈ? এক কেন, গগন আলোকিত করিয়া লক্ষ শশী উদিত হউক—কিছুতেই আর শঙ্কা নাই। আমার মাধব আজ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে, সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে। আমি আজ সেই দরিদ্রের নিধিকে আমার হৃদয়ে ধরিতে পারিয়াছি। এ দেহকে সই ততদিনই দেহ বলিয়া মানিব, যতদিন সে আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না।

অব সো ন যাবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা।

আজ প্রিয়তমের স্পর্শলাভ করিয়াছি বলিয়া দেহ সার্থক হইয়াছে। সে পরশে যে সখি কাচ কাঞ্চন হয়। আমি বড় আশায় মণ্ডপ রচনা করিয়াছিলাম—আজ তথায় দেবতার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি—আজ আমার মণ্ডপ মন্দির হইয়াছে।

যখন "দুহুক দুলহ দুহু দরশন ভেল" তখন আর কোন আকাঙ্ক্ষাই অপরিতৃপ্ত রহিল না। শ্রীরাধা কহিলেন—হে, নন্দনন্দন, আর তোমার শরণ ছাড়িব না

বার বার চরণারবিন্দ গহি
সদা রহব বনি পসিয়া।

কি ছিলাম, কি হইয়াছি, আরও যে কি হইব তাহা কে জানে। "বৃথা হোয়ত জুল হাসিয়া"—যাহা হয় হউক, আর ত তোমাকে ছাড়িব না।

কুল তেয়াগিনু ভরম ছাড়িনু
লইনু কলঙ্কের ডালা!
যে জন যে বল, আমারেই বল
ছাড়িতে নারিব কালা।

(চণ্ডীদাস)

যদি আঁচল ভরিয়া মহানিধিও পাই, তবুও ত তোমাকে বিদেশে যাইতে দিব না। তুমি যে আমার শীতের ওড়না, গ্রীষ্মের বা, বর্ষার ছত্র, প্রেম দরিয়ার নৌকা।

তুমি আমার—

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥

হৃদয়ের কস্তুরী তুমি, কণ্ঠের হার—আমার দেহের সর্ব্বস্ব তুমি, গৃহের সার। তুমি পাখীর পাখা, মৎস্যের বারি, জীবনের জীবন। না-না-বন্ধু! তুমি যে আমার কি—তুমি যে আমার কেমন তাহা ত বলিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। আমার কণ্ঠে এমন ভাষা নাই, ভাষায় এমন শব্দ নাই—শব্দের এমন শক্তি নাই যে সে কথা প্রকাশ করিতে পারি।

তুহু কৈসে মাধব কহ তুহু মোর।

মাধব! মাধব! কি তুমি—কেমন তুমি—তুমিই তাহা বলিয়া দাও।

মন কর মনাও ন ছাড়িঅ

* * *

রাখিঅ ছিঅ লাএ ॥
পরাণ যেথানে রাখিব সেথানে
এমন মন মোর করে ॥ (চণ্ডীদাস)

সখি আমি যে হৃদয়ে কি অনুভব করিতেছি সে কথা আর আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিস্? তাহার সে প্রেমানুরাগ আমি কেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিব? সখি, সে যে "তিলে তিলে নূতন হয়।" আমি জন্ম ভরিয়া তাহার রূপ দেখিলাম, কিন্তু নয়নের তৃষা ত মিটিল না। তাহার সে মধুর কথা কত শুনিলাম,

কিন্তু সে কথা ত কোন দিন পুরাতন হইল না। মধু যামিনীর পর কত মধুযামিনী তাহার সহিত প্রেমানন্দে কাটাইলাম, তবুও ত বুঝিলাম না সখি, কেলি কাহাকে কহে। এক নয় দুই নয় সখি—লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া আমার এই তপ্ত হৃদয়ে তাহার হৃদয় রাখিলাম, তবুও ত এ হিয়ার জ্বালা জুড়াইল না।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতন হয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল।
কত মধু যামিনির রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল।

হিয়া ত জুড়ায় নাই বটে। নক্ষত্র তাই নক্ষত্রের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে, দর্শন পিপাসা মিটে না। গ্রহ তাই গ্রহের পশ্চাতে ছুটিয়াছে, হৃদয়ের জ্বালা জুড়ায় না। যুগের পর যুগ ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ— বেদনাতুর হৃদয়ের তটভূমে ঝম্প দিয়া পড়িতেছে, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ভ্রমরের গুঞ্জনে, বিহগের কূজনে, পত্রের মর্ম্মরে, মেঘের মন্দ্রে, বাতাসের শ্বাসে, আলোকোজ্জ্বল আকাশে কেবলই সেই কাতর আহ্বান নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে—হে পরাণপ্রিয়, হে জীবন সর্ব্বস্ব, হে আমার নয়নের মণি—এস, আরও নিকটে এস—তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখি। সৃষ্টির আদিকাল হইতে এই যে এক অতৃপ্তির কাতর আহ্বান বিশ্বের অন্তরে বাহিরে কাঁদিয়া ফিরিতেছে, কে জানে কবে তাহার নয়নের বারি শুষ্ক হইবে। সেই অতৃপ্তির দারুণ রোদনে মহাসমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহারই সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে রক্তোৎপলের উপর চরণপদ্ম স্থাপিত করিয়া যে এক মহাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাঁহার নাম প্রেম। তাঁহারই বন্দনাগীতি যুগের পর যুগ ধরিয়া নিখিল বিশ্বের বীণার তারে রন্ রন্ করিয়া বাজিতেছে ; তবুও—

শ্রুতিপথে পরশ ন গেল।

সমাপ্ত

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্গসাহিত্য

(১)

মানুষের ন্যায় সাহিত্যেরও দেহ ও আত্মা আছে— এই উভয়েরই আলোচনা করিতে হইবে। ভাষা বা রচনা রীতি—এই দেহ ; আর ভাব, অর্থ, ও আলোচ্য বিষয়—এই আত্মা। ভাবের সহিত ভাষার ব্যবধান যত কম, সাহিত্য ততই প্রাণময়। ভাষা এমন স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল হওয়া চাই যে, ভাবের প্রতিবিম্ব, সেই ভাষার দর্পণে অক্ষুণ্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভাষা এমন কমনীয় হওয়া চাই যে ভাবের অণুমাত্র স্পন্দন-বৈচিত্র্য, ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। ইহাই আদর্শ রচনা-নীতি। কিন্তু, কোনও সাহিত্যের রচনা-হঠাৎ একদিনে, এই আদর্শ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় না। সাহিত্য শিল্পিগণ পরিশ্রম করিয়া, সাহিত্যকে ক্রমে ক্রমে এই আদর্শ অবস্থায় পরিচালিত করিতেছেন। সাহিত্যের সমালোচনায় ইহাই প্রথম সূত্র।

জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, জাতির

প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই। অনেকগুলি নরনারী যে সময়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবিধ প্রকারের বৈষম্য সত্ত্বেও, একটি সাধারণ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একতাবদ্ধ হয়, সেই সময়ে ঐ মানব সমষ্টিকে জাতি বলা যায়। যে সাহিত্য, ঐ জাতীয় চিত্তের ও জাতীয় কল্পনার দর্পণস্বরূপ, অর্থাৎ জাতির জীবনের যাবতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, চিন্তা, চেষ্টা ও রসাস্বাদন সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন ঐ সাহিত্যকে জাতীয়-সাহিত্য বলা যায়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের কেবল যে একটা মূল্য আছে তাহা নহে—সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব আছে। এই মহত্ত্ব, নানারূপ আচরণের দ্বারা সকল সময়ে সুপরিস্ফুট নহে। কিন্তু মানব যখন সচ্চিদানন্দের কণা, তখন ভাবুকের দৃষ্টির নিকট, সেই সৌন্দর্য্য আত্মগোপন করিতে পারে না। একটি জাতি বলিলে নানা প্রকারের বহু নরনারীকে বুঝায়। সুতরাং জাতির জীবন অনন্ত বৈচিত্র্যময়। দ্বিতীয়তঃ এই বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল—সর্ব্বদাই এক সুদূরবর্ত্তী লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কোনও সাহিত্য, জাতীয় সাহিত্য এই এই নামে অভিহিত হইবার যোগ্য কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে—এই সাহিত্যে জাতির জীবনের বৈচিত্র্য, পরিবর্ত্তন ও উন্নতিমুখী গতি কি পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে আমাদের দেশে, জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু একদিনে জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবার নহে। প্রত্যেক মানুষকে জাগিয়া উঠিতে হইবে, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং নিজেকে প্রকাশ করিতে হইবে। সাহিত্য এই প্রকাশের বাহন। সাহিত্যের দ্বারা আমরা প্রত্যেকে অপরকে বুঝিব, অপরের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইব এবং আমাদের মধ্যে বাহ্যজীবনে বৈষম্য ও ব্যবধান থাকিলেও হৃদয়রাজ্যে ও মনোরাজ্যে আমরা সকলেই যে এক পরম ঐক্য-সূত্রে বদ্ধ তাহা বুঝিতে পারিব। জাতীয় সাহিত্যের সাধনা, মানুষকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিবে—এই দীক্ষায় দীক্ষিত করিবে। জাতীয় সাহিত্যের পর—বিশ্বমানবের সাহিত্য। কিন্তু সে বিষয়ের এখন আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যের আলোচনায় দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে—ভাব ও ভাষা। ভাবের আলোচনা দ্বারা অনেকে দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও মন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। কিন্তু ভাষার আলোচনা দ্বারা এই তত্ত্ব দেখাইবার তেমন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। অর্থাৎ, বাঙ্গালা সাহিত্যের রচনা রীতি বা পদ-বিন্যাস অন্তর্মুখী হইয়া বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। কিন্তু এই আলোচনা বিশেষরূপে আবশ্যক। আমরা এই উদ্দেশেই বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা রীতির আলোচনা করিতেছি।

কোনও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যশিল্পী সম্বন্ধে যথার্থরূপে আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। সাহিত্যালোচনার দ্বারা কি হয়? মানবের হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি অনুশীলিত ও মার্জ্জিত হয়, তাহার অনুভবশক্তি ও উপভোগ শক্তি ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করে। স্বভাবের শিশু মানব, সাহিত্য আলোচনা দ্বারা একটি উন্নততর অবস্থায় আরোহণ করিয়া, মানব জীবনের ধন্যতা ও পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং সাহিত্যশিল্পী মানব জীবনের গুরু ও পথপ্রদর্শক। তিনি বন্ধুর ন্যায় হাস্যমুখে ও মিষ্টভাবে জনসাধারণের আপনার জন হইয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার একটি উন্নততর লক্ষ্য থাকা চাই। সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আর তিনি নব নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া মানবকে সেই আদর্শ বা লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সাহিত্যশিল্পে ইহার নাম – লক্ষ্য বা আদর্শ।

সাহিত্য-শিল্পীর যেমন একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকা

প্রয়োজন, তেমনি সেই লক্ষ্যে মানবকে পরিচালিত করিবার একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থাও থাকা আবশ্যক। মানবের আলোচনার বিষয় অসংখ্য। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা, বিচারণা-শক্তি দ্বারা, আমাদের ভাবুকতার দ্বারা, প্রতিদিন বিবিধ প্রকার বিষয় ও ব্যাপারের সংস্পর্শে আসিতেছি। সমাজ, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্য্য ও রহস্য, নরনারীর বিচিত্র প্রকারে জীবনযাত্রা পদ্ধতি, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের, ইহলোকের ও পরলোকের, নিকটের ও দূরের, বহু বহু বিষয় ও ব্যাপার আমাদিগকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া সুখী করিয়া দুঃখী করিয়া ভোগাসক্ত করিয়া বিষয়-বিরক্ত করিয়া আমাদের বাস্তবজীবন, মানসজীবন ও ভাবজীবনের উপর চেষ্টা কল্পনা, অনুভূতি ও বিচারণার সাহায্যে অসীম-প্রসারী প্রবাহবৎ বহিয়া যাইতেছে। ইহার ভিতর হইতে কোন্ কোন্ বিষয় ও ব্যাপার নির্ব্বাচিত করিয়া তাহার সহিত মানবের বিশেষ প্রকারের পরিচয় সাধন করাইতে হইবে, তাহার ভিতরের রস আবিষ্কার করিয়া মানবকে আস্বাদন করাইতে হইবে, সাহিত্য শিল্পীকে তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই নির্ব্বাচনের দ্বারা সাহিত্যশিল্পীর মানসিক প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নির্ব্বাচন ও রসসৃষ্টি, সাহিত্যশিল্পীর পন্থা।

কোনও সাহিত্য-শিল্পীকে যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার লক্ষ্য ও পন্থা—এই দুইটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য একটি অতি সুবৃহৎ ব্যাপার। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। একজন সাহিত্যশিল্পী, প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য স্বয়ং উপভোগ করিতেছেন—এই উপভোগের আনন্দ যেন তাঁহার হৃদয়ে ধরিতেছে না, তিনি সকল মানবকে এই আনন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য আকুল হইয়া সাহিত্যের সাহায্যে সেই সৌন্দর্য্য ও সেই সৌন্দর্য্যের উপভোগকে মূর্ত্তিদান করিয়া বিতরণ করিতেছেন। অসংখ্য কবি ও সাহিত্যশিল্পী এই কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই একই প্রকারের সুন্দর বস্তু নির্ব্বাচন করেন নাই, এবং সকলের উপভোগের প্রণালীও ঠিক একরূপ নহে। প্রকৃতি একজন ভাবুকের নিকট এক এক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্মশান, ভাঙ্গা বাড়ী, পরিত্যক্ত জনপদ প্রভৃতি কাহারও উপভোগের বিষয়; জলপ্রপাত, ভীষণ বনভূমি, মরুদেশ কাহারও হৃদয়বৃত্তির অনুকূল; ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রাম্য সমাজের সুখ দুঃখ গার্হস্থ্য জীবনের হাসিকান্না কাহারও প্রীতিপ্রদ। কেবল সাহিত্য শিল্পীর মানসপ্রকৃতির আলোচনা করিতে হইলে, গভীর ভাবে অনুভব করিতে হইবে কোন্ শ্রেণীর চিত্রে ঐ শিল্পীর স্বভাবতই গভীরতম রসাস্বাদন হইয়া থাকে। কোন কোনও লেখক, সাহিত্য রচনায় আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে পারেন। অর্থাৎ নিজের সত্যসত্যই ভাল লাগুক বা না লাগুক, সাহিত্যিক বিধানের ব্যবস্থানুসারেই শ্মশান, বনস্থল, রাজসভা প্রভৃতি বর্ণনা করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত রসভাবনাচতুর সমালোচকের নিকট এই প্রকারের কৃত্রিম রচনা আত্মগোপন করিতে পারে না। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে পরবর্ত্তী যুগের অনেক রচনা এবং সেই সমুদয় রচনার অনুকরণে বা আদর্শানুযায়ী রচিত অনেক বাঙ্গালা রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সুতরাং সাহিত্য-শিল্পীর হৃদয় ও মন, কোন্ কোন্ বিষয়ে ও ব্যাপারের আলোচনায়, তাহার স্বরূপের উপলব্ধি করে, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কোনও লেখকের রচনাবলী হইতে যদি কতকগুলি বিষয় শিক্ষার্থিগণের জন্য নির্ব্বাচিত করিতে হয়, তাহা হইলে সেই লেখকের মানস প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার লক্ষ্য ও পন্থা বুঝিয়া তদনুযায়ী এই নির্ব্বাচন কার্য্য করিতে হইবে।

এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহাদের সাহিত্যের কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই। এই শ্রেণীর লেখকগণ, দুই একটি খণ্ড রচনায় যশোলাভ করিয়া সাময়িক-সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাওয়া

অসম্ভব। অনেক সাহিত্য-শিল্পী, তাঁহার লক্ষ্য ও পন্থা এবং তাঁহার মানস-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিজে না জানিতে পারেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাঁহারা সাহিত্যের সমালোচক ও প্রকৃত ব্যাখ্যাতা তাঁহারা এই লক্ষ্য, পন্থা ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিবেন—ইহাই সাহিত্য-শিল্পীর নিজত্ব। এই নিজত্বের পূর্ণ বিকাশ, মানব-জীবনকে প্রকৃত প্রস্তাবে মহিমান্বিত করে।

লেখকের ব্যক্তিগত মানস-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রকাশরূপে রচনা-রীতির আলোচনা করা, আমাদের দেশে প্রাচীন কালে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ, রচনা-রীতিকে যে তিন বা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কোন কথা নাই। তবে যাঁহারা উচ্চতম শ্রেণীর লেখক, তাঁহাদের রচনায় ব্যক্তিত্বের চিহ্ন ধরিতে পারা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির অনুসরণ করাই, সে কালের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্য, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের বিধানের শাসনাধীনে বিকশিত হয় নাই। সুতরাং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের তুলাদণ্ডে ইহার পরিমাপ করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে যে সমুদয় লেখকের লক্ষ্য পন্থা ও বৈশিষ্ট্যও ধরিতে পারা যায়, তাঁহাদের রচনা-রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ ভাবে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ আমাদের সাহিত্য-সাধনা অনেক সময়ে কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায়, সাময়িক উত্তেজনায় ও বিভিন্নমুখী প্রবাহের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে। অতীতের হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন, এরূপ অবস্থায় অত্যন্ত অধিক। নতুবা, বর্ত্তমানকে আমরা একটি গৌরবময় সুনিশ্চিত পথে, সজ্ঞানভাবে লইয়া যাইতে পারিব না।

২

বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-রচনার সুপ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য এই যে, সকলে যেন রচনা বুঝিতে পারে। কারণ আমাদের এই যুগ যে জনসাধারণের যুগ, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। অবশ্য একেবারে প্রত্যেক নর-নারীকে সকল বিষয় বুঝাইয়া বলা অত্যন্ত কঠিন এবং অনেক সময়ে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-সাধনার আদর্শ এইরূপ। পূর্ব্বকালে এই আদর্শ বা লক্ষ্য, সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে গ্রাম্যতাদোষ কাব্য-রচনায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। গৌড়-রীতি ওজোগুণ যুক্ত—ইহাতে পদের আড়ম্বর ও দীর্ঘ সমাসের বাহুল্য থাকা প্রয়োজন। পাঞ্চাল রীতিতেও রচনা কৌশলপূর্ণ। সুতরাং এই উভয় প্রকারের রচনার রীতি বুঝিতে হইলে, বিশেষ প্রকারের শিক্ষার প্রয়োজন। অনেক সময়ে লেখক নিজেই, কাব্যের টীকা রচনা করিয়াছেন—নতুবা, পণ্ডিতের পক্ষেও তাঁহার রচনা অবোধ্য থাকিয়া যাইত। যে রীতিতে প্রসাদগুণ অধিক, তাহাকে বৈদর্ভী রীতি বলে। এই রচনায়, শব্দের অর্থ পরিস্ফুট। কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, বাক্যের বা পদের অর্থ সুব্যক্ত করিবার জন্য, রচনা যেন গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট না হয়।

সকলেই যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই গ্রাম্যতা দোষ। 'সর্ব্বলোকাবগম্যং যৎ গ্রাম্যং তদভিধীয়তে'—'কাব্যচন্দ্রিকায়' এই লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব অশিক্ষিত বা গ্রাম্য জনসাধারণ যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই 'গ্রাম্য'। এই আদর্শে যখন সাহিত্য রচিত হয়, তখন উহা সম্প্রদায় বিশেষের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া থাকিত। অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরা কাব্য রচনা করিতেন। যাঁহারা ভদ্রস্থানে ধনবান বা ভাগ্যবান বা সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সভায় যাতায়াত করিতেন, তাঁহারাই কাব্যরস আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইতেন। সকলেই কাব্য-রস আস্বাদনের বা সংস্কৃত সাহিত্যের উপভোগের অধিকারী ছিলেন না। ইংলণ্ডেও এই প্রকার সময় ছিল। কেবল ইংলণ্ডের কথাই বা

বলি কেন? পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যে ও সমাজে, এই প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার যুগ ছিল এবং এখনও সেই প্রাচীন যুগের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে বাছাই করা সুবিধাভোগী কতকগুলি মানুষ, আর একদিকে অসংখ্য জনসাধারণ। ভদ্র-সাহিত্য, এই বাছাই করা মানুষদের উপভোগের সামগ্রী। জনসাধারণের মধ্য হইতে সাহিত্য-স্রষ্টার উদ্ভব হইলে, ঐ ভদ্রলোকেরা তাহাকে উন্নীত করিয়া নিজেদের দলে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাহিত্য-রচয়িতাগণ সুবিধাভোগী ও শক্তিশালী রাজন্যবর্গের গুণগান ও তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া, নিজেদের সামর্থ্যের সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সমুদয় দেশে, দলাদলির দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হয়, সেখানে অনেক শক্তিশালী লেখক, কোন রাজনীতিক দলের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন এবং সেই দলের সেবায় নিজের শক্তি নিয়োজিত করিয়া পার্থিব সুবিধা ভোগ করিয়াছেন।

সাহিত্য-সাধনার এই অবস্থা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের অবস্থার মধ্যে কোন কোন কবি বা সাহিত্য-স্রষ্টা, জনসাধারণের সহিত থাকিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা তথা কথিত ভদ্রলোকের দলে আসিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈদিক যুগে বা তাহার পরবর্ত্তী যুগে, সাহিত্য সাধনার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলা বড় সহজ নহে এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে, যখন পালিভাষায় এবং নানারূপ সরল উপাখ্যানের সাহায্যে তত্ত্বকথা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহার পর প্রাকৃত ভাষায় রচিত কোনও দোঁহার দ্বারা জনসাধারণের সাহিত্যের ভিত্তি সংগঠিত হইতে আরম্ভ হইল, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, জনসাধারণের জাগরণ হইয়াছে এবং সাহিত্য, সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তিরূপে না থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের মহা-মিলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে যেমন, মধ্যযুগে আমাদের বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্ভব ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টিও সেইরূপ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ঠিক এই সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগের সমলক্ষণাক্রান্ত যুগ দেখিতে পাওয়া যায়। নানক, কবীর, দাদু, রামানন্দ, আসামের শঙ্করদেব, উৎকলের জগন্নাথ দাস বা অচ্যুতানন্দ দাস প্রভৃতি—এই জনসাধারণের যুগের প্রবর্ত্তক। ধর্ম্ম ও সাহিত্য—এই উভয় বিভাগেই এই সমুদয় যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং তাঁহারা ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ, জনসাধারণের ভাষায় সর্ব্বসাধারণের জন্য, যুগবাণী প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দেশে, নবযুগে বা আধুনিক যুগে, রাজা রামমোহন রায়ের উদ্ভব ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, এই শ্রেণীর ঘটনা।

নবীন বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় এই বিশেষ লক্ষণটি মনে রাখা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব ব্রাহ্ম-সমাজ নামক একটি সীমাবদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্য দিয়াই বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—নানা দিক দিয়া সেই প্রভাব, নানা প্রকারে রূপান্তরিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আমাদের সমগ্র সমাজ-জীবনে ক্রিয়া করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। নব্য-বঙ্গের বা নব্যভারতের নব যুগ বলিতে যাহা বুঝায়, এবং বঙ্গ-সাহিত্যের যেগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ, সেই লক্ষণ গুলি, রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার প্রত্যক্ষ ফল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবেই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভব এবং তত্ত্ববোধিনী-সভার প্রতিষ্ঠা। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় মূলতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুগত্য করিয়া, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান কর্ম্মী হইয়াছিলেন। একদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত, আর একদিকে তাঁহারই সমসাময়িক টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র—উভয়েই রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্র—বঙ্গীয় সাহিত্য-সাধনার এই দুইটি ধারা ব্যতীত, আর একটি ধারা

উল্লেখযোগ্য। উহাকে আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান বলা যায়। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে, রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে শক্তি জাগ্রত হইয়াছিল, সেই শক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধন-ক্ষেত্রেও আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। এই তৃতীয় ধারার নেতৃগণ, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতী বাঙ্গালার উত্তরাধিকারী হইলেও, তাঁহাদের প্রকৃতি অল্প দিনের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনের কারণও রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলন ও জন-সাধারণের জাগরণ।

আমরা সাহিত্যের রচনা-রীতির এই ত্রি-ধারার আলোচনায়, সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত, তাহার পর প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) এবং তাহার পর সমসাময়িক পণ্ডিতী-আন্দোলনের আলোচনা করিব। এই স্থানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—এই তিনটি ধারা যে প্রথম হইতেই, স্থূলরূপে পৃথক পৃথক পথে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে ক্রমাগত অল্পাধিক পরিমাণে বিচিত্র প্রকারের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এই তিনটি ধারা অবশ্য পরিণামে এক পুণ্য-প্রয়াগে সম্মিলিত হইবে। কিন্তু এই মিলনের পথে, নানারূপ আঘাত-প্রতিঘাত ও আলোচনা আন্দোলন স্বাভাবিক; এবং যাহা স্বাভাবিক, তাহাই ঘটিয়াছে।

(৩)

সাহিত্য রাজ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রকৃত স্থান কোথায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসের দুই একটি কথা জানা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায় একটি রহস্য। তিনি কি, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ও সঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। বহু বহু মনীষী তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকেই নূতন কথা বলিয়াছেন। সাধারণ মানুষ হইতে যাঁহারা খুব বেশী উপরের লোক, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রকারের মতভেদ চিরকালই হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্মিত বা বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা এস্থলে একটি মাত্র উদাহরণ দিতে চাই। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (প্রথম নাম—'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা') প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়, ঠিক সেই সময়েই (১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩) The Hindu Theo Philanthropic Society নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া, পরমাত্মরূপে ও সত্যরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং জনসেবা করা, এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার সহিত প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এই সভা দাবী করিতেন যে, তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়েরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। এই সভা অবশ্য স্থায়ী হয় নাই—মাত্র তিন বৎসর কাল ইহার পরমায়ু। কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় এই সভা, বহু উন্নত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়, এই সভার বিশিষ্ট সভ্য ও পরিচালক ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা রিভিউ পত্রে, তিনি রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে —হিন্দুরা বলেন যে রাজা হিন্দু ছিলেন, খ্রীষ্টানেরা বলেন যে তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন, আবার মুসলমানেরা বলেন, তিনি মুসলমান ছিলেন। একত্ববাদী খ্রীষ্টান ও বেদান্তমতাবলম্বিগণও তাঁহাকে তাঁহাদের আপনার লোক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বর-বিশ্বাসী বেন্থাম-মতাবলম্বী (Religious Benthamite) ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় প্রচারক ডফ সাহেবের জীবনচরিত লেখক জর্জ্জ স্মিথ বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর সময় রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন—তিনি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান নহেন। স্মিথ সাহেবের মতে রাজা ঈশ্বর-বিশ্বাসী বেন্থাম-

মতাবলম্বী ছিলেন। অবশ্য রাজা রামমোহন রায়ের মতের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের অধিকার বহির্ভূত। আমাদের বক্তব্য এই যে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব, নানা মূর্ত্তিতে বঙ্গীয় সমাজে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। Hindu Theo-Philanthropical Societyর সভ্যেরা, রাজা রামমোহন রায়কে গুরু বা পথ-প্রদর্শকরূপে স্বীকার করিতেন—কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের উপর তুষ্ট ছিলেন না। রাজা রামমোহন রায় যে কেমন 'রহস্য', ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রত্যক্ষ ভাবে রাজা রামমোহন রায়ের ভাবরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজার সাধনার পতাকা হস্তে লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

(৪)

নব্যবঙ্গের ভাবজীবনের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, এক সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী ব্যাপার ছিল। এই সভা ও এই পত্রিকা যাহা করিয়াছেন, সেই কার্য্যসাধনে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অক্ষয়কুমার তাঁহার সহিত অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দেবেন্দ্রনাথেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অক্ষয়কুমার যখন সাধনক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন তখন দেখিলেন, দেশের ও আমাদের জীবনের সর্ব্বত্রই অতি ভয়ঙ্কর জড়তা। আমাদের এই প্রাচীন দেশের নরনারী, নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কারে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া, একেবারে জড়বৎ পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে বিশাল ও বিচিত্র জগৎ, চারিদিকে উন্নতিশীল নানাজাতির বিচিত্র সাধনা ও উদ্যম;—কিন্তু আমরা একেবারেই অসাড় ও নিস্পন্দ! আমাদের বুদ্ধিকে নিগড়মুক্ত করিয়া, স্বাধীন চিন্তায় দীক্ষিত করাই অক্ষয়কুমারের জীবনের সাধনা ছিল। ইউরোপ বা নব্যজগৎ তাহার নবীন উদ্যম লইয়া, প্রাচীন ভারতের দুয়ারে উপস্থিত। ভারতবর্ষ, এই নবসাধনার চাপে নিষ্পেষিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, কিংবা জাগিয়া উঠিয়া এই নবসাধনকে আত্মসাৎ করিয়া, নববলে বলীয়ান হইয়া সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে—ইহাই সেদিনের সমস্যা ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নবযুগের ধর্ম্ম ঠিক প্রাচীন যুগের ধর্ম্ম নহে। অক্ষয়কুমার ইহা বুঝিতেন এবং অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বাধীনে ইউরোপের সমুদয় বিদ্যাকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা, এই তত্ত্ববোধিনীর মধ্য দিয়া আরম্ভ হয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—বাঙ্গালীর ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ করান, সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়। সে সময়ের একজন বড় অধ্যাপক Rev-John Anderson সাহেব বলিয়াছেন—Akhoykumar is Indianising European Science। অক্ষয়কুমার দত্তের বাণী সংক্ষেপে এই—"তোমরা চিন্তারাজ্যে স্বাধীন হও এবং প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে আদর করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। আজ এই বিশ্ববেদ তোমাদের গ্রহণীয়।" প্রাচীন বেদের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, আমাদের সাধন শক্তিকে পঙ্গু করিয়াছে বলিয়া অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করিতেন। পূজা ও প্রার্থনা প্রভৃতির ভাবুকতা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অকর্ম্মণ্য করিয়াছে বলিয়া অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করিতেন। তাই তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথকেও বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ক ধারণা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন এবং অমিত সাহসের সহিত প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

স্বাধীন চিন্তার পরিণাম কি? সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি মানুষকে কোথায় লইয়া যাইবে? স্বাধীন চিন্তার নাম শুনিলে অনেকেই কাঁপিয়া উঠেন। স্বাধীন চিন্তার সহিত নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিজাতীয় ভাবানুকরণ ও স্বদেশদ্রোহিতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে

বিবেচনা করেন। এই কারণে আমাদের সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তার ও সংস্কারমুক্ত গবেষণার একটা প্রতি-ক্রিয়াও দেখা যায়। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার স্বাস্থ্যকর পরিণতি কি? অক্ষয়কুমারের নির্ম্মল, বিলাস-বিমুখ, আড়ম্বরহীন, সরল ও উদার জীবন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অক্ষয়কুমার দত্তের সাহিত্য-সাধনার যাহা লক্ষ্য ছিল তাহা বলা হইল। এই লক্ষ্য রাজা রামমোহন রায়েরও ছিল। রাজা রামমোহন রায় দেশে যে জাগরণ আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে চারিদিকে যে আন্দোলন, আলোচনা ও শিক্ষাবিস্তার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে অক্ষয়কুমার অনেক সুবিধা পাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের সময়ে সুপাঠ্য ও সর্ব্বজনীন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল তাহা উল্লেখযোগ্য নয়। রাজা রামমোহনকে দুর্গম বনপ্রদেশে পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। গদ্য কেমন করিয়া পড়িতে হয়, পাঠকগণকে তাহা শিখাইয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমারের এ সমুদয় অসুবিধা ছিল না। দেশের লোকের মানসিক প্রকৃতি চিন্তাপ্রণালী ও সংস্কার তখন বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় চিন্তা ও সাধনা-রাজ্যে যে যে বিভাগে আঘাত করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার তাহার প্রত্যেক বিভাগে রাজা রামমোহনের সাধনাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন এবং এই মৈত্রী স্থাপনের জন্য সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি শ্রদ্ধার সহিত অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করা একান্তভাবে আবশ্যক। ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ লইয়া মানুষ কলহ করিতেছে, ধর্ম্মের যাহা প্রাণ তাহা অন্বেষণ করিবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই।

অক্ষয়কুমারের ধর্ম্মনীতি' 'বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি গ্রন্থ, রাজার এই সঙ্কল্পসাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বর্ত্তমান জগতে আমরা অতিশয় পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছি—বিজ্ঞান অনুশীলনের অভাব ও বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির অভাব, ইহার প্রধান কারণ। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার সাহস নাই, প্রবৃত্তি নাই সামর্থ্যও নাই। অন্ধভাবে গতানুগতিকের অনুবর্ত্তন করিতেছি। আমাদিগের দৃষ্টি অতিশয় সঙ্কীর্ণ—বিজ্ঞানের চর্চ্চার দ্বারা স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে হইবে—রাজা রামমোহন রায়ের ইহা সঙ্কল্প ছিল। অক্ষয়কুমার এই কার্য্য বহুল পরিমাণে সাধন করিয়া গিয়াছেন।

(৫)

রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ের সহিত বাঙ্গালা দেশে এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের জাগরণের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের জাগরণ একদিনে অকস্মাৎ সাধিত হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের অবস্থা সে সময়ে যেরূপ ছিল, উচ্চ শ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর, পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের প্রভেদ এতই অধিক ছিল যে, জনসাধারণের এই জাগরণের প্রচেষ্টা, ক্রমে ক্রমে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়া সাধিত হইয়াছে। এখনও এই জাগরণ যে পূর্ণাবস্থায় বা সন্তোষজনক অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা নহে—এখনও কাজ অনেক বাকী রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও আমরা এই স্তরগুলি দেখিতে পাই এবং বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার রীতিতেও এই স্তরের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিলেন. তখনও ব্রাহ্মসমাজে জনসাধারণের আন্দোলন হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা গোপনে বেদপাঠ করিতেন—জনসাধারণের সেখানে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। বেদপাঠ হইয়া যাওয়ার পর, যখন বাহিরে আসিয়া বক্তৃতা হইত, তখন অবশ্য সকলে তাহাতে যোগ দিতে পারিতেন। এই ব্যবস্থা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ তখনও জন-সাধারণের সহিত

সমান ভাবে মিশিতে পারেন নাই। তাঁহারা উপদেষ্টা ও শিক্ষকরূপে নিজেদের উন্নত শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করিতেন এবং জন-সাধারণ তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে, ইহাই আশা করিতেন।

শিক্ষাদান কার্য্যের দুই প্রকারের আদর্শ, বর্ত্তমান সময়ে আলোচিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের সিদ্ধান্ত এই যে, শিক্ষককে ছাত্রের নিকট যাইতে হইবে—ছাত্রকে বুঝিতে হইবে, ছাত্রের ভাবের ভাবুক হইতে হইবে এবং ছাত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে বন্ধুর ন্যায় মিশিয়া, তাহাকে সম্মান করিয়া, তাহাকে আনন্দদান পূর্ব্বক, তাহার স্বাধীন অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগাইয়া তাহাকে উন্নীত করিতে হইবে। এই পদ্ধতি অত্যন্ত আধুনিক। আমাদের দেশে, এই পদ্ধতি এখনও সাধারণতঃ অপরিচিত—অন্ততঃ পক্ষে এই পদ্ধতিতে আমরা এখনও অভ্যস্ত হই নাই। প্রাচীন কালের পদ্ধতি অন্যরূপ—ছাত্রকে শাসন করিয়া, ভয় দেখাইয়া, শিক্ষকের অনুগত করিতে হইবে; এই অনুগত্যের দ্বারা ছাত্র ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। এই প্রাচীন পদ্ধতি হইতে আধুনিক পদ্ধতিতে একেবারে আসিয়া উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে। কতকগুলি স্তর অতিক্রম করিয়া প্রাচীন পদ্ধতি হইতে নূতন পদ্ধতিতে আসিতে হইবে।

অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা যে সর্ব্ব-সাধারণের সুবোধ্য নহে, এবং তিনি যে ইচ্ছা করিয়াই সংস্কৃত শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া, তাঁহার রচনা মার্জ্জিত ও অলংকৃত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাঁহার পূর্ব্বের সংস্কৃতবিৎ বাঙ্গালা লেখকেরা ভাষাকে ওজস্বী ও গম্ভীর করিবার জন্য, যেমন দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য করিতেন এবং ভাবের দৈন্য, সমাসবহুল ও অনুপ্রাস মুখরিত শব্দাড়ম্বরের দ্বারা লুক্কায়িত করিতেন, অক্ষয়কুমারের ভিতর তাহা ছিল না। তিনি শব্দের বন্যা সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই—ভাবের দ্বারা ও তত্ত্বের দ্বারা দেশবাসীর হৃদয় মনের দৈন্য দূর করিয়া, তাহাদিগকে সত্যরূপে উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু একেবারে জনসাধারণের ভূমিতে নামিয়া আসিতে পারেন নাই।

সাহিত্যের রচনা-নীতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের অভিমত, তিনি তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন—কীর্ত্তিবিষয়ক' প্রবন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। মাঘ, ভারবী, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের সহিত বাল্মীকির তুলনা করিয়া তিনি বলিতেছেন—"বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বাভাবিক সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ, এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না।"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Hindu Patriot কাগজে, অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থের যে ইংরাজী সমালোচনা বাহির হয় তাহাতে বলা হইয়াছে—This, like other works of the author, is one of the best specimens of chaste Bengali writing, devoid of Sanskriticism for the sake of pedantry." অর্থাৎ, কেবল পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ নাই—ইহাই মার্জ্জিত বাঙ্গালা রচনার সর্ব্বোত্তম নিদর্শন।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলী মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। ছাত্রদিগের জন্য পাঠ্য-পুস্তক রচনায় তিনি যে পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, জনসাধারণের জন্য লিখিত গ্রন্থে সে পরিমাণ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন নাই। 'চারুপাঠের' রচনার সহিত 'ধর্ম্ম-নীতি'র তুলনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। অবশ্য তিনি সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য করিবার জন্য গ্রন্থ রচনা করিলেও, সংস্কৃত শব্দের প্রতি যে তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ

নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকারের রীতির বিরুদ্ধে, প্যারী চাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার মহাশয়ের কর্তৃক প্রচারিত "মাসিক পত্রিকা" নামক পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত সরল, প্রাঞ্জল ও কথ্যশব্দবহুল ভাষার উদ্ভব হয়। টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থ যে এই ভাষার স্বাভাবিক বিদ্রোহরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, হইয়াছিল, তাহা নহে—একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থ প্রচারিত হয়।

যাহা হউক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে কারণে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বাহির হইয়া আসেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যে ভবিষ্যতের সাধারণ ব্রহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়, ঠিক সেইরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনারীতির অপর দিকে এই কথ্য ও সরল বাঙ্গালার উদ্ভবের মধ্যে ভবিষ্যতের বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির ভাবী বীজ রোপিত হয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

দেরাদূন

বঙ্গ সরস্বতীর অর্চ্চনাকল্পে প্রবাসী বাঙ্গালী এই দেরাদূনে যে পূজামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আজ আমরা সেই পুণ্যমন্দিরে সমবেত হইয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যাঁহারা নানাভাবে সম্বদ্ধ তাঁহাদের এরূপ আনন্দ সম্মিলন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু আমার পক্ষে ইহা অভিনব এক অপার আনন্দের ব্যাপার। দূর প্রবাসে স্বদেশীয়ের মূর্ত্তি দূর হইতে দেখিলেও আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে, কিন্তু সেই প্রবাসে বঙ্গবাসী তাঁহাদের স্নেহবেষ্টনের মধ্যে স্থান দিবার জন্য যখন প্রসারিত ভুজবিস্তারের মধ্যে আহ্বান করেন, সে আহ্বান যে কত মধুর তাহা সেই জানে, আমার আজিকার শুভাদৃষ্টের ন্যায় শুভাদৃষ্ট যাহার কখনও হইয়াছে। গুণ, জ্ঞান, যোগ্যতা বিচার করিয়া দেখিলে হয়ত আমার স্থান আজ এখানে এভাবে হইতে পারিত কিনা সন্দেহ; কিন্তু স্নেহ সে সকল বিচার বিবেচনা করে না, আপনারাও তাহা করেন নাই—ইহারই নাম অহৈতুকী প্রীতি; এই প্রীতির প্রতিদান নাই, এ স্নেহঋণ অপরিশোধ্য; ঋণগ্রহণকারী ইহার জন্য চিরঋণীই রহিয়া যায়, আমাকেও থাকিতে হইবে। আজিকার এই শুভদিনের আনন্দস্মৃতি আমার চিত্ততলে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিল, জীবনের শেষতম নিমেষপর্য্যন্ত বিস্মৃতির আবরণে ইহা আবরিত হইবার নহে, হইবেও না।

বঙ্গসারস্বতনিকুঞ্জ একদিন প্রায় অন্ধকারেই সমাবৃত ছিল; "গুলেবকাউলী"র গল্প এবং রামনারায়ণের নাটকের ন্যায় কতিপয় গ্রন্থ ছিল তাহার সম্বল; অপরদিকে কাপ্তান রিচার্ডসন্, ডিরোজিও প্রভৃতি শ্বেতকায় আচার্য্যগণের দ্বারা ইংরাজি শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন বঙ্গযুবকগণ স্বীয় সাহিত্যের দৈন্য দেখিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। যাহার যাহা কিছু বলিবার কহিবার এবং শিখিবার ছিল সে সমস্তই ইংরাজিতে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। রজতগিরিসন্নিভ ইংরাজগুরুর নিকট হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষামন্ত্রের প্রথম উন্মাদনা ভোলানাথের স্বহস্ত প্রস্তুত সিদ্ধির সরবতের ন্যায় সকলকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বদেশের আচার বিচার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সমাজ সংস্কার সমস্তই দক্ষযজ্ঞের ন্যায় লণ্ড ভণ্ড হইবার উপক্রম হইল। বঙ্গসরস্বতীর ঘনান্ধকার-সমাচ্ছন্ন বৃক্ষতলে

যখন এই তাণ্ডবলীলার আয়োজন চলিতেছিল তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের প্রথম অরুণালোকসম্পাতকে বসন্ত-বৈতালিকের ন্যায় আহ্বান করিয়া লইল মধুসূদনের মধুস্বর। সরস্বতীর নিকুঞ্জকাননে "ব্রজাঙ্গনা"র নূপুর নিক্কণ শুনা গেল; "মেঘনাদে"র মেঘমন্দ্র দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হইয়া উঠিল; সাহিত্যরস-পিপাসু বঙ্গনরনারী অবিসম্বাদিতরূপে বুঝিতে পারিল যে বঙ্গসরস্বতীর ভাণ্ডারে কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। তাহার পরে বঙ্গসাহিত্যাকাশের নবোদিত প্রভাতে বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্মীরূপিণী প্রতিভা "বঙ্গদর্শনে"র সুধা-ভাণ্ডহস্তে দর্শন দিল; এবং যে বঙ্গসাহিত্য একদিন ইংরাজিশিক্ষিত বঙ্গবাসীর উপেক্ষার সামগ্রী ছিল,তাহারই জন্য প্রতিমাসে বঙ্গদর্শনের পথ চাহিয়া সমস্ত বঙ্গের নরনারী উৎকণ্ঠার কালাতিপাত করিতে লাগিল। যে সাহিত্যশিশুর সূতিকাগারে বঙ্কিমচন্দ্র ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, বঙ্কিমের জীবনকাল মধ্যে তিনি অঙ্গদ-বলয় কেউরকুণ্ডলে বিভূষিত করিয়া সেই শিশু সাহিত্যকে তাহার কৈশোর উত্তীর্ণ করাইয়া দিলেন, এবং সমস্ত জগতের সাহিত্যসমাজে তাহাকে রাজাসনের যোগ্য করিয়া তুলিলেন। তাহার পরে নবোদিত কিশোর "রবি"র নবীনা প্রতিভার স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় যখন প্রাচী দিগ্‌বিভাগ আলোকিত হইয়া উঠিল, তখনও আমরা জানিতে পারি নাই যে পরিণত দিবসের মধ্যাহ্ন ভাস্করের ভাস্বর আলোকে প্রাচী প্রতীচী সমভাবে সমুজ্জ্বল হইবে। আজ বঙ্গভাষার গতদিনের একান্ত দৈন বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। মধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভার সুবর্ণরশ্মি সম্পাতে বঙ্গভারতীর কমলবনের স্বর্ণপদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই মকরন্দ গন্ধে আজ সমগ্র ধরণী আমোদিত। কেবলমাত্র মধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্র নহে, উষাসমাগমে কাননতলে ... ন সংস্র কলবিহঙ্গের কাকলি জাগিয়া উঠে, তেমনি এই সকল মনস্বীর পদ্মানুসরণ করিয়া সারস্বত নিকুঞ্জের সকলগুলি কলবিহঙ্গই জাগ্রত হইয়াছে এবং তাহাদের সুমিষ্ট কাকলি ভারতীর কুঞ্জকাননতলকে অনুদিন মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে।

আগে জানিতাম সরস্বতীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় যে তপশ্চরণ করিতে হয় কেবল বঙ্গজননীর শ্যামলাঞ্চল-ছায়াতলেই তাহার তপোভূমি অবস্থিত। আজ দেখিতেছি কেবল তাহা নহে; ঋষিকোপানলে ভস্মাবশেষ সগর সন্তানের উদ্ধারকল্পে তপস্যা করিয়া ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া গিয়াছিলেন বটে, এবং ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে সমুদ্রসঙ্গমস্থলে ভাগীরথী অতুল গৌরবে শতমুখী হইয়া তরঙ্গভঙ্গে সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে সমুচ্ছলিতা, হরজটাটবীচারিণী মন্দাকিনীধারা হিমবৎশীর্ষের তুষার-মণ্ডিত গঙ্গোত্রীক্ষেত্র হইতেই নামিয়া গিয়াছেন, এবং হিমশৈলের তুষার সংস্পর্শ না থাকিলে সাগরসঙ্গমের অতুল্য গৌরব সম্ভব হইত কি না কে জানে? আজ দেখিতেছি হিমশৈল-পাদমূলে, জাহ্নবীর জন্মনিকেতন-সন্নিধানে, দ্রোণাশ্রমে, ভারতীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ভক্ত তপস্বীর অসদ্ভাব নাই।

তপশ্চরণের যোগ্য স্থান এই দ্রোণাশ্রম তাহাতে সন্দেহ নাই; একদিকে হিমবৎপ্রস্থ অপর দিকে শৈলরাজের শুভ্র তুষার-মণ্ডিত শীর্ষ হইতে মুক্তি-প্রবাহিনী মন্দাকিনী, নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে প্রবাহিত হইয়া "কনখল"কে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত করিয়াছেন; ইহারই সন্নিহিত আর এক স্থানে পরশুরাম শিষ্য দ্রোণাচার্য্য কুরু পাণ্ডবের শস্ত্র এবং শাস্ত্রগুরু রূপে ভারতের একচ্ছত্র অধিপতির ভবিষ্যৎ বংশধর-গণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ভারতের অদ্বিতীয় বীর, গাণ্ডীবধন্বা, ত্রিলোকবিজয়ী, ফাল্গুনী গুরুচরণ তলে বসিয়া কুরুক্ষেত্র সমর বিজয়ের সূচনা করিয়াছিলেন—এহেন পুণ্যক্ষেত্র যথার্থই তপশ্চর্য্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং প্রবাসী বঙ্গ সন্তানগণ বঙ্গ ভারতীর করুণালাভকল্পে এই স্থানকেই যে তাঁহাদের তপোভূমি রূপে লাভ করিয়াছেন ইহা একান্ত সঙ্গত হইয়াছে। এই পুণ্যভূমির এক প্রান্তে মুক্ত প্রদায়িনী জাহ্নবীর

পূতধারা বহিয়া গিয়াছে, অপর প্রান্তে কলিন্দনন্দিনী কালীন্দী গঙ্গাসঙ্গম মানসে তীর্থরাজ প্রয়াগের অভিমুখে প্রধাবিতা; এই দুই বিমল বিপুল জলধারার মধ্যবর্ত্তী শ্যামশোভা-সমন্বিত দ্রোণক্ষেত্রে বসিয়া যাঁহারা তরুণেন্দু-কান্তিমতী বাগ্‌দেবতার চরণার্চ্চনের আয়োজন করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিমলাচরণ প্রমুখ কর্ম্মিগণ যাঁহারা কুরুগুরু দ্রোণাচার্য্যেরই ন্যায় বর্ত্তমানে বঙ্গ-সরস্বতীর ভবিষ্যৎ পূজারী প্রস্তুত করিতেছেন, পরিণত বয়সে কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাদের সমাগতপ্রায়; আজ যাঁহারা শিক্ষার্থী, আগামী কল্য তাঁহাদিগকেই আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতে হইবে—বীণাবাদনপরা বাগ্‌দেবতার সিন্দূর চন্দনাঙ্কিত পাদপীঠতলে তাঁহাদের সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করিতে হইবে একথা তাঁহারা বিস্মৃত না হন ইহাই স্থানীয় যুবজনের নিকট আমার বিনীত নিবেদন।

কবি দেশজননীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

ভারতীয়গণের হৃদয় গগনেই প্রথম জ্ঞানের উষারুণ-আভা উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ভারতের তপোবনেই প্রথম সামরব ধ্বনিত হইয়াছিল, ভারতের বনভবনেই জ্ঞান ধর্ম্ম কাব্য কাহিনী প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল; সে গৌরবের দিন আজ অতীতের অন্ধ গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহু কর্ম্মী বহু মহাত্মা বহুভাবে কার্য্য করিতেছেন। সে সকলের ফলাফলের বিচারকর্ত্তা ভবিষ্যৎ। কিন্তু মনে হয়, অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে আবার ভারতবাসীর হৃদয়াকাশে জ্ঞানের সুনির্ম্মল আলোক ধারাকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে, সে বর দানের দেবতা শ্বেতসরোজসন্নিষণ্ণ বাগ্‌দেবতা সরস্বতী। এই সুপ্রাচীন পুণ্যময় তপোভূমিতে বসিয়া যাঁহারা সেই দেবতার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় তপশ্চরণে বিনিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার বিনীত অভিবাদন জানাইতেছি, এবং গঙ্গা যমুনার সুশীতল শীকর-সম্পৃক্ত শৈল কিরীটিনী এই তপোভূমিকে বারংবার আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিতেছি।*

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

* দেরাদুন "বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি"র বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সাময়িক সাহিত্যে যাঁহার রহস্যরস-সমুজ্জ্বল রচনা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী হাসিয়াছে, যাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ পটুতা অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছে, যাঁহার অপূর্ব্ব ভাষাসম্পদ সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছে, বাঙ্গালার সেই জনপ্রিয় লেখকের লেখনী আজি চিরদিনের জন্য অচল হইয়াছে! যাঁহার সরস মধুর, সময়ে সময়ে ওজস্বিনী অনায়াস বক্তৃতা শুনিবার জন্য বাঙ্গালী উদ্গ্রীব হইত, যাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গালী কখনও হাসিয়াছে, কখনও কাঁদিয়াছে, কখনও উত্তেজিত হইয়াছে, কখনও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছে, সেই প্রতিভাশালী বাগ্মীর মহাসভা-উন্মাদনী-বাণী আজি চিরদিনের জন্য নীরব হইয়াছে। বিগত ২৯শে কার্ত্তিক সন্ধ্যা ৭টার সময় সুনামধন্য সাময়িক সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বৃদ্ধ জনক জননী, তরুণী পত্নী

দুইটী পুত্রসন্তান এবং অসংখ্য বন্ধুকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া অনন্ত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

পাঁচকড়ির নাম কে না জানেন? তাঁহার রচনার সহিত কে পরিচিত নহেন? গল্প, উপন্যাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, জীবনচরিত, জাতিতত্ব, দর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, সমালোচনা—সকল বিষয়েই তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই সকল রচনাপাঠে তাঁহার ভাষার অনন্যসাধারণ আধিপত্য, তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কে চমৎকৃত হন নাই?

কিন্তু 'উমা' 'রূপলহরী' প্রভৃতি উপন্যাস পুস্তকের জন্য বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা নহে। তাঁহার কৃতিত্ব প্রধানতঃ সাময়িক পত্রাদিতে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত রসরঙ্গ-সমুজ্জল সন্দর্ভগুলির দীপ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সন্দর্ভগুলি অধিকাংশ স্থানেই সাময়িক বিষয় লইয়া লিখিত এবং সংবাদপত্রের আবর্জ্জনার মধ্যে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সুতরাং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ কখনও পাঁচকড়ির প্রতিভা ও সাময়িক সমাজের উপর প্রভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনি কি করিয়াছেন, বাঙ্গালী সমাজের তিনি কি করিয়াছেন, তাহা কখনও তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে কোনও স্থায়ী সম্পদ রাখিয়া গেলেন না, যদিও তাঁহার যেরূপ অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাহাতে তিনি স্থায়ী সম্পদের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

কিন্তু সাময়িক সংবাদপত্র সম্পাদকগণের অদৃষ্টই এইরূপ। রাজা রামমোহন রায়ের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, "সমাচার চন্দ্রিকা" সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা সন্দর্শন করিয়া মার্শম্যান বলিয়াছিলেন তিনি রামমোহনের সহিত ভারতবর্ষে রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রীসভায় অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য, আজ তিনিও অধিকাংশ বাঙ্গালীর নিকট অপরিজ্ঞাত। সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যাঁহার সংযত সাধু ও ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত সারগর্ভ সন্দর্ভাবলী এবং নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনা বিগত যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল, আজি বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছেন। ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের কতটুকু আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি? কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কার্য্যের পরিচয় নবীন যুগের কয়জন প্রাপ্ত হইবেন? পাঁচকড়ির তিরোধানের সহিত তাঁহার রসের ফোয়ারাও ফুরাইল। বহু বৎসর পরে হয়ত মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতে, উল্টাইতে পাঁচকড়ির মৃত্যুর পর আমাদিগকে শোক প্রকাশ করিতে দেখিয়া, কোনও নবীন পাঠক বিস্মিত হইবেন, আমাদিগের কথাগুলি অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করিবেন, কারণ যে সকল রচনাতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যে সকল ঘটনা বা চরিত্রের তিনি নির্ম্মম শ্লেষবর্ষী সমালোচনা করিয়াছিলেন, যে সকল উক্তিতে তাঁহার নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহার কোনও পরিচয়ই থাকিবে না। তথাপি আমাদিগের মনে হয় পাঁচকড়ি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ এই স্থলে লিপিবদ্ধ রাখা উচিত।

পাঁচকড়ি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। উঁহাদের আদি নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরে। কিন্তু তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাগলপুরে কলেক্টারী আফিসে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া পাঁচকড়ির বাল্যকাল ও প্রথম যৌবনকাল ভাগলপুরেই অতিবাহিত হয়।

ভাগলপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়েই পাঁচকড়ি বিদ্যা-শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। এই স্থানেই ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ের পরিদর্শক প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের সেই স্মরণীয় ঘটনা তিনি স্বয়ং এক স্থলে এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন—

"আমার তখন পৈতা হইয়াছে। দুই কাণে দুই সোণার মাকড়ী, মাথা নেড়া, পায়ে কাশীর জরির জুতা,

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পরণে গেরুয়া রঙের থানপেড়ে কাপড়, গায়ে গেরুয়া রঙের এক ভাগলপুরী বাপ্তার কোট। তখন আমি ফিপ্থ ক্লাশে পড়ি। স্কুলে যাইয়াই শুনিলাম, ইনেস্পেক্টর ভূদেববাবু স্কুল দেখিতে আসিবেন। হেডমাষ্টার ছিলেন বাবু বেণীমাধ দে।

"ঠিক বেলা দুইটার সময় ভূদেববাবু আমাদের ক্লাশে আসিলেন। আমাদের মাষ্টার ছিলেন—ঋষিকল্প পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়। * * ভূদেব বাবু ক্লাশে আসিয়াই পার্ব্বতী বাবুকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে কোলাকুলি হইল। আমি ক্লাশের প্রথম ছেলে। আমাকে দেখিয়া ভূদেব বাবু একটু হাসিলেন; বলিলেন "তোমার পৈতা হইয়াছে?" উত্তরে আমি বলিলাম—হাঁ। "তুমি সন্ধ্যা মুখস্থ করিয়াছ?" উত্তরে আমি বলিলাম, "হাঁ।" "বল দেখি সন্ধ্যার বই কোথা?" আমি অমনি

বলিলাম—'মৈনস।" ভূদেববাবু হাসিলেন। এই সময়ে হেড মাষ্টার বেণীবাবু ভূদেববাবুকে বলিলেন—"জিজ্ঞাসা করুন ত ওর বাপের নাম কি?" ভূদেববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবার নাম কি?" আমি রাগ করিয়া বলিলাম—'ষা'। কথা এই যে, আমার ইষ্টদেবের নাম বেণীমাধব। আমাদের হেডমাষ্টারের নামও বেণীমাধব। আমি পিতার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলে হেড মাষ্টার বেণীবাবু—"একটু ভুল হইয়াছে' বলিয়া আমাকে লইয়া রঙ্গ করিতেন। ভূদেব সে রঙ্গের লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। আমার মহা রাগ হইল। শেষে ভূদেব বাবু কাছে ডাকিয়া আমাকে একটু আদর করিলেন। আমাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার মাতামহের নাম কি?' আমি মাতামহকুলের কোন পরিচয় জানিতাম না। আমি বলিলাম—'মার আবার বাবা আছেন নাকি?' আমার কথা শুনিয়া বেজায় একটা হাসি পড়িয়া গেল। তার পর ভূদেববাবু আমাকে লেখাপড়ার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সকল প্রশ্নের উত্তর করিয়া বলিলাম—'আমাকেই খালি খালি জিজ্ঞাসা করছেন—অন্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করুন না?' উত্তরে ভূদেববাবু বলিলেন 'বটেই ত! আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না। এখন তুমি কি করিতে চাও?' আমি বলিলাম—'খেলা করিতে।'

"সেই বৎসরের শেষে—ছোট লাট স্যর এ্যাসলি ইডেন ভাগলপুরে গিয়াছিলেন। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াছি। প্রাইজও পাইয়াছি। ছোট লাট স্বয়ং প্রাইজ বিতরণ করিতেছেন। খুব ধূম। আমার ভাগ্যে অনেকগুলি বহি প্রাইজ পড়িয়াছে। আমি সেই প্রাইজগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিব, এমন সময় ভূদেববাবু আমাকে ধরিয়া দাঁড় করাইলেন। এবং স্যর এ্যাসলিকে ইংরাজীতে কি বলিলেন। স্যার এ্যাসলি আমাকে ডাকিলেন। আমার বড় ভয় হইল। তথাপি ছোট লাটের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। ছোটলাট বলিলেন,—'তুমি সেই স্তবটি পড়িয়া আমাকে শুনাও।' সে এক অপূর্ব্ব স্তব। অমৃতবাজার পত্রিকায়—স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের উপর এক স্তব বাহির হইয়াছিল, আমার এক খুল্লতাত আমাকে তাহা শিখাইয়াছিলেন। আমাকে সেই স্তব পড়িতে বলিলে, আমি সেই স্তবটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইতাম। ছোটলাটের হুকুম—কি করি! হাতের প্রাইজ বইগুলি নীচে রাখিয়া, হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্লুতস্বরে আমি সেই স্তব পড়িতে লাগিলাম। তাহার একটা ছত্র আমার মনে আছে—

'জয় জর্জ্জ বার্ণড বলীবর্দ্দবাহনম্'

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আমার স্তব পড়া শেষ হইলে, ছোটলাট হইতে আরম্ভ হইয়া ঘর শুদ্ধ সকলে হাসিয়া উঠিল। স্যর এ্যাসলি আমাকে বসাইয়া রাখিলেন। প্রাইজ বিতরণ শেষ হইলে, তিনি সম্মুখের দুইটি বড় ফুলের তোড়া আমার হাতে দিলেন। আমি বহি ও তোড়া লইয়া সামলাইতে পারিলাম না। ভূদেব বাবু আমার বহিগুলি লইয়া, তোড়া দুটি আমার হাতে দিয়া আমাকে সঙ্গে

লইয়া তাঁহার বাসায় আসিলেন। সেখানে আমি এক কেঁচড় সন্দেশ পাইলাম। সন্ধ্যার পর তিনি আমাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। ইহার পর যতদিন ভূদেব বাবু জীবিত ছিলেন, আমার খবর রাখিতেন। আমি যখন পাটনা কলেজে পড়িতাম, তখন ভূদেব বাবু পাটনা বিভাগে ইনেস্পেক্টার ছিলেন। পাটনা কলেজে আমাকে দেখিতে পাইয়া, বাসায় লইয়া গিয়া আমাকে খুব আম খাওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে চুঁচূড়ায় গিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলাম।"

বাল্যকাল হইতে বিহার প্রদেশে থাকায়, হিন্দী ভাষায় পাঁচকড়ির বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল। অনেক হিন্দী দোঁহা প্রভৃতি তিনি মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহার সুন্দর আবৃত্তি দ্বারা শ্রোতৃগণকে বিমোহিত করিতেন। শুনা যায়, ইঁহারই মুখে তুলসীদাসের দোঁহার আবৃত্তি শুনিয়া কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাহার বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। কবিবর রঙ্গলাল পাঁচকড়ির জ্যেঠতুতো ভাইদিগের পিস্তুতো ভাই ছিলেন। সেই সূত্রে পাঁচকড়ি মধ্যে মধ্যে 'রঙ্গদার' নিকটে যাইতেন। পাঁচকড়ি একস্থানে লিখিয়াছেন "তিনি (রঙ্গলাল) আমার মুখে হিন্দী দোঁহা চৌপায়ী প্রভৃতি পদ্য ও গাথা শুনিতে ভালবাসিতেন। হিন্দী কবি নরহরি ও ভূষণের দেশাত্মবোধ-জ্ঞাপক কবিতা সকল যখন আবৃত্তি করিতাম, তখন বৃদ্ধের সেই রোগক্লিষ্ট মুখও যেন জ্বলিয়া উঠিত। এত তেজ, এত ঝাঁজ যে বাঙ্গালীর মধ্যে হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও জানিতাম না।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পাঁচকড়ি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পাঁচকড়ি কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন এবং খিদিরপুরে তাঁহার পিসেমহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তিনি প্রায়ই রঙ্গলালকে দেখিতে যাইতেন। রঙ্গলাল পাঁচকড়ির কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির প্রশংসা করিতেন। পাঁচকড়ি লিখিয়াছেন—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"একদিন রঙ্গলাল দাদাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কাছে গেলাম। এবার তাঁহাকে একটু অধিক ক্লিষ্ট দেখিলাম। আমি যাইতেই তিনি একখানি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লইয়া বলিলেন,—'আমাকে পড়িয়া শুনাও।' আমি বাছিয়া বাছিয়া স্থানে স্থানে পড়িতে লাগিলাম। আমার আবৃত্তি শুনিয়া তিনি যেন বিছানা হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার মাথায় মুখে জল দিয়া ঠাণ্ডা করিলাম। তিনি আশ্বস্ত হইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'বাঙ্গালাও এমন করিয়া পড়া যায়!' এই বলিয়া তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে খবর পাইলাম যে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। দাদা যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলেন। আমাকে কাছে বসাইয়া নেবু ও সন্দেশ খাওয়াইলেন। কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। রঙ্গলাল দাদা ইংরাজী শিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে,

ইংরাজী শিক্ষার যত অধিক বিস্তার হইবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে,—দেশাত্মবোধ আপনি ফুটিয়া উঠিবে।"

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পাঁচকড়ি পাটনা কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং যথাসময়ে এফ এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই পাঁচকড়ি বাঙ্গালা সন্দর্ভাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন-সম্পাদিত "ধর্ম্ম প্রচারকে" তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার তরুণ বয়সের রচনা সম্বন্ধে একটি গল্প তিনি স্বয়ং এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন—

"পাটনা কলেজে বি-এ পড়িতেছি। পূজার পরে কলিকাতায় আসিয়াছি। তখন 'প্রচার' ও 'নবজীবন' জোরে চলিতেছে। রাখাল দাদা বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা বলিলেন,—'তুই বাঙ্গালা লিখতে শিখেছিস্,- কেবল ধর্ম্ম প্রচারকেই লিখিস্ কেন? 'প্রচারে'র জন্য কিছু লেখ না!' উত্তরে আমি বলিলাম,—'আচ্ছা, ছাপবে ত?' রাখাল দা আমার নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন। আমি ১৫ দিন পরিশ্রম করিয়া ছত্রিশ পাতা ব্যাপী এক সন্দর্ভ লিখিলাম। তাহার বিষয়—'প্রেম।' ল্যাটিন, গ্রীক, ফারসী, আরবী, সংস্কৃত ও চীন সাহিত্য হইতে প্রেমের যতপ্রকারের বিকৃতি আছে, তাহা লিখিয়া দিলাম। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সভ্য-অসভ্য, বর্ব্বর-রাক্ষস—সকল জাতির চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রথার বিবরণ দিলাম। প্রেমের এইরূপ এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের মারফত রাখাল দাদাকে পাঠাইয়া দিলাম। দুই দিন পরে, রাখাল দা আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই এক চপেটাঘাত লাভ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—'হতভাগা, আর কিছু লেখবার পাওনি? শুনেছ কর্ত্তা (বঙ্কিমচন্দ্র) কি বলেছেন?' আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি?' রাখাল দা বলিলেন—'পাঁচুর আর বিয়ে না দিলে চলে না!' রাখাল দা আমাকে প্রবন্ধটি ফিরাইয়া দিলেন। আমি উহার সহিত বৈষ্ণব প্রেমের ঈশ্বর প্রেমের বিকৃতি জুড়িয়া দিয়া, প্রবন্ধটিকে ধর্ম্ম-সন্দর্ভে পরিণত করিয়া, ধর্ম্মপ্রচারকে পাঠাইয়া দিলাম। 'ধর্ম্মপ্রচারকে' উহার ছাপা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'ছোকরাটা ভারী দুষ্টু!—কিন্তু অসাধারণ মেধাবী।"

এই সময় হইতেই পাঁচকড়ির সরস সমালোচন শক্তিও বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচকড়ি তাঁহার স্মৃতিকথার একস্থানে লিখিয়াছেন—

"'কৃষ্ণচরিত' বাহির হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শ্যামবাবুর ছোট জামাই ৺কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া আমি বঙ্কিম বাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম। আহারাদির পর, বঙ্কিম বাবুর বাড়ী যে সময় যাইতাম, কিছু না কিছু খাইতেই পাইতাম। কৃষ্ণধন কৃষ্ণ কথা লইয়া শ্বশুরের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। আমি নীরবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলাম ও পাণ চিবাইতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি কি বুঝিয়াছ?' আমি মস্তক অবনত করিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিলাম,—'পওনীয়রে দেখেছেন ত, কান্দাগারে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে; সে কৃষ্ণ পোষাকে পরিচ্ছদে খাঁটী পাঠান,—পাঠানের আব্বা জাব্বা পরা, পাঠানী পাগড়ীর উপর ময়ূর পাখা আঁটা। যেমন জন্ম, যেমন কর্ম্ম, যেমন সংসার, কৃষ্ণও তেমনি ফুটিয়াছে।' এইটুকু বলিয়া আমি নীরব হইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র আমার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন,—'আর এক বাটী ক্ষীর খা, আর দুটা রসগোল্লা খা—বাপান্ত করেছিস্ বটে!' রাখাল দাদা তাড়াতাড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই—বাড়ীর ভিতর হইতে ক্ষীর ও রসগোল্লা আনিয়া দিলেন। আমার তখন আহারে অরুচি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—'তিনটাই একদরের!' তিনি উঠিয়া যাইলেন। আমরা তিনজনে ক্ষীর ও রসগোল্লা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইলাম। শেষে পাণ চিবাইতে চিবাইতে বাটীর বাহির হইয়া সার্কাস দেখিতে চলিয়া গেলাম।"

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পাঁচকড়ি পাটনা কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোনও গবর্ণমেণ্ট আফিসে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে তিনি উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগলপুরে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে একবার কলিকাতায় আসিলে তাঁহার খুড়শ্বশুর, "বেদব্যাস" মাসিক পত্র সম্পাদক ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অসাধারণ মেধা সন্দর্শন করিয়া মোহিত হন এবং তাঁহার গুরুদেব সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। পাঁচকড়ি "বেদব্যাস"এর প্রধান লেখক ও সমালোচক হইলেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে লেখক ও বক্তারূপে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি কাশীতে অধ্যয়ন করিয়া তত্রত্য সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। পণ্ডিত প্রবর শশধরের উপদেশে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং সুপ্রসিদ্ধ বক্তা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের নিকট বক্তৃতা শক্তি অর্জ্জন করিয়া পাঁচকড়ি যৌবনেই উৎকৃষ্ট বক্তা ও ধর্ম্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যাতা বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিলেন। ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যস্থতায় হিন্দুসমাজের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে পাঁচকড়ি সহকারী সম্পাদক রূপে প্রবেশ লাভ করেন। পাঁচকড়ির যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায় ছিল তাহাতে তিনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া অন্য কোনও বিভাগে প্রবেশ করিলে সাংসারিক উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন। পাঁচকড়ির আত্মীয় বর্গ সেই জন্য তাঁহাকে পুনরায় অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু সাহিত্য সেবার জন্য তাঁহার রূপ আগ্রহ ছিল যে, নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া, তিনি সামান্য পারিশ্রমিকে 'বঙ্গবাসীর' সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিলেন।

পাঁচকড়ি যখন 'বঙ্গবাসী' অফিসে প্রবেশ করেন তখন ৺যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উহার সত্ত্বাধিকারী, ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সম্পাদক, ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 'ভারত উদ্ধার' রচয়িতা ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসীর' হিতৈষী, পরামর্শ দাতা ও প্রধান লেখক ছিলেন। অল্প কালের মধ্যেই পাঁচকড়ি নিজগুণে ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রনাথ পাঁচকড়ির উপর এরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রনাথকে পাঁচকড়ি আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার সাহিত্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। পাঁচকড়ির রচনপদ্ধতি ইন্দ্রনাথের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কিরূপ স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তিনি স্বয়ং তাহা একস্থানে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

"তাঁহার সে প্রগাঢ় স্নেহে কোনও কোরকাপ্ ছিল না ; সে স্নেহের উপর কত উপদ্রব করিয়াছি, তাঁহারই কাছে শেখা গালাগালি, রঙ্গভঙ্গ তাঁহারই

উপর প্রয়োগ করিয়াছি, কত মন্দ বলিয়াছি, কত ব্যঙ্গ করিয়াছি; কত লোকে আমার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কত কথা বলিয়াছে, কিন্তু সে প্রগাঢ় স্নেহ পদ্মা-প্রবাহের মতন অব্যাহত ভাবে চলিত, বাধাবিঘ্ন মানিত না, তাহাতে অহঙ্কারের বালির চড়া ছিল না,—অগাধ, নির্ম্মল, সুপেয় এবং অনন্যগতি। পিতার ন্যায় স্নেহী, জ্যেষ্ঠের তুল্য আদর আব্দার সহিষ্ণু, সখার ন্যায় সরল, উদার মুক্তহস্ত সহায়ক। আর কি তেমন হইবে? আর কি তেমন পাইব? যতদিন যাইতেছে যত বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা দেহ মনকে অবসন্ন করিতেছে, ততই সেই সব কথা মনে পড়ে, ততই সে অতীত স্মৃতি-সুখে দিনযাপন করিতে সাধ যায়। কেবলই কি বন্ধু ও সখা?—তিনি আমার খাঁটি গুরুমহাশয় ছিলেন, হাত ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, কত ভঙ্গী করিয়া পড়িতে, বুঝিতে ও বুঝাইতে শিখাইয়াছিলেন। আমার লেখায় এবং বলায় যদি কিছু মাধুরী থাকে তবে সে তাঁহার; আর বাকী উদ্ভটতা, উৎকটতা—সে সব আমার। এখনও তাঁহারই কথা বেচিয়া খাইতেছি, তাঁহারই সিদ্ধান্তসকল ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে স্থান পাইয়া আছি। গুরু, বন্ধু, সখা, ভ্রাতা, পরিচালক —তিনি আমার সব; অধম অযোগ্য আমি, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির বিশেষ কিছুই আদায় করিতে পারি নাই। যাহা পারিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের অবলম্বন, দরিদ্রের তৃপ্তি, নিরাশার সুখ।"

পাঁচকড়ি বলিতেন, বাঙ্গালায় ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তিনটী ব্রাহ্মণ সন্তান তিনভাবে তিন দিক্ দিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম—ভূদেব, দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র, তৃতীয় ইন্দ্রনাথ। ভূদেব সিদ্ধান্তবিদ্ ঋষি, বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণকারের মতন সে সিদ্ধান্তের অভিব্যঞ্জনা ঘটাইয়াছিলেন, ইন্দ্রনাথ বিদূষকের ভূমিকা লইয়া ভূদেবকৃত সিদ্ধান্তসকলের বিরুদ্ধপক্ষের উদ্ভটতা খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন।" পাঁচকড়ি এই ইন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন।

আর একজন পাঁচকড়ির উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন—তিনি সাহিত্যজগতে সুপরিচিত 'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

কৃষ্ণচন্দ্র 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদনভার ত্যাগ করিলে পাঁচকড়ি সেই ভার গ্রহণ করেন। সেই সময়ে কাশীতে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সেই বলাৎকারের কুৎসিত মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। 'বঙ্গবাসী'তে ঐ মোকদ্দমার বিবরণ আনুপূর্ব্বিক লিখিত হইতে লাগিল এবং দেশময় ঐ মোকদ্দমা লইয়া হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচকড়ির সম্পাদন কৃতিত্ব দেশময় প্রচারিত হইল। তাহার পর কলিকাতায় প্লেগের বিভীষিকা উপস্থিত হইল। সহৃদয় ছোটলাট স্যর জন উডবার্ণ নগরবাসীকে সাহস দিবার জন্য 'বঙ্গবাসী' প্রমুখ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সহায়তা চাহিলেন। এই সূত্রে পাঁচকড়ি ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রমুখ উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত সুপরিচিত হন।

কিছুকাল যোগ্যতার সহিত 'বঙ্গবাসী' সম্পাদিত করিয়া পাঁচকড়ি উহার সম্পাদনভার ত্যাগ করিয়া 'বসুমতী'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এ দেশে সম্পাদকগণকে অনেক সময়েই পরিচালকের মতানুবর্ত্তী হইয়াই কায করিতে হয়—তাঁহাদের কোনও স্বাধীনতা থাকে না। 'বঙ্গবাসী' কংগ্রেসের বিপক্ষে ও 'বসুমতী' কংগ্রেসের স্বপক্ষে ছিল। 'বঙ্গবাসী' হইতে 'বসুমতী'তে আসিয়াই পাঁচকড়ি তাঁহার সুর ফিরাইলেন। তিনি স্পষ্টই লিখিলেন, স্ত্রী পুত্রগণের ভরণপোষণের জন্য পূর্ব্বে তাঁহাকে কংগ্রেসের বিপক্ষে লিখিতে হইয়াছিল!

'বসুমতী'র সংস্রবে থাকিবার সময় তিনি 'আইন-ই-আকবরী'র একটী বঙ্গানুবাদ এবং চৈতন্যচরিতামৃতের একটী সংস্করণ সম্পাদিত করেন।

অতঃপর পাঁচকড়ি ক্রমান্বয়ে 'রঙ্গালয়', 'টেলিগ্রাফ', 'হিতবাদী'; 'বাঙ্গালী' পত্রের সম্পাদকতা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'তেও পাঁচকড়ি নিয়মিতভাবে লিখিতেন। তিনি হিন্দী

দৈনিক 'ভারতমিত্র'ও কিছুকাল সম্পাদিত করিয়াছিলেন।

১৩২০ সালে 'প্রবাহিনী' নামক যে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়, প্রথম হইতেই পাঁচকড়ি তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং কতকগুলি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধে বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা করেন।

'নায়ক' নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সহিতই পাঁচকড়ি দীর্ঘকাল সম্পাদকরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন। নায়কের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি যে রসধারা ঢালিতেন, বোধহয় বাঙ্গালার এমন শিক্ষিত ব্যক্তি নাই যিনি তাহা উপভোগ করিয়া আনন্দলাভ করেন নাই। তাঁহার রচনায় এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যে, সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে তাঁহার রচনাগুলি অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারা যায়।

কেবল সংবাদপত্রে নহে, সাহিত্যবিষয়ক বহু প্রথম-শ্রেণীর মাসিকপত্রের সহিত পাঁচকড়ির সহযোগিতা ছিল।

'জন্মভূমি'তে, তাঁহার অনেকগুলি গল্প এবং 'বিজয়া'তে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পঞ্চম বর্ষের "মানসী"তে পাঁচকড়ি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুবিষয়ক সন্দর্ভটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই স্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বাল্যকালেই পাঁচকড়ি ভাগলপুরে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত পরিচিত এবং বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে ১৩২০ সালের সাহিত্যেও পাঁচকড়ি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পাঁচকড়ি যখন 'বঙ্গবাসীর পূর্ণাবয়ব সম্পাদক সেই সময়ের একটি ঘটনা দ্বিজেন্দ্রলালের চরিতকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে পাঁচকড়ি এইরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন।:—

"যখন আমি কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী' কাগজের সম্পাদক হইয়া আসি তাহার পর হইতেই দ্বিজুর সহিত সখ্যভাব ক্রমশঃ প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। আমি তখন বঙ্গবাসীর পূর্ণাবয়ব সম্পাদক। দ্বিজু যথারীতি একবার

প্রচার সম্পাদক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজের কাষ সারিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং হ্যাটকোট পরিয়াই আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। সেদিন আমার বাসায় স্বয়ং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতিথি। দ্বিজু আসিয়াই আমাকে নত হইয়া নমস্কার করিল, প্রণাম করিতে গিয়া প্যান্টলুনের একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। একবার আমার ও একবার ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল— 'তোমার এখানে আসিতে ভয় করে, তুমি বঙ্গবাসীর এডিটার—গোঁড়াদের সর্দ্দার।' ইন্দ্রনাথ অমনই মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'হুঁঃ পাতিদের সর্দ্দার। কমলা শ্রীহট্টে জন্মায়, সে কমলার চাষ বাঙ্গালার মাটিতে করিলে তাহা গোঁড়ায় পরিণত হয়। পাঁচু এই দেশেরই; সুতরাং পাতি—বড়জোর যদি শ্রদ্ধা করিয়া বল ত 'কাগজী'

বলিলেও বলিতে পার।" দ্বিজেন্দ্রলাল অমনি হাসিতে হাসিতে বলিল—'আপনার নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেমন? কারণ এমন উপহাস রসিকতা এক ইন্দ্রনাথ ছাড়া আর ত কাহারও নাই।' উত্তরে ইন্দ্রনাথ বলিলেন—'আর তোমাকেও ত চিনিয়াছি। তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল।' কারণ তখন দ্বিজেন্দ্রলালের গোটাকতক হাসির গান বাহির হইয়াছিল। বঙ্গবাসীতে "আমরা বিলেত-ফেরতা ক'ভাই" "রিফর্ম্মড হিন্দুজ" প্রভৃতি কয়েকটি গান আমি তুলিয়া দিয়াছিলাম। ইন্দ্রনাথ তাহা পড়িয়া বাহবা দিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথকে সেদিন রিফর্ম্মড্ হিন্দুজ্ গানটা শুনাইয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেল।"

সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে পাঁচকড়ি সাহিত্যে সহযোগী সাহিত্য এবং অন্যান্য চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সাহিত্যের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পাঁচকড়ির সহিত সমাজপতি মহাশয়ই আমাকে পরিচিত করিয়া দেন। সে ১৩১৮ সালের কথা। তখন আমার পূজনীয় পিতামহদেব, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজী জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সমাজপতি মহাশয়কে 'সাহিত্যে' তাহার পরিচয় দিতে অনুরোধ করি। সমাজপতি মহাশয় পাঁচকড়িকে সেই ভার অর্পণ করেন এবং পাঁচকড়ি উক্ত বৎসরের পৌষ ও চৈত্র সংখ্যায় "বাঙ্গালী জীবন" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমি সমাজপতি মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করি সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের লুপ্তপ্রায় ইংরাজী পুস্তকগুলি বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়। সমাজপতি আমাকেই ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আমার হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি লাঞ্ছিত হয়, আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং উভয়ের পরামর্শে স্থির হইল, আমি ইংরাজী প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া দিব, সমাজপতি পাঁচকড়ি দ্বারা তাহা অনুদিত করাইয়া লইবেন। এই অবধারণ অনুসারে পাঁচকড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের দুইটী প্রবন্ধ অনুবাদিত করিয়া দেন—১৩১৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় "হিন্দু পূজোৎসবের উৎপত্তি কথা" এবং ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "বাঙ্গালীর জনসাধারণের সাহিত্য" প্রকাশিত হয়। অতঃপর সমাজপতি মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমি ১৩২৩।২৪ সালের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আর তিনটী ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত করি। পাঁচকড়ির অনুবাদগুলি অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় তাহা মৌলিক প্রবন্ধ। এ বিষয়ে পাঁচকড়ির নৈপুণ্য "সহযোগী সাহিত্যে"ও দেখিয়াছিলাম। অনেক ইংরাজী শব্দের তিনি এমন বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন যে, তাহাতে ভাষার উপর তাঁহার কতদূর আধিপত্য ছিল তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

চিত্তরঞ্জনের "নারায়ণে" এবং নব প্রকাশিত "বঙ্গবাণী"তে পাঁচকড়ি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পাঁচকড়ির বিলক্ষণ বক্তৃতাশক্তি ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বাঙ্গালা ইংরাজী ও হিন্দী তিন ভাষাতেই অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইদানীং প্রায় সকল সভা সমিতিতেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্যই সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সতেজ ও অতি সুন্দর ছিল এবং তিনি বিষয় অনুসারে সরল অথবা গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করিতে জানিতেন, লোককে হাসাইতে পারিতেন, কাঁদাইতেও পারিতেন। তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল এবং তর্কবিতর্কে তিনি স্বীয় মত অপূর্ব্ব যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে পারিতেন। বক্তৃতাকালে কোনও শ্রোতা রহস্য করিয়া কিছু বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার এরূপ প্রত্যুত্তর দিতেন যে, সভাশুদ্ধ লোক হাসিয়া আকুল হইত।

পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয়, তাঁহার মতস্থৈর্য্য ছিল না। বাস্তবিক আজ তিনি কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ

করিতেছেন। অবশ্য সকলেরই ভ্রান্তি ঘটিতে পারে এবং মত পরিবর্ত্তন করা কোনও লোকের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পাঁচকড়ি প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেন যে তিনি পেটের দায়ে কোনও বিশেষ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। "বঙ্গবাসী"র সম্পাদকরূপে তিনি একভাবে লিখিয়াছেন, বসুমতীর সম্পাদকরূপে তাহার বিপরীত ভাবে লিখিয়াছেন। "বাঙ্গালী"র সম্পাদক রূপে প্রাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, নায়কের সম্পাদকরূপে সন্ধ্যাকালে তাহার বিপরীত লিখিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি স্বাধীনভাবে কিছুই লিখিতে পারেন নাই, সেই জন্য তিনি কিরূপ রাজনীতিক ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। স্যর আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছেন পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। আমরা আশ্চর্য্য হইতাম সাহিত্যিকরূপে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া; "বাঙ্গালীতে" এক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক মতের সমর্থন করিয়াছেন—সেই দিনই "নায়কে" অপর এক প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত পূর্ব্বমতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার এই রচনাকৌশল দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। হায়, আমাদের দেশের যদি এরূপ অবস্থা হইত যে, সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে না হইত, এবং তাঁহারা নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে লোকমত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন! তাহা হইলে পাঁচকড়ির প্রতিভা যথোচিত স্ফূর্ত্তি পাইত এবং আমরা তাঁহার শক্তির যথোচিত পরিচয় পাইতাম!

পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনয়ন করা হয় তাহা এই যে, তিনি সম্পাদকীয় লেখনী সময়ে সময়ে এরূপ অসংযতভাবে ব্যবহার করিতেন যে তাহাতে অনেকে মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহার নামে অনেকবার মানহানির মোকর্দ্দমা হইয়াছে। প্রায়ই তিনি তাঁহার শ্লেষবাণাহত প্রতিপক্ষের রহস্য রসাস্বাদন শক্তি অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। প্রাচীন বাঙ্গালার রসিকতায় যে আধুনিক বাঙ্গালীর মানহানি হইতে পারে ইহা তিনি আইন সত্ত্বেও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। অধিকাংশ স্থলেই এই সকল বিবাদ হাস্য পরিহাসের মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত হইত। পাঁচকড়ি যথার্থই লিখিয়াছিলেন—"যে আজ আমাকে গালাগালি করে, সে কাল আমার হাত ধরিয়া লইয়া যায়। যে আজ আমার নিন্দার দুন্দুভি বাজায়, সে কাল প্রশংসায় সানাইয়ের সুর জমাইবার চেষ্টা করে। তোমাদের নিন্দা স্তুতির মূল্য বুঝিয়া আমার কেবল হাসি পায়। আমাকে চিনিলে না, চিনিতে পারিবেও না।"

পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বলিতে গেলে, জনক-জননীর প্রতি পাঁচকড়ির গভীর ভক্তির উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি তাঁহার পিতা ও মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন এবং যেরূপ প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদের বাৎসল্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, তদনুরূপ তাঁহাদিগকে আজীবন ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন। গত আষাঢ় মাসে পাঁচকড়ি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং অনেক ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতে থাকে। তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিতেছিল কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা জননীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে না। এরূপ ঘটনা ঘটিলে তাঁহার স্নেহময় জনক ও জননীর মনে কতবড় আঘাত লাগিবে তাহা তিনি মনে ভাবিতেও কষ্ট পাইতেন। তিনি বলিতেন, 'বাহিরে আমাকে তোমরা যে রকমই দেখ, গৃহে আমি পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শিশুমাত্র।' হায়, সেই পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ দম্পতীর কথা স্মরণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পাঁচকড়ি দুইটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠটি পুলিসকোর্টের উকীল হইয়াছেন। আমরা ইঁহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি এবং পাঁচকড়ির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বৃটিশ নৌ-যুদ্ধ বিভাগে প্রথম বাঙ্গালী

এতৎসহ যে যুবকের প্রতিকৃতি আমরা প্রকাশ করিলাম, তিনি বৃটিশ নৌ-যুদ্ধ বিভাগে প্রবেশ করিয়া, বিগত য়ুরোপীয় মহাসমর কালে (১৯১৮ খৃঃ) একটি রণতরীর দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্ট (2nd Lieutenant) পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেন; ইহার পিতা ছিলেন জয়পুর আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ৺উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়।

লেফটেনাণ্ট অমর সেন

সমুদ্রের প্রতি বাল্যকাল হইতেই অমরনাথের টান ছিল। বাল্যকালেই, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, ইনি পলাইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছিলেন। পঠদ্দশায় "রবিন্সন ক্রুসো," "মাষ্টারম্যান রেডি" প্রভৃতি সমুদ্র যাত্রার ইংরাজি বহিগুলি ইঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল।

অমরনাথ প্রথমে জয়পুর মিশন স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। তথায় Rev. Dr. Low সাহেবের নিকট ইংরাজি ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিবার সুযোগ পান। পরে কলিকাতা নেবুতলা হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস হইয়া, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইং ১৯১৪ সাল "বয় স্কাউট" দলে প্রবেশ করিয়া, য়ুরোপীয়ন এসোসিয়েসন কর্তৃক বাছাই হইয়া, ইনিই একমাত্র বাঙ্গালী King's Scout 5th Troup এ Patrol leader এর পদ পান। ইঁহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া "স্কাউট্ মাষ্টার" স্যর ফ্রান্সিস কার্টার সুপারিশ করিয়া ইহাকে রণতরীর দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্ট পদ দেওয়াইয়া য়ুরোপে পাঠাইয়া দেন। এই রণতরী ইংরাজ উপনিবেশগুলি হইতে সৈন্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফ্রান্সে লইয়া যাইত। ১৮১৯ সালে ইনি রেঙ্গুন, জাভা, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও, আন্দামান দ্বীপে ভ্রমন করিয়াছিলেন। চায়না জাপান, অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতিও ইনি পর্য্যটন করিয়াছেন—অথচ ইঁহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। এ বৎসর আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইনি বাণিজ্য-শাস্ত্রে উপাধি (B. Com.) ও গাউন লাভ করিয়াছেন।

রূপের ফাঁদ

(গল্প)

১

অমরদের বাটী কলকাতায়, সে অবিবাহিত এবং বিবাহ-নিবারণী সভার সম্পাদক।

নভেল নাটকে যেরূপ আদর্শ চরিত্র দেখা যায়, অমরেরও ইচ্ছা নিজের চরিত্র সেই ভাবে গঠন করা। প্রকৃতপক্ষে তার চরিত্রও খুব ভাল। বয়স তার পঁচিশ। তারা ব্রাহ্মণ।

মঠ মন্দিরে যাতায়াত, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যোগদান, গীতা পাঠ এবং সরল সাদাসিধা চাল চলনে অমরকে সকলেই ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। অমরের পিতা বিষয়ী লোক—বড় মানুষ, তিনি এ সব দেখতে পারেন না।

অমরের বন্ধু পূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বিবাহিত এবং বিবাহের খুব পক্ষপাতী। পূর্ণ প্রত্যহ বৈকালে অমরদের বাটী চা খাইতে আসিত এবং সেই সময় উভয় বন্ধুতে বিবাহ লইয়া খুব তর্কবিতর্ক হইত। কেহ কারও সঙ্গে পারিয়া উঠিত না, উভয়েই শাস্ত্রাদির প্রমাণ দ্বারা নিজনিজ মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিত।

অমরের প্রধান অবলম্বন ছিল, শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ। একদিন বৈকালে উভয় বন্ধুতে চা খাইতেছে, পূর্ণ অমরকে কহিল, "তুমি কি কখনও বিয়ে করবে না?"

"কখনও না, দেখে নিও।"

"ওহে, কোনো বিষয়ে দর্প করতে নেই।"

"আমি দর্প করেই বলছি—দেখো।"

"আচ্ছা" বলিয়া সে দিন পূর্ণ প্রস্থান করিল।

২

অমরদের পাড়ায় তার পণ্ডিত মশায় উঠিয়া আসিয়াছেন।

আজ রবিবার, পণ্ডিত মশায়ের বাটীতে অমরের নিমন্ত্রণ। বেলা এগারটা বাজিয়াছে, পণ্ডিত মশায়ের বাহিরের বৈঠক খানায় বসিয়া অমর সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছে।

পণ্ডিত মশায় গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া বাটীতে প্রবেশ করিয়াই অমরকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "এই যে বাবা, এসেছ? তা বড় বেলা হ'য়ে গিয়েছে,—জল টল খেয়েছ—না?"

"কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন? আমি জল খেয়ে এসেছি। আর, বেলাতে খাওয়া আমার অভ্যাস; আপনি যান, কাপড় ছাড়ুন গে।"

"না না তা কি হয় বাবা? আগে একটু জল খাও।" বলিয়া পণ্ডিত মশায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও একটু পরেই বাহিরে আসিয়া অমরকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

মেঝেতে একখানি সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা, সম্মুখে ঝক্‌ঝকে রেকাবিতে মিষ্টান্ন ও পার্শ্বে এক গ্লাস্ জল।

অমর আসনে উপবেশন করিয়া সন্দেশবংশ ধ্বংস করিল। সে যখন হাত ধুইয়া রুমালে হাত মুছিতেছে সেই সময় পণ্ডিত মশায়-"বীণু মা!" পাণ দিয়ে যাও।" এই কথা বলিতেই সুন্দরী একটী বালিকা ছোট ডিবায় করিয়া টেবিলের উপর কয়েকটী পাণ রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় অমর একবার বালিকার মুখের দিকে চাহিল। বালিকাও মুহূর্ত্তে চাহিয়াই চক্ষু অবনত করিল। তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। মেয়েটী পণ্ডিত মশায়ের কন্যা, নাম বীণাপাণি, ডাকনাম বীণু।

অমর ভাবিতে লাগিল—আহা কি সুন্দর, কি কমনীয়, কি কোমল, কি মনোহর! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বাহিরের বৈঠক খানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বীণু তখন মনে মনে ভাবতেছে—আমারও বর বোধ হয় এই রকম!

পণ্ডিত মশায়ও বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ কথা ও কথা সে কথার পর বলিলেন, "বড়ই বিপদে পড়েছি বাবা, মেয়েটিকে নিয়ে; আমাদের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ঘরে এত বড় মেয়ে তো আর রাখা যায় না। শীঘ্র বিবাহ না দিলে লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হয়ে উঠেছে।"

"কেন পণ্ডিত মশায়, কি জন্যে এখনও বিলম্ব হচ্ছে?"

"আর কি জন্তে বাবা! তোমার কাছে বলতে আর বাধা কি, সবই তো জান—পঞ্চাশটী টাকা মাহিনা পাই, খেতে পরতে চার পাঁচটী, কখনও তো কিছু জমাতে পারিনি!" বলিয়া মুখ নীচু করিয়া চুপ করিলেন।

একটু পরেই অমর কহিল—"কত টাকার দরকার পণ্ডিত মশায়?"

হেমবাবু। আমাদের সমান ঘরে না হলে, বিয়ে হতেই পারে না।

"তা বাবা, সবশুদ্ধ প্রায় দেড় হাজার টাকা খরচ।"

অমর বলিল—"পাত্র ঠিক হয়েছে কি?"

"পাত্র আর ঠিক কি বাবা? হাটে জিনিষ কেনা-বেচার মত পাত্র তো কেনা বেচা হয়। টাকা পেলেই দরদস্তুর করি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তা বটে।"

"বলতে পারিনে বাবা—তবে এ সময় যদি আমায় কিছু টাকা ঋণ স্বরূপ দিতে পার, আমি চিরদিন—"

"আমায় ও কথা বলে' অপরাধী করবেন না। আপনি পাত্র দেখতে আরম্ভ করুন।"

"বাবা, অমর, তুমি আজ যে ভরসা দিলে তা আজ পর্য্যন্ত আমার কোনও আত্মীয় দেয় নি!" করুণ কণ্ঠে পণ্ডিত মহাশয় এই কথা কয়টী কহিলেন।

ক্রমে আহার প্রস্তুতের সংবাদ আসিল। উভয়ে বাটীর অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আলিপনা দেওয়া মেঝের উপর অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ থালা ও চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন রকমের পাঁচ ছয়টী বাটীতে দাল ঝোল সুক্তা অম্বল পরমান্ন প্রভৃতি সজ্জিত। একখানি কার্পেটের আসন পাতা তাহাতে লেখা রহিয়াছে "বসুন"।

অমর আহারে বসিল। পণ্ডিত মশায় সম্মুখে বসিয়া এটা খাও ওটা খাও বলিয়া অমরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বীণা মাঝে মাঝে আসিয়া পরিবেষণ করিতে লাগিল।

কোণে আসিয়া কহিয়া গেল—"এর আর কিন্তু কি? বিবাহ করায় দোষ কি?"

অমর এই রূপ চিন্তা করিতেছে, পণ্ডিত মশায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমর কহিল, "পণ্ডিত মশায়, আমিও পাত্রের অনুসন্ধানে রইলুম, আপনিও একটী ভাল পাত্রের সন্ধান করুন। টাকাকড়ির জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না—সে যা হয় হবে, তার জন্যে আট্‌কাবে না।"

"আমি আর কি বলব বাবা? তুমি ত সবই দেখে শুনে গেলে!"

"আচ্ছা আপনার কন্যার ফটো আছে কি? জানেন ত আজকালকার একটা ফ্যাসান দাঁড়িয়েছে, লোকে আগে ফটো দেখতে চায়।"

"হ্যাঁ বাবা আছে। মাস দুই হল তুলিয়েছি। এনে দিই।"

পণ্ডিতমশায় গৃহমধ্যে যাইয়া বীণার ফটোখানি আনিয়া অমরের হাতে

পাজি নচ্ছার, আজকাল বুঝি ক্লাবে এই সব হয়?

আহারান্তে অমর বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। পণ্ডিতমশায় "একটু বস বাবা আসি"—বলিয়া আহারের জন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমর বসিয়া ভাবিতে লাগিল —"ওঃ—পণ্ডিত মশায় কি বিপদেই পড়েছেন! শুধু পণ্ডিত মশায় কেন, আজ সারা বাঙ্গলা দেশেরই এই অবস্থা। কেউ কারও কথা ভাবে না—যে যার নিজের গণ্ডা বুঝে নেবার জন্যে আকুল; তা যেমন করে হোক। সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, বিচার নেই বিবেচনা নেই। এখন কোথায় একটী ভাল পাত্র পাওয়া যায়? দেখা যাক চেষ্টা করে। আচ্ছা আমি যদি—ছিঃ ছিঃ!—আমি যে বিয়ে করব না প্রতিজ্ঞা করেছি।" কিন্তু অমরের সংযমী চিত্তে একটু ধাক্কা লাগিয়াছিল। কে যেন লুকাইয়া মনের

দিলেন। অমর পণ্ডিত মশায়ের অলক্ষ্যে চকিতে একবার ফটোখানি দেখিয়া লইয়া, একটী কাগজে মুড়িয়া পকেটে রাখিয়া, "আজ আসি পণ্ডিত মশায়" বলিয়া প্রণাম করিল।

"এস বাবা এস, দীর্ঘজীবি হও।"

অমর চলিয়া গেল। বীণাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। পথে যাইতে যাইতে পকেট হইতে ফটোখানি বাহির করিয়া একবার দেখিল।

পণ্ডিত মশায় গৃহিনীকে বলিলেন, "অনেক ছেলে দেখেছি বটে, কিন্তু অল্প বয়সে এত বুদ্ধি বিবেচনা, এমন উদার, উচ্চ হৃদয় আর কাউকে বড় দেখিনি।"

"আহা, এমন একটী ছেলে যদি জামাই হয়!"

"এমন বরাত কি হবে।"

বীণা সেই সময় রান্নাঘর হইতে এই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া ভাবিতেছিল—বাবার এই ছাত্রটী বেশ, এর সঙ্গে বিয়ে—

গৃহিণী ডাকিলেন—"বীণা!"

"মা!"

কোকিলটার জল ফুরিয়ে গেছে একটু জল দে।"

"দিই, মা!" একটা বাটী করিয়া জল লইয়া খাঁচাটী খুলিতেই পাখীটা ডাকিয়া উঠিল—কু—কু—কু।

পাশে অন্য একটা খাঁচায় ময়না ছিল, সে কহিল, খুকীর বিয়ে হোক।

বীণা তাহাকেও একটু জল দিল।

কোকিলটা জল খাইয়া গলা শানাইয়া আবার ডাকিল কুহু, কুহু, কুহু।

৩

বৈকাল পাঁচটা, অমর আজ আর মাঠে বেড়াইতে যায় নাই। বাটীতে একটি চেয়ারে বসিয়া বীণার বিবাহের কথা চিন্তা করিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে তাহার ফটোখানি দেখিতেছিল।

কি সুন্দর মুখখানি, কি কমনীয়, কি সরলতাপূর্ণ! আচ্ছা আমি যদি—ছিঃ ছিঃ লোকে কি বলবে, আমি বিবাহ নিবারণী সভার সম্পাদক, আর আমিই!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, পুনরায় ছবিখানি লইয়া দেখিতে দেখিতে, অমর যেন তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেল। তার বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই ছবি জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। যেন তার সঙ্গে অমরের বিবাহ হইতেছে, যেন জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে নির্জ্জনকক্ষে বসিয়া উভয়ে উভয়ে রূপসুধা পান করিতেছে।

এমন সময় পূর্ণ পা টিপিয়া টিপিয়া অমরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমরের অজ্ঞাতে যেন তাহার হাত, বীণার ফটোখানি তার মুখের নিকট লইয়া আসিল। অমর সেই ফটোর উপর চুম্বন করিতে যাইতেছে, এমন সময় পূর্ণ কহিল, "অ্যাঁ—এ কি প্রভু শঙ্করাচার্য্য!"

অমরের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। তার মনে হইল সে যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে ছিল।

পূর্ণকে দেখিয়া অমর টেবিলের উপর হাত রাখিয়া লজ্জায় মুখ লুকাইল।

পূর্ণর কাছে অমর কোন কথা লুকাইল না, কিন্তু তার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল পিতা; এ বিবাহে রাজী হইবেন কি না! পূর্ণ কহিল, "তুমি কেন ভাবছ অমর! আমি তাঁকে রাজী করচি, পূর্ণর ভারি আমোদ যে অমর বিবাহ করিব।

ওদিকে পণ্ডিত মশায় কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত, চারিদিকে পাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

আমাকে এ অন্যায় তিরস্কার

হঠাৎ একদিন পথে পণ্ডিত মশায়ের সহিত পূর্ণর সাক্ষাৎ হইল। পূর্ণ কথার আভাসে জানাইল—"যদি আপনি অমরের পিতাকে রাজী করাতে পারেন, তাহা হইলে অমরের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ হতে পারে।"

"আমার অদৃষ্টে কি তা হবে বাবা? আর অমরের পিতার কাছে একথা তুলতেই আমার সাহস হয় না। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, স্কুলের পণ্ডিত, তিনি বিষয়ী বড়লোক—তা বাবা তুমি যদি একটু—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও চেষ্টা করছি। ক'দিনই তাঁর কাছে যাতায়াত করছি কিন্তু বিয়ের কথা তোলবার বেশ সুবিধা করে উঠতে পারি নি। তবে শীঘ্রই কথাটা তুলব।"

"যদিই তিনি বিবাহ দিতে রাজী হন, দেনা পাওনায় কি আমি পেরে উঠব।"

"অমর যখন আপনাকে ভরসা দিয়েছে সেজন্য আপনি ভাবছেন কেন? নিশ্চিন্ত থাকুন।"

অমরের পিতা বৈকালে একটী বেঞ্চে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন, পূর্ণ আসিয়া উপস্থিত।

"হ্যাঁগ পূর্ণ, তুমি রোজই এস আর চলে যাও, কিছু কথা আছে কি?"

ঐ মেয়েটাকে দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকাকড়ি বার করে নিচ্ছে

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পূর্ণ কহিল—"আজ্ঞে 'আজ্ঞে' অমরের বিয়ের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতুম।"

"বেশ, জিজ্ঞাসা কর।"

পূর্ণ, পণ্ডিত মশায়ের কন্যার সহিত অমরের বিবাহের কথা তুলিল।

অমরের পিতা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন,—"না, তা কি ক'রে হয় বাবা? আমাদের সমান ঘর না হ'লে বিয়ে হ'তেই পারে না। সমাজে আমাদের মান সম্ভ্রমটা তো রক্ষা ক'রতে হ'বে।"

পূর্ণ আর কোন কথা না কহিয়া সেদিন প্রস্থান করিল। অমরের পিতা ঘোর বিষয়ী লোক, দৃঢ়চেতা, কাহারও কথায় ভিজিবার লোক নহেন।

পূর্ণর মুখে পণ্ডিত মশায় নিরাশার সংবাদ পাইয়া একেবারে দমিয়া গেলেন। অমর কিন্তু দমিল না। বরং একটু দৃঢ়স্বরে কহিল—"ভাই পূর্ণ! যদি বিয়ে করি, এইখানেই বিয়ে ক'রব। নচেৎ ক'রবই না।"

অমরের পিতা পূর্ণর মুখে এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে অমরের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে অমর পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যার প্রতি বিশেষ রকম আকৃষ্ট হইয়াছে।

একদিন বৈকালে অমর তাহাদের ক্লাব রুমের বৈঠকখানায় হারমনিয়মে গলা সাধিতেছে - এমন সময় সেই খান দিয়া অমরের পিতা যাইতেছিলেন। তিনি পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর থাকিতে না পারিয়া, একেবারে

যদু বাবু একখানি পুরাতন পোষ্টকার্ড বাহির করিলেন

সেখানে উপস্থিত হইয়া "পাজি নচ্ছার, আজ কাল বুঝি ক্লাবে ব'সে এই সব হয়!" বলিয়া অনেক ভর্ৎসনা করিয়া চলিয়া গেলেন। অমর একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল—আমাকে এ অকারণ তিরস্কার!

৪

প্রায় কুড়িদিন হইল পণ্ডিত মশায় টাইফয়েড্ জ্বরে শয্যাগত। ডাক্তারেরাও বেশী ভরসা দিতেছেন না। অমর ও পূর্ণ প্রাণ দিয়া পণ্ডিত মশায়ের সেবা শুশ্রূষা করিতেছে।

বীণা দিবারাত্রি পিতার শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইতেছে, টেম্পারেচর লইতেছে ও কখন কিরূপ থাকেন লিখিয়া রাখিতেছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পণ্ডিত মশায়ের শিয়রে বীণা বসিয়া বাতাস করিতেছে। অমর চেয়ারে বসিয়া আছে।

ক্ষীণ কণ্ঠে পণ্ডিত মশায় ডাকিলেন "বাবা। অমর!"

"কি বলছেন পণ্ডিত মশায়?"

"আমি আর এ যাত্রা—" বলিয়া হাঁফাইয়া উঠিলেন।

"কেন অমন কচ্ছেন?

বীণা বলিল "বাবা! একটু জল দেবো?" পণ্ডিত মশায় সম্মতি সূচক মাথা নাড়িলেন। বীণা জল দিয়া বলিল, "বাবা! কিছু কষ্ট হচ্ছে?"

কন্যার দিকে একবার চাহিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইলেন "না।"

এ কয়দিন অমরের নিকট বীণার আর ততট লজ্জা নাই। বিপদের সময় প্রায় তা থাকে না; বিশেষতঃ যিনি এতটা হিতৈষী, আত্মীয়ের মত তাঁর কাছে লজ্জা করার কথা নহে। যাকিছু খরচ পত্র এখন অমরই দিতেছে।

বীণার প্রতি অমরের যে স্নেহ ভালবাসা ভাসা ভাসা ভাবে হইয়াছিল, এখন তাহা বেশ দৃঢ় ভাবে বসিয়াছে। বীণাকে ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে এখন অসাধ্য।

পণ্ডিত মশায়ের বাটীওয়ালা যদুবাবু একটী বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের মত। ভয়ানক মামলাবাজ, কুটিল, মুখে সর্ব্বদা হাসি ও কথায় মধু মিশ্রিত, অন্তরে বিষের সমুদ্র।

বাটীওয়ালার ইচ্ছা, তাঁর পুত্রের সঙ্গে বীণার বিবাহ হয়। এ সম্বন্ধে মৌখিক কথাবার্ত্তা ভিন্ন পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে তাঁহার দুই এক খানি পত্র ব্যবহারও হইয়াছিল।

২৪।২৫ দিন কাটিয়া যাইবার পর, পণ্ডিত মশায়ের

জ্বর ছাড়িল। ডাক্তারেরা বলিলেন তাঁকে মধুপুর বৈদ্যনাথ অঞ্চলে দিন কতক চেঞ্জে যাইতে হইবে। কিন্তু টাকা কড়ি তো হাতে নাই।

বীণার মা ঐ কথা শুনিয়া অমরকে জানাইলেন, "বাবা! আর তো কিছুই নেই, তবে বীণার বিয়ের জন্যে দুই একখানা গহনা গড়ান আছে। তাই বিক্রি করে বা বাঁধা দিয়েই এখন কায চলুক, তা ছাড়া উপায় কি?"

অমর বলিল, "আপনাকে সে জন্যে ভাবতে হ'বে না মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

পণ্ডিত গৃহিণীর চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—"বাবা! আমার ছেলে নেই, তুমিই আমার বড় ছেলে।"

বীণারও চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে তখন ভাবিতেছিল—ইনি কি দেবতা?

"বাড়ীতে কে আছেন" বলিয়া বাড়ীওয়ালা মহাশয় প্রবেশ করিলেন। বীণা ও তাহার মাতা কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বাড়ীওয়ালা সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

ক্ষীণ কণ্ঠে পণ্ডিত মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি বাঁচব যদুবাবু?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—সে কি কথা পণ্ডিত মশায়? ভাল হ'য়ে উঠে মেয়ের বিয়ে দেবেন। মা লক্ষ্মীকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। আহা, আপনার কত সাধ যে আমার ছেলে আপনার জামাতা হবে।"

অমরের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। বীণাও আড়াল হইতে সব শুনিতেছিল-একবার হঠাৎ যেন তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। পণ্ডিত গৃহিণী আশ্চর্য্য হইলেন; আর রুগ্ন দুর্ব্বল ক্ষীণকায় পণ্ডিত মশায় একটু মৃদু হাসিয়া, যদু বাবুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অমরের দিকে চাহিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলেন ও তার হাত খানি নিজের হাতে ধরিয়া বুকের উপর রাখিয়া চাপিয়া রহিলেন। অমর বিছানাতেই বসিল।

যদুবাবু বলিলেন, "তবে আসি তা হলে। সেরেই উঠেছেন আর ভয় নেই। অমর বাবু! তুমিই তো এখন এদের বাড়ীর কর্ত্তা, তোমাকেই বলি কিছু মনে কোরো না বাবা—এক মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে।"

অমর বলিল, "যে আজ্ঞে, আজই নিয়ে যান না।"

"না না ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। কাল সকালেই দিও। কাল আবার একটা মকদ্দমা আছে, টাকাটা পেলেই কাযে লেগে যাবে!" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অমরের পিতাকে যদুনাথ বাবু বেশ উত্তম রূপেই সমস্ত শুনাইলেন। ইসারা ইঙ্গিতে এ ভাবও প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না যে, বোধ হয় অমরের চরিত্র আর ভাল নাই। অমরের পিতা ক্রমেই পুত্রের উপর বিশেষ রূপে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একদিন স্পষ্টই বলিলেন "তুমি যদি পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীতে যাও, এ বাড়ীতে আর এসো না।"

দুই একদিন পরেই পণ্ডিত মশায় দেওঘর চলিয়া গেলেন। খরচপত্র পূর্ব্ব মারফৎ অমর সমস্তই পাঠাইয়া দিয়াছিল।

৫

অমর এ কথা বুঝিতে পারিয়াছে যে, তার পিতাকে তার বিরুদ্ধে এতটা উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে, যদুনাথ বাবু।

বৈকাল বেলা অমর মাঠের দিকে যাইতেছে, পথে যদুনাথবাবুর সহিত তাঁর বাটীর সম্মুখেই দেখা হইল। যদুবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তোমরা বাবা, আজকালকার শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ছেলে। তোমরাও পুরোণো পাকা পণ্ডিতী চাল কি ধর্তে পার? ঐ মেয়েটাকে দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা কড়ি বার করে নিচ্ছে।"

এই অপ্রত্যাশিত কথা কয়টা শুনিয়া অমর ঘৃণায় ও লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "এ সব কথা দয়া করে আর বলবেন না।"

"না বাবা কিছু মনে কোরো না। আমি বুড়ো হয়েছি, অনেক দেখলুম, অনেক শুনলুম, তাই এ কথা বলা। তুমি যে পণ্ডিতের মেয়েটীকে ভালবেসেছ, তা আমি

বুঝতে পেরেছি। তবে কি জান, পণ্ডিত মশায় অনেকদিন পূর্ব্বে হ'তেই হাতে কলমে আমাকে লিখে দিয়েছেন যে, ওঁর মেয়ের বিয়ে আমাদের "নগার" সঙ্গেই দেবেন। তা যদি না দেন, আমি আইনতঃ তাঁকে বিয়ে দিতে বাধ্য করাব, আমি তার জন্মে আর পাঁচটা ভাল ঘরের সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছি। যাই হোক বাবা, বুঝে কায কোরো।" অমর দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল।

"নগা" ওরফে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদুবাবুর গুণধর পুত্র। পাড়ার থিয়েটার ক্লাবের ম্যানেজার, ছোট-বড় চুল ছাঁটা, মেজাজ সদাই ১০৫ ডিগ্রী গরম। তিনি আস্তে কথা ক'ন না পাছে লোকে ভাল অ্যাক্টার না বলে। বাড়ীতে কথাবার্ত্তা থিয়েটারী টোনেই কহিয়া থাকেন। নিমন্ত্রণের নাম করিয়া পাঁচটা ভাল মন্দ জায়গায় যাতায়াতও করেন।

মাঠে পূর্ণর সঙ্গে দেখা হইলে, অমর সমস্ত কহিল। পূর্ণ কহিল "দেখ, এখন সেই চিঠিখানা বুড়ো যদু মুখুজ্যের কাছ থেকে যে কোন রকমে হোক বার করে নিতে হ'বে, কিন্তু বুড়ো ব্যাটা ভারি ঝানু! বুড়ো আমায় একটু ভালবাসে, মাঝে মাঝে ঔষধ পত্র টা দি, দেখা যাক, কি করতে পারি।"

পরদিন প্রাতে পূর্ণ যদুবাবুর বাটীতে উপস্থিত। যদুবাবু বেতো রোগী, বাযেই ডাক্তারকে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা :—"এস বাবা এস, বস। আমার বরাত, তোমরা দেশের রত্ন আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে বাবা!"—বলিয়া পূর্ণকে বসাইলেন।

পূর্ণ বৃদ্ধকে নানা রকমে প্রশংসা করিয়া, একথা ওকথা সে কথার পর বলিল, "নগেনের বিয়ের কি হ'ল, মুখুজ্যে মশায়?" "এই বাবা, তোমাদেরই পণ্ডিত মশায়ের অসুখের জন্মে কথাটা চাপা আছে; নয়ত লেখাপড়ায় কাগজে কলমে এক রকম সবই ঠিক হ'য়ে আছে।"

"তাই নাকি?"

"এই এস না বাবা, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।" কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বৃদ্ধ একটী চৌকা ধরণের চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ্ আনিয়া তার মধ্য হইতে এটা ওটা সেটা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "এই দেখ"—বলিয়া বৃদ্ধ একখানি পুরাতন পোষ্টকার্ড বহির করিয়া পূর্ণর হাতে দিলেন।

পূর্ণ পত্রখানি পাঠ করিয়াই বলিল, "বাঃ! এই তো সব ঠিকঠাকই হ'য়ে আছে। তবে আর পণ্ডিত মশায়ের চিন্তা কি?"

এই সময় পাড়ার বিনোদ চাটুয্যে মশায় "এ রকম অত্যাচার তো আর সহ্য করা যায় না! এবার যদি মুখুজ্যে মশায় একটা বিহিত না করেন, আমরা এর দস্তুর মত ষ্টেপ নোবো।"—বলিতে বলিতে যদুবাবুর সম্মুখে মুখ লাল করিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কি হয়েছে বিনোদ বাবু?"

"আর মশায় আপনার ছেলের জন্মে তো—"

"ছেলে তোমার কোন্ বাপ চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছে?"—বলিয়া যদুনাথের গুণ্ডা দুলাল শ্রীমান্ নগেন্দ্র নাথ আস্তিন গুটাইয়া উপস্থিত হইল।

সেই অবসরে পূর্ণ, পোষ্টকার্ডখানি লইয়া বৃদ্ধ যদুনাথের অলক্ষ্যে সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

চাটুয্যে মশায় অপমানিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

৬

পণ্ডিত মশায় এখন দেওঘরে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সবল। দুইবেলা প্রায় ২।৩ মাইল ভ্রমণ করিতে পারেন, ক্ষুধাও বেশ হইয়াছে। বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন।

হঠাৎ একদিন যদুবাবু সপরিবারে দেওঘরে পণ্ডিত মশায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত মশায় মনে মনে আশ্চর্য্য হইলেন এবং যতটা সম্ভব আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

একদিন পণ্ডিত মশায়ের বাসায় থাকিয়া নিকটেই ছোট বাটী দেখিয়া যদুবাবু সপরিবারে সেই খানেই

চলিয়া গেলেন। তাঁর আসিবার কারণ পুত্রের বিবাহ দেওয়া। পুত্র এখন ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী। বিনোদ চাটুয্যে মশায় ফরিয়াদী, তিনি নালিশ করিয়াছেন, সত্বরই মোকদ্দমা আরম্ভ হইবে।

যদুবাবু বিয়ে দিতে আসিয়াছেন জানিয়া পণ্ডিত মশায় কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পূর্ণকে পত্র লিখিলেন।

যদুবাবু প্রত্যহ আসিয়া পণ্ডিত মশায়কে বিশেষ আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। এমন কি একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া সকলকে আহারাদি করাইলেন, এবং এক সপ্তাহ পরে একটী ভাল বিবাহের দিনের কথা উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া কৃতার্থ করিবেন, তাহাও জানাইলেন।

বীণার মা এই সমস্ত শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত মশায় এ বিষয়ে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পূর্ণকে পুনরায় বিস্তারিত লিখিয়া এক পত্র দিলেন।

বীণা মনে মনে বাবা বৈদ্যনাথের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে বাবা বৈদ্যনাথ! এ বিবাহ যেন না হয়।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে মোকদ্দমা উঠিল; কিন্তু আসামী ফেরার। ওয়ারেণ্ট বাহির হইল।

অমর ও পূর্ণ সমস্ত সংবাদ রাখিতেছিল।

এক সপ্তাহের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া বাক্স বিছানা বাঁধিয়া দুই বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

আজ বিবাহের দিন। পণ্ডিত মশায়ের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যদুবাবু সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া ফেলিয়াছেন, কন্যাপক্ষের আবশ্যক দ্রব্যাদি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া দিয়াছেন।

৭

অমর ও পূর্ণ দেওঘরে তাহাদের এক বন্ধুর বাটীতে যাইয়া উঠিল। বন্ধুটীর নাম পরেশ বাবু, তিনি দেওঘরের ডাক্তার। সেখানে তাঁর খুব প্রতিষ্ঠা সম্মান, প্রতিপত্তি।

পূর্ণ পণ্ডিত মশায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বিবাহের আয়োজন সমস্ত ঠিক। পণ্ডিত মশায়ের আজ একটু জ্বর হইয়াছে। তিনি শুইয়া আছেন।

অমর ও পূর্ণর আগমন সংবাদ, যদুবাবু অনেকক্ষণ পাইয়াছেন। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা, কি ক'রে বিয়েটা হ'য়ে যায়।

শুভদিনে শুভক্ষণে পুলিসও ওয়ারেণ্ট লইয়া উপস্থিত। নগেন বাটীর মধ্যে ছিল, পুলিস আসিয়াছে শুনিয়া এক কাপড়েই জাঁতি হাতে পলায়ন করিল। যদুবাবুর মুখ এতটুকু হইয়া গেল।

রাত্রি আটটায় লগ্ন। উভয় পক্ষের পুরোহিত উপস্থিত, বর কোথায়?

অমরকে বর সাজাইয়া পূর্ণ ও তাহার ডাক্তার বন্ধু এবং স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক পণ্ডিত মশায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত মশাই আনন্দে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। শাঁক বাজিয়া উঠিল, একটা আনন্দের কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

যদুবাবু আর কি বলিয়া বাধা দেবেন? তিনি নিজের বাসায় বসিয়া রহিলেন। অনেকেই ডাকিতে গেল, তিনি দেখা করিলেন না। সেই রাত্রি শেষে ভোরের ট্রেণে সপরিবারে তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। পুত্র নগেন্দ্রনাথ তার পূর্ব্বেই চন্দননগরে পলায়ন করিয়াছিল। যদুবাবু পুত্রের জন্য একটুও চিন্তিত হইলেন না, কারণ তাঁহার পুত্রকে তিনি চিনিতেন।

বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় অমরের সহিত বীণার বিবাহ হইয়া গেল। আর কেহ না হোক, দুইটী প্রাণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল,—অমর ও বীণাপাণি।

ডাক্তার বন্ধু ও দুই চারিজন স্থানীয় ভদ্রলোক দুপিঠ-ভাজাতেও বঞ্চিত হইলেন না; তার সঙ্গে বৈদ্যনাথের বিখ্যাত পেঁড়া ও দধি বিশেষ ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল।

২।৩ দিন পরে সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অমরের পিতা পূর্ব্বেই সব শুনিয়াছিলেন। তিনি আর

।ক· বলিবেন, সস্নেহে পুত্র পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অংরের মা দম্পতী যুগলকে আদর করিয়া আশীর্ব্বাদ ও চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "এস মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এস।"

অমর বিবাহ-নিবারণী সভার সম্পাদক পদ ত্যাগ করিয়া, কন্যাদায় উদ্ধারক সম্প্রদায় নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছে।

৺কালীপ্রসন্ন পাইন।

শিবা বাওনী

হিন্দীর প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—"সূর সূর, তুলসী শশী উড়গন কেশব দাস।"—কবি সুরদাস সূর্য্য স্বরূপ, তুলসীদাস চন্দ্রতুল্য, কেশবদাস নক্ষত্র—অন্যান্য কবিদের খদ্যোতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দী কবিদের মধ্যে ভূষণ য খদ্যোৎ ছিলেন না, সে কথা তাঁহার কাব্য পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। ভূষণ যে একজন মহাকবি একথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়। তাঁহার কবিতা পাঠকালে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। শক্তির একনিষ্ঠ উপাসক ভূষণের কবিতা বীর রসে পূর্ণ।

কানপুর জেলার ত্রিবিক্রমপুরে ১৬৯২ বিক্রমাব্দে ভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পণ্ডিত রত্নাকর তিওয়ারী ছিল। ইঁহারা চারি ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ চিন্তামণি, ভূষণ মধ্যম, মতিরাম ও নীলকণ্ঠ কনিষ্ঠ। ইঁহারা চারিজনেই প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। প্রথমে ভূষণ কিছুদিন চিত্রকূটাধিপতি রুদ্ররাম সোলঙ্কীর সভা কবি ছিলেন এবং চিত্রকূটপতিই ইঁহাকে ভূষণ উপাধি দিয়াছিলেন। "শিবরাজ ভূষণ" কাব্যে কবিভূষণ স্বয়ং লিখিয়াছেন—"কুল সুলঙ্কী চিত্রকূটপতি সাহসশীলসমুদ্র

কবি ভূষণ পদবী দঈ, হৃদয়রামসুত রুদ্র॥"

ইঁহার প্রকৃত নাম আজও জানা যায় নাই।

১৭২৪ বিক্রমাব্দে ভূষণ শিবাজীর নিকট গিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী ইঁহার কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে ইঁহাকে সভাকবির পদে বরণ করেন। "শিবরাজভূষণ" ও "শিবা বাওনী" নামক শিবাজীর প্রশংসাসূচক দুইখানি কাব্য ইনি প্রণয়ন করেন। শিবা বাওনীতে ৫২টি খণ্ড কবিতা সংগৃহীত হওয়ায় ইহা বাওনী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শিবা বাওনীর ছন্দ এবং ভাষা, শিবরাজ ভূষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহোবা অধীশ্বর ছত্রসাল, কুমায়ুঁরাজ ও বুন্দী রাজসভাতেও ভূষণ বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

১৭৩৭ বিক্রমাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পর ভূষণ স্বদেশে ফিরিয়া যান, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বগ্রামেই ছিলেন। আজও ইঁহার বংশধরগণ মধ্য প্রদেশে স্থানে স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট ভূষণের স্বহস্ত লিখিত কবিতা পুঁথিও আছে। "বৃন্দ সতস." রচয়িতা কবি বৃন্দ ইঁহারই বংশধর, কবি শীতলও ইঁহার বংশজ ছিলেন বলিয়া শু। যায়।

ভূষণ স্পষ্ট বক্তা ও নির্ভীক কবি ছিলেন। ইঁহার সমস্ত কবিতা বীর রসে পরিপূর্ণ। এ সকল কবিতা পাঠ কালে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া, সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া দিয়া একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ভূষণের কবিতায় বিস্তর ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। শিবা বাওনীর প্রত্যেক কবিতা হৃদয়গ্রাহী ও জাতীয় গৌরবে পূর্ণ। আমরা ভূষণের এই অমূল্য কাব্য শিবা-বাওনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠক সম্প্রদায়কে দিব। ভূষণের কোন কোন কবিতাকে খাঁটি ইতিহাসও বলা যায়। এই

ধরণের কবিতার যথাযথ ঐতিহাসিক পরিচয়ও আমরা দিবার চেষ্টা করিব।

শিবা বাওনীর প্রথম কবিতায় ভূষণ শিবাজীর যুদ্ধ যাত্রার বর্ণন এইরূপ করিয়াছেন,—

"সাজি চতুরঙ্গ বীররঙ্গমে তুরঙ্গ চঢ়ি,
সরজা সিবাজী জঙ্গ জীতন চলত হৈ।
ভূষণ ভনত নাদ বিহদ নগারন কে
নদী নদ মদ গৈবরণ কে রলত হৈ॥
এ্যাল ফৈল খৈল ভৈল খলক মে গৈল গৈল,
গজন্কী ঠৈল পৈল সৈল উস্লত হৈ
তারা সো তরনি ধূরি ধারামে লগত জিমি
থারা পর পারা পারাবার ইওঁ হলত হৈ॥"

"শিবাজী তাঁহার চতুরঙ্গ সেনা লইয়া অশ্বারোহণে যুদ্ধে চলিয়াছেন। দামামার ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির প্রায়। মদমত্ত করী ও সৈন্যের কোলাহলে চারিদিকে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। ধূলিজালে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে আচ্ছাদিত সূর্য্য তারার মত দেখা যাইতেছে। থালায় পারা যেরূপ কাঁপিতে থাকে, শিবাজীর সৈন্যভারে সমুদ্র সেইরূপ কাঁপিতেছে।"

শিবাজী এবং তাঁহার সৈন্যদলকে মুসলমানগণ কিরূপ ভয় করিত এই কবিতায় ভূষণ তাহার বর্ণন করিয়াছেন —

"বদ্দল ন হোহি দল দচ্ছিন ঘমণ্ড মাহি,
ঘটা হূন হোহি দল সিবাজী হঙ্কারীকে।
দামিনী দমঙ্ক নাহি খুলে খগ্গ বীরন্কে
বীর সির ছাপ লখু তীজা * সয়ারীকে॥
দেখি দেখি মুগলোঁকী হরমৈ ভবন ত্যাগে,
উঝকি উঝকি উঠে বহত বয়ারীকে।
দিল্লী মতি ভুলী কহে বাত ঘন ঘোর ঘোর
বাজত নগারে ইয়ে সিতারে গড়ধারীকে॥"

"মোগল ও তাঁহাদের গৃহিণীগণ উদীয়মান মেঘমালা দেখিয়া বলিতেছেন, ইহা মেঘ নহে, বলদৃপ্ত মহারাষ্ট্র সেনা; ঘটা দেখিয়া বলিতেছেন, ইহা গর্ব্বিত শিবাজীর সৈন্যদল, বিজলীর চমক দেখিয়া বলিতেছেন ইহা সৈন্যগণের নগ্ন তরবারির তীব্র জ্যোতি ও তীজা উপলক্ষে ভগিনী গৃহে আগত বীর ভ্রাতার উষ্ণীশের চাকচিক্য। বায়ুর শব্দে মোগল নারীগণ চমকাইয়া উঠেন। মেঘগর্জ্জন শুনিয়া ভীত দিল্লীবাসিগণ বলিতেছে, ইহা সাতারা অধিপতি শিবাজীর নাগারার ধ্বনি।" এই কবিতাটির ছন্দ বড়ই সুন্দর—কিন্তু অসামঞ্জস্য দোষ আছে। শিবাজীর সৈন্যদল সম্বন্ধে তীজ পর্ব্ব স্মরণ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে।

শিবাজী যখন দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে সময় মোগলসেনাপতি ও দিল্লীবাসিগণের মনের অবস্থা ভূষণ একটি কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কবিতাটি নির্দোষ, ছন্দে ও ভাষায় বড়ই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, অনুপ্রাসে কবিতার সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়িয়াছে।

"বাজি গজরাজ সিবরাজ সৈন্ সাজতহী
দিল্লী দিলগীর দসা দীরঘ দুখন কী।
তনিয়াঁন তিলক পগনিয়াঁন সুথ নিয়াঁ,
যামে ঘুমরাতী ছোড়ি সেজিয়া সুখনকী॥
ভূষণ ভনত পতি বাঁহ বঁহিয়ান তেঁউ
ছাঁহিয়া ছবীলী তাকি রহিয়া রুখন কী।
বালিয়া বিথুর জিমি অলিয়া নলিনপর
ললিয়া মলিন মুগলনিয়া মুখনকী॥"

"শিবাজীর দিল্লী আক্রমণের সংবাদে সকলে ভীত হইয়া উঠিল। সুন্দরী যুবতীগণ সুখ শয্যা ছাড়িয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের চাঁদের মত মুখের উপর কৃষ্ণকেশরাশি আসিয়া পড়ায় মনে হইতেছিল যেন ফুল্লকমলের উপর ভ্রমরের দল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদের ত্রস্ত মলিন বদন এক বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে।"

ভূষণ একবার আওরংজেবের নিকট গিয়াছিলেন। সেই সময় দরবার-ই-আমে অসংখ্য জনগণ বেষ্টিত সম্রাট্

---

* পশ্চিমাঞ্চলে ভাদ্রমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে হরিতালিকা তীজ পর্ব্ব হইয়া থাকে। ইহা কতটা আমাদের দেশের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার মত। এই দিন ভ্রাতা সাধ্যমত ভগিনীকে উপহার দেয় ও ভগিনী ভ্রাতাকে আহারাদি করায়।

কবি ভূষণকে বলিয়াছিলেন, "আপনি শিবাজীর প্রসংশাসূচক বিস্তর কবিতা রচনা করিয়াছেন, আমার সম্বন্ধে কোনও কবিতা রচনা করিতে পারেন না কি?"

কবি বলিলেন, "সম্রাট্, স্বাধীন চিন্তাই কবিতার মূল উপাদান। কিন্তু সে স্বাধীনতা ত আপনার নিকট আমি পাইব না। আমায় ক্ষমা করুন।"

সম্রাট বলিলেন, "আপনাকে আমি অভয় দিলাম। আমি আল্লার নামে শপথ করিতেছি, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা যত অপ্রিয় হোক না কেন, আমি সানন্দে শুনিব।"

কবি তখন আসমুদ্র-হিমাচল অধিপতি ভারতসম্রাট্ আওরংজেবকে বলিলেন—

"কিবলে কী ঠৌর বাপ বাদসাহ সাহজাহাঁ,
তাকো কৈদ কিয়ো মানো মক্কে আগিলাই হৈ
বড়ো ভাই দারা বাকো পকরিকে কতল্ কিয়ো,
মেহরহু নাহি মাকো জায়ো সগো ভাই হৈ ॥
বন্ধু তো মুরাদবক্স বাদি চুক করিবে কো,
বীচ দে কুরান্ খুদাকী কসম খাই হৈ।
ভূষণ সুকবি কহে সুনো নবরংজেব,
এতে কাম কীনে তউ পাতসাহী ছাই হৈ ॥"

"কবি সম্রাটকে বলিতেছেন "আওরংজেব! প্রত্যক্ষ দেবতা, তীর্থস্বরূপ পূজ্য পিতাকে বন্দী করিয়া তোমার শ্রেষ্ঠ তীর্থ মক্কায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছ। একই মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে হত্যা করিতে তোমার মনে একটু দয়া হয় নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোরাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তুমি একটুও কুণ্ঠিত হও নাই। কোরাণের দোহাই দিয়া, ঈশ্বরের নামে কত শত পাপকার্য্য তুমি করিয়াছ, তবু সাম্রাজ্য তোমার বিস্তৃতই আছে।" কবিতাটি নির্ভীক হৃদয়ের স্পষ্ট উক্তি, ইতিহাসের দিক দিয়াও ইহার মূল্য যথেষ্ট। একটি কবিতায় কবি সুন্দর ভাবে সম্রাট্ আওরংজেবের সবগুলি দোষের কথা বলিয়াছেন।

মোগল সম্রাটগণকে ভূষণ নৃশংস বা অত্যাচারী বলেন নাই। তিনি বাবর, হুমায়ুন, আকবর ও সাজাহানের যথেষ্ট প্রসংশা করিয়াছেন। আওরংজেবের অন্যায় আচরণের বর্ণন করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়াছেন,—

"সাঁচ কোন মানে দেবী দেবতান্ জানে অন্ধ,
এসী উর আনে মৈ কহত বাত জবকী।
অউর পাতসাহন্‌কে হুতী চাহ হিন্দুন্ কী
অকবর সাহজহাঁ কহে সাখি তবকী ॥
বব্বরকে তব্বর হুমায়ু হদ্দ বাঁধি গয়ে,
দোনো এক করী না কুরান্ বেদ ডবকী।
কাসীহুকী কলা জাতী মথুরা মসীত হোতি
সিবাজী ন হোতো তো সুনতি হোত সবকী ॥"

—বাবর, আকবর প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ হিন্দুত্বের অপমান করেন নাই, হিন্দুগণকে তাঁহারা জোর করিয়া মুসলমান করেন নাই, বেদ পুরাণ ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থের অপমান তাঁহারা করেন নাই। কিন্তু আওরংজেব হিন্দুধর্ম্মের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে। যদি শিবাজী না থাকিতেন তাহা হইলে কাশীর মাহাত্ম্য লোপ পাইত, সমস্ত মথুরায় মসজিদ নির্ম্মিত হইত।—এই কবিতাটির ছন্দ নিতান্ত ক্লিষ্ট, প্রথম চরণের অর্থও স্পষ্ট বুঝা যায় না।

উপমা অলঙ্কার দ্বারা ভূষণ শিবাজীর শৌর্য্য বর্ণন করিতেছেন,

"গরুড় কো দাবা সদা নাগ কে সমুহপর,
দাবা নাগ জুহপর সিংহ সিরতাজ কো।
দাবা পুরহুতকো পহরান্‌কে কুলপর,
পচ্ছিন কে গোল পর দাবা সদা বাজ কো ॥
ভূষণ অখণ্ড নব খণ্ড মহি মণ্ডলমে
তম্ পর দাবা রবি কিরণ সমাজ কো।
পুরব পছাঁহ দেশ দচ্ছিনতে উত্তর লৌ
জহাঁ পাতসাহী তহাঁ দাবা সিবরাজ কো ॥"

"নাগকুলের উপর যেমন গরুড়ের অধিকার, হস্তীর উপর সিংহের, পক্ষিগণের উপর বাজের এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর সূর্য্যকিরণের যেরূপ অধিকার, তেমনি

পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যেখানে বাদশাহী সেইখানেই শিবাজীর আধিপত্য।—উপমালঙ্কারে, ভাষা ও ছন্দের লঘুগতিতে কবিতাটি সমুজ্জল।

ভূষণের একটি কবিতা ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। ইহাতে দারার সহিত আওরংজেবের যুদ্ধ বর্ণনা, সুজার খিজুয়া যুদ্ধের কথা, শাহবাজ খাঁর যুদ্ধ এবং কেশব রায়ের ডেরা নষ্টের বর্ণন কবি নিপুণতার সহিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাশী, বৃন্দাবন ও মথুরা ইত্যাদি স্থানে আওরংজেবের অত্যাচারের কথাও বলিয়াছেন। এ কবিতাটিও ভাষা এবং ছন্দে অতুলনীয়।

"দারাকী ন দৌর ইহ রারি নহি খজুবে (১) কী,
বাঁধিবো নহী হৈ কিধৌ মীর সহবাল (২) কো।
মঠ বিশ্বনাথ কোন বাস গ্রাম গোকুলকো,
দেব (৩) কোন দেহরা ন মন্দিরে গোপাল কো॥"

ভূষণ বলিতেছেন ইহা দারার সহিত যুদ্ধ নহে বা খিজুয়ার রণক্ষেত্রও নয়। মীর শাহাবাজ খাঁকে বন্দী করা নহে কিংবা ইহা বিশ্বনাথ ব গোপালের মন্দির এবং কেশব রায়ের ডেরা চূর্ণ করাও নহে, স্মরণ রাখিও ইহা শিবাজীর সহিত সংগ্রাম।—উপরিউক্তরূপ উপমা দিয়া, কবিতার শেষাংশে কবি সম্রাটকে সাবধান করিয়া লিখিতেছেন, শিবাজীর সহিত যুদ্ধে তুমি রক্ষা পাইবে না।

শিবাজী যখন দৃপ্ত সূর্য্যের মত ভারত-ভাগ্যাকাশে বিচরণ করিতেছেন, দুর্গের পর দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইতেছে, সেই সময়ের বর্ণন ভূষণ এইরূপ করিয়াছেন,

"দুগ্‌গ পর দুগ্‌গ জীতে সরজা (৪) সিবাজী গাজী,
ডগ্‌গ পর ডগ্‌গ নাচে রুণ্ডমুণ্ড ফারকে।
ভূষণ ভনত বাজে জীতকে নগারে ভারে
সারে করনাটী ভূপ সিংহল কোসরকে॥
মারে সুনি সুভট পনারে (৫) বারে উদভট
তারে লাগে ফরন সিতারে গড়ধরকে।
বীজাপুর বীরণ কে গোলকুণ্ডা ধীরনকে,
দিল্লী উর মীরনকে দাড়িম সে দরকে॥"

"বীরসিংহ শিবাজী দুর্গের পর দুর্গ জয় করিতেছেন। তাঁহার এই যুদ্ধ জয়ে বিশ্বনাথ তাঁহার দলবলসহ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। জয়ভেরীর ভীষণ নাদে কর্ণাট অধীশ্বর সিংহলে পলাইয়া গেলেন। সতারাধিপতি শিবাজীর সহিত যুদ্ধে পরনালার শত শত বীর যোদ্ধা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। বীজাপুর গোলকুণ্ডা ও দিল্লীর সেনানীগণের হৃদয় দাড়িমের মত ফাটিতে লাগিল।" এই কবিতাটির ছন্দ এবং ভাষা বড়ই সুন্দর, ইহার কোথাও একটুও দোষ নাই, ইহাতে ইতিহাসেরও সামান্য উল্লেখ আছে। পরনালার যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

ভূষণের কোন কোন কবিতা খাঁটী ইতিহাস, তাহাতে কেবল সন ও তারিখের উল্লেখ নাই। আবার কোন কোন কবিতা অতিশয়োক্তিতে ভারাক্রান্ত। যেমন, মোগল হারেমের শাহজাদি ও বেগমগণ সম্বন্ধে ভূষণ বলিতেছেন,"নাসপাতি খাতি তে বনাসপাতী খাতি হৈ।" অর্থাৎ যাহারা একদিন নাসপাতি প্রভৃতি মেওয়া এবং রাজভোগ আহার করিত, শিবাজীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আজ তাহারা বনস্পতি (গাছ) খাইতেছে এবং বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।—কিন্তু আরংজেব বর্ত্তমানে হারেমের বেগম ও শাহজাদিগণের এরূপ অবস্থা হওয়া অসম্ভব। কোন কোন কবিতায় ভূষণ অদ্ভুত উপমা দিয়াছেন, যেমন এক স্থানে তিনি শিবাজীকে 'বর' এবং দিল্লীকে বধূরূপে কল্পনা করিয়াছেন—"দূলহো সিবাজী ভয়ো দাচ্ছিনী দমামে বারে, দিল্লী দুলহিন ভই সহর সিতারে কী॥"

ভূষণের আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা উদ্ধৃত করিয়া

১। ফতেপুর জেলার বিন্দকীর নিকট খেজুয়া গ্রাম। আওরংজেবের সহিত যুদ্ধে ১৭১৬ বিক্রমাব্দে সুজা এইস্থানে পরাজিত হন। ২। শাহবাজ খাঁ আওরংজেবের শ্বশুর, ইনি দারার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হন। ৩। ১৭২৬ বিক্রমাব্দে আওরংজেব বিশ্বের দেবালয় চূর্ণ করেন, এই সময় ওরছাধীশ বীরসিংহ দেব নির্ম্মিত মথুরার কেশব রায়ের ডেরাও চূর্ণ করিয়া মসজিদ নির্ম্মিত হয়। ৪। সরজা অর্থে সিংহের রাজা। মালোজির এই উপাধি ছিল। ৫। পরনলা বীজাপুরের প্রধান দুর্গ। ১৭৩০ বিক্রমাব্দে এই দুর্গ শিবাজীর অধিকারভুক্ত হয়।—লেখক।

প্রবন্ধ শেষ করিব,—

"চকিত চকত্তা চৌকি চৌকি উঠৈ বর বার
দিল্লী দহসতি চিতৈ চাহ করষতি হৈ।
বিলখি বদন বিলখাত বিজাপুর পতি,
ফিরতি ফিরঙ্গিন কীনারী ফরকতি হৈ॥
থর থর কাঁপত কুতুব সাহ গোলকুণ্ডা,
হহরি হবস ভুপ ভীর ভরকতি হৈ।
রাজা সিবরাজকে নগারণকী ধাক সুনি—
কেতে পাতসাহনকী ছাতী দরকতি হৈ॥"

শিবাজীর শত্রুগণ তাঁহার নাম শুনিয়া চমকিত হয়, ভীত দিল্লীবাসী সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে। বীজাপুরপতি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। ভয়ে ইংরাজগণ সর্ব্বদা ত্রস্ত। গোলকুণ্ডাধিপতি কুতুব সাহ কাঁপিতেছেন। মহারাজ শিবাজীর নাগরার ধ্বনি শুনিয়া বাদশাহগণের প্রাণে ভয় হইয়াছে।—এই কবিতাটিই ভূষণের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভাষা এবং ছন্দ ইহার বড় সুন্দর। উহার পূর্ব্বার্দ্ধ বীর এবং শেষার্দ্ধ বীভৎস রসপূর্ণ। এই কবিতাটি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।

ভূষণ শিবাজীর নিকট যাইতেছিলেন, তখনও তিনি মহারাষ্ট্র বীরকে দেখেন নাই। পথে শিবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শিবাজী কবিকে বলেন,—"আপনি কবিতা শুনাইয়া শিবাজীর নিকট পুরস্কারলাভের আশায় যাইতেছেন। আপনার দু-একটি কবিতা শুনিলে, আমি বলিয়া দিতে পারি, এ কার্য্যে আপনি সফল হইবেন কি না।" উত্তরে ভূষণ উপরিউদ্ধৃত কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতা শুনিয়া শিবাজী মুগ্ধ হন, কবিকে আবার উহা আবৃত্তি করিতে বলেন। এইরূপে শিবাজীর অনুরোধে ভূষণ সতের বার কবিতা আবৃত্তি করেন। শেষে শিবাজী কবিকে আত্মপরিচয় দিয়া, সতেরখানি গ্রাম তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ দেন। এই সময় হইতেই ভূষণ শিবাজীর সভাকবি হন।

শিবা-বাওনীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। সমগ্র পুস্তকখানি পড়িবার উপযুক্ত কাব্য। হিন্দীর আর একজন বীর কবি আছেন, ইনি "কলকত্তার লত্তা" উড়াইয়াছেন। ইহার নাম কবি পদ্মাকর; বারান্তরে ইঁহার এবং ইঁহার কাব্যের পরিচয় দিব।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

৺সূর্য্যকুমার অগস্তি

গত ৪ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার বেলা ৫টার সময় সূর্য্যাস্তের সহিত মেদিনীপুরের উজ্জ্বলতম রত্ন ও বঙ্গীয় কান্যকুব্জ সমাজের "সূর্য্য" অস্তমিত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতা গ্রামের এক উচ্চবংশীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকুলে ১২৬৩ সালের মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া ঐ গ্রামে বসবাস করেন। এদেশে বহুকাল বাস করার জন্য তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গদেশীয় অনেক আচার ব্যবহার ও ভাষার প্রচলন হইয়া পড়ে।

তাঁহার পিতৃদেব ৺ঠাকুরলাল অগস্তি মহাশয় অত্যন্ত কৃতী, উদ্যোগী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রথম অবস্থার কথা ও পরে তাঁহার কৃতিত্বের বিষয় স্মরণ করিলে তাঁহাকে পুরুষসিংহ বলিয়া স্পষ্টই ধারণা জন্মে। যৌবনে তিনি অতি দরিদ্র ব্যক্তিই ছিলেন। এমন কি সমগ্র পরিবারের দুইবেলা আহারের সংস্থানের জন্য তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঠাকুরলাল কেবল মাত্র নিজ চেষ্টায় তৎকাল প্রচলিত ফার্সি ভাষা শিক্ষা করিয়া মোক্তারী পাশ করেন এবং তাহাতে যথেষ্ট

৺সূর্য্যকুমার অগস্তি

খ্যাতিলাভ করিয়া অনেক বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন করেন এবং ক্রমে সে স্থানের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন।

অগস্তি মহাশয়ের মাতা শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীও অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলা, পরম দয়াবতী ও ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। সূর্য্যকুমার তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্র—তিনি পিতা মাতার উপরিউক্ত গুণ সমূহের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব মেধা ও প্রায় শ্রুতিধরের স্থায় স্মরণ শক্তি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের জীবনের প্রতি দিনের ঘটনার তারিখ মাস ও সময় সুস্পষ্টরূপে স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার অনেক লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। যখন তিনি ছয় বৎসরের বালক, প্রথম ভাগ পড়েন, তখন তাঁহার এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। সূর্য্যকুমার সমগ্র পুস্তকখানির প্রতি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর প্রদান করেন। বালকের এইরূপ অপূর্ব্ব মেধা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উক্ত জ্ঞাতি তাঁহাকে একটি টাকা সন্দেশ খাইতে পুরস্কার দেন। দশ বৎসর বয়সে গড়বেতা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন কিন্তু সে বার বৃত্তি পান নাই। ইহাতে তাঁহার পিতৃদেব বলেন, "সূর্য্য! তুমি ত বেশ মনোযোগ দিয়াই পড়াশুনা কর, অথচ বৃত্তি পাইলে না ইহার কারণ কি?" ইহার পর তিনি ১১ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় বার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন ও ৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। এইরূপে বাল্যকাল হইতেই নিজ বৃত্তির অর্থ দ্বারাই তাঁহার আজীবন শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

১৮৭৩ সালে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তিনি কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ হাইস্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ২০৲ বৃত্তি পান, এবং উক্ত পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। ইহার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে উক্ত স্কুলে কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি ছাত্রগণের উন্নতির অভাব লক্ষিত হইতেছিল, তজ্জন্য ঐ স্কুলের গভর্ণমেণ্ট-সাহায্য বন্ধ হইবার কথা ছিল। সূর্য্যকুমার ঐরূপ প্রশংসার সহিত পাশ করাতে স্কুলের শিক্ষকগণ গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করায় স্কুলটি গভর্ণমেণ্ট সাহায্য হইতে আর বঞ্চিত হইল না। ইহার পর হইতে ঐ স্কুল স্থায়ী হইয়া গেল।

বিদ্যার্জ্জনের সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত হইতেন। পড়িবার সময় যদি কোনরূপ ব্যাঘাত হয় এ জন্য সর্ব্বদাই ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতে বসিতেন। তখন তাঁহাদের বাসগৃহ মাটীর ছিল—যাহাকে 'কোঠাঘর' বলে। একদিন দ্বিতল গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতেছিলেন, দৈবক্রমে গৃহে অগ্নিসংযোগ হয় এবং ঠিক তাঁহার ঘরখানিই পুড়িতে আরম্ভ করে। তিনি এমন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতে থাকেন যে ঘর পুড়িতেছে বলিয়া বিন্দুমাত্রও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী বারবার দ্বারে আঘাত করিয়া বলেন, "সূর্য্য! শীঘ্র বাহিরে এস, ঘরে আগুন লাগিয়াছে।" তখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয়। যোগী যেমন একাগ্রমনা হইয়া যোগাসনে বসেন, তিনিও সেইরূপ ভাবে বিদ্যার্জ্জন করিতে বসিতেন। তাঁহার পরিণত বয়সেও যে ব্যায়াম ও পরিশ্রমের অভ্যাস তাঁহাকে সাধারণ বাঙ্গালী হইতে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছিল, বাল্যকাল হইতে তাহাও সুস্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল।

তাহার পর তিনি একে একে বি এ, ১৮৭৯ সনে এম্‌-এ, প্রভৃতি প্রায় সমুদয় পরীক্ষাই কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে দেন ও সকল পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ঘড়ি, স্বর্ণপদক, পুস্তক ও বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৮১ সনে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা পাশ করিয়া দশহাজার টাকা পুরস্কার ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় তিনি এত বেশী নম্বর পান যে একাল পর্য্যন্ত কেহ অত নম্বর পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

এইরূপ অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত বিদ্যা শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটনে, পরে জেনারল এসেমব্লি এবং ঢাকা কলেজে প্রোফেসারি করেন। অল্পদিনের জন্য তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটও হইয়াছিলেন।

এই সময় এদেশে কিছুদিনের জন্য সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি এই ষ্ট্যাচুটারি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন এবং ১৮৮৪ সালে ঐ পরীক্ষায় অসাধারণ দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সিভিলিয়নের পদে অধিষ্ঠিত হন। ষ্ট্যাচুটারি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি এত অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন যে তাৎকালীন লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণর স্যর রিভার্স টমসন্ সাহেব আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে পত্র লিখেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার পরম অনুরাগ ছিল। গভর্ণমেন্টের কার্য্য করিতে করিতে তিনি হাই ষ্ট্যাণ্ডার্ড সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া ২০০৲ টাকা বৃত্তি পান। তিনি অতি দক্ষতার সহিত ২৮ বৎসর রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বালেশ্বর জেলা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কার্য্যকালে তিনি বেহার, উড়িষ্যা ও পূর্ব্ববঙ্গ ইত্যাদি নানাস্থান ভ্রমণ করেন এবং প্রতি জেলার প্রজাবর্গের ও দেশের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করেন। তিনি যে যে স্থানে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে তত্রস্থ জনসাধারণ তাঁহার গুণরাশি স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছে এবং সেই মহাত্মার মূর্ত্তি মনোমন্দিরে স্থাপনা করিয়া ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে।

১৯০৪ সনে যখন তিনি ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন ভয়ানক প্লেগের উপদ্রবে সেই স্থানের অধিবাসীরা অতিশয় বিব্রত হইয়াছিল। অগস্তি মহাশয় নিজপ্রাণের প্রতি লক্ষ্যশূন্য হইয়া প্রজাবর্গের কল্যাণের নিমিত্ত এরূপ পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন যে, ঐ সময়ের ছোটলাট সার এনড্রু ফ্রেজার মহোদয় ভাগলপুরে গিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার গুণগান করেন ও স্বহস্তে তাঁহার প্রশংসা লিখেন।

তিনি যখন যশোহর জেলায় ছিলেন তখন সেস্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য স্রোতোহীন নদী কাটাইবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্টের সহিত লেখালিখি আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত হন। যদিও তৎকালে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, তথাপি ইহার প্রয়োজনীতা পরে গবর্ণমেন্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সে শুভচেষ্টা যশোহর জেলাবাসীর এখনও স্মরণ আছে। পাবনা জেলায় অবস্থানকালে এক সময় বাজারে আগুন লাগে। ম্যাজিষ্ট্রেট অগস্তি সাহেব তখন সেখানে উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিলেন যে একজন লোক অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য জল ঢালিবার ইচ্ছায় ছাদে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সিঁড়ি অভাবে উঠিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ লোককে বলেন, "তুমি আমার কাঁধে চড়িয়া ছাদে উঠ।" সে ব্যক্তি ইতস্তত করিতেছিল কিন্তু তাঁহার বারংবার অনুরোধে অবশেষে তাঁহার কাঁধে উঠিয়া ছাদে উঠিয়া যায়। তাঁহার ঐরূপ ব্যবহার দর্শনে সে সময়ে সকলে চমৎকৃত হয়। তাঁহার ন্যায় সরল ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। যখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে অবস্থান করিতেন তখনও অশ্বারোহণে কিংবা অন্য কোনও যানে ভ্রমণে গিয়া পথের পথিককে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে, মুটেকে নিজ হইতে ডাকিয়া তাহার আর্থিক অবস্থার কথা তাহার সুখ দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতেন। এইরূপে রাজকার্য্য পরিচালন সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়া সেখানে কৃষক ও অপরাপর লোকদের সহিত নানা রূপ ঘনিষ্ঠ আলাপে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিতেন।

রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অগস্তি মহাশয় তাঁহার মেদিনীপুরস্থ "মলয়াবাস" বাটীতে এযাবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। চিকিৎসার্থ তিনি গত বৎসর কলিকাতায় আসেন।

তিনি পরম সাহিত্যানুরাগী * ছিলেন ও আজীবন সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। কঠিন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি ফরাসী ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়া ফার্শী শিখেন।

সূর্য্যকুমার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলেন।

---

* তাঁহার মৃত্যুতে আমরা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র একজন পুরা পুরা-তন গ্রাহক হারাইলাম।—মাঃ মঃ সম্পাদক।

১৯২২ সনে মেদিনীপুরে যে সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছিল অগস্তি মহাশয় তাঁহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সময়ের অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিত উচ্চ আশাই পোষণ করিতেন। সেই অভিভাষণে তিনি প্রাচ্যের সাত্ত্বিকতা সংযম প্রভৃতি গুণের সহিত প্রতীচ্যের উদ্যোগ ও দৃঢ় অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ সমূহ মিশ্রিত করিয়া যে নবজাতির অভ্যুদয়ের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন, তিনি নিজেই যে সেই আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার এই ক্ষুদ্র জীবনীপাঠে বোধ হয় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

গীতা তাঁহার অতিশয় প্রিয় পাঠ্য ছিল। সমস্ত পুস্তকখানি তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ফৈজীর গীতার ফার্সী অনুবাদ তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাহাও প্রায় আবৃত্তি করিতেন।

দেশহিতকর সমুদয় কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল, এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তিনি ঐ সব কার্য্যে যোগদান করিতেন। যখন ১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধী মেদিনীপুরে যান, তখন সূর্য্যকুমার সভাপতি হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার হৃদয়ে অতি প্রগাঢ় স্বদেশ ভক্তি ছিল, কিন্তু তাহা বাক্যচ্ছটা দ্বারা আড়ম্বর সহকারে কখনও প্রকাশ করেন নাই। স্বদেশ ভক্তি থাকিলেই বিদেশীর উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে হইবে এইরূপ ভাবকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

তাঁহার জন্মস্থান গড়বেতা গ্রামে তিনি নিজ চেষ্টায় এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন এবং আজীবন ঐ স্কুলের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি নিজ কন্যাদিগকে ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত ও গীত বাদ্যে সুশিক্ষিতা করিয়া গিয়াছেন।

সরকারী কার্য্য উপলক্ষ্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কতকটা বিজাতীয় আচার ব্যবহার পালন করিতে হইত, কিন্তু অন্তরে তিনি প্রকৃত হিন্দু ও পরম ভগবদ্-বিশ্বাসী ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হিন্দুগণের প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোকাবলী আবৃত্তি পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিতেন এবং কোনও কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে, যাত্রাকালে কিংবা ঔষধ সেবনে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করা তাঁহার আজীবনের অভ্যাস ছিল।

পিতার নানা সদ্‌গুণের সহিত তাঁহার তেজস্বী স্বভাব, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও অধ্যবসায় তিনি পূর্ণ মাত্রায় অধিকার করিয়াছিলেন। অপরদিকে স্বীয় মাতার হৃদয়ের কোমলতা, অসীম সহিষ্ণুতা ও গভীর ধর্ম্ম বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়কে অপরূপ সুষমা মণ্ডিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ তিনি ধনী নির্দ্ধন, উচ্চ নীচ, বিদ্বান্ মূর্খ, শত্রু মিত্র যে কোনও লোকের উপকার করিতে পারিলে অসীম তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিতেন। রোগশয্যার নিদারুণ যন্ত্রণায় যখন তাঁহার লেখনী স্পর্শ করিতে কষ্ট বোধ হইত, তখনও পর্য্যন্ত অপরের দ্বারা লেখাইয়া সার্টিফিকেট বা সুপারিশ পত্র প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার অতিপ্রিয় পুস্তক গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের সেই অতুলনীয় শ্লোক—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।"

—যে শ্লোকটি তিনি পরম আনন্দের সহিত আজীবন বারংবার আবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল।

গুরুভক্তি তাঁহার চরিত্রের আর এক মহাগুণ ছিল। যিনি একদিনও তাঁহাকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, পরিণত বয়সেও তাঁহাকে দেখিলেই, ব্রাহ্মণ হইলে পদধূলি গ্রহণ করিয়া ও অপর জাতি হইলে পরম শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতেন

তিনি যেমন আস্তিক্যবুদ্ধিশালী ছিলেন, সেইরূপ কখনও কোনও বিষয়ে নিরাশ হইতেন না। ভগবান মঙ্গলময়, তিনি সমস্তই মঙ্গল করিবেন, রোগ, বিপদ কি দুর্ঘটনার সময় চিরদিন অটলভাবে এই মত পোষণ করিয়া

গিয়াছেন এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেও এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার সহিষ্ণুতার বিষয় একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। পাবনায় থাকা কালীন একদিন তিনি টমটমে মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে যান। দৈব দুর্ঘটনায় ঘোড়া হঠাৎ গাড়ী সহিত ছুটিয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে। অগস্তি মহাশয়ের পায়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। এই ক্ষত ছয় ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি গভীর হইয়াছিল। তিনি চলৎশক্তি রহিত হন। ডাক্তার আঘাত পরীক্ষা করিয়া বলেন যে ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ঐ ক্ষত সেলাই করিতে হইবে। অগস্তি মহাশয় বলেন, অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন নাই, আপনারা স্বচ্ছন্দে যাহা করণীয় করিয়া যান। তিনি সিভিল সার্জ্জনের সহিত গল্প ও পুস্তক পাঠ করিতে থাকেন, ইত্যবসরে অস্ত্র ডাক্তারেরা ক্ষত কাটা, পরিষ্কার ও সেলাই ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চনও হয় নাই। ঐ কার্য্য শেষ করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। সে সময় তাঁহার অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা দর্শনে সকলে চমৎকৃত হন।

আজিকালিকার ইংরাজি শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই কথাবার্ত্তার মধ্যে ইংরাজির বুকনি না দিয়া কথা বলিতে পারেন না এবং হয়ত ইচ্ছাও করেন না। তিনি ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ করিতেন।

রহস্যপ্রিয়তা তাঁহার স্বভাবকে মধুর করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি চিরদিন সন্তান সংহতি পরিবৃত হইয়া গল্প করিতে করিতে আহার করিতে ভালবাসিতেন। ঐ সময় তাঁহার বাল্য ও যৌবনের নানা গল্প ও রহস্যালাপে গৃহ আনন্দে পরিপূরিত হইত।

আজীবন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ স্বভাবের লোক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে রোগাক্রান্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনি সাঁতার দিতেন ও মুগুর ভাঁজিতেন। প্রতিদিন ৬।৭ মাইল ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ানো তাঁহার অতি প্রিয় ব্যায়াম ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। ইহার ১৫ মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ অটুট ছিল যে তিনি এত শীঘ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন তাহা কেহই মনে করে নাই।

গত বৎসর তাঁহার প্রাণোপম জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপেশচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় অকালে পরলোক গমন করেন। সেই দুর্ব্বিসহ শোক তাঁহার পরম স্নেহশীল অপত্য বৎসল হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। ইহার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও তিনি হৃৎপিণ্ড ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত হন। রোগশয্যায় তাঁহার অসীম সহিষ্ণুতা, সুস্থ হইবার প্রবল আশা ও অসাধারণ মানসিক বল দর্শনে চিকিৎসকেরাও চমৎকৃত হইয়াছেন।

তিনি একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার অগস্তি এম এ, জামাতা শ্রীপ্রিয়লাল ত্রিবেদী এম এ, কন্যা দৌহিত্র, দৌহিত্রী পৌত্রী ও পত্নী রাখিয়া গিয়াছেন।

১৯২৩ সনের ২৯শে নবেম্বর রাত্রিকালে হঠাৎ তাঁহার অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া উঠে। ৩০শে সূর্য্যাস্তের সহিত তাহার জ্যোতির্ম্ময় আত্মা চিররুগ্ন-মুক্ত হইয়া অমরধামে মহাপ্রস্থান করেন।

—o—

তীর্থযাত্রীরপত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১লা জুন ১৩২৩—অদ্য মধ্যাহ্নভোজনের পর হৃষীকেশ গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ চৌদ্দ মাইল, প্রশস্ত রাজপথ আছে। দুইখানা মোটর গাড়ী আরোহী লইয়া প্রত্যহ অনেকবার যাতায়ত করে। এতদ্ব্যতীত ট্যাক্সি, একা ও গরুর গাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায়। যাহারা তীর্থভ্রমণে এই শ্রেণীর যানবাহন ব্যবহার করে না, তাহারা হরিদ্বার অথবা হৃষীকেশ রোড্ ষ্টেশন হইতে পদব্রজে হৃষীকেশ গমন করিয়া থাকে। হরিদ্বার-দেরাদুন রেলপথে হরিদ্বার হইতে সাত মাইল দূরে হৃষীকেশ রোড ষ্টেশন। সেখান হইতে হৃষীকেশ সাত মাইল। হৃষীকেশ রোড ষ্টেশনে লরী কিংবা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না—একা পাওয়া যায়—তাহাও সংখ্যায় তত বেশী নহে।

আমি হৃষীকেশ হইতে কেদার বদরী অভিমুখে যাত্রা করিব, বরদা বাবু আমার সঙ্গীদিগকে হরিদ্বারে লইয়া আসিবেন ইহাই আমাদের কল্পনা। আমাদের জিনিষপত্রের অধিকাংশই হরিদ্বারে ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষের নিকট রাখিয়া গেলাম। আমার হিমালয় ভ্রমণোপযোগী এবং হৃষীকেশে অল্পদিনের ব্যবহারে আবশ্যক জিনিষ পত্র মাত্র সঙ্গে লইলাম। একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় হৃষীকেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত পথ যদিও রাজপথ, তথাপি উত্তম পথ নহে—অত্যন্ত কঙ্করময় ও অসমতল। পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্যাবলীর উল্লেখযোগ্য কোনও বিশেষত্ব নাই। অর্দ্ধপথের কিছু অধিক অগ্রসর হইয়া সত্যনারায়ণ নামক স্থানে আমরা অবতরণ করিলাম।

সত্যনারায়ণ স্থানটী অতি নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিত। যাত্রীদের বিশ্রাম এবং অবস্থান জন্য ধর্ম্মশালা এবং রামসীতার একটী মন্দির এখানে আছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটী বিগ্রহ স্থাপিত। এখান হইতেই স্বামী বিশুদ্ধানন্দের (তিনি কালী কম্‌লীওয়ালা নামেই সমধিক পরিচিত) অন্ন সত্র আরম্ভ। এইস্থান হইতে যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ এবং বদরীনাথ পর্য্যন্ত পথে কোন্ কোন্ স্থানে কালী কম্‌লীওয়ালার "ছত্র" আছে এবং কোন্ ছত্র হইতে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য একবেলা একজন প্রার্থীকে দেওয়া হয় তাহার একটী মুদ্রিত তালিকা একব্যক্তি আমাদিগকে দিল। এই সমস্ত ছত্র সাধারণের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর নির্ভর করিয়াই চলিতেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং মন্দির ও বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া সত্যনারায়ণ ত্যাগ করিয়া অপরাহ্ণ ৫ঘটিকায় হৃষীকেশে পৌঁছিলাম।

হরিদ্বারের ন্যায় হৃষীকেশেও অনেক ধর্ম্মশালা আছে,—তন্মধ্যে পাঞ্জাব ছত্র এবং কালীকম্‌লীওয়ালার ধর্ম্মশালাই সমধিক প্রসিদ্ধ।

আমরা কোনও প্রসিদ্ধ ও যাত্রীবহুল ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, অপেক্ষাকৃত অপরিচিত এবং নির্জ্জনে স্থাপিত "ফিরোজপুরওয়ালে" ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ধর্ম্মশালাটী গঙ্গাতীরে না হইলেও ধর্ম্মশালা হইতে গঙ্গা প্রবাহ পর্য্যন্ত খোলা মাঠ—কোনও বাড়ীঘর কি বৃক্ষগুল্ম নাই। ধর্ম্মশালার বারান্দায় বসিয়া গঙ্গা এবং তাহার পূর্ব্বতীরস্থিত উচ্চ পর্ব্বতের শোভা দেখা যায়। এই নৈসর্গিক শোভাটুকুর প্রলোভনেই আমাদিগকে কিছু কষ্টস্বীকার করিয়া এখানে আসিতে হইয়াছে। রাজপথ হইতে এই ধর্ম্মশালা অনেকটা দূরে স্থাপিত—মোটর, ঘরের দুয়ারে

আসে না। আমাদিগের জিনিষ পত্র আমাদিগকেই আনিতে হইয়াছিল।

হরিদ্বারের অনেক ধর্ম্মশালা কেবল গৃহস্থ যাত্রীদের জন্ম স্থাপিত। সেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা অবস্থান করেন না এবং গৃহস্থ যাত্রিগণও স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারে না। হৃষীকেশের অন্যান্য ধর্ম্মশালায় কি বিধি জানি না, কিন্তু আমরা যে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি সেখানে কানাড়া দেশীয় একজন অবধূত সন্ন্যাসী স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। অপর একজন ঠিকাদার এক কোঠায় স্থায়ী ভাবে সস্ত্রীক আছেন এবং একটী পাকের কোঠা তাঁহার ঠিকাদারী কার্য্যের মালমসল্লায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অদ্য সময়াভাবে আর সহরে বাহির হইলাম না, অবধূতজীর সহিত আলাপ করিলাম। বম্বে প্রদেশে অবস্থান কালে কয়েকজন কানাড়াদেশীয় কর্ম্মচারীর সহিত আমাকে একত্র কায করিতে হইয়াছিল, সেই সব কর্ম্মচারীরা যখন নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় আলাপ করিতেন তখন একবর্ণও বুঝিতাম না। আমার সহিত অবশ্য ইংরাজীতে আলাপ করিতেন। এই সন্ন্যাসীজী হিন্দি জানেন, এবং হিন্দিতেই আলাপ করিলেন, কিন্তু হিন্দি কথাগুলি কানাড়ী সাজে ঢালিয়া লইয়া এক নূতন ধরণে উচ্চারণ করিলেন। সমস্ত দিবারাত্রে ইনি মাত্র বেলা ১০ ঘটিকায় আহার্য্য সংগ্রহের জন্ম একবার বাহিরে যান, অন্য সময় ধর্ম্মশালাতেই থাকেন।

২রা জুন হইতে ৪ঠা জুন পর্য্যন্ত আমরা হৃষীকেশে ছিলাম। হৃষীকেশে আসিবার পথেই মাতাঠাকুরাণীর জ্বর হইয়াছে। একদিন বিশ্রামে সুস্থ হইতে পারিবেন এই বিবেচনায় তাঁহাকে এবং অন্যান্য সকলকে ধর্ম্ম-শালায় রাখিয়া বরদাবাবু ও আমি অদ্য (২রা জুন) প্রত্যুষে লছমনঝোলা যাত্রা করিলাম।

হৃষীকেশের উত্তরেই পশ্চিম হইতে একটী নদী আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। নদীটীর নাম চন্দ্রভাগা। এখন সম্পূর্ণ শুষ্কতোয়া, কিন্তু বর্ষায় অত্যন্ত বেগবতী হয়। তখন চন্দ্রভাগার উত্তর তীর নিবাসী সন্ন্যাসীদের আহার্য্য সংগ্রহের জন্ম হৃষীকেশে গমন একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ কালী কম্বলী ওয়ালা (বর্ত্তমান কালী কম্বলীওয়ালা বা নাথজী, হৃষী-কেশ হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত অন্নছত্র প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিশুদ্ধানন্দ কালী কম্বলীওয়ালার শিষ্য) চন্দ্রভাগা নদীর উপর একটী লোহার সেতু নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিয়াছেন এবং সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক মুদ্রিত প্রার্থনা পত্র বাহির করিয়াছেন।

চন্দ্রভাগা স্বাধীন গাড়োয়াল বা টিহরী রাজ্যের দক্ষিণ সীমা। হৃষীকেশ হইতে লছমন-ঝোলা পর্য্যন্ত রাস্তা এবং লছমন ঝোলার পর হইতে গঙ্গাপ্রবাহ টিহরীর পূর্ব্ব সীমা।

চন্দ্রভাগার উত্তরে এবং গঙ্গার পশ্চিমে (সঙ্গম স্থান হইতে অনেক উত্তরে) একটী দ্বীপাকৃতি স্থান আছে। স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং মনোহর। অনেক সন্ন্যাসী এই নির্জ্জন স্থানে "কুঠিয়া" (বাঁশ নির্ম্মিত এক প্রকার সুক্ষ্মচূড় গৃহ) নির্ম্মাণ করিয়া একান্তে সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকেন। দিবসে মাত্র একবার ইঁহাদিগকে হৃষীকেশ যাইয়া কোন ছত্র হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়।

হৃষীকেশ হইতে লছমন ঝোলা পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য পথ; তবে কতকদূর পর্য্যন্ত একা চলে। পথের উভয় পার্শ্বে অনেক আশ্রম। প্রায় সকল আশ্রম গুলিই ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং সুদৃশ্য। পথের পশ্চিম পার্শ্বে "কৈলাস" নামে একটী আশ্রম অতি উচ্চে স্থাপিত।

পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে গঙ্গায় অবতরণ জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানযুক্ত ঘাট আছে। একটী ঘাটের নাম "রাম ঘাট"। ইহার নিকট সন্ন্যাসীদের ব্যবহার জন্য একটী পুস্তকাগার আছে। এই ঘাটের সমসূত্রে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে "স্বর্গাশ্রম।"

রামঘাট হইতে আরও কিছুদূর উত্তরে "মুনিকি রেতি" নামক স্থানে একটী পোষ্টাফিস এবং একটী ছোট বাজার আছে। ইহার কিছু উত্তর-পশ্চিমের

উচ্চ পর্ব্বতে তপোবন নামক স্থান। এখানকার বাঁশমতি চাউল অতি প্রসিদ্ধ।

মুনিকি রেতির কিছু উত্তরে একটী অনুচ্চ পাহাড় চড়াই উৎরাই করিয়া লছমন ঝোলায় পৌঁছিতে হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা চড়াই উৎরাইর পর আমরা লছমন্-ঝোলা পৌছিলাম। উৎরাই শেষ হইলে পাহাড়ের উত্তর পাদদেশে একটী দেব মন্দির, দুই একখানা দোকান, এবং গঙ্গায় অবতরণ জন্য একটী বাঁধান ঘাট। ঘাটের শীর্ষদেশ হইতেই সেতু আরম্ভ। পূর্ব্বে এখানে দড়ী ও কাষ্ঠখণ্ড সহযোগে একটী দোলায়মান বিপজ্জনক সেতু ছিল, তাহার নাম ছিল "লছমন্-ঝোলা।" সেতুর নামানুসারে স্থানটীর নামও লছমন্ ঝোলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান লৌহ সেতুটী কলিকাতার মাড়োয়ারী বণিক বাবু সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সেতুটী খুব প্রশস্ত নহে, দুই দিক হইতে অধিক সংখ্যক যাত্রী একই সময় সেতু পার হইতে চেষ্টা করিলে উভয় দলেরই অসুবিধা হয়। যখন ভারবাহী গর্দ্দভ কি অশ্বতরের দল পুল পার হইতে আরম্ভ করে, তখন যাত্রীদিগকে তীরে অপেক্ষা করিতে হয়। হৃষীকেশ হইতে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত প্রত্যহই অনেক ভারবাহী পশু যাতায়াত করিয়া থাকে।

সেতু পার হইয়া আমরা গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইলাম। লছমন-ঝোলার নিকট অল্প খানিকটা যায়গায় গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী। সেতুর উত্তর প্রান্ত হইতে এক পথ অল্প পশ্চিমদিকে যাইয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীর ধরিয়া উত্তর দিকে গিয়াছে, এইটীই কেদার-বদরীর পথ। পথিপার্শ্বে একটি উচ্চস্থানে সরকারী ডাক-বাঙ্গালা। লছমন-ঝোলা হইতেই কেদার বদরীর পথশোভার নীরব গাম্ভীর্য্য আরম্ভ। পথের পশ্চিমে অনেক নিম্নে গঙ্গা। গঙ্গার পশ্চিমতীরে এবং পথের পূর্ব্ব দিকে বনরাজি শোভিত অতি উচ্চ পর্ব্বত। দিবাভাগেও পথটী সম্পূর্ণ আলোকিত হয় না। গঙ্গার মৃদু কল্লোল, পাহাড়িয়া ঝিঁঝিঁর বিকট চীৎকার এবং প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্য পথিকের মনে যেন একটা অকারণ ভয়ের সঞ্চার করে।

যাহারা বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত যাইতে অশক্ত, তাহারা লছমন্-ঝোলায় গঙ্গাস্নান করে এবং কেদার-বদরীর পথে কিছুদূর (এক মাইল দেড় মাইল পথ) অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পুল হইতে পূর্ব্বদিকেও একটী পথ গিয়াছে। এই পথের পার্শ্বে কয়েকটী আশ্রম। আমরা আশ্রম দর্শন করিয়া হরিদ্বার অভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন পথে স্বামী মঙ্গলনাথ নামক একজন অধীতশাস্ত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। এখানেও যাইয়া দেখি, স্বামীজী ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অর্দ্ধোপবিষ্ট অবস্থায় আছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, "বনের বেদান্তকে ঘরে আনিতে হইবে।" বনের বেদান্ত কতদূর ঘরে আসিয়াছে জানি না, কিন্তু ঘরের ভোগবিলাস যে প্রচুর পরিমাণে বনে সংক্রামিত হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

স্বামীজির সহিত কিঞ্চিৎ আলাপের পর, প্রায় ১১টার সময় বাসায় ফিরিলাম।

অপরাহ্ণে হৃষীকেশ সহর দর্শনে বাহির হইলাম। সহরটী হরিদ্বার অপেক্ষা ছোট এবং সৌন্দর্য্য হিসাবেও অনেকটা হীন। কিন্তু হরিদ্বার অপেক্ষা সমধিক শীতল। এখানে থানা ও ডাকঘর আছে, কয়েকটী দেব মন্দির আছে। কেদার বদরী যাত্রিগণ এখান হইতেই কাণ্ডিওয়ালা (ভারবাহী) প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া হিমালয় ভ্রমণে যাত্রা করিয়া থাকে।

এখানে শুনব যে সত্বরেই হৃষীকেশ একটী সব-ডিবিজনে পরিণত হইবে। অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসীর নিকট শুনিলাম যে হৃষীকেশের সেই প্রাচীন শুদ্ধ গাম্ভীর্য্য এখন আর নাই, স্থানটী এখন আর নির্জ্জন সাধন ভজনের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। হৃষীকেশ এখন লোকবহুল এবং সাংসারিক লোকের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আর কয়েক বৎসর পরে নির্জ্জনতার অনুসন্ধানে সন্ন্যাসীদিগকে আরও দূরতর স্থানে যাইতে হইবে। একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী দুঃখ প্রকাশ করিয়া

বলিলেন যে, যাহাদের সন্ন্যাসে শাস্ত্রসঙ্গত অধিকার নাই, তাহারাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে এবং সাধন রাজ্যের অতি নিম্নস্তরের কার্য্য "ইষ্ট পূর্ত্ত" প্রভৃতিকেই সন্ন্যাসীর কার্য্য বলিয়া লোক-সমাজে প্রচার করিতেছে। ইহাতে লোকের উপকার হইতেছে সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শ খর্ব্ব হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অনেক ভণ্ডও এখন সন্ন্যাসী সাজিয়া সন্ন্যাসীর দল বৃদ্ধি করিতেছে এবং সাধারণ লোকের চক্ষে সন্ন্যাসীদিগকে হীন করিতেছে। হৃষীকেশে এখন যত অন্নসত্র আছে, যদি আগামী কল্য তাহা বন্ধ হইয়া যায়, তবে বারো আনা রকম সন্ন্যাসী পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবে। যে পরিমাণে সন্ন্যাসীর দল বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে এই সমস্ত অন্নসত্র বোধ হয় শীঘ্রই বন্ধ হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা ও অন্নসত্র আছে। আমরা পাঞ্জাবছত্র ও কালী কম্বলী ওয়ালার ধর্ম্মশালা দেখিতে গেলাম। উভয় স্থানেই অধ্যক্ষের পক্ষ হইতে একজন লোক অতি সৌজন্য সহকারে আমাদিগকে দ্রষ্টব্য বিষয় গুলি দেখাইল। এই সকল ছত্র হইতে সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে আহার্য্য প্রদান করা হয়। তীর্থ-যাত্রীরা এখানে আশ্রয় পাইয়া থাকে। তীর্থ-যাত্রী কি সাধু সন্ন্যাসিগণ পীড়িত হইলে তাহাদের চিকিৎসা জন্য এখানে বন্দোবস্ত আছে।

আরও দুই চারিটী ধর্ম্মশালা দর্শন ও সহরটী পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিলাম।

৩রা জুন—মাতাঠাকুরাণীর পীড়া কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই, অধিকন্তু আমাশয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া আমাকে হিমালয় ভ্রমণে যাইতে দিতে বরদাবাবু স্বীকৃত হইলেন না—অন্যান্য সকলেও আমার যাওয়াতে আপত্তি উত্থাপন করিল। আবার হরিদ্বারে ফিরিয়া, খুড়ীমা'র পীড়া প্রশমিত হইলে যাহা হয় করা যাইবে স্থির করা গেল। বরদাবাবু ও আমি অদ্য পুনরায় লছমন ঝোলা চলিলাম।

সেতু পার হইয়া আমরা উত্তর তীরে আসিলাম এবং তথা হইতে স্বর্গাশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যেখানে গঙ্গা লছমনঝোলা ছাড়াইয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছেন সেখান হইতে স্বর্গাশ্রম আরম্ভ। আশ্রমটী গাড়োয়াল জেলা ভুক্ত।

বিখ্যাত কালীকম্‌লীওয়ালার দুইজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। একজনের নাম আত্মপ্রকাশ। কালীকম্‌লীওয়ালার হৃষীকেশের গদি প্রাপ্তি উপলক্ষে শিষ্যদ্বয় মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হওয়ায় আত্মপ্রকাশ হৃষীকেশ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এই আশ্রম স্থাপিত করিয়াছেন। অপর শিষ্য নাথজী কালীকম্‌লীওয়ালা নাম গ্রহণ করিয়া গুরুর গদিতে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

স্বর্গাশ্রমে সন্ন্যাসীদের সাধনভজন জন্য ইংরেজীতে নম্বর দেওয়া "কুঠিয়া" (ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর) আছে। এক একটী কুঠিয়া এক একজন সন্ন্যাসী থাকিবার জন্য। এই সমস্ত কুঠিয়াবাসী সন্ন্যাসিগণ স্বর্গাশ্রম ছত্র হইতে আহার পাইয়া থাকে।

দুই একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করিলাম। তাঁহারা তাঁহাদের ঐহিক সুবিধা অসুবিধার কথাই বলিলেন যথা—"ছত্র হইতে আহার্য্য পাওয়া গেলেও রাত্রে প্রদীপ জ্বালিবার তৈল কি বস্ত্র পরিষ্কারের সাবান পাওয়া যায় না। যাহাদের ধূমপান অভ্যাস আছে তাহারা বিড়ি এবং দেশলাই পায় না। আহার্য্যও প্রত্যহ একজাতীয়। তবে যে সমস্ত সন্ন্যাসীর অর্থের সংস্থান আছে তাহাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।" ইত্যাদি।

কুঠিয়াগুলি দেখিয়া ক্রমে ছত্রে পৌঁছিলাম। স্বামী আত্মপ্রকাশ এখন আশ্রমে উপস্থিত নাই—কলিকাতায় আছেন, তাঁহার সঙ্গ দেখা হইল না। স্বর্গাশ্রমের পক্ষ হইতে, আশ্রম ঘাট হইতে রামঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গায় খেয়া দেওয়া হইয়া থাকে, পার হইতে কোন পয়সা দিতে হয় না। আমরা খেয়ায় গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যাহ্নে ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম।

অপরাহ্নে বরদাবাবু ও আমি বাহির হইলাম। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত একজন বি-এল্ উকীল সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া হৃষীকেশে এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন,

তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম তিনি অসুস্থ, দেখা হইল না। আমরা অন্যত্র সন্ন্যাসী দর্শনে গেলাম।

লছমোনঝোলা যাওয়া আসার পথে সর্ব্বানন্দ ব্রহ্মচারী নামে একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। তিনি চন্দ্রভাগা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী দ্বীপাকার স্থানে এক কুঠিয়ায় থাকেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার কুঠিয়ায় গেলাম। কুঠিয়ার নিকট গঙ্গাতীরে আমরা উপবিষ্ট হইলাম। সেখানে আরও দুইটী নবীন সন্ন্যাসী ছিলেন। বরদা বাবু ব্রহ্মচারীজীর সহিত আধ্যাত্মিক আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন, আমি "যাবৎ কিঞ্চন্নভাবতে" চাণক্য বাক্য স্মরণ করিয়া গঙ্গাস্রোত দেখিতে লাগিলাম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি পার্ব্বত্যপথ—তাহাও সুপরিচিত নহে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

মাতাঠাকুরাণীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাকে লছমনঝোলায় লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না। আগামী কল্য অন্যান্য সকলকে লইয়া আমি লছমনঝোলা যাইব, দীনেশ (আমার আত্মীয় যুবক) ও বরদাবাবু বাসায় রহিবেন স্থির হইল। ৪টা জুন অতি প্রত্যূষে (৪ঘটিকা) আমরা লছমনঝোলা রওনা হইলাম। অনেক যাত্রী আমাদের পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াছে। যথাসময়ে লছমনঝোলা পৌঁছিলাম এবং কেদার বদরীর পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। গঙ্গাস্নান অন্তে পুনরায় হৃষীকেশ যাত্রা করিলাম।

চড়াই শেষ করিয়া পাহাড়ের অধিত্যকায় আসিলে কয়েকটী হিন্দুস্থানী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল। তাহাদের সকলেরই মূল্যবান "হাল ফ্যাসানের" বেশভূষা। যুবক-গুলি সকলেই তাম্বুলবিলাসী। আমরা বিশ্রাম জন্য উপবিষ্ট হইলে পর একটী যুবক নিকটে আসিয়া আলাপ করিল। জানিতে পারিলা তাহাদের বাড়ী বিজনৌর জেলায় এবং তাহারা লছমনঝোলা দেখিতে যাইতেছে। লছমন ঝোলায় কি কি দ্রষ্টব্য আছে আমার নিকট হইতে জানিয়া লইল। আলাপ অন্তে আমাকেও তাম্বুল গ্রহণে অনুরোধ করিল। আমি যদিও পাণ খাই না, তথাপি আমার সঙ্গে পাণ খাইবার লোকের অভাব ছিল না।

আমাদের পূর্ব্বেই যুবকদল রওয়ানা হইল। পোষাকে "বাবু" সাজিলেও শারীরিক শক্তির সদ্ব্যবহারে তাহারা পরাঙ্মুখ নহে। নিজেদের জিনিষ পত্র নিজেরাই পৃষ্ঠে লইয়া চলিল।

লছমন ঝোলা যাইবার পথে আমরা সম্পূর্ণ পথই পদব্রজে গিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রামঘাট হইতে একা করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

মাতাঠাকুরাণী অদ্য অন্ন পথ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি আর হৃষীকেশে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া পুনরায় হরিদ্বার যাত্রা করিলাম।

৫ই জুন—হরিদ্বারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দিল্লী হইতে আমার ভাগিনেয়ের পত্র পাইলাম। বাবাজী দিল্লী রামযশ্ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল। এই অসহ্য গরমে সকলকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে কেন বাহির হইয়াছি তজ্জন্য প্রথমতঃ আমাকে অনুযোগ, পরে পরিবারবর্গ সহ সত্বর তাঁহার নিকটে পৌঁছিবার আদেশ, নিবেদন অথবা আব্দার।

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া মাতাঠাকুরাণী দিল্লী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। "তাঁহার বয়স হইয়াছে কখন কি হয় বলা যায় না সুতরাং তাঁহাকে অগ্রে কুরুক্ষেত্র মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি দেখাইয়া পরে আমার কেদার বদরী যাওয়া না যাওয়া!"—এই হইল মা'র দিল্লী যাইবার যুক্তি। "কখন কি হয় না হয়"—এর সঙ্গে বয়সের কোন সম্বন্ধ নাই, যদি বা থাকে তবে আমার বয়সও পঞ্চাশের কাছাকাছি—মা'কে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না, আমাদের দিল্লী যাওয়াই স্থির হইল।

যে আশা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইল না, মনে বড় কষ্ট হইল, কিন্তু নিরুপায়।

শ্রীশ বাবু আমাদের হৃষীকেশ যাইবার পূর্ব্বেই সপরিবারে দেরাদুন চলিয়া গিয়াছেন। বরদা বাবু অদ্য রাত্র ৯টার ৺কাশীধাম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনিও অনেকটা নিরাশ হইয়া গেলেন। তাঁহার বড়ই সাধ ছিল যে হরিদ্বার কি হৃষীকেশে কোনও ধ্যান নিমগ্ন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়; কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মত সন্ন্যাসী প্রথমে "তিষ্ঠ" বলিবেন, পরে ব্যুত্থিত অবস্থায় নানারূপ আধ্যাত্মিক আলাপ করিবেন এবং ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিবেন। বরদা বাবুর এ বাসনা পূর্ণ হইল না।

আমরা আগামী কল্য দিল্লী যাইতে উদ্যোগী রহিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীশচ্চন্দ্র আচার্য্য।

মানস দহ

(গল্প)

একদা দুই কুলবধূ সন্তানকামনায় গোপনে মানস-দহে পূজা দিতে গিয়াছিল। তাহারা বাল্যসখী। শ্বশুরবাড়ী আসিয়া অবধি সুখে দুঃখে দুইটিতে কাল কাটাইতেছিল। তাহাদের নাম সুকুমারী ও মনোরমা। সুকুমারীর স্বামী সঙ্গতিপন্ন; বাড়ীতেই থাকেন। বাড়ীতে বৃদ্ধা শাশুড়ী ব্যতীত আর স্ত্রীলোক নাই; প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটী একরূপ জনহীন। সুকুমারীর শ্বশুরবাড়ীর কিছু দূরেই মনোরমার শ্বশুরবাড়ী। মনোরমারও স্বামী ব্যতীত আর কেহ নাই। স্বামীর চাকুরির উপর নির্ভর। সকালবেলা খাইয়া তিনি দশটার ট্রেণে কলিকাতার আফিসে যান; এবং সন্ধ্যার ফিরিয়া আসেন। বাড়ীতে তিনখানি মেটে ঘর। সমস্তদিন মনোরমা সুকুমারীর কাছে থাকিত। এইরূপে দুইজনে বেশ স া ব জ ন্মিয়া-ছিল। দুঃখের বিষয় অনেক বয়স পর্য্যন্ত দুইজনেরই সন্তান হইল না। দুইজনেই নানাস্থানে আরাধনা করিতে লাগিল। অবশেষে মানস দহের নাম শুনিয়া গঙ্গাস্নানের ব্যপদেশে সেখানে গিয়াছিল।

মানস দহ একটা ক্ষুদ্র নদীর অংশবিশেষ। নদীটি ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে। দহটি নদীসংলগ্ন এক গভীর খাল। এই স্থান ভাগীরথী তীরের নিকটবর্ত্তী। ইহার গভীরতা কত কেহই স্থির করিতে পারে নাই। বর্ষার সময় এই খালে ভয়াবহ আবর্ত্তসকলের উদ্ভব হইয়া থাকে। নৌকা লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক হয়। অনেক নৌকা এখানে জলমগ্ন হইয়াছে। এখানকার আর একটি ভয়ের কারণ কুম্ভীর। একত্র এত কুম্ভীর বোধ হয় কেহ দেখেন নাই। বর্ষা অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই কুম্ভীর অধিক দেখা যায়। তখন নদী শুকাইয়া যায়, দহের জলও কমিয়া আসে, যত কুম্ভীর আসিয়া তখন এইখানেই আশ্রয় লয়। পূজা দিতে গিয়া অনেকে পাকা কলা লইয়া যায়। জলে একছড়া কলা ফেলিবামাত্র দুই তিনটি প্রকাণ্ড কুম্ভীর ভাসিয়া উঠিয়া কলা লইয়া কাড়াকাড়ি করে। রৌদ্রের সময় দশবিশটা ডাঙ্গায় পড়িয়া রৌদ্র পোহায়।

এ হেন মানস দহে স্ত্রীলোকেরা সন্তানার্থ পূজা দিতে যায়। তীরস্থিত কুলগাছের গোড়ায় দহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা হয়। পূজা শেষ হইলে সন্তান মানসে দহে নামিয়া ডুব দিতে হয়। তীরের নিকটে কুম্ভীর ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তবু ডুব দেওয়া চাই। তবে এ এ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোককে কুম্ভীরে খাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। যে সাহস করিয়া ডুব দিতে পারে, এবং ডুব দিয়া ঝিনুক কিংবা ঘুটিঙ তুলিতে পারে, তাহারই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। যে কুম্ভীরের ভয়ে নামিতে পারে

না তাঁহার কোন আশাই নাই। ঘুটিও তুলিলে পুত্র আর ঝিনুক তুলিলে কন্যা।

পূজা শেষ হইলে মনোরমা ও সুকুমারীকে পূজারী ডুব দিতে বলিলেন। আসার পর হইতে অনেক কুম্ভীর দেখিয়া সুকুমারীর মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সে কিছুতেই জলে নামিল না। মনোরমা প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া জলে নামিল এবং এক ডুবে একটী ঘুটিও তুলিল।

বাটী ফিরিয়া আসার কয়েক মাস পরে মনোরমার গর্ভসংবাদে সুকুমারীর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মনোরমা একটী সুন্দর পুত্র প্রসব করিল। এই সময় হইতে এই দুই নারীর মনোমধ্যে এক ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হইল।

২

অবস্থা বেশ স্বচ্ছল না হইলেও মনোরমার স্বামী পুত্রের অন্নপ্রাশনে বেশ ধুমধাম করিলেন। সুকুমারীর কিন্তু প্রাণ খুলিয়া এ আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পারি না। ভাব। * সে ভাব মনোরমা ব্যতীত আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। মনেরমা সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক। সে তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইল না। সখীর নিঃসন্তান অবস্থা ভাবিয়া সে আর কিছু মনে করিল না।

কিছু দিন পরে সুকুমারী স্বামীর নিকট আবদার করিল, একবার পশ্চিমে যাওয়া যাক্। স্বামী পত্নীর আবদার প্রায়ই উপেক্ষা করিতেন না।

তাঁহারা পশ্চিম রওনা হইলেন। ধনী দম্পতী অজস্র অর্থব্যয় করিয়া প্রায় ছয় মাস প্রবাসে কাটাইয়া আসিলেন। সুকুমারী ফিরিয়া আসিলে মনোরমা তাহার সহিত দেখা করিতে গেল। সুকুমারী তেমন আগ্রহের সহিত আলাপ করিল না। এইবার মনোরমা যথার্থ ক্ষুণ্ণ হইল। সে ভাবিয়া পাইল না, সখী কেন তাহার উপর বিরূপ। সে বুঝিল, সুকুমারী তাহার সঙ্গ চায় না। ক্রমে তাহাদের আলাপ স্নানের ঘাটে যাইবার সময় পথের আলাপে পরিণত হইল।

দুই বৎসর পরে মনোরমা দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। এইবার মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্য পূজা দিবার পালা। তাহার স্বামী যথাসাধ্য ব্যয়ে মানস দহে পূজা দিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় পুত্রের অন্নপ্রাশনেও গ্রামের সকলকে খাওয়ান হইল।

অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বেই সুকুমারী পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার স্বামী বুঝিতে পারিলেন না যে সুকুমারী কেন এ সময়ে পিত্রালয়ে যাইতে চায়। মনোরমার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার অভাবও তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কোথায় গেল সে আসা যাওয়া ও সে নিমন্ত্রণ খাওয়া? তিনি খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্ত্রী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয় ভাবিয়া আর উচ্চবাচ্য করেন নাই।

৩

আরও দেড় বৎসর পরে তৃতীয় পুত্র প্রসব করিয়া মনোরমা সূতিকা রোগে শয্যাগ্রহণ করিল। তাহার পিত্রালয়ে কেহই ছিল না; স্বামীই শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সুকুমারী লোকদেখানো ভাবে দুই চারিদিন দেখিতে আসিল, সেবা যত্নের কিছুই করিল না। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও মনোরমা দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। অবশেষে চিকিৎসকেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। তাহার স্বামী ছুটি লইয়া বাটীতে বসিলেন।

সুকুমারীর স্বামী সুকুমারীকে মনোরমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সে বলিত, "দুদিন ত যাই নি।" তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। একদিন তিনি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমার সইয়ের সঙ্গে কি হ'য়েছে বল ত?"

সুকুমারী বলিল, "কি আবার হবে?"

তাহার স্বামী বলিলেন, "তাকে দেখতে যাওনা কেন?"

সুকুমারী বলিল, "যাই বৈকি। বাড়ীর কায-কর্ম্ম সেরে রোজ কি ক'রে যাই বল?" তিনি আর কথা কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে কাঁটা ফোটায়

মত কি যেন খচ্‌খচ্‌ করিতে লাগিল। সেই দিন হইতে তিনি দুইবেলা মনোরমার সংবাদ লইতে লাগিলেন।

৪

যেদিন মনোরমার জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, সে এক মেঘাচ্ছন্ন শীতের দিন। সমস্ত দিন কন্‌কনে হাওয়া বহিতেছিল।

মনোরমার অবস্থা খুব খারাপ দেখিয়া বৈকালে সুকুমারী তাহাকে দেখিতে গেল। দেখিল শয্যায় ম্লান দেহলতা পড়িয়া আছে। তাহার স্বামী অধোমুখে বসিয়া আছেন। মনোরমার দৃষ্টি স্বামীর উপর নিবদ্ধ। বড় ছেলেটি মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া আছে। মধ্যমটি মুড়ি খাইতেছে, আর ছোটটি ঘুমাইতেছে।

সুকুমারীকে দেখিয়া মনোরমার স্বামী বিছানা হইতে উঠিলেন। মনোরমা দৃষ্টি ফিরাইতেই সখীকে দেখিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "এস বোন! চল্‌লাম; মনে কিছু ক'রো না। যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি ক্ষমা ক'রো।"

সুকুমারী কাছে বসিয়া বলিল "ওকি কথা বল্‌চ? তুমি আরাম হবে।"

মনোরমার পাণ্ডুর মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বহু কষ্টে বলিল, "কাল আর দেখ্‌তে পাবে না।"

সুকুমারী অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "সই, একটি কথা রাখবে?"

মনোরমা বলিল, "কি, বল না সই?"

সুকুমারী বলিল, "তোমার তিনটি ছেলে একটি আমাকে দাও, ছেলের মত মানুষ করব।"

মনোরমা বলিল, "তুমি পারবে না সই! ছেলের মা নও, অত ঝক্কি সইতে পারবে না।"

সুকুমারী সোৎসাহে বলিল, "খুব পারব ভাই! আমার অত বিষয় আশয়, কে ভোগ করবে? একটি ছেলে আমায় দাও তুমি!"

মনোরমা বলিল, "মাপ করো ভাই! ছেলে আমি দিতে পারব না।"

মনোরমার স্বামী মেঝের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া মনোরমা বলিল, "আমার ছেলে কাউকে দিতে পাবে না। যত কষ্টই হোক, তোমাকেই মানুষ ক'রতে হবে। যদি আবার বিয়ে কর, তবু আমার ছেলেগুলি মানুষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভার তোমারই উপর। মানুষ হ'লেই তুমি খালাস।"

এই কথাগুলি মনোরমা বড় জোরের সহিত বলিল, এবং অধিক পরিশ্রমের পর মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। তাহার স্বামী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার নিকট বসিলেন। সুকুমারী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আকাশ পূর্ব্বাবধিই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। অল্পক্ষণ পরেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

৫

সন্ধ্যার পর মনোরমার মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুকুমারীর স্বামী বাড়ী আসিলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুকুমারীকে দেখিতে না পাইয়া ডাকিলেন, "কোথায় গেলে!"

তাঁহার বৃদ্ধা জননী বলিলেন, "বউমা ত উপরেই আছেন।"

তিনি একবারে উপরে উঠিয়া গেলেন। দেখিলেন, সুকুমারী হেঁটমুখে বসিয়া আছে। তাঁহার সাড়া পাইয়া সুকুমারী মুখ তুলিল। তিনি দেখিলেন, তাহার কপোলে অশ্রুচিহ্ন। ভাবিলেন সইয়ের জন্য সুকুমারী কাঁদিতেছে। তিনি বলিলেন, "আহা, কাচ্চা বাচ্চাগুলি নিয়ে ওর স্বামীর কি কষ্টই হবে! তুমি গিয়ে ছেলেগুলিকে নিয়ে এস না হয়।"

সুকুমারী কিছুই বলিল না।

স্বামী বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র কিছু খেতে দাও, শ্মশানে যেতে হবে।"

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত সুকুমারী গর্জ্জন করিয়া বলিল,

"কিছুতেই না। এই দুর্য্যোগে আমি তোমাকে কোথাও যেতে দিব না।"

তাহার স্বামী দুইবার চক্ষুর পলক ফেলিয়া বলিলেন, "সে কি কথা! আমাদের আত্মীয়, আর এই বিপদ! শ্মশানবন্ধুর কায করবো না? না গেলে নিন্দে হবে যে!"

সুকুমারী একটুও দমিল না। বলিল, "যাওয়া হবেই না. গেলে আমি অনর্থ করবো।"

"আচ্ছা, যা ভাল বোঝ কোরো।"—এই বলিয়া তাহার স্বামী গমনোদ্যত হইলেন।

সুকুমারী দুয়ার আটকাইয়া বলিল, "যাও দেখি, কেমন যাবে! যদি জোর ক'রে যাও ত ফিরে এসে আর আমাকে দেখ্‌তে পাবে না।"

তাহার স্বামী বিরত হইয়া বলিলেন, "কারণটা কি শুনি?"

সুকুমারী বলিল, "মনোরমা আমার যথেষ্ট অপমান করেছে।"

স্বামী বলিলেন, "সে ত আর নেই, এখন কি আর রাগ রাখতে আছে?"

সুকুমারী বলিল, "তোমার পায়ে ধরি, যত নিন্দাই হোক, তুমি যেতে পাবে না। আমি নিঃসন্তান বলে, সে আমার মর্ম্মান্তিক অপমান করেছে।"

এই বলিয়া সে স্বামীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার স্বামী কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "তবে যাব না।"

বাহিরে তখন প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল। ঝড় বৃষ্টি ও অন্ধকার একযোগে বিশ্বগ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

অভ্যাস

চিত্তকে স্থির করিবার জন্য যে যত্ন, যে যত্নে চিত্ত রজস্তমোবৃত্তি শূন্য হয়, যে যত্নের সুফল চিত্তের একাগ্রতা, সেই যত্নে ও তদ্রূপ অনুষ্ঠানে তৎপর থাকার নাম অভ্যাস। কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সাধনের জন্য চিত্তের বহির্গতি ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইলে, চিত্তকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায় আনিতে গেলে, এবং তদবস্থা স্থায়ী করিতে হইলে অভ্যাসের প্রয়োজন। যে যেরূপ অভ্যাস করে, সে সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে তাহা স্বভাবের সমবল ধারণ করে।

দুঃখ, মনঃক্ষোভ, শারীরিক পীড়া সর্ব্বদাই আমাদের সহচর। চিত্ত স্থির করিবার জন্য যত্ন করিতে গেলে উহারা প্রতিবন্ধক হয় ও নানা বিঘ্ন উৎপাদন করে। তাহা নিবারণের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা আমাদের মনোমত বিষয় বা বস্তু চিন্তা করিতে হইবে; এবং আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে তাহাতে বিযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। সুখলাভ করিতে গেলে, সেই চিন্তা কেবল মাত্র সুখের দিকেই চালনা করিতে হইবে; সকল বিষয়েরই সুন্দর ও সমুজ্জ্বল দিক দেখিতে হইবে এবং প্রতিনিয়তই আপন চিন্তা তাহাতেই ফিরাইয়া—তাহাতেই অভিনিবিষ্ট ও প্রলিপ্ত করিয়া রাখিতে হইবে। দিনে যখন অন্তের সাহচর্য্য করিবে, অন্তের অপেক্ষায় জন্য সময়ক্ষেপ করিবে, রাত্রে নিদ্রা যখন তোমার চক্ষুর পাতা বুজিতে দিবে না, তখন প্রীতিকর চিন্তাতেই তোমার চিত্ত যেন সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে। ঘরে বিশ্রাম লাভের সময়ে বা বাহিরে চলিবার ফিরিবার সময়ে তোমার চিত্ত কখনও যেন খালি থাকে না। তোমার চিন্তা, তখন তোমার সুখের অনুকূল, প্রতিকূল বা ক্ষতিকর হইতে পারে, তখন তোমার চিন্তাকে যথোচিত ভাবে

পরিচালিত করিও; দেখিবে অন্যান্য অভ্যাসের ন্যায় তোমার সুখশান্তের চিন্তা কেমন সহজে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। যিনি ঈশ্বর লাভে প্রয়াসী, তিনি অনুক্ষণ ঈশ্বর ধ্যান ও ঈশ্বর চিন্তা করিবেন। যতক্ষণ না, যতদিন না তুমি তোমার ইষ্ট দেবতায় অনন্যচিত্ত হইতে পারো ততক্ষণ ও ততদিন বারবার বহুবার কেবল তাহাই ধ্যান ও চিন্তা করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা তোমার চিত্তে একাগ্র শক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে। ধ্যেয় বস্তুর সহিত চিত্তের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ উৎপন্ন হইবে, তুমি তন্ময় হইয়া যাইবে। কর্ম্ম সাধন করিতে গেলে, সংসারে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে গেলে, মৈত্রী, করুণা, প্রীতি, উপেক্ষা অবলম্বন করিবে। সর্ব্বদা সুখীর প্রতি মৈত্রী, দুঃখীর প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি প্রীতি ও পাপীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে। এইরূপ করিতে করিতে তোমার চিত্ত ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইয়া একাগ্র শক্তিসম্পন্ন হইবে; তোমার কর্ম্ম সাধন ও কর্ত্তব্য পালন অতি সহজ হইয়া পড়িবে ও উহার ফল অচিরেই তোমার করতলগত হইবে। এইরূপে আত্মবিবেকের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া ক্ষিপ্রভাবে ইচ্ছা শক্তির পরিচালন ও চিত্তস্থৈর্য্য সাধন এবং তদ্দ্বারা রজস্তমোবৃত্তির নিরোধন, নৈতিক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আমাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

ঐরূপ প্রক্রিয়া, ঐরূপ অভ্যাস, ঐরূপ ইন্দ্রিয় নিরোধ ক্ষমতা দুই এক দিনের কার্য্য নহে। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিরন্তর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্রহ্মচর্য্য, উৎসাহ, আগ্রহ ও আদরের সহিত উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে তবে ক্রমে উহা দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে। তখন তোমার চিত্ত, তোমার অধীনে হইবে। তখন তুমি তোমার চিত্তকে যখন যথায় ইচ্ছা তথায় নিবিষ্ট ও প্রযুক্ত করিতে পারিবে। তাহাতেই সে স্থির হইবে, তন্ময় হইবে। তদনন্তর সমুদয় স্বরূপ ও অন্তস্তত্ব সাক্ষাৎকৃত হইবে; কোন অংশই আবৃত থাকিবে না। চিত্ত নির্ম্মল ও স্থির হইলে, অভ্যাস বলে অভীপ্সিত বিষয়ে একাগ্র শক্তি জন্মিলে, তাহা কি পরমাণু, কি পরম মহৎ—সর্ব্বত্রই স্থির হয়। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তুই তাহার বশ হয়।

যাঁহারা আপন আপন অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অভিজ্ঞ লোকদিগের উপদিষ্ট উপায়ে সেই কার্য্যের জন্ম বারংবার চেষ্টা না করিলে, কিছুতেই তাহার ফল লাভ করিতে পারিবেন না। অভ্যাসের মহিমার সীমা নাই। অভ্যাস বলে অজ্ঞ বিজ্ঞ হয়, অলস কর্ম্মী হয়, অসৎ সৎ হয়। অভ্যাস বলে বাণ দ্বারা সুদূরে স্থিত লক্ষ্যও বিদ্ধ করিতে পারা যায়, পর্ব্বত চূর্ণ করিতে পারা যায়। অভ্যাস গুণেই কটু দ্রব্য মিষ্ট লাগিয়া থাকে। অভ্যাস গুণে নিমের তিক্তস্বাদও ক্রমে সহ্য হইয়া যায়। সর্ব্বদা নিকটে থাকার গুণে অনাত্মীয় বন্ধু হইয়া যায়, আবার দূরে অবস্থিতির অভ্যাস বলে আপনার প্রিয় বন্ধুর প্রতিও ভালবাসা কমিয়া যায়। পুণ্যও বিফল হইয়া যায়, অষ্টবিধ যোগ সিদ্ধিও বিফল হইতে পারে, ভাগ্যও বিপরীত হইয়া থাকে; কিন্তু অভ্যাস কখনও বিফল হয় না। অভ্যাসের এমনই গুণ সে অভ্যাস বলে দুঃসাধ্য কার্য্যও সাধিত হয়, শত্রুও মিত্র হইয়া যায়, বিষও অমৃত হইয়া উঠে। কল্পবৃক্ষ যেমন যাচকের মনোমত ফল প্রদান করে, চিন্তামণি যেমন অভীষ্ট ফল বিতরণ করে, অভ্যাসও সেইরূপ অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকে। একমাত্র অভ্যাসরূপ সূর্য্যই সকল জীবের হৃদয়ে সকল প্রকার বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে। এক কার্য্য পুনঃ পুনঃ করাকেই অভ্যাস বলে; সেই অভ্যাসই পুরুষার্থ; সেই অভ্যাস ব্যতীত অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির আর কোন উপায় নাই। নিজের বিবেক বুদ্ধিতে যাহা অভিমত বলিয়া বোধ হইবে, তাহা সাধন করিতে হইলে দৃঢ় অভ্যাসের পরিচর্য্যা করিতেই হইবে, নতুবা কিছুতেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। একমাত্র অভ্যাসের গুণেই ভীরু-লোক ঘোর সাহসী হইয়া হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ ঘোর কাননে বা পর্ব্বত গুহায়, সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে।

অভ্যাস বলেই ভগবান শঙ্করাচার্য্য সোঽহং বলিয়া শিবময় হইয়াছিলেন। অভ্যাস বলেই শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণময় হইয়াছিলেন—

"অনুখন, মাধব মাধব সুমরইত
সুন্দরি ভেল মধাই।
ও নিজভাব সোভাব হি বিসরল
আপন গুণ লুবধাই॥" বিদ্যাপতি।

গীতগোবিন্দ—
"মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা
মধুরিপু রহমিব ভাবন শীলা॥"

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

তিব্বতীয়দিগের শব-সংকার প্রথা

তিব্বতে কাহারও প্রাণবিয়োগ ঘটিলে এদেশের মত তৎক্ষণাৎ তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় না, মৃতদেহটিকে শ্বেতবস্ত্রাবৃত করিয়া লামার আদেশ প্রতীক্ষায় দু'তিন দিন পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। দিনক্ষণাদি বিচার পূর্ব্বক লামা সংকারের প্রণালী নির্দ্দেশ করিলে শবযাত্রার উপযোগী আয়োজনাদি হইতে থাকে।

শবটিকে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত শবাধার মধ্যে স্থাপিত করিয়া সমবেত আত্মীয়কুটুম্বগণ পরলোকগত আত্মার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তন্মধ্যে একখানি শ্বেত বস্ত্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তৎপরে নিশানের মত একখণ্ড শ্বেতবস্ত্র হস্তে লইয়া লামা ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে "মুর্দ্দা পাহাড়" (সমাধি-পাহাড় বা শ্মশান) অভিমুখে অগ্রসর হইলে প্রজ্বলিত ধুপ হস্তে ধুপবাহক, ও তৎপশ্চাতে শববাহী ডোমগণ শবটিকে দণ্ডায়মানভাবে স্থাপিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে।

তিব্বতে শববহন, শবানুগমন ও শবসংকার প্রভৃতি কার্য্য "শববাহী ডোমগণ" কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, মৃতের আত্মীয়গণের মধ্যে কেহই শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গমন করে না।

দার্জ্জিলিং-প্রবাসী তিব্বতীয়গণের মধ্যে এ নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়; এদেশে তিব্বতের ন্যায় শববাহী ডোমজাতির বসতি না থাকায়, মৃতের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণই সংকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকে।

তিব্বতে, এক একদিনের পথ ব্যবধানে প্রত্যেক গ্রামের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "মুর্দ্দাপাহাড়" নির্দ্দিষ্ট আছে। নির্দ্দিষ্ট "মুর্দ্দাপাহাড়ে" ডোমগণকর্ত্তৃক শব আনীত হইলে, লামার নির্দ্দেশ অনুসারে কোনটি ভূমিতে প্রোথিত, কোনটি অগ্নিতে ভস্মীভূত, কোনটি নদীতে নিক্ষিপ্ত, কোনটি বা গৃধ্রের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে।

অগ্নি-সংকার প্রায় অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। বিশেষ সম্পত্তি সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী লামাগণের মৃতদেহ চন্দনকাষ্ঠ সংযোগে দাহ করা হয়।

সাধারণতঃ সমাধি ও গৃধ্রভোজন, এই দ্বিবিধ প্রথাই বিশেষরূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সমাধিপ্রদান করিতে হইলে, শবটীকে শবাধার হইতে উত্তোলন করিয়া গোরের ভিতর দণ্ডায়মানভাবে স্থাপন করা হয়, এবং গর্ত্তটি মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

নিতান্ত নিঃসম্বল দরিদ্র ব্যতীত প্রায় সকলেই সমাধি স্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া থাকে।

যে সকল শব গৃধ্রের জন্য উৎসর্গীকৃত হয় সেগুলিকে প্রথমতঃ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সাহায্যে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলা হয়, এবং অস্থি

ও মস্তক প্রভৃতি কঠিন অংশ গুলিকে প্রস্তরে পিষিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করা হয়।

সম্পূর্ণ শবদেহটিকে এইরূপে গৃধ্রভোজনের উপযোগী করিয়া লামা দূর হইতে স-পারিষদ গৃধ্ররাজকে শাস্ত্রোক্ত-মন্ত্রে স্তবস্তুতি ও আবাহন করিতে থাকেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ-আহ্বানে হউক অথবা শবমাংস ঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, গৃধ্রগণ অনতিবিলম্বে শব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মাংসখণ্ড গুলিকে নিঃশেষে ভোজন করিয়া ফেলে।

এ প্রথা ব্রিটিশ আইনের অনুমোদিত নহে বলিয়া প্রবাসী তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক এদেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দার্জ্জিলিং-এ তিস্তা, রঙ্গীত প্রভৃতি খরস্রোতা নদী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ইহার কোনটিই গভীর নহে বলিয়া এদেশে কাহাকেও নদীতে শবনিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিব্বতীয়গণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মৃত্যুকালে মৃতব্যক্তির অঙ্গে যে সকল বস্ত্রালঙ্কার বর্ত্তমান থাকে, তাহা যতই মূল্যবান হউক, উন্মোচন করিয়া লওয়া হয় না, শবসৎকার সময়ে ডোমগণ উহা গ্রহণ পাইয়া থাকে। শবসৎকার কারিগণের নিমিত্ত মৃতের গৃহ হইতে ছারমদ্য, পিষ্টক, মাংস প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে মূর্দ্দা পাহাড়ে প্রেরিত হয়।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

আসল-পাওয়া

সব চেয়ে মোর আসল তারেই পাওয়া
এই—অসীম মাঝে তার চাহনিই ধ্রুবতারার চাওয়া।
মিলনে, পাই সুখের মাঝে
বিরহে, সে ব্যথার বাজে
ঘুমের ঘোরে আরও আপন—সোণার স্বপন ছাওয়া।

দূর অতীতের স্মৃতির রাঙা পদ্মোপরে সে,
ভবিষ্যতের ভীতির মাঝে আঁকড়ে ধরে সে।
যুগে যুগে পরাণ ভরি
তারেই পাওয়ার গর্ব্ব করি,
জন্মে জন্মে তাহার তরে অটল দাবী দাওয়'।

সোণার চাঁদের হাটে তাহার তাহারে পাই ফিরে
এক চাঁদেরই বহুধা পাই বিশ্বে হ্রদের নীরে।
যত্ন সেবা গৃহশ্রীতে
সংসারে তায় পাই প্রীতিতে,
তারে পাওয়ার কথাই গীতে ছন্দে আমার গাওয়া।

নিশ্বাসে পাই, স্পর্শনে পাই, পাই তাহারে ঘ্রাণে,
কায়-মনো-বাক্ ধেয়ানে পাই, তাহারে প্রাণে।
তাহায়, অপার শোক পাথারে
ভেলার মতন পাই সাঁতারে,
ওপার হতে পাওয়ার তারে এপার ছোঁয়া হাওয়া।

শ্রীকালিদাস রায়

হেমন্ত শেষে

হেমন্তের হিম বায়ে ঝরে পড়া শেফালীর দলে,
নিঃশ্বসিত কাশবনে শিশিরের অশ্রু মুক্তা ফলে,
মূর্চ্ছিত কাননকুঞ্জে শীর্ণদেহা তটিনী ধারায়,
কি কথা জাগিছে আজি অনিবার মৌন বেদনায়
নির্ম্মম রহস্যবাণী। কহে' যায় উত্তর পবন,
'নহে আর হাস্যময় জীবনের নব মুঞ্জরণ,
যৌবন সার্থক হল, ফুটিবার পালা হল শেষ,
এবার ঝরিতে হবে—সুদূরের এসেছে আদেশ।'
—শেফালী ধূলায় লুটি চাহে রিক্ত পল্লবের পানে,
উপল আহত গতি তটিনীর বিদায়ের গানে
ক্রন্দন মুখর শস্যশ্যামলিত চারু তটভূমি.
তৃণতরুবল্লরীর বিগলিত হিম অশ্রু চুমি
বিশীর্ণ কুসুমে পর্ণে বনে বনে অস্ফুট আভাস
সকরুণ শেষ বারতার,—'ছুঁয়ে গেল হিমের বাতাস,
মরণ পরশে তার ঝরে যাই মরে যাই তবে;
মৃত্যুর আঁধার বক্ষে অন্তহীন জীবন গৌরবে
শীতের জড়িমা শেষে বসন্তের নব জাগরণে
আবার আসিব ফিরে নবরূপে কাননে কাননে।'

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

চীনপরিব্রাজকগণের বর্ণিত মথুরা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিয়ন্থসাং বা ইয়াংচুয়াং

ইনি চীন হইতে স্থল পথে তক্‌লামকান্ নামক মরু ভূমির উত্তর পথ দিয়া ও পরে সমরকন্দের মধ্য দিয়া ভারতে আইসেন এবং পামির ও খোটানের ভিতর দিয়া দেশে ফিরিয়া যান। সুতরাং তাঁহাকে গমনাগমন উভয় কালেই সুদীর্ঘ, দুর্গম ও জীবন-সঙ্কটকর পথ অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ইনি ভারতের বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এখানি না থাকিলে হয়ত তাৎকালীন ভারতের ইতিহাসের অনেক অংশ অন্ধকারে থাকিয়া যাইত। ইনি সম্রাট্ শ্রীহর্ষের রাজত্ব কালে ভারতে আসিয়া তাঁহার বন্ধুগণ মধ্যে পরিগণিত হন। খৃষ্টীয় ৬২৯ হইতে ৬৪৫ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন। এবং নালন্দা ও তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর থাকিয়া পালি ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া যান। আমরা Watter সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রন্থ হইতে অনুবাদ দিলাম।

হিয়ন্থসাং বলিতেছেন, তাঁহার সময়ে মথুরা মণ্ডলের পরিধি প্রায় ৫০০০ হাজার লি (অনুমান ৫০০ শত ক্রোশ) বং ইহার রাজধানী মথুরা নগরের পরিধি ২০লি (প্রায় ৪ক্রোশ হইবে)। এ প্রদেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। এদেশের লোকদিগের বাটীর উদ্যানে দুই রকমের আম্র ফলিত। তাহার মধ্যে ছোট জাতি পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হইত। বড় জাতীয় ফল গুলা, পাকিলেও হরিৎ বর্ণ থাকিত। এদেশের লোকেরা সুবর্ণ ও তুলার সূত্রে সূক্ষ্ম ডুরিয়া কাপড় প্রস্তুত করিতে

পারিত। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান। অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার সভ্য, ভব্য ও ভদ্রলোকের মত। ইহারা সদসৎ কর্ম্মের উপর মনুষ্যের শুভাশুভ ফল নির্ভর করে বলিয়া বিশ্বাস করে। নীতি ও জ্ঞানের সম্মান রাখে। এ প্রদেশে প্রায় ২০টী বৌদ্ধ সংঘারাম আছে। তথায় মহাযান্‌ ও হীনযান সম্প্রদায়ের দুই হাজারের উপর বৌদ্ধেরা বাস করে। শ্রমণেরা মহাযান হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি সযত্নে অভ্যাস করে। ভিন্ন ধর্ম্মীদের বা বৌদ্ধেতর হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের কেবল মাত্র ৫টী দেব-মন্দির পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত আছে। মথুরা নগরে অশোক নির্ম্মিত তিনটী স্তূপ আছে। তদ্ভিন্ন চারিজন অতীত বুদ্ধ এখানে অনেক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সারীপুত্র, মুদ্‌গল পুত্র, পুর্ণ মৈত্রেয়াণি পুত্র, উপালী, আনন্দ ও রাহুলের স্তূপে তাঁহাদের শরীরধাতু (অস্থি) অথবা অপর কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে। মঞ্জুশ্রী ও পুষারি নামে আরও দুইটী স্তূপ আছে। বৎসরের প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাসে এখানে পর্ব্ব বা মেলা হয়। প্রতি মাসের ৮।১৪।১৫।২৩।২৯ ও ৩০ দিবসে অর্থাৎ প্রতিমাসের এই ছয়দিনে এখানকার লোকেরা উপোষথ (উপবাস) করিয়া থাকে। অধিবাসীরা ঐ সকল পর্ব্বদিবসে পূজার জন্ম বহুমূল্য উপকরণ লইয়া দলে দলে নিজ নিজ অভীপ্সিত দেবতার স্তূপে যাইয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে, অভিধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা সারী-পুত্রের স্তূপে, সমাধি-সম্প্রদায়ের লোকেরা মৌদ্‌গল্যায়ন স্তূপে, সূত্র সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ণ মৈত্রেয়ানি স্তূপে, বিনয় সম্প্রদায়ের লোকেরা উপালী স্তূপে, ভিক্ষুণীরা আনন্দের স্তূপে, নবীন শ্রমণেরা রাহুলের স্তূপে এবং মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বোধিসত্ত্বের স্তূপে যাইয়া উপাসনা করে। পর্ব্ব বা উৎসব সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিয়া ছত্র, মাল্য, পতাকাদি দিয়া আপন আপন স্তূপগুলিকে সুসজ্জিত করে। গন্ধবাসিত ধূমে তখন চন্দ্র তপন এমন কি গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া যায়। বৃষ্টিধারার মত পুষ্প বর্ষণ হইতে থাকে। কেবল সাধারণ নিম্ন প্রজারা নহে, রাজারা, রাজ-পারিষদেরা এবং যাবতীয় সম্রান্ত লোকেরা পর্য্যন্ত এই শুভকর্ম্মে যোগদান করেন। নগর হইতে পাঁচ ছয় লি দূরে পূর্ব্বদিকে নদীর দুরারোহ তটের উপর যে পর্ব্বত সঙ্ঘারামটী আছে; অতি সংকীর্ণ নিম্ন পথ দিয়া তথায় যাইতে হয়। পরম পূজনীয় উপগুপ্ত এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটী স্তূপে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখর সমাহিত আছে। ইহার উত্তর দিকে পাষাণ-নির্ম্মিত-প্রাচীর বেষ্টিত একটী বিশ ফুট উচ্চ ও ত্রিশ ফুট চওড়া গুহাগৃহ আছে। তাহার ভিতর ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশ বা কাষ্ঠ খণ্ড সকল রাশিকৃত আছে। যখন পূজ্যপাদ উপগুপ্ত কোন বিবাহিত দম্পতীকে মন্ত্র ও দীক্ষা দিয়া অর্হৎ-পদে উন্নীত করিতেন, * তখন সে যাইয়া ঐ গৃহে একটী বংশ বা কাষ্ঠ দণ্ড পুঁতিয়া রাখিবার অধিকার পাইত। অবিবাহিত অর্হৎগণের জন্ম সে গণনায় সংখ্যা রাখা হইত না। এই উপগুপ্ত বিহার হইতে ২৪।২৫লি দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে একটী বৃহৎ শুষ্ক তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পার্শ্বে একটী স্তূপ আছে। পর্যটক ইয়াংচুয়াং বলিতেছেন যে,—যখন একদিন বুদ্ধদেব সেই বৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছিলেন, তখন একটী বানর আসিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মধু উপহার দিয়াছিল। বুদ্ধদেব মধুর সহিত জল মিশ্রিত করিয়া, সমস্ত শিষ্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া বানরটী অতিশয় আহ্লাদে লাফালাফি করিতে গিয়া, জলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। এই

* গৃহস্থেরা প্রথমে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের শরণ লইয়া, দুই অষ্টমী, দুই চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় পোষব্রত (উপবাস) পালন করিতেন। ঐ ঐ দিনে বিহারে যাইয়া তাঁহারা ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করিতেন বলিয়া তখন তাঁহাদের শ্রমণ বা শ্রাবক নাম হইত। তৎপরে ভিক্ষু হইয়া বিহারে যাইয়া বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল থাকিবার পর ক্রমে 'স্রোতাপন্ন' 'সকৃতাগামী' 'অনাগামী' প্রভৃতি পদ লাভ করিলে পর সর্ব্বোচ্চ 'অর্হৎ' পদবী প্রাপ্ত হইতেন। অর্হতেরা জন্ম জরা মরণাদি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মুক্ত পুরুষ।

সুকৃতির জন্ম বানর পরজন্মে মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শুষ্ক তড়াগের উত্তর দিকে, অনতিদূরে একটী বৃহৎ অরণ্য মধ্যে চারিজন অতীত বুদ্ধের (*) পাদচারণ জনিত পদাঙ্ক আছে। ইহার নিকটেই অপর এক স্থানে সারীপুত্র ও ১২৫০ জন বুদ্ধ শিষ্য সমাধিমগ্ন থাকিতেন। তাহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কয়েকটী স্তূপ আছে। বুদ্ধদেব এ প্রদেশে বহুবার আসিয়াছিলেন এবং যে যে স্থানে বসিয়া লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, সেই সকল স্থানে বুদ্ধদেবের কোন না কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন (চৈত্য, স্তম্ভ বা স্তূপাদি) সংরক্ষিত হইয়াছে।

T. Watter সাহেব টীকায় লিখিয়াছেন, অপরাপর চীনদেশীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, এই উপগুপ্ত বিহারটী যে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত ছিল, তাহার নাম উরুমণ্ড বা রুরুমণ্ড পর্ব্বত। চীনদেশীয়েরা বলেন, উরুমণ্ডের অর্থ বৃহৎ সর (great cream)। এই পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নামও উরুমণ্ড। এ স্থানটি শ্যামল তরুরাজি শোভিত। কেহ কেহ বলেন, নট ও ভট নামে দুই ভাই, তাঁহাদের নিজ নিজ নামে দুইটী বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। লোকে সেই দুইটীকে নটভট বিহার বলিত। উপগুপ্ত মথুরায় অবস্থানকালে এই নটভট বিহারে থাকিতেন। যে গুহায় উপগুপ্তের শিষ্যেরা বংশখণ্ড পুঁতিয়া রাখিত সেটী একটী স্বভাব-জাত পর্ব্বতগুহা। ইহাকে পরিষ্কার ও পরিবর্ত্তিত করিয়া গৃহ করা হইয়াছিল। উপগুপ্ত ১৮০০০ হাজার শিষ্যকে অর্হৎ পদে উন্নীত করিলে তাহারা যে সকল বংশখণ্ড পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেগুলি উপগুপ্তের চিতায় দগ্ধ করা হয়। এই এই পর্ব্বতের পার্শ্বে অপর একটী পর্ব্বতের নাম উশির বা শিরপর্ব্বত। যমুনার একদিকে ঋষিগ্রাম ও অপর দিকে পিণ্ডবন (বৃন্দাবন?) নামে দুইটী গ্রাম ছিল। কোন কোন বৌদ্ধজাতকের মতে মধুশাটী বা মধুবশিষ্ঠ নামে একজন ভিক্ষু পূর্ব্বজন্মকৃত পাপফলে বানর হইয়া জন্মিয়াছিল। বুদ্ধদেবকে মধুদান করিবার পর সে পাপমুক্ত হইয়া উপগুপ্তনামে জন্মগ্রহণ করে। এবং এই মধুদান ব্যাপার হইতে এস্থানের নাম, প্রথমে মধুরা, পরে মথুরা হইয়াছে।

উভয় পরিব্রাজকই বলিতেছেন যে, মথুরায় ২০টি সংঘাবাস ছিল। তাহাদের মধ্যে সারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ণ মহাকাশ্যপ, উপালি, আনন্দ ও রাহুল প্রভৃতি বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের, এবং মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞা ও অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণের নামে যে সকল স্তূপ ছিল, সেগুলি সমধিক বিখ্যাত। তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার শিক্ষা ও সাধনা হইত। পর্ব্ব ও মেলার সময় মহাসমারোহে উৎসব হইত।

কেবল সাধারণ লোকেরা নহে, এ দেশের রাজারা ও উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা পর্য্যন্ত, নানাবিধ উপহার লইয়া সে উৎসবে যোগদান করিতেন। পরিব্রাজকেরা কোনও রাজার নাম করেন নাই, তাঁহারা সম্ভবত মগধের অধীন সামন্ত ও করদ রাজা হইবেন। ইঁহারাও যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা বুঝা যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মথুরায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, এই চীন দেশীয় পর্য্যটকেরা তাহার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। হিএন্থসাং বলিতেছেন যে তখন মথুরায় কেবলমাত্র পাঁচটি হিন্দু দেবালয় পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থিত ছিল। আমাদের মনে হয় যে, সেগুলি আদি বরাহপুরাণোক্ত পদ্মদলমধ্যে অবস্থিত কেশবদেব, গোবিন্দদেব, দীর্ঘবিষ্ণু, বিশ্রান্তি ও বরাহদেব নামে যে পাঁচটি বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম আছে, তাঁহারাই হিএন্থসাং কথিত পাঁচটি মূর্ত্তি হইতে পারেন। কারণ বিষ্ণুভক্ত গুপ্ত সম্রাটেরাই ফাহিয়ান ও হিএন্থসাংএর মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভারতের কয়েকস্থানে বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাইতেছি। আরও একটা কারণ এই যে, প্রবল প্রতাপ গুপ্ত-সম্রাটেরা ছাড়া, সেই জৈন বৌদ্ধ প্রধান মথুরায়, তৎকালে অপর কেহ

---

* অক্ষোভ্য, রত্ন সম্ভব, অমোঘ সিদ্ধি, এবং বৈরোচন, শাক্য সিংহের পূর্ব্বে এই চারিজন আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা অতীত বা ধ্যানী বুদ্ধ নামে পরিচিত।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইতেন না। বুদ্ধদেব যে মথুরায় বহুবার আসিয়াছিলেন, এবং এখানে যে অশোকের তিনটী স্তূপ ছিল, তাহা হিএন্থসাং স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। বহুবার রাষ্ট্রবিপ্লবে ও লুণ্ঠনে সে সমুদয় ঐতিহাসিক নিদর্শন গুলি চিরতরে লোপ পাইয়াছে। কতক বা বৈষ্ণব ও হিন্দু মন্দিরাদির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। উভয় চৈনিক পরিব্রাজকের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, তাৎকালীন মথুরার অধিবাসিবৃন্দ প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। তাহারা তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতির সহিত সুবর্ণ-সূত্র মিশাইয়া সুন্দর সুন্দর বসন-বয়ন-কার্য্যে সুনিপুণ ছিল। তাহারা অহিংসাপরায়ণ, শান্তিপ্রিয় ও রাজভক্ত প্রজা ছিল। তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মই এখানকার রাজকীয় ধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ না করিয়া সখ্যভাবে শিষ্টশান্ত প্রতিবেশী মত এক পল্লীতে বাস করিতেন।

বলিতে কি, চৈনিক পরিব্রাজকদিগের নিকট মথুরার যতদুর বিশদ ইতিহাস পাইতেছি, ভারতীয় কোনও গ্রন্থে তাহা দুর্লভ। আমরা বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মাথুর শিল্পের নমুনা স্বরূপ যে সমস্ত চিত্র দিয়াছিলাম, সে গুলি 'রূপম্' নামক শিল্পকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক মথুরার যাদুঘর হইতে আনীত ও তাঁহার সৌজন্যে আমরা পাইয়াছি। এগুলি জৈন, বৌদ্ধ কিংবা ব্রাহ্মণ্য, কোন্ দেবতার মূর্ত্তি তাহা জানি না।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

বিরাট বধূ

বিশ্বরাণী বিরাট বধূ, কোথায় তিনি শুধাব কা'র ?
বিশ্বজোড়া প্রকাশ তাঁর নিত্য।
ক্ষুদ্র দুটি চক্ষু দিয়ে হেরিবে তারে পূর্ণতায়
দুরাশা মিছে করেছ মোর চিত্ত।
এ চোখে শুধু অংশ হেরি, শুনি ভূষণ-শিঞ্জরব
আঁচল-বায়ু পরশে যে গাত্র।
কখনো হেরি গুল্ফ তারি কখনো হেরি অশ্রুলব
কখনো হেরি কেশের গুছি মাত্র।
লাক্ষারাঙা চরণ তাঁরি সান্ধ্যরাগে দীপ্যমান,
ফাগুনে জাগে পলাশ রাগে লজ্জা।
কাঁকনে মণিবন্ধে বাজে কূজন কল গুঞ্জতান
গিরি-নিঝরে তাহারি উরঃ সজ্জা।
দিগন্তের ও কানন রেখা কৃষ্ণ ভুরু চক্ষে তার
নিশ্বাস তার নাগকেশর গন্ধে।

আষাঢ়-মেঘে থরে-বিথরে পুঞ্জীভূত চিকুর-ভার
চপলামালা এলায়ে পড়ে স্কন্ধে।
বদনারুণ-ভাতি ভাসিত কণ্ঠে দুলে নীহার-হার
জ্যোছনা'কাশে, কুমুদে তারি হাস্য।
মহা জলধি রত্ন ভরা নীল দুকূল অঙ্গে তার
নদী-লহরে নূপুর রত লাস্য।
বিরাট সেই দয়িত তার চুম্ব দিলে গণ্ড'পর
ইন্দ্রায়ুধে জাগে বরণ পুঞ্জে।
প্রিয়ের পরিরম্ভ লাভে রোমাঞ্চন হর্ষ কর
পুষ্পে ফুটে মঞ্জরিয়া কুঞ্জে।
কবি তাহারে হেরিবে বলি করিছে বহু স্তোত্র গান
রচিছে তার অর্ঘ্য কত ছন্দে।
শিল্পী বসি কল্প লোকে তুলিকা হাতে মুগ্ধ প্রাণ
আনিতে তারে চাহিছে রেখা-বন্ধে।

বিজ্ঞ যত বৈজ্ঞানিকে লাগায়ে কাচ কাচের পর
নয়ন দুটি নিয়ত তাহে লিপ্ত।
সর্ব্বগ্রাসী নেত্রে ক্ষরি আয়ত হতে আয়ত তর
তত্ত্ববাদী ফিরিছে যেন ক্ষিপ্ত।
ভক্ত যত তাহারি লাগি কুসুম তুলি রাত্রি দিন
চরণ দুটী বাঁধিতে রচে মাল্য।
ধরার পারে যাত্রী সবে হেরিতে তারে, বিরাম-হীন
দিবালোকেও হাজার দীপ জ্বাল্‌প।

বিশ্বে তার পূর্ণরূপ মিলেনা, সে যে ছত্রাকার,
বিশ্ব ভরি ভূমার তার স্ফূর্ত্তি,
মনোজগতে কেন্দ্রীভূত অখিল বৈচিত্র্য তার
মনো দেউলে ধরেছে চিন্ময়ূর্ত্তি।
দেহের আঁখি বন্ধ করি খুলিয়া দেখ মনের চোখ
গোচরগত দুয়ার করি রুদ্ধ,
তোমারি মাঝে রয়েছে সে যে—মরিছ খুঁজে সপ্তলোক
অন্তরে যে হয়েছে উদ্বুদ্ধ।

শ্রীকালিদাস রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

মায়াপুরী।

গল্প পুস্তক। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত ও তৎ-কর্ত্তৃক ৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২২৪ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ১৷৷০

অল্পদিন মধ্যেই মণীন্দ্রবাবু কথা-সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার বাছা-বাছা এগারটি গল্পের সমষ্টি এই মায়াপুরী। প্রথম গল্প অরুণ মন্দ নয়। দ্বিতীয় গল্প জন্ম-জন্মান্তর, এই কয়েকটি প্রথমে দিলেই খুব ভাল হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" কয়েকখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল, গল্পটির পাণ্ডুলিপি মাসিক পত্রে পাঠাইবার সময় মণী বাবুর মাষ্টার মহাশয় খগেন বাবু সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন,—"আমার এক ছাত্রের লেখা, গল্প বলাও যেতে পারে।" এই প্রবন্ধ ভাঙিয়া মণীন্দ্র বাবু সরস তুলিকায় "জন্ম জন্মান্তর" আঁকিয়াছেন, গল্পটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাত হইতে বেলা আর তরুণ দুজনে দুজনকে ভাল বাসিয়াছে, জন্মে জন্মে যুগে যুগে তরুণ বেলার রূপ দেখিয়া আসিতেছে, লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়া রহিল তবু হিয়া জুড়ান গেল না।" বঙ্গ ভাষায় গল্পটি নুতন, একটি উজ্জ্বল রত্ন। গল্পটীর ভাষাও খুব ভাল, গদ্যকাব্যও বলা যায়। মা—সুন্দর গার্হস্থ্য চিত্র। যে সকল পুরু-ষের দুরারোগ্য ব্যাধি আছে, তাহাদের বিবাহ সত্যই বিড়ম্বনা। যুগান্তরের তৃষ্ণা রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের মত মায়াময় গল্প। লেখকের শ্রেষ্ঠ কল্পনা পদ্মরাগ পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ফুলের ব্যথা কয়েক খানি প্রাণময় ছবি। অন্যান্য গল্প গুলিও বেশ হইয়াছে।

মণীন্দ্র বাবুর নিকট হইতে আমরা সমাজের বিভিন্ন দিকের ছবি দেখিবার আশায় রহিলাম। বই খানির মলাট দেখিয়া, সুখী হইয়াছি। সিল্কের মলাটে বইখানি বাঁধাইয়া পাঠকদের ঘাড়ে আরও ৷৷০ পয়সা না চাপাইয়া, লেখক ভালই করিয়াছেন। লেখক সম্প্রদায়কে, আমরা কথাটা ভাবিয়া দেখিতে বলি।

জয় পতাকা।

উপন্যাস, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান ডাইরেক্টরি প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৮, গুলুওস্তাগর লেন, দর্জ্জিপাড়া কলিকাতা। ২১২ পৃষ্ঠা, সিল্ক বাইণ্ডিং-মূল্য ১৮০

উপন্যাসে উপন্যাসে ধূলোপরিমাণ, কাযেই ভাল মন্দ বিচার করা কঠিন। আলোচ্য উপন্যাস খানি আমরা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি। প্লটে নুতনত্ব বিশেষ নাই, গল্পের প্রথমটা তেমন জমে নাই, শেষাংশ বেশ হইয়াছে। কোনও গল্পে পাপ ও পুণ্যের ফলাফল দেখাই-বার জন্য, দুইটী দল খাড়া করিলে, সে উপন্যাস যেমন

ফুটিতে পার না, এই বই খানির দশা তাহাই হইয়াছে। কয়েক পরিচ্ছেদ পাঠের পর একস্থানে আসিয়া, পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার সূত্র ধরিয়া নূতন পরিচ্ছেদ পড়িতে হয়। ফলে উপন্যাসের কোন কথাই পাঠকের প্রাণে স্থায়ী রেখা টানিতে পারে না, ইহাতে উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত গ্রাম্য জমীদার বাড়ীতে পারিবারিক অভিনয়ায়োজন দেখিয়া আমরা একটু আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, অভিনয় সভায় জমীদার গৃহিণী ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র আছেন, সঙ্গে আছেন বিলাত প্রত্যাগত জমীদার শ্যালক। ডাক্তার মুখার্জ্জী ও তাঁহার পরিবারবর্গ না হয় শিক্ষিত, কিন্তু বিন্দুরাণী ও বরেনের শিক্ষার পরিচয় পাঠকবর্গ পায় নাই। মাষ্টার মহাশয়ের দূত তের বছরের বিমলের মুখে "হিন্দুগৃহে এমন শিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা যে দিন খুব বেশী হবে" ইত্যাদি বক্তৃতা একটু বেখাপ্পা হয় নাই কি? কয়েকটি চরিত্র একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে। গ্রন্থখানির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য চরিত্র আচার্য্য ঠাকুর, শচীন, অনিল, দীপ্তি ও রতন সর্দ্দার। দীপ্তিকে লেখক প্রাণ দিয়া আঁকিয়াছেন, সে পিতার উপযুক্ত কন্যা—গুরুর যোগ্য ছাত্রী, তাহার জ্ঞানগর্ভ উক্তিতে আমরা বিস্মিত হই না, কারণ চরিত্রটির আগাগোড়া একটা মিল আছে। অন্যের মধ্যে রতন সর্দ্দার বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু সে যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষা তাহার নিজের নহে। এই ভাষা বিভ্রাটে বই খানির সর্ব্বত্র একটা আড়ষ্ট ভাব রহিয়া গিয়াছে।

মোটের উপর উপন্যাস হিসাবে বইখানি ভালই হইয়াছে।

কর্ম্মমন্দির।

উপন্যাস—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কলিকাতা ইণ্ডিয়ান ডাইরেক্টরি প্রেসে মুদ্রিত ও ৮নং গুলুওস্তাগর লেন বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ২৮২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৲

উপন্যাস কল্পনা, কিন্তু আমাদের মনে হয় কল্পনার সহিত বাস্তবকে এক করিতে পারিলেই সে চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠে। লেখক যদি দোষগুণ যুক্ত সংসারী মানুষ আঁকিতেন, তাহা হইলে উপন্যাস খানি খুব ভাল হইত। অঙ্কিত চরিত্র গুলির একটা দিকই তিনি দেখাইয়াছেন, তাই বইখানি আমাদের একটু অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছে। পরেশকে আদর্শরূপে আঁকিবার জন্য গ্রন্থকার যে সকল ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে পরেশ দেবতা হইয়াছে বটে, কিন্তু চরিত্রটী অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস খানি বাহুল্য ঘটনায় বিস্তৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বইখানিতে উল্লেখযোগ্য চরিত্র আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। বেশী রং দিয়া ছবি আঁকিলে, সে ছবি নষ্ট হয়, চেষ্টায় চিত্রিত চরিত্র প্রাণ স্পর্শ করে না। বই খানিতে পাত্র পাত্রীর অভাব নাই, কিন্তু একটী চরিত্রও ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। স্থানে স্থানে ভাষারও দোষ আছে। ৩৩শ পরিচ্ছেদ ১৯৪পৃষ্ঠায় "চেহারা দেখেই বুঝেছি, এরা ভগবানের অতি প্রিয় কন্যা।" এ ভাষা কোন অঞ্চলের?

স্কন্দগুপ্ত।

নাটক, শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। "ভেনাস" প্রিণ্টিং প্রেসে মুদ্রিত ও ১২ মদন মিত্রের লেন, ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬পেজি, ১৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

গুপ্তরাজত্বকালের ঘটনা অবলম্বনে নাটকখানি রচিত, এমিনেণ্ট থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে নাটকখানি বেশ ভালই হইয়াছে, পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তবে লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব ও ভাষার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, উহা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্ক অষ্টম দৃশ্য বিচার সভায় স্কন্দগুপ্তের কথা আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের "গগনে পবনে সেই তান পুলক স্তম্ভিত প্রবমান, নিখিলের যত সুর তব মহিমা-মধুর ধরণী আপনি তব কবি" ইহাকেও কি গান বলিতে হইবে? দ্বিতীয় দৃশ্যের গানটি সুন্দর হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য স্কন্দগুপ্ত ও ইন্দ্রলেখার কথোপকথন দ্বিজেন্দ্রলালের শক্ত ও দৌলতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অনন্তা দেবীর চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে। কুমার গুপ্তের প্রথমটা বেশ হইয়াছে। স্কন্দগুপ্তই নাটকখানির উজ্জ্বল রত্ন। শতানীক ও সোমেশ্বরও বেশ ফুটিয়াছে। নাটকখানি আমাদের ভালই লাগিয়াছে।

"কান্তি"

চিত্রে ভাব-বৈচিত্র্য।

চিত্রগ্রন্থ। কলিকাতা শ্রীনাথ প্রেসে অক্ষরাংশ এবং সরকার প্রেসে চিত্রিতাংশ মুদ্রিত। প্রকাশক—শ্রীকরুণাকান্ত ভট্টাচার্য্য, বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৮নং গুলু

ওস্তাগর লেন, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ৮ পেজি, ৩৪ খানি একবর্ণ ও একখানি ত্রিবর্ণ চিত্র, চিত্রপরিচয়সহ, কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২॥•

এই গ্রন্থের যিনি মূলসূত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাগচী তাঁকে গ্রন্থকার বলা চলে না, চিত্রকর বলা চলে না, অভিনেতা বলিলেও ঠিক হইবে না। তিনি কি করিয়াছেন তাহা ভূমিকা লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথাতেই বুঝাইয়া দিই :—"পূর্ব্বে আমাদের দেশে ••চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই চৌষট্টি কলার মধ্যে একটি বিদ্যা আছে যাহার সাধনায় কলাবিদ্ বেশভূষা ভাবভঙ্গির সংযোগে আপনাতে নানা রূপ প্রদর্শন করাইতে পারে। এই কলা অতি সূক্ষ্ম বিদ্যা। কুচুমার নামে এক ব্যক্তি এই বিদ্যার উদ্‌ভাবন করেন। তাই ইহার নাম হইয়াছে 'কৌচুমার যোগ।' 'চিত্রে ভাব বৈচিত্র্য' এই শ্রেণীর বিদ্যার একটি সুন্দর নিদর্শন। ...একই ব্যক্তি যে এত বিভিন্ন ভাবে নিজেকে প্রকাশ করিয়া তুলিতে পারেন, অথচ কোথাও ধরা পড়েন না, ইহা কম যোগ্যতার পরিচয় নয়।" অতএব ব্যাপারটি এই। তারক বাবু সাজিয়াছেন—কীর্ত্তনওয়ালী, অথবা খোলবাদক, অথবা উড়ে চাকর। সাজিয়া কোনও একটা ভাব দেখাইয়াছেন; তাঁহার সেই ভঙ্গির ফোটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে—সেই ফোটোগ্রাফের ছবি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। এটুকু ত সোজা কথা। কতকগুলি ছবিতে তারক বাবু আবার দুই মূর্ত্তিতে, কতকগুলিতে তিন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন। যেমন ধরুণ "মানভঞ্জন" চিত্র। স্বামী, নূতন গহনা গড়াইয়া আনিয়া মানবতী স্ত্রীর মানভঞ্জন করিতেছেন, চিত্রে আমরা ইহাই দেখিতেছি। এখন, স্বামীও সাজিয়াছেন তারক বাবু, স্ত্রীও সাজিয়াছেন তিনি। একবার স্বামী সাজিয়া, মানভঞ্জন কারীর ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া ফোটোগ্রাফ তোলাইয়াছেন; পরে আবার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মানবতী স্ত্রীর ভঙ্গিতে তোলাইয়াছেন। ছবির ব্লক নির্ম্মাতার কৌশলে উভয় ফোটোগ্রাফ সম্মিলিত হইয়া একখানি ছবিতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে "পিকপকেট" ছবিতে তিনি একাই বাবু, পকেট মারা ও কনেষ্টবল।

"কৌচুমার যোগ" কলাবিদ্যাটি তারক বাবু যে উত্তম রূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তাহা সকলগুলি ছবিতেই প্রকাশ। গ্রন্থারম্ভে তারক বাবুর একখানি স্বাভাবিক চিত্র আছে—অর্থাৎ যে ভাবে তিনি সংসারে বিচরণ করেন। কৌচুমার চিত্রগুলি দেখিয়া কার সাধ্য বোঝে যে ইহারাই সেই তারক বাবু। ঈশ্বর না করুন, পুলিস যদি কোনও দিন তারক বাবুকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে, তবে তিনি ছদ্মবেশে অনায়াসে তাহাদের চক্ষে ধুলা দিতে পারিবেন। চিত্রগুলি প্রায়ই হাস্যরসাশ্রিত—সুতরাং বেশ আমোদজনক। আরও আমোদের বিষয় এই যে, তারক বাবুর পিতা, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ সরস্বতী মহাশয় কোথাও গদ্যে, কোথাও ছড়ায়, চিত্রপরিচয়গুলি লিখিয়াছেন। ইঁহারা বাপ বেটায় মিলিয়া মজা করিয়াছেন ভাল। এই গ্রন্থখানি যাঁহার হাতে পড়িবে, দুইদণ্ডকাল তাঁহার বিমল হাস্যসুখে কাটিয়া যাইবে। পুস্তকের গঠনের তুলনায়, মূল্য অধিক হয় নাই।

আর্ট ও সাহিত্য।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ প্রণীত। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲

গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার গ্রন্থারম্ভে নিবেদনে বলিয়াছেন, "* * অধিকাংশ এ কালের উপন্যাস লেখক আজকাল উপন্যাস লিখিবার যে ধারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে আমাদের দেশের, আমাদের জাতির সর্ব্বনাশ ও ধ্বংস সুনিশ্চিত। এই ধারণা বশতঃ অনেক সময়ে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে বলিয়াই আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি।"—লেখক মহাশয় এই গ্রন্থে সত্য মঙ্গল ও সৌন্দর্য্যের সহিত আর্টের সম্বন্ধ কি তাহা বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কোন কোনও লেখকের উপন্যাস গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া নিজ মতের সমর্থন করিয়াছেন। অধুনা আর্টের নামে কিরূপ জঘন্যতা বঙ্গীয় কথা সাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। লেখক মহাশয় বলেন, প্রকৃতি অশ্লীলতার বিরোধী। যাহা প্রকৃতির বিপর্য্যয়—অস্বাভাবিকতা—তা কখনও আর্ট হইতে পারে না। কথটা যুক্তিসঙ্গত।

গ্রন্থারম্ভে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই ভূমিকায় সান্যাল মহাশয় বলিয়াছেন—"কাব্য-প্রসঙ্গে সুরুচি ও সুনীতির কথা তুলিলে, আর্টের পক্ষ হইতে উচ্চ গলায় বলা হইয়া থাকে যে, গুরুমহাশয়গিরি করা আর্টের কাষ নয়। * * * মানুষের পশু ভাব নষ্ট করিয়া, তাহার স্থলে দেব ভাবের প্রতিষ্ঠা করা যেমন সুরুচি ও সুনীতির

লক্ষ্য সমাজের উপর সুকবির সুকাব্যের ফলও তাহাই— কবি সেই মঙ্গল উদ্দেশ্যের কথা মনে ভাবিয়াই থাকুন আর না ভাবিয়াই থাকুন।”

ক্ষিতীন্দ্র বাবুর গ্রন্থখানি বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে। আর্ট-ওয়ালারা এখানি মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখিলে ভাল হয়।

নিত্যকৃত্য ধ্যান স্তবমালা।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ প্রণীত। কলিকাতা কাত্যায়নী প্রেসে মুদ্রিত ও ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি ১৮ পেজি ৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য।০

যাঁহারা সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের ব্যবহারার্থ কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্তব ও ধ্যান, লেখক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ ভালই হইয়াছে; তবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তবগুলির যে একটি স্বকীয় মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে, বঙ্গানুবাদে তাহা আশা করা বৃথা। সংস্কৃত স্তবের স্থান, কোনও বঙ্গানুবাদ কখনও অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে যাঁহারা মানে না বুঝিয়া তোতাপাখীর মত স্তব আওড়াইয়া যান, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন— এবং যথার্থ অর্থ বুঝিয়া তাঁহাদের ভক্তিভাবও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

মুক্তিযজ্ঞ অসমাপ্ত; কোথা গেল মুক্তিমন্ত্রকৃৎ!
নাহি হোতা, সে অধর্য্য কোথা সেই ব্রহ্মা ও উদ্গাতা!
রাষ্ট্রীয় ঋত্বিক আছে, প্রান্তে প্রান্তে আছে মন্ত্রদাতা।
গেল সেই অন্যতম মুক্তিকামী রাষ্ট্র-পুরোহিত!
সে ছিল মৌলবী পাদ্রী একাধারে আর্য্য ব্রহ্মবিৎ।
অপূর্ব্ব মনীষাদীপ্ত, বিশ্ববঙ্গ—সৌভাগ্য নির্ম্মাতা!
সর্ব্ববর্ণ সমন্বয়ী, ধর্ম্মবীর, দরিদ্রের ত্রাতা!
অগ্নিযুগযাত্রীদের বল্গাধারী একান্ত সুহৃৎ!

কীর্ত্তিমন্ত কর্ম্মযোগী বাঙালীর অশ্বিনীকুমার!
সহযোগ-বর্জ্জনের সুবৃহৎ সন্দেহ সময়ে,
গর্জ্জিয়া গুর্জ্জর-সূর্য্য ভগ্ন দেহে রহিল বিস্ময়ে!
ঘুচে' গেল সংশয়ের সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকার!
'মহাত্মা' অধুনা বন্দী; নেতৃবৃন্দ দ্বন্দ্ব করে, একি!
তাই বুঝি চলে' গেল যজ্ঞনাশ চক্ষে নাহি দেখি'!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা
১৪এ রামতনু বসুর লেন, “মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৮

সিকান্দ্রা — আকবর সমাধির প্রবেশ দ্বার। ১৮২৮ খৃঃ অঙ্কিত চিত্র হইতে।

# মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৫শ বর্ষ } ২য় খণ্ড } মাঘ, ১৩৩০ { ২য় খণ্ড { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জৈনদের চতুর্বিংশতিতম (বা শেষ) তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী

[জীবনচরিত]

বংশ পরিচয়। আধুনিক পাটনা, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে, [প্রাচীন মগধ দেশের উত্তর সীমাতে] অবস্থিত। গঙ্গার অপর পারে, উত্তর দিকের দেশকে বৃজ্জীদের দেশ অথবা "কাশী-কোশল" দেশ বলিত। এই কাশী-কোশল দেশ ১৮ জন রাজার এক সঙ্ঘ দ্বারা শাসিত ছিল। ইঁহাদের মধ্যে নয়জন মল্লভূমির রাজা ও নয়জন লিচ্ছবী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবী রাজা এই সঙ্ঘের মুখপাত্র বা সেক্রেটারির মত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা সঙ্ঘের অন্য রাজা অপেক্ষা কোনও বিষয়ে অধিক ছিল না। এখানে বলিয়া রাখা অন্যায় হইবে না যে সে কালের রাজা রাণীদের, এমন কি নগরেরও, একাধিক নাম ছিল। বৌদ্ধেরা যে নাম ব্যবহার করিয়াছেন, জৈনেরা সে নাম লেখেন নাই—তাঁহারা অন্য কোনও নামের পক্ষপাতী। সেই জন্য ইতিহাস পাঠককে অনেক সময়ে ভ্রমে পড়িতে হইয়াছে।

বৈশালীতে নানা গোত্রজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আপন আপন গোত্রপতি বা মণ্ডলের শাসনাধীনে, আপন আপন পল্লীতে বাস করিত। সঙ্ঘের নয়জন লিচ্ছবী রাজাদের মধ্যে বিদেহে [দারভাঙ্গা হইতে ৪২ মাইল উত্তর পশ্চিমে রেলের ধারে আধুনিক সীতামঢ়ী] রাজা বিরুদ্ধক রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে 'সকল' নামক এক মন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে পীড়িত হইয়া স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সহ বৈশালীতে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৈশালীবাসীরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি আপন এক কন্যা ত্রিশলা ও দুই পুত্র গোপাল ও সিংহের বৈশালীতে বিবাহ দিয়া বৈশালীবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুকাল পরে বৈশালীর রাজার মৃত্যু হইলে বৈশালীবাসীরা রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বহুদর্শী, সর্ব্বজন প্রিয় 'সকল'কে আপনাদের রাজা নির্ব্বাচিত করিল।

সকলের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল অত্যন্ত বলবান, ক্রোধী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠ সিংহ, বীর ও বিবেচক ছিলেন। সকলের মৃত্যুর পর বৈশালী-বাসীরা গোপালকে উপেক্ষা করিয়া সিংহকে আপনাদের রাজা নির্ব্বাচিত করিলে, অভিমানী গোপাল রাগ করিয়া রাজগৃহে চলিয়া গেলেন, এবং মগধের রাজা শ্রেণিক বিম্বিসারের সেবাতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর আসন লাভ করিয়াছিলেন। সিংহের নাম জৈন পুস্তকে চেতক দেখা যায়। চেতকের এক কন্যা বাসবী [বা চেল্লনা বা শ্রীভদ্রা] সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। গোপালের চেষ্টাতে সৌন্দর্য্য উপাসক বিম্বিসারের সহিত বৈদেহী বাসবীর বিবাহ হইয়াছিল। বাসবীর গর্ভে একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে তাহার নাম অজাতশত্রু, ও জৈন গ্রন্থে কুণিক দেখিতে পাওয়া যায়। বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য জয় করিয়া মগধ রাজ্য বিস্তৃত করিয়া ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তখন, মোগল যুগের দিল্লী ও আগ্রার মত, রাজগৃহ ও চম্পা দুইটি রাজধানী হইয়া গেল। চম্পার আধুনিক নাম নাথনগর। ইহা আধুনিক ভাগলপুর হইতে দুই মাইল মাত্র দূরে। কুণিক অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পানগরে থাকিতে ভালবাসিতেন, সেইজন্য জৈন গ্রন্থে তাঁহাকে প্রায়ই "চম্পার রাজা কুণিক" অথবা "অঙ্গরাজ কুণিক" লেখা হইয়াছে। অনেকে চম্পার রাজা কুণিক ও মগধের রাজা অজাতশত্রুকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভাবিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

বৈশালীর নিকটে—৩।৪ ক্রোশের মধ্যে—[বৌদ্ধ মতে] কোটিগ্রাম, [অথবা জৈনমতে কুণ্ডগ্রাম, বা কুণ্ডনগর] একটি বর্দ্ধিতশ্রী গ্রাম ও সন্নিবেশ ছিল। সেকালে নগর ও গ্রাম প্রাচীর বেষ্টিত ও সুরক্ষিত রাখা হইত। রাজধানী বা বড় নগরে বণিক ও যাত্রীদের বিশ্রাম করিবার স্থানের ব্যবস্থা করা হইত না। কেন না শত্রুসেনা, সুরক্ষিত নগরে বা রাজধানীতে গোপনে বণিক বা যাত্রীবেশে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিবে বা নগর অধিকার করিবে ইহা অসম্ভব ছিল না। সেই জন্য রাজধানীর বা বড় নগরের নিকট অন্য এক পৃথক গ্রামে বণিক ও যাত্রীদের আশ্রয়স্থান স্থাপন করা হইত। এরূপ গ্রামকে সন্নিবেশ বলিত। এরূপ সন্নিবেশগুলিও প্রাচীর বেষ্টিত ও সুরক্ষিত থাকিত। শত্রুরা পথিক বা বণিক রূপে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিলে বাধা দিবার মত বলবান সেনা, সন্নিবেশে রাখিতে হইত। সন্নিবেশের শাসন কর্ত্তাকে সকল সময়ে সতর্ক থাকিতে হইত। চতুর ও সাহসী বীরকেই সন্নিবেশ রক্ষক করা হইত। এরূপ রক্ষক অন্য সাধারণ নগর-রক্ষক বা দুর্গস্বামী অপেক্ষা মর্য্যাদায় উচ্চপদস্থ বিবেচিত হইত। খৃঃ পূঃ ৬২৫-৬০০ সময় মধ্যে কুণ্ডগ্রাম [বা কোটিগ্রাম] সন্নিবেশের রক্ষক ইক্ষ্বাকু বংশীয়, কাশ্যপ গোত্রীয় এক জন জ্ঞাত্রি-কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ ছিল। তাঁহার আর দুইটি নাম শ্রেয়াংশ ও জসাংস জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি বিদেহের রাজমন্ত্রী 'সকল'-এর কন্যা, বাশিষ্ঠ গোত্রজা ত্রিশলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিশলা জন্ম সময়ে মন্ত্রিকন্যা ও বিবাহের সময়ে সন্নিবেশ রক্ষকের পত্নী মাত্র ছিলেন। সেই জন্য জৈন গ্রন্থে তাঁহাকে "ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণী" বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, কোনও স্থানে ত্রিশলা দেবী শব্দ নাই। জৈন গ্রন্থে যদিও সিদ্ধার্থকে ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থই বলা হইয়াছে, তথাপি সেই পুস্তকেরই অত্যুক্তি-পূর্ণ বর্ণনা পাঠে তাঁহাকে একজন খুব বড় স্বাধীন রাজা বলিয়াই ভ্রম হয়। ত্রিশলাকে জৈন গ্রন্থে কখন কখন বৈদেহী, বিদেহদত্তা, অথবা প্রিয়কারিণী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুপার্শ্বর নামও পাওয়া যায়। ত্রিশলার গর্ভে প্রথমে এক কন্যা সুদর্শনা ও পরে দুই পুত্র, নন্দীবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান মাতৃকুল দ্বারা বৈশালী ও মগধ দুইটি রাজ-বংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। যদিও বুদ্ধদেব বৈশালীর লিচ্ছবী ক্ষত্রিয় সামন্তদের রূপে, গুণে স্বর্গের দেবতাদের সহিত উপমিত করিয়াছেন, তথাপি জৈনদের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বৈশালীর রাজা বৌদ্ধগ্রন্থে বড় সম্মান লাভ করেন নাই। শ্রেণিক বিম্বিসার ও অজাত-

শত্রু কুণিকের সবিস্তার বর্ণনা উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানের মোক্ষলাভের [খৃঃ পূঃ ৫২৭] পরে, অজাতশত্রুর রাজ্য লাভ [প্রায় ৪৮৫] হইয়াছিল। তিনি কখনও বৌদ্ধদের, কখনও জৈনদের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী বৃদ্ধ পিতার স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্ম অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। তিনি পিতাকে কারাগারে অনশনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে কেবল মাত্র তাঁহার মাতা বা সখী দিনান্তে ২।৩ বার মাত্র যাইতে পাইতেন। যখন কয়েক দিনের অনশনেও বৃদ্ধ মরিল না, তখন গুপ্তচরের মুখে জানিতে পারিলেন যে বাসবী এক প্রকার পুষ্টিকর স্নেহ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আপনার পৃষ্ঠে লাগাইয়া, তাহার উপর বসনাবৃত করিয়া কারাগারে যাইতেন ও স্বামীকে খাওয়াইতেন; তিনি হাতের ও পায়ের বালা ও মল ফাঁপা করিয়া তাহাতে জল পুরিয়া লইয়া যাইতেন, তাহাতেই অজাতশত্রু খাদ্য বন্ধ করিয়াও বৃদ্ধকে হত্যা করিতে পারেন নাই। তিনি মাতার কারাগারে গমন নিষেধ করিলেন ও পিতার পায়ের তলাতে লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিয়া ঘা করিয়া দিলেন, যাহাতে তাঁহার দাঁড়াইবার বা চলিবার শক্তি না থাকে। যখন অনশনে বিম্বিসার মৃতবৎ, তখন হঠাৎ অজাতশত্রুর মনে অনুতাপ উদিত হইল। তিনি স্বহস্তে পিতার বন্ধন মোচন করিতে অনুচর সহ চলিলেন। তাঁহার আগমন শব্দ পাইয়া বৃদ্ধ ভাবিলেন, গুণধর পুত্র কোন নূতন প্রকার যন্ত্রণা দিতে আসিতেছে। ভয়ে তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যন্ত্রণার অবসান হইল। অজাতশত্রুর মত স্বার্থপর নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ধর্ম্মের কোনও ধার ধারে না। যখন যে সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার রাজনৈতিক সুবিধা হইয়াছে, তখন সেই ধর্ম্মই স্বীকার করিয়া সেই সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। বৈশালীর রাজা বর্দ্ধমানের মাতুল, ও পরে মাতুল পুত্র ছিলেন বলিয়া সাধারণ ও অধিকাংশ বৈশালীবাসীরা জৈন ধর্ম্মের সাহায্য করিয়াছিলেন।

জন্ম—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শেষ তীর্থঙ্কর [যাঁহার নাম পরে বর্দ্ধমান রাখা হইয়াছিল] স্বর্গে পুষ্পোত্তর নামক বিমানে [দেবতাদের বাসস্থানে] ছিলেন। তাঁহার স্বর্গবাসের সময় শেষ হইলে তিনি জম্বুদ্বীপস্থ ভারতভূমিতে কুণ্ডগ্রামের ব্রাহ্মণ পল্লীতে ঋষভদত্ত নামক কোডাল গোত্রজ ব্রাহ্মণের জালন্ধরায়ণ গোত্রজা পত্নী দেবানন্দার গর্ভে আষাঢ় শুক্লা তৃতীয়ার মধ্যরাত্রে, শুভ উত্তরফল্গুনী (১) নক্ষত্রে প্রবেশ করিলেন। দেবানন্দা সে সময়ে অর্দ্ধনিদ্রিতা অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় ছিলেন। তিনি হঠাৎ বিমলানন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রেই তিনি ১৪টি শুভস্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্ন দেখিবার পরই তিনি নিদ্রিত স্বামীকে জাগাইয়া বলিলেন—"হে দেবগণের প্রিয়, আমি আজ এক প্রকার বিমল আনন্দ বোধ করিতেছি। এই মাত্র ১৪টী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম!" পরম রহস্যবিদ্ ঋষভদত্ত সকল কথা সবিস্তারে শুনিয়া বলিলেন—"তোমার গর্ভে নিশ্চয়ই তীর্থঙ্কর প্রবেশ করিয়াছেন। তুমি বড় সৌভাগ্যবতী। এখন এ কথা প্রকাশ করিও না, সযত্নে গর্ভরক্ষা কর।" দেবানন্দা স্বামীর উপদেশানুসারে সেইরূপ করিতে লাগিলেন।

এ ঘটনার কিছুকাল পরে, একদিন স্বর্গে বসিয়া দেবরাজ শক্র [ইন্দ্র] পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি আপন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর গর্ভে তীর্থঙ্করকে দেখিতে পাইলেন। তখন সসম্ভ্রমে বজ্রধারী, পুরন্দর, শতযজ্ঞকারী, সহস্রচক্ষু, মঘবন, পাকশাস্তা [পাক নামক দৈত্যের শাস্তা] মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণার্দ্ধের শাসনকর্ত্তা, ৩২০০০০ দেবনিবাসের রক্ষক,

(১) তীর্থঙ্করদের জীবনে গর্ভপ্রবেশ, ভূমিষ্ঠজন্ম, দীক্ষা, কেবলজ্ঞানলাভ ও মোক্ষ [বা মৃত্যু] এই পঞ্চ ঘটনাকে পঞ্চ কল্যাণ বলে। তাঁহাদের পঞ্চ কল্যাণ প্রায় একই নক্ষত্রে হইয়া থাকে। কিন্তু বর্দ্ধমানস্বামীর প্রথম চারি কল্যাণ উত্তর ফল্গুনীতে হইয়াছে, মোক্ষ স্বাতী নক্ষত্রে হইয়াছে। তবে বর্দ্ধমানের গর্ভপরিবর্ত্তনও কল্যাণ মধ্যে ধরা হয়, তাহা উত্তর ফল্গুনীতেই হইয়াছিল।

ঐরাবতারোহী, সুরেশ্বর, বিমলাম্বর ধারী, মালা মুকুট ও কুণ্ডলধারী, ঐশ্বর্য্যবান, জ্যোতিষ্মান, মহা বলবান, মহা সম্মানিত, মহা ক্ষমতাবান, মহাসুখী, ৩২০০০ দেবনিবাসবাসী দেবতাদের নায়ক ৮৪০০০ সমমর্য্যাদাবান, দেবতাদের সেনাপতি, ৩২ জন প্রধান দেবতাদের শাসক, চারিদিকপালের স্বামী দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ও আপনার রত্নজড়িত পাদুকা-যুগল ত্যাগ করিয়া, যে দিকে ভ্রূণরূপে তীর্থঙ্কর ছিলেন সেই দিকে সাত আট পদ অগ্রসর হইলেন। তিনি প্রত্যেক হাতের অঙ্গুলিগুলি একত্র করিয়া পদ্মকলির মত করিলেন, পরে বাম জানু নত করিয়া ও দক্ষিণ জানুতে ভর দিয়া তিনবার ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি অর্হৎদের ও ভগবৎদের, আদিকরদের ও তীর্থকরদের, পুরুষ-গন্ধ (২) হস্তীদের, জীবের পথ প্রদর্শকদের, আশ্রয়দাতাদের, শান্তিদাতাদের, দৃষ্টিদাতাদের, জ্ঞানদাতাদের প্রণাম করিতেছি। আমি সর্ব্বজ্ঞ, নির্ভীক জিনদের প্রণাম করিতেছি। আমি মহামুনি, আদিকর, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরকে প্রণাম করিতেছি। যাঁহার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্‌বার্ত্তা পূর্ব্ব তীর্থঙ্করেরা বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, সেই শেষ তীর্থঙ্করকে প্রণাম করিতেছি। আমি তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পূজা গ্রহণ করুন।" এইরূপে প্রণাম করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—ভূতকালে কখনই অর্হৎ, চক্রবর্ত্তী, বলদেব, অথবা বাসুদেবগণ অসম্মাননীয়, নীচ, অপবিত্র, পতিত, দরিদ্র, সাধারণ, ভিক্ষুক বা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং বর্ত্তমানকালে বা ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করিবেন না। কেন না ভূত, বর্ত্তমান, বা ভবিষ্যৎ কালে তাঁহাদের সম্মানীয় রাজকুলে, উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশ ইক্ষ্বাকু অথবা হরিকুলে [সূর্য্য বা চন্দ্র বংশে] অন্য কোনও ঐ প্রকার উভয়পবিত্র [পিতৃ ও মাতৃ] কুলে জন্মগ্রহণ করাই স্বভাব। কিন্তু এবার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অর্হৎ মহাবীর কুণ্ডগ্রামের ব্রাহ্মণ অংশে দেবানন্দার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। এখন তাঁহাকে কুণ্ডগ্রামে ক্ষত্রিয় পল্লীতে, ইক্ষ্বাকু বংশীয় কাশ্যপ গোত্রজ, জ্ঞাত্রি-ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের পত্নী, বশিষ্ঠ গোত্রজা ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আপন সেনাপতি হরিনৈগমৈষিণকে [প্রাকৃত হরিণেগমেষীকে] গর্ভ পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

তীর্থঙ্করের গর্ভপ্রবেশের ৮২ দিন পরে, ৮৩তম রাত্রে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, অর্দ্ধরাত্রে দেবসেনাপতি দেবরাজের নির্দ্দেশমত প্রথমে কুণ্ডগ্রামের দক্ষিণাংশে ব্রাহ্মণ পল্লীতে যেখানে দেবানন্দা অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় শুইয়াছিলেন, আসিলেন। প্রথমে তিনি গর্ভস্থ তীর্থঙ্করকে প্রণাম করিলেন। পরে আপনার সম্মোহন বিদ্যা দ্বারা দেবানন্দাকে ঘোর নিদ্রিতা করিলেন। পরে ধীরে, অতি সম্মান ও যত্নের সহিত গর্ভ হইতে তীর্থঙ্করের ভ্রূণ সংগ্রহ করিয়া আপনার দুই হাতের অঙ্গুলিমধ্যে রাখিলেন। পরে দেবানন্দার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া স্বয়ং কুণ্ডগ্রামের উত্তরাংশে ক্ষত্রিয়পল্লীতে সিদ্ধার্থের ভবনে চলিয়া গেলেন। ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলা তখন অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় সুকোমল শয্যাতে শুইয়াছিলেন। দেবসেনাপতি প্রথমে আপন সম্মোহন বিদ্যা দ্বারা ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াণীকে ঘোর নিদ্রামগ্না করিলেন। পরে গর্ভস্থ অপবিত্র বস্তুগুলি ফেলিয়া দিয়া পবিত্র জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলেন ও তীর্থঙ্করকে গর্ভে স্থাপন করিয়া ত্রিশলার ঘুম ভাঙ্গাইয়া চলিয়া গেলেন। (৩)

(২) হস্তীমধ্যে সর্ব্ব বৃহৎকায় অতি বলবান সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত হস্তীকে গন্ধহস্তী বলে।

৩। ভাগবতে অনেকটা এইরূপ গল্প আছে। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব প্রথমে দেবকীর সপ্তম গর্ভে ছিলেন। পরে মায়াদেবী তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। জৈনেরা বলেন, বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের এই গল্পের অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে তাহা বিচার সাপেক্ষ। এই গর্ভ-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে জৈনেরা একটি গল্প বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বজন্মে ত্রিশলা ও দেবানন্দা একই গৃহস্থের দুই বধূ ও উভয়ে উভয়ের যাতৃ ছিলেন। দেবানন্দা ত্রিশলার একটি রত্নালঙ্কার চুরি করিয়াছিলেন। সেই জন্য এ জন্মে ত্রিশলা দেবানন্দার পুত্ররত্ন চুরি করিলেন।

ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে তীর্থঙ্করের প্রয়াণের সহিত তাঁহার বিমলানন্দ অন্তর্হিত হইল। তিনি দুঃখিত চিত্তে সকল কথা আপনার স্বামীকে বলিলেন। রহস্যবিদ্ ঋষভদত্ত দেবানন্দাকে বুঝাইয়া বলিলেন—"আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ যে কোনও কারণে হউক তীর্থঙ্কর তোমার গর্ভ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, এখন শোক করা বৃথা।"

তীর্থঙ্কর পূর্ব্বকর্ম্ম বশে ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার কর্ম্মভোগ শেষ হইল, সেই জন্য তিনি ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ত্রিশলার ঘুম ভাঙ্গিতেই তিনি বিমল আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রেই তিনি নিম্নলিখিত ১৪টি স্বপ্ন দেখিলেন। [জৈনদের দুই প্রধান শাখা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর মধ্যে এই স্বপ্ন সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্বেতাম্বরেরা ১৪টি স্বপ্নে বিশ্বাস স্থাপন করেন, কিন্তু দিগম্বরেরা ১৬টি বিশ্বাস করেন। শ্বেতাম্বরগণের এক উপশাখা মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করিয়া "স্থানকবাসী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অনেকে তাঁহাদের "ঢুণ্ঢিয়া" বলেন।]

১। ত্রিশলা প্রথম বারের স্বপ্নে এক সর্ব্ব শুভলক্ষণ যুক্ত, চারিটি প্রকাণ্ড রদবিশিষ্ট, দুগ্ধফেননিভ, মুক্তা স্তূপ তুল্য, রজতগিরি সদৃশ, সুগন্ধযুক্ত, বজ্রনাদ তুল্য গর্জ্জনকারী, ঐরাবততুল্য মহাকায় হস্তী দেখিলেন।

২। দ্বিতীয় স্বপ্নে একটি অতি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ মহা বলবান বৃষ দেখিলেন। তাহার শরীর হইতে শ্বেতোজ্জ্বল আভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। দিগম্বর সম্প্রদায় মতে এই আভা এক জ্ঞানালোক বিস্তারকারী জগদ্গুরুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস। স্থানকবাসীদের মতে বৃষ দ্বারা মহা বলবান ধর্ম্মশিক্ষকের আবির্ভাব সূচিত হইতেছে।

৩। তৃতীয় স্বপ্নে দেখিলেন, একটী অতিশুভ্র অতি বলবান কেশরী তাঁহার দিকে লম্ফ দিতে দিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহার দুই চক্ষু বিদ্যুতের মত জ্বলিতেছে, অতি সুন্দর দীর্ঘ জিহ্বা মুখের বাহিরে ঝুলিয়া আছে। এই স্বপ্ন দ্বারা সূচিত হইতেছে যে গর্ভস্থ শিশু শত্রুকে অর্থাৎ কর্ম্মফলকে বশীভূত করিবে, এবং সন্ন্যাসী বা নিগ্রন্থদের মধ্যে সিংহ সদৃশ হইবে।

৪। চতুর্থ স্বপ্নে তিনি হিমাংশু পর্ব্বতের উপর এক কমলপূর্ণ সরোবরে কমলাসনা লক্ষ্মীকে দেখিলেন। তাঁহাকে দুইটি হস্তী দুই দিক হইতে বারিপূর্ণ কলসের ধারা দ্বারা অভিষিক্ত করিতেছিল। এই স্বপ্ন দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে গর্ভস্থ শিশু অভিষিক্ত রাজা কিংবা ত্যাগী হইলে সন্ন্যাসী হইবে।

৫। পঞ্চম স্বপ্নে তিনি একটি [স্থানকবাসী মতে দুইটি] পঞ্চ বর্ণের ও অশোক, চম্পক, নাগ, পুন্নাগ, প্রিয়ঙ্গু, শিরিষ, মুদগর, মল্লিকা, জাতি, যূথিকা, অঙ্কোল্লা, কোরণ্টক-পত্র, দমনক, নব-মল্লিকা, বকুল, তিলক, বাসন্তিকা, কমলিনী, পাটল, কুণ্ড, অতিমুক্ত, আম্র মুকুল ইত্যাদি নানা পুষ্পের গন্ধে সুবাসিত মন্দার পুষ্পের মালা দেখিতে পাইলেন। ইহা দ্বারা গর্ভস্থ শিশুর দেহ ও যশের সৌরভের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতেছিল।

৬। ষষ্ঠ স্বপ্নে তিনি বিমল জ্যোৎস্না-মণ্ডিত পূর্ণ শশধর দেখিতে পাইলেন। ইহাতে গর্ভস্থ শিশুর ও তাহার ধর্ম্মের পবিত্র যশের পূর্ব্বাভাস সূচিত হইতেছিল।

৭। সপ্তম স্বপ্নে তিনি রক্তবর্ণ কিরণ বর্ষণকারী সূর্য্য দেখিতে পাইলেন। ইহাতে গর্ভস্থ শিশু অজ্ঞানান্ধকার নাশকারী হইবে, তাহাই সূচিত হইতেছিল। দিগম্বরেরা বলেন যে তিনি প্রথমে রক্তবর্ণ সূর্য্য, পরে পূর্ণ শশধর দেখিয়াছিলেন।

৮। অষ্টম স্বপ্ন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় মতে তিনি নানা মাঙ্গল্যচিহ্ন সহিত এক ইন্দ্রধ্বজ দেখিয়াছিলেন। এই গগনচুম্বি ধ্বজের দণ্ডটি সুবর্ণ দ্বারা গঠিত ও নানা রত্ন জড়িত ছিল, তাহার শীর্ষে ময়ূরপুচ্ছ ছিল। কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে তিনি মৎস্যযুগল দেখিয়াছিলেন। মৎস্য যুগলের মত গর্ভস্থ শিশু মহাসুখী হয়।

৯। নবম স্বপ্ন সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। শ্বেতাম্বরেরা বলেন তিনি একটি বারিপূর্ণ নানা সুগন্ধ পুষ্পমাল্য

বিলম্বিত রত্ন জড়িত সুবর্ণ কলস দেখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা গর্ভস্থ শিশুর সুখ সূচিত হয়। দিগম্বরেরা বলেন ঐরূপ কলস দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একটি নহে দুইটি। তাহার ফল, গর্ভস্থ শিশু চিরকাল ধর্ম্ম ও জ্ঞানচিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে।

১০। দশম স্বপ্নে তিনি কমল পূর্ণ তড়াগ দেখিলেন, তাহাতে নানা প্রকার জলজ পক্ষী—হংস, সারস, চক্রবাক, ইত্যাদি ক্রীড়া করিতেছে। মধু মক্ষিকা ও ভ্রমর মধুপান ও গুঞ্জন করিতেছে। ইহা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে গর্ভস্থ শিশুর শরীরে মহাপুরুষের সকল লক্ষণ থাকিবে। স্থানকবাসীরা বলেন মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরের মধুপানের অর্থ—জগদ্‌বাসী গর্ভস্থ শিশুর বাক্যসুধা-পান করিবে।

১১। একাদশ স্বপ্নে তিনি উত্তাল তরঙ্গমালা ও নানা প্রকার মৎস্য, মকর, নক্র পূর্ণ, লক্ষ্মীর পয়োধর তুল্য ক্ষীর সাগর দেখিলেন। সাগরের ভয়ঙ্কর আবর্ত্তে নানা নদ নদী প্রবেশ করিতেছে। এই স্বপ্নের ফল গর্ভস্থ শিশু "কেবলী" হইবে।

১১। ক। দিগম্বরেরা ১৪টি স্বপ্নের স্থানে ১৬টি বিশ্বাস করেন। শ্বেতাম্বরদের একাদশ ও দ্বাদশ স্বপ্নের মধ্যে, দিগম্বর মতে তিনি এক রত্নমণ্ডিত সিংহাসন দেখিয়াছিলেন। ইহার ফলে গর্ভস্থ শিশু ত্রিলোকের অধিপতি হয়।

১২। দ্বাদশ স্বপ্নে তিনি এক অতি বৃহৎ দেবনিবাস দেখিলেন। স্থানকবাসীরা বলেন তিনি একটি নগর-প্রমাণ রথ দেখিয়াছিলেন। দেবনিবাসটি প্রাতঃসূর্য্য সম উজ্জ্বল, ও অষ্টোত্তর সহস্র স্তম্ভযুক্ত। স্তম্ভগুলি বিশুদ্ধ সুবর্ণ ও নানা প্রকার রত্নজড়িত কারুকার্য্য বিশিষ্ট। নিবাসের নানা স্থানে স্বর্গীয় পুষ্পমালা বিলম্বিত মুক্তার ঝালর দেওয়া যবনিকা ঝুলিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃষ, নানা প্রকার বিষধর সর্প, কিন্নর, নানা প্রকার মৃগ, শরভ, নানা প্রকার শৃঙ্গী, নখী, করী ও বিবিধ প্রকারের ছোট, বড় বৃক্ষের চিত্র দ্বারা সুশোভিত। স্থানে স্থানে গন্ধর্ব্বেরা নানা প্রকার যন্ত্রে বাদ্য ও তান লয়যুক্ত গান করিতেছে। স্থানে স্থানে নানা প্রকার সুগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে।

১২। ক। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্বপ্ন মধ্যে, দিগম্বরেরা এক অতিরিক্ত স্বপ্ন বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন যে ত্রিশলা ইহার পর এক পাতালবাসী দেবতা দেখিয়াছিলেন।

১৩। ত্রয়োদশ স্বপ্নে তিনি দেখিলেন যে ভূমিতে একটি বৃহৎ থালার বা কোনও আধারের উপর মেরু-পর্ব্বত সমান উচ্চ পুলক, বজ্রনীল, ইন্দ্রনীল, লোহিতাক্ষ, মরকত, প্রবাল, সৌগন্ধিক, স্ফটিক, হংসগর্ভ, অঞ্জনা, চন্দ্রকান্ত ইত্যাদি নানা প্রকার মণি স্তূপীকৃত রহিয়াছে। তাহার জ্যোতিদ্বারা আকাশ দীপ্ত হইয়াছে। ইহার ফল এই যে, গর্ভস্থ শিশু সত্যজ্ঞান লাভ করিবে।

১৪। চতুর্দ্দশ স্বপ্নে তিনি এক অতি বৃহৎ, মধু সদৃশ, ঘৃত সিঞ্চিত, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ধূম অগ্নিশিখা দেখিলেন। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছিল যে গর্ভস্থ শিশু পৃথিবীর অজ্ঞানান্ধকার জ্ঞানালোক দ্বারা দূর করিবে।

জৈন মহিলারা আপন আপন ভাষাতে এই ১৪টি স্বপ্নের ছড়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা, বিশেষতঃ সন্তান-সম্ভাবিতারা, দিনান্তে ৫।৭ বার ঐ ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে ঐরূপ করিলে নবজাত শিশু ধার্ম্মিক হয়।

ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তিনি নিদ্রিত সিদ্ধার্থকে জাগাইয়া বলিলেন :—"হে দেবানাম্‌ প্রিয়, আজ আমি অদ্ভুত বিমলানন্দ ভোগ করিতেছি। এইমাত্র এই এইরূপ ১৪টি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখিলাম, ইহার কোনও কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।" সিদ্ধার্থও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। প্রাতে তিনি নগরের আট জন প্রধান স্বপ্নবিচারক পণ্ডিতদের আহ্বান করিলেন ও সকলকে সবিস্তারে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া বিচার করিয়া ফল বলিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা নানা বিচার করিয়া বলিলেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে ৩০টি মহাস্বপ্ন এবং ৪২টি সাধারণ স্বপ্নের বর্ণনা আছে এবং এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, যদি কোনও গর্ভবতী একই রাত্রে এই ১৪টি

স্বপ্ন এই ক্রমে দেখিবার পর শয্যাত্যাগ করে, তবে নিশ্চয় জানিবে যে তাহার গর্ভে এমন কোনও মহাপুরুষ আছেন যিনি সংসারী থাকিলে চক্রবর্ত্তী রাজা ও সংসার ত্যাগ করিলে অর্হৎ ও তীর্থঙ্কর হইবেন। প্রসূতি যদি এই ১৪টির মধ্যে কোনও সাতটি স্বপ্ন দেখেন, তবে গর্ভে বাসুদেব আছেন, যদি কোনও চারিটি দেখেন তবে বলদেব আছেন; আর যদি কোন একটি স্বপ্ন দেখেন তবে মাণ্ডলিক আছেন জানিতে হইবে।

সিদ্ধার্থ স্বপ্ন বিচারকগণকে নানা প্রকার খাদ্য, পুষ্প, সুগন্ধদ্রব্য, মাল্য, অলঙ্কার ও প্রত্যেকের মর্য্যাদানুরূপ ধন দিয়া বিদায় করিলেন। ত্রিশলা, গর্ভে মহাপুরুষের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়া অতি যত্নে গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন। জ্ঞাত্রি ক্ষত্রিয় কুলে তীর্থঙ্করের আগমন হইবার সময় হইতে দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় তাঁহার সেবকেরা ভূমণ্ডলের নানাস্থানে, যেখানে যেখানে লুক্কায়িত ও প্রোথিত ধন রত্ন ছিল, সকলগুলি সিদ্ধার্থের নিকটে আনিতে লাগিল। সিদ্ধার্থের ধন রত্ন দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সিদ্ধার্থ এই বৃদ্ধি দেখিয়া মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে গর্ভস্থ শিশুর নাম বর্দ্ধমান রাখিবেন। এইরূপে মহানন্দে তাঁহাদের সময় কাটিতে লাগিল।

পৃথিবীতে যে কোনও দেশে, যে কোনও কালে, কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোনও প্রকারে হউক তাঁহার আগমনবার্ত্তা আবির্ভাবের পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছে। কোথাও বা কোনও পয়গম্বর বা ভবিষ্যদ্বক্তা আপনার ভবিষ্যদ্বাণীতে বলিয়াছেন; কোথাও আকাশবাণী হইয়াছে, কোথাও নারদ মুনির মত কোনও জীব প্রচার করিয়াছেন; কোথাও বা অদ্বৈতাচার্য্যের মত কোনও জ্ঞানী ভক্ত পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যীশু ও মহম্মদের আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছিল। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হনীফেরা দেশ দেশান্তরে আগন্তুককে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল। জৈন মতে এই ১৪টি স্বপ্নই তীর্থঙ্করদের আগমনের পূর্ব্বে গর্ভ প্রবেশের শুভ সংবাদ। এযুগে যে ২৪ জন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের আগমন বার্ত্তাই এইরূপ স্বপ্নে প্রচারিত হইয়াছিল।

ত্রিশলার গর্ভধারণের নয়মাস সার্দ্ধ (৪) সপ্তদিবস পরে শুভ চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী সংযুক্ত চতুর্দ্দশী তিথির অর্দ্ধরাত্রে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে অর্হৎ মহাবীর সম্পূর্ণ নীরোগ শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

জৈনেরা বলেন স্বর্গে ৬৪ জন ইন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করেন। পৃথিবীতে তীর্থঙ্করের পঞ্চ-কল্যাণ-(৫) কালে সৌধর্ম্মেন্দ্র নামক ইন্দ্রের সিংহাসন নড়িয়া উঠে। এইরূপে তিনি সংবাদ পাইয়া থাকেন। তিনি তখন সুঘোষ নামক ঘণ্টা ধ্বনি করেন। অন্য ৬৩ জন ইন্দ্র ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া সৌধর্ম্মেন্দ্রের কাছে আসেন। সকলে মিলিয়া তীর্থঙ্করের কল্যাণোৎসব করিতে পৃথিবীতে নামিয়া আসেন। তাঁহাদের সহিত ২০০ দেব নিবাসবাসী প্রধান দেবতারা ও ছোট দেবতারা আসেন। জন্মের সময়ে সকলে মিলিয়া নবজাত শিশুকে মেরু পর্ব্বতে লইয়া যান, সেখানে তাহাকে পবিত্র জলের অতি প্রখর স্রোতে স্নান করান হয়। জৈন সাহিত্যে আছে যে পূর্ব্ব তীর্থঙ্করেরা অতি বৃহৎ অবয়বযুক্ত ছিলেন; ক্রমে তাঁহাদের দৈর্ঘ্য কমিয়া শেষ তীর্থঙ্কর সাধারণ মনুষ্যরূপী হইয়াছিলেন। মেরু পর্ব্বতের প্রখর স্রোতে স্নান করাইবার সময় হইলে সৌধর্ম্মেন্দ্রের মনে সন্দেহ হইল, এই এতটুকু শিশু পূর্ব্ব তীর্থঙ্করদের মত এত প্রখর স্রোত সহ্য করিতে

(৪) জৈনদের আচারাঙ্গ সূত্র [২ স্কন্ধ. ১৫ অধ্যায়, ৬ উদ্দেশ্য] ও কল্পসূত্র [৪ অধ্যায় ১৬ সূত্র] উভয় গ্রন্থে ৯ মাস ৭॥ দিন লেখা আছে। কিন্তু বর্ণনাতে উভয় অর্দ্ধরাত্রে হইয়াছে। অতএব অর্দ্ধদিন সম্ভব নহে। কিন্তু সূত্র লেখকের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার ছিল। উভয় ঘটনাই উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে ঘটিয়াছে। নক্ষত্রচক্রে চন্দ্র একবার ২৭ ডেসিমল ৩২১ দিনে ভ্রমণ করে। দশবার ভ্রমণ করিতে ২৭৩০২১ দিন লাগে। চান্দ্রমাস ২৯০৫৩ দিনে হয়। ৯ মাস ৭॥ দিন=২৯০৫৩×৯+৭০৫ ২৬৫০৭৭+৭০৫ ২৭৩০২৭ দিন। এই হিসাবে সার্দ্ধ সাত দিন লেখা হইয়াছে।

(৫) গর্ভপ্রবেশ. ভূমিষ্ঠজন্ম, দীক্ষা, কেবল জ্ঞান লাভ ও মোক্ষ—তীর্থঙ্করের পঞ্চ কল্যাণ।

পারিবে কি না। তীর্থঙ্করেরা "অবধি" জ্ঞান সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ইন্দ্রের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে হাস্য করিয়া ইন্দ্রকে আপনার ক্ষমতা দেখাইবার জন্ম পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মেরু পর্ব্বত ঠেলিয়া দিলেন। পর্ব্বত কাঁপিয়া (বা নড়িয়া) উঠিল। ইন্দ্র, শিশুর এই অমানুষিক ক্ষমতা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নাম করিলেন মহাবীর। সেই জন্ম ঐ নামে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। জন্মোৎসব করিতে ভবনপতি, ব্যান্তর, জ্যোতিষ্ক ও বিমানবাসী চারি শ্রেণীর দেব ও দেবীদের তীর্থঙ্করের পূজার জন্ম ক্রমান্বয়ে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নামা ওঠাতে স্বর্গীয় আলোক দ্বারা দিক সকল দীপ্ত হইল ও শব্দ দ্বারা কোলাহল হইতে লাগিল। বৈশ্রবণের [ইন্দ্রের] আজ্ঞাকারী সেবক দৈত্যেরা ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের বাসভবনে নানা প্রকার স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, মূল্যবান বসন, ভূষণ, নানা প্রকার, অলঙ্কার, পুষ্প, পত্র, বীজ, পুষ্পমালা, গন্ধদ্রব্য, চন্দনানুলেপন ও বহুমূল্য মুক্তা, বর্ষার বারিধারার মত ছড়াইয়া দিল। সেই রাত্রেই উপরিউক্ত দেবতারা তীর্থঙ্করের জন্মোৎসবের সকল নিয়মগুলি পালন করিলেন।

শিশুর জন্মের তৃতীয় দিবসে তাহাকে দিনে সূর্য্য ও সন্ধ্যার পর চন্দ্র (৬) দেখান হইল। ষষ্ঠ দিবসে দিবারাত্র (৭) জাগরণ করিয়া আত্মীয়রা শিশুকে রক্ষা করিলেন। দশদিনে জননাশৌচ দূর হইল, ত্রিশলা স্নান করিয়া একাদশ দিবসে শুদ্ধা হইলেন। দ্বাদশ দিবসে সিদ্ধার্থ আপনার সকল আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতিক্ষত্রিয় সমাজ, বন্ধু বান্ধবদের মহাভোজে নিমন্ত্রিত করিলেন। নানা প্রকার মুখরোচক খাদ্য পেয় ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিলেন। পরে স্নান করিয়া গৃহদেবতাদের (৮) পূজা ও ভোগ দিলেন। সকলে পবিত্র বসন ও মূল্যবান ভূষণে ভূষিত হইলেন। ভোজনের পর অতিথিদের পুষ্প, মাল্য, সুগন্ধি ও বসন ভূষণ উপহার দিয়া সম্মানিত করিলেন। জৈন সমাজে প্রায়ই শিশুর পিতৃস্বসা নাম নির্ব্বাচন করিবার অধিকারিণী। সেই জন্ম এই দিবসে তাঁহার বিশেষ সম্মান হইয়া থাকে। নামকরণের পর শিশুর পিতা আপন ভগিনীকে নানা উপহার দিয়া সম্মানিত ও তুষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু এ শিশু সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে দেবানাম্ প্রিয়গণ, আজ যে শিশুর জন্ম উৎসবে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যোগদান করিয়াছেন, সে শিশুর গর্ভপ্রবেশ কাল হইতে নানা প্রকারে আমার ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে, আমি ইহা লক্ষ করিয়া আসিতেছি, সেই জন্ম আমি এই শিশুর নাম বর্দ্ধমান রাখিব স্থির করিয়াছি।" এইরূপে নবজাত শিশুর নাম বর্দ্ধমান হইল। ভবিষ্যতে বর্দ্ধমানের গুণের জন্ম নানা লোক নানা প্রকার নাম রাখিয়াছিল, কিন্তু বর্দ্ধমান ও মহাবীর এই দুই নামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

---

(৬) মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে অথবা সন্ধ্যার সময়ে চন্দ্র উদিত না হইলে কেবল একবার উন্মুক্ত আঙ্গিনাতে আনা হইত। এখন এ নিয়ম আর প্রচলিত নাই।

(৭) আধুনিক কালে কোন কোন জৈন পরিবারে হিন্দুদের দেখাদেখি ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয় বটে, কিন্তু উহা জৈনাগার বিরুদ্ধ।

(৮) গৃহদেবতাদের নাম বা পূজা পদ্ধতি জানা যায় না।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্গসাহিত্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু গভীর ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এক শ্রেণীর ভাগ্যহীন লেখক. দুর্ব্বোধ্য শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা গদ্য-সাহিত্যকে দুর্গম কণ্টকারণ্যে পরিণত করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সে শ্রেণীর লেখক নহেন। প্রকৃত সাহিত্যিক বা প্রাণময় প্রজ্ঞা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, অক্ষয়কুমার দত্ত সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রেণীর সাহিত্য-রচয়িতা। সুতরাং তাঁহার. বা তাঁহার ন্যায় সুলেখকের রচনায় সংস্কৃত-শব্দের বহুল প্রয়োগ কেনই বা হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরাই বা কি পাইয়াছি, তাহার বিচার করিতে হইবে।

জনসাধারণের মধ্যে সচ্চিন্তা উদ্রিক্ত করিয়া, বর্ত্তমান জগতের যাবতীয় উন্নততর বিষয়ের সহিত দেশবাসিগণকে পরিচিত করিয়া, তাহাদের মনোবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন যাহাতে উত্তমরূপে সাধিত হয়, তাহারই জন্য অক্ষয়কুমার সাহিত্যের সাধনা করিয়াছিলেন। কোনও রাজসভায় বসিয়া, পৃষ্ঠপোষক সৌখীন ব্যক্তিগণের সাময়িক আনন্দ বিধানের জন্য তিনি সাহিত্য রচনা করেন নাই। অক্ষয়কুমারের সাহিত্য, সর্ব্বতোভাবেই জনসাধারণের সাহিত্য। জনসাধারণের সাহিত্যে, কথঞ্চিৎ দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ কেন, এরূপ প্রশ্ন বর্ত্তমান সময়ে কাহারও কাহারও মনে জাগিতে পারে। কাযেই ইহার উত্তর আবশ্যক।

অক্ষয়কুমার এবং তাঁহার যুগের যাবতীয় সুলেখকগণের হৃদয়ে অতীত ভারতের প্রতি একটি অতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রতিভা, মনীষা ও মহত্ত্ব তাঁহাদিগকে অতিমাত্রায় বিমুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন যে, আমাদিগকে যদি আবার মানুষ হইতে হয়, আমাদের হৃত গৌরবের যদি উদ্ধার সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অতীতের সহিত অতি উত্তম রূপে পরিচিত হইতে হইবে। সেই অতীতের রসে হৃদয়ক্ষেত্র সরস করিয়া. সেই অতীতের আলোকে পথ আলোকিত করিয়া অগ্রসর হইবে হইবে।

কিন্তু সেই অতীতকে আয়ত্ত করিবার উপায় কি? সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত উত্তমরূপে পরিচয়ই ইহার প্রথম ও প্রধান উপায়। আমরা বাঙ্গালী—ইংরাজরাজের শাসনে দেশের নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সকলেই বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুক—সৎ সাহিত্য রচিত হউক, সৎ সাহিত্যের আলোচনা দ্বারায় দেশের নরনারী ধনীদরিদ্র সকলেরই হৃদয় ও মন মার্জ্জিত হউক। কিন্তু এই শিক্ষা যথার্থ রূপে সফল করিতে হইলে, শিক্ষিত জনসাধারণকে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে অতীত ভারতের সহিত প্রাণময় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন, আমাদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্যের পিতা বা পিতামহ যে সংস্কৃত সাহিত্য—তাহার সহিত যদি কোনরূপ পরিচিত না করে, তাহা হইলে এই বাঙ্গলা শিক্ষা নিষ্ফল হইবে—ইহাই তখনকার ধারণা ছিল। অক্ষয়কুমার নিজেও, প্রথম জীবনে উত্তম রূপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণেই সে যুগের লেখকেরা চেষ্টা করিয়া সংস্কৃত শব্দের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের সৌষ্ঠব সাধন করিতেন। এই সমুদয় বাঙ্গালা গ্রন্থ যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারা সংস্কৃত

শব্দ, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইয়া অল্প পরিশ্রম সংস্কৃত সাহিত্য আয়ত্ত করিতে পারিবেন। অথচ পৃথগ্‌ রূপে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা না করিলেও, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান হইয়া যাইবে। ইহাই সে সময়ে সাহিত্য চর্চ্চার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি লেখকেরা অনেক স্থলেই, এই উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কেবল মাত্র পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য নির্ব্বিবাদে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দূষণীয়। কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনায় এবং তৎপরবর্ত্তী এই শ্রেণীর অনেক সুলেখকের রচনায় এই দোষ নাই।

সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের আরও কারণ রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য যে পৃথিবীর একটি উন্নততম সাহিত্য, ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং আমাদের চিন্তারাজ্য ও ভাব ক্ষেত্র যখন প্রসারিত হইল, যখন নূতন নূতন চিন্তা ভাষায় পরিব্যক্ত করিবার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার নিতান্তই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইল। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা, সাধ্যমত সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শব্দ প্রয়োগের এই প্রয়োজন দুইটি চিন্তা করিয়া, দেখিবেন। একেবারে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক বুঝিতে পারে—এই প্রকারের শব্দের সাহায্যে যদি সাহিত্য রচনা করা যায়, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা, ভাব ও কল্পনা অতি অল্পদূরে মাত্র প্রসারিত হইবে। তখন নূতন নূতন শব্দ গঠনের আবশ্যকতা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

নূতন শব্দ কি একবারে গঠন করিবেন? যে সমুদয় অসভ্য বন্য জাতিগণের কোনরূপ উজ্জ্বল সুসভ্য গৌরবময় অতীত নাই এবং সেই অতীতের প্রকাশক সুপুষ্ট ও সমুন্নত সাহিত্য নাই, তাহারা হয় কোন বৈদেশিক সাহিত্য হইতে, এই সমুদয় শব্দ সঞ্চয় বা আহরণ করিবে, নতুবা কৃত্রিম উপায়ে শব্দ নির্দ্ধারণ করিবে। কিন্তু আমরা যদি সে পথ অবলম্বন করি, তাহা হইলে আমাদের অতীতের উত্তরাধিকারীত্ব ও আত্মপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত হইব।

(৭)

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কথা—ব্যক্তিত্বের ও স্বাধীন চিন্তার পূর্ণ বিকাশ (Strong Individuality)। আমাদের ভারতবর্ষে এই জিনিবটিরই অভাব হইয়াছিল এবং আমাদের যাবতীয় দুর্গতির মূলে এই ব্যক্তিত্বের অভাব, হেতুরূপে বিদ্যমান। আমি ঐশীশক্তির অংশ, অতএব আমাকে আমার স্বাধীন চিন্তার আমার নিজের পথে ফুটিয়া উঠিতে হইবে—অন্ধ ভাবে গতানুগতিকের অনুবর্ত্তন করিলে, আমার জীবন সফল হইবে না—এই বোধ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থা, এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিকূল ছিল। প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রধান উপকার এই হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত জীবনকে, তাহার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া স্বাধীন ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার আবশ্যকতা আমরা বুঝিয়াছি। রাজা রামমোহন রায়, এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভূমিতে দাঁড়াইয়া স্বাধীন চিন্তার পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন, এই বৈশিষ্ট্য স্ফুরণের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল।

দশ বৎসর বয়ক্রমের সময় প্রাকৃতিক ভূগোলের বঙ্গানুবাদ পড়িয়া তিনি বুঝিলেন যে, প্রকৃত জ্ঞান-রাজ্যে উন্নত হইতে হইলে, আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির অনুবর্ত্তন করিলে চলিবে না। ইহাতে তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন—'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্‌'; অক্ষয়কুমার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'সর্ব্বশক্তিমান নহেন—বিচিত্র শক্তিমান্‌।' ইহা অবশ্য পরিণত বয়সের কথা। কিন্তু, এই কথায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও নিজের প্রকৃত বোধের উপর নির্ভরে দাঁড়াইয়া বহু কালের প্রচলিত মত ও বহু জনের আদর পূর্ব্বক স্বীকৃত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার

অতি বিপুল শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার অনাবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন—সে সময়ে ইহাও বড় কম কথা নহে।

অক্ষয়কুমারের জীবনের দ্বিতীয় কথা—তিনি 'ব্রতধারী' ছিলেন। নিজে জ্ঞানার্জন করিয়া, নিজের দেশের ভাষার সাহায্যে, দেশবাসী জন-সাধারণকে সেই জ্ঞান বিতরণ করিব—ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সাংসারিক উন্নতির নানারূপ সুযোগ, তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল—ইচ্ছা করিলে তিনি সে যুগে ব্যবসায় করিয়া, বিপুল ধনার্জন করিতে পারিতেন, চাকুরী করিয়া বহু টাকা বেতন পাইতে পারিতেন। কিন্তু জীবনে যাহা ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছুতেই বিচলিত হন নাই। তিনি কত পরিশ্রম করিয়াছেন ও কত গ্রন্থ পড়িয়া কত দুরূহ নূতন নূতন বিষয় আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে ধারণাতীত। এই উৎকট পরিশ্রমে তিনি দেহপাত করিয়াছেন। এই প্রকারে পরিস্ফুট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্রতধারী লোক, এই ভারতবর্ষের জন্য একান্ত ভাবে আবশ্যক।

অক্ষয়কুমারের রচনা-রীতির আলোচনায় প্রথমতঃ মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার রচনা রীতির উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাঁহার প্রথম সময়ের অনেক রচনা, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। যে সাহিত্যিক বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেখানে সে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল প্রভাব না থাকিয়াই পারে না। সেই সময়ে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের অনুবাদ করিতেছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করিতেছিলেন। অক্ষয়কুমার যদিও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন, কিন্তু প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের জন্য একটি স্বতন্ত্র সমিতি ছিল। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী সভা, কিরূপ ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা করিবেন, সে বিষয়ে তত্ত্ববোধিনীর লেখকগণের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। ঐ সমিতির ভিতর সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহাদের মত যে সমাদরের সহিত গৃহীত হইত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাধনার প্রথম যুগে অবশ্য এই প্রকারের বন্ধন, সকল ক্ষেত্রে না হউক, অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ। এই প্রকারের বন্ধন সত্ত্বেও, অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত-রীতির অনেক পরিবর্জ্জন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহার নিজের প্রকৃতির অনুবর্ত্তী করিয়াছেন। ধনী, মানী, জ্ঞানী প্রভৃতি সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দগুলি, বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে কর্তৃকারকের এক বচনে ঈ-কারান্ত হইত, অন্যান্য স্থলে ইকারান্ত হইত। অক্ষয়কুমার সেই প্রয়োগ রহিত করিয়া, সকল বিভক্তিতে ও সকল বচনে ঈ-কারান্ত করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় সম্বোধন পদে—মুনে, দেবি প্রভৃতি লিখবার রীতি ছিল। এই রীতিও অক্ষয়কুমার কর্তৃক পরিবর্জ্জিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার যে একটি নিজের জীবন ও নিজস্ব প্রকৃতি আছে, বাঙ্গালা ভাষা যে একটি জীবিত ভাষা—এ কথা অক্ষয়কুমার বুঝিয়াছিলেন এবং ইহা বুঝাইবার জন্য সে সময়ে অনেক সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতের সহিত তাঁহাকে বাদানুবাদও করিতে হইয়াছিল। মোট কথা গতানুগতিকতা বর্জ্জন করিয়া বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি লইয়া, সামাজিক পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তির নিয়মের তিনি অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মানব মাত্রেরই উচ্চতম অধিকার তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—সংস্কার বর্জ্জন করিয়া, স্বাধীন চিন্তার পথে নিজের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়া, তিনি দেশবাসীকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ও সাহিত্য 'সাধনার' ইহাই প্রথম ও প্রধান কথা।

(৮)

আজ সাইত্রিশ বৎসর হইল, অক্ষয়কুমার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং অক্ষয়কুমারের প্রতিভারশ্মি তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যে বঙ্গীয় সমাজের উপর ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে, তাহার পর আশী বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

এই আশী বৎসর বাঙ্গালী জাতি নানা বিষয়ে চিন্তা ও চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও মনে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও সকল বিষয়ে বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

আজ বর্ত্তমানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া, যদি অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে যে মূর্ত্তি দান করিয়া গিয়াছেন সেই মূর্ত্তি জয়যুক্ত হইয়াছে। অবশ্য এই মূর্ত্তি গঠনের কৃতিত্ব অক্ষয়কুমারের সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অন্যান্য কার্ম্মিগণও ইহার অংশভাগী। কিন্তু অক্ষয়কুমারের ভাব ও চিন্তা, আমদের দেশে অমরতা লাভ করিলেও বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। এই শেষোক্ত কথাটি বুঝিতে হইলে, নব্যবঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ভাবের দিক হইতে আলোচনা করিতে হইবে।

অক্ষয়কুমার প্রধনতঃ বৈজ্ঞানিক। আজ ইংরাজ জাতি, জার্ম্মাণ জাতি, ফরাসী ও মার্কিণ জাতি, বৈজ্ঞানিকতায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার প্রতিষ্ঠা একদিনে হয় নাই। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির অনুশীলনে, ইংরাজ জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মনীষী বেকন হইতে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ পর্য্যন্ত মনীষিগণ কি কঠোর তপস্যা এবং কি ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বেকনের সময়ে ভদ্রলোকেরা নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও উন্নত বিষয়ের আলোচনাকে ভদ্রলোকের উপযুক্ত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আরিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের বড় বড় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করা সমাজে সম্মানজনক কার্য্য ছিল। এই মানুষকে প্রত্যক্ষ স্থূল ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করাইয়া অধ্যবসায় সহকারে সেই সমুদয় বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ করিবার সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত করিতে বেকনকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

আজ ইংরাজ যে গৌরবান্বিত, তাহার কারণ এই বৈজ্ঞানিকতা। অক্ষয়কুমার আমাদের দেশে এই বৈজ্ঞানিকতার প্রতিষ্ঠার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সেই কঠোর তপস্যায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকের যাবতীয় লক্ষণ অক্ষয়কুমারের চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি ছাড়া, মানবের আর একটি বৃত্তি আছে—তাহার নাম কবিত্ববৃত্তি বা ভাবুকতা। এই দুইটি বৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্বও দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় এই দুইটিকে যথাক্রমে Reason and Imagination বলা যায়। কোনও মানবের প্রকৃতিতে এই দুইটি বৃত্তি যদি সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা আদর্শ মানব বলিতে বাধ্য। কিন্তু এই প্রকারের পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য বড়ই বিরল। অক্ষয়কুমারের প্রকৃতিতে এই উভয় প্রকারের উপাদানই যে বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে অতি অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই সামঞ্জস্য ছিল কি না, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না এবং বলিবার সময়ও হয় নাই।

পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের দেশে, আর এক প্রকারের চিন্তাপদ্ধতি জাগিয়া উঠিল। তখন সমালোচকেরা অক্ষয়কুমারের মতের নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—অক্ষয়কুমার অনেক বিষয়ে উকীলের মত কার্য্য করিয়াছেন, ইংরাজী সাহিত্যে যেকলে জন্সনের যে সমুদয় দোষ দেখাইয়াছেন, কোন কোন সমালোচক তাহারই অনুবর্ত্তনে দেখাইয়া দিলেন যে অক্ষয়কুমারেরও এই সমুদয় দোষ ছিল। অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন—হিন্দুর স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র অসার এবং দার্শনিকগণ কেবল বিতণ্ডা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার পঞ্জিকা দেখিয়া দিনক্ষণ নিরূপণ করিয়া যাত্রা করাকে কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করিতেন—বহু দেবদেবীর অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না—ফলিত জ্যোতিষেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। অক্ষয়কুমার তাঁহার এই সমুদয় মনোভাব গোপন রাখেন নাই। তিনি চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন, নির্ভীক ভাবে অকপটে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। এই প্রকারের নির্ভীকতা, অনুসন্ধিৎসা ও অন্ধভাবে প্রচলিত মতকে মান্য না করা, বৈজ্ঞানিকের

বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার যুগ আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল না। নানা কারণে আমরা দেশকে হঠাৎ ভালবাসিয়া ফেলিলাম। এই ভালবাসা সকল সময়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয় নাই এবং ভালবাসা বা প্রেম সাধারণতঃ চক্ষুষ্মান্ নহে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ আমাদের ইতিহাসে অযথা কলঙ্ক লেপন করিয়াছে—আর গুপ্ত মহাশয় সেই কলঙ্ক মুক্ত করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। অবশ্য যে কলঙ্ক অযথা, তাহার ক্ষালন করা উচিত। কিন্তু আমার দেশের শাস্ত্র,ধর্ম্ম বা ইতিহাসের বিরুদ্ধে যখন কিছু বলা হইয়াছে, তখন বুঝি বা না বুঝি, তাহার প্রতিবাদ করিব—এই প্রকারের প্রবৃত্তি যদি কোনও লেখকের ভিতর জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে তিনি বৈজ্ঞানিকের ভূমি হইতে স্খলিত হইয়া ভাবুকতার পিচ্ছিলপথে নিপতিত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ও ভাবুক এই উভয়ের মধ্যে যেটুকু প্রভেদ তাহা মনে রাখা আবশ্যক।

প্রেম আমাদিগকে অনেক সময়েই অন্ধ করে এবং প্রেমিক হইতে গিয়া আমরা অনেক সময়ে সত্যভ্রষ্ট হই। স্বদেশপ্রেম অতীব প্রশংসার বিষয়। কিন্তু আজকাল অনেক মহাপুরুষের নিকট আমরা শুনিতেছি—স্বদেশ অপেক্ষা সত্য বড়। কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্যের ইতিহাস ভারতের দিক্ হইতে আলোচনা করিলে একটি স্তর দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে স্তরে একটি কৃত্রিম বা সাময়িক উচ্ছ্বাসময় স্বদেশপ্রেম, আমাদিগকে সত্যান্বেষণে সুদৃঢ় সবল ও অধ্যবসায়শীল হইতে বাধা দিয়াছে। এখনও আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। এই প্রতিক্রিয়াই তাহার কারণ। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—এই উভয়ের দ্বন্দ্বের অনেক ইতিহাস বাহির হইয়াছে। সেই সমুদয় পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব—বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু—এই সুপরিচিত নীতিসূত্র অবলম্বন করিয়া যাহারা প্রচলিত ধর্ম্মমত নির্ব্বিকারে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা যাবতীয় পরিবর্ত্তন ও অগ্রবর্ত্তিতাকে ভয়ের চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের প্রাধান্য বৈজ্ঞানিকতা প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। অক্ষয়কুমার দত্তের সাধনা, এই এক বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এই বিঘ্ন কতদিনে দূরীভূত হইবে, তাহা বলা যায় না।

পূর্ব্বে কিছু সূক্ষ্মভাবে আমরা যে প্রতিক্রিয়ার কথা বলিলাম, একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা তাহা বর্ণন করিতেছি। অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থরচনার দ্বারায় দেশে সুশিক্ষা বিস্তারের একটি বিশেষ সুবিধা ছিল তাঁহা আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি স্কুল কলেজে বড় বড় অধ্যাপকের অধীনে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র বিশেষ রূপে পাঠ করেন নাই। অল্পদিন মাত্র মেডিকেল কলেজে বিশেষ ছাত্ররূপে উপস্থিত হইয়া কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের চেষ্টায় এবং কিছু বেশী রকম পরিশ্রম করিয়া এই বিষয় তাঁহাকে শিখিতে হইয়াছিল। কাযেই আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি ও চিন্তা পদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে তাহারা কি প্রকারে বৈজ্ঞানিক বিষয় সমূহ বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিতে পারে, নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা অক্ষয়কুমার তাহা অতি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানের আলোচনায় যশোলাভ করিয়া যদি তিনি বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতেন, তাহা হইলে গ্রন্থগুলি আমাদের দেশের পাঠকগণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইত কি না বিশেষ সন্দেহ।

বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যে সমুদয় বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ গ্রন্থেই অক্ষয়কুমারের ভাষা ও বর্ণনা প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কোন কোনও গ্রন্থে একটি বিশেষ দোষ বা ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছি। অক্ষয়কুমারের রচনার সহিত তুলনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহার রচনায় এই দোষের লেশমাত্র নাই। বিজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া তাহা মনোরম করিবার জন্য আমরা এমন উৎকট কাব্য সৃষ্টি করিয়া বসি যে, সেই কাব্যের ব্যূহভেদ করিয়া প্রকৃত বিষয়ে উপস্থিত হইতে, পাঠককে বিশেষরূপ বেগ পাইতে

হয় এবং অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। পাঠকের চিত্তবৃত্তির সহিত লেখকের পরিচয় না থাকাতেই এই প্রকারের অযথা কাব্য সৃষ্টি দ্বারা বৈজ্ঞানিক রচনা অনেক সময়েই নিষ্ফল হইয়া যায়। অক্ষয়কুমারের রচনা এ বিষয়ে এখনও অন্ততঃপক্ষে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আদর্শ রচনা। কিন্তু অক্ষয়কুমারের পদার্থবিদ্যা অনেকদিন পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল না। তাহার পর যে গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক রূপে প্রচলিত হয়, সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে ১২৮৭ সালের আষাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে "বঙ্গ বৈজ্ঞানিক" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে, এই নূতন গ্রন্থের গ্রন্থকার অক্ষয় কুমারের গ্রন্থখানি উত্তমরূপে পড়িলে অনেক ভ্রম হইতে রক্ষা পাইতেন। অথচ এই দ্বিতীয় পুস্তকখানি পাঠ্য পুস্তক হইয়া গেল! প্রতিক্রিয়ার ইহা একটি স্থূল উদাহরণ।

(৯)

অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্যের ও সমাজের যে স্তরের প্রতিনিধি, আমরা বহুদিন সেই স্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। সেই স্তরের প্রভাব ও সাফল্য বহুল পরিমাণে লইয়া আসিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে আমরা সে যুগ বা সে স্তর হইতে সকল বিষয়েই অনাবিল উন্নতি লাভ করিয়াছি, ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যে যে যুগ চলিতেছে, আসন্ন ভবিষ্যতে তাহার একটি প্রতিক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা এবং সেই প্রতিক্রিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে যে, অক্ষয়কুমারের যুগে অনেক স্বাস্থ্যকর ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা অবহেলা করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি।

কেবল একটী বিষয়ের দ্বারা এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যায়। মানবের জীবনে এবং সাহিত্যে একটা অস্পষ্টতার যুগ আছে। সেই যুগে মানুষ বিচার পূর্ব্বক কোনও বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট বা সুনির্দ্ধারিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। প্রত্যেক বিষয় ও ব্যাপার, নানা প্রকারে নানা দিক্ হইতে আলোচনা করিতে পারা যায় এবং প্রতিকূলে ও অনুকূলে নানা প্রকারের কথা বলিতে পারা যায়। এই প্রকারের প্রত্যেক ব্যাপার সম্বন্ধে যত প্রকারের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত সম্ভব, কোনও লোক যদি বসিয়া বসিয়া, তাহাই আবিষ্কার করিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা সেই লোকের পাণ্ডিত্যের ও বহুজ্ঞতার প্রশংসা না করিয়া পারি না সত্য, কিন্তু সেই প্রকারের লোক লইয়া বাস্তব জগতের প্রয়োজন সাধন, অনেক সময়েই অসম্ভব ও কষ্টকর হইয়া পড়ে।

মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। সাহিত্য ও সামাজিক প্রয়োজনকে, সে উপেক্ষা করিতে পারে না। অনেক সময়ে সমাজে এমন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন অস্পষ্টতা অনিষ্টকর। তখন সকল বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত একান্তভাবে আবশ্যক। অক্ষয়-কুমারের যুগ তাঁহার রচনাবলীর সাহায্যে এবং সেই সময়কার অন্যান্য সাহিত্যিকের সাহায্যে আলোচনা করিলে মনে হয়, উহা সকল বিষয়েই একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের যুগ। এই সিদ্ধান্ত সমূহ অভ্রান্ত কিনা, তাহার আমরা আলোচনা করিতেছি না; এক যুগের যাবতীয় সিদ্ধান্ত অপর যুগে অভ্রান্ত বলিয়া কখনও গৃহীত হয় না। কিন্তু সামাজিক জীবনের এমন দিন আসে, যখন যাহা হউক একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম্ম আবশ্যক হইয়া পড়ে। সর্ব্ববিধ অস্পষ্টতা বিবর্জ্জিত বীরত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্তের যুগকে ইংরাজীতে Positivistic Age বলে—বৈজ্ঞানিকতার প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই যুগ সম্ভব হয়।

অক্ষয়কুমারের পর, বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যে এবং জীবনে যে যুগ আসিল, সেই যুগকে আমরা দার্শনিকের সংশয়পূর্ণ অস্পষ্টতা ও কাল্পনিকতার যুগ (The Age of Metaphysical Doubts and Fancies) বলিলে, প্রমাণের অভাব হইবে না। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Comte) মানবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তিন স্তর বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম যুগ—অলৌকিকের দোহাই দিবার যুগ (The Theological Stage); দ্বিতীয় যুগের নাম—দার্শনিকের বাগ্বিতণ্ডার যুগ (The Meta-

physical Stage), আর তৃতীয় যুগের নাম—ধ্রুবদর্শন ও সুস্পষ্ট নির্দ্ধারণের যুগ (The Potistivistic Stage)। রাজা রামমোহন রায়ের সাধনায় আমরা আমাদের জীবনে, সমাজে ও সাহিত্যে এই তৃতীয় যুগের উষালোক দেখিতে পাই। অক্ষয়কুমারের সময়ে, এই উষার আলোক আরও উজ্জ্বল ও বিস্তৃত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে, এই আলোক যে নির্ব্বাপিত হইল তাহা নহে, তবে অনেক স্থলেই অসময়ের কৃষ্ণমেঘ উদিত হইয়া, ঐ আলোকের স্বাস্থ্যকর ক্রিয়ার বিঘ্ন উৎপাদন করিল। বাঙ্গালার নবযুগের সাহিত্যের আলোচনায় এই একটি সিদ্ধান্ত নির্ভয়ে করা যাইতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস, যদি কখনও বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বৈজ্ঞানিকের সত্যের আলোক ব্যক্তির জীবনে, সামাজিক জীবনে, এমন কি, ধর্ম্ম, কাব্য ও কবিতায় যদি কখনও জয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে অক্ষয়কুমারকে আমরা আরও ভালরূপে বুঝিতে পারিব। তাঁহার অবশ্য মৌলিক দান কিছুই নাই। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যের কোন নব-সত্যের উদ্ভাবক বা আবিষ্কর্ত্তা নহেন। কিন্তু, আজ আমাদের বাঙ্গালা দেশের যে সমুদয় বৈজ্ঞানিকের যশঃপ্রভা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তারিত হইয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিতেছে, সেই সমুদয় বৈজ্ঞানিকগণের উদ্ভব যে সম্ভব হইয়াছে তাহার মূলে অক্ষয়কুমারের সাধনা সুস্পষ্ট রূপে দেদীপ্যমান। অক্ষয়কুমাকে খর্ব্ব করিবার জন্য যাঁহারা দেখাইয়াছেন তিনি দেবতা মানিতেন না, হাঁচি টিকটিকি দিক্‌শূল মানিতেন না, স্মৃতিশাস্ত্রের নিন্দা করিতেন, তাঁহারা, যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালী বর্ত্তমান সময়ে জাতির মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, এই সব বিষয়ে তাঁহাদের কি মত, তাহা কি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন? তাঁহারাও যদি অক্ষয়কুমারের মতাবলম্বী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা শুনিতে কি অস্বীকৃত হইবেন? বিজ্ঞানালোচনার দিক হইতে এই কথাটি বলা অত্যন্ত আবশ্যক। যিনি বৈজ্ঞানিক নহেন,—ভাবুক ও ভক্ত—তাঁহার রাজ্য স্বতন্ত্র; তিনি অবশ্য শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে অক্ষয়কুমারের ন্যায় স্বাধীনচিন্ততা ও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার সাহসিকতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

মিলন পথে

(উপন্যাস)

দশম পরিচ্ছেদ

গোবিন্দ দাসের বাড়ীর পাশের বনমালী বোষ্টমের বৌ তাহার প্রথম পক্ষের স্বামীর একটি সাত বছরের ছেলে লইয়াই বনমালীর ঘর করিতে আসিয়াছে। এই ছেলেটি কর্ম্মহীন মধ্যাহ্নে অনেক সময়ে মাধবীর সঙ্গী হইয়া থাকিত। মাধবীর সময় যখন আর ফুরাইতে চাহিত না, তখন সে আদর করিয়াই ছেলেটিকে লইয়া আসিত। ছেলের মাও ছেলেকে মাধবীর কাছে দিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। নিস্তেজ ছেলেটার সর্ব্বদা সব কাযের সময়ে মায়ের পিছনে পিছনে ঘোরা, ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যানে স্বভাব এবং ছেলেকে 'মানুষ'

করিয়া তুলিবার জন্ত বনমালীর শ্রান্তিহীন তিরস্কার এবং কঠোর আচরণ ছেলের মাকে প্রায় সর্ব্বদা অশান্ত ও ব্যস্ত করিয়া তুলিত।

আজও মাধবী মধ্যাহ্নে শীর্ণ দেহ, অযত্নে বিশৃঙ্খল রুক্ষ কেশ ছেলেটিকে কোলের কাছে বসাইয়া তাহার ম্লান মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে পঞ্চু তুই এমন রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস কেন? পেট ভ'রে ভাত খাসনে নাকি?"

ক্ষীণ হাত দু'খানি তুলিয়া ভাতের ওজনটা মাধবীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া পঞ্চু বলিল, "রোজ এত গুলি ক'রে ভাত খাই। আমি আগে কতবার ক'রে খেতাম; এখন তো বাবা দু'বারের বেশী খেতে দেয় না, তাই দু'বারেই অনেকগুলি করে ভাত খাই। বাবা যদি দেখতে পায়, তবে খুব বকে; বাবার সামনে মা আমাকে খেতে দেয় না।"

"তোর বাবা তোকে ভালবাসে না পঞ্চু?"

"একটুও না। ও মরে গেলে বেশ হ'তো। আমায় কেবল বকে আর মারে। মাসিমা, তুমি জাননা, ও আমার নিজের বাবা নয়। এখন মাও আর আমায় ভালবাসেনা। আগে কত খেতে দিত, এখন আর দেয় না। বাবা বাড়ী না থাকলে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু খেতে দেয়।"

"তোর নিজের বাবা তোকে ভালবাসত না?"

"হুঁ খুব ভালবাসত। বাবার সঙ্গে খেতাম, শুতাম, বাবার কোলে চড়ে বেড়াতে যেতাম। ক—ত খাবার দিত বাবা! একটুও রাগ করত না, মারত না।"

"বনমালী যখন তোকে মারে, তখন তোর মা কি করে?"

"সে বাড়ী থাকলে কিছু করে না, আর মেরে ধরে বের হয়ে গেলে মা আমায় কোলে ক'রে চোখ মুছে দেয়, এক এক সময় নিজেও কাঁদে। আচ্ছা, মাসিমা, বাবা মাকেও মারে নাকি? নইলে মা কাঁদে কেন?"

মাধবী মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "গুড় নারকেল দিয়ে তুই চাট্টি মুড়ি খাবি রে পঞ্চু?"

পঞ্চু গম্ভীর ভাবে বলিল, "খেতে পারি।"

মাধবী মুড়ি আনিয়া দিল। পঞ্চু মুড়ির বাটিটা কাছে আনিয়া গম্ভীর ভাবেই খাইতে লাগিল। প্রাপ্তির শিশুসুলভ আনন্দের আভাস তাহার মুখে দেখা গেল না। স্নেহের অভাব এবং কঠোর শাসন তাহাকে এমনি অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, যেন তাহাতে আহ্লাদ করিবার, আশা করিবার, উৎসাহিত হইবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ইহার নিরুপায় মায়ের কথা ভাবিয়া মাধবীর চোখের পাতা আবার ভিজিয়া উঠিল। ছেলেকে প্রকাশ্যে আদর করিবার অধিকারও আর মায়ের নাই! এই দুঃসহ দুঃখের ভার বহন করিতে যাইয়া মায়ের হৃদয় কতখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কে জানে? তাহার মৌন ব্যথা গলিয়া গলিয়া নির্জ্জনে অশ্রুবন্যার সৃষ্টি করে, এই শিশু তো তাহার কিছুই জানে না! অপ্রকাশ্য ব্যথিত স্নেহের ওজন করার, অনুভব করার শক্তি তো এই শিশুর নাই। হয়তো পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছেলেকে মায়ের স্নেহ বুঝিবার ক্ষমতা কোন দিনই দিবে না। মায়ের একান্ত বাঞ্ছিত সন্তানের ভালবাসা এবং সন্তানের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ মাতৃস্নেহ, এই দু'টি হইতে উভয় উভয়কে চির বঞ্চিত মনে করিবে। হায় দুর্ভাগ্য! পঞ্চুর মার আবার বিবাহ করিবার কি দরকার ছিল? ছেলেকে বুকে করিয়া কিছু দিন কষ্ট সহিয়া থাকিতে পারিলে, এই ছেলেই তো তাহার অভাব পূরণ করিতে পারিত। বৈষ্ণব সমাজে কে এই প্রথার সৃষ্টি করিল? নিশ্চই সে বিধাতার অভিশপ্ত। যে প্রথা ছেলেকে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত করে, মাকে স্নেহ প্রকাশ করিতে দেয় না, তাহা টিকিয়া থাকে কেন? যদি মাধবীর শক্তি থাকিত, তবে সে অন্ততঃ সসন্তান বিধবার কণ্ঠীবদল প্রথা তুলিয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। সহসা মাধবীর মনে পড়িল, কত নিরুপায় হইয়া কত কষ্টে পঞ্চুর মা বনমালীর ঘর করিতে আসিয়াছিল। পঞ্চুর বাবার মৃত্যুর পর সে দৈন্যের চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তবু কল্পনাতীত কষ্ট সহিয়া সে স্বামীর ভিটায় দুই বছর পড়িয়া ছিল। কতদিন নিজে না খাইয়া ছেলেকে দু'টি খাওয়াইয়া ও স্থির চিত্তে

চুপ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দিনান্তে ছেলেকে দু'টি খাওয়াইবার উপায়ও তাহার আর রহিল না। ক্ষুধিত সন্তানের চীৎকারে মায়ের প্রাণ সহ্য করিতে পারিল না। এই ছেলের জন্যই সে বনমালীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। নারীর জীবনটাই বিধাতার মূর্ত্তিমান অভিশাপ।

মাধবীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়া পঞ্চু বলিল, "মাসীমা, আমাকে এক গেলাস জল দাও।"

মাধবী পঞ্চুর শূন্য বাটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু খাবি?"

পঞ্চু বলিল, "দিতে পার।"

মাধবী আবার মুড়ি আনিয়া দিল। তারপর পঞ্চুকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তাহার চুল লইয়া বসিল। লম্বা লম্বা চুল গুলিতে অনেক দিন চিরুণী পড়ে নাই। মাধবী অনেকক্ষণ বসিয়া চুলগুলি আঁচড়াইয়া সম্মুখের দিকে আনিয়া চূড়াকারে বাঁধিয়া দিল এবং ভিজা গামছা লইয়া তাহার মুখ মুছাইয়া পরিষ্কার করিল। নিজে সে কোন দিনই তিলক ব্যবহার করিত না। কিন্তু আজ সে তিলক বাহির করিয়া পঞ্চুর নাকে একটা কলি করিয়া দিল। প্রসাধন শেষ করিয়া হাত ধরিয়া পঞ্চুকে রাসমণির কাছে লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ দেখি মা, পঞ্চুকে আজ কেমন দেখাচ্ছে।"

রাসমণি দাওয়ায় বসিয়া ডাল বাছিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "বেশ দেখাচ্ছে তো! তুই বুঝি এতক্ষণ ব'সে পঞ্চুর গা মাজা ঘষা করেছিস? তা, মাঝে মাঝে একটু করিস। ওর জন্যেই তো ওর মাকে এখানে আসতে হলো, কিন্তু তবু ওর দুঃখ ঘুচলো না। একটুও দুরন্তপনা করেনা পঞ্চু, তবু যে বনমালী কি ব্যাভারটাই করে!"

"পঞ্চু তোমার কাছে থাক্ মা, আমি জল আনতে যাই; বেলা তো আর বেশী নেই"—বলিয়া মাধবী কলসী লইয়া অশোকের বাড়ী চলিল। লোকের কাছে জবাবদিহির লজ্জা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার জন্য মাধবী এক দিনও অশোকের পুকুর হইতে জল আনা বন্ধ করে নাই। তবে তাহার গৃহে সে আর পদার্পণ করে নাই। গৃহে পদার্পণ না করায় কেহ আশ্চর্য্য হয় নাই, কারণ অশোক তো সেই ঘটনার পর হইতেই গৃহছাড়া। তবে যে তিন চারদিন সে গৃহে ছিল, সে ক'দিন নাকি মাধবীর কোমরে একটা বেদনা হইয়াছিল; তাই সে ক'দিন রাসমণিকে জল আনিতে হইয়াছিল।

মাধবী ঘাটে যাইয়া কলসী নামাইতেই পশ্চাৎ হইতে বঙ্কু হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, একটা সু-খবর আছে, কি বকসিস দেবে বল?"

মাধবী ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল, "আগে তোমার খবরটাই বল।"

"এই ফাল্গুন মাসে বাবুর বিয়ে।"

"সত্যি নাকি? কার কাছে শুনলে?"

"সত্যি, সত্যি, সত্যি, উমাদিদির চিঠি এসেছে যে।"

"তোমার কাছে চিঠি এসেছে?"

বঙ্কুর মতে তাহাই আসা উচিত ছিল, কিন্তু উমাদিদি সেই উচিত কাযটা না বুঝিয়া মহেন্দ্র বাবুর কাছে চিঠি লিখিয়াছেন। বঙ্কু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, "না দিদি, ও বাড়ীর সেজ বাবুর কাছে চিঠি এসেছে।"

"কোথায় বিয়ে ঠিক হলো বঙ্কু?"

"দিদির ওখানে,—ঐ চাঁদপুরেই।" তারপর বঙ্কু নিজের আবেগেই বলিয়া যাইতে লাগিল, "মেয়ে বেশ ডাগর, খুব লেখাপড়া, গান বাজনা জানে। আর, নাকি কত রকম সেলাই করতে জানে; সব দর্জ্জিতেও নাকি সে রকম পারে না। আর নাকি খুব সুন্দর দেখতে. তোমার মতন।"

মাধবী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখেছ বোধ হয় বঙ্কু?"

বঙ্কু মাধবীর কথায় অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল। মাধবীই যে তাহার কাছে সৌন্দর্য্যের আদর্শ, বেচারী সে কথা তাহাকে বুঝাইতে পারিল না। মাধবী তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বঙ্কু, সেই গুণবতী রূপসী মেয়েটিকে দেখে নিশ্চয়ই তোমার বাবু ভুলে গেছেন?"

মাধবীর কথার ফল ফলিল। বঙ্কু বলিল, "তা যেতে পারেন, নইলে বিয়ে করতে রাজি হবেন কেন? আমি কত বলেছি, তখন তো রাজি হন নি।"

মাধবী কলসীতে জল ভরিতে ভরিতে বলিল, "যে দিন তোমার বাবু বৌ নিয়ে বাড়ী আসবেন, সেদিন আমি তোমাকে খুসী ক'রে দেবো বঙ্কু।"

বঙ্কু ঈষৎ গর্ব্বের সহিত বলিল, "বাবু, উমাদিদি, তুমি—তোমরা সবাই সুখে থাক, এছাড়া বঙ্কু আর কিছুই চায়না দিদি।"

"তা আমি জানি বঙ্কু। কিন্তু তোমার বাবু তোমাকে কিছু জানান নি কেন?"

"কি জানি দিদি। আচ্ছা, বাবু কি তোমাকেও কিছু লেখেন নি বিয়ের কথা?"

"না। আমিও তো তাঁকে চিঠি লিখিনে।"

বঙ্কুর বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া মাধবী তাহাকে আর প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া তাড়াতাড়ি জল লইয়া উঠিয়া চলিল।

অশোকের বিবাহ! অসম্ভব, অসম্ভব। মাধবীর অন্তর কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু অবিশ্বাসের কারণও সে বিশেষ কিছু দেখিতেছিল না। তাই সে মনে মনে হাসিতে লাগিল!

মাধবী বাড়ী আসিয়া দেখিল, রাসমণি দরজা বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, পঞ্চুদের বাড়ী। গোবিন্দদাসও বাড়ী নাই। সে দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া জল রাখিয়া দিল। তারপর বৈকালিক গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে গুণ গুণ করিয়া আপন মনে গাহিতে লাগিল,

"কতদিন মাধব রহব মথুরা পুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি, হরি, কাহে কহব এ সংবাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু,
তব দরসন হু সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি সবহুঁ কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশ নিগড় করি জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পয়াণ।
বিদ্যাপতি কহ আশাহীন নহ,
আওব সো বর কান॥

মাধবীর মৃদু গুঞ্জন কখন যে উচ্চ তারে উঠিয়া বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। কি এক অজানা শক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গাহিয়াই যাইতে লাগিল। আজ তাহার কণ্ঠের সমস্ত নৈপুণ্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য এই পদটিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ গাহিয়া, অনেকক্ষণ পরে সে চুপ করিল। পিছনে নিশ্বাসের শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, ঠাকুর্দ্দা দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝড়িয়া পরিতেছিল। মুহূর্ত্তে মাধবীর সজল কালো চক্ষু দু'টি হাসিতে ঝলকিয়া উঠিল। পাঁচ সাত দিন সে ঠাকুর্দ্দাকে দেখে নাই। ঠাকুর্দ্দা আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "গলায় এতখানি মিষ্টি লুকিয়ে রেখেছিলে, তা আজ টের পেলাম দিদি। সত্যি, বিরহ জিনিটা বড় সুন্দর, বড় মিষ্টি।"

মাধবী একটু লজ্জিত হইল। সে তো কিছু ভাবিয়া গান গাহে নাই, কিন্তু ঠাকুর্দ্দা হয়তো কি জানি কি ভাবিয়াছেন। তবু সে হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি? কিন্তু বিরহের তুমিই বা কি জান, আর আমিই বা কি জানি ঠাকুর্দ্দা?"

ঠাকুর্দ্দা চোখ মুদিয়া, একটুখানি হাসিয়া বলিলেন- "দিদি, সবাই জানে। ভাল না বেসে কারু থাকবার উপায় নেই যে! তবে অবস্থা ভেদে প্রকার ভেদ, এই যা কথা।"

মাধবী কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তার বলা হইল না। গোবিন্দদাস আসিয়া ডাকিল, "মাধু, মা, এদিকে এস তো।"

দ্রুতপদে মাধবী পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দ দাস মাধবীর হাতে একখানা চওড়া লালপেড়ে আসমানী রঙের শাড়ী দিল। মাধবী শাড়ীখানা উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া বলিল, "বাঃ, বেশ শাড়ী খানা তো! কার জন্যে এনেছ বাবা?"

গোবিন্দদাস সস্নেহে সহাস্যে কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, "বল দেখি মা।"

"বাবা, এখন কেন আনলে? আমার তো ঢের আছে।"

"সে কথা পরে হবে, এখন একটু তামাক সাজ মাধু। কেও? বাবাজী নাকি? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এস। কথা আছে, এদিক এস।"

ঠাকুর্দ্দাকে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দদাস চুপি চুপি যেন কি বলিল। ঠাকুর্দ্দাও অস্ফুটকণ্ঠে তাহার জবাব দিলেন। ইতিমধ্যে রাসমণি আসিয়া তাহাদের কথায় যোগ দিল। মাধবী তামাক দিয়া চলিয়া গেল, আর দাঁড়াইল না।

পরদিন মাধবী জানিতে পারিল, আজ গোবিন্দ দাস বিবাহের পাকা কথা বলিতে কেশবের ওখানে যাইবে।

কেশবের বাড়ী নিকটবর্ত্তী গ্রামে, দুই ক্রোশের বেশী পথ নহে। এই অঞ্চলের বৈষ্ণবদের মধ্যে ধনে সে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ এবং শুনা যায়, সে বেশ লেখাপড়াও শিখিয়াছে। ঠাকুর্দ্দার কাছে তাহার অবস্থা ও শিক্ষার কথা শুনিয়া গোবিন্দ দাস ও রাসমণি বিবাহের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

যথা সময়ে গোবিন্দ দাস পরিস্কার কাপড়চোপড় পরিল। বহুদিনের ক্রীত এবং পরিত্যক্ত এক জোড়া চটি জুতা ছিল তাহা বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া পরিস্কার করিয়া পায়ে দিয়া দেখিল, একটা ছেঁড়া যায়গা দিয়া প্রায় দুইটা আঙ্গুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এখন মুচিবাড়ী যাইয়া মেরামৎ করাইবার আর সময় নাই। সে দুঃখিত মনে জুতা খুলিয়া রাখিয়া, শ্রীহরি শ্রীহরি বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সে বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে দেখিতে পাইল রান্নাঘরের পিছনের কুল গাছে হেলান দিয়া মাধবী নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। তাহার অন্তরের নিগূঢ় দারুণ দুঃখ যেন তাহার কম্পিত দেহে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দ দাস কিছুকাল বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া মাধবীর আরক্ত ও স্ফীত মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া গেল। মাধবী ইহার কিছুই জানিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর গোবিন্দ দাস বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াতেই রাসমণি অধীর অদম্য সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে দিন ঠিক হলো গো?"

গোবিন্দ দাস তক্তপোষের উপর বসিয়া, গায়ের চাদর খুলিতে খুলিতে বিস্ময়ের ভাবে বলিল, "কিসের দিন?"

রাসমণি ক্রোধ ও বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া বলিল, "কিসের দিন? বামুনগাঁয়ে কেন গিয়েছিলে?"

"ওঃ, তাই! তা, বিয়ে হবার এখন সুবিধে হল না।" —বলিয়া গোবিন্দ দাস একবার মাধবীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল, বিস্ময় ছাড়া তাহাতে আর কিছুই নাই। রাস-মণি ততক্ষণে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যাহা বলিবার, বুঝাইবার ছিল, হয় তো তাহা পারে নাই, হয় তো বুদ্ধির দোষে মাধবীকে আঘাত করিয়াছে, ভাবিয়া অশোক নিজেও এক বিন্দু স্বস্তি পাইতেছিল না। তাই সে খুব তাড়াতাড়ি করিয়াই চাঁদপুরে উমার কাছে চলিয়া আসিয়াছিল। উমার স্বামী ফণিভূষণ ভাল করিয়া এম-এ ও আইন পাস করিয়াও ওকালতিতে পসার করিতে পারে নাই। তার পিতা তাঁহার একজন উচ্চপদস্থ বন্ধুকে ধরিয়া অনেক চেষ্টায় ফণীকে মুনসে-ফীতে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ফণী অল্পদিন হইল চাঁদপুরে বদলী হইয়া আসিয়াছে। সে শ্যালকের শুভাগমনের টেলিগ্রাম পাইয়া বেশ খুসী হইয়া উঠিল। কারণ অনেকবার অনেক অনুরোধেও সে অশোককে তাহার কর্ম্মস্থানে আনিতে পারে নাই।

যথাসময়ে ফণিভূষণ ষ্টেশনে যাইয়া সমাদরে শ্যালককে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল।

চাঁদপুরে উমার পরিচর্য্যা, তাহার ছেলেমেয়ের ছুটির সঙ্গ এবং মেঘনার অগাধ নীল জলরাশি অশোককে খানিকটা তাজা করিয়া তুলিল। ছুটির দিন ছাড়া অশোক ফণীকে বড় একটা পাইত না. কিন্তু ফণীর পাঁচ বছরের মেয়ে রাণী অনর্গল গল্পে, প্রশ্নে এবং ফরমাসে সর্ব্বদা তাহাকে ব্যস্ত করিয়া রাখিত। রাণীর তিন চারটি ছেলেমেয়ে ছিল। এগুলি তাহার বাপ তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিল। উমা খোকাকে লইয়া যেমন যেমন করিত, রাণী পুতুলগুলি লইয়া তাহারই অবিকল নকল করিতে চেষ্টা পাইত। ছেলেমেয়ের পরিচর্য্যার ভার সে অবসরপ্রাপ্ত মামাবাবুকেও খানিকটা দিয়াছিল।

সেদিন দুপুর বেলা অশোক শুইয়া "অমৃতবাজার" পড়িতেছিল। রাণী তাহার পুতুলের বাক্স লইয়া তাহারই পাশে বসিয়া খেলিতেছিল। একটি পুতুল অশোকের হাতে দিয়া রাণী বলিল, "মামাবাবু এটিকে কাপড় পরিয়ে দাও শীগ্‌গির।"

অশোক "অমৃত বাজার" রাখিয়া তৎক্ষণাৎ রাণীর আদর পালনে সচেষ্ট হইল। এমন সময়ে উমা আসিয়া অশোকের কাছে বসিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি হচ্চে দাদা?"

অশোকও হাসিয়া বলিল, "নাতনীকে কাপড় পরাচ্ছি।"

"রাণী তোমাকে খুব পেয়ে বসেছে।"

"হাঁ, ওকে ছেড়ে যেতে আমার ভারি কষ্ট হবে।"

"ওমা, এখনি কোথা যাবে? একমাস পুরো হয়নি যে এসেছ। শরীরটাও তো একটুও শোধরাল না।"

"আমার শরীরটা ত বেশ ভালই আছে উমা।"

"ছাই আছে! প্রথম প্রথম একটু বা ভাল হয়েছিল। এখন তো আবার খারাপ হয়েছে। এই শরীর নিয়ে বাড়ী গেলে কেই বা তোমায় দেখবে! মা নেই, বাবা নেই, আমাদের মত দুঃখ কার?"—বলিয়াই উমা কাঁদিয়া ফেলিল। অশোক সস্নেহে বোনটির চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "মা বাবার অভাব কে-ই বা পূরণ করতে পারে? কিন্তু বাড়ীতে আমার কোন অযত্ন, অসুবিধে হয় না তো। বন্ধু, হরু তো আছেই, বিধুঠাকরুণ রান্না করে দেন। আর মাধবী সব সময়ে দেখা শোনা করে। মাধবী তোরই মত যত্ন করে আমার।"

শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে অশোক উদ্যত দীর্ঘশ্বাস কোন মতে চাপিয়া রাখিল।

উমা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাধুর এখনো বিয়ে হয়নি?"

অশোক একটুখানি হাসিয়া বলিল, "ক'বার তার বিয়ে হবে?"

"যা হয়েছিল, সেকি একটা বিয়ে নাকি? আবার বিয়ে হলে ওদের মধ্যে তো কোন নিন্দে নেই।"

"ও কি ঠিক ওদেরি মত উমা?"

"তা নয় বটে। ও কি আর বিয়ে করবে না তবে?"

"কে জানে?"

বলিয়া অশোক খোলা জানালার পানে চাহিল। অদূরবর্ত্তী মেঘনার নীল নির্ম্মল তরঙ্গায়িত বক্ষে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর দীপ্তি হীরকের মত জলজল করিতেছিল। অশোক চাহিয়া চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। খোকার কান্না শুনিয়া উমাও উঠিয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর উমা শয়ন করিতে যাইয়া স্বামীকে বলিল, "শোন, একটা কথা আছে।"

ফণী অর্দ্ধশায়িত অবস্থাতেই বলিল, "একটা কেন, দশটা বল। কাণ পেতেই তো আছি চির কাল।"

উমা কোল হইতে ঘুমন্ত খোকাকে সাবধানে শোওয়াইয়া রাখিয়া, স্বামীর পায়ের কাছে ভাল হইয়া বসিয়া বলিল, "দাদার বিয়ের চেষ্টা দেখতে হবে। আর কত দিন আইবুড়ো থাকবে বল?"

ফণী যেন আঁতকাইয়া উঠিয়া বলিল, "বাপরে! এ সাধু সঙ্কল্প কেন আবার? খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেশ আছে। কেন তার ঘাড়ে একটা দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দেওয়া?"

"তা হলে আমি তোমার একটা দুঃসহ বোঝা বল!"

এই বিশ্রামের সময়ে ফণী স্ত্রীর অধর অভিমানে স্ফুরিত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল, স্ত্রীকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমি কি আমার কথা বলছি, পাগলী? অনেকের তো এমন হয়। তোমার দাদারও হতে পারে।"

"দাদার যে এমন হবেই, তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই! ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, ভেবে ক'জনই বা চিরকুমার থাকতে পেরেছে?"

ফণী মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "তা ঠিক, তা ঠিক, আমিই তো পারিনি। এখন আমাকে কি করতে হবে বল।"

"দাদাকে বিয়েয় রাজি করতে হবে।"

"কেন, সে কি ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছে, এমন প্রমাণ পেয়েছ?"

"না। তবে কথাটা তো পাড়তে হবে, তুমিই পাড়।"

"তাই হবে"—বলিয়া ফণী এসম্বন্ধে সমস্ত আলোচনা তখনকার মত শেষ করিয়া দিতে চাহিল। উমা কিন্তু ছাড়িল না, বলিল, "আচ্ছা, এণার সঙ্গে দাদার বিয়ে হ'লে কেমন হয়?"

এণাক্ষি স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হরকুমার বাবুর কন্যা, ষোড়শী, রূপসী এবং শিক্ষিতা। উমার সঙ্গে তাহার খুব ভাব—সে প্রায় প্রত্যহই উমার কাছে আসিত। সে যেন হাসি ও উল্লাসের ঝরণা। অকারণ জড়তা বা সঙ্কোচ তাহাতে ছিল না। অশোকের সঙ্গেও তাহার আলাপ হইয়াছিল। কিন্তু আলাপটা তেমন জমিতে পায় নাই, তার কারণ অশোক নাকি এই রকম মেয়েদের সঙ্গে আলাপে তেমন পটু নয়। এণাক্ষি ঠাট্টা করিয়া বলিত, "উমা দিদির দাদাটি ভয়ানক কৃপণ। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে অনেক সঞ্চয় আছে, কিন্তু তার কিছুই তিনি খরচ করবেন না।" উমা এ ঠাট্টা গায়ে মাখিত না। তাহার দাদার স্কুল কলেজের সব পরীক্ষায় সম্মানিত কৃতিত্ব এবং বাণীর নির্ম্মাল্য স্বরূপ স্বর্ণপদক গুলির কথা মনে করিয়া সে গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া উঠিত। ফণী বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "উমা, এণার সঙ্গে তোমার দাদার কোর্টশিপ চলছে নাকি?"

উমা বলিল, "দূর! তা কেন? তবে মেয়েটি সব রকমে ভাল, তাই বল্লাম।"

"এণার মা বাবার মতের দরকার হবে না?"

"তাঁরা অমত করবেন না, জানি।"

"আজ রাত্রেই তো তোমার দাদার বিয়ে হচ্ছে না, তবে রাত জেগে কেন কষ্ট পাওয়া? এখন ঘুমুতে পারি?"

"তা পার" বলিয়া উমা নিজেও শয়ন করিল।

পরদিন একটা ছুটি ছিল। অপরাহ্নে ফণী অশোকের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওহে ভায়া, কি করছ?"

অশোক তাহার হস্তস্থিত বই হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিল, "পড়াশুনো।"

ফণী একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বেশ ঝাঁকিয়া বসিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "বই রাখ, দরকারী কথা আছে।"

অশোক বইখানা বন্ধ না করিয়াই টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া নিঃশব্দে ফণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। ফণী বলিল, "কি দেখছ? আমি কি খুব সুন্দর?"

"খুব কেন, একটুও না।"

"উমা তোমার সঙ্গে এক মত হ'তে পারবে না বোধ হয়। কোনও সাধ্বী স্ত্রী—"

"কেবল বাজে কথা! কি বলবে, বল না।"

"তোমাকে বিয়ে করতে হবে।"

"এই কথা! বেশ তো।"

"উমার ইচ্ছে, শীগ্‌গির করতে হবে। তোমার তো কোন আপত্তি নেই?"

"যোগ্য পাত্রী পেলে নেই।"

"বহুৎ আচ্ছা! চল, একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।"

দুই জনে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

সাত আট দিন পরে উমা অশোককে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, আজ এণার গান শুনেছ?"

"তোমার ঘর থেকে সন্ধ্যা বেলা যে গান শোনা যাচ্ছিল, সে কি এণার গান?"

"হাঁ, কেমন শুনলে?"

"বেশ, কিন্তু মাধবীর গলা এর চেয়ে মিষ্টি।"

উমা রাগ করিয়া বলিল, "মাধবী এর চেয়ে দেখতেও ভাল বোধ হয়?"

উমার রাগ দেখিয়া অশোক খানিক অবাক্ থাকিয়া বলিল, "সে কথা কেন?"

"এই এণাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।"

"এখনি নাকি?"

"না, কিন্তু ফাল্গুন মাসের মধ্যেই।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

"তিন দিনের বেশী ভাবতে পারবে না।"—বলিয়া উমা চলিয়া গেল।

'ভেবে দেখি' ও তো একটা কথার কথা, ছল। এণাকে অপছন্দ হওয়ার কোন কারণই নাই। রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, এণার কিসের অভাব? বেশ ডাগরও হইয়াছে—যাইয়াই ঘরকন্না বুঝিয়া লইতে পারিবে। কতদিন অশোকের মুখে এণার প্রশংসাও তো শুনা গিয়াছে। উমা হৃষ্টচিত্তে তখনই মহেন্দ্রলালকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিল। গ্রামে তাঁহার মত নিকট আত্মীয় আর তো কেহ ছিল না।

তিনদিন পরে ফণী অশোককে জিজ্ঞাসা করিল "কি বল, বিয়ের প্রস্তাব এণার বাপের কাছে করতে পারি এখন?

অশোক বলিল, "না, পাত্রী পছন্দ হলো না।"

শুনিয়া উমা বিস্ময়ে ক্ষোভে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ফণী হাসিয়া নিজের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার আর কোন পাত্রী পছন্দ হয়ে কায নেই ভাই, ও কি কম ঝঞ্ঝাট?"

অশোক কোন কথা বলিল না। কিন্তু দুঃখে উমার কান্না আসিতে লাগিল। মা বাবা বাঁচিয়া থাকিলে আজ কি অশোক বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিত? কখনও না! এত করিয়াও উমা দাদাকে 'সংসারী' করিতে পারিল না।

তিন চার দিন উমা দাদার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিল না। তারপর আবার তিন চারদিন খুব সাধাসাধি করিয়াও দাদাকে বিবাহে রাজি করাইতে না পারায় আপাততঃ হাল ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিল, কিন্তু আশা ছাড়িল না।

একদিন অশোক উমাকে ডাকিয়া বলিল, "উমা, কাল আমি কাশী রওনা হব ভাবছি। ওখানে একবার আমার শরীর ভাল হয়েছিল।"

অশোকের দেহের প্রতি চাহিয়া উমা আপত্তি করিতে পারিল না। বলিল, "তা গিয়ে সেখানে কিছুদিন থাকতে পার। কিন্তু ফেরবার সময়ে আমাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে যেও।"

অশোক খুব উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয় নিয়ে যাব। কিন্তু ফণী রাজি হবে তো উমা?"

"রাজি হবেন না কেন? আড়াই বছর হলো বাড়ী যাইনি।"

পরদিন অশোক কাশী রওনা হইল। যাত্রাকালে উমা কেবলই আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিল। রাণী তো মামাবাবুর সঙ্গে যাইবার জন্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে নানাবিধ খেলনা দিয়া, আবার আসিয়া লইয়া যাইবার আশ্বাস দিয়া কোনমতে চক্ষুর জল চাপিয়া অশোক গিয়া ষ্টীমারে উঠিল।

কাশীধামে পৌঁছিয়া অশোক আপনাকে সম্বরণ করিয়া অনেকখানি সুস্থ হইয়া বসিল। বিবাহ করিবে না, একথা তাহার মনে কখনও জাগে নাই। বিবাহ জিনিসটা যখন প্রায় সত্য হইয়া তাহার কাছে ধরা দিতে আসিল, তখন সে কিছুতেই তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। এই না পারার কারণ যখন সে এক রকম বুঝিল, তখন সে সহসা ভয়ে লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। বিবাহের কথা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, না-করার কারণটা তাহার কাছে নিতান্ত অস্পষ্ট ও ঝাপসা ছিল। কারণটা তাহার মনের কাছে ধরা পড়িয়া দিনের আলোর

মত স্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় সে ভয়ানক বিচলিত হইয়া কাশীতে পলাইয়া আসিল। এখানে তো বিবাহের কথা তুলিয়া তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিবার আর কেহ নাই।

কাশীধামে বাস করিতে করিতে তাহার চিত্ত অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিল। তাহার লুপ্ত চেতনা যেন আবার ফিরিয়া আসিল। ভালবাসা যদি কাহারও পক্ষে অপরাধ না হয়, তবে তাহার পক্ষেই বা হইবে কেন? সে কি বিধাতার সৃষ্টির বাহিরের জীব? সে যাহাকে ভালবাসে, মানুষ হিসাবে তাহার মূল্য কাহারও অপেক্ষা কম নয়। সেই আশৈশব প্রাণভরা স্নেহ, একাগ্র সেবা, সুখী করিবার জন্ম প্রাণপণ যত্ন, পৃথিবীতে কয় জনের ভাগ্যে যোটে? দোষ গুণ, ভাল মন্দ, সব লইয়া তাহাকে কে আর অমন পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? কে আর তাহার বাহির দেখিয়া অনায়াসে মনোভাব পাঠ করিতে পারে? কাহার কাছে সে আর অমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে? এই বিপুল বিশ্বে কে আর তাহার মুখ চাহিয়া আপনাকে ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে?

বাঙ্গালার এক কোণের সেই ক্ষুদ্র পল্লী হইতে এত খানি দূরে আসিয়া আজ অশোকের প্রাপ্তির মূল্য খুব বৃহৎ ও মহৎ হইয়াই দেখা দিল। ইহা এত সুন্দর, এত মহৎ, মূর্খ সে, তাই এতদিন বুঝিতে পারে নাই। আজ এই নিভৃতে বসিয়া স্মৃতি-ভাণ্ডার খুলিয়া এত দিনের সঞ্চিত রত্নগুলি অশোক শতবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। কবে সে ইহা সঞ্চয় করিয়াছিলল, তাহা তাহার মনে নাই, কিন্তু আজ সেই সঞ্চয়ের গভীর আনন্দে উচ্চ গৌরবে তাহার সমগ্র হৃদয় ভরিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

যৌবন বিলাস

তব লাবণ্য সরোবরে, সখি,
করেছি কেবল জলখেলা,
লালসা-তাপিত এ তনু জুড়াতে
কেটে গেছে যৌবনবেলা।
সরোজ-সুরভি কলতরঙ্গে
এলায়ে দিয়েছি অলস অঙ্গে,
হরষরঙ্গে চলবিভঙ্গে
নিখিলবিশ্বে করি' হেলা—
তব লাবণ্য সরোবরে আমি
করেছি কেবল জলখেলা।

যাত্রীরা সব পথে যেতে যেতে
ডাকিয়াছে মোরে "আয়, আয়,"
শুনেও শুনিনি, প্রহর গুণিনি,
বিভোর ছিলাম হায়, হায়।
বাণীরে ভুলিয়া, মরালের তীর
কণ্ঠ ধরিয়া দিয়েছি সাঁতার,
পদ্মায়ে ভুলি' পদ্মে মজেছি
আঁকড়ি ধরেছি ফুলভেলা,
তব লাবণ্য সরোবরে শুধু—
করে' গেছি আমি জলখেলা॥

সাধকসংঘ ডেকেছে তূর্য্যে,
শঙ্খে, মঠের পুরোহিত,
ডেকেছে জীবন-সমরাঙ্গনে
বিষাণ বাদনে স্মরজিৎ।
কত অভিমান, কত উৎসব
তুলিয়াছে দূরে কলকল রব,
ভাগ করে' নিয়ে জয়বৈভব,
মহামানবের মহামেলা।
তব লাবণ্য সরোবরে সখি,
করিয়াছি আমি শুধু খেলা।

শ্রীকালিদাস রায়।

"স্বর্ণলতা"

সাহিত্য-জগতে দেখা যায় যে, কোন কোন সাহিত্যিক একখানি মাত্র গ্রন্থ লিখিয়া বা একটীমাত্র কবিতা রচনা করিয়া চিরকালের জন্য যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ঐ সকল সাহিত্যিক আর কোন গ্রন্থ না লিখিলেও, আর কোন কবিতা রচনা না করিলেও, তাঁহাদের নাম সাহিত্য জগতে অমর হইয়া থাকিত। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি গ্রে (Gray) তাঁহার সুপরিচিত "এলিজি" নামক কবিতাটি লিখিয়া, যদি আর কোন কবিতা না লিখিতেন, তাহা হইলেও ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম অক্ষয় হইত। এদিকে আমাদের বঙ্গদেশে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যদি তাঁহার "পদ্মিনী" কাব্যের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" প্রভৃতি কয়েক ছত্র মাত্র কবিতা লিখিয়া আর কিছুই না লিখিতেন,—যদি কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য লিখিয়া আর কিছুই না লিখিতেন, সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁহার কপালকুণ্ডলা নামক উপন্যাস খানি লিখিয়া আর কিছুই না লিখিতেন, তাহা হইলেও রঙ্গলালের বা নবীনচন্দ্রের বা বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বঙ্গ সাহিত্যে চিরকাল বিরাজমান থাকিত। সেইরূপ আজ এই প্রবন্ধে একজন বঙ্গবাণীর সেবকের বিষয় আলোচনা করিব, যিনি শুধু একখানি মাত্র পুস্তকদ্বারা বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, যিনি শুধু সেই পুস্তখানি দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার নাম অক্ষয় অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ঐ গ্রন্থকারের সম্যক্ আদর এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যে করা হয় নাই,—দুঃখের বিষয় সেই গ্রন্থকারের জীবনী আজ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থকারের সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা হইল না। অথচ তাঁহার ঐ পুস্তকখানি খুব সমাদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে এবং আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকল বঙ্গবাসীই ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া অশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। সেই গ্রন্থকারের নাম ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সেই গ্রন্থের নাম স্বর্ণাক্ষরে বঙ্গ-সাহিত্যে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "স্বর্ণলতা" ছাড়া, "অদৃষ্ট", "হরিষে-বিষাদ" প্রভৃতি আরও কয়েক খানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন বটে,—কিন্তু "স্বর্ণলতা"ই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কীর্ত্তি ; শুধু "স্বর্ণলতা"ই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় ও অমর করিয়া রাখিবে।

তারকনাথের নিবাসস্থান ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত বাগ্‌আঁচড়া গ্রাম। ঐ গ্রামটী অধুনাতন ই, বি, রেলওয়ে সেন্‌ট্রাল সেক্‌শনের যাদবপুর নামক ষ্টেসন হইতে ছয় মাইল দূরে। এবং সুপ্রসিদ্ধ স্বনামখ্যাত ঢপ কীর্ত্তন প্রবর্ত্তয়িতা মধুকানের বাসস্থান উলসী হইতে চার পাঁচ মাইলের মধ্যে। গ্রামখানি গণ্ডগ্রাম,—পূর্ব্বে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাস ছিল,—পূর্ব্বাপেক্ষা হীনদশাগ্রস্ত হইলেও ঐ গ্রামে এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাস আছে। উহারই একটি পটী বাগুড়িতে একটি পোষ্ট আফিস আছে। বাগ-আঁচড়া, বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত। বনগ্রাম পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অধীন ছিল, খুলনা জেলা সৃষ্টির সময়ে যশোহরের অন্তর্গত হইয়াছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনেক দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত লালবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও অধ্যাপক। তাঁহার অপর এক পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে বর্দ্ধমানের পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তারকনাথ প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন, পরে উচ্চ ইংরাজ বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া ডাক্তারী অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তার হয়েন। তিনি এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন এবং

সেই কর্ম্ম উপলক্ষ্যে বঙ্গদেশের ও বেহারের অনেক স্থানে গমনাগমন করিয়াছিলেন। ডাক্তারির অবসর সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চ্চার সময় অতিবাহিত করিতেন। তাহার ফলে আমরা তাঁহার নিকট উপরের লিখিত উপন্যাস কয়খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে "স্বর্ণলতা"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "স্বর্ণলতা"র ইংরাজীতে অনুবাদ হইয়াছে। তারকনাথের সহিত তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত অনেকেরই আলাপ ছিল, তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও লেখক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তারকনাথের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এবং তাঁহারই নামে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "স্বর্ণলতা" গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

তারকনাথের জীবনী লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র "স্বর্ণলতা" উপন্যাসের সামান্য সমালোচনা করা হইতেছে। আশা করি তাহা অস্থানসংবদ্ধ হইবে না।

"স্বর্ণলতা" উপন্যাসে প্রেমিকার প্রেমোচ্ছাস নাই; ইহাতে চন্দ্রালোক নাই, দক্ষিণা বাতাস নাই, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সম্ভারের বর্ণনা নাই, রাজা রাজ্ঞীর বা কোন বড়লোকের বিষয় নাই, যুদ্ধ বিগ্রহ নাই,—ইহাতে কাব্য জগতের কবিত্ব-উন্মাদনা নাই। তথাপি ইহা সুললিত ও সুখপাঠ্য এবং হৃদয়গ্রাহী। কবি গ্রের কথায় বলিতে গেলে, এই পুস্তকখানি "The short and simple annals of the poor"—অর্থাৎ দরিদ্র গৃহস্থ জীবনের ঘটনা লইয়া এই পুস্তক লিখিত। ইহাই ইহার বিশেষত্ব এবং এই জন্যই এই পুস্তক এত সমাদৃত।

সাহিত্যক্ষেত্রে কয়েক শ্রেণীর লেখক দেখা যায়। কাহারও কাহারও গ্রন্থ বাস্তবজীবন বর্ণনা করা হয়, কাহারও কাহারও গ্রন্থ ভাবমূলক—অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থে বাস্তবজীবনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বস্তুর ভাবমূর্ত্তি বা চিন্মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং কাহারও কাহারও গ্রন্থে এই দুইয়ের সংমিশ্রণ থাকে। প্রথম শ্রেণীর লেখক বস্তুতন্ত্র,—তাঁহারা বাস্তব জীবনে যেরূপ ঘটিয়া থাকে তাহাই যথাযথ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক বাস্তবজীবনে যেরূপ ঘটিয়া থাকে সেরূপ বর্ণনা না করিয়া, তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত বস্তু সকল কাল্পনিক ভাবে বিচিত্র করিয়া, পাঠকের সমক্ষে সেই কল্পনাপ্রসূত ভাবসমূহ এবং সেই ভাব সমন্বিত বস্তু সকল আনীত করেন। তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, এই দুই মিশ্রিত করিয়া সংমিশ্র চিত্র অঙ্কিত করেন। প্রথম শ্রেণীর লেখক রিয়ালিষ্টিক্ বা বস্তুতন্ত্র, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক আইডিয়ালিষ্টিক্ (Idealistic) বা চিদ্বস্তু বিকাশ-পন্থী। তৃতীয় শ্রেণীর লেখক এই দুইয়ের সংমিশ্রণ অর্থাৎ আইডিয়ালিষ্টিক্ ও রিয়ালিষ্টিক্ উভয়ই। "স্বর্ণলতা"র লেখক প্রথম শ্রেণীর লেখক এবং "স্বর্ণলতা" প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ অর্থাৎ বস্তুতন্ত্র। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে সাধারণ দরিদ্র পল্লীবাসী গৃহস্থের দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপ, আচার ব্যবহার, মনোভাব, কার্য্যপ্রণালী, সুখ দুঃখ প্রভৃতি—এক কথায় তাহাদের দৈনন্দিন ইতিহাস যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা "স্বর্ণলতা" গ্রন্থে পাইবেন। "স্বর্ণলতা" পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বেকার গৃহস্থ পল্লীবাসীর একখানি নিখুঁৎ চিত্র। এই গ্রন্থে, তৎকালে হিন্দু যৌথ পরিবার কিরূপ ছিল, কিরূপে সেই পরিবারে কলহের বীজ উপ্ত হইয়া সেই পারিবারিক যৌথজীবন ভিন্ন হইত, কিরূপে তৎকালে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তি জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, কিরূপে কলহপ্রিয়া হিন্দুরমণীর কার্য্যদোষে ও প্রকৃতির দোষে সংসার নষ্ট হইয়া যাইত, কিরূপে পতিব্রতা হিন্দুরমণী স্বামীর সেবা করিত এবং স্বামীর চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিত, এবং কিরূপে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পলে পলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত, কিরূপে প্রভুপরায়ণা দাসী প্রভুর সেবা শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিত এবং প্রভু, প্রভুপত্নী ও প্রভুপুত্র ঐরূপ দাসীর প্রতি কিরূপ সুব্যবহার করিত এবং তাহাকে পরিবারস্থ একজন বলিয়া মনে করিত, কিরূপে বিলাসী বাবু আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া থাকিতেন এবং জমিদার সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণ কিরূপ জীবন যাপন করিত এবং বিলাসী

বাবুগণের ভৃত্যবর্গ কিরূপ আচরণ করিত, সেই সময়কার গ্রাম্য পাঠশালার অবস্থা কিরূপ ছিল এবং গুরুমহাশয় ও ছাত্রগণ মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, সেই সময়কার পুলিশ কর্ম্মচারী কিরূপ ছিল এবং বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা দরিদ্র সম্বন্ধী কিরূপ আচরণ করিত; পল্লীবাসী দরিদ্র ব্যক্তি কর্ম্মের অনুসন্ধানে সহরে আসিয়া কিরূপ ব্যবহার পাইত ও করিত;—সাধারণতঃ সেই সময়কার নরনারীর আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, এই সকলের বাস্তব জগন্ত চিত্র "স্বর্ণলতা"র অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সেই সময়কার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাই "স্বর্ণলতা"র আর একটি বিশেষত্ব। এখন পল্লীজীবন অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কলিকাতা ও কালীঘাট এবং আচার ব্যবহারও অনেকাংশে বা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু "স্বর্ণলতা" পাঠে আমরা যেন চক্ষের সমক্ষে সেই সময়কার চিত্র দেখিতে পাইতেছি।

তারকনাথের চরিত্রসৃষ্টি-ক্ষমতা অতুলনীয়। প্রধান প্রধান চরিত্র ত বেশই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—অপ্রধান, সামান্য সামান্য চরিত্রও অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অতি সামান্য সাধারণ চরিত্রও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অতি সামান্য নগণ্য ব্যক্তিরও বিশেষত্ব তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাহা অতি সামান্য দুই একটি কথায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি এক একটি জাতি (type)। প্রত্যেক নরনারীর, প্রত্যেক ব্যক্তির, ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বিশেষত্ব তারকনাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাহার ছবি তাঁহার অনবদ্য তুলিকাদ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন। সে ছবি সদা জাজ্জ্বল্যমান,—যেন "জীবন্ত" মূর্ত্তি। যে তুলিকাতে তিনি প্রধান প্রধান চরিত্র,—শশিভূষণ, বিধুভূষণ, নীলকমল, গদাধরচন্দ্র, গোপাল, হেমচন্দ্র, প্রমদা, সরলা, শ্যামা, স্বর্ণলতা প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই তুলিকাতেই তিনি অতি সামান্য সাধারণ নগণ্য চরিত্র,—গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়, বিলাসী বাবু ও তাঁহার চাকর রামা, বাবুর পারিষদ বর্গ, হেমচন্দ্রের চাকর রামকুমার, রজক, রমেশ কনেষ্টবল, দারোগা দীনবন্ধু বাবু, রামধন শুঁড়ি, নৌকার মাঝি, হেড্ কনেষ্টবল, প্রভৃতিরও চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু চিত্র সব সময়ে সকল স্থানেই অতি সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে,—সকলগুলিই বাস্তব নরনারীর চিত্র,—প্রত্যেক চিত্রটিই সেই সেই চরিত্রের জাতি। ঐ সকল চরিত্রের আসল (original) আমরা প্রায়ই সংসারে দেখিয়া থাকি। তারকনাথ সেগুলি এমন সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমরা উপন্যাস পাঠ করিতেছি না, আমরা বাস্তব জগতে বিচরণ করিতেছি। ইহাই প্রতিভাবান লেখকের বিশেষত্ব; ইহাই তারকনাথের বিশেষত্ব।

এই চরিত্র অঙ্কন ও পরিস্ফুটন বিষয়ে তারকনাথের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তাঁহার চরিত্রগুলি সাধারণ "নভেলি" চরিত্র নহে,—সেগুলি নাটকীয় (dramatic) চরিত্র। কথাটি একটু পরিস্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। সাধারণ "নভেলি" চরিত্র দুই প্রকারে পরিস্ফুটিত হয়,—সেই সেই চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত উক্তি ও কথোপকথন দ্বারা এবং সেই নভেল বা উপন্যাস-লেখকের বর্ণনাদ্বারা। নাটকে চরিত্র পরিস্ফুটন করা হয় কেবলমাত্র কুশীলবগণের (Characters in a drama) উক্তি প্রত্যুক্তি ও পরস্পর বাক্যালাপ দ্বারা। নাটকে, উপন্যাস বা নভেলের ন্যায় পৃথগ্‌ভাবে চরিত্রবিশ্লেষণ বা মনস্তত্ব অনুশীলনের অবসর বা সুযোগ নাই, নাটকের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। নাটকে যে সকল কুশীলবের বা চরিত্রের অবতারণা করা হয়, তাহাদের পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তি, কথোপকথন ও আত্মগত উক্তি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মনস্তত্ব অনুশীলন বা চরিত্রগত বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। পৃথগ্‌ভাবে ঐ কার্য্য করিলে নাটকের সৌন্দর্য্যহানি

হয় এবং নাটকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কিন্তু যে উপন্যাস-লেখক, অঙ্কিত চরিত্রগুলির ও তাহাদের কার্য্যাদির বিশেষত্ব ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি চরিত্রগত ভাবগুলি নিজের কথায় আদৌ বর্ণনা বা বিশ্লেষণ না করিয়া, সেই সেই চরিত্রের মুখের কথাদ্বারা ব্যক্ত করেন, সেই উপন্যাস-লেখকের ক্ষমতা অসাধারণ। তারকনাথের "স্বর্ণলতা" পাঠ করিলে "স্বর্ণলতা" লেখকের সেই অসাধারণ ক্ষমতার, সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও চরিত্রের বিশেষত্ব বা পার্থক্য বা ব্যক্তিত্ব বা মনস্তত্ত্ব তারকনাথ নিজের কথায় বিকাশ করিবার কোন প্রয়াস পান নাই,—কোথাও তিনি নিজে ঐসকল বিশ্লেষণ করেন নাই বা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই;—তিনি বর্ণনীয় ঘটনা সমুদয় সরল ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, উপন্যাসের চরিত্রগুলি সরলভাবে অনায়াসে উক্তি-প্রত্যুক্তি করিয়াছে, তাহা হইতে আপনা আপনি তাহাদের মনস্তত্ব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি, পাঠকের সমক্ষে দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়াছে। কোনও প্রয়াস নাই, কোনও উদ্যম নাই। যেন সরল ভাবে জগতের ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—আর তাহারই মধ্যে চরিত্রগুলি আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই যে নাটকীয় ভাব, এই যে নাটকীয় চরিত্রাঙ্কন ইহা কম ক্ষমতার কথা নহে,—ইহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। ইহাও "স্বর্ণলতা" লেখকের একটি বিশেষত্ব।

এ প্রবন্ধে "স্বর্ণলতা"র প্রত্যেক চরিত্র বিশ্লেষণ করিব না। কিন্তু "স্বর্ণলতা"র চরিত্রগুলির সম্বন্ধে এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যখন "স্বর্ণলতা" প্রথমে লিখিত হয়, সেই সময়ে এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষা, নূতন পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ লাভ করিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক বঙ্গ-সাহিত্যিক তখন বঙ্গ সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গ-সাহিত্যে একচ্ছত্র সম্রাট্। বঙ্গসাহিত্যের উপর তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বিস্তীর্ণ হইতেছিল; বঙ্গসাহিত্য তখন পাশ্চাত্য ভাবে বিভোর। এ সময়ে "স্বর্ণলতা" লিখিত হইলেও, ইহা "স্বর্ণলতা" লেখকের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে যে, তাঁহার "স্বর্ণলতা" প্রায়শঃ পাশ্চাত্য ভাব বর্জ্জিত,—প্রায়শঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব তাহাতে দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "স্বর্ণলতা" বঙ্গদেশের তাৎকালীন সাধারণ পল্লীবাসীর নিখুঁৎ ছবি—তাহাতে বিদেশীয় গন্ধ নাই। অঙ্কিত চরিত্রগুলি সবই বঙ্গদেশীয়—তাহার কোনটিই পাশ্চাত্য ধরণের নহে। খাঁটি দেশী জিনিষ এই "স্বর্ণলতা"—খাঁটি দেশী "মালমসলায়" প্রস্তুত এই "স্বর্ণলতা"—খাঁটি স্বদেশজাত নর-নারীতে পূর্ণ এই "স্বর্ণলতা"। ইহার চরিত্রগুলি সবই এই দেশের। বিশেষ তাহার "নীলকমল" ও "গদাধরচন্দ্র" খাঁটি মৌলিক চিত্র—সাহিত্য-জগতে নূতন ও অতুলনীয়—দ্বিতীয় "নীলকমল" বা "গদাধরচন্দ্র" বঙ্গ-সাহিত্যে বা অন্য কোন সাহিত্যে দেখিতে পাই নাই।—অমর, অক্ষয় এই "নীলকমল" ও "গদাধরচন্দ্র"—যাহারা তাহাদিগের চিত্র লেখককেও অমর ও অক্ষয় করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে "স্বর্ণলতা"র ভাষা। কি প্রাঞ্জল, কি মনোরম, কি সুখপাঠ্য সে ভাষা! খাঁটি বাঙ্গলার ভাষা,—কোনও বিদেশীয় সংমিশ্রণ তাহাতে নাই,—"স্বর্ণলতা"র ভাষা খাঁটি স্বদেশী—সে ভাষা জারজ নহে। যদি সাহিত্যে সুখপাঠ্য, সুখবোধ্য ভাষার গৌরব থাকে,—যদি সাহিত্যে গভীর ভাব প্রকাশক, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার আদর থাকে,—তবে সে গৌরব, সে আদর "স্বর্ণলতা"র চিরকাল থাকিবে। যদি বাঙ্গলা গদ্যের ভাষার জন্মদাতা বলিয়া রাজা রামমোহন রায়ের খ্যাতি থাকে, যদি তাঁহার পরিপোষ্টা ও পালনকারী বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম থাকে, যদি তাহার অলঙ্কর্ত্তা ও শ্রীসম্পন্নকারী বলিয়া বঙ্গসাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকে—তবে সেই বঙ্গ-গদ্য-সাহিত্যের ভক্ত পূজক ও সাধক বলিয়া তারকনাথের নামও বঙ্গসাহিত্য ইতিহাসে বিদ্যমান থাকিবে।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

কালো মেয়ে

(গল্প)

দরিদ্রের টানাটানির ঘরে কালো মেয়ে 'সুশীতলা' যে কি ভাবিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সেই জানে; কিন্তু আমরা জানি, তার এই অনধিকার প্রবেশে বাপ মার অন্তর ও দরিদ্রের সংসারে দুর্ভাবনার একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। শৈশবের অজ্ঞান অবস্থায় অবিচলিত থাকিলেও, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার ঝাপ্‌টা সুশীকে সহিতে হইয়াছিল। জননীর গৃহকার্য্যকালে তাহার ক্ষুধার কান্না শৈশব হইতেই অমার্জ্জনীয় অপরাধ রূপে গণ্য হইত। —"পোড়া মেয়ের পেটের জ্বালার সময় অসময় নেই, আমি এখন তোমার পেট ভরাতে বস্‌লে সংসার দেখে কে? ঐ রূপের খোচনকে সাত তাড়াতাড়ি কে আস্‌তে সেধেছিল জানি নে!" রাত্রে কাঁদিয়া উঠিলে পিতার রক্তচক্ষু হইতে যে অগ্নি নির্গত হইত, সুশীর কালো হাড়ের নিতান্ত অবিনাশিত্ব প্রযুক্তই বোধ হয় তাহা ভস্ম না হইয়া টেঁকিয়া যাইত। আর পিতামাতার কিলটা চড়টা? সেটা তো সুশীর আটপৌরে আদরের মধ্যেই গণ্য ছিল। তবুও বাপ মায়ের প্রাণ—এই দুঃখের সংসারে রূপহীনা কন্যা সন্তানটিকেও কায়ক্লেশে প্রতিপালন করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

কিন্তু তারপর ক্রমে ক্রমে যখন তিনটি কন্যারত্নে গৃহ সমুজ্জল হইয়া উঠিল' তখন পিতামাতার ক্রোধাগ্নি, গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত বেচারি সুশীর ঘাড়েই ভাঙ্গিয়া পড়িল। "হতভাগী বড় ঐশ্বর্য্য দেখেছে! তাই একলা এসে হ'ল না, দলবল পেছনে জুটিয়ে এনেছে!" কিন্তু এসব সাধুভাষার অর্থভেদ করার বয়স সুশীর ছিল না। সেই দৈন্যপীড়িত সংসারে, মায়ের ছিন্ন বস্ত্রের অঞ্চলাংশে দেহ আবৃত করিয়া, মুড়ি মুড়কি জলখাবার ও গরম হইলে ফ্যানে ভাতে, বাসি হইলে নুন ভাত খাইয়া, রাজকন্যারই মত পরম আনন্দে সে দিন কাটাইতে লাগিল। আমগাছের তলাটি নিকাইয়া, ইট ঘেরিয়া খেলাঘর পাতিয়া, ছোট বোন দুটিকে লইয়া যখন সে গৃহিণীপনায় প্রবৃত্ত হইত, তখন তার চেয়ে জগতে কেহ সুখী আছে, কোনও তর্ক যুক্তিতেই সুশীকে এ কথা বুঝান যাইত না। তার উপর যেদিন অর্দ্ধ মলিন শয্যায় ছিন্ন কাঁথায় গা ঢাকিয়া, মায়ের মুখে রাজপুত্রের গল্প শুনিতে পাইত, সেদিন সুশীর স্বপ্নরাজ্যে কত রাজপুত্রেরই যে আনাগোনায় ধুম পড়িয়া যাইত, তাহার ক্ষুদ্র চিত্তে তাহার সংখ্যা থাকিত না। তার খেলাঘরে মধ্যে মধ্যে ন্যাকড়ার প্রতিমায় ছিন্ন বস্ত্র ও পুঁতির মালায় অঙ্গ সাজাইয়া রাজকন্যা রাজপুত্রেরা পরম শোভায় বিরাজ করিতেন। তাঁদের নামও রীতিমত 'পারুল', 'চম্পা', 'কঙ্কাবতী', 'দুধকুমার' প্রভৃত রাখিয়া বংশের মৌলিকত্ব বজায় রাখিতে সুশীর কিছুমাত্র ত্রুটি থাকিত না। কিন্তু এত সুখের মধ্যেও সুশীর সোণার শৈশব পোষ মানিল না, ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া তাহাকে কৈশোরের কঠিন স্তরে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া একদিন অন্তর্দ্ধান হইল। সুশীর পিতা মাতা সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁদের কালো মেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

২

সুশীদের এই ক্ষুদ্র গৃহখানির পাশেই কাঞ্চনতলার বাবুদের কাছারী বাড়ী। বারমাস নায়েব গোমস্তা ও একজন পাকের বামুন থাকে; মধ্যে মধ্যে ম্যানেজার আসিয়া দুই এক সপ্তাহ থাকিয়া যান। তিনি আসিলেই তাঁর স্নেহার্দ্র চক্ষু পাশের বাড়ীর কালো মেয়েটির উপর পতিত হইত; ধীর স্থির, স্বাস্থ্য ও আনন্দ ভরা সুশীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। জমীদারের কাছারী বাড়ী, যেখানে সুদ আসল বাকি বকেয়ার কড়ায় গণ্ডায়

হিসাব নিকাশ—সেই পাথর-পুরীতে এই কালো মুখখানি টানিয়া আনিয়া একটু সোণার হাসি ফুটাইয়া তুলিতেন। সুশী ডাকিত জ্যেঠামশায়; তারিণী বাবু ডাকিতেন মায়ি। যে ক'দিন তারিণী বাবু থাকিতেন, সুশী ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। মায়া বড় কঠিন পাশ, অনেক সময়ে এই কালো মেয়েটির আকর্ষণে তারিণী বাবু অকারণে এ কাছারিতে আসিতেন। বাপ মায়ের কাছে যেটুকু অপ্রাপ্য ছিল, তার জ্যেঠামশায়ের কাছে সুশী সেটুকু অপরিমিত রূপেই পাইয়াছিল। বালিকা বুঝিত, বাপ মায়েরা সন্তানকে এইরূপেই গালিগালাজ করে, এবং জ্যেঠামশায়রা সহজেই এইরূপ আদর করিতে পারে। সুতরাং সেও খেলাঘরে তাহার কৃত্রিম সন্তানগুলিকে মা হইয়া তাড়না ও জ্যেঠা হইয়া অজস্র আদর করিত। তারিণী বাবুর যত্ন আদর পিতা মাতার নিকট চাওয়া অসঙ্গত বলিয়াই সুশীর ধারণা জন্মিয়াছিল।

এবার আসিয়া তারিণী বাবু সমস্ত সকালবেলা শত কাযের মধ্যেও পথ চাহিয়া থাকিয়া সুশীর দেখা পাইলেন না। স্নানের সময় তৈলমর্দ্দন-রত ভৃত্যকে বলিলেন, "সুশী তো আজ এখনো এল না! সে কি জানে না আমি এসেছি?" ভৃত্য বলিল, "বলতে পারিনে হুজুর।"

"যা, আমি নিজে তেল মাখছি, সুশীকে বলগে, তার খাওয়া না হ'য়ে থাকে, আমার সঙ্গেই খাবে।"

ভৃত্য 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিল; তারিণী বাবু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "আশ্চর্য্য। পরের সন্তান, তবু যতক্ষণ তাকে না দেখছি, কিছু ভাল লাগছে না।"

ক্ষণকাল পরে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "আমাদের কাছারী বাড়ী এত লোকের সামনে সুশী দিদি তো আসবে না; সে এখন বড় হয়েছে বলে, তাকে মাঠাকুরুণ বাইরে আসতে দেন না।"

"বটে!" বলিয়া তারিণী বাবু স্নানাহার শেষ করিলেন। শয্যাপার্শ্বে পাণ তামাক প্রস্তুত রাখিয়া, পাখা হস্তে ভৃত্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, পাণ লইয়া তারিণী বাবু বাহির হইয়া গেলেন। মাথার চুলের ভিতর যে কোমল হাতদুটির অঙ্গুলি সঞ্চালনে, সুখনিদ্রায় তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিত, তার অভাবে বিছানায় শুইতে ইচ্ছা করিল না।

দ্বারের কাছে জ্যেঠামশায়ের সাড়া পাইয়া, সুশী সব ভুলিয়া, লাফ দিয়া উঠানে নামিয়া পড়িল। ঘর হইতে মা ডাকিলেন, "ওকি, ঝড়ের মত ছুটলি কোথা?" "দাঁড়াও মা, জ্যেঠামশায় এসেছেন আগে দোর খুলে আসি।"

"শোন্ ওলো সর্ব্বনাশী। আগে শুনে যা!"

সর্ব্বনাশী ততক্ষণে দুয়ারে গিয়া হাজির। অর্গল মুক্ত করিতেই জ্যেঠামশায়ের স্নেহময় বুকের মধ্যে সুশী ঝাঁপাইয়া পড়িল; তারিণী বাবু দুই হাতে সুশীকে বেষ্টন করিয়া বলিলেন—"যাঃ তোকে কোলে নেব না, দুষ্টু কোথাকার!"

এদিকে সুশীর মা ঘরে গিয়া স্বামীকে বলিলেন, "তোমার ধাড়ি ষাঁড় উর্দ্ধমুখী হ'য়ে ছুটলো যে! দেখ এতক্ষণে বুঝি কাছারী বাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছে। কি কাল্ মেয়ে পেটে ধরেছিলাম মা! জ্বালিয়ে খেলে! চেঁচিয়ে গলা চিরে গেল সর্ব্বনাশী কথায় কাণ অবধি দিলে না।"

সুশীর বাপ জানিতেন আজ তারিণী বাবু আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "তুমি স্থির হও, আমি তারিণী বাবুর কাছে যাচ্ছি।"

দ্বারের নিকট আসিতেই তারিণী বাবুকে তিনি দেখিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আপনি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছেন? অনুগ্রহ করে ঘরে এসে বসুন; যদিও আমার এ ভাঙ্গা ঘর, আপনার পা রাখবারও যোগ্য নয়!" মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এতখানি বয়স হ'ল সুশী তোর, এ আক্কেলটুকুও হ'ল না!"

তারিণী বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলে কোলে পেলে কি আর মায়ের জ্ঞান থাকে? না মার কোলে ওঠবার ছেলেরই ঠাঁই অঠাঁই থাকে?"—বলিয়া সুশীর মাথার উপর স্নেহ হাতখানি একবার বুলাইয়া হাসিতে লাগিলেন। সুশীর পিতা রমেশচন্দ্র সবিনয়ে হাত যোড় করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনিয়া বসাইলেন। তাঁহার গৃহে তারিণী বাবুর এই প্রথম পদার্পণ।

সুশী তাহার পিতার অর্দ্ধ মলিন শয্যা বিছাইয়া বলিল, "জ্যেঠামশায় খেয়ে এসেছেন তো? তবে শুয়ে পড়ুন, আমি বাতাস করচি।" রমেশচন্দ্র তাঁহার পোষাকী ফর্সি বাহির করিয়া তামাক সাজিতে চলিয়া গেলেন।

সুশী বলিল, "আচ্ছা জ্যোঠামশায়, আপনার কি কোন জ্ঞান নেই? ভাত খেয়ে এই রোদে ছুটে এসেছেন কি ব'লে?"

তারিণী বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "কুমাতা যদি বা হয়, কুপুত্র কখনো নয়।" সুশী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বলিল, "এখানে না হয় ছুটে এসেছেন! বাবা যখন আমার পরের বাড়ী বিদেয় করবেন তখন সেখানেও কি সুপুত্তুর হতে যাবেন নাকি?"

এই সময়ে রমেশচন্দ্র তামাক লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন; তারিণী বাবু সুশীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রমেশ, সত্যিই মায়ের আমার বিয়ের ঠিক করে ফেলেছ না কি?" সুশী জ্যোঠামশায়ের কাছে যাই বলুক; বাপের সামনে বিবাহের কথায় সেখানে দাঁড়াইল না, ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল।

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "কৈ আর পেরেছি বলুন? কেবল ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছি। একে তো কালো মেয়ে, তাতে এই অবস্থা; আমাদেরও তো বিয়ে হয়েছে মশায়, তা যেমন ঘর তেমনি শাঁখা শাড়ী নথ দিয়ে লোকে কন্যাদান ক'রে গেছে। এখন মশায় যার ঘর যত দস্তি, সে তত বড় হাঁ করে ব'সে থাকে। তখনকার কালে দুটো রাঁধাভাত ধরে দেবার লোক পেলে গেরস্ত ব'র্তে যেতো। এখন মানুষটা কিছু নয়, টাকাটাই সব। হা রে কলিকাল!" রমেশচন্দ্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তারিণী বাবু বলিলেন, "কত টাকা দরকার মনে কর?"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "ভাল মন্দের কথা ছেড়েই দিন মশাই! যদি কোন গতিকে সিঁথের সিঁদুরটা দেওয়াতে হয়, তবু ছ' সাত শো'র কমে তো কিছুতে হবে না। আমায় মশাই বেচলেও ছ' সাত গণ্ডা টাকা হয় না, আমি ছ' শাত শো কোথায় পাব বলুন? আমি তো বলি, মরুকগে, দুঃখে কষ্টে মানুষ করেছি, নাই বা বিয়ে হল। আমারই সংসারে খেটে খুটে থাকুক। তা, ওর মা তো সে কথা মানবে না। বর জুটলো না ব'লে মেয়েকেও গাল পাড়বে, আমাকেও দেশছাড়া করবে।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "তা তুমি একটি মোটামুটি সুপাত্র খোঁজ কর, ঠিকঠাক হ'লে আমার কাছে যেও, এষ্টেট থেকে কিছু টাকা তোমায় সাহায্য করিয়ে দেব। তবে দেখ হে রমেশ, এবার মাকে আমায় ছেড়ে দিতে হবে, পরের বাড়ী একবার গেলে তো আর দেখতে পাব না—"

এষ্টেট্ হইতে সাহায্যের কথায় রমেশচন্দ্রের মন গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি মহানন্দে সম্মতি দিলেন, "আপনার কাছে থাক্‌বে তার আর কি? ও তো আপনারই মেয়ে।"

তারিণী বাবু বলিলেন, "মায়ির যদি খাওয়া হ'য়ে থাকে, তা হলে ডেকে দাও। এ বেলা ও কাছে ছিল না, আমার খেয়ে তৃপ্তি হয় নি। ও বেলা ওখানেই খাবে। তুমিও আজ আমার সঙ্গে খেও হে রমেশ!"

"আজ্ঞে আপনারই তো খাচ্চি"—বলিয়া রমেশ সুশীকে ডাক দিলেন। সুশীর মা বলিলেন, "দেখিস্ একটু ধীর স্থির হ'য়ে যাস্। তখনকার মত ধিঙ্গি হয়ে ছুটিস্‌নে। ব'লে ব'লে আর তোকে পারলাম না!"

কিন্তু জননীর সম্মুখে ধীরপদে অগ্রসর হইলেও, ক্ষণপরেই দুই হাতে জ্যেঠামশায়কে টানিতে টানিতে তিন লাফে সুশী উঠান পার হইয়া গেল।

৩

রমেশচন্দ্র কাঞ্চনতলায় গিয়া তারিণী বাবুর সহিত দেখা করিলেন। তারিণী বাবু বলিলেন, "তা বেশ, কাল

পণ্ডর মধ্যেই টাকাটা যাতে পাও তা আমি করিয়ে দেব। তা হ'লে, কোথায় সম্বন্ধ ঠিক করলে হে রমেশ?"

"আজ্ঞে ওরই মামার বাড়ীতে; গ্রাম সম্পর্কে আমার স্ত্রীর খুড়ো হন। সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয়বার গৃহশূন্য হয়েছে। ছেলে মেয়ে ধনে ধান্যে সংসার ভরা, সুশী আমার খেয়ে মেখে থাকবে ভাল।"

তারিণী বাবুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল—সুশী খেয়ে মেখে থাকবে ভাল? বহু পুত্র কন্যার বৃদ্ধ পিতার গলায় মালা দিয়া সুশী "থাকবে ভাল?" জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজীর বয়স কত হবে?"

"কত আর? আমার চেয়ে বড় জোর আট ন বছরের বড় হবেন। কিন্তু তাঁর মাথার চুল সব এখনো কাঁচা—"

বাধা দিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "এ ছাড়া আর পাত্র পেলে না?"

দুঃখিত স্বরে রমেশ বলিলেন, "পাব না কেন? তবে বেল পাকলে কাগের কি বলুন?"

তারিণী বাবু নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুশী—তাঁহার অতি স্নেহের কন্যাধিকা সুশী—তার বিয়ে কি না! তারিণী বাবুর মনে হইতে লাগিল, আজ তাঁহার যদি একটি বিবাহযোগ্য পুত্র থাকিত, ঐ আলোকরা কালোরূপ আজ তিনি নিজেরই গৃহে তুলিয়া আনিতেন। গৃহিণী যে একটি বই আর সন্তান প্রসব করিলেন না—তাও সে আজ বিবাহিত। অন্যে সুশীর কালো দেহই দেখে, তার ভিতরের মমত্ব ভরা হৃদয়টুকুর সন্ধান তাঁর মত কে জানে?

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "তা হলে"—চমকিত হইয়া তারিণী বাবু মুখ তুলিলেন, "না হে রমেশ, অত ব্যস্ত হয়ো না, আর একটু চেষ্টা করে দেখ!"

রমেশ বলিলেন, "এ টাকায় এর চেয়ে ভাল আর কোথায় পাব বলুন? এ তবু জামাইয়ের ভাগ্যে যা হোক, সতীনপোরা যদি মন্দ না হয়, মেয়েটা একমুঠো খেয়ে পরে থাকবে। আর এই কি জোটাবার আমার সাধ্য ছিল? আপনি যাই এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন—"

"না না রমেশ, আমার সুশী মার কি এই উপযুক্ত বর? তুমি বাপ হ'য়ে কত দুঃখে এ সম্বন্ধ করেছ আমি কি তা বুঝছি নে? কিন্তু তুমি আমার উপর একবার ভার দেবে কি?"

"আজ্ঞে, সে তো আমার পরম ভাগ্য; সুশী তো আপনারই মেয়ে!"—বলিয়া রমেশ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পর তারিণী বাবু তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রাধাবিনোদকে ডাকাইলেন। তিনি কাঞ্চনতলা এষ্টেটেই চাকরী করেন, চার পাঁচ ক্রোশ দূরে পৈতৃক ভিটায় পরিবার বাস করে, তিনি ছুটির সময় বাড়ীতে যাওয়া আসা করিয়া থাকেন। উপর্যুপরি তিনটি কন্যার বিবাহ দিয়া এষ্টেটের নিকট তিনি বহু পরিমাণে ঋণী হইয়া পড়িয়াছিলেন—এমন কি তাঁর বাড়ীখানি অবধি বাঁধা পড়িয়াছিল। তারিণী বাবু বলিলেন, "কি হে রাধু, তোমার দেনাটার কি করছ? সুদে আসলে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কর্ত্তা তো আর ফেলে রাখতে চান না।"

রাধাবিনোদ উত্তর দিলেন, "কি আর করবো, বাড়ীখানি ছেড়েই দিতে হবে দেখছি। ভগবান গাছতলাই শেষে কপালে লিখেছেন।"

"কেন, তোমার চুনী তো এবার বি-এ পাস করেছে। তার একটি ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে দাওনা, তা হ'লেই দেনাটা অনেক পাতলা হয়ে যাবে।"

রাধাবিনোদ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দাদা, সে ভাগ্যি আমি করে আসিনি। ছেলে আমার নয়, তার মার। তার মা ঘটক লাগিয়েছেন, বিয়ে দিয়ে যা পাবেন, সে টাকায় তাঁরই অধিকার। আমি কোনও কথা কইতে গেলে অগ্নিকাণ্ড বেধে ওঠে। মেয়েদের বিয়ের সময় তাঁর যা গহনা দিয়েছিলেন, সুদে আসলে আগে তা পুষিয়ে নেবেন, তার পরে আমার ভিটে গেলে আর রইল!"

তারিণী বাবু বলিলেন, "এক কায কর তো বলি।"

'আজ্ঞা করুন।"

"আমি একটি মেয়ের সন্ধান জানি, মেয়েটি লক্ষ্মী প্রতিমা! রং কালো বটে, কিন্তু অমন মেয়ে তুমি

কোথাও পাবেনা রাধু, তা আমি বলে দিচ্ছি!" বলিতে বলিতে স্নেহভরে তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল।

রাধাবিনোদ বলিলেন, "আমার আর অমত কি? তবে চুনীর মা বা বলেন—"

"তা তো জানি হে, সেই কথাই বল্‌ছি। এই মেয়েটি যদি তুমি নাও, তোমার সাত হাজার টাকা ঋণ আমি উপস্থিত শোধ করে, তোমার বাড়ী ছাড়িয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে তিন হাজার তোমায় বিয়ের যৌতুক স্বরূপ আমি দেবো, বাকি চার হাজার তুমি মাসে ৪০।৫০ যা পার, বিনা সুদে আমায় শোধ দিয়ে যেও। এছাড়া তোমার স্ত্রীকে এক হাজার নগদ দেবো। তুমি পরামর্শ ক'রে দেখ, তোমার স্ত্রী এতে রাজী হন কি না।"

"আচ্ছা, দেখি। কালই তাহলে বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।"

তারিণী বাবু বলিলেন "আমার কিন্তু তিন চার দিনের মধ্যেই পাকা খবর চাই।"

রমেশচন্দ্র কাঞ্চনতলাতেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাধাবিনোদ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন, স্ত্রীর অমত নাই, তবে চুনী বাবাজী একখানি বাইক্, একটি রিষ্ট ওয়াচ্ ও একটি অর্গান চান; তার প্রতিজ্ঞা এ না পেলে তিনি বিয়ে কর্ব্বেন না।

তারিণী বাবু বলিলেন, "দ্বিতীয় ভীষ্ম দেখ্‌চি!" খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা সেজন্যে বিয়ে আট্‌কাবে না, তুমি দিন স্থির ক'রে ফেল। ভদ্রলোককে আমি আটকে রেখে কষ্ট দিচ্ছি!"

বিবাহের কথাবার্ত্তা ও পাত্র আশীর্ব্বাদ শেষ করিয়া রমেশচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন, তাঁর দীনা হীনা কালো মেয়ের এ কি ভাগ্য!

৪

টাকার তোড়ার ঝক্‌ঝকে রূপ দেখিয়া মন একান্ত বিমোহিত হইলেও, বধুর কালো রূপের জ্বালাটা শাশুড়ী সাম্‌লাইতে পারিলেন না—তাহাতে তাঁহার অমন ছেলের পাশে! তাঁর ছেলে মেয়েদেরও পাড়ার চোখখাকীরা কালো বলে বটে, তাই বলে কি তারা এমন কালো? তাই কি শুধু কালো, এক মেনিমুখী মেয়ে তাঁর হাড় জ্বালাইতে কোথা হইতে আসিল? "হা ঘরের মেয়ে জানে কেবল উঞ্ছবৃত্তি! রাজকন্যে বৌ আন্‌বো, রূপে ঘর আলো করে' সোনার খাটে পা রেখে ব'সে থাক্‌বে, হাজার দাসী চারদিকে সেবার জন্যে ঘুরে বেড়াবে (অবশ্য এ সব বধূর বাপের পয়সাতেই)—তা নয় কেলে হাঁড়ির মত মূর্ত্তি নিয়ে ছুটেছেন ঘর ঝাঁট দিতে, বাসন মাজ্‌তে, রাঁধ্‌তে, কাপড় কাচ্‌তে! ভগবান কি উপর ভিতর দুইই সমান করেছিলেন?

ফুলশয্যার রাত্রে, শাশুড়ীর বুকখানা ভগবান নেহাৎ পাথর দিয়ে গড়িয়াছিলেন বলিয়াই ভাঙ্গিয়া যায় নাই নৈলে দুধে ধোওয়া বিছানার ওপর ফুলের রাশির মাঝখানে তাঁর সোণার চাঁদের পাশে তুলিয়া দিল কিনা ঐ আল্‌কাৎরার হাঁড়ি! তারিণী বাবু না হয় জ্ঞাতিই ছিলেন, তাই বলিয়া এমন শত্রুতাই কি সাধিতে হয়? দিবারাত্রি গঞ্জনার চোটে রাধাবিনোদের বাড়ী আসা ভীতিজনক হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজের লাঞ্ছনা গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হইলেই, সর্ব্বস্নেহ-পরিত্যক্তা একখানি অসহায় বেদনা কাতর মুখ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত.—আহা নিরপরাধা বধূটি আমার!

চুনীর কিন্তু সুখ দুঃখ কিছুই ছিল না। স্ত্রীলোকের রূপ অরূপ সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। মা যদি একটা বৌ আনেন এবং সে আসিয়া যদি তাহার "জীবন মরণের দাসী" বলিয়া সেবা সুরু করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার ভাল বই মন্দ নয়; প্রেম অনুরাগ এসব সে উপন্যাসের নায়ক বা পাগলের প্রলাপ বলিয়াই গণ্য করিত; বাস্তব রাজ্যে সে বোঝে নিজের একটু সুখ সুবিধা। বধূর কল্যাণে তাহার সে সাধ যখন মিটিয়াছে, তখন সে সুন্দর হোক্ আর কালোই হোক্. তাহাতে কিছু আসে যায় না। প্রতি রাত্রে বধূর হাতের পাখার বাতাস, সেটার অপ্রয়োজনে পদসেবার দ্বারা পরম তৃপ্তিতে নিদ্রাদান করিয়া চুনীলাল ঘরের বাহির হইত। বুদ্ধিমান চুনী, সুন্দর হাতের হাওয়া ইহা অপেক্ষা মিষ্ট কি না সে

বিচারে ঠাণ্ডা মস্তিষ্ক অনর্থক উত্তেজিত করার কোনই প্রয়োজন দেখিত না। তার উপর, সমস্ত দিন যখন যেটির দরকার না চাহিতে হাতের কাছে প্রস্তুত। মায়ের মুখ নাড়া বা ভগিনীদের ঝাল ঝাড়ার উপদ্রব নাই, বরং পরম মুরুব্বিয়ানায় চুনীই দুই একটা তর্জ্জন গর্জ্জন ঝাড়িয়া পৌরুষ জানাইতে পারে—ইহার অধিক আর তার কিই বা প্রয়োজন ?

বৈশাখ মাসে সুশীর বিবাহ হইল; জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী বাটার তত্ত্বের ব্যাপার। সুশী শ্বশুরবাড়ী থাকাতে জামাতা না আনিয়া সুশীর পিতামাতা তত্ত্বের দ্বারাই অর্চ্চনার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু কুটুম্ব দেবতার কোন্দল ঋষি, বেয়াড়া ছন্দ, আদায় দেবতা, গালাগালি বিনিয়োগঃ; যাঁরা ষোড়শোপচারে পূজা জোগান তাঁদেরই এই দশা, আর যারা অপারগ তাদের অবস্থা তো বর্ণনাতীত।

গরিবের প্রাণান্ত আয়োজনে আহৃত দ্রব্যাদি যখন উঠানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন পটকার গাদায় আগুন দিলে যে কাণ্ড হয়, গিন্নি বাড়ীময় সেইরূপ ছুটিতে লাগিলেন। তারপর আক্রমণের বেগ সুশীর উপর গিয়া পড়িল। রাধাবিনোদ এতক্ষণ প্রাণভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন, এইবার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বড় বাড়িয়ে তুলছ গিন্নি! যাদের বল্‌ছ তাদেরই বলগে, বৌমাকে অমন করতে এলে কেন ?" হুহুঙ্কারে প্রজ্বলিত অগ্নির মুখ ফিরিল; রাধাবিনোদ, তাঁর জ্ঞাতি-শত্রু তারিণীবাবু, রাধাবিনোদের পিতৃ-কুলের সকলে একে একে সেই অগ্নিস্পর্শে পবিত্র হইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া কুটুম বাড়ীর লোকেরা জিনিষ ফেলিয়া পলাইল। আর কালো মেয়ে সুশীর ডাগর ডাগর কালো চোখের জলে তার বুকখানি নীরবে ভিজিতে লাগিল।

পূজার তত্ত্বের সময় আর একবার এই কাণ্ডের পুনরভিনয় হইল। সে সময় সুশী লুকাইয়া মাকে একখানি পত্র লিখিয়া লোকের হাতে দিল—"মা, আমায় যে ঘরে দিয়াছ, এখানে আমি পরম সুখে আছি। আমার কোনও জিনিষের অভাব নাই। আমার শাশুড়ীর লক্ষ্মীর সংসারে তোমার খুদ-কুঁড়া অতি তুচ্ছ জিনিষ, তাঁরা এ সামান্য জিনিষে অসন্তুষ্টই হন। আমার জন্য অকারণে এই ব্যয় ও অপমান বহন করার চেয়ে, তোমার দুঃখী সন্তানদের লালন-পালনে ব্যয় করিলে সার্থক হইবে মা! আমি তোমাদের কাছে কখন কিছু জোর করিয়া চাহি নাই—আজ একটি ভিক্ষা চাহিতেছি—আর কখনও এখানে কিছু পাঠাইও না;—আবার যদি এমন হয়, তুমি জানিও তখনি আমি বিষ খাইব।"—মাও অগত্যা এ ব্যাপারে সেই হইতে ক্ষান্ত দিয়াছিলেন।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কাঞ্চনতলা হইতে পাল্কী লইয়া লোক আসিল, বৌমাকে যাইতে হইবে। কালো বৌয়ের অনেক দোষ থাকিলেও ঐ যে উঞ্ছবৃত্তি কাযগুলা সে করে, সে গেলে ওগুলা কার দ্বারা হয়? দু বগ্‌না আগুনতাতে রান্না কি আর গিন্নির সয়, না গিন্নির দুধের মেয়েরা পারে? চুনীর বিবাহের পর হইতে রান্নাঘরের দায় হইতে সকলেই অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু গিন্নির বহু প্রকারের আপত্তি সত্ত্বেও রাধাবিনোদ এবার জেদ করিয়া বলিলেন, "তা হবে না। জান, এখনও তারিণী দা'র কাছে খত মাথা বিকিয়ে আছে! তার লোক অম্নি ফিরিয়ে দিলে কাল গাছতলায় দাঁড়াতে হবে।" অগত্যা সুশীর কাঞ্চনতলায় যাওয়ার অনুমতি পাস হইল।

৫

সেবার কার্ত্তিক মাসে পূজা ছিল; পূজার ক'দিন সুশীর কায-কর্ম্মের ব্যবস্থা দেখিয়া জ্যেঠাই মা (তারিণী বাবুর স্ত্রী) আহ্লাদে গদগদ। "কি লক্ষ্মী মেয়ে মা! চুনীর মার অনেক ভাগ্যি এমন বৌ ঘরে এনেছে। এত গুণের কাছে আবার রূপ কোথায় লাগে?" বিজয়ার পরে নিশ্চিন্ত হইয়া তারিণী বাবু মান্নির সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এখনও সেই জ্যেঠা মশায় সেই মান্নি সম্বোধন। বয়স যত শীঘ্র বাড়ে, মনের তত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয় না।

তারিণীবাবু বলিলেন, "তাহলে মান্নি আর ক'দিন তুই থাকবি বল দেখি?" হাতের পাকা চুলে টান দিয়া সুশী বলিল, "আমি তার কি জানি?" চুল তোলার

আরামে চোখ বুজিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "হুঁ— বটে বটে, তোর যে এখন শ্বশুরবাড়ী হয়েছে। আচ্ছা তোর জ্যেঠাইমা যা বল্‌বেন তাই হবে, তিনি তো তোর দুদিকেই আছেন।" জ্যেঠাইমা বলিলেন, "এ বছর আমার জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্‌যাপন হবে; তার পরে সুশীকে পাঠালেই ভাল হয়। ও থাক্‌লে আমার কোন কায ভাব্‌তে হবে না।" তারিণীবাবু বলিলেন "শুন্‌লি ?" সুশী জ্যেঠামশায়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "আমার শাশুড়ীকে তাহলে একবার খবর দেবেন।"

"আচ্ছা সে আমি রাধুকে দিয়ে বলে পাঠাব।"

কিন্তু সুশীর শাশুড়ীর মেজাজের পরিচয় সকলেরই কিছু না কিছু জানা ছিল। তিনি যে অত দিন বৌ রাখিতে রাজী হইবেন, কেহই তাহা আশা করিতে পারে নাই। কিন্তু এবার সুশীর শ্বশুর আসিলে সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, সুশীর শাশুড়ী বলিয়াছেন, তাঁদের যত দিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি, সঙ্গে প্রচুর জিনিষ-পত্র লোক জন দিয়া তারিণীবাবু সুশীকে পাঠাইয়া দিলেন।

পাল্কী হইতে নামিয়াই সুশী দেখিল, বাহির বাড়ীর রোয়াকের উপর তার পাঁচ বছরের ভাগিনেয়ী লীলা খেলা করিতেছে। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কবে এলি রে লীলা ?"

লীলা খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া মামীর হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি বুঝি তা জান না ? আমরা যে মামার বিয়ের সময় এসেছি।" সুশী হাসিয়া বলিল, "মামার বিয়ের এসে তো আবার চলে গিয়েছিলি। মামার বাড়ী এলেই বুঝি মামার বিয়ে হয় ?" লীলা পরম বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হয় না ? তুমি কিছু জান না মামী মা! ওই জন্য দিদিমা তোমায় ন্যাকা বউ বলে। চল তো মার কাছে, মামার বিয়েতে এসেছি কিনা শুনিয়ে দিচ্ছি।"

সুশী ততক্ষণে প্রাঙ্গণের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বলিল, "বেশ, তোরই জিত লীলা। তা, তোর মামা বিয়ে করে আবার একটা মামী এনেছে তো ?"

"এনেছে বই কি ? খুব সুন্দর মামী। ঐ যে নীচ কর্‌তেই বাইরে এসেছে।"

চকিতে চারি চক্ষের মিলন হইয়া গেল। সুশী দেখিল এক সুন্দরী তরুণী, তার কালো মুখের উপর রক্ত-কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে একটি তপ্তশ্বাস সুশীর বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ততক্ষণে সঙ্গের লোক-জন জিনিষ-পত্র আনিয়া দালানে নামাইল। লীলা চীৎকার জুড়িল—"ওগো দিদিমা, নেমে এস, বড় মামী এসেছে" উপর হইতে ঝঙ্কার আসিল, "এসেছে তা কি করব ? জ্যেঠার বাড়ী আর ভাত জুটল না বুঝি ?" লীলার মার স্বর শোনা গেল—"চুপ কর মা! জ্যেঠা মশায়ের বাড়ীর লোক জনেরা দাঁড়িয়ে আছে।"

"ওঃ তবে তো আমি ভয়েই মরে গেলাম আর কি! ভালই হল, নূতন বৌমাকে নিয়ে দেখিয়ে আয় কেমন বৌ নিয়ে এসেছি। বড় জ্ঞাতিত্ব সধেছিলেন, এখন দেখুন চুনীর মা এখনও মরে নি।"

সুশী মনে মনে প্রমাদ গণিল। তার সঙ্গে যে দাসী আসিয়াছিল তার হাত ধরিয়া বলিল, "আমার শাশুড়ীর কথা ধোর না ভাই, রাগ্‌লে ওঁর জ্ঞান থাকে না। জিনিষ পত্তর এখানেই থাক, তোমরা বাড়ী ফিরে যাও। দোহাই তোমার যেন জ্যেঠামশায়কে কিছু ব'ল না।" তাহারাও বুঝিল যেরূপ গতিক, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে হয় তো ঝাঁটাপেটা করিবে। তার চেয়ে মানে মানে সরিয়া পড়াই ভাল।

সুশী যাওয়ার পর হইতে একজন রাঁধুনী আসিয়াছিল. সুশী বাড়ীতে পা দিতেই তাহাকে বিদায় করা হইল। তারপর বৌ ঝি লইয়া পরামর্শ করিয়া গৃহিণী স্থির করিলেন, ঘরের লক্ষ্মী যখন ঘরে আনিয়াছেন, তখন ঘরকন্নার কাযে তো ও কাল্‌পেঁচার আর কোন অধিকার নাই, শুধু দুটি ভাত ফুটাইয়া বসিয়া কাটাইলে গতরে যে ঘুণ ধরিবে। ঝিকে অনর্থক আর মাহিনা খোরাক জোগাইয়া কি হইবে ? সে পয়সাটায় নূতন বৌমার গহনা

গড়াইলে সময় অসময় সংসারের কাযে লাগিবে। আর সংসারের দুখানা কাযও যদি না পাওয়া যায়, তবে ও রূপের খোচন লইয়া লোকে কি ধুইয়া জল খাইবে?

সুশীর কিন্তু কিছুতেই কোন আপত্তি বা মুখভার দেখা গেল না। সে শাশুড়ীর সকল ব্যবস্থাই মাথা পাতিয়া লইয়া, উদয় অস্ত সংসারের সমস্ত কায নিজে করিতে লাগিল। তার উপর কারণে অকারণে শাশুড়ীর অজস্র গালাগালি, ননদের গঞ্জনা ও সতীনের টিটকারী নীরবে সহিয়া যাইতে লাগিল। শ্বশুর তেমনিই কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। একমাত্র তাঁরই কেবল এই নিরপরাধা সর্ব্বসহা বালিকাকে দেখিয়া চোখ ফাটিয়া জল আসিত; কিন্তু এই নির্ম্মম পুরীতে একটু মুখের সহানুভূতি প্রকাশ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

সুশীর শ্বশুরবাড়ীর সংবাদ তারিণী বাবুর স্ত্রী সবই শুনিলেন। কিন্তু তিনি সহসা তারিণী বাবুকে জানাইতে সাহস করিলেন না, কেননা সুশীকে তারিণী বাবু কতখানি ভালবাসেন তিনি তা জানিতেন—এ সংবাদ শুনিলে হঠাৎ একটা অনর্থ বাধাইতে পারেন। এদিকে সুশীকে নাড়িয়া চাড়িয়া তাঁরও একটা মমত্ব জন্মিয়াছিল। সেই স্নেহশূন্য গৃহে সপত্নী সহবাসে নিরীহ সুশী কিরূপ কষ্টে দিন কাটাইতেছে, মনে হইলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। দু তিন মাস সুশীর কোন সংবাদ না পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না; একদিন স্বামীকে বলিলেন, "সুশী গিয়ে অবধি নিজে তো কোন চিঠি দিলে না। যে খাণ্ডা শাশুড়ী, মেয়েটা কেমন আছে কে জানে?"

তারিণী বাবু বলিলেন, "আমারও মনটা কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। রাধু তো আমার সঙ্গে আর দেখাই করে না। আমি জোর করে জিজ্ঞাসা করলে আমৃতা আমৃতা করে সেরে দিয়েই চলে যায়। একদিন না হয় নিজে গিয়েই দেখে আসি, কি বল?"

গৃহিণী একবার ভাবিলেন, বারণ করি, কি জানি কি করিতে কি কাণ্ড করিয়া আসিবেন। আবার ভাবিলেন, সুশীর উপর সত্যই যদি অধিক অত্যাচার হয়, ইনি নিজে না গেলে কোনই প্রতিকার হইবে না। সে যে মেয়ে, প্রাণ গেলেও কাহাকেও নিজের দুঃখ বলিবে না। যে সংসারে পড়িয়াছে, গলা টিপিয়া মারিতে পারিলেও কেহ ছাড়িবে না।

৬

বৈকালে তারিণী বাবু যখন সুশীর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলেন, চুনী তখন বেড়াইতে বাহির হইতেছে। সম্মুখে পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিয়া, প্রণাম করিয়াই পাশ কাটাইল। তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না আজ বাড়ীতে একটা কাণ্ড বাধিবে।

তারিণী বাবুকে বাহিরে বসাইয়া রাধাবিনোদ ভিতরে গিয়া স্ত্রীকে খবর দিলেন, "ওগো কাঞ্চনতলা থেকে দাদা এসেছেন, জলটল খাওয়ার জোগাড় কর।" গিন্নী জ্ঞাতি শত্রুর কালোমুখে চুণ মাখাইবার এ উত্তম সুযোগ ত্যাগ না করিয়া, ছোট মেয়ে সরলাকে বলিলেন, "আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি, তুই নূতন বৌমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে প্রণাম করিয়ে নিয়ে আয়।"

রাধাবিনোদ অন্দরে প্রবেশ করিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই তারিণী বাবু সুশীকে দেখিবার আশায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া ছিলেন। এমন সময় ঝুন ঝুন ঘুঙুর বাজাইয়া রাঙা বৌ আসিয়া প্রণাম করিল। তারিণী বাবু চাহিয়া বলিলেন, "এটি কে রে?" সরলা উত্তর করিল "দাদার নূতন বৌ।"

"দাদার? কোন্ দাদার রে?"

এই সময়ে উঠানে গুরুবস্তু পতনের শব্দে দুজনেই ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কুয়োতলায় সুশী জলের ঘড়া শুদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, সমস্ত কলসীর জলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, কাদার উপর পড়িয়া সুশী শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া এমন কাঁপিতেছে যে উঠিবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিতেছে না। ননদ সরলা চেঁচাইয়া উঠিল—"ওমা দিন দিন কি অকম্মা হচ্চে! কলসীটা যে একেবারে টোল খেয়ে গেছে। ভাত খায় না যেন, ওটুকু কলসী তুলবার জোরটুকুও হাতে পায়ে নেই।" তারিণী বাবু রক্ত চক্ষে চাহিতেই সরলা রণে ভঙ্গ দিয়া পাশ

কাটাইল। তখন তিনি সুশীকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি করে পড়লে মা ?"

"কি জানি জ্যেঠামশায়। হাত পা কেমন কেঁপে উঠল, বোধ হয় আপনি এসেছেন শুনে আহ্লাদে এমন হ'য়ে গেল।"

ঈষৎ হাসিয়া তারিণী বাবু বলিলেন "বেশ হয়েছে। এখন এ ভিজে কাপড়গুলো আগে ছেড়ে ফেলতে হবে। তুমি এখনও কাঁপছ মা; আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছি। ওরে সরলা, একখান শুক্নো কাপড় দে রে।"

কোথায় বা সরলা কোথায় বা কে! বাড়ীতে যে কোনও লোক আছে এমন কোন চিহ্নও নাই। তারিণী বাবু চিৎকার করিয়া বলিলেন—"ও রাধু, বলি সবাই কি বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে না কি ?" এইবার সরলা আসিয়া বলিল, "বাবা বাজারে গেছেন।"

"তোরা ত যাস্ নি! একখান কাপড় দে না। দেখ্‌ছিস্ নে সুশী শীতে কাঁপছে ?"

সরলা বলিল, "কাঁপচে তো নিয়ে পরুক না, আমার কি অন্য কায নেই⋯"

ক্রোধে তারিণী বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সুশী সভয়ে বলিল, 'আমার কিছু হয় নি জ্যেঠামশায়, আমি গিয়ে এখনি কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।"

নিশ্বাস ফেলিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, "তাই এস।"

ক্ষণকাল পরেই রাধাবিনোদ ফিরিয়া আসিলেন। তারিণী বাবু বলিলেন, "শোন রাধু।" কণ্ঠস্বর শুনিয়াই রাধাবিনোদ বুঝিলেন, ব্যাপার গুরুতর। কাছে বসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

"তোমার বাড়ী নূতন বউটি দেখলাম, কে ?"

রাধাবিনোদ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে আমি কিছু জানিনে, চুনীর মা—ই—"

ধমক দিয়া তারিণী বাবু বলিলেন—"যা বলি উত্তর দাও। ও তা হলে চুনীর স্ত্রী ?"

"আজ্ঞে!"

"বেশ। লোকে এক স্ত্রী পুষতেই ভাবনায় কুল পায় না, চুনীলাল পর পর দুই স্ত্রী ঘরে এনেছেন। তখন নিশ্চয়ই তোমার অবস্থাও এখন বেশ সচ্ছল। তবে ঐ বালিকাকে দিয়ে কুয়োর জল তোলাচ্ছিলে কেন ?"

পাশের বাড়ীর একটি দুষ্ট বালক দ্বারের নিকট হইতে বলিল—"শুধু বুঝি জল তোলান্? রান্না, বাসন মাজা, গোয়াল কাড়া, জল তোলা সবই তো বড় বৌকে দিয়ে করানো হয়। ওঁরা বুঝি এখন লোক রাখেন ?" বলিয়াই বালক ছুটিয়া পলাইল। রাধাবিনোদের পেয়ারা গাছে খুব ভাল পেয়ারা হয়, বেচারা যখনি একটি লইতে গিয়াছে তখনি ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে; আজ সে মনের ঝাল মিটাইয়া গেল।

তারিণী বাবু ডাকিলেন—"রাধু!"

রাধাবিনোদ নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারিণী বাবু তখন রোষকম্পিত কঠিন স্বরে বলিলেন—"জান, তুমি কার উপর এই অত্যাচার করছ? যে কাঞ্চনতলার এষ্টেট থেকে অন্ন এনে সবারি পেট ভরাচ্চ, সে কার দয়ার উপর নির্ভর করচে জান? ওই নির্য্যাতিতা বালিকার। জান, এক মুহূর্ত্তে আমি তোমার মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে, ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি! ওরে অকৃতজ্ঞ অধর্ম্মী, আজ যে তুই স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়াচ্ছিস্, কার দয়ায় বাপের ভিটেয় এখনও বাস কচ্চিস জানিস্? ওই অসহায়া নিপীড়িতার দয়ায়। এখনও যে ঋণের দায়ে তোর মাথার চুল আমার পায়ে বিকিয়ে আছে, আমি এক মুহূর্ত্তে তোর কোন্ দুর্গতি না করতে পারি? যার জন্যে তোর ভাত ভিটে, সেই লক্ষ্মীকে এমন হেনস্থা করতে তোর পরকালেরও ভয় হল না হতভাগা? শোন রাধাবিনোদ, স্ত্রীর দোহাই দিয়ে পার পাবে না! তুমি মনেও ভেব না, তারিণী রায় তোমায় অমনি রেহাই দেবে।"—ক্রোধে তারিণী বাবু থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

দুখানি শীতল কোমল করস্পর্শে চাহিয়া দেখিলেন, পায়ের উপর মুখ রাখিয়া সুশী কাঁদিতেছে। হাত ধরিয়া তুলিয়া সস্নেহে চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন, "কেঁদনা মা, তোমার

চোখের জল আর আমি পড়তে দেব না সুশী।” কাতর স্বরে সুশী বলিল, “বাবার উপর রাগ করবেন না জ্যেঠা-মশায়, বাবার তো কোন দোষ নেই।” সুশী এই প্রথম শ্বশুরের সম্মুখে কথা কহিল। ক্রোধরক্ত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া তারিণী বাবু বলিলেন, “দোষ নেই?” পরক্ষণেই গভীর কাতর স্বরে বলিলেন, “ঠিক বলেছ মা, আমিই দোষী, ওর দোষ কি? সুশী রে, তোর বাপ যখন তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধের হাতে তোকে দিতে গিয়েছিল, আমিই তো তখন তাকে নিবৃত্ত করেছিলাম। কিন্তু কি হত? সেই বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহে, কি এত অনিষ্ট হত? না হয় কিছুদিন পরেই তুই বিধবা হ'তিস। কিন্তু যতদিন সে বেঁচে থাকতো, তার বিপুল স্নেহে তোকে আদরিণী করে রাখত। তা থেকে ছিনিয়ে এনে আমি তোকে এ কি জলন্ত কুণ্ডে নিক্ষেপ করলাম? সুশী রে, আমার স্নেহের প্রতিমা, আমি নিজে হাতে তোকে আগুনে তুলে দিলাম!” বলিয়া দুই হাতে সুশীকে বেষ্টন করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জ্যেঠামশায়ের বুকে মুখ রাখিয়া সুশী বলিল, “স্থির হোন জ্যেঠামশায়, স্থির হোন।”

“স্থির ছেড়ে পাষাণ হয়েছি মা!” পরে রাধা-বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কি লক্ষ্মী তোমায় দিয়েছিলাম, চিনলে না! কিন্তু একদিন চিনবে। শুধু তুমি নয়, এই অধর্ম্মী সংসারের সকলকেই এক-দিন বুঝতে হবে, যেদিন তোমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হবে। আয় মা সুশী, আর তোকে এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে দেব না।”—বলিয়া সুশীর হাত ধরিয়া বাহিরের দিকে আকর্ষণ করিলেন।

শান্ত স্বরে সুশী বলিল, “ছি জ্যেঠা মশায়!”

তারিণীবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, “এখনও এখানে থাকতে চাস না কি?”

নত মুখে ধীরে ধীরে সুশী বলিল, “এ ঘর ছাড়া আর আমার স্থান কোথা, জ্যেঠা মশায়!” সহসা সেই শান্ত মৃদুস্বর দৃপ্ত হইয়া উঠিল, তারিণীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, “এখনও একবছরও হয়নি, এই তো সেদিন, আপনারাই চিরদিনের মত এই ঘরে আমায় বিদায় করে দিয়েছেন। এর মধ্যে তা ভুলে গেলেন জ্যেঠা মশায়? যেদিন ঈশ্বর সাক্ষী করে আমাকে শপথ করিয়েছেন, সুখে হোক্ দুঃখে হোক্ ঐশ্বর্য্যে হোক দৈন্যে হোক্, আদরে হোক্ অনাদরে হোক্ এই ঘরেই আমি আজীবন ধ্রুবনক্ষত্রের মত অবিচলিত হয়ে থাকব, সে কি আপনার মনে নেই?”

তারিণীবাবুও তেমনি দৃপ্তস্বরে বলিলেন, “হতভাগিনী, প্রতিজ্ঞা কি তুই-ই একা করেছিলি? কর্ত্তব্য কি অপর পক্ষেও নেই?”

“কেন থাকবে না জ্যেঠা মশায়! সে কর্ত্তব্য পালন করতেও তো কেউ বিমুখ হন নি। আমায় অন্ন দিচ্চেন, বস্ত্র দিচ্চেন, আশ্রয় দিচ্চেন।”

অট্টহাস্য করিয়া তারিণীবাবু বলিলেন, “স্বামী বিবাহ করছেন, শাশুড়ী দাসীর অধম করছেন, শ্বশুর পথের কুকুরের মত লাঞ্ছনা করছেন, ননদ পায়ের তলায় থেৎলাচ্ছেন—”

বাধা দিয়া সুশী বলিল, “সে দোষ কি এঁদের?”

বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া, তারিণী বাবু বলিলেন, “তবে কার?”

“ভগবানের।”

তারিণী বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “উত্তম যুক্তি।”

সুশী বলিল, “নয়? স্থির হয়ে ভেবে দেখুন জ্যেঠা মশায়, আমি যদি এঁদের অনাদর পেয়ে থাকি, তার কারণ কি? আমি কালো বলেই না? সে কালো আমায় কে করেছে জ্যেঠামশায়?”

তারিণীবাবু খানিক সেই কালো মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, আপন মনে বলিলেন, “অদ্ভুত মেয়ে বটে!” পরে বলিলেন, “আচ্ছা সুশী, সত্যি করে বল্ তোর মনে কষ্ট নেই?”

আশৈশবের স্নেহনিকেতন জ্যেঠামশায়ের বিশাল বক্ষে মুখ লুকাইয়া সুশী বলিল, “আছে বৈকি।”

“তবে?”

“কিন্তু জ্যেঠামশায়, জানেন তো, আমি যে কালো

মেয়ে। ভগবানের সব কালো জিনিষই শীতল গুণ-বিশিষ্ট। আমার কালো মনের সেই গুণে আমি সব দুঃখই সইতে পারি। আর, একবার সইতে অভ্যাস হ'লেই, তার তীব্রতা দূর হ'য়ে যায়।"

"হ্যাঁ, বাপ মায়ে তোর সার্থক নাম রেখেছিল বটে সুশীতলা। একটু আগে রাধুকে বলেছিলাম, তোমরা এ রত্ন চিনতে পারলে না। এখন বলছি,আমিও তোকে চিনতে পারি নি। যদি জগদীশ্বর সত্য হন, সতীত্বের গৌরব যদি থাকে, তোর এই মহা তপস্যা একদিন সার্থক হবে। তোর এ সাধনায় আর আমি বিঘ্ন হব না, বিদায় মা!"

রাধাবিনোদ একবার আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "শুধু মুখে চলে যাওয়াটা—"

তারিণীবাবু আরক্ত চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, "চুপ!" পরে সুশীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভুলে থেকো না মা, মধ্যে মধ্যে খবর দিও।"

সুশী গলায় কাপড় দিয়া জ্যেঠামশায়ের চরণে প্রণাম করিল। মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিয়া তারিণীবাবু গৃহত্যাগ করিলেন।

সুশীর কালো চোখের আঁখি-তারা ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই পথ অনুসরণ করিয়া চাহিয়া রহিল।

শ্রীননীবালা দেবী।

সাহিত্যিকের আয়

আমাদের দেশে সাহিত্যিকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্র। আজকাল বহু গ্রন্থকার আমাদের মধ্যে গজাইতেছেন এবং সাহিত্য অনেকেরই উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু আজিও সাহিত্যসেবা এ বাজারে একপ্রকার উঞ্ছবৃত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই চারিজন প্রসিদ্ধ লেখকের কথা ছাড়িয়া দিলে, এই বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে এমন খুব অল্পসংখ্যক লেখক আছেন যাঁহারা অন্নচিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

এ দেশে স্কুলপাঠ্যপুস্তক লেখকদের কিছুটা আয় আছে বটে, কিন্তু 'টেক্সট্ বুক্ কমিটী'র কৃপাকটাক্ষপ্রাপ্ত গ্রন্থকার ভিন্ন এ আয়ের অধিকারী হওয়াও বড় সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকাবলীর আয় মাসিক অনুমান তিন হইতে পাঁচহাজার টাকা পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া শুনা যায়। ৺অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থাবলীর আয় ঠিক ততদূর না হইলেও, বড় মন্দ ছিল না। এতদ্ভিন্ন স্কুলপাঠ্যপুস্তকে আর কেহ বড় বেশী লাভবান হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না।

সেকালে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন মহাকবি কালিদাস, কবিতাচতুষ্টয় দ্বারা কর্ণাটরাজ সমীপে দিক্‌চতুষ্টয় অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। সে কালে রাজা, জমীদার এবং ধনবান ব্যক্তিরা সাহিত্যিকের প্রতিপালন করাটা গৌরবজনক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যসেবী, শাস্ত্রাধ্যাপক এবং গুণীমাত্রেই রাজা-রাজড়াদের সভায় সদস্যরূপে অতি সমাদরে ও সম্মানের সহিত ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ শক্তির অনুশীলন এবং পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিতেন। সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্য তাঁহাদিগকে কোনপ্রকার উঞ্ছবৃত্তি করিতে হইত না। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজসভায় তখনকার দিনে মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা বৃত্তি পাইতেন। কবিরঞ্জন

সাধক রামপ্রসাদ তাঁর কবিত্বের প্রথম পুরস্কার স্বরূপ মাসিক ৩০৲ ত্রিশটাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বগ্রামে নির্ব্বাসিত দরিদ্র কবিকঙ্কণের প্রথম উপার্জ্জন —"দশ আড়া ধান।"

পরবর্ত্তিকালে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কথঞ্চিৎ আয় দেখিতে পাই। মাইকেল্ কবি মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থাবলীর স্বত্বাধিকার অতি সামান্য মূল্যে নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল। কবি হেমচন্দ্র অন্ধাবস্থায় দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে শেষজীবন কি ভাবে কাটাইয়াছেন তাহার সংবাদ অল্পবিস্তর সকলেই অবগত আছেন। কবি বড় জ্বালায় প্রাণের দুঃখেই ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে!" ভাওয়াল পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব কবি গোবিন্দদাস, দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া সেদিনও কি ভাবে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আজিও আমাদের শ্রবণ পটহ বিদীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু সাহিত্যিকের এমন দুর্দ্দশা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিলাতে গ্রন্থ প্রকাশক ধনী মহাজনগণ গ্রন্থকার প্রতিপালন ও প্রস্তুত করেন। সেখানকার এক একজন গ্রন্থকারের আয়ের কথা শুনিলে চম্‌কাইয়া যাইতে হয়। স্যর ওয়াল্‌টর স্কট্, নেপোলিয়নের জীবনী লিখিয়া ১৮,০০০ আঠার হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। তাঁর "উড্‌ষ্টক" নামক উপন্যাস লিখিতে মাত্র তিন মাস সময় লাগিয়াছিল—তিনি এই উপন্যাসখানিতে ৮,২৩৮ পাউণ্ড অর্থাৎ লক্ষাধিক টাকা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া স্কট্ তাঁর আরও এগারখানি উপন্যাসগ্রন্থের মূল্যস্বরূপ ১১০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ষোল লক্ষ টাকারও অধিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজী ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ২৬ খৃষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত—ঐ ১৯ মাসের মধ্যে স্কটর ২৬,০০০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চারিলক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। লর্ড মেকলে তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ডের জন্য লঙ্‌ম্যান কোম্পানীর নিকট হইতে বিশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিনলক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার ভিক্টর হিউগো তাঁর Les Miserab'e নামক বৃহৎ উপন্যাসের জন্য ষোল হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বাক্সবন্দী করিয়াছিলেন। জর্জ্জ এলিয়ট্ তাঁর 'রমোলা' নামক উপন্যাসটীর পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়া প্রকাশকের নিকট হইতে দশহাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দেড়লক্ষ টাকা রোজগার করেন। শোনা যায় প্রকাশকেরও এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। ডিকেন্স তাঁর The Chimes নামক একখানি অতি ছোট আকারের পুস্তকের মূল্য পাইয়াছিলেন পাঁচ হাজার পাউণ্ড—তার মানে অর্দ্ধলক্ষেরও উপরে। ডিকেন্সের নভেল গুলির আয় ছিল বার্ষিক লক্ষ টাকারও অধিক। বুলুয়ার লিটন তাঁর উপন্যাস গ্রন্থাবলী হইতে আশী হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ বারলক্ষ টাকারও অধিক সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ট্রলপ্ সংস্থাপন করিয়াছিলেন সাত লক্ষেরও বেশী। উইল্কি কলিন্স—ডিকেন্সের শিষ্য—তিনি তাঁর No Name নামক উপন্যাস হইতে তিন হাজার পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। তাঁর Armadale উপন্যাসের আয় হইয়াছিল পঞ্চাশ হাজার টাকারও অধিক।

আজকাল বিলাতে সাহিত্যসেবিগণ দুই রকমে অর্থ উপার্জ্জন করেন। প্রথমতঃ গ্রন্থ খানি সাময়িক পত্রে ক্রমশ প্রকাশ করিতে দিয়া একবার অর্থ সংগ্রহ করেন, তারপর পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র মূল্য প্রাপ্ত হন। শুনা যায় উপন্যাস ও ইতিহাস গ্রন্থে প্রকাশকদিগের ব্যয় অধিক পড়ে। লর্ড বেকন্স্‌ফিল্ড্ তাঁর Endymion নামক উপন্যাসের দরুণ দশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। গিবনও তাঁর ইতিহাসের জন্য প্রায় অত টাকাই পাইয়াছিলেন।

কবিদের নাম-ডাক হইয়া উঠিলে, কবিতাও বড়

কম দরে বিকায় না। বায়রণ অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রকাশক মারের নিকট হইতে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আদায় করেন। মুর, বায়রণের জীবনী লিখিয়া চল্লিশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। মুরের "লালারুখ" নামক কাব্যও অত টাকা আদায় করিয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব রাজকবি টেনিসনের কবিতার মূল্য বড় চড়া। সাময়িক পত্রে তাঁর যে সব কবিতা প্রকাশ হইত, তার প্রতিছত্রের দাম হইত এক গিনি করিয়া। ষ্টান্‌লীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের দর কোন কোন প্রকাশক চল্লিশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ছয় লক্ষ টাকারও অধিক দিতে চাহিয়াছিলেন।

কথিত আছে পুরাকালে "হিরোডটাস্" তৎ-প্রণীত ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করাতে এথিনিয়ানগণ সাধারণ রাজকোষ হইতে তাঁকে দশ ট্যালেন্ট অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছিল। সম্রাট্ অগষ্টস্, ভার্জ্জিলকে, তাঁর "ইনিয়দ" নামক কাব্যের কিয়দংশের প্রত্যেক কবিতার জন্য আটশত টাকা করিয়া পুরস্কার দিয়াছিলেন।*

শ্রীঅবনীকুমার দে।

---

* The Calcutta Corporation Out-door Employees' Association সভায় পঠিত।

অনন্ত মিলন

তোমার সনে নয়ক আমার নূতন পরিচয়,
অনন্তকাল বাসছি ভালো এমনি মনে হয়।
মোদের মিলন দেখেই বুঝি
কপিলঋষি পেলেন খুঁজি
সূত্র তাঁহার—প্রকৃতি আর পুরুষ সমন্বয়।

মোরা প্রথম ছিলাম যখন কেবলি সঙ্গীত,
মোদের পরিণয়ে ছিলেন ব্রহ্মা পুরোহিত।
তার পরে সে দেশবিদেশে
নূতন রূপে নূতন বেশে
জন্ম জন্ম হচ্ছে মোদের মিলন অভিনয়।

বৃক্ষ ছিলাম, হয়নি যখন পরিণয়ের প্রথা,
হয়ত তুমি মহীরুহ,—হয়ত আমি লতা।
হয়ত চখা হয়ত চখী,
নয়ত সখা নয়ত সখী,
পত্নী পতি নামের চলন হয়নি যে সময়।

মানুষ মোদের ঘুচায়নিক ক্ষণিক ব্যবধান
মিলায়েছে সেই সনাতন চিরযুগের টান।
সেই সৃজনের আদি হতেই
হয়নি ছাড়া কোন' মতেই,—
'তুমি' বলেই ভালবাসি—স্বামী বলেই নয়।

শ্রীকালিদাস রায়।

মূক-বধিরের বিষয়ে কয়েকটি কথা

পরম পিতা জগদীশ্বর কতকগুলি মনুষ্যকে জন্মাবধি মূক-বধির করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা শুনিতে পায় না, বা কথা কহিতেও পারে না। তাহারা শুনিতে পায় না বলিয়াই কথা কহিতে পারে না; তাহারা কথা বলিবার চেষ্টা করে কিন্তু কহিতে না পারায় বড়ই দুঃখ অনুভব করে। তাহাদের লেখাপড়া শিখিবার ক্ষমতা নাই। রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার শব্দ তাহারা শুনিতে পায় না; কাযেই তাহারা বাটী হইতে বাহির যাইতে সাহস করে না।

পূর্ব্বে কলিকাতায় মূক-বধিরগণের শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। ১৮৯৩ সালে মে মাসে সিটী কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহায়তায় ৺শ্রীনাথ সিংহ সিটী কলেজের একটী প্রকোষ্ঠে দুইটি মূক বধির ছাত্র লইয়া তাহাদের শিক্ষার্থ একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্বর্গীয় যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার মহাশয়গণ অবিলম্বে তাঁহার সহিত যোগদান করেন। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের চেষ্টায় ক্রমে ৪নং কলেজ স্কোয়ারে মূক-বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া, ১৮৯৩ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর মূক বধির দিগের শিক্ষার পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য ইউরোপে গমন করেন। যামিনী বাবুর অধ্যবসায় ও আগ্রহের গুণে আজ এই বিদ্যালয় ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

আন্দাজ ২।৩ বৎসর যাবৎ যামিনী বাবু ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে মূক-বধির শিক্ষা সম্বন্ধে কৃতবিদ্য হইয়া কলিকাতায় আগমন করিয়া ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্যর রবার্ট কার্লাইল সাহেব তখন কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায়, ১৯০২ সালে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় ২৯৩নং আপার সার্কুলার রোডে বহুব্যয়ে নূতন একটী মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কলেজ স্কোয়ারের পুরাতন মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ লইয়া আপার সার্কুলার রোডের নূতন বিদ্যালয়টি খোলা হয়।

মূক-বধির ছাত্রগণ স্কুল-সংলগ্ন বোর্ডিংএ বাস করে, কিন্তু ছাত্রীদের জন্য কোনও বোর্ডিং নাই। তাহারা নিজ নিজ বাড়ী হইতে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আইসে।

ভারতবর্ষে মূক বধিরের সংখ্যা ২,০০০০০ লক্ষ। তন্মধ্যে শুধু বাঙ্গলায় প্রায় ৩৩০০০ দৃষ্ট হয়। ইহারা ঐ বিদ্যালয় ভর্ত্তি হইলে, সময়ে উত্তম রূপে কথা বলিতে ও বুঝিতে পারিবে। প্রতিবৎসর ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলীর রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় এবং তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহুলোক তাহাদের মূখ-বধির সন্তানগণকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। দরিদ্র মূক-বধির বালক বালিকাদের জন্য কোন কোনও জেলার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

প্রথম প্রথম কিছু দিবস নূতন মূক-বধির ছাত্র আত্মীয়গণ পরিত্যক্ত হইয়া বোর্ডিংএ থাকিতে অতিশয় কষ্টবোধ করে ও ক্রন্দন করে। তখন পুরাতন ছাত্র ও ছাত্রীরা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া থাকে। এই প্রকারে অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা মিলিয়া মিশিয়া, পড়াশুনার সময় লেখাপড়া করিয়া, ও খেলা করিবার সময় আনন্দে খেলা করিয়া থাকে এবং আর কোন প্রকার অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে না।

বহু বৎসর যাবৎ শ্রীযুক্ত অটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূক বধির শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন। তিনি তথায় মূক-বধির শিক্ষা প্রণালী আয়ত্ত করিয়া আসিয়া কলি-

কাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক প্রথমে অ, আ, ই প্রভৃতি শিক্ষা দিতে থাকেন। কিছু দিবস পরে মূক-গণ সামান্য সামান্য উচ্চারণ করিতে পারে। প্রায় ৫ বৎসর পরে তাহারা সহজপাঠ্য পুস্তক পড়িতে পারে। এই সময়ে শিক্ষকগণ অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে শিক্ষা দেন। সহজ পুস্তক পাঠ সমাপ্ত হইলে অপেক্ষাকৃত কঠিন পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হয়। প্রথমে তাহাদের বুদ্ধি বিশেষ প্রখর থাকে না, কিন্তু বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং ভাল রকমে কথা বলিতে শিখে; কিন্তু কাণে শুনিতে পায় না।

মূক-বধিরদিগকে উপার্জ্জনক্ষম ও যাহাতে তাহারা সহজে ও বিনা ক্লেশে ভ্রমণ করিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

আলোক থাকিলে তাহারা রাত্রি কালেও লোকের কথা বুঝিতে পারে। কিন্তু অন্ধকারে তাহারা বক্তার মুখ নাড়ান দেখিতে পায় না বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না। অঙ্গুলি দ্বারা তাহাদের হস্তে কথা লিখিয়া দিলে তাহারা স্পর্শে বুঝিতে পারে।

শিক্ষালাভের পূর্ব্বে তাহারা কথা বলিতে পারিত না। সুতরাং এখন তাহাদের পিতা মাতা আত্মীয় প্রভৃতি তাহাদের কথা কহিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি শুন্‌তে পাও কি? আমি কথা বল্লে সব বুঝতে পার তো? কিরূপে বুঝ?" সে বলে, "আমি যদিও কাণে শুন্‌তে পাইনা, কিন্তু আপনার মুখ নাড়ান দেখে আমি সব বুঝতে পারি।" ইহা শিক্ষার ফল।

উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে 'মডেলিং', 'ড্রইং' প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দেন। ৫ বৎসর পরে বধিরগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠে, আর দুই বৎসর পরে তাহারা নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিলে বৃত্তি পায়। আরও দুই বৎসর পরে তাহারা উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দেয় এবং ইহাতে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিলে দ্বিগুণ বৃত্তি পায়। বধিরগণ সাধারণ ছাত্রদের মত উচ্চবিদ্যা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না, কারণ তাহাদের বিদ্যালয়ে ঐ প্রকার উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত নাই।

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর পারিতোষিক বিতরণের সময় লাট সাহেব ও বড় বড় রাজাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। এই উপলক্ষে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নীরব অভিনয় (tableaux) করে। লাট সাহেব ছাত্র ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই সময় বহু ধনী ঐ বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্যের নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি ক্রীড়া করিয়া থাকে, ছাত্রীগণ ব্যায়াম ও টেনিস খেলিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অন্যান্য স্কুল কলেজের ছাত্রদের সহিত ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ খেলা করে। ক্রীড়ার সময়ে বধিরদের সুবিধার জন্য রেফারী লাল নিশান নাড়াইয়া সঙ্কেতে ফাউল ইত্যাদি গোচর করেন। আজকাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এইরূপে অনেক স্কুল কলেজকে হারাইয়া শিল্ড, কাপ ইত্যাদি জিতিয়া লইতেছে। ইহারা অনেক ইউরোপীয় "টীমের" সহিতও খেলা করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকাল ও পূজার ছুটীতে মূক-বধির বিদ্যালয় অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় বন্ধ থাকে। ছুটীর পূর্ব্বেই ছাত্রদের অভিভাবকের নিকট জানান হয় যে, অমুক তারিখে বিদ্যালয় বন্ধ হইবে। যে ছেলের বাড়ী নিকট তাহারা নিজেরাই বাড়ী চলিয়া যায়। যাহাদের বাড়ী কলিকাতা হইতে অনেক দূর, তাহারা একলা যাইতে পারে না। হয়ত তাহাদের আত্মীয়স্বজন আসিয়া লইয়া যান, নচেৎ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা বাড়ী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এইরূপে অধ্যয়ন শেষ হইলে, তাহারা স্বাধীন ভাবে

জীবনযাপন করিবার জন্ত কর্ম্ম অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান বা তাঁহার সহকারী অধ্যক্ষ, ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া নান। আফিসে ও কারখানায় লইয়া গিয়া কর্ম্ম স্থির করিয়া দেন। এইরূপে তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হয়। কেহ কেহ দোকান খুলিয়া নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করে।

মূক-বধির ছাত্রীগণ ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া, বিবাহ করিতে পারে। যদিও তাহারা উপার্জ্জন-ক্ষম ও সুস্থ সবলকায় হয়, তথাপি তাহাদের সহজে কেহ বিবাহ করিতে রাজী হয় না। তাহারা বিবাহের মন্ত্রাদি সম্যক রূপে উচ্চারণ করিতে পারে না, আরও নানাবিধ অসুবিধা ভোগ আছে এই কারণেই লোকে পশ্চাৎপদ হয়।

প্রায়ই দেখা যায় যে বাটীর মূক বধিরের আত্মীয়-গণ তাহার সহিত বিশেষ কথাবার্ত্তা কহে না তজ্জন্য সে নীরবে একা বসিয়া থাকে। ইহার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই তাহার গলা বন্ধ হইয়া যায় ও তাহাদের কথা কহিবার শক্তি লোপ পায়। এই জন্য যাহাতে সে একলা বসিয়া থাকিয়া কষ্ট না পায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহাদের মনে কোন প্রকার কষ্ট দিতে নাই।

জন্ম হইতেই কেহ কেহ মূক-বধির হইয়া সৃষ্ট হয়। এবং এইরূপও অনেক দেখা যায় যে, অতি বাল্যা-বস্থায় খুব সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইয়া অনেকে মূক-বধির হইয়া যায়। সাধারণতঃ প্রথমোক্ত মূক-বধিরগণ অপেক্ষা, শেষোক্ত মূক-বধিরগণ শিক্ষালাভ করিয়া উত্তমরূপে কথা কহিতে পারে। ইহা ব্যতীত অনেক বিষয়ে এই উভয় শ্রেণীর মূক-বধিরগণের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মূক-বধিরগণ উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ২০০৲। ৩০০৲ টাকা কোনও অফিসে জমা দিয়া তথায় ২০। ২৫৲ টাকা মাহিয়ানায় চাকুরী করিতেছে। অথচ ঐ মূলধন লইয়া একটী দোকান খুলিলে স্বাধীনভাবে তাহারা তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে এবং পরে ইহার লভ্য অংশ পুনরায় ঐ দোকানে খাটাইয়া, চাকুরী অপেক্ষা বহুগুণ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে নির্ব্বিঘ্নে দিনযাপন করিতে পারে।

মূক বধির যুবককে কেহ বিবাহ করিতে চায় না, কারণ কন্যা তাহার স্বামীর সহিত কথা বলিতে বা পত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত আরও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেক সময় মূক-বধিরের আত্মীয়েরা বলেন যে, মূক বধির পুরুষ মূক-বধির কন্যার সঙ্গে বিবাহ করুক না কেন। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি মূক-বধির পুরুষের মূক-বধির কন্যার সহিত বিবাহ হইলে নানা প্রকার অসুবিধা হইবে, কারণ উভয়েই মূক-বধির হইলে সন্তান পালন অসম্ভব। এমন কি চোর যদি ঘরে সিদ দিয়া সব চুরি করিয়া পালায় তাহা হইলে উভয়ের কেহ শুনিতে পাইবে না

ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বধিরগণ ভারতবর্ষের মূক-বধিরদের চেয়ে সাধারণতঃ বিদ্যার্জ্জন করিবার অধিক সুযোগ পায়। তথাকার অধিকাংশ লোক ধনী ও স্বদেশহিতৈষী; তাহারা মূক-বধির-দিগকে অত্যন্ত যত্ন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সকলেই নিজের নিজের সুখ লইয়া ব্যস্ত, পরের জন্ত ভাবিবার সময় নাই। মুখে "আহা" করিতে খুব পটু, কাযের বেলায় শূন্য।

১৯২১ সালের ২১শে ডিসেম্বর স্বর্গীয় যামিনী-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গলাভ করেন। শ্রীযুক্ত অটলচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অধ্যক্ষ স্বর্গীয় যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবিত কালে তাঁহার সহকারী ছিলেন। কোনও কারণে তিনি বিদ্যালয়ে পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বিদায় উপলক্ষে ছাত্রগণ ব্যথিত হইয়া দুঃখ প্রকাশের নিমিত্ত একটী সভা করে। সেই সময়ে মূক-বধির শিক্ষা সমিতি নামে এক সভা সংস্থাপিত হয়। যামিনীনাথ পরলোক গমন করিলে স্কুলের ছাত্রগণ শোকে অতিশয় অভিভূত হয়। ৺যামিনী

বাবুর হঠাৎ মৃত্যুতে প্রায় দুই বছর স্কুলের কায সুচারু রূপে নির্ব্বাহ না হওয়ায়, বিদ্যালয়ের সভ্যগণ অটলবাবুকে পুনরায় প্রিন্সিপ্যাল পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আমরা বিদ্যালয়ের সভ্যগণকে ধন্যবাদ দিই। বর্ত্তমানে অটল বাবুর পুনরাগমনে ছাত্রদের বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে। স্বর্গীয় যামিনীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বি এ পাশ করিয়া, বিদ্যালয়ের ব্যয়ে মূক-বধির শিক্ষা প্রণালী আয়ত্ত করিবার জন্য আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।

ভারতবর্ষে ছয়টী মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। ঐ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রের সংখ্যা ৭।৮ শত। লেখাপড়া জানা মূক-বধিরের সংখ্যা প্রায় ২০।৩০ হাজার মাত্র—বাকী সকলেই কষ্ট পাইতেছে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। দেশে এত বড় বড় রাজা মহারাজ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা কেহই এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কাযেই অনেক মূক-বধির তাহাদের নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও লেখাপড়া শিখিতে পায় না।

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন মজুমদার মহাশয় শিল্প বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। শ্রীমৌলিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বোর্ডিং বিভাগের সুপারভাইজার। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসটি সুবিস্তৃত এবং স্বাস্থ্যকর। মৌলিবাবু পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ের মূক-বধির ছাত্র ছিলেন।

শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়।
(মূক-বধির বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র)

ছোটমা

(গল্প)

শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী, তাঁহার পীড়িতা পুত্রবধূ নীরদাকে বায়ুপরিবর্ত্তন করাইবার জন্য, কয়েক মাস হইতে দেওঘরে আসিয়া বাস করিতেছেন।

পাহাড়ের কোলে ছোট্টো ধবধবে বাড়ীখানা বসন্ত প্রভাতের রঙীন আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাগানে কতকগুলি মরসুমী ফুল ও কতকগুলি গোলাপ সুনীল আকাশের তলে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। একটু দূরে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী শস্যশ্যামল ঢেউ-খেলান মাঠের ভিতর দিয়া সাগরসঙ্গমে যাত্রা করিয়াছে,—আরও দূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় নিবিড় বনানী, সোণালী কিরণ রঞ্জিত হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়াইয়া আছে।

ফুটফুটে মেয়েটী—একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল তাহার মাথার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গায়ের কাল রঙের জামার বাহিরে তাহার শরীরের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহা কষ্টি পাথরে সোণার রেখার মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব দিক্‌কার খোলা বারান্দায় রৌদ্র-সেবন-নিরতা পিতামহী তারাসুন্দরীর উন্মুক্ত কেশরাশি দুলাইয়া, আঁচল টানিয়া শিশু কন্যাটী নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল। তারাসুন্দরী পৌত্রীর বামহস্ত ধরিয়া ফেলিয়া স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দূর্ পাগলী! পড়ে যাবি—একটু থির হ'য়ে বোস।"

দুগ্ধশুভ্র দন্তপংক্তি বাহির করিয়া মেয়েটীও হাসিতে হাসিতে বলিল, "একটু থিল হ'য়ে বোস।"

তারাসুন্দরী পৌত্রীর চিবুকের নিম্নে হাত দিয়া

গোলাপ কলিকার মত মুখ খানিকে একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "দিদি আমার পাগলী!"

এমন সময় তারাসুন্দরীর পুত্র শচীন একগোছা ফুল হাতে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

"বাবা, ফুল—আমাল ফুল—" বলিতে বলিতে মেয়েটী ছুটিয়া গিয়া পিতার বাম হস্ত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া বলিল, "আমাল ফুল—"

তারাসুন্দরী পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁরে শচীন; আজ এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোথায় ছিলিরে?"

শচীন গুচ্ছ হইতে দুইটী ফুল বাহির করিয়া কন্তার হাতে দিয়া বলিল, "সুধীরদের বাসায় আজ একটু দেরী হয়ে গেল মা! ওরা এই সন্ধ্যার ট্রেণেই চ'লে যাচ্ছে কিনা—তাই একটু বেশী করে দেখাশুনো করে এলাম।"

তারাসুন্দরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্যগ্রভরে বলিলেন, "ওরা চলে যাবে? আজই চলে যাবে? এই সেদিন যে সুধীর বলছিল, ওরা এখন কিছুদিন থাকবে।"

শচীন মাতার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ওদের ইচ্ছা ছিল আরও কিছুদিন এখানে থাকে; কিন্তু বাড়ীতে সুধীরের দাদার অত্যন্ত অসুখ—এই একটু আগেই তার পেয়েছে।"

"তবে যা, এক্ষুণি গিয়ে ওদের বাড়ীর সকলকে আজ দুপুরে এখানে খাওয়ার নেমন্তন্ন ক'রে আয় শচীন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "সুধীর ছেলেটী কিন্তু বেশ—যেমন কথায় বার্ত্তায় তেমনি ব্যবহারে। আর তার মা—তার ত জুড়িই মেলে না! যা শচীন, যা, আর দেরী করিস্‌নে।"

"যাই" বলিয়া শচীন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল এবং ফুলের গুচ্ছটী যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তাহার স্ত্রী নীরদা তখন উন্মুক্ত জানালায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে একখানি মাসিক পত্রিকার ছবি দেখিতেছিল—আধ ঘোমটার দুই পাশ দিয়া খোলা চুলের রাশি তাহার রোগশীর্ণ বাহুদ্বয়ের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শচীন ছাতাটা হাতে করিয়া বাহির হইতেই নীরদা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "এখানেও কি তোমার দুপুর বেলা পর্য্যন্ত কায মেটে না? এত বেলায় আবার কোথায় যাচ্ছ?" শচীন স্ত্রীর কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সুধীরদের নেমন্তন্ন করতে।"

নীরদা স্বামীর দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া বলিল, "এত বেলায় সে খেয়াল উঠ্‌ল যে?"

শচীন বলিল, "সুধীরের দাদার খুব অসুখ; ওরা আজকের সন্ধ্যার ট্রেণেই চলে যাবে—"

"আজই চলে যাবে?"

"হাঁ, আজই।"

নীরদার রোগপাণ্ডুর দৃষ্টি আবার ধীরে ধীরে খোলা বইখানার পাতার উপর নত হইয়া আসিল।

শচীন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মাতাকে বলিল, "আজও আমাদের বামুন ঠাকুরটা এল না মা! তুমি একলা রান্নাবান্না সমস্ত কায করতে পারবে?"

"পারবো বই কি বাবা! যা, তুই আর দেরী করিস্‌নে ওদের সকলকে দুপুরে আসতে ব'লে আয়।"

"তোমার বড্ড কষ্ট হবে মা! আচ্ছা—ওদের বামুন ঠাকুরকে একটু আগে নিয়ে এলে হয় না?"

মাতা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁরে শচীন, সে মন্দ নয়। ফেরবার সময়ই ওদের ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিস্।"

নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া শচীন আধ ঘণ্টার মধ্যেই সুধীরদের ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া মাতার নিকট হাজির হইল। তখন তারাসুন্দরীর স্নান শেষ হইয়া গিয়াছে—তাঁহার সন্তসিক্ত উন্মুক্ত কেশাগ্রভাগ হইতে তখনও বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দে শচীন, ঠাকুরকে একটু তেল দে—নেয়ে আসুক। আমি ততক্ষণ আহ্নিকটা সেরে নিই।"

বারোটার পূর্ব্বেই রান্না শেষ হইয়া গেল। ঠাকুরের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রকারিতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় তারাসুন্দরী অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "এমনি একটী ঠাকুর যদি আমরা পেতাম।" একখানা

রেকাবীতে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম নিতাই।"

"নিতাই ? আহা নামটী ত বেশ। তোমার বাড়ী কোথায় ঠাকুর ?"

"আমার বাড়ী—"

এই সময় মাতার সহিত সুধীর আসিয়া পৌছিল। "এই যে আমার দিদি এসেছেন। এত দেরী করলে কেন ভাই ?" বলিতে বলিতে তারাসুন্দরী রান্নাঘর হইতে নামিয়া গিয়া সুধীরের মাতার হাত ধরিয়া দরদালানে বসাইলেন।

সুধীরের মাতা বলিলেন, "এই সন্ধ্যের ট্রেণেই আমাদের যেতে হবে, সে ত তুমি শুনেছ বোন! জিনিষ পত্তর বাঁধাছাঁদা করতে করতে দেরী হয়ে গেল।"

তারাসুন্দরী সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁরে সুধীর, তোকেও কি একটু আগে আসতে হয়না ? বেশ ছেলে যা হোক তুই!"

নিরুত্তর সুধীর লজ্জিত মুখে শচীনের পাশে গিয়া বসিল।

আহারাদি শেষ হইয়া গেল। বিদায়ের ক্ষণে তারাসুন্দরী সুধীরের মাতাকে বলিলেন, "দিদি, একটা কথা বলছি ভাই!"

"কি কথা বোন ?"

"তোমার এই ঠাকুরকে যদি দিনকতক আমার কাছে রেখে যাও, তাহলে তোমার বিশেষ অসুবিধে হবে কি ? আমাদের ঠাকুর আজ আটদিন হল তার মেয়ের অসুখ বলে বাড়ী গেছে। বোধ করি, সে আর আসবে না। শচীন একটা খোঁজ করে এনেছিল; কিন্তু ছিরি দেখে তার হাতে খেতে আমাদের মন সরল না।"

সুধীরের মাতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, তাই হোক। আমরা দেশে গিয়ে আর একটা ঠিক করে নেব এখন। নিতাই, আমাদের সঙ্গে তোমার যাওয়া হবেনা—এঁদের বাসায় কিছুদিন থেকে যাও।"

নিতাই ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইল।

একখানা ভারি গাড়ী ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া সুধীরদের লইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিদায়ের একটা করুণ স্পর্শ যেন এই সুদূর প্রবাসে মাতা পুত্রকে ক্ষণকালের জন্য আবিষ্ট করিয়া ফেলিল।

২

গোপীরমণ ঘোষাল গ্রামের মধ্যে বেশ অবস্থাপন্ন লোক। নগদ টাকা তাঁহার যথেষ্ট; ভূসম্পত্তিও মন্দ ছিল না। অনেকের বিশ্বাস যে জাগ্রত গৃহদেবতা রাধাবল্লভজীর কৃপায় চঞ্চলা কমলা অচঞ্চলা হইয়া তাঁহার ঘরে বাঁধা রহিয়াছেন। নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল। মোটের উপর সংসারিক সকল বিষয়ে তিনি বেশ সুখীই ছিলে। সম্প্রতি একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, একমাত্র কন্যা তারার বিবাহ লইয়া। সে ভিন্ন তাঁহার আর অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না—সুতরাং তারাই তাঁহার সংসারে নিদাঘ-তাপদগ্ধ প্রান্তরে বৃষ্টির ধারা, সন্ধ্যাগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তারার বিবাহের জন্য চেষ্টার মত চেষ্টা না হইলেও, ঘোষাল মহাশয় মনে মনে সুপাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কোনটাই তাঁহার পছন্দ হয় না। কেহ বা বংশ মর্য্যাদায় হীন, কেহ বা একটু সমকক্ষ, কিন্তু অবস্থার ঢের পার্থক্য দাঁড়ায়। এ যে এক বিষম সমস্যার কথা! এ অবস্থায় ধনী কুলীন কন্যার বিবাহ হয় কি করিয়া? দেখিতে দেখিতে গোটা দুইটা বৎসর কাটিয়া গেল, মনের মতন পাত্র মিলিল না। তারার বয়স হিন্দু বিবাহপ্রথার সনাতন গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনেক দূর চলিয়া গেল। ঘোষাল দম্পতীর মন উৎকণ্ঠায় দুশ্চিন্তায় ভরিয়া উঠিল।

তারাসুন্দরী পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার মনের বনে নব বসন্তের আবির্ভাব হইল—কোকিল কুহরিয়া উঠিল—প্রজাপতি রঙীন পাখা মেলিয়া উড়িল—ঘুমন্ত কুঁড়ি সকল জাগিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার রূপ যৌবন যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা বারোটা উত্তীর্ণ প্রায়। ঘোষাল মহাশয় বড় ঘরের বারান্দায় বসিয়া গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন; এমন সময় গৃহিণী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ওগো! তুমি যে মেয়ের বিয়ের জন্তে রাজপুত্তুর না কি মন্ত্রীর পুত্তুর খোঁজ কর্‌ছিলে, তার কি সন্ধান মিল্‌লো?"

গৃহিণীর কথার ভঙ্গীতে ঘোষাল মহাশয় বুঝিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ রোষের উত্তাপ আছে। কিছুদিন হইতে কন্যার বিবাহের জন্য তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন। অকস্মাৎ খোঁচা খাইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন—মুখ দিয়া কথা সরিল না।

গৃহিণী স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি না হয় চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে পার, কিন্তু আমি যে পারিনে! আমার যে লোকের কথায় কথায় হাড় পাঁজর ভেঙ্গে গেল!"

ঘোষাল মহাশয় উদাস ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া কেবল তৈলমর্দ্দন করিতে লাগিলেন—কোন কথা কহিলেন না।

গৃহিণীর ক্রোধ আর একটু বাড়িয়া উঠিল—একটু সুর চড়াইয়া বলিলেন, "তোমার দ্বারায় হ'বে না, তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার পাঁচটা নয়, দশটা নয় একটা মেয়ের বিয়ে—"

ঘোষাল মহাশয় কাসিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "আর কাউকে ত আমি চেষ্টা কর্‌তে বারণ করিনি।"

"আচ্ছা, তা যেন হল—কিন্তু চন্দ্রনাথ ত আমাদের হাতেই আছে, তার সঙ্গে বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলনা কেন?"

ঘোষাল মহাশয় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু কুলটা যে তাহলে একেবারে খাটো হয়ে যাবে! এত শীগ্‌গির এমনি করে কি কুলের গৌরব নষ্ট করা যায়?"

গৃহিণী একবারে ঝাঁজিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দেখ, এতে কুলের গৌরব ত বাড়েই না, উপরন্তু তোমরা মানুষকে সাক্ষাৎভাবে ঘৃণা কর!—এমনি করেই তোমাদের কুল কোন্ দিন যে অকূলে তলিয়ে গিয়েছে, তার টেরও পাওনি!" ঘোষাল মহাশয় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, তারাকে উপরতালা হইতে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি স্নানের ঘাটে চলিয়া গেলেন।

৩

অপরাহ্নের সিন্দুর-রঞ্জিত মেঘ সকল সন্ধ্যার শান্ত স্তব্ধতার ভিতরে বিলীন হইয়া গেল। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। গোপীরমণ একাকী তাঁহার বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একখানি চৌকির উপর চিন্তিত মনে বসিয়া আছেন। চাকর আসিয়া আলো দিয়া গেল। নিকটে একখানা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়া ছিল, তিনি সেইখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন; হরিহর বাঁড়ুয্যেকে হুঁকা হাতে করিয়া আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "খুড়োকে আজ সারা দিনের মধ্যে দেখ্‌তে পাইনি যে!"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় চৌকীর এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আরে বাপু! সকাল থেকে যে ব্যস্ত থাকি! একা মানুষ, যে দিকে না যাব, যা না দেখব, সেইখানেই একটা গণ্ডগোল হয়ে পড়্‌বে। চাকর খানসামা থেকে আরম্ভ করে স্ত্রীলোকের কায পর্য্যন্ত আমাকে কর্‌তে হয়! তাতে আবার কাল থেকে ঠাকুর পালি পড়েছে। তারপর, এই বিকেলে তোমার এখানে আস্‌ব ব'লে বেরুতেই আমার মামাত ভাই বলরাম এসে উপস্থিত।"

"আপনার মামাত ভাই? ঐ ত এক ভবানী ছিল—সে কয় বছর হ'লো মারা গিয়েছে, না?"

"হাঁ, এ মামাত ভাই বটে, তবে কিনা ঠিক আপন মামাত ভাই নয়।"

"তবে তাই-ই বলুন। যে এসেছে, তার নাম কি বল্লেন?"

"নাম—বলরাম মুখুয্যে।"

"বয়স কত হ'বে?"

"বয়স? বয়স আন্দাজ বছর পঞ্চাশ হ'বে।"

"বিবাহ হ'য়েছে ক'টি? ঘর কি রকম?"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা, বিয়ে ৫০।৬০টি হয়ে থাকবে। এ যে একবারে বিয়ের সম্বন্ধ আরম্ভ ক'রে দিলে দেখ্ছি। আমার তারা দিদির কি সাতপাক ঘুরিয়ে দেবে না কি তার সঙ্গে?"

গোপীরমণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ধরুন, যদি তাই দিই। আর কতকাল বিয়ে না দিয়ে মেয়ে ঘরে রাখা যায়? মনে করেছিলাম, একটা ভাল ঘরের অল্প বয়সের ছেলের সঙ্গে তারার আমার বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রাখব; কিন্তু আমার কপাল মন্দ, তা হলো না, ভগবান তাতে বাদ সাধলেন।" ব'লয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু পরে বলিলেন, "মেয়ের বয়স পনেরো পার হ'তে চল্লো—লোকে যে একবারে ছি ছি কর্‌ছে!"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাইত—এত বয়স পর্য্যন্ত কেউ কি মেয়ে আইবুড়ো রাখে? এতে পূর্ব্বপুরুষগণ কুপিত হন! শাস্তর না মেনে চলেই ত আমরা দিন দিন এমন হীন হ'য়ে পড়্ছি! খৃষ্টানদের মত—" বলিয়া তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

এই কথাগুলি গোপীরমণের কাণে যেন জলন্ত অঙ্গারের মত প্রবেশ ক'রল। লজ্জায় সঙ্কোচে মুখখানা যেন কালী হইয়া গেল, তাহা অস্পষ্ট আলোকেও বেশ বুঝা গেল।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় একটু পরে মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার প্রশংসা যে তুমি কুলের দিকে তাকিয়ে যেখানে সেখানে মেয়ের বিয়ে দাও নি।"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বাড়ী গিয়া সেই রাত্রেই বলরামকে বলিলেন, "তুমি যখন আর পাঁচটা কুলীনের কুল রক্ষা ক'রেছ ভায়া, তখন আর একটা কুলীনের কুল তোমাকে রক্ষা করতে হ'বে।"

শুনিয়া বলরাম বিস্মিত দৃষ্টিতে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া একটু হাসিলেন মাত্র।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলরামের সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "এটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না ভায়া। গোপীরমণের মাত্র ঐ মেয়েই। বিষয় সম্পত্তি, টাকা কড়ি যথেষ্টই আছে—ওর অভাবে সমস্তই মেয়ে জামাইয়ের।"

বলরাম প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, শেষে ঘাড় কাৎ করিয়া সম্মতি জানাইলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহের লগ্নপত্র হইয়া গেল।

বলরাম কুলীন সন্তান। কুলীনের কুল ত কুলীনেই রক্ষা করিবে। তাই এ বয়সেও তিনি গোপীরমণকে কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহার মাথার ভার ত লঘু করিয়া দিলেনই, আর সেই সঙ্গে তারাসুন্দরীরও ইহকাল পরকালের পথ খোলসা করিয়া দিলেন।

৪

ধনী কন্যার বিবাহ—লোক-জন, আত্মীয়-স্বজনের কলরোলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিবে, সকলেই মুখেই আনন্দ উছলিয়া উঠিতে থাকিবে, কিন্তু এখানে সে সব কিছুই হইল না। ঘোষাল গৃহিণী নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছিলেন। কত কালের গোপন ব্যথা যেন তাঁহার আপাদমস্তক ছাইয়া ফেলিল। অপহৃতশাবক পক্ষিণীর যেমন শূন্য নীড়ে মাথা ঠোকা ছাড়া আর উপায় থাকে না, ঘোষাল গৃহিণীরও হইয়াছিল ঠিক তাহাই। একমাত্র নাড়ী-ছেঁড়া ধন তাঁহার ঐ তারা!—এমনি করিয়া জীবনের প্রভাতে যদি অকস্মাৎ অস্তাচলের মলিন ছায়ায় তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে, তবে এই বৈধব্যের আঘাত যে নিদারুণ হইয়া তাঁহাকেই প্রথম বাজিবে! তিনি মনে মনে বলিলেন, "ছাই সমাজ! ছাই কুল! যে কুলের গৌরব রক্ষা করতে গিয়ে একটা শিশুকে অকূলে নিক্ষেপ করা হয়, সে গৌরবের মূল্য কি এতই বেশী? জানি

না, ভগবান, এ পোড়া দেশে—এ তোমার কোন বিধান।"

মাতাপিতার একমাত্র সন্তান তারা—সেই এতটুকু হইতেই সে কোন দিন দুঃখের মুখ দেখে নাই। তাহার মনে হইত, এত সুখ-বৈভব এত সম্মান—সবই বুঝি চিরকালের জন্ম তাহাদের মুষ্টির মধ্যে! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এক মায়াপুরীর মোহন বাঁশীর সুরে তাহার কোমল মন কি এক বিপুল পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! সে বিভোর হইয়া দেখিত, দুধ-সাগরের শাঁখ-বাঁধান ঘাট—তার ধাপের উপর ধাপ, উপকথার রাজকন্যার মত শত সখী পরিবৃতা হইয়া সে যেন বসিয়া আছে,—আর রাজপুত্র তট-ভূমির সারা উপবন মথিত করিয়া বিবিধ কুসুম আনিয়া তাহার কবরী সাজাইতে ব্যস্ত। কিন্তু সব ক্ষেত্রে মানুষের আশানুরূপ ফল ফলিলে আর দুঃখ কি ছিল? অনভিজ্ঞ বাল্য-যৌবন যখন কৈশোরের সীমা ছাড়াইয়া সংসারের কর্ম্ম কোলাহল-মুখরিত জীবনের পথে আসিয়া পড়ে, সেই দিন তাহার উদ্দাম কল্পনার রঙীন নেশা প্রাতঃকালের কুয়াসার মত ধীরে ধীরে কাটিয়া যায়—সেইদিন সে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখে, এতদিন ধরিয়া সে যাহা মনের নিভৃত কোণে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা গগনোদ্যানের মত সুদূরে—অতি দূরেই ফুটিয়া রহিয়াছে!

বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে, বার্দ্ধক্যের ক্ষয়রোগে বলরাম ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে পতি-দেবতার চরণদর্শন তাহার ভাগ্যে দুই একবার হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু স্বামী-গৃহ গমনের সৌভাগ্য তাহার মোটেই হয় নাই। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ যখন তারার কাণে পৌঁছিল, তখন সে নয় মাস বয়স্ক শিশুপুত্র শচীনকে দগ্ধ বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে উদ্বেলিত শোক কতকটা শান্ত করিল।

৫

কিঞ্চিদধিক ছয় মাস দেওঘরে অবস্থান করিয়া, নীরদার শরীর বেশ নিরাময় হইয়া উঠিল। তাহার শুষ্ক দৃষ্টি আবার দীপ্তিময় হইল—রোগক্লিষ্ট পাংশু মুখখানিতে রক্তের রেখা খেলিয়া গিয়া প্রস্ফুটিত গোলাপের মত হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রচুর স্বাস্থ্য, রোগের সমস্ত ক্লিন্নতা দূর করিয়া দিয়া শরীরে নূতন প্রাণের প্রবাহ ছুটাইয়া দিল।

আশ্বিন মাস। মেঘমুক্ত সূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিহঙ্গ-কুলের আনন্দ-কাকলী কুঞ্জবনের বুক ছাপাইয়া শারদোৎসবের বন্দনা গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে এক নির্ম্মল রৌদ্ররঞ্জিত দিনে শচীন সপরিবারে তাহার নিজ গ্রাম মাঝদিয়ায় আসিয়া পৌঁছিল। অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবার তাহাদের কৌলিক দুর্গোৎসব বেশ ধুমধাম ও আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

এখানে আসিয়া অবধি পাচক নিতাই ঠাকুর যেন কেমন একটু উন্মনা হইয়া গেল; অথচ "যাই যাই" করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিতেও তাহার মন সরিতেছিল না। হৃদয়ের অন্তস্তলের কত কালের কথা যে তাহার মানসপটের উপর দিয়া মেঘের মত উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া গেল, তার একটারও সে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিল না। এই মাঝদিয়া গ্রাম—ইহার পূর্ব্বে এ গ্রামের নাম কোনও সম্পর্কে সে শুনিয়াছে বলিয়া ত তাহার মনে হয় না, তবু একটা অবছায়ার মত মাঝদিয়ার স্মৃতি ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে জাগিল। কেবলমাত্র এইটুকু মনে করিতে পারিল যে, হয়ত সে ইহার সম্বন্ধে কোন কথা কোনও দিন শুনিয়া থাকিবে।

দেওঘরে যে কয়মাস তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন, সে সময়ে একদিনও শচীন কিংবা তাহার জননী নিতাইয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নাই—করিবার অবসরও পান নাই। নিতাই রান্নাবান্না শেষ করিয়া, উপরি পাওনার লোভে অন্যত্র ঠিকা কায করিতে বাহির হইয়া যাইত, এবং অবশিষ্ট সময়টুকু সেইখানেই কাটাইয়া দিত।

একদিন গৃহিণী নিতাইকে বলিলেন, "নিতাই, কিছু দিন থেকে তোমাকে কেমন যেন শুক্‌নো দেখাচ্ছে, তোমার কোন অসুখ হয়নি ত?"

নিতাই বিনীত কণ্ঠে বলিল, "না মা, আমার ত কোন অসুখ হয় নি। আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভালই আছি।"

"বাড়ীতে ছেলেপিলের জন্যে বোধ হয় মন কেমন ক'রছে, না? আহা তা করবারই ত কথা! এদিকে যে অনেক দিন বাড়ী যাও নি।"

"হাঁ, এদিকে প্রায় বছর ঘুরে এল, বাড়ী যাওয়া হয়নি। ক'দিন থেকে বলবো বলবো করে বলা হয়নি।"

তারাসুন্দরী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি তা হলে দিন কয়েকের জন্যে বাড়ী থেকে ঘুরে এস নিতাই। কিন্তু তুমি একবারে যেতে পাবে না,—তা বলে দিচ্ছি; তোমাকে আবার এখানে আস্‌তে হবে। আচ্ছা নিতাই, তোমার বাড়ী কোথায় বাবা?"

নিতাই বলিল, "আমার বাড়ী রতনপুর। সে এখান থেকে দশ বারো ক্রোশ রাস্তা হবে, গোটা এক দিনের পথ।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা সুন্দরীর মুখখানা রক্তশূন্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন. "কোন্ রতনপুর? যে রতনপুরের মুখুয্যেরা খুব কুলীন?"

"হাঁ, সেই রতনপুরেই। এ হতভাগা সেই কুলীন মুখুয্যে বংশেরই ছেলে! আমার পিতা বলরাম মুখুয্যের মৃত্যুর পর, অদৃষ্টের ফেরে—"

অদূরে বজ্রধ্বনি হইলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, তারাসুন্দরী তেমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও:! বুঝেছি, আর বলতে হবে না! নিতাই!"

"কি মা!"

কিসে যেন তারাসুন্দরীর কণ্ঠরোধ করিয়া দিল—ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক নুইয়া পড়িল।

নিতাই আবার ডাকিল. "মা!"

নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া তারাসুন্দরী বলিলেন "আমি যে সত্যি সত্যিই তোর মা রে, নিতাই! তোর মায়ের মধ্যে, এই হতভাগিনীই তোর ছোট মা।"

নিতাইয়ের মাথা সসম্ভ্রমে তারাসুন্দরীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক।

সমবায় ব্যবসায় প্রণালী ও তাহার উপকারিতা

সমবায় ব্যবসায় অর্থাৎ সাধারণ কথায় যাহাকে যৌথ কারবার বলে, ইংরাজীতে Joint-stock Company বলে, তাহা সততার সহিত ঠিক ভাবে চালাইতে পারিলে, দেশের প্রভূত ধনবৃদ্ধি হয়। সমবায় এ দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, ঐ প্রণালী ইংরাজ কর্ত্তৃক এদেশে আনীত ও প্রচারিত হইয়াছে। উহার গঠন ও কার্য্যপ্রণালী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কৃত আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উহা বহু লোকের সমবায়ে গঠিত হয়। যে ব্যবসায় করিতে হইবে, প্রধানতঃ তাহার নাম, অথবা যে দেশে কারবার চলিবে সেই দেশের নাম, কিংবা কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নামোল্লেখে লিমিটেড কোম্পানী (Limited Company) নামে ঐ কারবার অভিহিত হইয়া থাকে। যথা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বেঙ্গল ফোন কোম্পানী, বর্ম্মা অইল কোম্পানী, মোহিনী মিলস্ লিমিটেড ইত্যাদি। যৌথ কোম্পানী হইলেই তাহার শেষে লিমিটেড অর্থাৎ 'সীমাবদ্ধ' শব্দ যুক্ত থাকিবে—উহার অর্থ ঐ কোম্পানীর কারবার অচল হইলে, লোকসান পড়িয়া বন্ধ হইলে, সাধারণ পাওনাদারের নিকট অংশিগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ—যে অংশী (sharer) যত টাকার অংশ (share)

লইয়াছে, তত টাকা পর্য্যন্ত সে দায়ী—ঐ কোম্পানীর দেনার জন্য অংশীদিগের অন্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইবে না অথবা অংশের অতিরিক্ত টাকা দিতে হইবে না। এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকায় সাধারণে সাহস পূর্ব্বক নিঃসঙ্কোচে বহু সমবায় কোম্পানী গঠিত করিয়া বহুবিধ কারবার চালাইতে পারে।

কি প্রকারে সমবায় ব্যবসায় কোম্পানী গঠিত হয়, কি কারণেই বা বহু লোক একত্র হইয়া এই কারবারের মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাই অগ্রে বুঝান যাইতেছে। যে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন, যাহা দশ জনের মূলধনেও কুলায় না—বহু জনের অর্থের আবশ্যক, সেইরূপ একটী প্রকাণ্ড যৌথ কারবার খুলিতে হইলে, দেশীয় বিদেশীয় সংবাদপত্রে নানাবিধ প্রলোভন বিশিষ্ট বিজ্ঞাপন এবং তৎসঙ্গে উদ্দিষ্ট ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণযুক্ত অনুষ্ঠানপত্র (prospectus) প্রচারিত করিতে হয়। যাহাতে সাধারণ বহু লোক অংশ ক্রয় করিতে পারে সেই কারণে ৫৲ ১০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত এক এক অংশের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। সহজে যাহাতে লোকে নিজ অংশের টাকা দিতে পারে, সেই কারণে তিন বা চারি কিস্তিতে আদায় হওয়ার নিয়ম প্রচারিত হয়। কোম্পানী গঠনের প্রারম্ভে কয়েকজন অনুষ্ঠাতা (promoters) সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে সেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হয়। ব্যক্তি বিশেষকে কমিসন দিয়া দেশ বিদেশে অংশ বিক্রয় করান হয়। এইরূপে প্রচারিত মূলধনের টাকা সংগৃহীত হইতে থাকে। উদ্দিষ্ট ব্যবসায়ে যত টাকা মূলধনের (capital) প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া অনুষ্ঠান পত্রের সহিত সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়া থাকে। এইরূপ একটী প্রকাণ্ড যৌথ কোম্পানী গঠনের সূত্রপাত হইতে কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করা, অংশ বিক্রয়ে মূলধন সংগ্রহ করা, কারবারের কল যন্ত্রাদির বায়না বিলাতে উপযুক্ত কোম্পানীকে দেওয়া, কারবার স্থাপনের উপযুক্ত পাকা গৃহাদি নির্ম্মাণ ইত্যাদি সমুদয় আয়োজন, অনুষ্ঠাতাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর কোন শুভদিনে শুভক্ষণে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহামহিম ব্যক্তি দ্বারা মহাড়ম্বরে কারবার খোলানো হইয়া থাকে।

অংশিগণের সাধারণ সভা আহূত হইয়া উঁহার মধ্যে উপযুক্ত কয়েক ব্যক্তিকে যৌথ কারবার চালাইবার জন্য কার্য্যপরিচালক (Director) নির্ব্বাচিত করা হয়। পাঁচ, সাত, নয়, এগার এইরূপ অসম সংখ্যক ডিরেক্টর প্রতি বৎসর নির্ব্বাচিত হয়। সকল ডিরেক্টরগণ সাক্ষাৎ ভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য চালাইবার জন্য আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে কার্য্যাধ্যক্ষ (Managing Director) নির্ব্বাচন করেন। কার্য্যের বাহুল্য হইলে সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষও নিযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে ডিরেক্টর সভা গঠিত হয় এবং সেই সভা দ্বারা যৌথ কারবারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও তাঁহার সহকারী দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলে অথবা কোন কার্য্যে বেশী টাকা ব্যয়ের আবশ্যক হইলে, কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসায় প্রয়োজন হইলে, মাসিক কার্য্য বিবরণ ও ব্যয় মঞ্জুর করাইতে হইলে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর কর্ত্তৃক ডিরেক্টর সভা আহূত হয়। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার ডিরেক্টর সভা আহূত হওয়ার নিয়ম। অধিকাংশ ডিরেক্টর সভায় উপস্থিত হইলে কোরম (quorum) হইয়া নোটীশে প্রচারিত কার্য্যাবলীর আলোচনা আরম্ভ হয়। অল্প সংখ্যক ডিরেক্টর উপস্থিত হইলে কোরম অভাবে সভার কার্য্য স্থগিত থাকে। প্রতি সভায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর সভাপতি (President) হইয়া থাকেন। নোটিশে লিখিত প্রত্যেক বিষয় আলোচিত হইয়া যে মন্তব্য (resolution) স্থিরীকৃত হয়, তাহা একখানি বহিতে সভাপতি কর্ত্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে। ডিরেক্টর সভায় স্থিরীকৃত নিয়মাবলী, আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কোম্পানীর সর্ব্ববিধ আর্থিক, বৈষয়িক ও খরিদ বিক্রয়ের কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত নিয়মানুসারে সম্বৎসর সমবায় কোম্পানীর কারবার সুচারুরূপে পরিচালিত হইলে প্রভূত লাভ অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ঐ রূপ লভ্যাংশকে dividend বলে। যৌথকোম্পানী কর্ত্তৃক রক্ষিত হিসাবাদি প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টমনোনিত হিসাব-পরীক্ষক (auditor) দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল অডিটর স্ব স্ব মন্তব্যসহ উদ্বৃত্তপত্র (Balance sheet) অর্থাৎ সালতামামি নিকাসী জমাখরচের তালিকা ডিরেক্টর সভায় দাখিল করেন। ডিরেক্টরগণ উক্ত আডিটরের রিপোর্ট, আপনাদের মন্তব্য, সম্বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী, ব্যালেন্স সীট, লভ্যাংশ বণ্টনের হিসাব প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন এবং একখণ্ড পুস্তিকা ও প্রতিনিধি নিয়োগের ফরম সহ সাধারণ সভার ধার্য্য দিনে উপস্থিত হওয়ার জন্য অংশীগণকে পত্র লেখেন। কোম্পানীর কার্য্যালয়ে সাধারণ সভা আহূত হয়। যে অংশী নিজে উপস্থিত হইতে না পারেন, তিনি অংশীর মধ্যে একজনকে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন। এইরূপে ধার্য্য দিনে ধার্য্য সময়ে সমবায় কোম্পানীর অংশিগণ সাধারণ সভায় সমবেত হইলে, কোন বিশিষ্ট গণ্যমান্য অংশীকে সর্ব্বসম্মতিতে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে প্রথমে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সম্বৎসরের কারবারের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন—ব্যালেন্স সীটের প্রতি অঙ্ক বুঝাইয়া দেন এবং লাভ লোকসানের তালিকায় লভ্যাংশ বণ্টনের বিষয় বিবৃত করেন। অংশিগণের মধ্যেও অনেকে নিজ নিজ মন্তব্য জ্ঞাপন করেন, কারবার সম্বন্ধে নানারূপ বাদ-প্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক ও সমাধান হওয়ার পরে, সেই বৎসর অংশিগণকে শতকরা বা অংশপ্রতি যে হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইবে, যে টাকা সঞ্চিত তহবিলে (Reserve Fund) রাখিতে হইবে, যে টাকা খাস্ত খাতায় (Depreciation Fund) ও যে টাকা বিলাত খাস্ত খাতায় (Bad debts Reserve) রাখিতে হইবে, ডিরেক্টরদিগের লিখিত রিপোর্ট অনুযায়ী সমস্ত বিষয় আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হয়। ব্যালান্স সীট সভায় উপস্থিত সমুদায় অংশী দ্বারা স্বীকৃত হয় এবং এক খণ্ড গবর্ণমেণ্ট আফিসে পাঠান হয়। অবশেষে ডিরেক্টরগণ, অডিটর, আইন-উপদেষ্টা উকিল, জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর আইনের বিধানানুসারে স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অধিকাংশ অংশীর অভিমতে (vote) তাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাচিত হইতে পারেন এবং হইয়াও থাকেন। ডিরেক্টরদিগের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। অডিটর, উকীল প্রভৃতি বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত পরিবর্ত্তিত হয় না। সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত মন্তব্য গুলি একখানি বহিতে লিখিত ও সভাপতি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

সমবায় কোম্পানী কিরূপে কি কারণে গঠিত হয়, কি প্রণালীতে উহার সর্ব্বপ্রকার কার্য্য কারবার পরিচালিত হয়, কি নিয়মে উহার হিসাব রক্ষিত পরীক্ষিত ও বার্ষিক নিকাস হইয়া লভ্যাংশ বণ্টিত হয়, সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে একপ্রকার বিবৃত হইল। এক্ষণে ঐ সমবায় ব্যবসায়ের উপকারিতা ও আমাদের ভারতে, বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে, উহার কতদূর সফলতা হইয়াছে তাহ্বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

ইংলণ্ড, জর্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ সমূহ এবং আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি রাজ্য সমূহ একমাত্র সমবায় ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া পৃথিবীর মধ্যে মহা ধনী ও শ্রীসৌষ্ঠব সম্পন্ন হইয়াছে। ইংলণ্ডের তাৎকালীন রাজা ইষ্টইণ্ডিয়া সমবায় কোম্পানীকে সনন্দ দিয়া এই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে পাঠাইয়াছিলেন; ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সৌভাগ্যে ভারতরাজ্য লাভ ঐ কোম্পানী কর্ত্তৃকই হইয়াছে, অমূল্যরত্ন কোহিনূর তাঁহার শিরোভূষণ হইয়াছে; সমবায় কারবারে অঘটন ঘটন ঘটে, উহাতে অভাবনীয় সম্পদ লাভ হয়। যে দেশের লোক বহুল পরিমাণে ঐরূপ কারবারে লিপ্ত থাকে, সে দেশ পৃথিবীর ধনাগার হইয়া উঠে। ইউরোপ, আমেরিকা কত বড় মহাধনী দেশ, তাহা বিগত মহাযুদ্ধে বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে। জর্ম্মানীর

কি অতুল ঐশ্বর্য্য তাহাও ভাবিয়া দেখিয়াছি, অথবা আমাদের দরিদ্র বাঙ্গালী তাহা ভাবিতেও পারে না। এক দিকে মিত্রশক্তির সংঘবল, জর্ম্মানী ধনবলের সহিত একাকী মহা বিক্রম চারিবৎসর কাল সর্ব্ববিষয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। কোথা হইতে ঐ বিপুল ধনবল সঞ্চিত হইয়াছিল? বিজ্ঞানোন্নতি, শিল্পোন্নতি ও সর্ব্বতোমুখী ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ প্রসারে পর্ব্বতপ্রমাণ ধনসঞ্চয় হইয়াছিল। ভারতের বাজারে জার্ম্মানী অষ্ট্রীয়ার কিরূপ পসার প্রতিপত্তি ছিল, যুদ্ধাবসানে এক্ষণে আমরা পরমুখাপেক্ষী ভারতবাসী, তাহা হাড়েহাড়ে বুঝিতেছি।

ইংলণ্ডেশ্বরী, দরিদ্রা ভারত ভগিনীর নগ্ন পুত্র কন্যার লজ্জা নিবারণ করিয়া বর্ষে বর্ষে কত কোটী কোটী টাকা কুক্ষিগত করিতেছেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যে অতুল সম্পদে প্রভূত সচ্ছলতায় তাঁহার শ্বেতাঙ্গ অমল ধবল স্থূল হইতেছে, দুঃখিনী ভারত দিন দিন দীনা ক্ষীণা মলিনা হইতেছে। সম্প্রতি তাঁহার দীন পুত্র মহাত্মা গান্ধী গোটা কতক চরকা ঘুরাইয়া মাতার লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন—যাহা সাহারায় বারিবিন্দুর ন্যায়।

মহাত্মা গান্ধি ভারতে আজকাল রাজনৈতিক ধর্ম্মাবতার রূপে সাধারণের চক্ষে প্রতীয়মান, তাঁহার প্রভাবে অল্প দিনে কোটী মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ অর্থ দ্বারা কি কার্য্য হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। অনেকে অনেক রূপ কল্পনা জল্পনা করিতেছেন। গান্ধি মহাত্মার কাছে আমাদের ন্যায় নগণ্যের কোনরূপ প্রস্তাব করা নিতান্ত ধৃষ্টতা বেশ বুঝিতেছি, তথাপি একটা কথা বলি, গান্ধি চরকার প্রচলন যেমন করিতেছেন, তাহা করুন; তদুপরি তিনি যে কোটী মুদ্রা পাইয়াছেন তদ্দ্বারা ভারতের জেলায় জেলায় এক একটী কাপড়ের সুতার কল প্রতিষ্ঠা করিলে সুবিধা হয় না কি? এক একটী কলে দুই লক্ষ হিসাবে মূলধন দিলে পঞ্চাশটী কল পঞ্চাশটী জেলায় স্থাপিত হইতে পারে। দুই লক্ষ টাকা মূলধনে কার্য্য আরম্ভ হইলে ক্রমে উহাকে সমবায় কোম্পানীতে পরিণত করিয়া, আরও মূলধন বাড়ান যাইতে পারে এবং ঐ সকল কলের দ্বারা এত পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে যে, তদ্দ্বারা ঐ জেলার ব্যবহার্য্য বস্ত্রের অভাব ঘুচিয়া অন্যত্র রপ্তানি করা যাইতে পারে। মহাত্মা গান্ধি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, দেশ হিতৈষণায় উন্মত্ত, তিনি মুষ্টিমেয় বম্বের কলওয়ালাদিগকে বুঝাইতেছেন, দেশহিতের জন্য তোমরা কাপড়ের দর চড়াইও না—এটী বালকের আব্দার। কোনও দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা গ্রাহক অধিক হইলে, তাহার মূল্য বৃদ্ধি না করিলেও আপনি বাড়িয়া যায়। সাধারণ কথায় বলে "হাটের দুয়ারে আগড় দেওয়া যায় না।" অতএব দেশ-হিতৈষণায় খাতিরে কেহই কাপড়ের দর কমাইবে না—ইহা স্থির নিশ্চয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বম্বে যাইয়া কলওয়ালাদিগের দ্বারে দ্বারে চিৎকারে গলা ভাঙ্গিয়াছিলেন, কোনও ফল হয় নাই। অপ্রস্তুত অবস্থায়—অভাব পূরণের উপযুক্ত জিনিষ দেশে জন্মাইতে না পারিলে কোনও ফল হইবে না। ভাবপ্রবণ হৃদয়ের বেগে জ্ঞানশূন্য হইয়া কোন মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। উহাতে বরং ঘোর অশান্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলনে বিদেশী বস্ত্র বয়কটের বিফলতা, উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদেশে স্বদেশী সমবায় কারবারের সৃষ্টি হইয়াছিল। শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করায় কয়েক স্থানে স্বদেশী বস্ত্র বয়নের কল (mill) স্থাপিত হইয়াছিল—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মোহিনী মিল, কল্যাণ মিল, আমেদাবাদে রামকৃষ্ণ মিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল মিলের মধ্যে কেবল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে মোটা সূতা প্রস্তুত হয় অন্য মিলে বিলাত হইতে সূতা আনাইয়া বস্ত্র বয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বম্বের অনেক মিলে বিলাতী সূতায় বস্ত্র বোনা হয়, সুতরাং ঐরূপ বস্ত্রকে স্বদেশী বস্ত্র বলা যাইতে পারে না।

আবার ঐরূপ জগাখিচুড়ি বস্ত্রও এরূপ পরিমাণে প্রস্তুত হয় না, যাহাতে সমগ্র ভারতের বস্ত্রাভাব বিদূরিত হয়। এরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় বিলাতীবস্ত্র বর্জ্জনের ঘোষণা করিলে শত্রুর মুখ হাসান ব্যতীত বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা অতি কম মহাত্মা গান্ধি লক্ষ লক্ষ চরকার আমদানির পরামর্শ দিয়াছেন তাঁহার মুখরক্ষার জন্য তাঁহার ভক্ত বঙ্গীয় শিষ্য চরকা কিনিয়া অট্টালিকার সিঁড়ির ঘরে রক্ষা করিয়াছেন—বঙ্গ রমণীদিগকে চরকায় সুতা কাটিতে প্রবৃত্ত করার জন্য মাসিক পত্রে রমণীর শিরোমণি সরলা দেবীর চরকা কাটা ছবি বাহির হইয়াছে—চরকার উপকারিতা, গুণগ্রামের কত কবিতা বাহির হইয়াছে—কলিকাতার বহু দোকানে চরকার নানাবিধ নমুনা প্রদর্শিত হইতেছে—কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর নানাবিধ কলকারখানার প্রতিযোগিতায় চরকার প্রচলন টিকিবে কিনা সন্দেহ—টিকিলেও বিশেষ ফলপ্রদ হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

স্বদেশী আন্দোলন সময়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মিলের কার্য্য সুচারু রূপে পরিচালিত না হওয়ায় আশানুরূপ লাভপ্রদ হয় নাই। উহাতে সমবায় কার্য্য পরিচালনে বাঙ্গালীর অযোগ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। ঐরূপ নানা স্থানে অর্থাৎ বম্বে লাহোর আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রভূত মূলধন বিশিষ্ট সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় সকলগুলিই অকালে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ কারবারে দেশীয় পুরুষদিগের নানারূপ চতুরতা প্রকাশ পাইয়াছে, উহাতে বহু দরিদ্র ব্যক্তির বহু অর্থ নষ্ট হইয়াছে, সাধারণের মনে স্বদেশী কারবারের প্রতি ঘোর অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সেই হেতু ভারতে নূতন স্বদেশীয় যৌথ কারবার একরূপ বন্ধ হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গালী যেরূপ পূর্ণ উৎসাহে যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠায় তন্ময় হইয়াছিল. শুভ ফল পাইলে এতদিন বঙ্গদেশ নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যের কল কারখানায় পরিশোভিত হইত, প্রভূত ধনাগমে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইত, বাঙ্গালী গোলামি ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের রসাস্বাদন করিত।

কিন্তু ভাগ্যদেবী যে বাঙ্গালীর প্রতি প্রসন্না নহেন, সেটি বাঙ্গালীর চরিত্রের অসম্পূর্ণতা, অপরিপক্কতার দোষ। বাঙ্গালী এখনও নীচ স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে পারে নাই। যেরূপ সংকল্পের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, কার্য্যতৎপরতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতার আবশ্যক, বাঙ্গালী চরিত্রে ঐ সকল গুণের সেরূপ সমাবেশ এখনও দেখা যায় না। সমবায় ব্যবসায় চালাইতে, উহার সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সংগঠনে যেরূপ দৃঢ়তা, দূরদর্শিতার প্রয়োজন, বাঙ্গালীতে তাহার একান্ত অভাব। বাঙ্গালী বাক্‌পটু, কার্য্যপটু নহে। বাঙ্গালী অব্যবস্থিত, অস্থির চিত্ত, অসহিষ্ণু।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত বৃহৎ বাণিজ্যে প্রভূত লাভ ও প্রভূত মূলধন—তৎসমুদয় ইংরাজ যৌথ কোম্পানী দিগের করতলগত। বিলাতে ঐ সকল কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলওয়ে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে প্রভৃতি ভারতে যতগুলি প্রকাণ্ড রেলওয়ে আছে, সমস্তই প্রায় ইংলণ্ডবাসীর মূলধনে এই দেশে পরিচালিত হইয়া, প্রভূত লভ্যাংশ ইংলণ্ডে যাইতেছে। হুগলি হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে যে সকল চট কল আছে, সে সমস্তই ইংরাজ সমবায় কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত। আসাম, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানের বড় বড় চা-বাগান ইংরাজ যৌথ কোম্পানীর দ্বারা সংস্থিত। বঙ্গবাসীদিগের মূলধনে ও পরিচালনে কোনও বৃহৎ সমবায় কোম্পানী গঠিত হয় নাই। ইদানীং বাঙ্গালী কোম্পানী কর্ত্তৃক চা-বাগানের কার্য্য কিছু কিছু চলিতেছে। ঐ সকল সমবায় চায়ের ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে—একশত টাকার অংশী, একশত টাকা লাভ বা ডিভিডেণ্ড পাইয়া থাকেন। বাঙ্গালী উকিল মোক্তারদিগের সমবায়ে জেলা ও মহকুমায় কতকগুলি লোন কোম্পানী (Loan Company) গঠিত হইয়া তেজারতি কারবার চলিতেছে, কিন্তু উহা প্রকৃত বাণিজ্য ব্যবসায় নহে।

সমবায় ব্যবসায়ের অংশিগণ ইচ্ছামত অংশের টাকা

তুলিয়া লইতে পারেন না। অন্ত সকল ভাগের কারবারে, ইচ্ছা হইলে এক ভাগী অন্ত ভাগীদিগের নিকট হইতে নিজে ভাগের টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন। সমবায় কোম্পানীর অংশী, আবশ্যক হইলে নিজে অংশ সমূহ বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন। কালকাতায় কোম্পানীর কাগজ ও সেয়ার খরিদ বিক্রয়ের বৃহৎ বাজার আছে, তাহাকে সাধারণতঃ কোম্পানী কাগজের বাজার বলে। প্রত্যহ ঐ বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ (Government Promissory note), এবং বহু প্রকার সমবায় কোম্পানীর বহু সেয়ার খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু ধনী মহাজন উহার খরিদ বিক্রয়ের কার্য্য চালাইয়া বহু অর্থ লাভ করেন। যে কোম্পানীর সেয়ারে বর্ষে বর্ষে উচ্চ হারে ডিভিডেণ্ড প্রদত্ত হয়, এবং যাহার স্থায়িত্ব ও পসার প্রতি-পত্তি আছে, সে কোম্পানীর সেয়ার বাজারে অসম্ভব উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে—এমন কি একশত টাকার সেয়ার, পাঁচশত হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। আবার যে কোম্পানীর সেয়ারে ডিভিডেণ্ড প্রদত্ত হয় না, তাহা কম মূল্যে অর্থাৎ আশী, নব্বই টাকায় বিক্রয় হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে সমবায় সেয়ারের টাকা উঠাইতে না পারিলেও, বাজারে অবাধে বিক্রয় হয় এবং তাহাতে অনেক সময়ে লাভবান হওয়া যায়। তাহা হইলে সমবায় ব্যবসা প্রণালী যে সর্ব্বপ্রকারে সুবিধাজনক তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

কিন্তু আমরা ভারতবাসী—বিশেষতঃ বঙ্গবাসী—এত-দূর হতভাগ্য ও অকর্ম্মণ্য যে, এত সুবিধার সমবায়ে নানা-বিধ কারবার চালাইয়া স্বদেশকে সৌভাগ্যশালী করিতে এবং অন্ত দেশকে চমকিত করিতে নিতান্ত অপারক।

একটী কথা সকলকে মনে রাখিতে হইবে। সতত স্বদেশকে, আপনাকে দীন দরিদ্র কৃপাপাত্র ভাবিলে আত্মাবমাননা করা হয় সেরূপ করিলে সে জাতির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ দীনভাবে সম্পন্ন করিব এরূপ প্রতিজ্ঞা না করিয়া, দেশময় কল-কারখানার প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিব নানা বিলাস-বিভবের বস্তু প্রস্তুত করিব, যাহাতে বহু শিল্পীর অন্ন সংস্থান হইবে, বিদেশীদিগের সহিত বিবিধ বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রভূত ধন লাভ করিব যাহাতে ভারতমাতার মলিন মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইবে, এরূপ চেষ্টাই করা উচিত। তাহা না করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইলে, সমস্ত কাব-কর্ম্ম বর্জ্জন করিলে ভারতমাতার ত্রিশ কোটি কৃপোষ্যের অন্ন-বস্ত্র জুটিবে কিরূপে? প্রাণপণে সঙ্গত বিধানে আমরা সেই চেষ্টা করিব যাহাতে কোন বিষয়ে আমরা পরমুখাপেক্ষী হেয় না হই। উপরোধ অনুরোধ যুক্ত বয়কটে, দেশ-হিতৈষণার খাতিরে বয়কটে বিশিষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা নাই। পর্ব্বতাকার বিলাতী বস্ত্র পোড়াইলাম, কি লাভ হইল? পর্ব্বতাকার স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুত করা চাই। উহা সময়-সাপেক্ষ হইলেও, তত কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। এতকাল ঘুমাইয়া, একদিনের জাগরণে একেবারে সাফল্য লাভ কি হয়? আবদার করিলে চলিবে কেন? যোগ্যতা চাই, ক্ষমতা চাই, কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল পাওয়া যায়। যোগ্য হইলে, দুঃখ দারিদ্র্য আপনিই ঘুচিবে; উহারা কখন অন্তর্হিত হইবে তাহা জানাও যাইবে না। জাতীয় সম্মান ভিক্ষা করিতে হইবে না, আপনিই আসে। মূল কথা বাক্যে, ভাবে, হঠকারিতায় কিছুই ফল হইবে না—একনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত হইয়া, মহাকর্ম্মের মহানুষ্ঠান জন্ম মহা সম্মিলন চাই।*

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

---

* এই প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালে কলিকাতা সুহৃদ্ লাইব্রেরি কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোরের কথা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আজিজিয়ার ছাউনি। কুড়ি মিনিট যুদ্ধ।

আজিজিয়া কুট-এল-আমারা হইতে ৭৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং বোগ্দাদ হইতে চল্লিশ মাইল পূর্ব্বে, টাইগ্রিস নদীর বামপার্শ্বে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। ইহারই ঠিক ৬০ মাইল দক্ষিণে, ইউফ্রেটিস নদীর পারে ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। গ্রামে যে কয়টি মাটির ঘর ছিল তাহা অধিকাংশই ভগ্নাবস্থায় দেখিলাম পাছে সেগুলি পাইয়া আমাদের আশ্রয়ের সুবিধা হয়, তাই তুর্কি ফৌজ হটিয়া যাইবার সময় ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাহারা ছিল তাহারা আমাদের ফৌজে কুলির কায করিত। ইহাদের দৈনিক দশ আনা করিয়া মজুরি দেওয়া হইত।

আমরা আজিজিয়া পৌঁছিবার পরদিন বৈকালে ডিভিসনের তৃতীয় ব্রিগেড আসিয়া পড়িল। তুর্কিরা তখন আজিজিয়া হইতে সাত মাইল পশ্চিমে এল্ কটুনিয়া নামক গ্রামে ছাউনি ফেলিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়াই আমাদের ডিভিসনটি দ্রুত গতিতে কেন্দ্রীভূত হইয়া লইল। মধ্যে মধ্যে তুর্কিরা দলবদ্ধ হইয়া আমাদের শিবির সম্বন্ধে সংবাদ লইবার জন্য, (যাহাকে রিকনয়টারিং বলে) অগ্রসর হইত, কিন্তু আমাদের বড় কামানগুলির পাল্লার ভিতর পড়িলেই তাহাদিগকে তোপ্ দাগিয়া বিতাড়িত করা হইত।

আজিজিয়া পৌঁছিবার পর তিনদিন আমাদের কোনও কাযকর্ম্ম করিতে হয় নাই। এ সম্বন্ধে অ্যাম্বুলেন্সের কর্ত্তাদের অমনোযোগ দেখিয়া আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম। তবে আমরা এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। চতুর্থ দিনে একটি ঘটনার পর, হঠাৎ আমরা কর্ণেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। আমাদের ছাউনির পাশেই রসদ বিভাগের ছাউনি ছিল। দিনের বেলায় তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে "বহির্গমনের" জন্য আমাদের দলের একজনকে এক সিপাহী ধৃত করিয়া, তাহাদের কাপ্তানের নিকট উপস্থিত করে এবং তিনি চার্জ্জশীট পূরণ করিয়া কার্ণেল হেনেসির নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহার তাঁবুর নিকট আমাদের আসিতে দেখিয়া কার্ণেল সহাস্য মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার শুনিয়া বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। কর্ণেল হেনেসি আইন কানুন সম্বন্ধে অতিশয় কড়া ছিলেন; যখন শুনিলেন যে অপরাধকারী আইন-ব্যবসায়ী, তখন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া, আইন ভঙ্গ করিলে এরূপ অপরাধ সমস্ত ডিভিসনের লোকের কিরূপ স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে সে বিষয়ে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। আইন ব্যবসায়ী অপরাধকারীকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কাপ্তান ম্যালান আসিয়া আমাদের কুচ্ করিয়া ল্যাট্রিন প্যারেডে লইয়া গেলেন এবং দিবাভাগের পায়খানা ও নৈশ পায়খানা দেখাইয়া দিলেন। পায়খানা সম্বন্ধীয় আইন ভঙ্গ করিলে যে এক সপ্তাহের কারাবাস করিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

দ্বিপ্রহরে মেজর ল্যাম্বার্ট আসিয়া আমাদের ফল্ ইন্ করাইলেন এবং ট্রেঞ্চখনন কার্য্যে লইয়া গেলেন। অ্যাম্বুলেন্সের সার্জ্জেন্ট হেইটার আসিয়া আমাদিগকে ট্রেঞ্চ খনন প্রণালী শিখাইতে আরম্ভ করিল। ইহার পর মেজর আমাদের দৈনন্দিন কার্য্য ঠিক করিয়া দিলেন। প্রাতে ৮টার সময় সকলকে পুরা পোষাকে ঝোলা ও জলের বোতল সমেত ফল্-ইন করিতে হইত এবং এক ঘণ্টা ড্রিল ও এক ঘণ্টা কুইক্ মার্চ্চ করিতে হইত। ৮টার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, প্রতি তাঁবুতে ছয় জন করিয়া

১২ জন রন্ধন ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য রাখিয়া, বাকী সকলে কার্য্যের জন্য ইণ্ডিয়ান, ও ইউরোপিয়ান অফিসারদের ওয়ার্ডে যাইত এবং দুইজন করিয়া আপিসের কাযের জন্য যাইত। ওয়ার্ডে প্রতিদিন দুইঘণ্টার মধ্যেই কায সমাপন করিয়া সকলে ফিরিয়া আসিত। বেলা ২টার সময় পুনরায় সকলে ট্রেঞ্চখননের জন্য যাইয়া বেলা ৫টায় ফিরিয়া আসিত। সন্ধ্যা ৬টার সময় এ৮টি দল রাতের কাযের জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে যাইত।

এই সময় ছাউনীতে আমাশয় রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল এবং আমরাও ইহাতে অনেকেই আক্রান্ত হইয়াছিলাম। নদীর জল অত্যন্ত অপরিস্কৃত অবস্থায় পান করাই ইহার প্রধান কারণ। নদীর তীরে কয়েকটি নিশান পোঁতা হইয়াছিল। স্রোতের দিকে সর্ব্বপ্রথম নিশানটির নিকট সকলে পানীয় ও রন্ধনের জল লইত, তাহার পর বিভিন্ন নিশানের নিকট অশ্বাদির জলপানের স্থান, সিপাহীদের স্নানের স্থান, অশ্বাদির স্নানের স্থান ও বাসন পত্রাদির ধৌত করিবার স্থান ছিল।

হাবিলদার চম্পটী, নায়েক বীরেন্দ্রকুমার ও প্রাইভেট শিশিরপ্রসাদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অসুস্থ হইয়া পড়েন। নায়েক বীরেন্দ্রকুমারের অবস্থা দেখিয়া কার্ণেল তাঁহাকে আ-মারার ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের অগ্রগমন সম্বন্ধে ইঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল এবং আমরার অফিসারদের নিকট আমাদের এ সম্বন্ধে আগ্রহ জ্ঞাপন করিতে ইনিই আমাদের মুখপাত্র ছিলেন। অসুস্থতার জন্য ইঁহার সর্ব্বপ্রধান ইচ্ছা যুদ্ধক্ষেত্রে কায করা, ফলবতী হইতে পারিল না।

কাযে লাগিবার কিছুদিন পর হইতেই আমরা অফিসারদের অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠিলাম। কার্ণেল একদিন হাবিলদার চম্পটীকে বলিলেন যে, কার্ণেল হেয়ার ও জেনারেল ডিলামেইন আমাদের কাযের কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং উৎসাহ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আজিজিয়া পৌঁছানর পর আমরা রসদ বিভাগের কয়েকটি বাঙ্গালী কেরাণীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের সহিত পরিচিত হই। ইঁহারাও প্রায়ই আমাদের তাঁবুতে আসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের খাদ্যাদির সুবিধা করিয়া দিতেন।

আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে প্রায় জনৎশেক গোরা সিপাহী নার্সিং অর্ডারলির কায করিত। ইহারা আমাদের সহিত সমকক্ষ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিত। ইহাদের সকলেই সাধারণ হিন্দুস্থানী সিপাহীদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিত, আমাদের সহিত তাহা করিত না। আমরাও লক্ষ্য করিলাম যে সাধারণ হিন্দুস্থানি সিপাহীদের অপেক্ষা ইহারা অনেক শিক্ষিত এবং সকলেরই পৃথিবী সম্বন্ধে একটু সাধারণ জ্ঞান আছে। ইহারা আমাদের নিকট ইংরাজী নভেল লইয়া পড়িত, বাংলা গান শিখিত, আমাদের সংবাদপত্র পাঠ করিতে দিত এবং যুদ্ধের সময় প্রচলিত কয়েকটি সুপরিচিত ইংরাজি গান শিখাইত। দেশী সিপাহীরা আমাদের সম্মানের চক্ষে দেখিত এবং কেহ কেহ বাঙ্গালীর খাতির দেখিয়া একটু ঈর্ষান্বিত হইত।

আজিজিয়া পৌঁছানর প্রায় তিন সপ্তাহ পর, ২৭শে অক্টোবর বৈকালে কার্ণেল হেনেসি চম্পটী বাবুকে ডাকিয়া, আমাদের আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে বলিলেন। আমরা সন্ধ্যার মধ্যেই আহারাদি সমাপন করিয়া, ঝোলায় একদিনের আহার বাঁধিয়া, উর্দ্দি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া লইলাম। রাত্র ৮টার সময় মেজর ল্যাম্বার্ট আসিয়া আমাদের ফল ইন করাইলেন; ৯টার সময় আমরা ব্রিগেডের সহিত কুচ আরম্ভ করিলাম। আমরা শুনিতে পাইলাম যে এল্-কুটনিয়া স্থিত তুর্কি শিবির আক্রমণ করিতে আমরা যাইতেছি। ইহাই আমাদের প্রথম যুদ্ধযাত্রা বলিয়া আমরা পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

এসিনের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেনাপতি নুরুদ্দিন পাশা, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জিউর নামক স্থানে ছাউনি ফেলিয়াছিলেন। এল-কুটনিয়াতে তুর্কিদের একটি অশ্বারোহী দল ছিল। ইহারা মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া আমাদের ফোরেজ পার্টি বা জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রাহকদের উপর গুলি চালাইত। ইহাদের বিতাড়িত করাই

আমাদের নৈশ আক্রমণের উদ্দেশ্য। এই নৈশ অভিযানে দুইটি ব্রিগেড যোগ দিয়াছিল।

আমরা রাত্রি ৯টার সময় কুচ আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৩টার সময় হল্ট করি। এই ছয় ঘণ্টায় আমরা মাত্র ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, ইহাতেই কুচের অসম্ভব রকমের ধীরগতি বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার উদ্দেশ্য, শত্রুপক্ষকে যতদূর সম্ভব আমাদের আগমন সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখা। 'সারপ্রাইজ অ্যাটাক' বা আচম্‌কা আক্রমণ বলিয়া, কুচের সময় এবং তাহার পর সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, কথোপকথন করার হুকুম ছিল না। আলোক দেখিয়া শত্রুপক্ষ আমাদের অবস্থান বুঝিতে পারিবে বলিয়া, দিয়াশলাই জ্বালা বা ধূমপান করা নিষিদ্ধ ছিল। যতদূর মনে হয় আমাদের এ সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কারণ সে রাত্রে যথেষ্ট চন্দ্রালোক ছিল। মেসোপটেমিয়ার নির্ম্মল আকাশে চাঁদের আলোতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আমাদের সঙ্গের কামানের গাড়ী, মেসিন গান, ব্যাটারির গাড়ী, অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ীগুলি অসমান ভূপৃষ্ঠে যে শব্দ করিয়া যাইতেছিল, তাহাতেও আমাদের গমন শত্রুপক্ষের মোটেই অগোচর ছিল না।

রাত্রে মেসোপটেমিয়ার আকাশের দৃশ্য বড়ই গম্ভীর ও চিত্তাকর্ষক। বায়ুমণ্ডলের নির্ম্মলতা ও শুষ্কতার জন্য, নক্ষত্রগুলি আমাদের দেশের অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল দেখায়। মেসোপটেমিয়ার পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগই পুরাকালে ক্যালডিয়া নামে খ্যাত ছিল; ক্যালডীয়গণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই লতাবৃক্ষহীন সমতল মরুপ্রদেশের আদিম মানবেরা যে তাঁহাদের দেশের জ্যোতিষ্কখচিত নভোমণ্ডলের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রথম হইতেই চেষ্টিত ছিলেন, তাহা বেশ অনুভব করা যায়, কারণ মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানলিপ্সা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও দৃশ্যাবলী হইতেই জন্মিয়া থাকে।

চন্দ্র অস্ত যাওয়ার পর আমরা তারার আলোকে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলাম। পথ দেখা মানে সম্মুখবর্ত্তী চারিজনের পিছনে পিছনে চলা। এই রাত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখিলাম যে, মানুষ চলিতে চলিতেও ঘুমাইতে পারে। অশ্বাদি পশু দণ্ডায়মান অবস্থায় নিদ্রা যায় তাহা সকলেই দেখিয়াছে; কিন্তু একটু বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, আমাদের সহযাত্রী অনেক ভুলিবেহারা ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাঁটিতেছে। যখন সম্মুখবর্ত্তী দল কোনও কারণে থামিতেছিল, তখন এই সুপ্ত ভ্রমণকারীরা তাহাদের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। আমরা দেখাদেখি হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। এটি বোধ হয় অভ্যাস-সাপেক্ষ।

সে রাত্রে অসহ্য শীতপড়িয়াছিল। আমরা তখনও কোন শীতবস্ত্র পাই নাই; তাই রাত্রে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গী অফিসারেরা কেহ কেহ শীত নিবারণের জন্য খানিকটা লাফাইয়া লইলেন। অবশ্য আমাদের তাহা করিবার উপায় ছিল না। রাত প্রায় তিনটার সময় একটি উচু টিলার (Sand hill) নিম্নভাগে আমরা থামিলাম এবং বসিবার ও শুইবার অনুমতি পাইলাম। কৌতূহল ও উদ্বেগের জন্য আমাদের কাহারও সে সময় ঘুম আসিল না।

অশ্বারোহীর দল ধীরগতিতে আমাদের পশ্চিমে চলিয়া গেল। তাহাদের বল্লমের ফলকগুলি তারার আলোকে চিক্‌মিক্ করিতেছিল; এবং বোধ হইতেছিল যেন অন্ধকারে একঝাঁক জোনাকি পোকা সারি বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

দুই ঘণ্টা বিশ্রামের পর পদাতিক সিপাহীর দল অগ্রসর হইয়া গেল। অগ্রসরের গতি প্যারেড বা মার্চের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া নয়, প্রতি তিনগজ ব্যবধানে এক একজন করিয়া—কিন্তু শ্রেণীটী সরল রেখায় রাখিয়া অগ্রসর হইবার নিয়ম। ইহাকে এক্‌স্টেণ্ডেড অর্ডারে বা প্রসারিত ভাবে অগ্রসর হওয়া বলে। কিছু পরেই রাত্রের অন্ধকার তরল হইতে লাগিল, পূর্ব্ব আকাশে চক্রবাল রেখার ঊর্দ্ধে অতিক্ষীণ রক্তিম আভা দেখা দিল। ক্রমে ইহা স্পষ্ট

হইয়া আকাশে বহুবিধ বর্ণবিন্যাসের পর সূর্য্যোদয় হইল। আমরা শুনিতে পাইলাম আমাদের পশ্চিম দিকে গুলি চলিতেছে। মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের এক্‌টেণ্ড্ করিবার হুকুম দিলেন। আমরা প্রতি ২০ কুড়ি গজ ব্যবধানে একটি একটি একটি ষ্ট্রেচারের দল দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া লইলাম। আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানেও গুলি পড়িতেছে দেখিয়া মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের শুইয়া পড়িতে হুকুম দিলেন। আমরা বুকের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ইহার উদ্দেশ্য, দূর হইতে শত্রুপক্ষ সহজে আমাদের অবস্থান দেখিতে পাইবে না এবং ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ষ্ট্রেচর, গুলির আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কিছুক্ষণ পর তোপের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-শোঁ শব্দ করিয়া, দুটি শত্রুপক্ষের গোলা নীলাভ ধূমের বাহার খুলিয়া বহু উর্দ্ধে আমাদের মাথার উপর সশব্দে ফাটিয়া গেল। শেল-মুক্ত স্র্যাপনেল্ গুলি আমাদের চারিদিকে মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। মেজর একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া লইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন কেহ আহত হইয়াছে কিনা। আমাদের সহাস্য "না" শুনিয়া মেজরও অল্প হাসিয়া শুইয়া পড়িলেন। এতক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়াই ছিলেন। মেজর ল্যাম্বার্ট মধ্যে মধ্যে আমাদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য, ভীরু বাঙ্গালী ভয় পাইয়াছে কি না দেখা। তুর্কিদের শেল ফাটার পরও তিনি আমাদের মুখে বিশেষ ভাবান্তর দেখিতে না পাইয়া বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আমাদের ঠিক সম্মুখভাগে একটি ব্যাটারি বা ছয়টি কামানের শ্রেণী নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তুর্কিরা তোপ চালাইতে আরম্ভ করিবামাত্র গোলন্দাজেরা ঘোড়া ছুটাইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেল এবং নিমেষের মধ্যে তোপগুলির মুখ ফিরাইয়া প্রস্তুত হইয়া লইয়া দমাদম গোলা চালাইতে লাগিল। আমরা দেখিতে পাইলাম, যে, আমাদের গোলাগুলি সম্মুখবর্ত্তী এল্-কুটনিয়া গ্রামের উপর ও তাহার পূর্ব্বস্থিত জঙ্গলের উপর ফাটিতেছে। মেসোপটেমিয়ায় খেজুর গাছ ভিন্ন অন্য গাছের বন এই প্রথম দেখিলাম। গাছগুলি কিসের গাছ তাহা দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। মিনিট দুই তিন গোলা নিক্ষেপের পর ব্যাটারি থামিয়া গেল। মেজর উঠিয়া পড়িলেন এবং আমাদের উঠিতে হুকুম দিলেন। তোপখানাটি আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া, পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল। আমরা দেখিলাম আমাদের পদাতিকের দল এল্ কুটনিয়া গ্রামে অগ্নিসংযোগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। তখন চারিদিকে গুলির আওয়াজ থামিয়া গিয়াছে। আমরা কয়েক শত গজ অগ্রসর হইয়া বিশ্রামের আদেশ পাইলাম। রাশন টিন হইতে রুটি ও গুড় বাহির করিয়া আহার সমাধা করিয়া লইলাম। মেজর ও আমাদের সমভিব্যাহারী দুজন চ্যাপেন্ বা পাদরী, পাঁউরুটি ও বুলবীফ বা টিনে রক্ষিত মাংস আহার করিলেন। আমাদের কিছু পিছনে একটি উঁচু টিলার উপর জেনারেল টাউনসেণ্ড ও তাঁহার পার্শ্বচরেরা দূরবীণ দিয়া পশ্চিম দিকে দেখিতেছিলেন, সেই সময় অশ্বারোহণে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কিছু পরে ষ্টাফ্ হইতে একজন সার্জ্জেণ্ট অশ্বারোহণে আসিয়া আমাদের কন্‌সেনট্রেসন্ গ্রাউণ্ডে যাইবার আদেশ জ্ঞাপন করিল। এক একটি যুদ্ধ হইয়া যাইবার পর ব্রিগেডের পল্টনগুলি ও অন্যান্য দল পুনরায় যখন ক্লোজ অর্ডারে মিলিত হয় তখন তাহাকে কনসেনট্রেশন বা কেন্দ্রীভূত হওয়া বলে।

আমাদের অগ্রসর হওয়ার সন্ধান পাইয়াই তুর্কিরা স্থানটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের পশ্চাৎ রক্ষক সৈন্যদের (রিয়ার গার্ড) সহিত আমাদের মাত্র পনের কুড়ি মিনিট যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা দূরে চলিয়া যাওয়ায় যুদ্ধ বন্ধ করা হইয়াছিল। এই সংঘর্ষে আমাদের অশ্বারোহী দলের কয়েকজন ব্যতীত আর কেহ আহত হয় নাই।

এল কুটনিয়ায় একটি ছোট দল রাখিয়া, আমরা বেলা নয়টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহরে আজিজিয়া পৌছিলাম। যখন আজিজিয়ার ছাউনিতে প্রবেশ করি, তখন ব্রিগেডের নেতা জেনারেল ডিলামেইন

মেজরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়জন ফল আউট্ করিয়াছে? (অর্থাৎ মার্চ্চ করিতে অপারগ হইয়াছে) মেজর ল্যাম্বার্ট উত্তর করিলেন,—"কেহও নহে।" সেনাপতি বলিলেন "উত্তম।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা।

সেদিন বৈকালে যখন আমরা স্নান সমাধা করিয়া গল্পগুজব করিতেছি তখন মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ রহস্যালাপের পর, আমাদের প্রস্তুত লুচি ডাল ও মাংস খাইয়া সুখ্যাতি করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর মধ্যে মধ্যে তিনি আমাদের তাঁবুতে আসিতেন এবং আমাদের দেশের কথা, কলেজের পাঠ্যের কথা, তিনি নিজে কি করিয়া মেজর পর্য্যন্ত হইয়াছেন প্রভৃতি গল্প করিতেন। কার্য্যের সময় কিন্তু কঠোর আদেশানুবর্ত্তিতার কোন দিনই লাঘব হয় নাই।

আজিজিয়া থাকিতেই নিম্ন ইরাকের মৌসুমী বাতাস, "সাইমুন" আরম্ভ হইল। পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম সাইমুন বহিতে আরম্ভ হইলে দিবাভাগের প্রচণ্ড উত্তাপের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। আমরা খোলা মাঠে তাঁবুতে থাকিতাম বলিয়া ইহা বিশেষ বুঝিতে পারিতাম না। যখন সাইমুনের ঝড় বহিত, তখন সমস্ত ছাউনি আবৃত করিয়া বালি উড়িত। আমাদের তাঁবুর বাহিরে উনান কাটিয়া রন্ধন করিতে হইত, ঝড়ের জন্য তাহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। খাদ্যদ্রব্যে বালির মাত্রা এত বেশী থাকিত যে আহারের সময় কেহ চিবাইয়া খাইতে সাহস করিত না। রাত্রে বাতাসের বেগ অল্প থাকিত বলিয়া আমরা এখন হইতে রাত্রেই তাহার পর দিনের আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম।

রন্ধনের জন্য আমাদের প্রতি জনকে এক পাউণ্ড হিসাবে যে জ্বালানি কাঠ দেওয়া হইত তাহা বাতাসে এত শীঘ্র পুড়িয়া যাইত যে তাহাতে আমাদের পাক হইয়া উঠিত না। রণদাপ্রসাদ প্রমুখ অল্পবয়স্করা সুবিধা পাইলেই মাঠ হইতে কাঁটা ঝোপ সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং তাহা দ্বারা আমরা জ্বালানি কাঠের অভাব পূরণ করিতাম। আজিজিয়া থাকিতে আমাদের ছত্রিশজনের জন্য প্রতিদিন দুইটি করিয়া পারস্য দেশীয় পার্ব্বত্য ছাগ আহার করিতে পাইতাম। কমিসারিয়েট হইতে প্রথামত চাল, আটা, ঘি, গুড়, চা, লবণ, মশলা প্রভৃতি পাইতাম। মসলার মধ্যে কেবল রসুন ও লঙ্কা। মধ্যে মধ্যে সে দেশের কফির বীজ আমাদের দেওয়া হইত; আমরা তাহা তাওয়ায় সেঁকিয়া গুঁড়া করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতাম। কখন কখন "ওয়ার গিফ্‌ট" হইতে আমরা পরিষ্কার চিনি পাইতাম। ইহা ব্যতীত ক্যানটিন বা ভ্রমণশীল দোকান হইতে আমরা টিনে রক্ষিত মাছ, মাংস, মাখন, জ্যাম, বিস্কুট, সিগারেট প্রভৃতি যথেচ্ছা ক্রয় করিতে পাইতাম। নদীতে যথেষ্ট মাছ ছিল, আমরা প্রায়ই কাপড় ছাঁকা দিয়া প্রচুর ট্যাংরা ও মৌরলা মাছ ধরিতাম; কখন কখন বেদুইনেরা মাছ বিক্রয় করিতে আসিত। এ দেশের মুসলমানেরা আঁষবিহীন মাছ আহার করে না বলিয়া বোয়াল, আইড় ও ট্যাংরা অতি অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যাইত। এক প্রকার বৃহৎ আকারের মাছ পাওয়া যাইত, দেখিতে আমাদের দেশের মহাশোলের ন্যায়। সাহেবেরাও ইহাকে "মাহা শিয়ার" বলিতেন—কিন্তু মহাশোলের সুস্বাদ ইহাতে নাই। এ দেশে মৃগেল মাছই বড় মাছের মধ্যে প্রধান মাছ। রুই অথবা কাৎলা পাওয়া যায় না। ছোট মাছের ভিতর ট্যাংরা, পুঁটি, মৌরলা, খয়রা, বাটা প্রভৃতি মাছ দেখিয়াছি। নদীতে বোয়ালের সংখ্যাই যেন বেশী বলিয়া বোধ হয়। বসরার নিকটবর্ত্তী স্থানে ইলিস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা একেবারে বিস্বাদ।

এল্-কুট্-নিয়াতে আমাদের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সামান্য অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, অন্যান্য সিপাহীদের নিকট ও অ্যাম্বুলেন্সের গোরাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধ সমূহের গল্প শুনিয়া তাহা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতাম। কাপ্তেন

ম্যাক্‌রেডি চম্পটী বাবুর নিকট এ সম্বন্ধে গল্প করিতেন।

এল্‌-কুট্‌নিয়ার ব্যাপারের কিছু দিন পরেই ছাউনিতে বেশ একটু ব্যস্ততার ভাব দেখা দিল। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী ট্রান্সপোর্ট পার্কের গাড়ীগুলি একদিন বৈকালে পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। ইহার দু'দিন পর কর্ণেল আদেশ দিলেন যে আমাদের শীঘ্রই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; কতদিনের জন্য এবং কতদূর যাইতে হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। বাহিনীর গতি যতদূর সম্ভব দ্রুত করিবার জন্য ট্রান্সপোর্ট কার্টগুলি হাল্কা করিয়া বোঝাই করিতে হইবে এবং সেই জন্য অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র ছাড়া আমরা অন্য কিছু সঙ্গে লইতে পারিব না। আমরা আমাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি গ্রাউণ্ড শীটে বাঁধিয়া ইঞ্জিনিয়ারদের আড্ডায় রাখিয়া দিলাম। কিট্‌ব্যাগ গুলি, একটি সার্ট, একজোড়া হাফপ্যান্ট, একখানা তোয়ালে, সাবান এবং টিনের কৌটায় রক্ষিত খাদ্য দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া লইলাম। তাঁবু দুটি বাহিনীর সহযাত্রী একটি ষ্টীমারে উঠাইয়া দিলাম।

মেজর জেনারেল স্যর চার্লস্‌ টাউনসেণ্ড

১৫ই নভেম্বর (১৯১৫) প্রাতে আমরা অগ্রসর হইবার আদেশ পাইলাম। আমাদের জন্য আনীত ট্রান্সপোর্ট দুই খানির একটিতে আমাদের কিট ব্যাগ গুলি শক্ত করিয়া বাঁধিলাম, কারণ সেগুলি পথে আবশ্যক হইবে না। অন্য গাড়ীতে আমাদের কম্বলগুলি, রসদের থলি ও জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষে বোঝাই করিলাম। আমাদের হাভারস্যাক্‌ বা ঝোলায় গেঞ্জি, তোয়ালে, কামাইবার সরঞ্জাম, নোটবুক, পেন্সিল, ছুঁচ, সুতা, বোতাম, কাঁচি, রঙ্গিন চশমা ও একদিনের উপযোগী খাদ্যপূর্ণ মেসটিন থাকিত। কুচের সময় আমরা বাম দিকে হাভারস্যাক ও ডানদিকে জলের বোতল ঝুলাইয়া চলিতাম। মেসোপটেমিয়ার প্রখর সূর্য্যরশ্মি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের রঙ্গীন চশমা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু ইহার লোহার ফ্রেম রৌদ্রে এত গরম হইয়া উঠিত যে আমাদের পক্ষে সেগুলি ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল। পথ পর্য্যটনের ক্লেশ লাঘব হইবে বলিয়া আমরা সকলেই সঙ্গে কিছু লজেঞ্জ রাখিতাম। হাঁটিতে হাঁটিতে সেগুলি চুষিলে শ্রমের অনেকটা লাঘব হইত। এ উপদেশ আমরা আ-মারার কর্ণেল নটের নিকট পাইয়াছিলাম।

বৈকাল তিনটার সময় আমরা আজিজিয়া পরিত্যাগ করিলাম। বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর যে বহুদূরব্যাপী

নায়েক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

বস্ত্রাবাসের ছাউনি পড়িয়াছিল তাহা এখন অদৃশ্য হইয়াছে। ষ্টীমার, মেহালা, বোট ও ছোট নৌকা গুলিও চলিয়া যাওয়াতে নদীটিকেও অত্যন্ত নগ্ন দেখাইতেছিল।

আজিজিয়ায় একটি ক্ষুদ্র সিপাহীর দল রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। আজিজিয়া ও বোগ্‌দাদের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে তুর্কিরা অবস্থান করিতেছিল। প্রধান সেনাপতি নিক্‌সন্, ষষ্ঠ সংখ্যক পুণা বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল টাউনসেণ্ডকে ঐ তুর্কি বাহিনী আক্রমণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, আমরা সেই আক্রমণে অগ্রসর হইতেছি।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

শিকার ও শিকারী

কোন্ শিকার কোথায় পাওয়া যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাম্বর ও সোয়াম্প ডিয়র।

'কাশ্মীর ষ্ট্যাগ' নামক এক জাতীয় হরিণ ব্যতীত, সাম্বর ও 'সোয়াম্প ডিয়র' ভারতবর্ষের বিবিধ শ্রেণীর হরিণের মধ্যে, দেহ ও শৃঙ্গ-সৌষ্ঠবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

সাম্বরকে কোন কোন স্থানে সাবর, সম্বর ও আমাদের দেশে গাউজ বলে; এবং সোয়াম্প ডিয়রকে 'বারশিঙ্গা' বলে। ইহাদিগকে গারো পাহাড় টেরাই ও আসামে প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু সাম্বর যুক্ত-প্রদেশ, নাগপুর, উড়িষ্যা ও অন্যান্য পার্ব্বত্য দেশেও দেখা যায়। শুনিতে পাই, অযোধ্যার কোন কোনও বনে 'বারশিঙ্গা' দলবদ্ধ হইয়া থাকে।

এই উভয় জাতীয় হরিণই আকারে 'পোনি' ঘোড়ার মত। তবে সাম্বর, সোয়াম্প ডিয়র অপেক্ষা কিছু বড় ও অধিকতর বলশালী হয়। সোয়াম্প ডিয়রের গলা সাম্বর অপেক্ষা সরু ও লম্বা হয়।

সাম্বর গুলির বর্ণ ফ্যাকাসে কালো এবং সোয়াম্প ডিয়র গুলি হরিদ্রা বর্ণের হয়। হরিণ মাত্রেই বৎসরান্তে একবার করিয়া লোম ও শিং ঝড়িয়া ফেলে। পুরাণো লোম বদলাইলে, প্রথম প্রথম বারশিঙ্গার রং খুব চক্‌চকে হলদে দেখায়; তখন ইহাদিগকে দেখিলে রামায়ণের স্বর্ণমৃগের কথা মনে পড়ে। ইহারা দেখিতে সাম্বর অপেক্ষা অনেক সুন্দর। ইহাদের শিংএ অনেকগুলি ভাগ হয় বলিয়া, ইহাদিগকে বারশিঙ্গা বলে

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

এবং কোন কোন স্থানে ঝাঁকালও বলিয়া থাকে। সাম্বর বা সাবরের শিং অপেক্ষাকৃত মোটা ও তিন ডালবিশিষ্ট হয়। কোন কোন সাম্বর একটু বেশী কালো ও বড় হয়, সেগুলিকে আমাদের দেশে 'কালোয়ার গাউজ' বলে। ইহাদের, এবং সোয়াম্প ডিয়রের মাদী গুলিকে 'ঢ্লানি' বা 'লাড়ী' বলে। অনেক সময় ইহাদের উভয় শ্রেণীকে একই জঙ্গলে দেখা গেলেও, সাম্বর সাধারণতঃ শুষ্ক ও পাহাড়ী জঙ্গল, এবং বারশিঙ্গা জলা ও বিলের ধারের জঙ্গল পছন্দ করে।

চলাফেরা করিবার সময়, ইহাদের বৃহদাকার শৃঙ্গগুলি বনে আটকাইয়া যায় বলিয়া, সর্ব্বদাই ইহারা মুখ উঁচু করিয়া শিং পিঠে লাগাইয়া চলে। এ জন্য বনের ঘর্ষণে গলার কতক স্থানের লোম উঠিয়া যায়। সাম্বর বর্ষা অন্তে ও বারশিঙ্গা শীতের সময় শিং ঝাড়ে। ইহাদিগকে পুষিলে প্রতি বৎসরই এক জোড়া করিয়া শিং পাওয়া যায়।

ইহাদের উভয় শ্রেণীরই, প্রথম শৃঙ্গোদ্গমের সময় এক ডাল করিয়া হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বারশিঙ্গার প্রতিবৎসরই একটী করিয়া ডাল বাড়িয়া যৌবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সাম্বরের ডাল বৃদ্ধি হইয়া তিনটীর অধিক আর হয় না। ইহার পর শিং মোটা ও আকারে বড় হইতে থাকে।

সাম্বরকে শীতকালে ও বারশিঙ্গাকে বর্ষাকালে সচরাচর দেখা যায়। সাম্বর শীতান্তে ও বারশিঙ্গা বর্ষান্তে, অধিকাংশই পাহাড়ে উঠিয়া যায়। সাম্বরের পুরুষ গুলি (stags) গরম সহ্য করিতে পারে না বলিয়া, মহিষের মত অনেক সময় গা ডুবাইয়া "গারি নিতে" ভালবাসে। এ জন্য অনেক সময়ই ইহাদের গায়ে কাদা দেখা যায়। মাদী (hind) গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

বর্ষার প্লাবনে, বনের মধ্যে প্রচুর জল হইলেও 'বারশিঙ্গা' জলেই থাকে। এমন কি, ডুব জল না হইলে কোমর কি গলা জলেও ইহাদিগকে থাকিতে দেখা যায়। তাড়া পাইলে এইরূপ জলেও এত দ্রুত লাফাইয়া যায় যে, ইহাতে ইহাদের কোন কষ্ট হইতেছে, বলিয়া মনে হয় না। ডাঙ্গায় ঘন বনে সাম্বর যেরূপ জোরে দৌড়ায়, ইহারাও জলে ঠিক্ সেইরূপই যায়। জলে থাকার দরুণ, ইহাদের গায়ে অনেক সময় জোঁক লাগিয়া থাকে। জোঁকের তাড়নায় অস্থির হইলে ইহারা জোঁক কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, সময় সময় দুই একটা খাইয়াও থাকে। আমি শিকার করিয়া ইহাদের ২।১ টার গলার ভিতর, জোঁক পাইয়াছি।

ইহাদিগকে Big bore rifl দিয়া শিকার করাই বিধেয়। ইহাদের মর্ম্মস্থলে আঘাত করা না গেলে, সহজে এক গুলিতে পড়িতে চায় না। বিশেষতঃ stag গুলিকে হাওদার উপর হইতে এক গুলিতে আট্কানো (stop) বড় কঠিন। হাওদা-শিকারে দৌড়ের সময়, ঘন বনের মধ্যে পশ্চাৎ হইতে ইহাদিগকে আব্ছায়ার মত দেখা যায় বলিয়া, মর্ম্মস্থল ঠিক্ করিয়া নিশানা করা বড় কঠিন। হাঁটা শিকারে সে অসুবিধা হয় না।

গো মহিষাদির ন্যায়, ইহারাও বৎসরে একটী করিয়া বাচ্চা প্রসব করে। 'বাচ্চা' গুলি প্রথম প্রথম সাদা 'ফুটি' যুক্ত ও স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা কিছু ফ্যাকাশে হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মাদি হরিণের শিং হয় না; হরিণেরও ২।৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিং হয় না। বাঘ যেমন, নখ ভোতা হইয়া গেলে, গাছে আঁচড়াইয়া ধারালো করে, ইহারাও সেইরূপ গাছে ঘষিয়া শিং চোখা করে। আরও এক কারণে ইহারা গাছের সঙ্গে শিং ঘসে। শিং উঠিবার সময় উহা চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে; উহাকে 'চাম শিঙ্গা' (Velvet Horn) বলে। ভিতরকার শিং শক্ত হইয়া গেলে, চুলকায় বলিয়া গাছে ঘষিয়া, উপরের চামড়া উঠাইয়া ফেলে।

জঙ্গলে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া খেলা করিতে ভালবাসে। বনের মধ্যে একটী স্থান মনোনীত করিয়া, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দলে দলে আসিয়া খেলা করে। ঐ স্থানকে 'খলা' বলে। এই সব 'খলা'র নিকট বিকালে চুপ করিয়া লুকাইয়া থাকিয়া, অথবা

সুবিধাজনক কোনও গাছে মাচা করিয়া বসিয়া, অনায়াসেই ইহাদিগকে শিকার করা যায়। আমি ঐরূপ মাচায় বসিয়া, ইহাদিগের খেলার দৃশ্য দেখিয়া এত অভিভূত হইয়া পড়িতাম যে, আমার শিকারের প্রবৃত্তি দূর হইয়া যাইত। কোনও সময় ২।৩টী একত্র হইয়া খেলা করে, কেহ কাহারো গাত্র লেহন করে, কেহ বা আনন্দে লাফাইতে থাকে। কোন কোনও সময়, দুইটা একত্র হইয়া শিংএ শিংএ ঘষাঘষি করিয়া, বেশ এক প্রকার খট্ খট্ শব্দ উৎপাদন করে; আবার কখনও বা দুই দিক হইতে দুটী stag ডাকিতে ডাকিতে আসিয়া, পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়।

রাত্রে হাতীতে চড়িয়া, কালো কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, বন্দুক হাতে আস্তে আস্তে বনের মধ্যে গেলে, অনেক সময় অতি সহজেই হরিণ শিকার করা যায়। এই অবস্থায় হাতীকে না চালাইয়া, হাতী যেন স্বেচ্ছাক্রমে বনে চরিতেছে এই ভাবে, আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে হয়। হাতী অতি নিকটে গেলেও, হরিণগুলি হাতীর দিকে বেকুবের মত হাঁ করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বোধ হয় ইহারা মনে করে, হাতীগুলিও ইহাদের মতই চরিয়া বেড়াইতেছে।

রাত্রে ইহারা ২৩ বা ৪টী মিলিত হইয়া, বনের মধ্যে ফাঁকা যায়গায়, অথবা বিলের ধারে কচি ঘাস খাইতে প্রায়ই আসে; তখনও ইহাদিগকে শিকার করা যায়। বনের নিকটবর্ত্তী শস্য ক্ষেত্রেরও ইহারা যথেষ্ট অনিষ্ট করে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘাস ছাড়া, ইহারা কখনও খায় না।

ইহারা বড়ই ভীত জন্তু, কিন্তু আহত হইলে কদাচিৎ চার্জ্জও করে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। পলায়নই ইহাদের স্বভাব।

হরিণী মারা পড়িলে, কোন কোনও সময় পেটে ভ্রূণ (বাচ্চা) পাওয়া যায়; তাহা হলুদ মাখাইয়া শুকাইয়া রাখা হয়। এগুলি নাকি সূতিকা প্রভৃতি অনেক রোগের ঔষধ। ইহাকে 'গর্ভ শোরা'ও বলে। যদিও আমি কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, কিন্তু সর্ব্বদাই ইহার জন্য অনেক প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠিক এইরূপ বাঘের চর্ব্বি ও জিভের জন্য সর্ব্বদাই লোকে জ্বালাতন করে। এই চর্ব্বিতে বাত এবং জিভে প্লীহা রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। অনেক কবিরাজ মহাশয়ও একথা বলিয়া থাকেন। শিকারান্তে আমরাও প্রতিবারই এগুলি প্রচুর পরিমাণে আনিয়া বিতরণ করি।

এই সব বৃহৎ জাতীয় হরিণের মাংস ছোট জাতীয় হরিণের মাংসের ন্যায় সুখাদ্য নয়। বড় হরিণের চামড়াগুলি Tannery হইতে leather করিয়া আনিলে অত্যন্ত নরম ও সুন্দর হয়। ইহাদ্বারা জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি আবশ্যক জিনিষ তৈয়ার করা যায়; তাহা অতি সুশ্রী হয়।

স্পটেড্ ডিয়র (চিতল), হগ্ ডিয়র ও বার্কিং ডিয়র।

সাবর ও বারশিঙ্গার পরেই চিতল (spotted deer) আকারে ও উচ্চতায়, অন্য হরিণ অপেক্ষা বড় হয়। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে সাদা ফুটি থাকে বলিয়া, ইহাদিগকে spotted deer বলে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, মাংসও সুস্বাদু। ইহাদের বাঙ্গলার সুন্দর বন, নেপাল ও ভূটান, টেরাইর কোন কোন স্থান, যুক্ত প্রদেশ, নাগপুর, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য বহু স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহারা সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া থাকে। দলের অধিকাংশই হরিণী (Doe), দুই তিনটী মাত্র হরিণ (Buck) থাকে। ঘাস-জঙ্গল অপেক্ষা গাছড়া-জঙ্গলে ইহারা থাকিতে ভালবাসে। ইহাদের শিং সাবরের শিঙের মত তিন ডাল বিশিষ্ট, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু হয়। কদাচিৎ দুই একটা এত মোটা দেখা যায় যে, সাবরের শিং বলিয়া ভ্রম হয়। সাবর

ও চিতলের শিং চিনিবার একটী উপায় এই যে, সাবরের শিং পার্শ্বদেশ হইতে ও চিতলের শিং পশ্চাৎ দিক হইতে বক্র (curved) হয়।

ইহাদিগকে ছোট রাইফল্ দ্বারা ও নিকটে পাওয়া গেলে Buck shot এ smooth bore gun দ্বারাও শিকার করা যায়।

হগ ডিয়র ও বার্কিং ডিয়র, চিতল অপেক্ষা আকারে ছোট। ইহাদের শিংও ছোট এবং তিন ডাল বিশিষ্ট হয়, কিন্তু দেখিতে বেশ সুশ্রী।

হগ ডিয়র বাঙ্গলা, আসাম, নেপাল টেরাই ও অন্যান্য অনেক স্থানে দেখা যায়। ইহারা শুষ্ক স্থানে খড় ও ঘাস জঙ্গলে থাকিতেই বেশী পছন্দ করে।

বার্কিং ডিয়র আবার হগ ডিয়র অপেক্ষাও ছোট। ইহারা সমতলভূমি অপেক্ষা পাহাড়ী জঙ্গলে থাকিতেই বেশী ভালবাসে। এগুলির মুখের দুই দিকে দুইটী canine teeth (সাদন্ত বা কুকুরে দাঁত) বাহির হয়। দিবারাত্রির মধ্যে অনেক সময় ইহারা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া, নিস্তব্ধ পাহাড় প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে; এজন্য ইহাদিগকে বারর্কিং ডিয়র বলে। আমাদের অঞ্চলে ইহাদিগকে 'খাটুয়া' হরিণ বলে।

হগ ডিয়র গুলির দৌড়াইবার প্রণালী অনেকটা শূকরের মত। তাড়া পাইলেই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, শূকরের মত মাথা নিচু করিয়া, যে যেদিকে পারে দৌড়ায় বলিয়া ইহাদিগকে হগডিয়র বা শূকরা হরিণ বলে। হাতীর লাইনে ইহারা শতকরা সত্তর আশিটা লাইন ভেদ (cut) করিবার চেষ্টা করে। ইহাই অন্য হরিণের তুলনায় ইহাদের বিশেষত্ব।

আমাদের দেশে গারো পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে ও "হুদং এর ধল" নামক বহুদূর বিস্তীর্ণ উলুখড়-পূর্ণ বনে প্রচুর হগডিয়র পাওয়া যায়। হাওদা শিকারীদের পক্ষে বড় হরিণ শিকার অপেক্ষা থলের এই সব ক্ষুদ্রকায় হরিণ যখন নক্ষত্র বেগে দৌড়াইয়া যায় তখন রাইফল্ দ্বারা শিকার করা অত্যন্ত বাহাদুরী ও আনন্দদায়ক।

নেপাল টেরাইতে কুশী (কৌশিকী) নদীর চরে ইহারা এত অধিক থাকে যে, হাতী লাইন করিয়া ইহাদিগকে নদীর দিকে তাড়াইয়া নিলে এক এক স্থানে হাতীর বেড়ের মধ্যে পাঁচ সাত শতও পড়িতে দেখা যাইত। আমাদের ঐ স্থানে শিকারের সময় হাতী লাইন করিয়া হরিণগুলিকে যখন নদীর দিকে কোণঠাসা করা হইত, তখন ইহাদের কতকগুলি স্থানাভাব ও ভীতি প্রযুক্ত হাতীর পায়ের তলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া যাইত, কতক বা নিরুপায় হইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ দিত; আবার কতক বা পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে (collision) শূন্যে উত্থিত হইয়া আছড়াইয়া পড়িত। এইরূপে আমরা প্রত্যহ ঘণ্টা খানেক শিকার করিয়া চার পাঁচ দিনে তিন শত সাড়ে তিন শত হরিণ মারিয়াছিলাম। এই ভাবে মারাকে নেহাৎ কসাইগিরি (Butchery) মনে করিয়া, আমি দুই একটী মারিয়াই হাওদায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, আমার বন্ধু শিকারীদের রক্তপিপাসা নিবৃত্তির তামাসা দেখিতাম। হঠাৎ যদি কোনও সময় বলিতাম, আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে, তখনই কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেন, "পয়সা দিয়া গুলি বারুদ কেনা হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই তো?" এই ভাবে massacre করাকে, গুলি বারুদের সদ্ব্যবহার বলে কি না তাহা তাঁহারাই ভাল বুঝিতেন।

ইহারা ছোট জাতীয় হরিণ বলিয়া ২নং বা B. B. shots দিয়াও শিকার করা চলে।

অন্যান্য সমস্ত জাতীয় হরিণ অপেক্ষা ইহাদের মাংস সুখাদ্য।

এতদপেক্ষাও ছোট আর এক জাতীয় হরিণ আছে; তাহাদিগকে mouse deer বলে। ইহারা আকারে 'সজারু' অপেক্ষা বড় হয় না; পিঠে শাদা শাদা লম্বা ডোরা থাকে। বাঙ্গলা ও আসামে ইহাদিগকে কখনও দেখি নাই; নাগপুর ও উড়িষ্যা প্রভৃতি

পার্ব্বত্য প্রদেশে, পাহাড় beat করিবার সময়, সর্ব্বদাই ইহাদিগকে দেখিয়াছি।

নীলগাই, ব্ল্যাক বাক্ ও চিকারা।

নীল গাই, ব্লাক বাক্ (কৃষ্ণষাঁড়) ও চিকারা, antelope শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে হরিণের শ্রেণীভুক্ত করেন না। নীল গাইকে অনেকে গো জাতীয় মনে করিয়া শিকার করেন না। বোধ হয় ইহাদের গরুর সহিত কতকটা আকৃতিগত সাদৃশ্য, ও 'গাই' শব্দ নামের সহিত যুক্ত থাকাতেই, এইরূপ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা অত্যন্ত ভুল। ইহাদের আকৃতি ও শিং অনেকটা গবাদি জন্তুর মত হইলেও, কিছুতেই ইহারা ঐ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। তিনটী বিশেষ লক্ষণে ইহারা গবাদি হইতে বিভিন্ন। (১) ইহারা গোময়ের মত নাদি না করিয়া, ছাগল হরিণের মত বড়ি নাদি করে। (২) গরুর গলার নীচে যেরূপ গলকম্বল থাকে, ইহাদের তাহা থাকে না। (৩) ইহাদের পুরুষগুলির গলার নীচে, চামরের মত কতকগুলি লম্বা লোম থাকে। অন্য কিছু পার্থক্য আছে কি না তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ভাল জানেন।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। এক এক দলে ২০।২৫ টা হইতে ১০০।১৫০ শতও আমি দেখিয়াছি। ইহারা সাবরের সমান উঁচু হয়।

আমি চুনারে থাকা সময় গঙ্গার পরপারে মাঝড়া নামক স্থানের বিস্তীর্ণ 'বাব্লা' ও 'কশাড়' বনে. ইহাদিগকে বিস্তর শিকার করিয়াছি। সেই সব স্থানে ইহাদিগকে এক এক দলে ২০।২৫ ট হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০।১৫০ শত পর্য্যন্তও দেখিয়াছি। ঐ সব স্থানে ইহাদিগকে 'রুঝ্' বলে। সম্বলপুর ও উড়িষ্যার কোন কোন স্থানে ইহারা শুধু 'নীল' নামে পরিচিত। ইহাদের পুরুষগুলি যখন গলা উঁচু ও বুক টান করিয়া দাঁড়ায়, তখন অতি মনোরম দেখায়। শীতের প্রারম্ভে ইহারা বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া চলিয়া আইসে, আবার বর্ষার প্রারম্ভে জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপন বাসস্থানে ফিরিয়া যায়।

নীল গাই, কৃষ্ণষাঁড়, চিকারা প্রভৃতি বাঙ্গলা ছাড়া প্রায় অনেকস্থানেই পাওয়া যায়। কৃষ্ণষাঁড় গুলি প্রায়ই মাঠে মাঠে থাকে; মাঠের তৃণ ও বিবিধ ফসলই ইহাদের খাদ্য। ইহারাও দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। সময় সময় ইহাদের মর্দ্দা গুলিকে 'ফেটো' অবস্থায়ও পাওয়া যায়; তাহারা দলের সঙ্গে মেশেনা।

দলবদ্ধ অবস্থায় মাদীর (Doe) সংখ্যাই অধিক থাকে; মর্দ্দা (Buck) ২।৩ টার বেশী থাকে না। হরিণের মত ইহাদেরও মাদী গুলির শিং হয় না। মর্দ্দা গুলির শিং ঘোরানো ঘোরানো অর্থাৎ স্ক্রুপের মত প্যাঁচ কাটা এক ডাল বিশিষ্ট হয়। হরিণের মত ইহারা বৎসরান্তে শিং ঝাড়িয়া ফেলে না। ইহাদের যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গোদ্গম হইয়া, ক্রমে বড় হয় এবং তাহাই চিরকাল থাকে। মাদী ও অল্পবয়স্ক পুরুষ গুলির পেটের রং সাদা ও পিঠের রং প্রথমে পাটকিলে (Brown) থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মর্দ্দা গুলির পিঠ, মুখ ও গলার রং পরিবর্ত্তিত হইয়া চক্‌চকে কালো হয়; তখন ইহাদিগকে অতি সুন্দর দেখায়। অনেক সময় একই দলে একটী অল্পবয়স্ক ও একটী প্রাচীন, দুই বর্ণের দুই টী কৃষ্ণষাঁড় দেখিয়া অনেকে বিভিন্ন জাতীয় মনে করেন। বাস্তবিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রঙের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র; নচেৎ ইহারা একই জাতীয়। মাদী গুলির রঙের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আমি দুই এক স্থানে ২।১টী পালিত দুগ্ধশুভ্র কৃষ্ণষাঁড় দেখিয়াছি। তখন উহাদিগকে আমি বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া মনে করিতাম; বাস্তবিক তাহা নহে। মানুষের শ্বেত (Leucoderma) রোগের মত ইহারাও Albino হইয়া এইরূপ হয় এবং চক্ষুও অনেকটা রক্তবর্ণ দেখায়। এই ব্যারাম হইলে, বর্ণ পরিবর্ত্তন ও চক্ষু লাল হওয়া ব্যতীত, অন্য কোনও রোগচিহ্ন দৃষ্ট হয় না।

কৃষ্ণষাঁড়গুলি খোলা মাঠে দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার সময়, বহুদূর হইতে দেখা যায় বলিয়া, ২।৩ টা ইহাদের প্রহরীর কার্য্য করে। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়,

দলস্থ সকল গুলি শুইয়া বিশ্রাম করিতে থাকিলে ২।১ টী দাঁড়াইয়া পাহারা দেয়।

ইহাদের দলস্থিত কোনও একটী হত বা আহত হইলে, অন্য গুলি ক্রমাগত একই স্থানে মুখ উঁচু করিয়া উপরের দিকে লাফাইতে থাকে। এইরূপ তিন চারটী লাফ দিয়া পরে দৌড়াইতে সুরু করে। হঠাৎ কোথা হইতে আক্রান্ত হইল, তাহা দেখিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহারা আক্রান্ত হইয়াই আতঙ্কে লাফাইবার সময় প্রথমে মনে করে যে খুব বেশী দৌড়াইতেছে; চার পাঁচ বার লাফাইবার পর ভ্রম বুঝিতে পারিয়া দৌড়াইতে সুরু করে।

কৃষ্ণষাঁড় antelope শ্রেণীভুক্ত হইলেও, প্রাচীন যুগ হইতেই ইহারা হিন্দুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ইহাদের চর্ম্ম ব্যতিরেকে, ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার হইতেই পারে না।

চিকারা, কৃষ্ণ ষাঁড় অপেক্ষা আকারে ছোট। ইহাদিগকে মাঠে বড় দেখা যায় না; পাহাড়েই দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। ইহাদের শিং কৃষ্ণষাঁড় অপেক্ষা সরু ও সোজা এবং সম্মুখে বহু গ্রন্থিযুক্ত হয় বলিয়া ঢেউ খেলানো মত দেখা যায়। শিং গুলি ছোট হইলেও দেখিতে বেশ সুন্দর। কোন কোন স্থানের চিকারার সম্মুখে, ছোট ছোট আরও দুইটী করিয়া শিং হয়। উহাদিগকে Four horned (চারি শিঙ্গা) চিকারা বলে। ইহাদিগকে আমি মির্জ্জাপুর জিলায় বিন্ধ্য পর্ব্বতে অসংখ্য শিকার করিয়াছি।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

দেবতা

ওগো ও দেবতা প্রিয়!
আমার নয়নে দাঁড়াইলে আসি
এ কি রূপে কমনীয়!
নয়নে তোমার কি আলোক-ধারা
উছলে করুণা ধারে
রাগিণী তোমার, মর্ম্মে মর্ম্মে
ঝঙ্কৃছে বারে বারে।
জীবনে'র শ্রেয়ঃ ধন!
আমার জীবনে নব নব রূপে
আসিতেছ ক্ষণে ক্ষণ।

ওগো ও পরশমণি!
পরশি তোমারে লৌহ এ তনু
হ'ল যে স্বর্ণ খনি!
আমার অঙ্গে জড়ায়েছ তব
সৌরভ সুমধুর
মরম-বীণায় বাজাতেছ শুধু
তোমারি একটি সুর।
হে মোহন যাদুকর!
একটি নিমেষে কি মন্ত্র পড়ি
মোহিয়াছ অন্তর।

একাধারে হলে সব—
পুত্র ভ্রাতা ও স্বামী সখা পিতা
গুরু তুমি দুর্লভ!
নয়নে নয়নে তোমারে নেহারি,
জীবনে মরণে দেখি,
মোর হৃদয়ে'র যা কিছু সকলি
হরিয়া লইলে এ কি!
রিক্ত-হৃদয়ে এসে
শূন্যতা পুরি আপনি বসেছ
উজ্জ্বল রাজ-বেশে।

শ্রীরাধারাণী দত্ত।

প্রাচীন য়ুরোপীয় নৃত্যপ্রথা

(১৮৫৩ খৃঃ প্রকাশিত, Read's Characteristic Dances of all Nations গ্রন্থ হইতে)

প্রাচীন ইংলণ্ডের মে-পোল নৃত্য

স্কটলাণ্ড। হাইলাণ্ড নৃত্য

আয়রল্যাণ্ড। জিগ নৃত্য

মানসিংহ ঝালা

রাজপুত কুল-গৌরব, ভারতের আদর্শ বীর মহারাণা প্রতাপসিংহের নাম ভারত-ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার পবিত্র চরিত্র পাঠে আজও আমাদের শিরায় শিরায় শোণিতের প্রবল উচ্ছ্বাস বহে; সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, অতীতের লুপ্তগৌরব স্মরণ করিয়া, চোখ জলে ভরিয়া উঠে। ভারতের সেই দিনগুলি কি সুখের, কি মহিমার, কি গৌরবেরই ছিল! ভারত সম্বন্ধে এমন অল্প ইতিহাসই আছে, যাহাতে কোন না কোন বিষয়ে রাণাপ্রতাপের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু যাঁহারা রাণার ঘোর দুর্দ্দিনে, নিজেদের সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রতাপের দুঃসহ দরিদ্রতাকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা কোনও ইতিহাসেই বিশদ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। রোহিদাস, রামসিংহ, জয়সিংহ, গোবিন্দসিংহ, সংগ্রামসিংহ, ভীমসাহা প্রভৃতি রাজপুত সর্দ্দারগণ তাঁহাদের রাজার জন্য সর্ব্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, রাণার সুখেই তাঁহারা সুখী ছিলেন। এই বীর সর্দ্দারগণের রাজভক্তি, সম্পদে-বিপদে রাণাকে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ঘেরিয়া রাখিয়াছিল; এই রাজভক্ত সর্দ্দারগণের মধ্যে বড় সাদড়ী অধিপতি মানসিংহ ঝালা অন্যতম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রতাপের ন্যায় তাঁহার সহযোগী কোনও রাজপুত সর্দ্দারের জীবনী, কোন ইতিহাসেই বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের জীবনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জানিবার কোন উপায়ই এখন আর নাই। মহাত্মা টডের রাজস্থান ব্যতীত অন্য কোন ইতিহাসেই মানসিংহ ঝালার স্পষ্ট নামোল্লেখ নাই, রাজস্থানে যাহা আছে তাহাও অতি অল্প; রাজস্থানে হলদিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রের অধ্যায়েই মানসিংহকে আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই. আর তাঁহার জীবনদীপ এই হলদিঘাট সমরক্ষেত্রেই নির্ব্বাপিত হয়!

রাজরাণা মানসিংহ ঝালা
(বড়সাদড়ীর বর্ত্তমান রাজরাণার অনুগ্রহে প্রাপ্ত)

যখন সম্রাট্ আকবরের আদেশে অম্বরাধিপতি মানসিংহ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ মেবার আক্রমণের উদ্দেশ্যে উদয়পুরাভিমুখে অগ্রসর হন, তখন রাণা প্রতাপ মাত্র বাইশ সহস্র রাজপুত সৈন্যসহ গুধুঁদে (১) হইতে

(১) হিন্দী সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক, স্বনামধন্য ঐতিহাসিক, মেবারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী সম্পাদক মুন্সী দেবীপ্রসাদ মহাশয় বলেন যে, "হলদিঘাটের স্মরণীয় যুদ্ধে, অম্বরপতি মানসিংহের পাঁচ সহস্র এবং রাণার মোটে তিন সহস্র

মানসিংহের গতিরোধার্থে গমন করেন। সম্রাট্ যেমন তাঁহার হিন্দু সেনাপতিগণের শক্তি ও সাহসের উপর পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, মহারাণাও তেমনি তাঁহার মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষের শৌর্য্য-বীর্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। এই অভিযানে, অর্দ্ধেক সৈন্যের পরিচালন ভার মহারাণা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অর্দ্ধেক সৈন্য হকিম সুর (২) পরিচালন করিয়াছিলেন। সম্বৎ ১৬৩২, শ্রাবণ মাসের শুক্লা-সপ্তমীর দিন, হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। (৩) যখন রণোন্মত্ত রাণা অসংখ্য মোগলসেনা ধরাশায়ী করিয়া, শাহজাদা সেলিমের সম্মুখীন হইলেন, তখন তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। সেলিম হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে মহারাণা এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন যে, অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ তিনি অগণিত মোগল-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। রাণার খড়্গাঘাতে শাহজাদার হস্তিচালক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অবস্থা বুঝিয়া শাহজাদা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। রাণার অসমসাহসিকতায়, অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশলে অসংখ্য মোগলসৈন্য মৃত্যুপথের যাত্রী হইল; রাজপুত সর্দ্দারগণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ফলে ১৪ হাজার রাজপুত সৈন্য দেখিতে দেখিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। রাণার চারিদিকে শত্রুসৈন্য, সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত, তবু তিনি প্রাণপণে ভল্ল ও অসি চালনা করিতেছিলেন। কিন্তু অসংখ্য সৈন্যের সহিত একা প্রতাপ কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারেন? তাঁহার মস্তকে রাজচিহ্ন দেখিয়া মোগলসৈন্যগণ তাঁহাকে আহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাণার শরীর লক্ষ্য করিয়া একজন মোগল সৈন্য তরবারি উত্তোলন করিল; মুহূর্ত্তের বিলম্বে রাজপুত-জাতির গৌরব, ভারতের আদর্শ বীর প্রতাপের ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুটাইবে! ঠিক এমনি সময়ে বড়সাদড়ী অধিপতি রাজরাণা মানসিংহ ঝালা তাঁহার দেড়শত সামন্ত সমভিব্যাহারে রাণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাণার অনিচ্ছা ও নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার মুকুট, শিরোভূষণাদি লইয়া আপন মস্তকে ধারণ করিলেন। মোগল সৈন্যগণ মানসিংহকে রাণাপ্রতাপ বলিয়া বুঝিল, আর সামান্য সৈনিকবেশে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত রাণাকে লইয়া, তাঁহার অশ্ব চৈতক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। রাজভক্ত সর্দ্দার, কৌশলে রাণার প্রাণরক্ষা করিয়া, ভীষণ যুদ্ধ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। মানসিংহ এ মরজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অতুলনীয় রাজভক্তি, অলৌকিক কীর্ত্তি; এই রাজভক্ত সর্দ্দারের সাহসেই সেদিন মেবারের সূর্য্য অকালে অস্ত যায় নাই। সেদিনের ঘোর যুদ্ধে মেবারের বীরবংশ লুপ্ত না হইলেও, অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। সহস্র সহস্র বীরবালার সীমন্ত-সিন্দুর চিরতরে মুছিয়া গিয়াছিল; মাতা তাহার নয়নের মণি হারাইয়াছিল, ভগিনী তাহার স্নেহের ভাইটিকে হারাইয়াছিল, এক কথায় মেবার সেদিন তাহার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছিল,—পরিবর্ত্তে সে পাইয়াছিল অক্ষয় কীর্ত্তি! যে মহিমার-মুকুট, গৌরবের যে রাজছত্র মেবার সেদিন ধারণ করিয়াছিল, বহুশতাব্দী পরে, আজও বিশ্ববাসী স্তব্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া দেখে; আর সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে তাহাদের মস্তক এই পবিত্র তীর্থরেণুর উপর লুটাইয়া পড়ে!

উপরে বলিয়াছি যে, প্রতাপের সহযোগী, স্বদেশপ্রাণ

সৈন্য ছিল। মুন্সীজীর এই মত আমি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।---লেখক।

(২) ইনি জাতিতে পাঠান, শেরশাহ সুরের বংশধর ছিলেন। ভারতে মোগলশক্তির প্রাদুর্ভাবকালেই ইঁহারা মেবারের রাণার আশ্রয় গ্রহণ করেন---যেমন সম্রাট্ বাবরের নিকট পরাজিত হইয়া, লোদীসম্রাটের বংশধরগণ মহারাণা সঙ্গর আশ্রয়গ্রহণ এবং মেবার সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, সিকরীর নিকট সম্রাট বাবরের সহিত যুদ্ধ করেন।

(৩) মুন্সী দেবীপ্রসাদের মতে, শ্রাবণ কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৬৩৩ সম্বতে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ হয়। তাঁহার এই উক্তিটিও ভ্রমাত্মক, সুতরাং অন্যান্য ঐতিহাসিকের নির্দ্দেশিত যুদ্ধের তিথি ও সম্বৎই আমি গ্রহণ করিলাম।---লেখক।

রাজপুত সর্দ্দারগণের জীবনী কোনও ইতিহাসেই বিশদ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। দুই একখানি ইতিহাসে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সামান্ত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাও ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। ১৫৯৯ সম্বতের কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে সাদড়ী নগরে মানসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই মানসিংহের হৃদয় বীরভাবে পূর্ণ ছিল। ভারতে সর্ব্বত্র তখন মোগলের বিজয় দুন্দুভি বাজিতেছিল, সমগ্র পরাধীন ভারতের মধ্যে তখন স্বাধীন ছিল কেবল মেবার, মাড়োয়ার ও বিজাপুর। এই তিনটি স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্ম, সম্রাটের বিরাট অভিযান বার বার তীরাপহত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় দলিত মথিত হইয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। যখন রাজপুতনায় এই শক্তিপরীক্ষা চলিতেছিল, তখন মানসিংহ বাল্যের সুখস্বপ্নে বিভোর। তার পর মোগলের দুর্ব্বার-বিক্রমের কাছে মাড়োয়ার ও বিজাপুরের গর্ব্বোন্নত উষ্ণীষ নত হইয়া পড়িল। এইবার মেবারের পালা; মোগল তাহার সমস্ত শক্তিটুকু মেবার ধ্বংসের জন্য নিয়োজিত করিল। বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও অনায়াসে চিতোর-দুর্গ মোগলের করায়ত্ত হইল; মোগলের বিপুলবাহিনীর কাছে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, পৌরজন সহ মহারাণা উদয়সিংহ চিতোর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

মানসিংহ তখন বাল্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি যখন শুনিলেন যে, মোগলের ভয়ে রাণা চিতোর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি এই দুঃসহ অপমানের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর একবার, আহেরিয়া উৎসবে তাঁহার নিকট দিয়া একটি বরাহ পলাইয়া যায়, প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও মানসিংহ সে বরাহকে বধ করিতে পারেন নাই। রাজপুতগণের বিশ্বাস, সমস্ত বৎসরের শুভাশুভ আহেরিয়ার ফলের উপর নির্ভর করে। যদি আহেরিয়া উৎসবে তাঁহারা সাফল্য-লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সে বৎসর সব কার্য্যেই তাঁহারা সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। মানসিংহ যখন বরাহকে নিহত করিতে পারিলেন না, তখন নিজের প্রাণদানে আহেরিয়া উৎসব সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলেন এবং তদনুযায়ী চিতোরেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গণে নিজের শিরশ্ছেদ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু রাজপুতগণের অনুরোধে এবং বাধাপ্রদানে মানসিংহের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মানসিংহ বাস্তবিকই একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, স্বদেশপ্রেমিক, সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মেবারের সম্মিলিত শক্তির এক অংশ অচল হইয়া পড়িয়াছিল। মানসিংহের মৃত্যুতে মহারাণা এমনি দুঃখিত, ব্যথিত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন যে, তিনি সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু গোবিন্দসিংহ, ভীমসাহা প্রভৃতি সর্দ্দারগণের উত্তেজনা-পূর্ণ উৎসাহবাক্যে, রাণা আবার সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। ঝালার মৃত্যুর পর মহারাণা, তাঁহার ভ্রাতা ভূপতিসিংহ ঝালাকে যে সহানুভূতিসূচক পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, ঐ পত্রখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মানসিংহের মৃত্যুতে মহারাণা কিরূপ বিচলিত ও ক্ষতগ্রস্থ হইয়াছিলেন।

পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ;—"মহারাজাধিরাজ মহারাণা শ্রীপ্রতাপসিংহের যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ ও প্রণামান্তে সামন্ত রাণা ভূপতিসিংহের নিকট নিবেদন এই যে, হলদিঘাটে সম্রাটসৈন্যের সহিত আমাদের যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, সেই মহাযুদ্ধে আমার প্রাণরক্ষার্থ আপনার সুযোগ্য বীর ভ্রাতা রাজভক্ত যোদ্ধা মানসিংহ ঝালা, তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে মেবারের সৈন্যশক্তি সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, আমি আমার দক্ষিণহস্ত হারাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে মেবারের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর কাহারও দ্বারা পূরণ হইবে না। ভগবান একলিঙ্গদেবের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাদের শোকসন্তপ্ত প্রাণে

শান্তিধারা বর্ষণ করুন এবং পরলোকগত বীরের পবিত্র আত্মারও সদ্গতি বিধান করুন।" (৪)

ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে ভূপতি সিংহ অত্যন্ত মর্মাহত ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং অবিধে তাঁহার সামন্তগণ সহ রাণার সহিত মিলিত হইয়া, সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ইনিও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

এইবার আমরা মানসিংহ ঝালার বংশধরগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব এবং মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বহস্ত লিখিত একখানি দানপত্রের পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই দানপত্রখানি অমূল্য, সেই জন্যই ইহা উদ্ধৃত করিব।

মানসিংহের তিন পুত্র ছিল, প্রথম ছত্রশাল, দ্বিতীয় কল্যাণ সিংহ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ অসকরণ। বিবাহের পর পারিবারিক কলহে বিরক্ত হইয়া ছত্রশাল যোধপুরে প্রস্থান করেন। কিন্তু আবার আবরা-সাবরার ঘাটিতে মোগলবাহিনীর সহিত রাণা প্রতাপের যুদ্ধ হয়, তখন রাজভক্ত ছত্রশাল যোধপুরের জায়গীর পরিত্যাগ করিয়া মেবারে প্রত্যাগমন করেন। আবরা-সাবরার যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি আহত হন এবং কিছুদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। কানসিংহ নামে ইঁহার এক পুত্র ছিল। কমলমীরের যুদ্ধে মানসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণসিংহ মোগলের হস্তে বন্দী হন। মোগল সেনাপতি মানসিংহ বন্দী কল্যাণ সিংহকে সম্রাটের হস্তে অর্পন করেন। সম্রাট কল্যাণ সিংহের স্পষ্টবাদিতায়, সাহসে ও নির্ভীকতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করেন। এবং রাণোদ নামক মহাল তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। কল্যাণসিংহ বিনীত ভাবে সম্রাটকে জানাইলেন যে, তিনি সম্রাটের এ উপহার গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই অসীম অনুকম্পার পরিবর্ত্তে তিনি যদি প্রপীড়িত রাণাকে আর আক্রমণ না করেন, তাহা হইলে সমগ্র মেবার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। অতঃপর কল্যাণসিংহ মেবারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অসকরণ সাদড়ীতে থাকিয়া রাজ্য পরিচালন করিতেছিলেন। কল্যাণসিংহ যখন মেবারে ফিরিয়া আসিলেন, তখন মহারাণা সসম্মানে তাঁহাকে দরবারে আহ্বান করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, কল্যাণসিংহ রাণার পক্ষ হইতে সম্রাটের নিকট কতকগুলি কথা বলিয়াছেন এবং সম্রাট তাঁহাকে রাণোদের জায়গীর দিয়াছিলেন, তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। সামন্ত সর্দ্দারগণের মিলিত সভায় কল্যাণসিংহের রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, মহারাণা তাঁহাকে একখানি স্বর্ণখচিত তরবারি উপহার প্রদান করেন এবং হলদিঘাটের নিকটবর্ত্তী দিলওয়ারা নামক বিস্তীর্ণ জায়গীর কল্যাণসিংহকে এবং গুধুঁদের জায়গীর কল্যাণসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র, মানসিংহ ঝালার পৌত্র কানসিংহ ঝালাকে দান করেন। এই দানপত্র খানি মহারাণা স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। মূল দানপত্র খানি দিলওয়ারার রাজভবনে রক্ষিত আছে, নিম্নে তাহারই প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল। লিপিখানি নাগরাক্ষরে লিখিত, পাঠকগণের সুবিধার জন্য বঙ্গাক্ষরেই লিখিলাম। (৫)

"শ্রীএকলিঙ্গজী প্রসাদাৎ শ্রীরামো জয়তি"

রাণার স্বাক্ষর——ভল্ল ও অসির চিত্র

"স্বস্তী শ্রীবিজয় কটক রা ডেরা শুভ সুথানে মহারাজাধিরাজ মহারাণা জী শ্রীপ্রতাপ সিংহ জী আদেসাৎ দেলবাড়া রাজরাণা (৬) কল্যাণ সিংহ সু প্রসাদ হকুজে। অঠারা সমাচার ভলা হৈ থাঁহারা কেহবাবজো অপ্রক্ষরণা চত্রশাল ছড়ীনো (৭) কর যোধপুর গয়া, আবরা সাবরারী নাল মাঁহে শ্রীপাতশাহজী রী ফৌজ পড়ী জঠে ঝগড়ো হুও

(৪) বীর-বিলাপ, ২১৮ পৃষ্ঠা।

(৫) এই পত্রখানির জন্য মুন্সী দেবীপ্রসাদজীর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।---লেখক।

(৬) দিলওয়ারা ও গুধুঁদের অধিপতিগণ এখনও রাজরাণা নামে অভিহিত হন। (৭) বিরক্ত হইয়া।

জিনী ঝগড়া মাংহে থাঁরে কাকা ভোপতসিংহ কাম আয়ো অউর চত্রশালরে লোহ লাগা সো ঘনা দিন পছে কাল কীধো, কল্যাণসিংহ পকড়ন মৈ গয়া, জঠে বোলী চালী রী সুফারিশ দিখানী জীং খুশী সূঁ কররনে থানে দেলবারো মংা হুও, রেখটকা দেড়লাখ রী হৈ খাতরী সূ জমীত রাখ জো থাঁরে ভতীজ কানসিংহ নো গোধুঁদো মংা হুও, থঁরা দোহী ঠিকানা মাঁহে নালরী কোডী পেস্কশী (৮) লাগেমো সদাবন্দ পেড়িয়াঁ দর পেড়িয়াঁ তক নহি লাগেগো গের বাজবী খোঁস খালমো নহি আবেগো ইও মাহরো বচন হৈ শ্রীএকলিঙ্গজী রী নাল মাহে চীরবা রা ঘাটামাহেঁ আছো বন্দোবস্ত রাখজ্যো বিগাড় উজার হুবেগা তো থাহে পুছিয়ো জাবেগা পরবানগী পঞ্চোলী গোরো। এব সাম্বৎ ১৬৩৯ রা আসোজ সুদি নবমী।"

উক্ত দানপত্রখানির মর্ম্মার্থ এই—"বিজয় বাহিনীর অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহারাণা শ্রীপ্রতাপ সিংহের যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদান্তে দিলওয়ারার রাজরাণা কল্যাণ সিংহের নিকট নিবেদন। অত্র কুশল, আপনাদের কুশল প্রার্থনা করি। আপনার রণনিপুণ অগ্রজ ছত্রশাল বিরক্ত হইয়া যোধপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন, পরে আবরা সাবরায় শ্রীবাদশাহজীর সহিত আমার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি এবং আপনার পিতৃব্য ভূপতি সিংহ আমার পক্ষে যুদ্ধ করেন। ভূপতি সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন এবং ছত্রশাল আহত হন ও অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। কল্যাণসিংহ বন্দী হইয়া সম্রাটের নিকট যান এবং তথায় আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। এই কারণে সানন্দে আমি তাঁহাকে দিলওয়ারা উপহার দিলাম। এই জায়গীরের দেড়লক্ষ টাকা বার্ষিক কর সৈন্যগণের জন্য ব্যয়িত হইবে। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র কান সিংহকে গুধুঁদে জায়গীর উপহার প্রদত্ত হইল। আপনাদের দুইজনকেই উপহারস্বরূপ উক্ত জায়গীরদ্বয় দান করিলাম, উহার কোন কর আপনাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না। পুরুষানুক্রমে আপনারা উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকুন। আমার এই দানপত্র ভবিষ্যতে আমার বংশধরগণ রদ করিতে পারিবেন না। একলিঙ্গদেবের আশীর্ব্বাদে পুরুষানুক্রমে আপনারা উহা ভোগ করুন। এখন হইতে উক্ত রাজ্যদ্বয়ের শুভাশুভ আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে।—সম্বৎ ১৬৩৯, আষাঢ়, শুক্লানবমী।"

মূল দানপত্রখানি মেবার অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় লিখিত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, রাণা প্রতাপ আকবরকে ঘৃণা করিতেন এবং এই কারণে তিনি সম্রাটকে "তুর্ক" "যবন" প্রভৃতি অসম্ভ্রমসূচক ভাষায় সম্বোধন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা এই পত্রখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। এই পত্রান্তর্গত "বাদশাহ" শব্দের পূর্ব্বে শ্রী এবং পরে জী, এই দুইটী সম্ভ্রমসূচক শব্দ যোজিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজপুতগণ শত্রুর নাম শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সহিত উচ্চারণ করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেন না।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

(৮) উপহার-পুরস্কার।

ভুল বোঝা

(গল্প)

সেই প্রথমটিবার তাহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, আজিও মানস-চক্ষুর সম্মুখে ঠিক তেমনি তাহাকে দেখিতে পাই। তরুণীর সেই করুণা-ব্রীড়া জড়িত সলজ্জ মুখখানি, সেই বিষাদ-মাখা চোখ দুটী, গোলাপী করত্রাণে আবৃত চঞ্চল সেই হাত দুখানির ছবি এখনও আমার মানসপটে চিত্রিত হইয়া আছে।

সেদিন তাহাকে তেমন আগ্রহভরে দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। কর্ম্ম জগতের হৃৎ স্পন্দনের তখন খানিকটা হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। আপিস ঘরের সম্মুখে দেওয়াল-পার্শ্বে রক্ষিত ঘড়ীটিতে টং টং করিয়া ৫টা বাজিয়া উঠিল। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া লেখনী যথাস্থানে রাখিয়া আমিও উঠিয়া পড়িলাম। হিসাব পত্র বিলবহি ইত্যাদি ম্যানেজার সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। অবশেষে যখন আপিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম তখন ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ সহজ রাস্তায় গলিপথে আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতাম। সেদিন নিদাঘের তপ্ত বায়ু কিছু অধিক মাত্রায় উষ্ণ মনে হওয়ায় ভাবিলাম, পার্ক ঘুরিয়া বড় রাস্তায় বাড়ী ফিরিয়া যাই।

সারাটি দিবসের ক্লান্তির পর পার্কের শীতল হাওয়া বড় সুখকর মনে হইল। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত-পদক্ষেপে পার্কের পশ্চিম ভাগে আসিয়া পড়িলাম। সূর্য্য তখন অস্তগমনোন্মুখ—আকাশবক্ষে একখানি বৃহৎ স্বর্ণথালা মাত্র। সহসা দেখিলাম, সম্মুখে পার্কের একটি বিজন কোণে সে একাকী বসিয়া আছে। অস্তমিত-প্রায় রবির শেষ রশ্মি আসিয়া তাহার তরুণ মুখখানিকে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে। সেই আমি তাহাকে প্রথম দেখি। চক্ষু তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে তখন আমার কেমন একটা লজ্জাবোধ হইল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত মাত্রের দর্শনেই তাহার মুখখানির ছবি আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গেল। আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে তখনও তেমনই নিশ্চল ভাবে একাকী বসিয়া ছিল। একটা বিষাদের ভাব তাহার কোমল অবয়বটিকে আচ্ছাদন করিয়া কি যেন একটা গোপন বেদনার কথা জ্ঞাপন করিতেছিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে, আমি ধীরে ধীরে পার্ক হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেদিন কেমন একটা বিষাদ চঞ্চল ভাব আসিয়া, আমার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। পরদিন রবিবার, ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, সেদিন সহরের বহির্ভাগে কোনও পল্লীবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিব ; কিন্তু সেদিন আর যাইবার স্পৃহা রহিল না। সারাটি দিবস এটা সেটা করিয়া চারিটা বাজিতেই, পোষাক পরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। কোন্ দিকে যাইব, কিছুই স্থির ছিল না। অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে ঠিক পার্কে আসিয়া পড়িলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া পার্কের পশ্চিম ভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, ঠিক পূর্ব্ব দিবস যেমনটি সে বসিয়া ছিল, সেদিনও সে ঠিক তেমনি ভাবে বসিয়া আছে। সূর্য্যরশ্মিতে তাহার মুখখানি তেমনি রঞ্জিত। সেই গোলাপী দস্তানায় তার হাত দুখানি তেমনি আবৃত। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একটি গোলাপ ঝাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম যদি সুযোগ পাই, তবে তাহার অলক্ষিতে চুপি চুপি তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইব। কিন্তু চেষ্টা করিতে যাইয়া, সহসা ধরা পড়িয়া গেলাম। চারি চক্ষুর মিলন হইলে লজ্জায়

তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

সেই হইতে প্রতিদিন যখন আপিসের কায-কর্ম্ম সাঙ্গ হইয়া যাইত, আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া পার্কে উপস্থিত হইতাম। আসিতে আসিতে ভাবিতাম, যদি তাহার দেখা না পাই, তবে ঘুরিয়া ফিরিয়া সান্ধ্য-ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া বাড়ী ফিরিব। কিন্তু দূর হইতেই যখন দেখিতাম, সে আপনার স্থানে ঠিক পূর্ব্বের মত বসিয়া আছে, তখন একটি দুর্দ্দমনীয় আনন্দের ভাব মনে জাগিয়া উঠিত। তখন বুঝিতে পারিতাম, তাহার যদি দেখা না পাইতাম, তবে সেটা আমার পক্ষে কতই বেদনা-জনক হইত। সে কিন্তু সেই বিজন আসনে একাকী তেমনি বসিয়া থাকিত; আমি কখনও তাহার সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া, কখনও তাহার পার্শ্বস্থিত আসনে বসিয়া বসিয়া, সন্ধ্যা হইলে গৃহে ফিরিতাম।

২

প্রতিদিন আপিসে বসিয়া খাতা-পত্র, বিলবহি ইত্যাদি নাড়িতে নাড়িতে কত কিছু ভাবিয়া রাখিতাম। ভাবিতাম, আজ তার সঙ্গে এই বলিয়া আলাপ জুড়িয়া বসিব; সে যখন সঙ্কোচ বোধ করিবে, তখন এই বলিয়া তাহার সঙ্কোচ মোচন করিতে প্রয়াস পাইব। আর প্রতিদিন আপিসের কার্য্য সমাধা হইলে, পার্কের পথে আসিতে আসিতে এই সকলের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিতাম। কিন্তু যেই দূর হইতে তাহার উপর দৃষ্টি পতিত হইত, অমনি কোথায় যে কথাগুলি মন হইতে সরিয়া পড়িত, মনের মধ্যে কেমন একটা গোলমাল হইয়া যাইত! কাযে কাযেই শত চেষ্টা করিয়াও তাহার সঙ্গে আলাপের সূচনা করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

এইরূপ আর কত কাল চলিত, বলিতে পারি না। কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে, তাহার সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল। সেদিন আমার পার্কে আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল; পার্কে প্রবেশ করিয়া, সে যেখানে প্রতিদিন বসিয়া থাকিত সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, সে সেখানে নাই। সে যে আসনে আসীন থাকিত, তাহার কাছে কয়েকটি শিশু খেলিয়া বেড়াইতেছে। কি এক ভয় আসিয়া আমার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ভাবিলাম আর বুঝি তাহার দেখা পাইব না। দ্রুতপদে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে, হঠাৎ সম্মুখে একটি বৃক্ষের অন্তরালে দেখিতে পাইলাম, সে বসিয়া আছে। তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়া ফেলিলাম, "বেশ ভোগালে কিন্তু!"

তাহার সঙ্গে আলাপের সূচনা করিবার জন্য, মনে মনে যত প্রকার বাক্য রচনা করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহা তো তাহার একটিরও মত হইল না! সে কিন্তু কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, বরং মৃদু হাসিয়া বলিল, "আসিয়া দেখিলাম, ছেলেরা সেখানে পূর্ব্বেই আসিয়া খেলা জুড়িয়া দিয়াছে, তাই আমার অন্য আসন গ্রহণ করিতে হইল।" আমি একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম—যেন সে আমার কতকালের পরিচিত। আমাদের উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে যে কখনও বাক্য-বিনিময় হয় নাই, আমরা যে উভয়েই উভয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত, একথা মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের মনে পড়িল না। তাহার বেশভূষা অল্প মূল্যের হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পারিপাট্য বিশিষ্ট। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকিলেও, সে নিঃসন্দেহ ভদ্র-পরিবারভুক্ত। তাহার বেশের পরিচ্ছন্নতা, তাহার অকৃত্রিম ভাব ও সর্ব্বোপরি তাহার সেই জীর্ণ মূল্যবান্ দস্তানা উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। সেদিন আর আমাদের মধ্যে অধিক কথোপকথন হইল না। সন্ধ্যা হইলে আমরা উভয়ে উঠিয়া পড়িলাম। পার্কের পশ্চিম ফটকের কাছে আসিলে নীরবে সে বিদায় গ্রহণ করিয়া একটি

দরিদ্র পল্লীর অভিমুখে চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অবশেষে সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে, ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলাম।

তখন হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা পার্কে আমাদের সাক্ষাৎ হইত। কোনও দিন পার্কে বসিয়া গল্প করিয়া, কোনদিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া, অবশেষে যখন গ্যাসের আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিত, উভয়ে উভয়ের কাছে বিদায় গ্রহণ করিতাম। ক্রমে সে তাহার গত জীবনের অনেক কথা আমাকে বলিতে লাগিল। শৈশবেই সে পিতৃ-মাতৃহীনা। জগতে আপনার জন তাহার কেহই ছিল না, ছিল শুধু এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা। কিন্তু সে কখনও তাহার খোঁজ-খবর লইত না। কোনও দরিদ্র প্রতিবেশিনী তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর তাঁহারই অনুকম্পায় এখন তাহার জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ও হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে বড় খাটিতে হয়। যে কার্য্য তাহার করিতে হয় উহা বড়ই কষ্টকর। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত। আমারও ইহজগতে আপনার বড় কেহ ছিল না। এই নূতন বন্ধুটিকে পাইয়া আমারও জীবনের ক্লেশ জ্বালার বেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিল। মাঝে মাঝে সেই পার্শ্বোপবিষ্ট দুঃখ-কাতর অথচ সুন্দরী তরুণীকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইবার জন্য হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইত। কিন্তু নিজেরই অন্নের সংস্থান অতি কষ্টে হইত বলিয়া, অপরের ভার গ্রহণ কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতাম না। তাই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইলেও, সংযত থাকিতে হইত।

৩

ক্রমে গ্রীষ্মকাল গেল, শরৎ আসিল; শরৎ গেল বসন্ত আসিল; বসন্ত গেল আবার গ্রীষ্মকাল আসিল। আমার আর্থিক অবস্থাও ক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু স্বচ্ছল হইয়া উঠিল। সেই পার্কের আসনখানি, যে বৃক্ষের ছায়ায় আমরা সতত বসিতাম সেই বৃক্ষের প্রতি পল্লবটি, যে পথ দিয়া সে সর্ব্বদা গমনাগমন করিত সেই পথটি আমার কাছে অতি প্রিয় হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আশা ও আনন্দের উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, বুঝি অনতি-বিলম্বে আমার হৃদয়রাণীকে দুঃখ-ক্লেশের কবল হইতে মুক্ত করিয়া, অতি আপনার করিয়া লইতে পারিব। বুঝি শীঘ্রই তাহাকে দরিদ্রপল্লী হইতে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে লইয়া আসিয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিব। সেও বুঝি বা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। কখন কখনও অর্দ্ধভীত অর্দ্ধ উৎসুক নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া, কি যেন বুঝিবার চেষ্টা করিত। তখন তাহাকে ঠিক হরিণশিশুর ন্যায় মনে হইত। আমি তাহার এই ভাব দেখিয়া একদিন বলিয়া উঠিলাম—"হরিণ শিশুর মতই, না জানি কবে তুমি কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে—আমি খুঁজিয়াও পাইব না।" সে একটু মৃদু হাসিয়া, আমার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া, তাহার গোলাপী করত্রাণে আবৃত হস্তে আমার একটি হাত টানিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে সহসা সে আপনার হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া, কিছুদূরে সরিয়া গেল। কি একটা ভয়ের ছায়া আসিয়া তাহার মুখে দেখা দিল। অর্দ্ধভীত, অর্দ্ধ উৎসুক চক্ষের একটি চাহনি চাহিয়া আমার মুখের ভাব হইতে কি যেন বুঝিতে চেষ্টা করিল। তাহার অধর দু'টি নড়িয়া উঠিল, কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া যেন সে বলিতে পারিল না। আমি তাহার এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনে কিছু বিস্মিত হইলেও, তাহাকে সে বিষয়ে সেদিন কোনও প্রশ্ন করিলাম না।

পর দিবস আবার যখন সেই বৃক্ষতলে বসিয়া উভয়ে উভয়ের সঙ্গসুখ অনুভব করিতেছিলাম, তখন তাহার হাতের দিকে সহসা দৃষ্টি পতিত হওয়ায় দেখিতে পাইলাম, সেদিনকার সেই জীর্ণ গোলাপী করত্রাণের পরিবর্ত্তে, নূতন একটি করত্রাণে তাহার হস্ত আবৃত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সর্ব্বদা দস্তানা

পর কেন? উন্মুক্ত হস্তে কি বাহির হইতে নাই?” মুহূর্ত্তের তরে সে চমকিয়া উঠিল। পরে সহজ স্বরে উত্তর করিল, “রাস্তায় বাহির হইতে হইলে আমি দস্তানা পরিয়া থাকি।” আমি বলিলাম, “এ ত রাস্তা নহে; আমরা ত নির্জ্জন পার্কে একাকী বসিয়া আছি—খুলিয়া ফেল না।”

সে সহসা কোন উত্তর প্রদান করিল না, কিন্তু সেদিন বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে সে আমাকে পার্কের নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া, স্বয়ং একটি আসনে উপবেশন করিল, ও আমাকেও বসিতে ইঙ্গিত করিল।

অতঃপর ধীরে ধীরে উভয় হস্তের করত্রাণ উন্মোচন করিয়া, উন্মুক্ত হস্ত দু'খানি আমার সম্মুখে ধরিল।

তাহার উন্মুক্ত হস্তের দিকে চাহিবামাত্র, যুগপৎ বিস্ময় ও ঘৃণায় আমার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তাহার হাত দুটিতে একটি নখও ছিল না—বৃহৎ বৃহৎ কদাকার সাদা দাগে তাহার করতল আচ্ছাদিত। এই বীভৎস দৃশ্য দর্শনে মনে যে ঘৃণা ও ক্রোধ অনুভব করিলাম, আমার চোখে তাহা সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। সে নীরবে সেই ঘৃণাব্যঞ্জক চাহনির আঘাত সহ্য করিয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিল—“পূর্ব্বেই তোমাকে আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু ভয় হইত পাছে—”

আর সে বলিতে পারিল না। বড় বড় দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িল। আমি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, তাহার সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়াই, বিদায় গ্রহণ করিলাম।

৪

এতদিনের সযত্নপোষিত সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সমস্ত হৃদয়টা দারুণ বেদনার আঘাতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পরদিবস কখন আবার পার্কের দ্বারে আসিয়া পড়িলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু অতি প্রবল চেষ্টার পর আত্মদমন করিয়া, পার্কে প্রবেশ না করিয়াই গৃহে ফিরিলাম। গৃহ হইতে কোনও অজ্ঞাত শক্তির বশীভূত হইয়া আবার পার্কের পথে ধাবিত হইলাম, কিন্তু পুনরায় আকাঙ্ক্ষা সংযত করিয়া অতিকষ্টে অন্য পথে চলিয়া গেলাম। প্রতিদিন এইরূপ হইতে লাগিল। অবশেষে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া, কিছুদিনের ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে একজন বন্ধুর আবাসে আশ্রয় লইলাম। ভাবিলাম, পল্লীর হাওয়ায়, পল্লীর নীরব নির্জ্জনতায় হয়ত মনের বেদনার লাঘব হইতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের সে শূন্যতা, সে অসহনীয় বেদনা, কিছুতেই যে প্রশমিত হইতে চাহে না। যখনই তাহার বিষাদপূর্ণ চক্ষু দুটির ছল ছল চাহনির কথা মনে পড়ে, তখনি আবার তাহার কাছে গিয়া পুনরায় তাহাকে হৃদয়ে ধরিতে প্রাণে ব্যাকুল বাসনা জাগিয়া উঠে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই কদর্য্য হাত দু'খানির ছবি মনে পড়িয়া, মনে এক বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয়।

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মনে শান্তির লেশ মাত্র নাই। অবশেষে একদিন বন্ধুর স্ত্রীর সাংঘাতিক পীড়া হইল। চিকিৎসাশাস্ত্র-বিশারদ বহু প্রবীণ ডাক্তার, রোগীর চিকিৎসার নিমিত্ত আহূত হইলেন। আমি সুযোগ বুঝিয়া উঁহাদের মধ্যে একজনকে সেই মেয়েটির কথা খুলিয়া বলিয়া জিজ্ঞাসিলাম, “কোন্ রোগ হইলে করতলদ্বয় এমন কদাকার ধারণ করে—নখ সব ক্ষয় হইয়া যায়?”

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, “রোগ?” ও ত কোন রোগ নহে। যাহারা সতত তরল রাসায়নিক পদার্থের কারখানায় কায করে, উঁহাদেরই তেমন হইয়া থাকে।” উৎসাহভরে আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “উহা কি কখনও আরোগ্য হয় না?” ডাক্তার বলিলেন, “নিশ্চয়ই হয়। মাস দুই তিন সেই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেই সব ভাল হইয়া যায়, আবার নূতন নখ গজায়।”

মনে মনে ভগবানের শত প্রশংসা করিতে করিতে, আমি সেই দিনই ট্রেণ ধরিয়া সহরে পৌঁছিলাম। সায়াহ্নে আবার সেই পার্কে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হৃদয়ের মধ্যে তখন ভয় ও আশার মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতে-ছিল। একবার মনে হইতেছিল সে নিশ্চয়ই পার্কে

আসিবে, আবার ভয় হইতেছিল যদি সে না আসে?

পার্কে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত পার্কে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহাকে পাইলাম না। একবার দুইবার তিনবার খুঁজিলাম, তবুও তাহাকে মিলিল না। উন্মাদের ন্যায় টলিতে টলিতে একটা শূন্য আসনে বসিয়া পড়িলাম। মনে পড়িল আমার সেই ঘৃণাব্যঞ্জক ক্রোধব্যঞ্জক নিষ্ঠুর চাহনি। পরিতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। হায়! না বুঝিয়া তাহাকে কতই না যন্ত্রনা দিয়াছি। সহসা মনে হইল, পার্কের রক্ষক হয়ত তাহার খবর দিতে পারিবে। সরাসর রক্ষকের কুটীরে গিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলাম। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "যে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন আসিয়া, পার্কের গেট হইতে রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কার যেন প্রতীক্ষা করিতেন। পরে সন্ধ্যা হইলে চলিয়া যাইতেন। কিছুদিন হইতে আর আসেন না।"

তাহার নামটি ত কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, তাহার আবাস কোথায় তাহাও জানি না। কি করিয়া তাহার খোঁজ পাই? সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতিদিন সায়াহ্নে আমাদের সেই প্রথম মিলনের স্থানে আসিয়া বসিয়া বসিয়া, অতীতের সেই সুখের দিনগুলি স্মরণ করিয়া এবং আমার ভুল বোঝা উপেক্ষার জন্য মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধীভূত হই। আর আপিসে, পথে, গৃহে, পার্কে সততই মনে পড়ে, বেদনাক্লিষ্ট বিষাদ মাখা সুন্দর সেই মুখখানি, ভীতি ও ঔৎসুক্য মাখা সেই মধুর চাহনি, আর গোলাপী করত্রাণে আবৃত সেই হাত দুখানি।

কি করিয়া আর তার দেখা পাই? অন্ধের মত পার্ক হইতে বহির্গত হইয়া, যে রাস্তা দিয়া সে প্রতিদিন চলিয়া যাইত, সেই রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থিত গৃহগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, সারাটি সহর খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার দেখা পাইলাম না। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত কত অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু আর তাহাকে পাইলাম না। *

আলতাফ হোসেন।

---

* ইংরাজ হইতে।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাঙ্গা লামা।

কিশোরীর মিটোগাং পরিত্যাগের পর তিন সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। দ্বাবিংশ দিন, দিবাবসান কালে অতি ধীরপদে সে পর্ব্বতারোহণ করিতেছিল। মিটোগাং হইতে সংগৃহীত সেই মুটিয়া, (তাহার নাম সাইদা) কম্বলাদির বোঝা লইয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতেছে, তাহার পশ্চাতে কিশোরী। সর্ব্বশেষে ফুরচিং—তাহার হাতে কিশোরীর সেই চামড়ার ব্যাগটী।

কিশোরীর অঙ্গে এখন তিব্বতীয় লামার পরিচ্ছদ—ইংরাজি পোষাক সে ফুরচিং-এর পিতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে ক্ষীণ কণ্ঠে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ফুরচিং, কাম্পাচেন গ্রাম আর কত দূর?"

"আর অধিক দূর নয়, নাঙ্গালামা।"

ফুরচিং এখন আর কিশোরীকে 'সাহেব' সম্বোধন করে না। এখন তাহাকে "নাঙ্গলামা" বলে। "নাঙ্গা" অর্থে উলঙ্গ নহে—কিশোরীর উপাধি "নাগ" শব্দেরই অপভ্রংশ। ফুরচিং বলিল, "আর. আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কাম্পাচেন পৌঁছিতে পারিব। বড় কষ্ট হইতেছে কি?"

কিশোরী বলিল, "হুঁ।, হইতেছে বৈকি। বোধ হয় জ্বরটা আবার আসিতেছে।"

আজ কয়েক দিন হইতে বিকালে কিশোরীর একটু একটু "জ্বরভাব" হইতেছে। তথাপি সে চলিয়াছে—দার্জ্জিলিঙ হইতে যতদূর গিয়া পড়িতে পারে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই, পথবাহনে সে ক্ষান্ত হয় নাই।

সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পরেই, কাম্পাচেন গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইল। গ্রামে পৌঁছিতে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। গ্রামে কুটীর সংখ্যা অধিক নহে। ফুরচিং কয়েক স্থানে আতিথ্য লাভের চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। সাইদা বলিল, গ্রামের অপর প্রান্ত হইতে কিছু দূরে একটি গোম্বা (গুহা বা মঠ) আছে, তথায় একজন বৃদ্ধ লামা বাস করে, সেখানে যাইলে আশ্রয় মিলিতে পারে। গ্রামের লোককে ফুরচিং এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল যে, সে লামা মরিয়া গিয়াছে, তাহার কন্যা এখন গোম্বার অধিকারিণী।

তখন ইহারা সেই গোম্বার অভিমুখে চলিল। পথে যাইতে যাইতে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "লামার আবার কন্যা কি রকম? আমি ত জানিতাম লামাদের বিবাহ হয় না।"

ফুরচিং একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "বিবাহ হয় না বটে, কিন্তু কোন কোনও লামার পুত্রকন্যা হয়।"

গ্রাম ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর গিয়াই একটি ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হইল। এই ধ্বজাই, গোম্বা অথবা মঠের চিহ্নজ্ঞাপক। যখন তিন জনে সেই ধ্বজার নিকট গিয়া পৌঁছিল তখন দিবালোক অত্যন্ত কম হইয়া গিয়াছে।

গোম্বার সম্মুখভাগে পাথরে গাঁথা সারি সারি তিনখানি ঘর; বোধ হয় কোনও সিমেণ্টও নাই—উপর্য্যুপরি পাথর সাজাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, কালক্রমে পাথরগুলা কতকটা জুড়িয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে ফাটলও দেখিতে পাওয়া গেল। ছাদের স্থানে, আড়াআড়ি ভাবে কাঠ সাজাইয়া, তাহার উপর ছোট ছোট পাথর ছড়ানো—তাহাও কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

মঠ তখন জনশূন্য–প্রবেশ দ্বারগুলিতে তালাবন্ধ। কিশোরী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, সম্মুখস্থ চাতালে সে বসিয়া পড়িল। সাইদা নিজ ভার নামাইল। কিশোরী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বড় পিপাসা, একটু জল কোথায় পাওয়া যায়?"

ফুরচিং বলিল, "আচ্ছা, কাছে কোথাও ঝরণা আছে কিনা আমি দেখিতেছি।" বলিয়া ব্যাগ হইতে এনামেলের গেলাসটি বাহির করিয়া লইয়া, সে চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, অদূরে যেন কোনও কিন্নরীর কণ্ঠজাত গীতধ্বনিতে, সেই সান্ধ্য নীরবতা ভঙ্গ হইল। পর্ব্বতের অন্তরাল বশতঃ গায়িকাকে দেখা গেল না, তবে স্বরে বুঝা গেল, সে ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে। কিশোরী মুগ্ধকর্ণে সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিল। সে ভাষা তাহার অপরিচিত, সে রাগিণীও তাহার অশ্রুতপূর্ব্ব, কিন্তু তথাপি সেই গীত তাহার কর্ণে যেন মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই গায়িকা দৃষ্টিগোচর হইল। মঠের দ্বারদেশে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার গান সহসা বন্ধ হইয়া গেল। সে ধীরপদে, আগন্তুকদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী দেখিল, যে দাঁড়াইল, তাহার দেহবর্ণ প্রায় শ্বেত গোলাপের পাপড়িগুলির মতই সমুজ্জ্বল, এক রাশি রুক্ষ চুল মাথার পিছনে গিরো বাঁধা, অঙ্গে তিব্বতীয় রমণীর পরিচ্ছদ, বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক হইবে না। হাত-পাগুলি সুপুষ্ট, শারীরিক বলের পরিচায়ক। পৃষ্ঠদেশে একটা ঝুড়ির মত কি বাঁধা রহিয়াছে—তাহারই ভরে বালিকার দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ

আনামত। কিশোরী শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিয়া এই তরুণী পর্ব্বতবাসিনীর পানে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল।

বালিকা নিকটে আসিয়া হিন্দু ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছ?"

সাইদা সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "আমরা তীর্থযাত্রী পান্থ-ইনি নাঙ্গালামা, হিন্দুস্থান হইতে আসিয়াছেন। আমি ইঁহার ভারবাহী। আমার বাসস্থান মিটোগাং।"

"এখানে কি তোমাদের প্রয়োজন?"

"রাত্রি আসিয়া পড়িল। তাহাতে নাঙ্গালামার শরীর অসুস্থ। তাই, রাত্রির জন্ম আমরা এই মঠে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আপনি কে?"

"এই মঠে আমার পিতা জোংপা লামা বাস করিতেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নির্ব্বাণলাভ হইয়াছে। এখন আমিই এই মঠের অধিকারিণী—এই খানেই আমি বাস করি।"

"এখানে আমাদের আপনি আশ্রয় দিবেন কি? আর একজন আমাদের সঙ্গে আছে, সেও আমার স্বদেশীয়। নাঙ্গা-লামা পিপাসায় বড় কাতর হইয়াছেন, তাই সে জল অন্বেষণ করিতে গিয়াছে।"

"পিপাসা কাতর হইয়াছেন? আমার ঘরে জল আছে—আমি এখনি জল দিতেছি।"—বলিয়া বালিকা পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার ঝুড়িটি নামাইয়া সেইখানে রাখিয়া, ত্বরিত-হস্তে দ্বারের চাবি খুলিয়া, ভিতর হইতে একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত পেয়ালায় জল ভরিয়া আনিয়া কিশোরীর হস্তে দিল।

কিশোরী সমস্ত জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিয়া, পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিয়া, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই রূপসী বালিকার পানে চাহিয়া রহিল।

বালিকা সাইদার পানে চাহিয়া বলিল, "সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ইঁহার অসুস্থ শরীর, বাহিরে হিমে বসিয়া কষ্ট করার প্রয়োজন কি? নাঙ্গালামা মঠের ভিতরে আসুন।"—সাইদা দোভাষী হইয়া বালিকার এই আহ্বান কিশোরীকে বুঝাইয়া দিল। কিশোরী আর একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বালিকার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল।

ভিতরে গিয়া মেয়েটি কিশোরীর দিকে ফিরিয়া পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "শুনিলাম আপনি হিন্দুস্থান-বাসী—হিন্দী বলেন কি?"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, আমরা সকলেই হিন্দী কহি। আপনি কি হিন্দুস্থানে গিয়াছিলেন? এমন সুন্দর হিন্দী শিখিলেন কোথায়?"

বালিকা উত্তর করিল, "আমার জননী এখানে আসিবার পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙে বাস করিতেন। তিনি হিন্দী কহিতেন, তাঁহারই কাছে বাল্যকালেই আমি হিন্দী শিখিয়াছি। এখন হইতে আমি তবে আপনাদের সহিত হিন্দীতেই কথা কহিব।"

কিশোরী বলিল, "আপনার নাম কি?"

"আমার নাম নিনা।"

ফুরচিং এই সময় গেলাস ভরিয়া জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। সাইদার সাহায্যে, কম্বলের বাণ্ডিল খুলিয়া বিছানা করিয়া কিশোরীকে শোয়াইয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে কিশোরী জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

কিশোরীর অবস্থা দেখিয়া, নিনা ফুরচিংকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় কি?"

ফুরচিং বলিল, "ভয়ের কারণ কিছুই নাই। পথ চলা—বিশেষ পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পথ চলা ইঁহার অভ্যাস ছিল না, অতিরিক্ত পরিশ্রমে ওরূপ হইয়াছে। দুই দিন বিশ্রাম পাইলেই ভাল হইয়া যাইবে। ঐ গ্রামে কোনও ভাল চিকিৎসক আছে কি?"

"একজন চিকিৎসক আছে বটে, ভাল মন্দ জানি না। তাকে ডাকিয়া আনিব?"

"না, আজ রাত্রে আর ডাকিবার দরকার নাই। কাল প্রাতে, কেমন থাকেন দেখিয়া, তখন যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। আপনি এ মঠে কি একাই থাকেন?"

"হাঁ, একাই থাকি।"

"আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া আপনাকে বোধ হয় বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইল? এই ঘর খানিতেই আপনি বোধ হয় শয়ন করেন?"

নিনা বলিল, "অসুবিধা কিছুই নাই। ইহার পাশে আরও দুইটি যে ঘর আছে তাহার পশ্চাতে কয়েটি গুহা আছে, আমি সেই গুহার একখানিতে শয়ন করিব। আপনারা তিন জনেই এই ঘরে থাকুন। আমি আপনাদের আহারের জন্য কিছু আয়োজন করি।"

"খাবার জিনিষ আপনার সংগ্রহ আছে কি? না থাকে ত বলুন, গ্রাম হইতে আমি গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনি।"

"খাবার জিনিষ আজই ত আমি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। গ্রামে সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসে, আমি সেই দিন আমার নিজের জন্য এক সপ্তাহের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখি। আজ সেই হাটের দিন ছিল—আমি হাট হইতে ফিরিয়া আপনাদিগকে এখানে উপস্থিত দেখিলাম।"—এই বলিয়া বালিকা, ক্ষিপ্রপদে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

রাত্রি অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, বালিকা অতিথিদ্বয়কে ভোজন করাইয়া দিল। একটি বাঁশের চোঙা আনিয়া ফুরচিংএর হাতে দিয়া বলিল, "এটি রাখিয়া দিন, ইহার মধ্যে শাম্বা আছে। নাঙ্গালামা যদি রাত্রে জাগিয়া উঠেন ও খাইতে চাহেন, তবে এই শাম্বা তাঁহাকে পান করিতে দিবেন। আর কোনও জিনিষের প্রয়োজন আছে কি?"—আমরা যাহাকে বার্লি বলি, এই শাম্বা সেই জাতীয় পদার্থ।

ফুরচিং সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলিল, "না আর কিছু চাই না। আপনি যান, আহার করুন। আপনাকে আজ আমরা বড়ই কষ্ট দিলাম।"

নিনা, কিশোরীর নিকট গিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিল। সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লামা-কুমারী।

সপ্তাহ কাল এই মঠে কিশোরী রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর, অবশেষে নিরাময় হইয়া উঠিল। ফুরচিং ও সাইদ উভয়েই এই বিশ্রামটা বেশ উপভোগ করিতেছিল। নিনা স্বয়ং রোগীর পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং ইহারা কার্য্যাভাবে, দিবসে গ্রামে গিয়া আড্ডা জমাইত ও চ্যাং (তদ্দেশীয় মদ্য) পান করিত। তিব্বতীয় ভাষায় লামাকুমারীর অসাধারণ অধিকার দেখিয়া ফুরচিং চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল।

নিনা সর্ব্বদা কিশোরীর শয্যাপার্শ্বেই থাকিত। কিশোরীর জ্বরটা কমিয়া আসার পর হইতে নিনার সহিত তাহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। নিনা তাহাকে নিজ জীবনের অনেক কথাই বলিয়াছে।

অন্নপথ্য করিবার একদিন পরে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি এখানে একা থাক, তোমার ভয় করে না?"

"ভয়? ভয় কাহাকে করিব?"

"চোর ডাকাত আসিতে পারে ত।"

"আমার বন্দুক আছে। সেই বন্দুক ভরিয়া লইয়া রাত্রে আমি শুইয়া থাকি। একবার একটা চোর আসিয়াছিল—এক গুলিতে তাহার একটা ঠ্যাং আমি খোঁড়া করিয়া দিয়াছিলাম।"—বলিয়া নিনা হাসিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্ণকালে ফুরচিং ও সাইদ গ্রামের আড্ডায় গিয়াছিল। মঠের সম্মুখভাগে কম্বল বিছাইয়া কিশোরী বসিয়া ছিল। নিনা আসিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার পার্শ্বে বসিল। কিশোরী বলিল, "তোমার উপর উপদ্রব যথেষ্ট করিলাম; এবার আমাদের বিদায় দাও। তুমি না থাকিলে, এ পীড়ার সময় আমার যে কি অবস্থা হইত, তাহা বলিতে পারি না—প্রাণ বাঁচিত কি না তাহাও খুব সন্দেহের বিষয়। তোমার এ উপকার আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।"

নিনা কহিল, "আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি! তা, তুমি এবার কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ?"

"তাসিলংপুর মঠে গিয়া কিছুদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, এই ইচ্ছাতেই আমি বাহির হইয়াছিলাম; সেইখানেই যাইতে চেষ্টা করিব।"

"কিন্তু, তুমি ত তিব্বতীয় ভাষা জান না।"

"শিখিতেছি। ঐ ফুরচিং আমার পড়ায়। ঐ কার্য্যের জন্যই উহাকে নিযুক্ত করিয়াছি।"

নিনা কিয়ৎক্ষণ নীরবে নতবদনে বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে মুখ তুলিয়া বলিল, "দেখ, তাসিলম্পু যাইবার মৎলব তুমি পরিত্যাগ কর। তুমি সমতল ভূমির লোক, পার্ব্বত্য দেশে ভ্রমণ করা তোমার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে। আবার যদি অসুখে পড়, তখন কি হইবে বল দেখি? আমার পরামর্শ শুন,—তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।"

কিশোরী বলিল, "একবার পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া কি বারবার তাহাই হইবে? আর, পথের কষ্টের কথা বলিতেছ, অভ্যাসে মানুষের সমস্তই সহিয়া যায়। সমতলবাসী কত লোক ত তিব্বতে গিয়াছে—সাহেবরাও গিয়াছে; আমার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীও কেহ কেহ গিয়াছে। আমিই বা পারিব না কেন?"

নিনা বলিল, "সাহেবরা যায়, তাহাদের সঙ্গে কত লোকজন, তাঁবু, ঘোড়া, জিনিষপত্র থাকে। তোমার ত সে সব কিছুই নাই। এ অবস্থায়, তোমার অধিক দূর অগ্রসর হওয়া ক্রমে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে।"

কিশোরী বলিল, "আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি। এখন সে কথা থাকুক, এখন তোমার নিজের কথা বল। তুমি কতকাল আর একাকিনী এই মঠ আগলাইয়া পড়িয়া থাকিবে? বিবাহ করিয়া, সংসারী হইবে না?"

লামাকুমারী হাসিয়া বলিল, "তোমার কেবল ঐ কথা! কাহাকে বিবাহ করিতে হইবে তাহা ত বল না!"

"আমি কি তোমাদের এ অঞ্চলের কাহাকেও চিনি? চিনিলে, ঘটকালী করিতে পারিতাম। কাম্পাচেন গ্রামে, আশেপাশে উপর নীচে আর সব গ্রামে, তোমার স্বজাতীয় এমন একজনও যুবাপুরুষও কি নাই, যাহাকে তোমার পছন্দ হয়?"

"আমার পছন্দ হইলেই ত হইল না; তাহারও ত আমায় পছন্দ হওয়া চাই!"—বলিয়া নিনা আবার হাসিল।

কিশোরী বলিল, "তোমাকে আবার পছন্দ হইবে না? খুব পছন্দ হইবে।"

"কেন, আমি কি এতই রূপসী?"—বলিয়া নিনা কিশোরীর প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

বাঙ্গালী যুবকের চক্ষে, তিব্বতীয় যুবতীর চ্যাপ্টা নাক ও থ্যাবড়ানো মুখে রূপ দেখা একটু কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই; তথাপি কিশোরী পুরুষোচিত সৌজন্যে বলিল, "তোমার মত সুন্দরী মেয়ে, পথে ঘাটে ত একটিও দেখিতে পাই না নিনা!"

এ কথায় নিনার মনটি যে খুসী হইয়া উঠিল, সেটা তাহার মুখের ভাবে বেশ বোঝা গেল; তাহার শ্বেত গোলাপের মত গাল দু'খানি মুহূর্ত্তের জন্য গোলাপী আভ ধারণ করিল।

এই সময় অদূরস্থিত পথ দিয়া, একজন ভুটিয়া ব্যবসায়ী, পাহাড়ী টাটু ঘোড়ার পৃষ্ঠের উভয় দিকে কম্বলের গাঁঠরি বোঝাই দিয়া যাইতেছিল, দেখিয়া নিনা তাহাকে ডাকিল।

কম্বল ব্যবসায়ী, ঘোড়াটি লইয়া মঠের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভুটিয়া ভাষায় নিনার সহিত কম্বলওয়ালার কি কথা-বার্ত্তা হইল তাহা কিশোরী বুঝিতে পারিল না। ভুটিয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কম্বলের বস্তা নামাইয়া, তাহা লামাকুমারীর সম্মুখে ধরিল। নিনা কম্বলগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া, তাহার মধ্যে হইতে চারিখানি বাছিয়া লইল। তাহার পর দরদস্তুর আরম্ভ হইল—সে সকল কথাও কিশোরী কিছুই বুঝিতে পারিল

না। অবশেষে মূল্য স্থির হইলে, লামাকুমারী কম্বল লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া, লামাকুমারী ভুটিয়াকে কি বলিল; ভুটিয়া তাহার উত্তর দিল। কিয়ৎকাল উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিল। অবশেষে লামাকুমারী বিষণ্ন বদনে মঠে প্রবেশ করিয়া, কম্বল গুলি বাহির করিয়া আনিয়া ভুটিয়াকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল, কম্বল ফিরাইয়া দিতেছ যে?"

নিনা বলিল, "এই চারিখানি কম্বলের ৫০৲ দাম হইয়াছে। আমার ধারণা ছিল, ঘরে আমার টাকা আছে। বাক্স খুলিয়া দেখি, ১০।১২৲ মাত্র আছে। উহাকে বলিলাম, কাল এই সময় আসিয়া টাকা লইয়া যাইও। ও বলিতেছে, ও এখন দার্জ্জিলিঙ যাইতেছে, এ পথে শীঘ্র ফিরিবে না; কম্বলের মূল্যের জন্য ও দেরী করিতে পারিবে না। তাই অগত্যা কম্বলগুলি ফিরাইয়া দিতেছি।"

কিশোরী বলিল, "আমার কাছে টাকা আছে, আমি দিব কি?"

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। অবশেষে বলিল, "তবে দাও, কাল আমি তোমায় টাকা দিব।"

কিশোরী উঠিয়া ভিতরে গিয়া, তাহার ব্যাগ হইতে ৫০৲ আনিয়া কম্বলওয়ালার হস্তে দিল। ইহা ইংরাজের টাকা দেখিয়া সে ব্যক্তি বেশ খুসী হইল। তথাপি প্রত্যেক টাকাটি উত্তমরূপে বাজাইয়া লইয়া কোমরে বাঁধিয়া, কম্বলের বস্তা টাটুর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, প্রস্থান করিল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "এত কম্বল লইয়া তুমি কি করিবে?"

"সম্মুখে শীত আসিতেছে যে!—আমি তীর্থ-যাত্রা করিব অভিপ্রায় করিয়াছি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তীর্থ-যাত্রা করিবে? কোথায়?"

শুভ্র সুগোল বাহুখানি নিনা উত্তরদিক নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "অনেক দূরে—শিগাট্‌শীতে—তাসিলংপু মঠে যাইব।"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাসিলংপু যাইবে? কেন?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "তুমি যাইতে পার, আমি পারি না? বিশেষ, যখন এমন সুযোগ পাইয়াছি—সঙ্গী যুটিয়াছে।"

"কে সঙ্গী?"

"কেন, তুমি!"

"তুমি আমার সঙ্গে তাসিলংপু যাইবে? না না, সে মৎলব ত্যাগ কর।"

"কেন করিব?"

"অনেক দূর, বড় কষ্টের পথ সে!"

"তুমি বাঙ্গালী, তুমি পারিবে, আমি পাহাড়ী মেয়ে, আমি পারিব না?"

"আমি পারিব, কিংবা বেগতিক দেখিয়া শেষে মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিব, তাই বা কে জানে?"

"তুমি যদি ফিরিয়া এস, আমিও ফিরিয়া আসিব।"

"তবে মিথ্যা কেন কষ্ট করিতে যাইবে?"

"মিথ্যা কেন? আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"কি প্রয়োজন?"

"তোমার যদি আবার অসুখ বিসুখ করে, আমি সঙ্গে না থাকিলে তোমায় দেখিবে কে?"—কথাগুলি বলিতে বলিতে নিনার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।

ক্ষণকালের নিমিত্ত কিশোরীর মুখ একটু গম্ভীর হইল। লামাকুমারীর ব্যবহারে এ কয়দিনে তাহার মনে যে সন্দেহ আবছায়ার মত দেখা দিয়াছিল, তাহাই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। কিন্তু সে ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া, মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "বেশ বেশ, তুমি একজন আদর্শ বৌদ্ধরমণী বটে। সর্ব্বজীবে দয়া—বেশ ভাল কথা!"

নিনা এ কথা শুনিয়া, তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে কিশোরীর পানে চাহিয়া রহিল। শেষে একটি মৃদু

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

কিশোরী বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিল, —আমি যাহা সন্দেহ করিতেছি, তাহাই যদি হয়, তবে ত বড়ই গোলমালের কথা! নিনা কি আমায় ভাল বাসিতেছে? কিন্তু উহার সে ভালবাসা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে! আমি ত উহাকে ভালবাসিতে পারিব না—আমি যে অন্যের! তা ছাড়া, আমি বাঙ্গালী, ও তিব্বতী—বাঙ্গালীর পক্ষে কোনও তিব্বতী মেয়েকে ভালবাসা কি সম্ভব? কেন ওর এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল? এরূপ অবস্থায়, এখান হইতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইতে পারিলে বাঁচি। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি?—ও যে সঙ্গে যাইতে চাহে! যদি বলি, তোমাকে আমি সঙ্গে লইব না, সেকথাই বা ও শুনিবে কেন? হাত আছে, পা আছে—দেহে বল বুকে সাহস আছে—বাঙ্গালীর মেয়ে ত নয়—ও আমার পিছু লইলে আমি কেমন করিয়া উহাকে নিবারণ করিব? তবে কি পলায়ন করিব? বোধ হয় সেই পরামর্শই ভাল।

এ সময় কিশোরী সহসা তাহার স্কন্ধদেশে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিল। ফিরিয়া দেখিল, নিনা ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোমল স্বরে বলিল, "নাঙ্গালামা, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

"না, রাগ করিব কেন?"

"তোমার সঙ্গে তাসিলংপু যাইতে চাহি বলিয়া?"

"না, রাগ করি নাই। তবে, তুমি ছেলেমানুষ, অত দূরপথে যাওয়াটা তোমার পক্ষে ভাল নয়; একথা কিন্তু এখনও বলিতেছি।"

"আচ্ছা, সে কথা এখন যাউক। সে পরের কথা পরে হইবে। এখন তোমার কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে।"

"কি, বল।"

"আজ যে আমি কম্বল কিনিয়াছি, টাকা ছিল না তুমি আমায় টাকা ধার দিয়াছ, এ কথাটি ফুরচিং অথবা সাইদার কাছে তুমি প্রকাশ করিও না।"

উহাদের নিকট সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য কিশোরীর কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না; তথাপি এই অনুরোধের কারণ কি জানিবার জন্য তাহার মনে একটু কৌতূহল জন্মিল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাতে দোষ কি?"

নিনা বলিল, "দোষ আছে। কি দোষ আছে, হয়ত একদিন আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিব, কিন্তু এখন নয়। এখন তুমি আমায় কথা দাও যে সে কথা তুমি উহাদের নিকট প্রকাশ করিবে না।"

কিশোরী বলিল, "আমি কথা দিতেছি, সে কথা আমি উহাদের নিকট প্রকাশ করিব না।"

"বেশ।"—বলিয়া নিনা আসিয়া কিশোরীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। বলিল, "আর একটি কথা। টাকাটা কালই আমি শোধ করিয়া দিব বলিয়াছিলাম। কালই যদি না পারি, যদি দুই চারিদিন বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তুমি রাগ করিবে না?"

"না না, রাগ করিব কেন?"

"তুমি মনে করিবে না, হয়ত এ আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে?"

কিশোরী বলিল, "ছি ছি,—সে কথা কোনও দিন আমার মনের ত্রিসীমানাতেও আসিতে পারে না।"

নিনা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, যে কথা হইল, তাহা তোমার মনে থাকে যেন। ঐ দেখ, ফুরচিং ও সাইদা ফিরিয়া আসিতেছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিনার কাণ্ড।

ফুরচিং ও সাইদা আসিয়া পৌঁছিতেই লামাকুমারী মঠের ভিতরে প্রবেশ করিল। ফুরচিং আসিয়া সাইদাকে ঝরণা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়া, কিশোরীর নিকট বসিয়া বলিল, "আজ শরীরটা কেমন বোধ হইতেছে?"

কিশোরী উত্তর করিল, "ভালই আছি।"

ফুরচিং বলিল, "এখনও আপনি খুব দুর্ব্বল।"

"আর দিন দুই পরেই বোধ হয়, আবার যাত্রা করিবার মত বল পাইব।"

ফুরচিং বলিল, "না না, নাঙ্গালামা। দিন দুই আপনি কি বলিতেছেন? আরও অন্ততঃ এক সপ্তাহ এখানে আপনার বিশ্রাম করা উচিত।"

কিশোরী মৃদুস্বরে বলিল, "সেটা কি আমাদের উচিত হইবে? একজন সহায়হীনা স্ত্রীলোকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া চর্ব্বচোষ্য আহার—সেই বা কি মনে করিবে?"

ফুরচিং বলিল, "না না, নিনা বড় ভাল মেয়ে, ও কিছুই মনে করিবে না। আপনি স্বচ্ছন্দে—"

এই সময় নিনা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "নাঙ্গালামা, তোমার চা প্রস্তুত হইয়াছে। ভিতরে আসিয়া পান করিবে, না এই খানেই আনিয়া দিব?"

কিশোরী কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ফুরচিং বলিয়া উঠিল, "এইখানেই আনিয়া দাও নিনা।"

ক্ষণকাল পরে, লামাকুমারী দুই পেয়ালা ধূমায়িত চা আনিয়া উভয়ের হস্তে দিল। নিজেও এক পেয়ালা লইয়া আসিয়া, সেইখানে বসিয়া পান করিতে লাগিল।

ফুরচিং বলিল, "শুনিয়াছ নিনা, নাঙ্গালামা বলিতেছেন, ২।১ দিন পরেই উনি আবার যাত্রা আরম্ভ করিবেন। এই দুর্ব্বল শরীরে, এই পাহাড়ের পথ ভাঙ্গিতে সুরু করা কি উঁহার উচিত হইবে?"

নিনা বলিল, "আমি ত মানা করিতেছি। উনি শোনেন কৈ?"

"আমি বলি কি, উনি অন্ততঃ আর এক সপ্তাহ এখানে বিশ্রাম করুন।"

কিশোরী বলিল, "না না, শরীরে আমি বেশ বল পাইয়াছি, এখন আর অনর্থক এখানে বিলম্ব করিয়া ফল কি?"

নিনা মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইয়া, চা পান করিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পরে, নিনা নিজকক্ষে শয়ন করিতে গেলে, ফুরচিং আবার কিশোরীকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এখানে আর কিছুদিন থাকিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যের অজুহাত কিশোরী মানিতেছে না দেখিয়া, অবশেষে ফুরচিং বলিল, "দেখুন, আরও একটা বিশেষ কথা আছে। আপনি ত বেশ জানেন, তিব্বতীয়গণ, বিদেশী লোককে—বিশেষতঃ ইংরাজ বা ইংরাজের প্রজাগণকে,—বিষম সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাসিলংপু মঠে আপনি প্রবেশের অনুমতি পাইবেন কি না সে ত বহু দূরের কথা—তিব্বতের সীমানায় প্রবেশ করিলেই তিব্বতীয় প্রজারাই আপনার প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিবে। আপনি লামা সাজিয়াছেন বটে, কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় এখনও আপনার ভালরূপ বুৎপত্তি হয় নাই। পথ চলিতে চলিতে, বিশ্রামের অবকাশে আপনাকে আমি পড়াইয়াছি বটে, কিন্তু সারাদিনের পথশ্রমের পর, আপনি বেশী মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। তাই আমি বলি কি, কিছুদিন এখানে থাকিয়া, ভাষাটা উত্তমরূপে শিখিয়া লউন—তখন আর পথে কোনও উৎপাত উপদ্রবের আশঙ্কা থাকিবে না।"

কথাটা কিশোরীর মনঃপূত হইল বটে; কিন্তু এ মঠে নিনার অতিথি হইয়া, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে থাকা কিছুতেই তাহার তাহার সদ্যুক্তি বলিয়া মনে হইল না। সে বলিল, "আচ্ছা, কথাটা আমি ভাবিয়া দেখিব। এখন ঘুমান যাক্—অনেক রাত হইয়াছে।"

ফুরচিং বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল, কিশোরীর কিন্তু ঘুম আসিল না। সে নানা চিন্তা করিতে লাগিল। তিব্বতীয়গণের বিদেশী-বিদ্বেষ সম্বন্ধে ফুরচিং যাহা বলিয়াছে, তাহা যথার্থ বটে। শরচ্চন্দ্র দাসের পুস্তকেও কিশোরী সে কথা পড়িয়াছে। সত্য সত্যই তাসিলংপু মঠে যাইবার বাসনা তাহার কোনও দিন ছিল না—ফুরচিংকে ভুলাইবার জন্যই ও কথা সে বলিয়াছে। তাহার আসল মৎলব, কিছুকাল লুকাইয়া থাকা। মঙ্গলুর খুন হইবার গোলমালটা চুকিয়া গেলেই সে আবার দেশে ফিরিবে—সত্যবালাকে বিবাহ করিবে—

আবার সুখের মুখ দেখিবে—ইহাই তাহার মনের বাসনা। কিন্তু, সে সব গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে কি না, সে খবরই বা তাহাকে কে দিবে? অন্ততঃ বৎসর খানেক গা ঢাকা দিয়া থাকা আবশ্যক—তার মধ্যে, মোটে ত একটি মাস মাত্র গত হইয়াছে। সম্বলের মধ্যে ২০০৲ টাকা ছিল, তাহার ত প্রায় এক চতুর্থাংশ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিটোগাং-এ কম্বল প্রভৃতি কিনিতেই বেশী টাকা খরচ হইয়াছে—পথে আহারের ব্যয় এমন কিছু বেশী লাগে নাই বটে। দিন চলিবার উপায়ই বা কি? প্রথম কয়েক দিন মনের উদ্বেগ—দার্জ্জিলিং হইতে যতদূরে পলায়ন করিতে পারে, সেই ঝোঁকে, এ সকল কথা ভাল করিয়া ভাবিবার অবসর সে পায় নাই। তার পর, সিকিম রাজ্যের এই সুদূর স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়া, সপ্তাহ কাল ত রোগশয্যাতেই কাটিয়াছে। এখন আর অধিক দূরে পলাইবার তেমন প্রয়োজন নাই—তাসি লম্পু যাইবার প্রয়োজন ত নাই-ই। এই গ্রামে বাকী ১১ মাস থাকিয়া গেলেও চলিত। কিন্তু ঐ ছুঁড়িই যে গোল বাধাইল! কিশোরী মনে মনে বলিল, কেন রে বাপু—তোদের স্বজাতীয় এত যুবাপুরুষ থাকিতে, এই গরীব বাঙ্গালী কায়স্থ সন্তানের উপরেই তোর মন পড়িল কেন?

অবশেষে কিশোরী স্থির করিল—এখান হইতে পলায়ন ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। আপাততঃ এরূপ ভাব দেখাইতে হইবে, যেন নিনার অনুরোধ ও ফুরচিং-এর উপদেশ অনুসারে, এখানেই সে আরও দিন কয়েক অবস্থান করাই স্থির করিয়াছে;—তার পর—ফুরচিংকে চুপি চুপি সব কথা বলিয়া, একদিন রাত্রি-যোগে উঠিয়া—পলায়ন। তাসি লম্পুর পথে নহে—কারণ, নিনা খুব সম্ভব টাটুঘোড়ায় চড়িয়া, সেই পথেই তাহাকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে। আপাততঃ দারজিলিঙের পথেই যাইতে হইবে, তার পর যেমন পরামর্শ হয়, সেইরূপ করা।

পরদিন প্রাতে কিশোরীকে নির্জ্জনে পাইয়া সাইদা বলিল, "লালামা, এখানে থাকিবার জন্য ফুরচিং কেন যে আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করিতেছে তাহা জানেন?"

"কেন বল্ দেখি।"

"নিনাকে বোধ হয় ও বিবাহ করিতে চায়।"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "বলিস্ কিরে। বিবাহ করিতে চায়?"

"হাঁ। গ্রামের লোকের কাছে ও শুনিয়াছে যে, এই মঠের লামাগণের বংশানুক্রমে সঞ্চিত রাশি রাশি টাকা মোহর, মোটা মোটা সোণার বাট, দামী দামী হীরা মুক্তা প্রভৃতি জহরৎ - বলিতে গেলে একটা রাজার সম্পত্তি ছিল। নিনার পিতা সেই সমস্ত ধনরত্নের অধিকারী ছিলেন। সে সকল জিনিষ পর্ব্বতের কোন্ স্থানে লুকানো আছে তাহা কেবল মাত্র এই নিনা জানে, আর কেহ জানে না। লামার মৃত্যুর পর, সেই ধনরত্নের লোভে অনেকে নিনাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিনা কাহাকেও বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই। ফুরচিং বোধ হয় এইবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে।"

কিশোরী হাসিয়া বলিল, "নিনা উহাকে বিবাহ করিবে কেন?"

সাইদা বলিল, "কি জানি। ফুরচিং অবশ্য স্পষ্ট করিয়া এ কথা বলে নাই; তবে উহার কথাবার্ত্তায় আমার ঐ প্রকার সন্দেহ হয়।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

নিনার বাক্সে টাকা নাই, "কাল শোধ করিব" বলিয়া কিশোরীর নিকট সে ৫০৲ টাকা ধার করিয়াছে; কিরূপে টাকা আনিয়া ঋণ শোধ করিবে এইবার কিশোরী তাহা বুঝিতে পারিল।

আহারান্তে কিশোরী নিদ্রা গিয়াছিল। ফুরচিং ও সাইদা বাহিরে বসিয়া ছিল। নিনা আসিয়া সাইদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত এই প্রদেশ চেন। এখান হইতে দুই পাহাড় দূরে, উপত্যকায় সানচং নামক একটি গ্রাম আছে, দেখিয়াছ কি?"

সাইদা বলিল, "না, দেখি নাই, তবে সে গ্রামের নাম আমি শুনিয়াছি বটে।"

"সেই গ্রামে, ভাল ভাল টাটু ঘোড়া পাওয়া যায়। আমার চারিটি টাটুর প্রয়োজন। তুমি ও ফুরচিং দুজনে গিয়া, আমার জন্য চারিটি টাটু কিনিয়া আনিয়া দাও। পারিবে?"

ফুরচিং বলিল, "কেন পারিব না? আজই যাইতে হইবে কি?"

"যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।"

ফুরচিং ও সাইদা সম্মত হইল। বড়লোকের হাট বাজার করিতে পাইলে দু'পয়সা লভ্য আছে বৈ কি! নিনা ফুরচিংকে ১০০৲ দিয়া বলিল, "চারিটি বেশ ভাল দেখিয়া টাটু কিনিয়া আনিবে। যেন বুড়া বা রুগ্ন না হয়।"

টাকা লইয়া উহারা প্রস্থান করিল। ঘুম হইতে উঠিয়া কিশোরী উহাদের তত্ত্ব লইলে নিনা বলিল, "তাহারা আমার জন্য চারিটি ঘোড়া কিনিতে গিয়াছে।"

কিশোরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়া কি হইবে?"

নিনা বলিল, "ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তাসিলংপু যাইব।"

শুনিয়া কিশোরী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পর, কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, এখনও উহারা ঘোড়া কিনিয়া ফিরিল না?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "সে যে দুই পাহাড় দূরে। আজ কি করিয়া ফিরিবে? কাল সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিতে পারে।"

আহারাদি শেষ হইল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। নিনা বলিল, "দাদামামা, তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় একটি জিনিষ দেখাইব। কেবল ঘোড়ার জন্যই নহে, ইহা তোমায় দেখাইব বলিয়াও ফুরচিং ও সাইদাকে আজ সরাইয়াছি।"

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, "কি দেখাইবে নিনা?"

"আমার কিছু পৈতৃক ধন সম্পত্তি লুকানো আছে। আমরা উভয়ে শীঘ্র দুর্গম পথে যাত্রা করিতেছি। যদি পথে আমি মরিয়া যাই, তবে এই সমস্ত সম্পত্তি তোমার হইবে। আমার ত আর কেহ নাই।"—বলিতে বলিতে নিনার নেত্রপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

কিশোরী বলিল, "ছি নিনা, তুমি ও কথা কেন বলিতেছ! তুমি মরিবে কেন?"

নিনা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কিছু কি বলা যায়? তুমি আমার সঙ্গে এস।"—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে?"

"এস"—বলিয়া নিনা প্রদীপ হস্তে সে ঘর হইতে বাহির হইল। কিশোরীও তাহার পশ্চাৎ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিনা প্রদীপ কিশোরীর হস্তে দিয়া সে ঘরের দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘর খুলিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিশোরী প্রবেশ করিলে, নিনা দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল। ঘরের শেষে একটি গুহার দ্বার। সেই গুহায় কিশোরীকে লইয়া গিয়া, সে দ্বারও নিনা খিলবদ্ধ করিল। বলিল, "এই ঘরে আমি শয়ন করি। এই দেখ আমার বন্দুক। এই বাক্সটাতে আমার গুলি বারুদ ছোরা সড়কি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র থাকে।"—বলিতে বলিতে মেঝের উপর হইতে নিজ শয্যাটি উঠাইয়া ফেলিল।

কিশোরী দেখিল, শয্যার নীচে একখানা চৌকা পাথর রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে খাঁজ কাটা। নিনা একটা শাবল লইয়া, সেই পাথরের একটা ফাঁকের স্থানে সবলে চুকাইয়া চাড় দিল। পাথরখানা উঠিয়া পড়িল।

পাথর সম্পূর্ণ অপসৃত হইলে কিশোরী সভয়ে দেখিল, নিম্নে একটা গহ্বর—নামিবার জন্য পাথরের গায়ে গায়ে কতকগুলি সিঁড়ি কাটা রহিয়াছে।

"আমার পিছু পিছু এস"—বলিয়া নিনা কিশোরীর হস্ত হইতে প্রদীপটি লইয়া সেই গহ্বরে অবতরণ করিল।

কিশোরীও কম্পিত হৃদয়ে গহ্বরমধ্যে নামিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ-সমালোচনা

ভুল ভাঙ্গা

উপন্যাস। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক, কলিকাতা, ১৩৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, অমর লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ৩১১ পৃষ্ঠা কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ২৲ টাকা।

গ্রন্থকার, স্বনামখ্যাত প্রতিভাশালী সুদক্ষ রঙ্গালয় পরিচালক ও কৃতী অভিনেতা স্বর্গগত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র। মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণে গ্রন্থকার যে বিশেষ পটু, তাহা আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িলেই প্রতীয়মান হয়। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হঠাৎ-আলোক প্রাপ্ত একশ্রেণীর কিরূপ হাস্যকর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহার চিত্র কয়েকটা দিক হইতে বেশ সুন্দর ভাবে এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপন্যাসে ভাবের চিত্র প্রদর্শিত হইলেও স্থানে স্থানে গ্রন্থকার চরিত্র-গত অপকর্ষতার দিকটি সাধারণের সম্মুখে সুন্দর প্রতিভাত করাইবার অভিপ্রায়ে উচ্ছ্বাসময়ী বর্ণনা করিতে বিরত হইতে পারক হয়েন নাই। তিনি তাঁহার রসপূর্ণ ভূমিকার মধ্যে গর্ব্ব করিয়া লিখিয়াছেন, "বহিখানি পড়িতে পড়িতে যখন আপনি মনের সাধে ইহার রস-সাগরে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হইবেন, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনি হাসিবেন—এত হাসিবেন যে, হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িবেন।" পুস্তকখানি তাঁহার সে গর্ব্ব সার্থক করিয়াছে। ভাষা বেশ সরল, বিষয়োপযোগী ও প্রাঞ্জল। উপন্যাসপ্রিয় পাঠকগণ পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিক্ষাও পাইবেন।

"বাণীসেবক"

শান্তি।

কবিতাগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৫পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ৸০

ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি। ছোট হইলেও কবিতাগুলি ভাবপূর্ণ, সবগুলিই বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভগবানের উদ্দেশ্যে গ্রথিত পুষ্পমাল্যের ন্যায় এই কবিতাগুচ্ছও সুন্দর ও সৌরভময়। কোন কোনও গান আমাদের খুবই ভাল লাগিল।

বিনা তব প্রেমে গীত গেছে থেমে,
পরাণে বহিছে মরু বায়।
মরিব বলিয়া আছি অপেখিয়া,
যেখানে ধরিয়া তব পায়।

সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

সাঁওতাল কাহিনী।

কাব্যগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত লোকনাথ দত্ত প্রণীত। বেঙ্গল প্রিণ্টার্স লিমিটেড, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও কর মজুমদার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজি ২০৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৲

সাঁওতাল বিদ্রোহ অবলম্বনে কাব্যখানি লিখিত। বর্ণিত ঘটনা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইলেও, কাব্য সৌন্দর্য্যের অভাবে তাহা তেমন উপভোগ্য হয় নাই। স্থানে স্থানে খুব ভাল হইয়াছে, কিন্তু আবার গ্রন্থের অনেক স্থানে একটা আড়ষ্ট ভাবও আছে। লেখকের প্রতিভার ছাপ কোথাও নাই। মাঝে মাঝে ছন্দ এতই আড়ষ্ট যে পড়িতে কষ্ট হয়, যেমন,—

"চাড়ি পুত দেওঘর" পরগনা "পাহাড় তল"
"বড়হাট" কেন্দ্র এল "কেসকু"-"মুর্ম্মু" বীর দল;
আইল "হাসক" যোদ্ধা গড়া জামতাড়া পথে;
আইল "হেমব্রোম" বীর সংস্র সৈনিক সাথে;

মোটের উপর, কাব্যখানি চলনসই হইয়াছে। বইয়ের ছাপা বাঁধাই ও কাগজের অনুপাতে ১৲ দাম খুব কমই হইয়াছে।

মেয়েলি হোমিওপ্যাথি।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মজুমদার বি-এ প্রণীত ও তৎ কর্ত্তৃক আদমপুর-ভাগলপুর হইতে প্রকাশিত। ভাগলপুর করোনেশন আর্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ১৮৪ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ২৷৷০

সাধারণ লেখাপড়া জানা মেয়েদের জন্য সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বইখানি লেখা হইয়াছে। শিশু ও স্ত্রীলোকদের সচরাচর যে সব রোগ হইয়া থাকে,

বেশ সুন্দর ভাবে তাহার বর্ণনা, ঔষধের মাত্রা ও সেবন প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একখানি বই ঘরে থাকিলে সময় অসময় অনেক কাযে লাগিবে বলিয়া মনে হয়। ফুটনোটে কতকগুলি শব্দের প্রাদেশিক অর্থ দিলে ভাল হইত। কোন কোন শব্দের মানে হয়ত সব মেয়েরা বুঝিতে পারিবেন না, যেমন ১৩৭ পৃষ্ঠায় "ভ্যাদালে ব্যথা"—১৪৩ পৃষ্ঠায় "চোকয়ের পুলটিস" ইত্যাদি।

স্নেহের শাসন।

উপন্যাস। শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২১৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ২৲

উপন্যাসখানি ভাল হইয়াছে। প্রথম খণ্ড তেমন না জমিলেও, এবং কতকগুলি ত্রুটি থাকিলেও, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ইন্দিরা ও অন্নদা সুন্দর হইয়াছে। রামময়, রমানাথ, রে সাহেব, বড় বৌ ও অন্নদা এই চরিত্রগুলি ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে বেশ ফুটিয়াছে।—লিলি চরিত্র শেষাংশে বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বেস্তাদের সমাজে গ্রহণ করিবার ধৃণা লেখককে পাইয়া বসিল কেন,—বুঝিতে পারিলাম না।

শান্তা সতী।

উপন্যাস। শ্রীযুক্ত লোকনাথ দত্ত প্রণীত। বেঙ্গল প্রিণ্টার্স লিমিটেড কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কর, মজুমদার এণ্ড কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২২২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৲

ভাব, ভাষা ও ঘটনা,—তিনটার একটারও প্রশংসা করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। বইখানি নামেই উপন্যাস হইয়াছে, উপন্যাসের রসধারা ইহাতে নাই। এই অসংযত প্লটের ভিতর দিয়া দু-একটি চরিত্র হয়ত ফুটিলেও ফুটিতে পারিত, কিন্তু ভাব ও ভাষার দৈন্যে একটি চরিত্রও ফোটে নাই। গ্রন্থের সর্ব্বত্র নাটকীয় ভাষা—যেমন "আমাদের প্রণয় বৃক্ষের প্রথম ফলটি" (৮পৃষ্ঠা), "নাথ, হৃদয়েশ্বরী তোমায় অদেয় আমার কি আছে?" ১৯৭পৃঃ।

"কান্তি"।

শোক-সংবাদ

৺রাখালরাজ রায়

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, নানা সাময়িক পত্রের লেখক, আমাদের অকৃত্রিম সুহৃদ রাখালরাজ রায় মহাশয় ৫৩ বৎসর বয়সে, বিগত ২রা পৌষ তারিখে, রক্তামাশয় রোগে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায়। জাতিতে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাস করিয়া তিনি শিক্ষকতা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তিন বৎসর পূর্ব্বে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃপায় বাঙ্গলা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে,রাখালরাজ কলিকাতায় আসিয়া, ৫০ বৎসর বয়সে সেই পরীক্ষা পাস করেন। বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার কতদূর অনুরাগ, তাহা এই ঘটনা হইতেই বোঝা যায়। এম-এ উপাধি লাভের পর, বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ্চ স্কলারসিপ পাইয়া, তিনি বঙ্গভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত ছিলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটে; কোন সন্তানাদিও জীবিত ছিল না। আর তিনি বিবাহ করেন নাই; সাহিত্য চর্চ্চাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন;—বেশবেশের কোনও পারিপাট্য তাঁহাতে কখনও দেখি নাই। শ্রীভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

১৫শ বর্ষ, ২য় খণ্ড সমাপ্ত

কলিকাতা

১৪এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত